"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

সম্পাদনা ও পরিচালনায় : গৌর চট্টোপাধ্যায় এম এ
সম্পাদনায় সহযোগী : লালচাঁদ দত্ত
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-সজ্জায় : রামকৃষ্ণ বসু ও রামকৃষ্ণ দত্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ : নিতাই চট্টোপাধ্যায়
বিজ্ঞাপন-সচিব : অধর মুখোপাধ্যায়
সহকারিতায় : গৌরবরণ ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

আষাঢ়, ১৩৫৯

সম্পাদকীয়— ৩
নতুন ছবি— ৫
কার পাপে ? চিতা বহ্নিমান
নতুন পাঠশালা ; কা-তব-কান্তা
আপনাদের চিঠি— ৯
নতুন নাটক—
জীবন সংগ্রাম ১৪
আকাশবাণী—
বেতারবন্ধু ১৭
নাগরদোলা—
'শ্রীনরাধম' চালিত ২৪
বাণীচিত্রের বাণী—
বীরেন্দ্রনাথ সরকার ২৮
বাংলা চিত্রজগতেঃ বিশ বছর আগে— ৩১
অভিনয়শিল্পের রীতি ও পদ্ধতি—
কনষ্টান্টিন ষ্টানিস্লাভস্কি
অনুবাদক : সুবোধকুমার ঘোষ ৩১
রিটার রোমান্স— ৩৭
ষ্টুডিও সংবাদ— ৪১
হলিউড ডায়েরী— ৪৬
ব্রিটেন থেকে— ৪৮
বোম্বাই বার্ত্তা— ৫১
মাদ্রাজ-সংবাদ— ৫৪
কলকাতার খবর— ৫৫
টুকরো খবর— ৫৭
বিবিধ অনুষ্ঠান— ৫৯
আপনি কি বলেন ?— ৬৪
কানন-চন্দ্রা-উমা—
সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৬৭

ছ বি র পা তা য়

(প্রচ্ছদপটে) 'আন' ছবিতে নাদিরা ; 'কার পাপে ?' চিত্রে মঞ্জু দে ; 'অঞ্জাম'-এ বৈজয়ন্তী-মালা ; 'পুণম্'-এ আশা মাথুর ; বীরেন্দ্রনাথ সরকার ; মঞ্চ-প্রযোজক ষ্টানিস্লাভস্কি ; ছলনাময়ী রিটা ; রিটা ও প্রিন্স আলী খাঁ ; 'আন' ছবির একটি দৃশ্যে শীলা ; মার্কিন চিত্রাভিনেত্রী ইভন্-ডি-কার্লো ; ব্রিটিশ চিত্রজগতের অভিনেত্রী প্যাট্রিসিয়া রক ; গ্যাব্রিয়েল পাস্কাল ও জিন সিমন্স ; সুলেখা ওয়ার্কসের ৭ম-বার্ষিকী উৎসবে ভাষণরত শ্রী এন মৈত্র ; 'চিতা বহ্নিমান' চিত্রে অনুরাধা দেবী ও অভি ভট্টাচার্য্য ; 'লিপটন-অনুষ্ঠানে' বার্ত্তাপ্রেরণরতা কামিনী কৌশল ও নলিনী জয়ন্ত ; সাবিত্রী-সত্যবান চিত্রে সমর রায় ও যমুনা সিংহ

চিত্রবাণী
নাট্য, চিত্র ও শিল্পকলার
সচিত্র মাসিক পত্রিকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য—১২৲ (সাধারণ ডাকে) : ১৫৷৷০ (রেজিষ্ট্রী ডাকে)
চতুর্থ বর্ষ | আষাঢ় ১৩৫৯ | দশম সংখ্যা

বাণী বিতরণের বন্যা

সারা ভারতবর্ষে বহু প্রদেশে যখন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় জলপ্লাবন ডেকে এনেছে ঠিক এমনি একটা সময়ে আমরা দেখছি সারা দেশ জুড়ে বোম্বাই থেকে বাংলা, কেশকার থেকে সরকার সবার মধ্যেই বাণী বিতরণের বন্যা অতি উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে। গত একমাসের মধ্যে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখেছি এই বাণী বিতরণের মহোৎসব—দেখেছি সরকারী বেসরকারী মহলে সর্ব্বত্র। ভারত সরকারের বেতার ও তথ্য মন্ত্রী শ্রীকেশকার দিয়েছেন জোরালো বাণী—তিনি নীতিবাগীশ নন তবে ভারতীয় ছবির নীতিবোধ, শ্রীলতা সম্বন্ধে অসংযম তাঁর পক্ষেও সহ্য করা অসম্ভব হ'য়ে পড়েছে—ভবিষ্যতের জন্য তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। অথচ সরকারী সেন্সর দপ্তর চিরাচরিত প্রথায় চলেছেন আজও—কোনো ছবি সহস্র আপত্তিকর কারণ থাকা সত্ত্বেও স্বচ্ছন্দে সেন্সরের ছাড়পত্র পায় এবং পাচ্ছে, আবার কোনো ছবি এই সব কারণের কোনোটা না থাকা সত্ত্বেও ছাড়পত্র পেতে নাজেহাল হয়। 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' বলে চিহ্নিত ছবি দেখতে অপ্রাপ্তবয়স্করাই উন্মাদ ও উদ্দাম হ'য়ে ভীড় জমাচ্ছে। নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার কলকাতায় এক অভিভাষণে বাণীচিত্রের বাণী সম্বন্ধে বহু মূল্যবান বাণী দিয়েছেন যা তাঁর সমব্যবসায়ী এমনকি তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের কাছেও উদাত্ত এবং হৃদয়গ্রাহী লাগবে। বোম্বাইয়ে চণ্ডুলাল শা' এক বাণী দিয়েছেন চিত্রদর্শক ও সমালোচকদের উদ্দেশ্যে যার মর্ম্মার্থ দাঁড়ায় এই যে তাঁরা অর্থাৎ চিত্রনির্ম্মাতারা ছবি যা করেন তা' সবই ভালো কিন্তু চিত্রসমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতার অভাবের দরুণ কাগজে কাগজে তাঁরা বিরূপ সমালোচনা করেন ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে সারা ভারতের রাজনৈতিক আকাশ যে রকম বাণীর সমারোহে মন্ত্রিত ও মুখরিত হ'য়ে আসছিল স্বাধীন অস্তিত্ব অনুভূতির গত পাঁচটি বছরে, তারই সংক্রমণ সুরু হয়েছে বাণীচিত্রের আকাশে। চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটির সাক্ষ্য, সুপারিশ লেখালেখি ইত্যাদিতে গত দুবছর ধ'রে বাণীর মুষলধারে বারিপাত চলেও আজও বাণী রুদ্ধ হোলো না—সম্ভব হোলো না কেবল তদন্তের ফলাফলকে কাজে লাগানো। বাংলা দেশ থেকে উঠেছে মুমূর্ষু (তবু মৃত নয়) চিত্রশিল্পকে বাঁচানোর বাণী—প্রদেশের সংকুচিত গণ্ডীকে সম্প্রসারিত ক'রে বাংলা ছবির বাজার বৃদ্ধির বাণী—বোম্বাই থেকে উঠেছে, ভারতীয় ছবির সর্ব্বজাগতিক (ইতিহাস-ভূগোল-দেশকালপাত্রের বন্ধনহীন) দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত ক'রে দুনিয়ার ছবির বাজার অধিকার করার বাণী—ছবিতে রঙ্‌ লাগানোর বাণী। এদিকে বাণী বিতরণের মহোৎসব যত বেশী বিরাট, ব্যাপক ও সংক্রামক হ'য়ে উঠছে ততই বোধ হয় শ্রোতার সংখ্যা কমে আসছে, কর্ম্মের উদ্দীপনা ও উৎসাহ কমে আসছে। তাই সবিস্ময়ে ভাবছি এই বাণী বিতরণের বন্যা রোধিবে কে? ভাবছি, এই বাণী মহোৎসবের প্রলয়মত্ততা থামবে কবে এবং কতদিনে?

নতুন ছবি

কার পাপে ?

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আদর্শমূলক চিত্ররচনার ক্ষেত্রে বাংলা দেশ চিরদিনই অগ্রণী। আর্থিক সাফল্য সম্বন্ধে সংশয় ও উদ্বেগকে হাসিমুখে স্বীকার ক'রে নিয়ে বাংলা দেশই আদর্শপ্রাণ ও সমাজকল্যাণপন্থী ছবি তৈরী করার দূরদর্শিতা ও অসমসাহসিকতার স্বাক্ষর রেখেছে। বিগত দিনে সে সাক্ষ্য দিয়েছেন নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠান—তাঁদের তোলা 'জীবন মরণ', 'দেশের মাটি' জাতীয় ছবি পর্দার বুকে তুলে ধরেছিল সমাজ-কল্যাণের সমস্যা ও সমাধানের ছবি, আনন্দের মাধ্যমে তুলে ধরেছিল সামাজিক ব্যাধি ও তার প্রতিকারের ছবি। ইদানীংকালে এম পি প্রোডাকসন্সের চিত্র-রচনার প্রচেষ্টার মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে সমাজ-সেবা এবং সামাজিক গ্লানি ও ব্যাধির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশের সার্থক আয়োজন। এই আয়োজনেরই সর্ব্বশেষতম সার্থকতম পরিচয় রয়েছে 'কার পাপে ?' চিত্রের মধ্যে। বহুনিন্দিত সর্ব্বনাশা যে গ্লানি, যে ব্যাধি গোপন রন্ধ্রে রন্ধ্রে অলক্ষ্যে বিরাজ ক'রে দেশ জাতি ও সমাজকে ক্ষয় ও ক্ষতির ভরাডুবিতে টেনে নিয়ে চলেছে, অসংযত চিত্তবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াসক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণামসঞ্জাত এই উৎকট ব্যাধির প্রসার কিভাবে হয়, তার পরিণতি কি, এ রোগ থেকে মুক্তি ও প্রতিকারের উপায় কি ইত্যাদি বহুতর প্রশ্ন যার প্রকাশ্য ও ব্যাপক আলোচনা আজও দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, সেই সমস্যা ও প্রশ্নকে অত্যন্ত স্পষ্ট, অকপট ও বলিষ্ঠভাবে 'কার পাপে ?' চিত্রের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত ক'রে তুলেছেন এম পি প্রোডাকসন্স, এই সামাজিক গোপন-সঞ্চারী ব্যাধি থেকে মুক্তির বিজ্ঞানসম্মত উপায় নির্দ্দেশ করার জন্য চলচ্চিত্রানুরাগী প্রতিজন চিন্তাশীল ও আগ্রহী সমাজ-কল্যাণকামীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিনন্দন লাভ করবেন তাঁরা।

সাগরপারের চিত্রজগৎ থেকে ইতিপূর্ব্বে এ-ধরণের বলিষ্ঠ এবং অসমসাহসিক ছবি আমরা পেয়েছি—Damaged Lives এবং Secrets of Life—তাতে মূলকাহিনীতে এবং প্রসঙ্গক্রমে সিফিলিস্ ও গণোরিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এবং ভয়াবহ পরিণাম ও ক্ষয়-ক্ষতির ইতিহাস, এই সব যৌন ব্যাধি থেকে আরোগ্য-লাভের উপায় বর্ণিত ও চিত্রিত হয়েছিল। এই দিক দিয়ে বাংলা দেশে তথা সারা ভারতে প্রথম প্রচেষ্টার সাক্ষ্য রাখলেন এম পি প্রোডাকসন্স।

১৯৩৮ সাল।

রাত্রের অন্ধকারে গা ঢেকে একটি সুবেশধারী যুবক এলো ডাক্তার বোসের ক্লিনিকে। ডাক্তার পরীক্ষা করে যে রোগের কথা বললেন, তাতে তাঁর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। গ্লানিকর সিফিলিস রোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য যুবক ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। কিন্তু ডাক্তারের কাছ থেকে দীর্ঘ তিন বছর ধ'রে সর্ব্বপ্রকার বিলাস থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে চিকিৎসার তালিকা শুনে বিব্রত হলেন। উপায়ান্তর না দেখে যুবক চিকিৎসা সুরু করালেন—কিন্তু অন্তর তাঁর বিদ্রোহী হয়ে রইল।

তিন মাস চিকিৎসা করানোর পর যুবকের দেহে যখন রোগের সমস্ত বাহ্যিক চিহ্ন মিলিয়ে গেল তখন তাঁর নাইট্ ক্লাবের বন্ধুরা বিদ্রূপ করলো,—"এক ধাপ্পাবাজ ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে তোমার সর্ব্বস্বান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিস্তার নেই!" একদিকে নাইট্ ক্লাবের বিলাসের আকর্ষণ, অন্যদিকে ডাক্তারের সতর্কবাণী—যুবক দোটানায় পড়লেন। যুবক ডাক্তারকে গিয়ে জানালেন যে, তিনি বিবাহ করে শান্ত সংযত জীবন যাপন করতে চান। কিন্তু ডাক্তার তাতেও আপত্তি করলেন। রোগের পুনরাক্রমণ হতে পারে এই

স্ত্রীর কাছে গোপন রাখতে চেষ্টা করতে গিয়ে মেয়েটির চিকিৎসা পর্য্যন্ত করান নি। ফলে এই পাঁচ বছরের মধ্যেই মেয়েটির জীবন হয়েছে বিষময়। তাছাড়া মেয়েটিকেই সবাই অপরাধী ভেবে, তাকে পরিত্যাগ করে অসীমের আবার বিয়ে দেবার তোড়জোড় ক'রছে। বিউটি ডাক্তারের কাছে তার দুরদৃষ্টের প্রকৃত কারণ জানতে পারলো। এই কঠিন রোগ নিয়েও বাড়ীর সকলের আগ্রহে অসীম দ্বিতীয়বার বিবাহে বদ্ধপরিকর হন। দুঃখে আক্রোশে বিউটি তখন উন্মাদ, উৎকট রোগে দেহ ও মন জর্জ্জরিত। বরপক্ষের গৃহত্যাগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিউটি বন্দুক চালায়—তার অব্যর্থ গুলী এসে লাগে বরবেশী অসীমের বুকে! এই

রাধা ফিল্মসের 'সাবিত্রী-সত্যবান' ছবিতে যমুনা সিংহ ও সমর রায়

অজুহাতে তিনি দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহে মত দিতে পারেন না, জানালেন।

যুবক ডাক্তারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করলেন। একটি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে তিনি বিবাহ করলেন। মেয়েটি ছিল প্রাণের প্রাচুর্য্যে ভরা। তার সাহচর্য্যে যুবক জীবনকে নূতনভাবে দেখতে পেলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি মেয়েটিকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেললেন। কিন্তু এর পরেই সুরু হলো মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি।

পাঁচবছর পরে। ১৯৪৩ সাল। ডাক্তার বোসের এক ছাত্র শঙ্কর একটি রোগিনীকে নিয়ে এলেন ডাক্তারের ক্লিনিকে। একটি রুগ্ন শিশু তার কোলে। ডাক্তার পরিচয় নিয়ে জানলেন এই সেই যুবক অসীমবাবুর স্ত্রী—বিউটি। পাঁচ বছরে তার কয়েকটি সন্তান নষ্ট হয়েছে, রোগে তার দেহ বিশ্রী হয়ে গেছে—স্বামীর ভালবাসা সে হারিয়েছে, শ্বশুড়ী ননদের গঞ্জনায় তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার বুঝলেন, কাপুরুষ অসীম নিজের রোগের কথা

ঘটনায় জ্ঞান ও চৈতন্য হারিয়ে উন্মাদ হয়ে যান অসীমের মা। অসীমের বড় বোনও ইতিমধ্যেই এই রোগাক্রান্ত হয়েছেন বিউটির প্রসাধনাদি ব্যবহার ক'রে। এর পর ধরা পড়ে তার ছোট বোনও ঐভাবেই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সেটা সে জানতে পারে এমন এক মুহূর্ত্তে যখন তার বিবাহের আয়োজন সব ঠিক। তার প্রণয়ী এবং ভাবী স্বামী শঙ্কর একথা জানতে পেরে তাকে আশ্বস্ত করলো এই ব'লে যে বিয়ে তাদের হবেই তবে তারপর শঙ্করের বাগ্‌দত্তার পূর্ণ রোগমুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করবে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হবে না। ডাক্তার বোস এই কথা শুনে সেই বিবাহে মত দিলেন।

বিউটি কর্ত্তৃক স্বামীহত্যার দৃশ্যেই নাট্যবস্তু উচ্চগ্রামে পৌঁছে যাবার পরও ছবিকে অযথা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে উজ্জ্বল দৃশ্য ক'রে তোলার জন্যে, তার ফলে anti-climax-এ ছবি শেষ হয়েছে। এছাড়া কাহিনীতে নাটকীয়তা সঞ্চারের কৌশল হৃদয়গ্রাহী এবং প্রশংসনীয়

হলেও ছবির আগাগোড়া এমন একটা ভাব এনে দেওয়া হয়েছে যাতে এই ব্যাধির প্রতি ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা-টাই প্রকাশ পেয়েছে বেশী ; ভীতি প্রদর্শন অবশ্যই সমর্থন পাবে প্রতিটি দর্শকের কাছ থেকে কিন্তু সেই সঙ্গেই আজকের দিনে যে এই ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য নয় এবং যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সাপক্ষে সহজেই মুক্তিলাভ করা যায় সেটাও প্রচার করার প্রয়োজন ছিল।

অভিনয়ে স্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ডাক্তার বোসরূপে ছবি বিশ্বাস এবং বিউটির ভূমিকায় মঞ্জু দে। বিশেষ ক'রে তাঁর শেষ দৃশ্যের অভিনয়ে চরম নাটকীয় মুহূর্তে তাঁর অভিব্যক্তি ও বাচনভঙ্গী অপূর্ব্ব। অসিত-বরণ, উত্তমকুমার ও গীতশ্রীর অভিনয় যথাযথ। গানের সুরে এবং আবহসঙ্গীতে না আছে বৈচিত্র্য, না আছে পরিবেশ সঞ্চার। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ স্থানে স্থানে বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে।

নতুন পাঠশালা

নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আদর্শ বা শিক্ষামূলক ছবি তোলার প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু সুবিন্যস্ত কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও স্বচ্ছন্দ গতি-সমন্বিত হয়ে এবং শিল্পীদের সুষ্ঠু অভিনয়গুণে যদি তা' দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করে তবেই তার সম্পূর্ণ সার্থকতা। মহাত্মা গান্ধী অনুপ্রাণিত 'বুনিয়াদী শিক্ষা'কে ভিত্তি ক'রেই এই ছবির কাহিনী রচিত হয়েছে। পরিচালক একাই যে ক'টি বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছেন তার সব ক'টিতেই তিনি সম্পূর্ণ বিফল হয়েছেন, দু'একটি দৃশ্যে সামান্য নাটকীয়তা ফুটিয়ে তোলা ছাড়া আর কোথাও কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।

কাহিনীর বিস্তৃত পরিচয় তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তার ওপর গ্রামের ছেলে-মেয়েদের সামনে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর বেশ গালভরা বড় বড় কথার তুবড়ী তারা তো দূরের কথা পর্দ্দার বাইরে দর্শকেরও হৃদয়ঙ্গম করতে বেশ বেগ পেতে হয়।

অভিনয়াংশে নরেশ মিত্র, অভি ভট্টাচার্য্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির মতো দক্ষ অভিনেতা থাকা সত্ত্বেও সেদিকটা মোটেই বিকশিত হয়নি তার কারণ শিল্পীরা ঠিক সুযোগ পান নি। লেতো, হাসি প্রভৃতি কিশোর শিল্পীরা মন্দ করে নি। আবহ-সঙ্গীতে তিমিরবরণের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকলেও কণ্ঠসঙ্গীত হয়েছে হতাশাব্যঞ্জক। চিত্রগ্রহণ আর শব্দগ্রহণের কথা না তোলাই ভালো।

চিতা বহ্নিমান

পুস্তকাকারে প্রকাশিত উপন্যাসের চিত্ররূপ যে সব সময়েই দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পারবে এমন ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে ছবি তুলতে যাওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ ছবিতে প্রদর্শিত সমস্যা যদি সময়োপযোগী না হয় তবে তা দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না। সেজন্য এই জাতীয় বস্তাপচা কাহিনী নিয়ে সামাজিক ছবি তোলার আগে যে কোনো নতুন প্রযোজকের ভালোভাবে ভেবে দেখা উচিত।

ধনীর দুলালী উচ্চ-শিক্ষিতা, সুন্দরী তপতী স্ত্রী-পুরুষ বন্ধুদের নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়ানোই বেশী পছন্দ করে। তার বিয়ের ঠিক হয়. কিন্তু বরপণের ব্যাপার নিয়ে বরের পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় বিবাহের আসর থেকেই বরকে উঠিয়ে নিয়ে যায় তার পিতা। সৌভাগ্যক্রমে কনের পিতার বাল্যবন্ধুর পুত্র তপন সেখানে এসেছিল নিমন্ত্রণ খেতে আর তারই সঙ্গে তপতীর বিয়ে হয়ে যায়। তপনের নিজের অবস্থা ছিল 'দিনগত পাপক্ষয়' গোছের, এমনকি রাত্রি-যাপনের নিজস্ব ঠাঁইটুকুও ছিল না তার, থাকতো সে বন্ধুর বাড়ীতে। তার ওপর লেখাপড়াও তেমন বেশীদূর করতে পারে নি। এমন অবস্থায় তপতীর মোটেই পছন্দ হয়নি স্বামীকে। তপতী বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে আপন স্ফূর্তি নিয়েই মেতে থাকে—স্বামীর প্রতি বিন্দুমাত্র ভালবাসা বা কর্ত্তব্যবোধ তার প্রকাশ পায় না। অনেক চেষ্টা করেও তপন বনিবনা বা বোঝা-পড়ায় আসতে পারে না। নানা ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ অন্তর্দ্বন্দ্বের পর চিরাচরিত প্রথায় ছবির যবনিকাপাত হয়।

যদিও ছবির দৈর্ঘ্য অল্পবিস্তর ন'হাজার ফিটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তবুও ছবিটির কোথাও কাহিনী দানা বাঁধতে না পারায় দর্শকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তার ওপর কোনো শিল্পীর অভিনয়ই হৃদয়গ্রাহী হয় নি। কি কণ্ঠ-সঙ্গীত কি আবহ-সঙ্গীত কোনোটিই এ ছবির উল্লেখযোগ্য নয়। চিত্র ও শব্দগ্রহণ সাধারণ পর্য্যায়ের।

কা-তব-কান্তা

টেগোর-অর্কেষ্ট্রার দাপাদাপিতে, শচীন দাসগুপ্তের সদা-সর্বদা ফিল্‌টার-চাপানো লেন্সের মধ্য দিয়ে, জীবেন বসুর লালুয়া-ভুলুয়া সন্ন্যেসীগিরির ঠেলায় পাক্কা বটতলা মার্কা গল্পকে সম্বল করে কল্পনার ম্যারাথন এগিয়ে চললো 'কা-তব-কান্তায়'···রবীন বিয়ে করলো সুন্দরী দীপাকে,কাল্-চার্ড মেয়ের "সামবাজারের সসিবাবু" বাবা বিয়ে দিয়েই খালাস। কোথা থেকে এক বেম্ম টাইপের দাদা জুটলো বোনের অসুখের খবর পেয়ে: এক কাব্য-কেলেঙ্কারী ডাক্তার জুটলো একেবারে সটান বিলেত থেকে; বিবেকের চরিত্রে দেখা দিল বাহার চাচা, যে মদ-খাওয়া শেখাবার জন্য মানুষ করেছিল রবীনকে; এছাড়া দিদি. বিধবা বৌদি, প্রয়োজনমতো ঝি, দারোয়ান (অপূর্ব বাঙ্‌লায় কথা বলে) আর ইয়ার বন্ধু, বাঈজী, সাঁওতালী মেয়েদের বেশে প্রাইভেট ডান্সিং স্কুলের ছাত্রীরা এবং নায়েব, তার মেয়ে—একেবারে এলাহি ব্যাপার। আসল ব্যাপারটা রবীন লম্পট, দুশ্চরিত্র ও উচ্ছৃঙ্খল। বারো বছর আগে-পরে সংসার-সমাজ ও হিমালয় (সটান হেঁটেই দু'এক দিনে চলে আসা যায়)—এই দু'য়ের মধ্যেই লোক-প্রজাদের কী নিদারুণ পরিবর্তন এবং কাহিনীকার ও পরিচালকের লম্পটকে দেবতার আসনে বসাবার জন্যে কী শোচনীয় "আজ্ঞে-ইয়ে" ভাব। অতঃপর রবীন ফিরলো কতকগুলো আবোল-তাবোল মার্কণ্ডেয় মন্‌টাজের মধ্য দিয়ে, দড়াম্ করে আবার একটা বিয়ে করে ফেললো, ছেলে হোল (হিমালয়ের গুরুর মন্ত্রে কী ছিল কে জানে!), প্রাসাদে ফিরে দেখলো দীপা আত্মহত্যার কাজটা কিছু আগেই বিধায়ক-বিনায়কের নির্দ্দেশে সেরে রেখেছে।

এমন বেপোট্ সংলাপ, এ্যামেচার ফোটোগ্রাফী, থিয়েটারী গান, আর অভিনয়ের নামে থিয়েটারী-হাসির পাগ্‌লামি, পরিচালনার নামে "লবডঙ্কাটি" দেখিয়ে কম খরচায় জমাট ছবি তুলে প্রযোজকের পকেটকে বেবাক্ ফর্দাফাঁই করে দেবার অপচেষ্টা কবে তিরোহিত হবে বাঙ্‌লার চিত্ররাজ্য থেকে, কে জানে!

আপনাদের চিঠি

রতনচন্দ্র দাস, হাটখোলা, চন্দননগর

বলিতে পারেন পুরাতন বা প্রবীণ অভিনেতা বা অভিনেত্রী বাদ দিয়ে নূতন অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রচলন কেন ?

জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে কারণে নতুনের আবাহন চিরপ্রচলিত, ঠিক সেই একই কারণে অভিনয়শিল্পের বেলাতেও নবীনের পদধ্বনি এতো মোহসঞ্চারী !

শম্ভুনাথ রায়, অন্নপূর্ণা মন্দির, বৈদ্যবাটী

'পল্লীসমাজ' ছবিতে বেণী ও বীরেশ্বরীর ভূমিকায় কে কে আছেন ?

যথাক্রমে জহর গাঙ্গুলী ও মলিনা দেবী।

বড়ুয়া ষ্টুডিও কি এখনও বর্ত্তমান ?

না। বড়ুয়া ষ্টুডিওর সাজ-সরঞ্জাম ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি নিয়েই সুরু হয়েছিল বর্ত্তমানের অরোরা ষ্টুডিও।

মন্টু, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

'আমাদের সিরাজ' ছবিতে মহেন্দ্র গুপ্ত, ছবি বিশ্বাস ও মঞ্জু দে যথাক্রমে কোন্ কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ?

এ ছবিটি তোলা বন্ধ হ'য়ে আছে।

মিত্রজিৎ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তারডাঙ্গা, পুরুলিয়া

বাংলা চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ সুরকার কে ? অবশ্য আপনার মতে।

বর্ত্তমানে পঙ্কজকুমার মল্লিক।

ধর্ম্মব্রত বসু, তেজপুর, আসাম

চিত্রাভিনেতা দিলীপকুমার নার্গিসের সঙ্গে কি আর অভিনয় করবেন না ?

তারকাদের মনের কথা মাটির মানুষ আর কি করে বলতে পারে, বলুন !

দীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গপাড়া, কাটোয়া

ভারতীয় সিনেমা কোম্পানীর প্রথম ছবি কি 'নল দয়মন্তী' এবং উক্ত সিনেমা কোম্পানীর নাম কি ম্যাডান কোম্পানী ?

ভারতীয় চিত্রশিল্পে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি হোল দাদাভাই ফালকে পরিচালিত 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' এবং এই ছবিটি সম্পূর্ণ করতে তাঁর আট মাস সময় লেগেছিল। এ ছবির চিত্রগ্রহণ সুরু হয় ১৯১১ সালে এবং ১৯১২ সালের বড়দিনের সময় বোম্বাই-এর স্যাণ্ডহার্ষ্ট রোডস্থিত 'করোনেশন সিনেমা'তে এটি মুক্তিলাভ করে।

'নল-দময়ন্তী' হোল বাংলাদেশে তোলা প্রথম ছবি এবং এই ছবির প্রযোজক ছিলেন জামসেদজী ফ্রামজী ম্যাডান প্রতিষ্ঠিত (ম্যাডান) চিত্র-প্রতিষ্ঠান। এ ছবিটি তোলা হয় ১৯১৭ সালে। ছবি দুটিই নির্ব্বাক চিত্র।

সবাক চিত্র আরম্ভ হইয়াছে কত সাল থেকে এবং সে ছবির নাম কি ?

ভারতে তোলা প্রথম সবাক চিত্র হিসাবে 'আলম-আরা'র নাম করা যায়। ছবিটি তোলা হয় ১৯৩১ সালে।

প্রথম গ্র্যাজুয়েট বাঙ্গালী ছায়াচিত্রাভিনেত্রী কে ?

স্বর্গীয়া কঙ্কাবতী দেবী।

মিসেস্ আমিনা. কে. মন্নাফ্. তেজপুর. আসাম

যেভাবে বিদেশী ছায়াছবি হিন্দীতে ডাবিং হচ্ছে ঠিক সেইভাবে ভালো ভালো বাংলা চিত্রকে অসমীয়া ভাষায় ডাবিং করে বাংলা চিত্র-শিল্পকে শক্তিশালী করা যায় না কি ?

বাংলা চিত্রশিল্পের যাতে উন্নতি হয় এবং জনপ্রিয়তা ও বাজার বাড়ে তার জন্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বনেরই আমরা পক্ষপাতী। আপনার এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বাংলার চিত্রশিল্পের কর্ণধারদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

প্রীতিভূষণ পাল. ধুবড়ী. আসাম

বোম্বেতে কোন্ কোন্ শিল্পী বর্ত্তমানে বেশী অর্থ উপার্জ্জন করেন ?

মধুবালা, নার্গিস, নলিনী জয়ন্ত. নিম্মি, অশোককুমার, দিলীপকুমার, প্রেমনাথ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

বৃন্দাবনচন্দ্র নন্দী. বৈদ্যবাটী. হুগলী

কিশোর শাহু কি পাশ ?

তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ, পাশ করেন।

শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়. সিটি কলেজ. থার্ড ইয়ার

বাংলার চিত্রজগতে এককালে যাঁদের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল এবং এখনও আছে তাঁরা সবাই আজ বোম্বাইয়ের পথে পা বাড়িয়েছেন কেন ? শুধু কি অর্থের জন্যই তাঁদের এই বোম্বাই-প্রীতি ?

সকল ক্ষেত্রে নয়। কেউ কেউ গেছেন নিজেদের নিঃশেষিত প্রতিভার দৈন্যকে বোম্বাইয়া ছবির চটকে ঢেকে রাখতে, কেউ বা গেছেন খ্যাতি ও উপার্জ্জন বৃদ্ধির আশায়। আবার অনেকে আছেন হাওড়া ষ্টেশনে বোম্বে মেলে ওঠার সময় করুণ ক'রে একথাও বলে যান, 'বাংলা দেশে কি মানুষ বাস করে ?' এবং ভাগ্যের দুর্বিপাকে এই অমানুষের দেশেই ফিরে আসেন, 'তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার' ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। একজন প্রখ্যাতনামা প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত-পরিচালক একবার বোম্বাই থেকে কিছুদিনের ছুটিতে কলকাতায় আসেন, উৎসাহে আনন্দে উদ্দীপনার আতিশয্যে তিনি বোম্বাই প্রসঙ্গে বলেন, 'সে হোল প্যা—ডা—ডাইস্'—বলে তিনি আনন্দের ভারে তোৎলাতে থাকেন! কাজেই তাঁর বা তাঁর মতো লোকের ক্ষেত্রে বলা চলে বোধ হয় যে তাঁরা গেছেন মর্ত্ত্যভূমিতে 'প্যারাডাইস্'-এ অবরোহণের লোভে, কি বলেন ?

নিউ থিয়েটার্সের 'নবীন যাত্রা' মুক্তিলাভ করবে কবে ? এর পরিচালনায়, চিত্রনাট্যে, সঙ্গীতশিল্পে ও আলোকচিত্রে কারা আছেন ?

'নবীন যাত্রা' শুরুই হয়নি এখনো, কাজেই মুক্তি বহু দূর। 'নবীন যাত্রা'র ঝাঁপিয়ে পড়বেন কোন্ কর্ম্মীর দল তা' এখনো সবিশেষ ঠিক হয় নি—তবে শোনা যায় 'মহাপ্রস্থানের পথে'র যাত্রীরাই হয়ত থাকবেন। 'নবীন যাত্রা'র বদলে নিউ থিয়েটার্সের 'মন্ত্রশক্তি'ও হয়ত আগে দেখতে পেতে পারেন।

নিউ থিয়েটার্সের বিনয় চট্টোপাধ্যায়-এর 'প্রতিশ্রুতি'র পর আর তাঁর কোন ভালো বই দেখি না কেন ? তিনি কি শুধু চিত্রনাট্য নিয়েই মেতেছেন ?

কেন ? প্রতিশ্রুতি তিনি পূরণ করেছিলেন 'ওয়াপস' ছবিতে। আর বরাবর তিনি যে জিনিষ নিয়ে মেতে থাকতেন তা' ঐ চিত্রনাট্যই! তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু (!) ও দোসর জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'র মহাপ্রয়াণ লাভের পর তিনি চিত্রনাট্যের বাইরে বহু পার্থিব জিনিষ নিয়ে মেতে আছেন তাই আর 'তাঁর কোনো ভালো বই' দেখেন না!

অরুন্ধতী এখন কোন্ ছবিতে কাজ করছেন ? এঁর short life sketch জানাবেন কি ?

অরুন্ধতী এখন নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গেই চুক্তিবদ্ধা; তবে সম্প্রতি বোম্বাই যাবার প্রলোভন এবং হাতছানি তাঁর কাছেও এসেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনি পরিণামদর্শিনী এবং প্রলোভন-বিজয়িনী—তাই বাংলা দেশে

এন্‌-টি'র 'নবীন যাত্রা' বা 'মন্ত্রশক্তি' অথবা দুটোতেই নায়িকার ভূমিকায় তাঁকে দেখা যাবে। তাঁর short life sketch আপনি জানতে চেয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছবির জগতে তাঁর life এখনও এত short যে তা' sketch করার স্তরে এসে পৌঁছয় নি। তাই তাঁর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় আপনি দেখতে পাবেন এ বছরের 'চিত্রবাণী চিত্রবার্ষিকী'তে।

মায়া চক্রবর্ত্তী, কনকালয়, গয়া

আজকাল দেখি 'প্রাপ্তবয়স্ক' মার্কা-মারা ছবিগুলিতে বেশীর ভাগই দর্শক থাকে অপ্রাপ্তবয়স্করা। এর প্রতিবিধান কি বলতে পারেন?

অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য আলাদা ছবি তৈরী এবং তাদের উপযোগী ছবি দেখানোর নিয়মিত এবং সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা।

অবান্তর যৌন আবেদনভরা ছবিগুলি আজকাল দেশের এক শ্রেণীর দর্শকদের খুবই প্রিয় হয়েছে। এর প্রতিকার কি?

আপনার বোধ হয় জানা নেই, এই জাতীয় ছবিগুলি 'এক শ্রেণীর দর্শকদের' একদা খুবই প্রিয় ছিল, আজ আর নেই! একদা 'খিড়কী' বা 'সানাই' তাদের যৌনতাকে সুড়সুড়ি দিয়ে একান্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল, আজ তাদেরই কাছে 'সিন সিনাকী বুবলা বু' জাতীয় ছবির আবেদন বারবার মাথা ঠুকে ফিরে আসে—কোনো সাড়া জাগাতে পারছে না। কাজেই প্রতিকার স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আসবে এবং আসছেও—ঠিক সেই কারণেই গত জানুয়ারী মাস থেকে আজ অবধি বোম্বাইয়া যত ছবি মুক্তিলাভ করেছে কলকাতায় তার মধ্যে একমাত্র হিন্দী 'মা' ছবিখানি ছাড়া আর কোনটাই জনপ্রিয়তায় অভিনন্দিত হয় নি। ঠিক একই কারণে বাংলা দেশের 'অবান্তর যৌন আবেদনভরা' ছবির একচেটিয়া প্রযোজক আজ 'এক শ্রেণীর দর্শককে'ও যৌন আবেদনের অস্ত্রে বধ করায় ব্যর্থ হয়ে 'মহিষাসুর বধ'এ হাত দিয়েছেন।

'ছিন্নমূল' (বাংলা) ছবিখানি কি দেখানো বাতিল হয়েছে? বইখানিতে আশা করি এমন কিছু আপত্তিজনক দৃশ্য নাই যার জন্য এই আদেশ?

'ছিন্নমূল' সম্বন্ধে এরকম কোন নিষেধাজ্ঞা তো নেই—আপনি যদি শুনে থাকেন তবে সেটা ভুল।

জনৈক ভারতীয়, কেয়ার অফ্ মিস্ সিন্থিয়া উড,
রায়ক্রফ্ট রোড, চেশায়ার, ইংলণ্ড

সম্প্রতি আমি একটি ইংরাজ পরিবারে বেড়াতে গিয়ে তাঁদের ওখানে টেলিভিশন দেখলাম, টেলিভিশনের প্রোগ্রামও আমার ভারী ভালো লাগলো। সেই পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কৌতূহলভরে আমায় জিগ্যেস করল ভারতে টেলিভিশন প্রচলিত হয় নি কেন? আমি এ সব বিষয়ে আদার ব্যাপারী তাই আমি এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নি। আপনার পত্রিকা মারফৎ এই অতি সাধারণ প্রশ্নটির জবাব দেবেন কি যাতে আমি আবার সেই সন্তোষজনক উত্তর তাদের জানাতে পারি?

আপনি কিসের ব্যাপারী তা' অবশ্য আমার জানা নেই, তবে এই সহজ প্রশ্নের উত্তর অতি স্পষ্ট এবং সহজ-ভাবেই দেওয়া উচিত ছিল। আপনি তাদের জানিয়ে দিতে পারেন যে পার্থিব ভোগৈশ্বর্য্যের দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রামময় ভারতবর্ষে 'কলের গান,' রেডিও এমনকি বিজলী বাতি ও পাখা ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় যন্ত্র সামগ্রীই আজো সুখের জিনিষ—কাজেই সেখানে টেলিভিশনের প্রচলন একটা বিরাট পরিহাস ছাড়া আর কিছুরূপে শোভা পাবে না।

শেফালী সেনগুপ্ত, নিউ দিল্লী

বোম্বাইয়ে সোরাব মোদী 'ঝান্সী-কি-রাণী' বলে যে ছবি করছেন তাতে অভিনয় করার জন্য বাংলা দেশ থেকে বনানী চৌধুরী গিয়েছিলেন শুনেছিলাম—সে ছবি এবং বনানী চৌধুরীর কাজ কি শেষ হয়ে গেছে?

ছবির কাজ শেষ হয়ে গেছে, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁর অভিনেয় অংশ শেষ করে আসতে পারেন নি বলে বনানী চৌধুরী আমাদের জানিয়েছেন।

নতুন নাটক

রঙমহলে 'জীবন সংগ্রাম'

সম্প্রতি 'রঙ্‌মহল' মঞ্চে আধুনিক সমস্যামূলক নতুন নাটক "জীবন সংগ্রাম"-এর অভিনয় সুরু হ'য়েছে। নাটকখানি রচনা করেছেন অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা ক'রেছেন চিত্র-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত আর সুর-যোজনা ক'রেছেন দুর্গা সেন।

নাটকে যে সমস্যার অবতারণ' করা হ'য়েছে তা' মূলতঃ ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেঁচে থাকার সমস্যা। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা ভাঙনের মুখে অথচ সেই ভাঙনকে এগিয়ে নিয়ে নতুনের আগমনকে নিশ্চিত করার সঠিক সঙ্ঘবদ্ধ কর্ম্মপ্রচেষ্টা নেই, তাই ধ্বসে পড়তে চাইছে সমাজের শোষিত শ্রেণীগুলি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীও তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারছে না, দেশের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য তার আত্মত্যাগ প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারে নি তাকে সমাজে, সংস্কারের বাঁধন একে একে তাকে ছিঁড়তে হচ্ছে শুধু বেঁচে থাকার জন্য, কিন্তু সারাজীবন অনেক পরীক্ষা পার হ'য়ে কঠিন সংগ্রাম ক'রেও শোষক শ্রেণীর কাছে তাকে হ'তে হয় পরাজিত। 'জীবন সংগ্রাম' নাটকের নাট্যবস্তু সম্ভবতঃ এই।

নাট্যবস্তুর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে না এসেও রঙমহলের কর্ত্তৃপক্ষ ও নাট্যপরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তকে ধন্যবাদ জানাতে হয় তাঁদের সাহসিকতা আর পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। আধুনিক ব্যবসায়ী মঞ্চে বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার নগ্ন কুৎসিত রূপ ফুটিয়ে তোলার কোনও চেষ্টা নেই, নতুন ভঙ্গীর নতুন দৃষ্টির নাট্য সৃষ্টির অভাব নেই, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথাও নেই, তাই 'রঙমহল'-কর্ত্তৃপক্ষ অভিনন্দন-যোগ্য।

কিন্তু মামুলী ঘটনাপ্রধান দুর্ব্বল কাহিনী "জীবন সংগ্রাম"কে জোরালো শিল্পসৃষ্টি ক'রে তুলতে পারে নি, আধুনিক বাস্তব সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ত হয়েও হতাশা-ব্যঞ্জক সিদ্ধান্তে রসসৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে নি নাট্যবস্তু। বরং দৃশ্য-বিন্যাস ব্যবস্থা দেখে স্থানে স্থানে সন্দেহ জেগেছে, সত্যই কি ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা আছে নাট্যকারের এই সব ঘটনা সম্বন্ধে।

সওদাগরী অফিসের টাইপিষ্ট মিস্ মালতি সেন, একটি ধ্বসে-পড়া মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি, পিতা জীবনের প্রান্তসীমায় এসে অকর্ম্মণ্য হয়ে আছেন, বড় ভাই দেশসেবার জন্য গৃহত্যাগী আর ছোট ভাই বিনু দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। অফিসের বড়কর্ত্তা সুবীরের নজর পড়লো মালতীর ওপর, তাকে কামনার ইন্ধনরূপে ব্যবহার করতে চাইলো। চাকুরী ছেড়ে দিতে হ'ল মালতীকে। এদিকে ধনীর দুলালী সুলতার সঙ্গে সুবীরের বিয়ের প্রায় সবই ঠিকঠাকই ছিল। সুবীর-মালতীর মাখামাখিতে সে প্রমাদ গুণলো। তাই ইতিমধ্যে একদিন এসে টাকা গুঁজে দিয়ে গেল মালতীর হাতে পথ থেকে সরে দাঁড়াবার অনুরোধ জানিয়ে। মালতী সে-টাকা দিয়ে দিল তার দাদার হাতে দেশসেবার কাজে।

শিল্পপতি গজাননের অফিসে নতুন চাকুরী পেল মালতী। বিনুর অসুখ বেড়ে গেল এই সময়, তার চিকিৎসার জন্য টাকা চাই। মালতী ছুটলো গজাননের কাছে। টাকা সে দিতেও চাইলো, কিন্তু বিনিময়ে যা' চাইলো মালতীর পক্ষে তা' দেওয়া সম্ভব নয়। তাই ফিরে এল সে টাকা না নিয়ে, ওষুধ অভাবে বিনু মারা গেল।

নাটকের মূল কাহিনী এই রকমই দাঁড়ায়। প্রিয়বাবু ও সুলতার ফষ্টি-নষ্টি নাট্যবস্তুর রূপায়নে অপ্রয়োজনীয় অথচ নাটকের এই অংশটি যেমন রচনায় তেমনি অভিনয়ে চিত্তাকর্ষক হ'য়ে উঠেছে।

মালতী বড়কর্ত্তার চেম্বারে বসে টাইপ করছে, টাইপের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পর্দা উঠলো, মঞ্চে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই, গাম্ভীর্য্য ও ঔৎসুক্যে ভরে গেল প্রেক্ষাগৃহ। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এই প্রথম দৃশ্যটিকে প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়বৃত্তির পরীক্ষা-ক্ষেত্র ক'রে তুলে অফিসের পরিবেশকে হাল্‌কা

ক'রে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয় দৃশ্যে মালতীর বাড়ীতে পারিবারিক অবস্থার সবকিছু বিবরণই প্রায় তার বাবার আর মা-র কথার মধ্য দিয়ে দিতে গিয়ে দৃশ্যটি বিবরণ-মূলক ও আকর্ষণহীন হয়ে পড়েছে। এই দুটি দৃশ্য ছাড়া অন্যান্য দৃশ্যগুলিতে রসসৃষ্টির উপকরণ রয়েছে, নাট্যকারের প্রথম নাট্য-প্রচেষ্টায় সর্ব্বত্র সেগুলি দানা বাঁধতে না পারলেও, তার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার সূত্রেই শুধু এই ধরণের নাট্যবস্তুকে রসোত্তীর্ণ ও জমাট করা সম্ভব।

কয়েকটি কথা, তাই, এখানে বলা যেতে পারে। দেশসেবী বড় ভাইকে রহস্যময় ক'রে না রেখে, প্রিয়বাবু-সুলতার উপকাহিনীকে সংক্ষিপ্ত ক'রে, মনোতোষ ও দীপুকে ঘনিষ্ঠ ক'রে আর অফিসের বাস্তব পরিবেশের শৈল্পিক রূপ দিয়ে ঘনিষ্ঠ চিত্র, দৃশ্য, সংলাপ আর ঘটনাবলীর ঠাস বুনুনিতে "জীবন সংগ্রাম"-কে সত্যই শিল্পগুণসম্পন্ন অথচ জনপ্রিয় নাটকে পরিণত করা যায়।

তা'ছাড়া নাট্যকারকে মনে রাখতে হবে, শিল্পের প্রাথমিক উপকরণ মানবীয় আবেদন, কোনও মত, পথ বা চিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মানবীয় আবেদনের কথা যদি উপেক্ষা করা হয়, তাহলে শিল্পসৃষ্টিই ব্যাহত হবে। মালতীর বড় ভাই দীপুকে নাট্যকার কি ধরণের দেশসেবী করতে চেয়েছেন জানি না, আজকের দিনে ১৯৫২ সালে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হ'য়ে মাতা-পিতা ভগিনীকে উপবাসী রেখে, ভাইকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দিয়ে কোনও দেশসেবীর পক্ষেই পরিবারের একমাত্র উপার্জ্জন-ক্ষমার হাত থেকে সর্ব্বস্ব নিয়ে যাওয়া মানবতাবিরোধী কিনা ভেবে দেখা দরকার, বিশেষ ক'রে এই ছেলে পরিবারের ভাল-মন্দের খোঁজ নিয়ে থাকে মাঝে মাঝে। এছাড়া মালতীকে সুলতার টাকা দেওয়া, মালতীর হাতে গজাননের চিঠি গুঁজে দেওয়া ও কাঞ্চিলালের সংলাপগুলি (শিবনাথের সঙ্গে কথা বলার সময়) মানবতা ও শৈল্পিকতাবিরোধী কিনা তাও নাট্যকারকে ভেবে দেখতে

অনুরোধ করছি। সর্ব্বোপরি, নাটকে সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া নাট্যকারের অবশ্য কর্ত্তব্য, নাটক পক্ষাবলম্বন করবেই, নাটক সমাজের বাস্তবধর্ম্মী শিল্পরূপ। 'জীবন সংগ্রাম'-এ পরাজয় নয়, জয়ের পথের সন্ধানই দিতে হবে প্রগতিশীল নাট্যকারকে। প্রগতিশীল পরিচালকেরও এদিকে দৃষ্টি থাকা দরকার।

অভিনয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি কেউ করতে পারেন নি। মালতীর ভূমিকায় ঝর্ণা দেবী সর্ব্বত্র সম্যক রসসৃষ্টি করতে না পারলেও মালতী চরিত্রের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নি। নতুন ধরণের চরিত্রে কমল মিত্র (প্রিয়বাবু) ও প্রভা দেবী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ ছাড়া ভানু চট্টোপাধ্যায় (সুধীর), ভূপেন চক্রবর্ত্তী (মনোতোষ) বিজয়কার্ত্তিক দাস (গজানন) ও রাণীবালা (মালতীর মা) স্ব স্ব ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করেছেন। হরিধন মুখোপাধ্যায়ের (কাঞ্জিলাল) ভাঁড়ামী অসহ্য হলেও মণি চক্রবর্ত্তীর (প্রিয়বাবুর চাকর) অভিনয় যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। রাণীবালার রূপসজ্জায় আভিজাত্যের ছাপ বড় বেমানান ঠেকছিল. জহর গাঙ্গুলীর বিশিষ্ট রূপসজ্জা ও ছাঁচে-ঢালা অভিনয়-পদ্ধতিতে 'শিবনাথ' চরিত্র সর্ব্বত্র স্পষ্ট হয় নি, বারবারই 'নিষ্কৃতি'র গিরীশের কথাই মনে হচ্ছিল।

মঞ্চসজ্জা ও সঙ্গীতাংশে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

সুবোধ কুমার ঘোষ।

লিপটনের উদ্যোগে
বেতার-অনুষ্ঠানে চিত্রতারকা

লিপটন লিমিটেড সিংহল বেতার কেন্দ্রের 'কমার্শিয়াল সার্ভিসে' বিশিষ্ট চিত্র-তারকাদের বক্তব্য প্রচারের এক নিয়মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। যাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, তাঁরা হলেন নিম্মি, অশোককুমার, নাসিম, নলিনী জয়ন্ত, গীতা বালি এবং কামিনী কৌশল। ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠান-সূচীতে একের পর এক অংশ নেবেন সুরাইয়া, মীনাকুমারী, বীণা রায়, শ্যামা এবং সুমিত্রা দেবী। পাশের ছবিতে মাইকের সামনে দেখা যাচ্ছে (ওপরে) কামিনী কৌশল, (নীচে) নলিনী জয়ন্ত-কে।

আকাশবাণী

বেতারবন্ধু

টুকরো খবর

বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করবার আগে কতকগুলি টুকরো খবর আপনাদের উপহার দিচ্ছি।

আজ বেতার-কর্ত্তাদের ওপর 'কথা বলনেওলা' কেউ নেই। মাথার ওপর কেউ না থাকলে কাঁচা বয়সের ছেলেরা একটু 'বকে' যায়—প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ কর্ত্তা না থাকলে বাড়ীর যে দুরবস্থা হয়—কলকাতার শুধু নয়—অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সমস্ত কেন্দ্রগুলির এই অবস্থা।

আমাদের গায়ের জ্বালা কলকাতা নিয়ে। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের কর্ত্তারা যে অনুষ্ঠান শ্রোতাদের কথা মনে করে 'কেবলমাত্র নিজেদের জন্যই' রচনা ও বণ্টন করে থাকেন 'গাঁটের কড়ি' খরচ করে তা শ্রোতাদের শোনা ছাড়া উপায় থাকে না। শ্রোতারা যা চান তা পান না এবং যা পান তা চান না। কিন্তু অন্য কোন উপায় না দেখে চোখ-কান-বুঁজে ওষুধ গেলার মতো বেতারের অনুষ্ঠানগুলি শুনতে 'বাধ্য' হন।

এই জোর-করে চাপিয়ে-দেওয়া প্রোগ্রাম শোনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই এদেশে একটা আন্দোলন অত্যন্ত ধীর গতিতে গড়ে উঠছে তারই অঙ্কুর আমি দেখতে পাচ্ছি **শ্রোতৃ সংঘের** প্রতিষ্ঠার মধ্যে। বয়ে-যাওয়া ছেলেকে ঠাণ্ডা এবং ঠিক করবার জন্যে একটি বেশ কড়া, 'চোখ রাঙাতে' এবং 'চাবুক হাঁকাতে' ওস্তাদ লোকের দরকার খুব তীব্র হয়ে দেখা দেয়—'শ্রোতৃ সংঘ' শক্তিশালী হয়ে এই কাজটাই ভালভাবে করতে পারলেই বেতার থেকে অনেক ভূত বিদায় নেবে।

আজ শ্রোতারা—যাঁরা একটু সজাগ, একটু সচেতন, তাঁরা একক ও বিচ্ছিন্নভাবে এখানে ওখানে প্রতিবাদ করছেন তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী বেতার-অনুষ্ঠান রচিত হতে না দেখে। এই বিচ্ছিন্ন ও একক প্রতিবাদ নিষ্ফল। একে কার্য্যকরী করে তোলার জন্য প্রয়োজন এই সমস্ত প্রতিবাদের উৎস-মুখ এক করা—বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদগুলি একত্রিত ক'রে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের সাহায্যে বেতার সংস্কারের পথটা সুগম এবং কাজটা সহজ করে তোলা। 'শ্রোতৃ সংঘ' সেই দিকে মনোযোগী হচ্ছেন দেখে আমরা খুশী হয়েছি—এবং এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে অতি-প্রচলিত একটি প্রবাদ—'তোমাকে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'—বেতার-কর্ত্তাদের সেই কথাই জানাতে ইচ্ছা হয়!

●

'শ্রোতৃ সংঘে'র সংগঠন-সম্পাদক সুশান্ত পাইন আমাদের জানিয়েছেন যে, শ্রোতারা এক টাকা চাঁদা দিয়ে শ্রোতৃ সংঘের 'আজীবন সভ্য' হতে পারেন। সংঘ-সম্পাদক, বেতার শ্রোতৃ সংঘ, ১৬।এ ডাফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬—এই ঠিকানায় শ্রোতাদের যোগাযোগ স্থাপন করবার আহ্বান জানানো হচ্ছে। বেতারকে শিক্ষার বাহক

এসে তৈরী হয়ে পরবর্ত্তী জীবনে খ্যাতনামা হয়ে উঠেছেন।

বহু বিখ্যাত সার্থকনামা মঞ্চ-শিল্পীদের সহযোগিতায়, প্রাণঢালা অভিনয়ে এবং শ্রীযুক্ত ভদ্রের যত্নে সেকালের 'বেতার নাটক অভিনয়' বেতারে 'স্বর্ণযুগ'-এর আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। এই স্বর্ণযুগ বলতে আমি বুঝি ১৯৩৬-১৯৪২ সালকে। অবশ্য 'বেতার নাটুকে দল' ছাড়াও বেতার প্রতিষ্ঠানে নাটক-অভিনয় করতে আসতেন মঞ্চ-জগতের সম্ভ্রান্ত নাট্য-সম্প্রদায়সমূহ। এঁদের মধ্যে আমার মনে পড়ে **নির্ম্মল বসু** পরিচালিত **'রূপ-মন্দিরে'**র কথা। এঁদের অভিনয়ও বেশ সুখ্যাতির সঙ্গে শ্রোতারা গ্রহণ করতেন। এই ধরণের অভিনয় ক'বছর পরে বন্ধ হয়ে যায়।

সে-সময়ে আজকের দিনের মতো কয়েকজনকে 'ষ্টাফ-ভুক্ত' করে তাদের দিয়েই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নাটকাভিনয় করানো হতো না।

বেতার নাটুকে দলের প্রধান ছিলেন শ্রীযুক্ত ভদ্র। সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যে, চিত্রজগতে এবং মঞ্চ-জগতের স্বনামধন্যেরা বেতারের নাট্য-বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন—এঁদের মধ্যে সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, পরিচালক হীরেন বসু, সুরকার পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতিদের নাম করা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত ভদ্র একাই যেন একশো' ছিলেন। তিনি নিজে অভিনয় করতেন, নাটক রচনা করতেন এবং অভিনয় শিক্ষা দিতেন। মঞ্চের নাটক নিয়ে নানা অসুবিধা দেখা দিতে লাগলো। তাকে বেতার-উপযোগী করে তোলবার জন্য শ্রীযুক্ত ভদ্রকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। বেতার নাটকের রসোপলব্ধি করতে হলে কেবলমাত্র **'কানে'র** ওপর নির্ভর করতে হয় বলেই বিপত্তিটা ছিল আরো বেশী। কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দের ও সঙ্গীতের সাহায্যে নাটকাভিনয়ের বিষয়বস্তুকে চোখের সামনে মূর্ত্ত করে তোলার মধ্যে যে অনন্যসাধারণ শিল্পচাতুর্য্য আছে তা চমকপ্রদভাবে বিকশিত হয়ে উঠতো শ্রীযুক্ত ভদ্রের নাট্য-পরিচালনার গুণে। কেবলমাত্র 'বেতারের জন্যই' সর্ব্বপ্রথম নাটক রচনা করলেন বীরেন্দ্র-কৃষ্ণ ভদ্র। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : ঝঞ্ঝা (Storm In The Station)। কেবলমাত্র **প্রথম বেতার-নাটক** বলেই 'ঝঞ্ঝা' উল্লিখিত হলে ঠিক হবে না। কলকাতা বেতার কেন্দ্রই এই নাটকের পটভূমি, বেতারের সমস্যাই এর বিষয়বস্তু এবং কলকাতা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক এবং কর্ম্মীরাই এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেন। এই হাস্যরসাত্মক নাটকটি কলকাতার বেতার-ইতিহাসে বিশেষভাবে লিখে রাখবার মতো। 'কেবলমাত্র বেতারের জন্যই' প্রথম নাটক লেখেন শ্রীযুক্ত ভদ্র। শ্রীযুক্ত ভদ্রের কাছে অভিনয়ের প্রথম পাঠ যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন ছায়াচিত্র-জগতের সুনন্দা দেবী এবং মঞ্চ-জগতের অঞ্জলি দেবী।

এই সময়েই—সম্ভবতঃ ১৯৪০ সালের শেষের দিকে—**প্রভাত মুখোপাধ্যায়** কলকাতা বেতার কেন্দ্রের নাটকা-ভিনয়ে নতুন ধারার প্রবর্ত্তন করলেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় 'অনুষ্ঠান-সহকারী' হিসাবে দিল্লী থেকে এসে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেন। কেবলমাত্র বেতারের জ নাটক বিশেষভাবে রচনা করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেই ক্ষান্ত হন নি—নিজেও এই ধরণের নাটক লিখে হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিলেন যে, এই ধরণের নাটক কতখানি উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো উৎসাহী সত্যকার নিষ্ঠাবান বেতার-কর্ম্মী আমি খুব কমই দেখেছি। ইনি একাধারে লিখতে পারতেন, অভিনয় করতে পারতেন, শিক্ষা দিতে পারতেন। তাছাড়াও ছিল যথার্থ গুণীকে যোগ্য সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করে বেতারে এনে হাজির করা। **রোমাঞ্চ নাটিকার** (Thriller) বেতারে ইনিই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। শুধু রোমাঞ্চ নাটিকা নয়—পনেরো মিনিট, বিশ মিনিটের উপযোগী একাঙ্কিকার প্রবর্ত্তন ক'রে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় যে জনসম্বর্দ্ধনা এবং বেতার শ্রোতাদের সমর্থন লাভ করেছিলেন তার তুলনা মেলে না। এই ধরণের অনুষ্ঠান রচনায় এঁর প্রধান সহকারী ছিলেন **অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়**। রচনায়, অভিনয়ে, শিক্ষা-দানে এঁকে শ্রীযুক্ত ভদ্রের পরেই স্থান দিতে ইচ্ছা করে অভিনব অনুষ্ঠানের সমাবেশ ঘটাতে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের

মেলে না। এই অনুষ্ঠান ত্রুটিহীনভাবে প্রচারের জন্য তিনি প্রানপণ চেষ্টা করতেন। অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হলে শিল্পীদের খুশী করবার জন্য কি না করতেন। কিন্তু কোনো ত্রুটী ঘটলে যেভাবে শিল্পীদের ভৎ'সনা করতেন তা সাম্প্রতিক কালের শিল্পীরা ভাবতেও পারবেন না। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় উচ্চপদে আসীন হলেও বর্ত্তমান কালের বেতার কর্ত্তাদের মতো নাক উঁচিয়ে চলতেন না—সাধারণ শিল্পীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন বলে এই বেতার পাগল মানুষটি স্বল্পকালের মধ্যে কর্ম্মী ও শিল্পীদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বেতার-উপযোগী নাটক রচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও তাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা কলকাতা বেতারে দেখা যায় নি। দুর দিল্লীর কর্ত্তারা বেতার-নাটকাভিনয়ের সময় **তিন ঘণ্টা** থেকে কমিয়ে **দেড় ঘণ্টা** এবং পরে **এক ঘণ্টায়** দাঁড করান। শ্রোতারা প্রতিবাদ করতে থাকেন। অনেক কাগজ আর কালি খরচ করা হলো। দু একটা পত্রিকায় শ্রোতাদের দু' একখানা চিঠি প্রকাশিত হলো, কিন্তু কিছুই হলো না। 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না'!

বেতার-নাটক অভিনয় তিনঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা এবং আরো কমিয়ে একঘণ্টা করার ফলে নাটক-অভিনয় একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। বেতারের জন্য বিশেষভাবে লিখিত নাটক নেই—বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তিনঘণ্টার নাটককে বেতারের সময় খাপে বন্দী করার জন্যে জহ্লাদের মতো নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা সুরু হলো। ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়েই নাটকাভিনয় হতে লাগলো। শ্রোতাদের বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ চলতে লাগলো। শ্রীযুক্ত ভদ্র অসহায় হয়ে এই হত্যাকাণ্ড দেখতে লাগলেন। শ্রোতাদের কোনো সঙ্ঘ না থাকায় এবং সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন না হওয়ার জন্যে বেতার কর্ত্তাদের **প্রথম জুলুমবাজী** সুরু হলো বেতার নাটকের ওপর। বেতার নাটকের অন্তিম দশা উপস্থিত হলো। ১৯৪৪-৪৫ সালে ব্যাপার চরমে উঠলো। ১৯৪৬-৪৭সালে শ্রীযুক্ত ভদ্র বে আসন থেকে অপসারিত হলেন কি নিজেকে অপসারিত করলেন ঠিক বোঝা গেল না। নানা পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগলো। মোটকথা শ্রীযুক্ত ভদ্র নিজেকে বেতার নাট্য বিভাগের শাসন কর্তৃত্বভার থেকে মুক্ত করে নিলেন। পদত্যাগ করতে চাইলেও তাঁকে পদত্যাগ করতে দেওয়া হলো না। তাঁকে বেশ **মোটা মাহিনা** দিয়ে **'ষ্টাফ্-আর্টিষ্ট'** করে নেওয়া হলো। তিন বছর অন্তর এর জন্য নতুন ক'রে চুক্তিপত্র (Contract) করতে হয়।

তারপর থেকে সুরু হলো বেতারের নাট্যশালায় ভূতের রাজত্ব। ইতিমধ্যে বেতার কর্ত্তারা **'বেতার নাটক রচনা' প্রতিযোগিতা** আহ্বান করলেন। বিশেষভাবে বেতারের জন্য লিখিত নাটক লেখবার তাগিদ মঞ্চের নাট্যকাররা অনুভব করলেন। এক ঘণ্টার নাটক লিখে পঁচিশ তিরিশ টাকা রয়েল্টি নিতে বড় একটা কেউ এগিয়ে এলেন না। প্রতিযোগিতায় অবশ্য শ্রেষ্ট-রচনার মূল্য আড়াই শো' টাকা ধার্য্য করা হলো। বেতারের জন্যে কিছু নাটক এইভাবে বেতার কর্ত্তারা পেলেন। এর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন **শ্রীমতী কমলা রায়**—সাম্প্রতিক কালের ছায়াচিত্রের খ্যাতনামা শিল্পী বিকাশ রায়ের ইনি সহধর্ম্মিনী। তখন শ্রীযুক্ত রায় বেতারের বাংলা বক্তৃতা বিভাগের কর্ত্তা। কিছুকাল আগে বিকাশ বাবুর জীবনীতে উক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত নাটকটি তাঁর নিজের রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীযুক্ত ভদ্রের পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন **নির্ম্মল গঙ্গোপাধ্যায়**। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা বেতারে প্রথম আসেন 'এ-আর-পি' বক্তা হিসাবে। অপূর্ব্ব ছিল এঁর কণ্ঠস্বর। অত্যন্ত নীরস 'বিমান-আক্রমন-প্রতিরোধ' আলোচনা এঁর কণ্ঠের আন্তরিকতায় অপূর্ব্ব হয়ে উঠতো। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেন নি। এরপর এর ভার গ্রহণ করেন **বিমান ঘোষ**। শ্রীযুক্ত ঘোষের আন্তরিকতায় নাট্য বিভাগের পুনর্গঠন সুরু হলো। শ্রীযুক্ত ঘোষ এককালে বেতারের সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। শিল্পীদের দুঃখময় জীবনের সঙ্গে তাঁর যোগ পরিচয় ছিল বলেই তিনি নাট্য বিভাগের পুরাতন

অবহেলিত শিল্পীদের আহ্বান করে আনতে লাগলেন। ফলে নাট্য বিভাগে কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হলো। কিন্তু শ্রীযুক্ত ঘোষও বেশী দিন এই নাট্য-বিভাগ নিয়ে থাকতে পারলেন না। তাঁকে চলে আসতে হলো সঙ্গীত বিভাগে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন **অতুল মুখোপাধ্যায়**—এককালে বেতারের নাটক বিভাগের সাধারণ শিল্পী। সেই থেকে ইনি বেতার নাটকের ভার নিয়ে আছেন। বেতারের এককালীন অতি প্রিয় এই বিভাগের চরম দুর্দশা তেমনিভাবে চলছে। যে বিশেষ জ্ঞান, সুক্ষ্মরুচি এবং শিক্ষা থাকলে এই বিভাগকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব তার কোনটিই শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের নেই। বেতারের প্রতিটি বিভাগের কাহিনী এই।

শ্রীযুক্ত ভদ্র বেতারে আজও আছেন। কিন্তু আমার মনে হয় কেবলমাত্র **'পেনসান'** নেবার জন্যই থাকা। আসেন যান, নাটক মহলা দেন, চীৎকার করে অভিনয় করেন, 'অরূপের আসর' খোলেন—সবই যেন যন্ত্রের মতো। তাঁর মধ্যে কোন 'প্রাণ' নেই। সবচেয়ে দুঃখ হয় যখন দেখি তাঁর প্রাণের দুরন্ত আবেগে গড়া, তাঁর বড় সাধের বেতার নাটক বিভাগের প্রতি তাঁর শ্মশান-বৈরাগ্য। একদা যে আসন শ্রীযুক্ত ভদ্র অলঙ্কৃত করেছিলেন সেই আসনেই বসে আছেন তৃতীয় শ্রেণীর একজন শিল্পী—এবং সেই আসনের পাশে চামর হাতে দণ্ডায়মান শ্রীযুক্ত ভদ্র উৎফুল্ল নয়নে সহাস্যবদনে সিংহাসনারূঢ় তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পীর সমস্ত কাজই সমর্থন করছেন।

আজ নাট্য বিভাগের যে দৈন্যদশা তা দূর হতে পারে যদি শ্রীযুক্ত ভদ্রকে তাঁর পুরাতন আসরে ফিরিয়ে আনা যায় এবং সেই সঙ্গে যদি নিম্নলিখিত সম্ভাব্য উপায়গুলি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা যায়। তার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি নজর দিতে হবেঃ—

[১] মঞ্চের বহুখ্যাত নাটক অভিনয় করতে হলে পুরো তিনঘণ্টা সময় দিতে হবে

[২] বেতারের জন্য বিশেষ ভাবে বেতার নাটক লেখবার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে নাট্যকারদের উৎসাহিত করতে হবে।

[৩] বেতারের অন্য বিভাগের মধ্যে নাট্য বিভাগেও যে 'চক্র' আছে তা ভেঙ্গে নতুন নতুন প্রতিভাধর শিল্পীকে সাদরে স্থান করে দেওয়া। অভিনয়-শিল্পীদের হয়রানী বন্ধ করতে হবে।

[৪] ষ্টাফ্ শিল্পীদের মাসে দুবারের বেশী যেন নাটকাভিনয়ে যোগদান করতে না দেওয়া হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

[৫] বিভিন্ন নাটকাভিনয়ে 'বেতার বাবুদের' 'ফড়ে'দের অংশ গ্রহণ বন্ধ করে দেওয়া। কোনরকমে দুটো কথা বলি টাকা যে পাইয়ে দেবার যে রীতি আছে তা' অবিলম্বে বন্ধ করা।

[৬] পারিশ্রমিক নিতে চান না এমন বহু শিল্পী এককালে বেতারের নাটক-আসর মাৎ করে-গেছেন। যাঁরা পারিশ্রমিক চান না এমনি শিল্পীদের সমাদরে বেতারে ফিরিয়ে আন দরকার এবং বেতার উপযোগী অভিনয় করার জন্য 'শিল্পী তৈরী' করতে শ্রীযুক্ত ভদ্র যেমন তৎপর হয়ে থাকতেন—অনুরূপ বেতার-অভিনয় শিক্ষার ক্লাস সুরু করা।

সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে উপযুক্ত লোকের হাতে বেতার নাট্য-বিভাগ সমর্পণ করা এবং 'পেটোয়া' লোকদের একেবারে বিদায় দিয়ে দেওয়া। তা না হলে হাজার চেষ্টা করলেও নাট্য-বিভাগের কোনো উন্নতি হবে না।

আগামী বারে **বেতার বিচিত্রা, রেকর্ড সহযোগে নাটিকা** এবং **একাঙ্কিকা** নিয়ে আলোচন' করার ইচ্ছা রইলো।

নাগরদোলে

শ্রী নরাধম চালিত

বোম্বাইয়ের screen পত্রিকায় নিউ থিয়েটার্সের 'যাত্রিক' ছবির যাঁরা সমালোচনা প'ড়েছেন, তাঁরা screen মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। 'যাত্রিক' ছবিটির গুণাবলী screen ক'রে (পর্দা দিয়ে ঢেকে) পত্রিকাটি 'সার্থক-নাম' হ'য়ে উঠেছে। ছবিটি আমিও কোনও রকমে দেখেছি—এমন কি ডবল ডোজে। বাংলা 'মহাপ্রস্থানের পথে' আর হিন্দী 'যাত্রিক' দেখে এবং সেই সঙ্গে screen-এর সমালোচনা থুড়ি থিসিস্ প'ড়ে এইটুকুই মনে হয়েছে, হয় আমি নয় screen-এর সমালোচক ছবি বুঝি না। উক্ত সমালোচক ছবিটিকে এত খারাপ বলেছেন যে, আমার সন্দেহ হয় নিউ থিয়েটার্স বোধহয় একটি খারাপ ছবিকে 'যাত্রিক' ছাপ দিয়ে ভদ্রলোককে দেখিয়েছিলেন। তবে এটা ডেমোক্রেসীর যুগ জন-সাধারণের ভোট যেখানে ভাগ্য নির্দ্ধারণ করে, সেখানে অনন্যসাধারণের ভোটও বাতিল হ'য়ে যাবে। screen-এর অত্যন্ত খারাপ মন্তব্য সত্ত্বেও বোম্বাই কেন, সারা ভারতে সকলেরই মুখে ছবিটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শোনা যাচ্ছে। তবে কি screen-এর পাঠকেরা screening সম্বন্ধে অবহিত ছিল?

●

অবশ্য সকলে যখন ভাল বলে, তখন নাম (বা, দুর্নাম) কেনার জন্য একক মন্দ বলার মূল্য আছে। এই সুযোগে screen এর নাম নিয়ে দু'চারজনের মুখে যে আলোচনা হ'ল তাতে পত্রিকাটির publicity একটু হ'ল। কিন্তু হঠাৎ পত্রিকাটি 'যাত্রিক'কে এত খারাপ বলার কি পেলেন, যেখানে হিন্দীর ফেল-করা ছবিগুলোও পত্রিকাটির কাছে সেকেণ্ড ডিভিসনের মার্ক পায়? বোম্বাই ছবির মহিলা-ভাঁড় ভূমিকার অভিনেত্রী যশোধরা কাটজুর ভগ্নী সম্পাদিকা মনোরমা কাটজুরও এ এক নতুন ধরণের ভাঁড়ামি সমালোচনা নয়?

●

ভাল ছবি করার বিপদ আছে। ছবি ভাল হলেই প্রযোজক, পরিচালক, কাহিনীকার, অভিনেতা, অভিনেত্রী – এমন কি ষ্টুডিও ম্যানেজারেরও ভাল ভাল বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তৈরী হয়ে থাকতে হয়। দেবকী বসু যতদিন পরমানন্দে 'নর্ত্তকী,' 'সাপুড়ে' 'মেঘদূত' 'কৃষ্ণলীলা,' প্রভৃতি ছবি করছিলেন ততদিন তিনি নিশ্চিন্তমনে মুখ বুজে বসেছিলেন এবং হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। কিন্তু 'রত্নদীপ' তোলার পর থেকেই ভদ্রলোকের আর মুখ বোজবার সময় নেই। হাজার গণ্ডা ইন্টারভিউ, রোটারি-ক্লাবে Beware of films বলা, হাওড়া রোটারিতে ফিল্মের আধ্যাত্মবাদ প্রচার; বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজে দিনের পর দিন বক্তৃতা, ইণ্ডিয়ান ফিল্ম প্রোডিউসার্স এ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট হয়ে বক্তৃতা, সিনে টেকনিসিয়ান এ্যাসোসিয়েসন অব বেঙ্গলের প্রেসিডেণ্ট হ'য়ে বক্তৃতা, ফিল্ম ফেষ্টিভেলে বক্তৃতা তার ওপর কারও কারও ছবির ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া (এ-ও একরকমের বক্তৃতা।)—দেবকীবাবুর হার্টের অসুখই বোধহয় সেরে গেছে 'হার্ট-লেস' লোকের পাল্লায়।

'যাত্রিক' ছবির পর আবার 'যাত্রিক' কোম্পানীর মুখ খুলেছে। এমন কি সদা-নির্ব্বাক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারও ভাষণ দিয়েছেন। বাঙলার চিত্র-শিল্পের এ এক নব অধ্যায়!

এই জন্যই আমি ভাল লিখি না; নয়ত কোনদিন দেখতেন লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে বোম্বাই-মাদ্রাজ-কোলকাতায় শুধু বক্তৃতা দিতে সুরু করেছি!

●

বোম্বাইয়ে অভিনেতা প্রেমনাথ অভিনেত্রী বীণা রায়কে

বিয়ে করার সংবাদ সকলকে জানানোর পর তিনি 'হিরো'র বদলে 'ভিলেন' হয়ে গেছেন, অবশ্য বীণা রায়ের ভক্তদের কাছে। আমাদের পাঠক যাঁরা বীণা রায়ের ভক্ত ছিলেন, তাঁদের কারও 'হার্ট ফেল' করেছে কিনা খবর পাই নি, কিন্তু দু-একজন যে প্রেমনাথকে 'ভিলেন' ক'রে, নিজে 'হিরো' সেজে এবং বীণা রায়কে 'হিরোইন' করে চিত্র-কাহিনী লিখতে সুরু করেছেন, সে সংবাদ পেয়েছি। তবে বিবাহের পর বীণা রায় আর ছবিতে আত্মপ্রকাশ করবেন না, এই সিদ্ধান্ত করেছেন ব'লেই হয়ত ঐ কাহিনীগুলির ভিত্তিতে কোন ছবিও হবে না।

প্রথম প্রেমে পাগল হওয়াই স্বাভাবিক। প্রেমনাথ এখনও স্থির করে উঠতে পারছেন না যে 'হনিমুন' কোথায় করবেন—কাপরিতে, না সুইটসারল্যাণ্ডে। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-এ কি এর কোনও সন্ধান বা সমাধান মিলতে পারে?

●

একদা রূপায়ন থিয়েটার্সের রবিপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে কয়েকজন প্রযোজক মিলে এক নতুন সমিতি খুলেছিলেন। তার নাম প্রথমে ছিল বেঙ্গল মোশান পিকচার প্রোডিউসার্স এ্যাসোসিয়েশন; তারপর নাম বদলে রাখা হ'ল ইণ্ডিয়ান ফিল্ম প্রোডিউসার্স-এ্যাসোসিয়েশন। এই সমিতির সাধারণ সম্পাদক হলেন রবিপ্রসাদ গুপ্ত। বি, এম, পি, এ, প্রযোজকদের সুখ-সুবিধা দেখেন না, তাই এই সমিতি স্বাধীন প্রযোজকদের সুখ-সুবিধা দেখার জন্য তৈরী হ'ল।

কিন্তু হঠাৎ বি, এম, পি, এ'র ওপর রাগের বোধ হয় অন্য কোনও কারণ ছিল। বি, এম, পি, এ'র সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে অসহযোগের ব্যবস্থাও এই সমিতি প্রায় করেছিল। এমনকি ফিল্ম ফেষ্টিভেলের দায়িত্ব বি, এম, পি, এ'র ওপর অর্পিত হওয়ায় এই সমিতির উষ্মাও প্রকট হ'য়ে উঠেছিল এবং পৃথকভাবে বিদেশী অতিথিদের

সম্বর্দ্ধনা জানানোর জন্য দিনের পর দিন তাঁরা সভা চালিয়েছিলেন।

এহেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মহাশয়ের ওপর স্বাধীন প্রযোজকদের আস্থা যখন দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে, তখন এই সম্পাদক মশাইয়ের ডিগবাজীতে ইণ্ডিয়ান ফিল্ম প্রোডিউসার্স এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যরা তো হতভম্ব। তিনি যে শুধু বি, এম, পি, এ'র সভ্য হয়েছেন তা' নয়, নাক কেটে আবার বি, এম, পি, এ'র প্রযোজক শাখার কার্য্যকরী সমিতিরও একজন সভ্য হয়েছেন। বি, এম, পি, এ'র বিরুদ্ধে তাঁর এত জেহাদের পরিণাম কি শেষ পর্য্যন্ত এইটুকুতে দাঁড়ালো ?

অবশ্য এখন ইণ্ডিয়ান ফিল্ম প্রোডিউসার্স এ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন সভ্য যে ভাষা প্রয়োগ করছেন, তা ছাপাও যায় না, বলাও যায় না। আর একথাও

অভিনেতা বিকাশ রায়ের হাতে সমারসেট মম-এর 'স্যানাটোরিয়াম' বইটি বেশী সময়ে দেখা যায়, বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন।

বলা যায় না যে দেবকীকুমার বসুর কাছে ভোট চাইতে গিয়ে তিনি কি উত্তর শুনে এসেছিলেন !

আমি লোকটি 'নরাধম' হ'তে পারি, কিন্তু আমি যে সবজান্তা একথা কেউ প্রথমে বিশ্বাস না করলেও শেষ পর্য্যন্ত ক'রে বসেন। ধরুন না যখন শ্রীমতী পিকচার্সের 'অনন্যা', 'বামুনের মেয়ে', বা 'মেজদিদি'র পরিচালক 'সব্যসাচী'র নাম অজয় কর ব'লে উল্লেখ করি, তখন এঁদের প্রচার সচিবের কাছ থেকে অনুযোগ আসে যে অজয় কর 'সব্যসাচী' ন'ন—'সব্যসাচী' হলেন শ্রীমতী পিকচার্স-এর পরিচালক-গোষ্ঠী।

কিন্তু আমিই যে ঠিক কথা বলেছিলাম, তার প্রমাণ এতদিনে পাওয়া গেল। সেই শ্রীমতী পিকচার্স 'দর্পচূর্ণ' ছবি তুলছেন, কিন্তু এবার অজয় কর নেই ; তাই পরিচালক এবার 'সব্যসাচী' ন'ন—পরিচালকের নাম 'শ্রীমতী পিকচার্স-ইউনিট'। অবশ্য অজয় কর যে সত্যই 'সব্যসাচী' তার প্রমাণ হ'ল এই যে তাঁর কাজ এখন করছেন তিনজন—দেওজিভাই, কমল গাঙ্গুলী আর হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

অবশেষে মিস্ ইণ্ডিয়াকে প্রথম রাউণ্ডে দাঁড় করিয়ে রেখে মিস্ ফিনল্যাণ্ড বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় 'মিস্ ইউনিভার্স' বা বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী হ'লেন। মিস্ ফিনল্যাণ্ড কেন এই গৌরব লাভ করলেন, নরাধম তার একটি কারণ আবিষ্কার করেছে। এবারে অলিম্পিক খেলা হচ্ছে ফিনল্যাণ্ডে, যদি মিস্ ফিনল্যাণ্ড আমেরিকায় গিয়ে মিস্ ইউনিভার্স না হতেন, তবে অলিম্পিকে মার্কিন প্রতিযোগীদের 'না মিলিত উদ্দেশ'। অবশ্য এটি নরাধমের একান্ত কপি-রাইট।

কিন্তু ভারতে একমাত্র 'মিসেস্' 'মিস্ ইণ্ডিয়া' হয়েছিলেন ; এবারে কিন্তু প্রতিযোগিনীদের মধ্যে একমাত্র মিসেস্ misses দি অনার। একটি পত্রিকায় এক পত্র লেখিকার চিঠিতে তাঁর বিস্ময় দেখে আমিও কম বিস্মিত হই নি। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন,—মাতৃমূর্ত্তির চেয়ে কি আর কিছু বেশী সুন্দর আছে ?

হয়ত নেই ; কিন্তু সে মা তখন 'সুইমিং কষ্ট্যুম' প'রে সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় দাঁড়ান না।

বোম্বাই-এর 'স্ক্রীন' কাগজে বোধ হয় এই প্রতিযোগিতাকে পরিহাস করার জন্যই একটি ফটো ছাপা হ'য়েছে যাতে দেখা যায় অভিনেত্রী পাইপার লরি মিস্ ইউনিভার্সের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন। পাশাপাশি দুজনের ছবি দেখলেই বুঝবেন মিস্ ইউনিভার্স সৌন্দর্য্যে পাইপার লরির কাছে কত ম্লান। সুতরাং 'নো কমেণ্ট্স্'।

সংবাদপত্রে দেখলাম, হীরেন নাগ 'কবি চন্দ্রাবতী'র জীবনী চিত্রায়িত করছেন। অনুসন্ধান ক'রে জানলাম আমাদের চন্দ্রাবতী 'কবি'ও ন'ন তাঁর জীবনী চিত্রায়িত করার তিনি অনুমতি দেন নি বা তিনি এই ছবির নায়িকাও ন'ন।

প্রভাংশু গুপ্ত নামে জনৈক লেখক বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এই ব'লে পত্রাঘাত করেছেন যে 'মানিকজোড়' নামে একটি গল্প তিনি কল্যাণ গুপ্তকে বিক্রী করেন ছবির জন্য, অথচ এখন আর একজন 'মাণিকজোড়' তুলছেন। সুতরাং সৌজন্যের খাতিরে সে নামটি পরিবর্ত্তন করা উচিত। শরৎচন্দ্রের 'দর্পচূর্ণ', রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়', 'যোগাযোগ' তলিয়ে গেল সিনেমার সৌজন্যে, তো 'মানিকজোড়'।

অবশ্য আমাদের নিমাই ব'লে অন্য কথা। 'মানিকজোড়' নামে আর একটি গল্প সে প্রায় বছর পনেরো আগে পড়েছে, সেই লেখকেরও সৌজন্যের খাতিরে নামটা পনেরো বছর আগে পাল্‌টে দেওয়া উচিত ছিল।

পৃথ্বিরাজ কাপুর কাউন্সিল অব ষ্টেটে মনোনয়ন লাভ ক'রে বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, তিনি একজন 'সুপার' অর্থাৎ ছোট ভূমিকার অভিনেতা। কথাটা যে কতদূর সত্য, 'হিন্দী 'আনন্দমঠ' দেখে বুঝতে পারলাম। ছোট ভূমিকার অভিনেতারা যেমন অভিনয় করতে পারেন না এবং কথা বলতে গেলে হয় হোঁচট খান, নয় এমন চীৎকার করেন যে সকলের প্রাণ নিয়ে টানাটানি উপস্থিত হয়: 'আনন্দমঠে' পৃথ্বিরাজ এমন চীৎকার করেছেন যে সেই 'সুপার'-এর কথাই মনে হয়।

এর কারণ নিমাই বাৎলে দিল। বললো,—পৃথ্বিরাজ বাঙলা দেশ ছেড়ে যখন যান তখনকার অভিনয়-ধারা আজও এখানে চালু ব'লে ওঁর বোধ হয় ধারণা!

●

কিশোর সাহু সেক্সপীয়ারের 'হ্যামলেট' নাটকটিকে হিন্দী ছবিতে তুলবেন ব'লে তার নাম দিয়েছেন 'খুন-এ-নাহক্'। আপনারাই বলুন সত্য সত্যই নাহক এ খুন কিনা!

●

আমাদের দেশে এক বিপ্লবী পরিচালক আছেন, যিনি পরিচালনা থেকে সুরু ক'রে ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটিতে সাক্ষ্য দেওয়া পর্য্যন্ত সব বিষয়েই বিপ্লব এনেছেন। এই বিপ্লবের ধাক্কায় তিনি যে ছবি করেন, তা-ই এক একটি বিপ্লব হয়ে দাঁড়ায়, এবং একটি ছবি যদি দেখে আসেন তো তাঁর সব ছবিই দেখা হ'য়ে যায়। মনে হয় এই বিপ্লবীকে ব্রিটিশরা একদা ধ'রে খুব ঠেঙিয়েছিলেন, কারণ ইনিও সুযোগ পেলে তাদের ছেড়ে কথা ক'ন না।

যাই হোক, এই যে বিপ্লবী পরিচালক, তিনি সম্প্রতি বেকার। হঠাৎ সংবাদ পেলেন যে একটি শান্তিবাহক পরিচালক এই বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়েছেন। অমনি বিপ্লবী ভদ্রলোক ছুটলেন শান্তি-পরিচালকের কাছে। শান্তি আর বিপ্লবে কোলাকুলি হ'ল।

বিপ্লব বললেন—ভারী আমার ডাইরেক্টার রে! যা করবে তো বুঝতেই পারছি। তার চেয়ে বুদ্ধিমানের মত তোমার গল্প, তোমার টাকা, তোমার ফাইন্যান্‌সিয়ার—সবকিছু আমাকে দিয়ে দাও। আমি পরিচালক হ'ব, প্রযোজক হ'ব, কাহিনীকার হ'ব—তবে হ্যাঁ দালালী হিসাবে তুমি ছবির লাভের শতকরা পাঁচ টাকা নিও।

শান্তি-পরিচালক তো অথৈ সলিলে পড়লেন, কারণ টাকাটা তিনিও আর একজনের ভাগ থেকে চোঁ মেরেছেন কিনা! শান্তি এপাশ ওপাশ ছোটাছুটি করে, বিপ্লব পিছু ধাওয়া করে। দেখা যাক্, এই চোর-চোর খেলায় কে জেতে!

বাণীচিত্রের বাণী

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

[চলোর্ম্মি সংস্কৃতি কেন্দ্রে প্রদত্ত অভিভাষণ]

ভাগ্যক্রমে আমি এই শিল্পের সঙ্গে ভেতর থেকে কার্যকরীভাবে জড়িত; আবার যখন বাইরে থেকে এই শিল্পের ভেতরকার অবস্থা তদন্ত করে দেখবার জন্য ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটি গঠিত হলো তখনো তার সদস্যরূপে আমার কাজ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ভারতবর্ষে যখন প্রথম ছবি তোলা আরম্ভ হয়, তখন অল্প-বিস্তর সেটা ব্যক্তিগত ছবি বা খেয়ালের ব্যাপার ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ তা থেকেই আজকাল এই বিরাট শিল্প গড়ে উঠেছে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই শিল্প গড়ে ওঠেনি, তাই স্বভাবতঃই তার মধ্যে গলদ রয়ে গেছে; সেকথা এই শিল্পের পরিচালকেরা জানেন ও স্বীকার করেন। সেই-জন্যে এই শিল্পের তরফ থেকেই গভর্ণমেণ্টকে একটা এনকোয়ারী কমিটি গড়ে তোলার জন্যে আবেদন করা হয়, সেই কমিটি যাতে এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে তার ভবিষ্যৎ উন্নতির নির্দ্দেশ দিতে পারেন যে নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই শিল্প ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি ও জনশিক্ষার প্রকৃষ্ট বাহন হতে পারে। আজকের এই সভায় আপনারা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার ব্যবস্থা করেছেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে আমি সেই কমিটির মন্তব্য থেকে অংশবিশেষ আপনাদের কাছে উল্লেখ করছি। তার মধ্যেই আমার ব্যক্তিগত মতামতেরও পরিচয় আপনারা পাবেন।

ছায়াচিত্রের ছবি দর্শকদের কাছে শুধু ছবি নয়, তার দ্রুত গতির মধ্যে এমন একটা জীবন্ত সচলতা এসে যায়, এমন একটা উত্তেজনা আর প্রাণচাঞ্চল্য রক্তমাংসের প্রত্যক্ষতায় ফুটে ওঠে, যার প্রভাবে সেই ছবির মধ্যে সাময়িকভাবে দর্শক নিজেকে জীবন্তভাবে প্রতিফলিত দেখতে পায় সামাজিক দিক থেকে, এইখানেই হলো ছায়াচিত্রের আসল শক্তি, এইখানেই হলো তার আসল বিপদ।

আমাদের অলংকার শাস্ত্রে চৌষট্টি কলার কথা আছে, কিন্তু ফিল্ম সেরকম কোন স্বতন্ত্র শিল্পকলা নয়, ফিল্ম হলো বহু শিল্পের বহু চেষ্টার একটা সম্মিলিত ফল। আজকাল বৈজ্ঞানিক সভ্যতা যতই এগিয়ে চলেছে, ততই মানুষ সমবায় পদ্ধতিকেই আদর্শ কর্ম্মপন্থা রূপে আঁকড়ে ধরেছে। ফিল্ম আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের সেই আদর্শকেই আর্টের ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলেছে। যাঁরা ফিল্ম Industry-র সঙ্গে হাতে-কলমে সংযুক্ত, তাঁরা হয়ত এই শিল্পকে মূলতঃ অর্থকরী লাভ-লোকসানের পণ্য হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত কিন্তু বাইরে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে এই শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত নন, তাঁদের মধ্যে অনেকে আশঙ্কা করেন যে, উপযুক্ত লোকের হাতে না থাকলে, এই শিল্প সমাজের ভয়াবহ ক্ষতি ও অধোগতির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

দর্শকের দিক থেকে অধিকাংশ দর্শকই ফিল্মকে তাঁদের অবসরের আনন্দ-বিনোদন হিসেবেই দেখে থাকেন। প্রাচীন কালে এই আনন্দ পরিবেশন করবার দায়িত্ব ছিল স্বয়ং রাজার। এমন কোন উৎসব হতো না যার সঙ্গে নৃত্য-গীত বা নাটকের অভিনয় সংযুক্ত না থাকতো। ক্রমশঃ যে সব উৎসব বা সাংস্কৃতিক আয়োজন পরিবারগত বা সমাজগত কাজ ছিল, সেগুলো হয়ে দাঁড়ালো জীবিকা অর্জ্জনের উপায়, গিয়ে পড়লো সমাজের বাইরের একজাতীয় লোকেদের হাতে। ফিল্মের সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্য বা অভিনয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকার দরুন তাকেও আমাদের দেশে খানিকটা এই সামাজিক সংস্কারে ভৎর্সনা সহ্য করতে হয়েছে। তার দরুন এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা চোখ বুজিয়েই বলেন, ফিল্ম দেখা মানেই হলো সামাজিক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া, তার মধ্যে জীবনের যে আনন্দ আর সৌন্দর্যের প্রকাশ তা তাঁরা দেখতে পান না, বা স্বীকার করতে চান না!

কিন্তু এই ধারণা যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা এই শিল্পের ততখানি ক্ষতিকারক নন, যতখানি ক্ষতিকারক হলেন তাঁরা, যাঁরা মনে করেন যে, ছবি হলো শুধু

প্রমোদ পরিবেশনের জিনিষ, যাতে দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্টভরা জীবনকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকতে পারা যায়। অনেক ছবি আছে যা দেখে দর্শকেরা খানিকটা আনন্দই পেলো, ভাল বা মন্দ, নীতি বা দুর্নীতির কোন কথাই তাদের মনে জাগলো না। আবার এমন সব ছবিও আছে যা মানুষের মনকে আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুল:ত পারে। দর্শককে কতখানি আনন্দ দিতে পারলো, তার ওপর সেই ছবির টিকিট বিক্রীর অঙ্ক মূলতঃ নির্ভর করে, এ কথা সত্যি বটে। কিন্তু ছবির ভাল-মন্দ বিচারে সেইটাই শেষ কথা নয়। মানুষকে তার দুঃখ ভোলাবার জন্য একটা নেশার মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া চলচ্চিত্রের কাজ নয়। যদি তার সামাজিক প্রভাব ক্ষতিকারক হয় তাহলে ছবি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে, সুতরাং প্রযোজকের দায়িত্ব মিটে গেছে, এ কথা যে প্রযোজক মনে করেন, আমার মতে তিনি ভুল করেন। ফিল্মের একটা বিরাট সামাজিক দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব শুধু ক্ষতিকারক প্রভাব বাঁচিয়ে ছবি তৈরী করাতেই নিঃশেষিত হয়ে যায় না। ভাল ছবির লক্ষ্য হলো তাকে একটা স্বাস্থ্যকর ও আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

এ কথা আজ কেউই অস্বীকার করেন না, আজকের সভ্যতায় এবং সংস্কৃতিতে ফিল্মের একটা নিজস্ব অবদান আছে। তার একটা বিশেষ গঠনমূলক সামাজিক দিক আছে তাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করে চলা সম্ভব নয়। সেইজন্যে সমাজের কর্তব্য হলো যে সব ফিল্ম সর্ব্বসাধারণের দেখবার জন্যে সরকারী অনুমোদন পায়, সেগুলো যেন যথার্থই আনন্দ-বলিষ্ঠ হয়, যেন জাতীয় চরিত্র গঠনে তারা সাহায্য করতে পারে।

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

যাঁরা দর্শক, যাঁরা এই শিল্পের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, আমাদের দেশে তাঁদের কোন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান বা ক্লাব নেই, যার ভেতর দিয়ে তাঁরা তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন। একমাত্র খবরের কাগজে লেখা ছাড়া অন্য উপায় নেই। কিন্তু অবস্থা গতিকে আমাদের দেশের সংবাদপত্র সাধারণতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে এতখানি বিব্রত যে, তাঁরা ফিল্মের জন্যে যথাযথ জায়গা দিতে পারেন না। তার ফলে সিনেমা-দর্শকরা তাঁদের দাবী সার্থকভাবে প্রকাশ করবার সুযোগ পান না।

চলোর্মি সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ সিনেমা-দর্শকদের সেই সুযোগ আজ দিয়েছেন, তার জন্যে তাঁরা সিনেমা শিল্পের ধন্যবাদ দাবী করতে পারেন। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান আরো বেশী হওয়া দরকার যাতে দর্শকেরা নিজেদের দাবীকে প্রকাশ করবার সুযোগ ও সুবিধা পেতে পারেন।

বিশ বছর আগে

★ ★ ★

১৯৩২ সালের ১লা জুলাই ক্রাউন সিনেমায় ম্যাডান থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানে তোলা কাহিনীকার-পরিচালক অমর রায়চৌধুরীর 'চিরকুমারী' মুক্তিলাভ করে। এরই প্রায় বিপরীত দিকে 'চিত্রা' প্রেক্ষাগৃহে তখন চলছিল 'পল্লীসমাজ'। 'চিরকুমারী' সবাক ছবি এবং এর সঙ্গীতাংশ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন অমর রায়চৌধুরী, ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায়, মিস্ রাণী। ম্যাডান প্রতিষ্ঠানেই তখন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অবলম্বনে সবাক ছবি তোলার মহড়া দেওয়া চলতে থাকে। এ-ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছিলেন :—গোবিন্দলাল—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, কৃষ্ণকান্ত—অহীন্দ্র চৌধুরী, হরলাল—মণি ঘোষ, মাধবীনাথ—কার্তিক দে, ভ্রমর—শান্তি গুপ্তা, রোহিনী—শিশুবালা। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করেন এবং চিত্রগ্রহণ করেন যতীন দাস। স্বর্গতঃ পরিচালক-অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর নিজস্ব প্রথম চিত্র প্রতিষ্ঠান 'বড়ুয়া পিকচার্স লিমিটেডে'র হয়ে ছবি তোলার কাজে উদ্যোগী হন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে নিউ থিয়েটার্সে 'রমা' নামে যে সবাক-ছবিটি তোলা হচ্ছিল সেটির নাম পরে গ্রন্থকারের দেওয়া নাম অনুযায়ীই 'পল্লীসমাজ' রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এ-ছবি পরিচালনা করেন নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 'চণ্ডীদাস' সে সময় সম্পাদন-কক্ষে। তাঁদের পরবর্তী ছবি তোলার কথা হয় প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় একখানি উর্দু ছবি।

ম্যাডান থিয়েটার্স-এর আর্থিক অসুবিধা দূর করার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং-ডিরেক্টার এ-ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এঁদের 'প্রফুল্ল'

ছবিটি নরেশ মিত্রের পরিচালনায় যথারীতি তোলা হতে থাকে। বড়ুয়া পিকচার্সের ষ্টুডিওটি তৈরী প্রায় সমাপ্ত হয় এবং তাঁরা ত্রি-ভাষী 'অনাথ' ছবির বহির্দৃশ্যগ্রহণের কাজ তার আগেই সুরু করেন। এই সময় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী। এই প্রতিষ্ঠানের সব ব্যবস্থার ভার নিয়েছিলেন প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। আর এল খেমকা এই ষ্টুডিওর কর্ণধার ছিলেন। বামনদাস চট্টোপাধ্যায় 'সিষ্টোফোন' সবাকচিত্রের প্রদর্শন-যন্ত্র তৈরী করেন। কলকাতার তৎকালীন অন্যতম জনপ্রিয় চিত্রগৃহ 'ছবিঘরে' এই যন্ত্র বসানো হয় এবং যে কোনো বিদেশী চিত্র-প্রদর্শন-যন্ত্রের তুলনায় এর দামও শতকরা ৫০% কম ছিল। মাদ্রাজ থেকে ছায়াচিত্র-রসপিপাসুরা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সবিতা দেবী অভিনীত বাংলা ছবি দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ম্যাডান প্রতিষ্ঠানে 'বাল্মিকী', 'দিল কি পিয়াস', 'পতি-ভক্তি' এবং 'আলাদীন' এই ক'টি ছবির চিত্রগ্রহণ-কার্য্য একই সঙ্গে পুরোদমে চলতে থাকে। তখনও পর্য্যন্ত তাঁদের আর্থিক ব্যাপারে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং-ডিরেক্টার এস এন পোচখানওয়ালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু এগোয় নি। দেবকীকুমার বসু পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের 'চণ্ডীদাস' ছবিটি তখন মুক্তি-প্রতীক্ষায়। 'এ্যারেবিয়ান নাইট্‌স্'-এর কাহিনী অবলম্বনে সে সময় একটি ছবি তোলার তোড়জোড় চলতে থাকে। বড়ুয়া পিকচার্সের 'নিশির ডাক' ছবিটি সিন্‌ক্রোনাইজ করার চেষ্টা হয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীতে সবিতা দেবী এসে যোগ দেন। তিনি বাংলা এবং হিন্দুস্থানী ভাষা শেখা সুরু করেন। ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠানের হয়ে নিরঞ্জন পাল 'শক্তিপূজা' ছবিটির সম্পাদনা-কার্য্য চালিয়ে যান।

ম্যাডান প্রতিষ্ঠানের 'পতিভক্তি' তোলা শেষ হয়। 'দিল কি পিয়াস', 'হিন্দুস্থান' এবং 'আলাদীন' ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর চিত্রগ্রহণ মাঝে মাঝে চলছিল। একদল নবীন কর্ম্মীকে নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানে ছবি তোলার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। এঁদের উর্দু ছবি 'সুবে কি সিতারা' তোলার পর 'দেবদাস' সবাক-চিত্র তোলার কাজে হাত দেওয়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। বড়ুয়া পিকচার্সের 'অনাথ' ছবিতে অভিনয় করার জন্য মঞ্চাভিনেতা ভুমেন রায় সেই প্রতিষ্ঠানে এসে যোগ দেন।

সদ্যমুক্ত 'অঞ্জাম' চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা

মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'পুণম্' চিত্রে আশা মাথুর

অভিনয়শিল্পের রীতি ও পদ্ধতি

লেখক : কনষ্টাণ্টিন ষ্টানিস্লাভস্কি

অনুবাদক : সুবোধকুমার ঘোষ

[মস্কো আর্ট থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, অভিনয়-শিল্পী ও পরিচালক কনষ্টান্টিন ষ্টানিস্লাভস্কি তাঁর পরিণত অভিজ্ঞতার ফল, তাঁর "পদ্ধতি" মারফৎ নাট্যাভিনয়ের নতুন এক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি উপস্থিত ক'রেছেন নাট্যামোদী দুনিয়ার কাছে। সাধারণতঃ, যে ধরণের নাট্য-পরিচালকের সঙ্গে আমাদের অনেকেই পরিচিত, শিল্প-জীবনের প্রথম দিকে ষ্টানিস্লাভস্কি নিজেও সেই ধরণের স্বেচ্ছাচারী পরিচালক ছিলেন। তাঁর পরিচালনাতেও শিল্পীরা শিখতেন তাঁর অভিনয়কে অবিকল নকল করতে। অভিনয়শিল্পী নিমিরোভিচ ডান্‌শেঙ্কোর সহযোগিতায় মস্কো আর্ট থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরও তিনি স্বেচ্ছাচারী পরিচালকের রীতি ত্যাগ করতে পারেন নি। বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ অভিনয়শিল্পী, বিশেষ ক'রে ইতালীয় অভিনয়শিল্পী তমাসো সালভিনির অভিনয়-পদ্ধতি বিশ্লেষণ ক'রে অভিনয়ের সাত্ত্বিক বিধি সম্পর্কে তিনি সজাগ হন। তার ফলেই তাঁর "পদ্ধতি"র সৃষ্টি। "পদ্ধতির"র ভিত্তি যুক্তিজালে নয়, "পদ্ধতি"র ভিত্তি শিল্পী পরিচালকের ত্রিশ বছরব্যাপী থিয়েটার-জীবনের অভিজ্ঞতায়। অবশ্য "পদ্ধতি" প্রকাশের আগেই জার্ম্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ তিনি ঘুরে এসেছেন, দুনিয়া-জোড়া নাম তাঁর ছড়িয়ে পড়েছে শিল্পী-পরিচালক হিসেবে।

"Systems and Methods of Creative Art" নামক গ্রন্থের অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হচ্ছে। এই গ্রন্থের অংশগুলি মস্কো বলশ'য় থিয়েটারে প্রদত্ত ষ্টানিস্লাভস্কির বক্তৃতামালার অন্তর্ভুক্ত। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে এই বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হয়, "পদ্ধতি"র সব কিছু মালমশলা তৈরী হয়ে গেলেও "পদ্ধতি" তখনও প্রকাশিত হয় নি। এই বক্তৃতামালায় ষ্টানিস্লাভস্কি বলশ'য় থিয়েটারের শিল্পীদের সহযোগিতায় অপেরার কাজে প্রয়োগ ক'রে দেখতে চেয়েছেন তাঁর "পদ্ধতি"কে। প্রাচীন একঘেয়ে অভিনয়-রীতি, থিয়েটারে থিয়েটারীপণা, মিছামিছি করুণ রসসৃষ্টি, বাগাড়ম্বর ও শিল্পপাণ্ডিত্যের ভাণ এই সবের বিরুদ্ধে "পদ্ধতি"র প্রধান বিদ্রোহ ঘোষণা।

—অনুবাদক]

প্রথম অধ্যায়

থিয়েটার হোলো জীবন রূপায়নের শিল্প—জীবনে ও থিয়েটারে সমগ্রতার ভিত্তি ছন্দ—সৃষ্টির কাজে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ছন্দোময় ব্যক্তিসত্তা—সৃষ্টির কাজে সাধারণ কার্য্যক্রম ও সমস্যাও আছে— সে নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনের কার্য্যক্রম ও সমস্যা—

লোকে আকস্মিকভাবে শিল্পক্ষেত্রে সমবেত হয় না। কেউ সহযোগী শিল্পীদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় ক'রতে চায়, আর একেবারে চুপ ক'রে থাকা সম্ভব নয় বলে কেউ চায় এগিয়ে যেতে; অন্তরের শক্তি তাদের আরও দৃঢ় হয়ে বেড়ে চলছে, খুঁজে পেতে চাইছে সৃষ্টির কাজে আত্মপ্রকাশের নতুন নতুন পথ। তাই, তারা সমবেত হয়।

আমাদেরও আজ একত্রিত ক'রেছে এই একই কারণ। আমি চাই আমার অভিজ্ঞতা বিনিময় ক'রতে, চেষ্টা ক'রতে চাই তাকে অপেরার কাজে লাগাতে, আর আমি নিশ্চিত জানি, আপনারাও সবাই এগিয়ে চলার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। তাই, আর কালবিলম্ব না ক'রে আমাদের শিল্পনীতি অনুশীলনের কাজ আমরা সুরু ক'রে দিতে পারি, অবশ্য যদি আপনাদের থিয়েটারের অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে এখনও এমন কেউ থেকে থাকেন, যিনি মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে চান আমার সঙ্গে, বিনিময় করতে চান আমাদের শিল্পে সম্পূর্ণতা অর্জনের, একে অপরকে পারস্পরিক সাহায্য ক'রবার জন্য

মঞ্চ-প্রযোজক ষ্টানিস্লাভস্কি

'পারস্পরিক' এইজন্য যে থিয়েটারে যারা স্বাধীনভাবে তাদের কাজ দেয় আর সেই কাজ যারা নেয়, তারা উভয়েই একসঙ্গে একই সময়ে এগিয়ে চলেছে,—বলা যেতে পারে। একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ষ্টুডিওতে রীতিমত অনুশীলন না ক'রে এতখানি দাবী মিটিয়ে যুগোপযোগী অভিনয়-শিল্পীর মর্য্যাদা লাভ করা কারও আজ সম্ভব নয়।

কোনও ভাবের অভিনয় কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যায়,—এই ভুল ধারণা এখন ত্যাগ করা দরকার। অভিনয় কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যায় না,—এই কথাই বরং সুস্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

প্রতিভাশালী অভিনয়-শিল্পীদের মহৎ উদাহরণ থেকে স্পষ্টই আমরা দেখতে পাই,—কি ক'রে তাঁদের যুগের প্রচলিত সবকিছু মঞ্চনীতি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে; বস্তুতঃ, অভিনীত ভূমিকার ঐক্যচ্ছন্দে আর আঙ্গিক ও আত্মিক অভিনয়ের বিস্ময়[illegible] স্বচ্ছন্দতায় সহযোগী অন্যান্য শিল্পীদের থেকে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা স্বতন্ত্র মর্য্যাদার বিশিষ্টতা নিয়ে। যেসব প্রবৃত্তি রূপায়িত করছেন তার প্রকৃত প্রকৃতি উপলব্ধি করেছেন বলেই মঞ্চে যতক্ষণ তাঁরা সৃষ্টির কাজে সক্রিয় থাকেন ততক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তের জীবনে সঙ্গী ক'রে নিয়েছেন তাঁরা দর্শক-সমাজকে। এইভাবে প্রচলিত মঞ্চরীতির বাধাকে অগ্রাহ্য ক'রে, যে ব্যবধানে তাদের দূরে ঠেলে দেয় দর্শকসমাজ থেকে তাকে তুলে দিয়ে সরাসরি আসন ক'রে নিতে পেরেছেন তাঁরা দর্শকসাধারণের হৃদয়ে। প্রত্যেকটি কথার খাঁটি মূল্য দিতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা তাঁদের সহজাত শিল্পজ্ঞানের প্রেরণায়, (এই জ্ঞান তাঁদের প্রতিভারই অবিচ্ছেদ্য অংশ) সত্যিকার ও সঠিক আঙ্গিক অভিনয়ের সহযোগ ছাড়া দর্শকদের দিকে কোনও কথা তাঁরা ছুঁড়ে দেন নি।

যুগোপযোগী সত্যকার অভিনয়শিল্পী যিনি হ'তে চান, তাঁর পক্ষে এই কাজই অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি। নিজস্ব পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার সাহায্যে প্রতিটি মনোভাবের প্রকৃত প্রকৃতি উপলব্ধি, এই ধরণের কাজে নিজের আগ্রহবুদ্ধি ও সচেতনভাবে সৃজনীবৃত্তে প্রবেশের কৌশল আয়ত্বই তাঁকে করতে হবে।

থিয়েটারের পুরো উদ্দেশ্যই যদি হ'ত চিত্তবিনোদন, এত খাটুনির তাহলে কোনও দরকারই ছিল না এর পেছনে। কিন্তু থিয়েটার হ'ল জীবন রূপায়নের শিল্প। নেরো বলে গেছেন,—থিয়েটার হচ্ছে মানবীয় শক্তির সাগর। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হ'য়ে গেছে নেরোর সময় থেকে তবুও তাঁর এই অভিমত আজও সত্য।

মানবশক্তিই নিঃসন্দেহে থিয়েটারকে গড়ে তুলেছে আর থিয়েটার নিজের ভেতর দিয়ে সেই মানব শক্তিকেই রূপায়িত করে। ধীশক্তি হঠাৎ আকাশ থেকে পড়া অলৌকিক একটা কিছু নয়। আমাদেরই চারিদিকে বিস্তৃত রয়েছে উত্তাল মানব সমুদ্র; যেসব শক্তি দেখা যায় সেই সমুদ্রে তার প্রতি অভিনয়শিল্পীর মনোযোগ আর অভিনয়শিল্পীর স্বকীয় মানবীয় শক্তির বিকাশের ফলেই উদ্ভূত হয়

এই শক্তি। মঞ্চে জীবনের দ্রুত-সঞ্চারী মুহূর্ত্তগুলি অর্থাৎ একটা বিশেষ পরিবেশের মধ্যে প্রবৃত্তি-সত্যকে সঞ্চারিত যখন করতে হবে, অভিনয়-শিল্পীর কাজের সেই অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তগুলি কোনওক্রমেই আকস্মিক অনুপ্রেরণাজাত নয়; কঠোর আভ্যন্তরীন শিক্ষা আর প্রবৃত্তি প্রকৃতির অনুশীলনের ফলই হ'ল এইগুলি। এই কঠোর শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রধান উদ্দেশ্য আবার প্রকৃত অনুপ্রেরণা লাভ আর ভেতরের বা বাইরের কোনও বাধাই যাতে শিল্পীর কাজে মনোযোগ বা কেন্দ্র সন্নিবেশ নষ্ট না ক'রে তার নিশ্চয়তা।

ষ্টুডিওতে কাজের ভেতর দিয়ে অভিনয়-শিল্পীর নিজস্ব ক্ষমতার নিশ্চিত বিকাশ হবে আর এমন হবে যাতে তার কল্পনাশক্তি আত্মশিক্ষায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে তার সমস্ত ক্ষমতাকে চালিয়ে নেবার উপযোগী ক'রে তোলে একটি মাত্র পথে, সে পথ তার ভূমিকার নির্দিষ্ট পথ। কিন্তু কি ক'রে মঞ্চের সৃজনী শিল্পের সেই স্তরে পৌঁছানো যাবে, যেখানে 'কোনও এক ব্যক্তিকে আমি রূপ দান ক'রছি'—এটা শেষ হবে আর সুরু হবে —'আমি যদি এরূপ একটি চরিত্র হই, তাহলে আমার মনোভাবের প্রকৃত প্রকৃতি কি হবে আর কিই বা হবে তখন আমার সঠিক অঙ্গভঙ্গী?' এর জন্য প্রয়োজন হয় অনেক বছরের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ। ভাষায় একে প্রকাশ ক'রে বলা সম্ভব নয়। পুসকিন নাট্যশিল্পকে আখ্যায়িত ক'রেছিলেন বিশেষ পরিবেশে প্রবৃত্তি-সত্য সঞ্চারের শক্তি হিসেবে। বলা যেতে পারে, পুস্‌কিনের প্রতিভা আজও তো অনতিক্রম্য রয়েছে, বলা যেতে পারে, সেই পথই অনুসরণ ক'রব আমরা ষ্টুডিওর কাজে আর নিযুক্ত হব মানবীয় ভাব ও অনুভবের এবং তদুপযোগী সঠিক আঙ্গিক অভিনয়ের অনুশীলনে।

সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষ যে সাদাসিধে দৈনন্দিন জীবন যাপন করে মনস্তাত্বিক প্রশ্নে সেই জীবনই হ'বে আমাদের প্রথম গবেষণার বিষয়। সাধারণ মানুষ তার সাধারণ জীবনের রূপায়ন হিসেবে মঞ্চও স্বভাবতঃই অত্যন্ত সাধারণ বৃত্তির অনুসরণ করে, একান্তভাবে অসাধারণ লোকেরাই যেসব কাজ করে তার অনুবর্ত্তনে নিযুক্ত থাকে না। অবশ্য, এর অর্থ নিশ্চয়ই এ নয় যে সাধারণ মানুষ কোনও এক সাধারণ দিনে কোনও অসাধারণ কাজ আদৌ করতে পারে না। দেশের জন্য, বন্ধুর জন্য বা মহৎ কোনও উদ্দেশ্যে যে প্রাণ দিয়েছে, তার আত্মত্যাগের মহত্তম প্রচেষ্টায় ক্রমোন্নত অগ্রগতির সব ক'টি ধাপই জানতে হবে অতি সাধারণ ও সামান্য প্রচেষ্টা থেকে সুরু ক'রে, জানতে হবে শুধু বোঝবার জন্য নয়, জীবন্ত প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিতও করতে হবে তাকে আর রূপায়িত করতে হবে সত্যকার ও সঠিক আঙ্গিক অভিনয়ে।

কিন্তু এই সমস্তকে কি ক'রে আমরা লক্ষ্য ক'রব আর কি ক'রেই বা রূপায়িত ক'রব তাকে আমাদের জীবনের মুহূর্ত্তগুলিতে? কি সেই বস্তু যার অভাবে দর্শককে কখনই আমরা বোঝাতে পারব না যে আমাদের শিল্প শুধু বোধগম্য নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে? মানুষের জীবনে সমগ্রতার ভিত্তি তার প্রকৃতি-দত্ত ছন্দ অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস আর আমাদের শিল্পেও যে এই ছন্দই সমগ্রতার ভিত্তি সে-কথা যদি আমরা বুঝতে না পারি, তাহ'লে সমগ্র একটি অনুষ্ঠানে একটি ছন্দের প্রবর্ত্তনে যেমন কখনই সমর্থ হব না, তেমনই সমর্থ হব না ঐ ছন্দে অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি শিল্পীর সুর মিলিয়ে এক ঐক্যতানী সমগ্রতার সৃষ্টিতে। জীবনে প্রতিটি মানুষকে যে ছন্দ প্রকাশ ক'রতে হয় তা' জন্ম নেয় তার শ্বাসক্রিয়ায় অর্থাৎ তার প্রথম অনিবার্য্য প্রয়োজন থেকে; তারপর, ক্রমশঃ সারা দেহমনই হয়ে পড়ে এর উৎস। সৃজনী কাজে প্রত্যেকটি মানুষই অদ্বিতীয় ও স্বতন্ত্র, এক একটি ছন্দোময় ব্যক্তিসত্ত্বা।

কারও কি কিছু তা'হলে জানার প্রয়োজন নেই, একবার ছন্দটি নির্দ্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারলেই কি পুরোপুরিভাবে অনুপ্রেরণার ওপর নির্ভর করা সম্ভব? তথাকথিত অনুপ্রেরণা-মতাবলম্বীরা প্রথমতঃ তাদের সমস্ত সহজাত শক্তিকে [illegible] ও বাগিয়ে তুলতে

চেষ্টা ক'রতেন, ফলে প্রায়শঃই সত্যকার সহজাত অনুপ্রেরণার অন্তর-শুদ্ধ উন্নত শক্তির শৈল্পিকতার পরিবর্ত্তে শুধু সরাসরি পাওয়া যেত সহজ ক্ষমতাজাত অতিরঞ্জন, মিথ্যা কারুণ্য ও অতি-অভিনয়, আর "এই এই ভাবের অভিনয় এই এই কায়দায় হবে"—এই কৃত্রিম মঞ্চনির্দ্দেশের কল্পনা গজিয়েছে এ থেকেই। শিল্পে নিযুক্ত হ'য়ে নিজেদেরই যাঁরা শুধু ভালবাসেন না বা বেশী মূল্য দেন না, জীবনে পছন্দসই জীবনপদ্ধতি হিসেবে যাঁরা দেখেন অভিনয়-শিল্পকে, যাঁরা মনে করেন জীবনই মূল্যহীন হয়ে পড়বে এর অভাবে, ষ্টুডিওতে দীর্ঘ একনিষ্ঠ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এইসব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করতে পারবেন তাঁরা।

উত্তর দেবার মত আরও একটি প্রশ্ন তবু থেকে যায়। শিল্প যদি প্রত্যেকের অনুপম প্রকাশভঙ্গীই হয়, অনেক শিল্পীর সমবেত অ নর জন্য ষ্টুডিও নির্ম্মাণ কি ক'রে আদৌ সম্ভব হ'তে পারে? প্রত্যেকেরই সম্ভবতঃ নিজস্ব ষ্টুডিও থাকবে? কাজের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাব, প্রত্যেকটি মানুষের সৃজনী-শক্তি তার নিজের মধ্যে থাকলেও আর একজনের সৃজনী-প্রতিভা আর একজনের সঙ্গে একই খাতে বইতে না পারলেও, সাধারণ ধরণের অনেক কার্য্যক্রম ও সমস্যা আছে। প্রত্যেক সৃজনী শিল্পীর পক্ষে তা' সমানভাবে খাটে। প্রত্যেকেই তাই একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারেন, সে তাঁর নিজস্ব অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলী। কি ক'রে এইসব লক্ষ্য ও আবিষ্কার করা যায় আর কিসের সাহায্যেই বা তাকে অভিনয়-শিল্পী হ'বার উপযোগী উন্নত সংস্কারমুক্ত ক'রে তোলা যায়, এটা ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই সাধারণ কর্ত্তব্য- সম্পূর্ণতার পথে তাদের সাধারণ শিল্পশৈলী। সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজের ও দর্শকের জন্য এক সাধারণ সংজ্ঞা লক্ষ্য করেন অভিনয়-শিল্পী। বস্তুতঃ সৃজনী কাজে প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখতে হবে তার নিজস্ব ছন্দকে, কিন্তু শিক্ষককে আরও একটু এগিয়ে যেতে হবে—সমস্ত ছাত্রের শিল্পছন্দকে অন্তর্ভুক্ত ক'রতে হবে তাকে তার নিজস্ব সৃজনী-বৃত্তে। [ক্রমশঃ]

পরিভাষা :—

সৃজনী শিল্প—Creative art
সাত্ত্বিক অভিনয়—Psychological action
সহজাত জ্ঞান—Intuition
ছন্দ—Rhythm সৃজনীবৃত্ত—Creative circle
কেন্দ্রসন্নিবেশ—Concentration সাধারণভাবে Concentration অর্থে 'একাগ্রতা' করা যেত। কিন্তু লেখক সর্ব্বত্র Concentration কথাটি খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার ক'রেছেন।

ষ্টুডিও—ষ্টানিস্লাভস্কি বলেন,—ষ্টুডিও থিয়েটারও নয়, প্রথম শিক্ষার্থীদের নাট্য-বিদ্যালয়ও নয়, ষ্টুডিও কমবেশী শিক্ষিত শিল্পীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ল্যাবরেটরী।

রিটার রোমান্স

★ ★ ★ ★

[মার্কিন ছবির লাস্যময়ী, যৌনমাদকতাসঞ্চারিণী অভিনেত্রী রিটা হেওয়ার্থ সারা বিশ্ব জুড়ে পরিচয় লাভ করেছে যতটা না তার অভিনয়ে, তার চেয়ে বেশী তার দুর্নিবার অপরিতৃপ্ত রোমান্সের ক্ষুধার জন্য। রোমান্স, প্রেম, বিবাহ কোনোটাই তার কাছে না বন্ধনহীন গ্রন্থি, না কোনো গ্রন্থির বন্ধন! এই দুর্ব্বার রোমান্স-পিয়াসী মন মার্কিন মুলুকে তথা হলিউডেও আলোড়নের সঞ্চার করেছিল—তার ফলে চিত্রজগতে এবং গুণমুগ্ধ চিত্রদর্শকদের মনোজগতেও তার প্রতিষ্ঠা একরকম শূন্যের কোঠায় এসে পৌচেছিল। প্রিন্স আলি খাঁ রিটার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন বিবাহবন্ধন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় ব্যর্থকাম ও অপ্রতিভ হয়েছেন। সম্প্রতি রিটা আবার চিত্রজগতে ফিরে আসছে হৃত প্রতিষ্ঠা ও মাদকতা-সঞ্চারী সুনাম ফিরে পাবার জন্য।]

সারা বিশ্বের বিস্ময় জেগে উঠেছে আজ ছলনাময়ী অভিনেত্রী রিটা হেওয়ার্থকে নিয়ে। সাংবাদিক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষের উদগ্রীব লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে সে। তার জীবনের প্রতিটি প্রেম-কাহিনী নাটকীয়—আর সেইজন্যেই বোধ করি তা' ক্ষণস্থায়ী। একের পর এক তার কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছেন গুণমুগ্ধ ও রূপমুগ্ধের দল। চোখে তাঁদের স্বপ্নের নেশা। কিন্তু স্বপ্নমাত্রই ভঙ্গুর—স্থিতি নেই তার। তাই বোধ হয় মধুমাসের শেষ পর্য্যায়ে আসে দুর্য্যোগ—নেশা যায় টুটে—ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে হতভাগ্য প্রণয়ীদের অন্তর।

মার্গারিটা কারমেন ক্যানাসিনো নামে অল্পবয়স্কা এক স্প্যানিশ নর্ত্তকী ছবির রাজ্য হলিউডে এসে উপস্থিত হলো। এই ছোট্ট মেয়েটি কিন্তু বেশীদিন অপরিচিত রইলো না। অল্পদিনের মধ্যেই সে চিত্রজগতে বিখ্যাত হয়ে উঠলো রিটা হেওয়ার্থ নামে।

হলিউডে আসার আগেই এড্. জাডসন্ নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রিটা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হয়। কিন্তু বন্ধন দীর্ঘস্থায়ী হলো না—ঘটলো বিবাহ-বিচ্ছেদ।

ছলনাময়ী রিটা

রিটা দ্বিতীয়বার বিবাহ ক'রল বিখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা অর্‌সন ওয়েলস্‌কে। এই বন্ধনে অরসন্‌ ওয়েলস্‌ সুখী হলেন—রিটা লাভ করল তার প্রথম কন্যা সন্তান। কিন্তু হলিউডের বেশীর ভাগ অভিনেত্রীর মত রিটার প্রেমও একজনের ওপরেই আবদ্ধ রইলো না। তাই এ বিবাহবন্ধন স্থায়িত্বলাভ করলো না—হলো দু'জনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি।

এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় এক থেকে আর এক রোমান্সের মধ্য দিয়েই রিটার দিন কাটছিল। তারপর এলো সেই স্মরণীয় দিন—যে দিনটিতে রিটার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটলো প্রিন্স আলি খাঁর। রিটা তখন ফ্রান্সে ছুটি উপভোগ করছিলো।

এই সময়েই ইরাণের মহামান্য শাহ্‌ মহম্মদ রেজা [illegible]রূপমুগ্ধ হয়ে পড়লেন। তাই তাঁর ফ্রান্সে অবস্থানের শেষ রাত্রে তিনি রিটাকে 'ইডেন রকে' ডিনারের নিমন্ত্রণ জানালেন। প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে তিনি রিটার প্রত্যাশায় কাল গুণছেন, কিন্তু রিটার দেখা নেই। রিটা তখন ধনকুবের মহামান্য আগা খাঁ-তনয় প্রিন্স আলি খাঁর সাহচর্য্যে 'ফ্রেঞ্চ রিভেয়ারাতে' সময় কাটাচ্ছেন।

প্রিন্স আলি খাঁ ইতিপূর্ব্বে দু'বার বিয়ে করেছেন ও প্রত্যহ প্রায় অগুন্তি চিঠি আসে তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। শুধু তাই নয়, প্রায় শতাধিক রোমান্স তাঁর জীবনকে করেছে রোমাঞ্চিত।

রিটার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯৪৮ সালের জুলাইয়ে প্যারিসে এক পার্টিতে। রিটার পরিধানে ছিল লাল রঙের অপূর্ব্ব সুন্দর এক পরিচ্ছদ। প্রিন্স আলি খাঁ যখন নাচের আসরে নেমে এলেন লাল গাউন-পরা সেই মেয়েটিই হলো তাঁর নৃত্যসঙ্গিনী। এরপর রিটার ভবিষ্যৎ স্বামী কে হবেন এই নিয়ে যথেষ্ট আলোচনার সৃষ্টি হলো সংশ্লিষ্ট মহলে। কানাকানি থেকে আরম্ভ করে জানাজানি কিছুই আর বাকী রইলো না। ১৯৪৮ সালের আগষ্টের প্রথম সপ্তাহেই রিটা ও আলির প্রণয়-বার্ত্তা রাষ্ট্র হয়ে গেল চতুর্দ্দিকে। কিন্তু প্রিন্সকে এই প্রণয়লাভের জন্য যথেষ্ট ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় দেখাতে হয়েছে।

প্যারিসের এক সংবাদপত্র এই সময় মন্তব্য করলেন—"রিটা অবশেষে তার প্রেমপ্রত্যাশী বহুজনের মধ্যে থেকে একজনকে মনোনীত করেছে এবং সেই সৌভাগ্যবানটি হলেন প্রিন্স আলি খাঁ।" রিটার প্রেম-প্রত্যাশীদের মধ্যে তার ভূতপূর্ব্ব স্বামী অরসন ওয়েলস্‌ও ছিলেন, এবং সেই সূত্রে তিনি রোম ও 'ফ্রেঞ্চ রিভেয়ারা'তে যাতায়াতও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাই হতাশায় পরিণত হয়।

এরপরই, অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের আগষ্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেখা যায় রিটা ও প্রিন্স আলি মোটরে করে আনন্দ-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। স্পেনের নানান্‌ জায়গা ঘুরে তাঁরা মাদ্রিদ হয়ে লিসবনে এসে পৌছন। এঁস্তারিলের

আধুনিক বিশ্রামাগারে কিছুদিন কাটিয়ে তাঁরা বেয়ারিজে এসে উপস্থিত হলেন প্রিন্সের নিজস্ব বিমানে করে। এখানে হোটেল মিরামের-এ এক সপ্তাহ অবস্থান করলেন তাঁরা—লা চেম্বার ড্য এ্যামার-এ সাঁতার কেটে আর লে বার বেস্কে আকণ্ঠ মদ্যপানের মধ্যেই তাঁদের সময় কাটতে লাগলো। সাঁ সেবাষ্টিয়ানেও কিছুদিন থেকে তাঁরা ফিরে এলেন তাঁদের পুরোনো কাফেতে।

রিটার রোমান্স-স্ফুলিঙ্গে অনির্বান দীপ্তি সঞ্চারে দুর্জ্জয়সংকল্প প্রিন্স আলী খাঁ

এরপরই দেখা গেল রিটা 'কুইন এলিজাবেথ' জাহাজে হলিউড অভিমুখে যাত্রা করেছে আর আলি খাঁ আনন্দে ভরপুর মন নিয়ে 'মে ফেয়ারে' 'কোটে ড্য এ্যাজার'—তাঁর ছোট্ট কুটিরে ফিরে এসেছেন। তিনি তখন ভবিষ্যৎ কর্ম্মময়, আনন্দময় জীবনের পরিকল্পনায় ব্যস্ত।

ইতিমধ্যে রিটা ও আলির ইউরোপ সফর ও প্রণয়-বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দ্দিকে। কাগজে কাগজে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁদের প্রেমপর্ব্বের খবরা-খবর। তাঁদের বিবাহের তারিখ নিয়ে চতুর্দ্দিকে জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগলো। অবশেষে এই প্রত্যাশার সমাধান হলো—১৯৪৯ সালের ২৭শে মে 'ফ্রেঞ্চ রিভেয়া-রা'তে তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। সাংবাদিকরা এই বিবাহকে আখ্যা দিলেন—"Cinderella-Prince Charming Romance", যদিও উভয়েরই এর আগে দু'-দু'বার বিয়ে হয়েছে। প্রিন্স আলির পিতা মহামান্য আগা খাঁ এই বিবাহ উপলক্ষ্যে বলে পাঠালেন—"রিটা যদি তার কাজ (চলচ্চিত্রাভিনয়) চালিয়ে না যায় তবে তা' বড়ই দুঃখের কথা হবে। তার ক্ষমতা আছে; তা'ছাড়া এটা আলিকেও নিজের পায়ে ভর দিতে শেখাবে।"

বিবাহের সাত মাস পরেই রিটা জন্মদান করলো 'জেসমিন'-এর, তার দ্বিতীয় কন্যা। সারা বিশ্বে হৈ হৈ পড়ে গেলো আর একবার। এর আগের বিয়েগুলির দরুন প্রিন্সের দুই পুত্র ছিলো, তাই 'জেসমিন' ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদে তিনি উৎফুল্ল হয়ে বললেন 'আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি যা' চেয়েছিলাম ঠিক তাই হয়েছে।'

এই মিলনের প্রতিক্রিয়া কিন্তু আমেরিকাতে মোটেই সুবিধাজনক হয় নি। কোলারাডোর ডেমোক্র্যাট সিনেটর এড্উইন. সি. জনসন্ রিটার কাজের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ আনলেন। শুধু তাই নয়, রিটাকে তিনি 'দুর্নীতির মূর্ত্তিময়ী প্রচারিকা' আখ্যা দিলেন।

কিন্তু শিল্পী রিটার মন আবার শিল্পসৃষ্টির জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো। তাই জেসমিন জন্মাবার পরেই সে স্বামীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলো চিত্রজগতে পুনরায় যোগদানের জন্য। প্রিন্স ইতঃস্তত করতে লাগলেন। অনুমতি দিতে প্রিন্সের মন চাইলো না। রিটা কিন্তু ইতি-মধ্যেই কলম্বিয়া চিত্রপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে।

হলিউডে ফিরে রিটার আবার সুরু হলো শিল্পীজী-

রিটার স্বপ্ন হলো শেষ। রিটা-আলির প্রেমের স্বপ্ন-বিলাসের সমাপ্তি ঘটলো।

রিটা তার আইনজ্ঞদের জানালো, সে প্রিন্স আলির সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। সে আরও জানালো যে দীর্ঘদিন বিবেচনার পরই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রিটার কথায় বলতে গেলে—"আমি আমার সন্তানদের ও আমার জন্যে যে সুখের সংসার চেয়েছিলাম, সে আশা পূরণ হল না। আমার স্বামীর সামাজিক বাধ্য-বাধকতা ও আরও বহুবিধ প্রথার চাপে আমার মনের সাধ মিটলো না।" রিটার স্নেহ-ভালোবাসা স্বামীদের চেয়ে তার সন্তানদের ওপরই বেশী। তাই জেসমিনের লালন-পালনের অধিকার নিয়ে তাঁদের দু'জনের মধ্যে বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। কার ওপর এই অধিকার বর্ত্তায় তা দেখবার জন্য বিশ্বের প্রতিটি লোক উন্মুখ হ'য়ে উঠেছিলেন।

রিটার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে প্রিন্স আলিকে প্রশ্ন করা হলে মৃদু হেসে তিনি বলেন "আমি কিছুই বলতে পারি না।" এদিকে প্রিন্সের পক্ষের আইনজ্ঞও জানান যে, রিটা যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করে তাহ'লে প্রিন্সের পক্ষ থেকেও অনুরূপ একটি বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন দাখিল করা হবে।

সম্প্রতি এক খবরে প্রকাশ যে প্রিন্স আলির কাছ থেকে পুনর্মিলনের যে প্রস্তাব পেয়েছিল রিটা তা' প্রত্যাখ্যান করেছে। রিটা হলিউড থেকে রেনো (নেভাদা) যাবার পরিকল্পনা করে। সেখানে গিয়েই সে বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছে। রিটা আরও বলে যে, যতদিন পর্য্যন্ত না প্রিন্স আলির সঙ্গে তার আইনতঃ বিচ্ছেদ হচ্ছে ততদিন সে প্রিন্সের সঙ্গে দেখা করবে না।

রিটা ও আলির বিবাহ তাঁদের জীবনে বিবাহ নয়—বিড়ম্বনা। প্রেমের মোহে অন্ধ হয়ে তাঁরা ছুটেছিলেন। তাই বোধ হয় তাঁদের এই দাম্পত্য-জীবন সমাপ্তি লাভ করলো এত অল্পকালের মধ্যেই। কেন যে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলো তা' নিয়েও নানা গুজব রটতে লাগলো কেউ কেউ বললেন, ইদানীং আলি নাকি রিটাকে এড়িয়ে চলতেন। শুধু তাই নয় ব্রডওয়ের বিখ্যাত নিগ্রো নর্ত্তকী ক্যাথ্‌রিন ডানহাম্ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় প্রিন্স আলি তাকে (ক্যাথ্‌রিনকে) অলঙ্কারের উপহারে ভরিয়ে তোলেন। এতে রিটার ক্ষুব্ধ হবারই কথা।

আর একদল বললেন,—রিটার ভূতপূর্ব্ব স্বামী অরসন্ ওয়েলস্ নাকি রিটাকে ফিরে পাবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছেন। রিটার মনেও নাকি তাঁর জন্য আজও জেগে আছে এক কোমল প্রেমময় অনুভূতি। এছাড়াও, এই বিয়ের দরুনই রিটার শিল্পীজীবনে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি হয়েছে—একথাও অনেকে বললেন। বিবাহিতা বলে রিটা নিশ্চয়ই এ বাধা সহ্য করতে রাজী নয়। তার ওপর আলিকে অনেক সময় নানারকম সরকারী কাজে উপস্থিত থাকতে হতো' যা' নাকি রিটার মত মেয়ের মেজাজে সয় না।

কিছুদিন আগেই শিকারের উদ্দেশ্যে আলি খাঁ আফ্রিকা ভ্রমণে যান। রিটা কন্যার সঙ্গে বাস করার অভিপ্রায়ের অজুহাতে বাড়ীতেই থেকে যায়। শুধু তাই নয় আলির পিতা মহামান্য আগা খাঁ রিটাকে এক পার্টিতে আমন্ত্রণ জানালে রিটা সরাসরি তা' প্রত্যাখ্যান করে বসলো। বিচ্ছেদের বহ্নি ধূমায়িত হতে থাকে—বিরক্ত হয়ে ওঠেন প্রিন্স আলি। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দেন, রিটা যদি হলিউডে ফিরে অভিনয়-জীবন সুরু করলেই আনন্দিত হয় তবে সে স্বচ্ছন্দে সেখানে ফিরে যেতে পারে। তাদের মধ্যে ঘটলো বিচ্ছেদ—রিটা ফিরে গেল হলিউডে। রহস্যময়ী নারীর জীবননাট্যে প্রেমের অঙ্কে আর একবার যবনিকা পড়লো।

প্রিন্স নতুন প্রেয়সীর সন্ধানে ঘুরতে লাগলেন বিভিন্ন দেশে এবং পরিশেষে হলিউডেই তা' খুঁজে পেলেন। বিখ্যাত অভিনেত্রী অলিভিয়া ডি হ্যাভিল্যাণ্ড-এর 'অস্কার'-বিজেতা ভগ্নী অভিনেত্রী জোয়ান ফন্টেন হলেন তাঁর নবতমা মানসীপ্রিয়া।

নাটকীয়ভাবে যে-প্রেমের উদ্ভব হয়েছিল একদিন তা' শেষও হ'ল নাটকীয়ভাবে।

ষ্টুডিও সংবাদ

দর্পচূর্ণ

শ্রীমতী কানন দেবীর প্রযোজনায় শ্রীমতী পিকচার্সের পরবর্ত্তী ছবি 'দর্পচূর্ণ'র চিত্রগ্রহণ ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হয়ে এসেছে। খ্যাতনামা আলোক-চিত্রশিল্পী দেওজীভাই আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন। সুর-সৃষ্টি ও সম্পাদনা করছেন যথাক্রমে কালিপদ সেন ও কমল গাঙ্গুলী। শিল্প-নির্দ্দেশনার ভার রয়েছে সত্যেন রায় চৌধুরীর ওপর। ছবিটি পরিচালনা করছেন 'শ্রীমতী পিকচার্স ইউনিট'। বিভিন্নাংশে রূপদান করছেন কানন দেবী, রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী, পদ্মা দেবী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, কালী সরকার, বিপিন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। নারায়ণ পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি আগামী দিনের অন্যতম স্মরণীয় অবদান হয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানাবে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র

গোপাল ভাঁড়ের পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি ছবি তোলার কাজ অর্দ্ধেক এগিয়ে এনেছেন। কলাকুশলীদের মধ্যে কাজ করছেন আলোকচিত্রে সুধীর দাস, শিল্পনির্দ্দেশনায় শুভো মুখোপাধ্যায় এবং সুর-যোজনায় উমাশঙ্কর। অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে আছেন পাহাড়ী সান্ন্যাল, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, মলিনা, সমীরকুমার, সমীর মজুমদার, উৎপল, তুলসী চক্রবর্ত্তী, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মায়াকানন

প্রমথেশ বড়ুয়ার অসমাপ্ত ছবি 'মায়াকানন'-এর চিত্রগ্রহণ তাঁরই সহকারী বিভূতি চক্রবর্ত্তী আরম্ভ করেছেন। বড়ুয়ার প্রতিভূরূপে অভিনয় করছেন অবনী মজুমদার এবং অন্যান্য শিল্পীরা হলেন প্রভাত সিংহ, শিবপ্রসাদ, রাধা-রাণী, অঞ্জলি রায়, ডুলিয়া দত্ত, মণি ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যো-পাধ্যায়, মনোরঞ্জন প্রভৃতি। সুর দিয়েছেন অনিল বাগচী, গীত রচনায় আছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এবং নৃত্য পরিচালনায় পিটার গোমেস।

অনিবার্য্য

ইষ্ট এণ্ড ফিল্মসের পরিবেশনায় চৈতালী চিত্র প্রতি-ষ্ঠানের প্রথম চিত্র-নিবেদন 'অনিবার্য্য' কয়েকটি চিত্রগৃহে অবিলম্বে মুক্তিলাভ করবে। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস একটি মধ্যবিত্ত সংসারে যে আলোড়নের সৃষ্টি করল তারই অবধারিত পরিণাম নিয়ে 'অনিবার্য্যে'র কাহিনী গড়ে উঠেছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন রতন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালক অনিল বাগচীর সুরসংযোজনা চিত্রের অন্যতম সম্পদ। বিভিন্ন ভূমিকায় অনুভা, পদ্মা, রেণুকা, বিমান, বিপিন গুপ্ত, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণীব্রত, তুলসী চক্রবর্ত্তী, প্রীতিধারা, রেবা, অপর্ণা প্রভৃতিকে দেখা যাবে। চিত্রগ্রহণ ও শিল্প-নির্দ্দেশনায় আছেন যথাক্রমে বিশু চক্রবর্ত্তী ও বীরেন নাগ।

মাকড়সার জাল

যোগেশ চৌধুরীর রচনা অবলম্বনে নীলকণ্ঠ পিক-চার্সের 'মাকড়সার জাল' ছবিখানির চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। পরিচালনা করেছেন পশুপতি কুণ্ডু এবং অভি-নয় করেছেন বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, হরিধন, আশু,নৃপতি, বেচু সিংহ, অনুভা, অপর্ণা, রেবা, লীলাবতী, শান্তি সান্ন্যাল প্রভৃতি। সুর-যোজনা করেছেন গিরীণ চক্রবর্ত্তী।

কবি চন্দ্রাবতী

আড়াইশো বছর আগেকার মহিলা-কবি চন্দ্রাবতীর জীবন কাহিনী অবলম্বনে উদয়ন পিকচার্সের প্রথম অর্ঘ "কবি চন্দ্রাবতী" নির্ম্মীয়মান চিত্রাবলীর অন্যতম। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন অনুভা গুপ্তা, আর অপরাপর ভূমিকায় আছেন পাহাড়ী, উত্তমকুমার, তুলসী চক্রবর্ত্তী

প্রভৃতি। ছবিখানি পরিচালনা করছেন হীরেন নাগ এবং সুর দিচ্ছেন কালিপদ সেন।

বিষবৃক্ষ

ষ্টুডিও এন্সের "বিষবৃক্ষ" নবগঠিত ইম্পিরিয়াল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় মুক্তি-প্রতীক্ষায় রয়েছে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন শান্তিপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এবং অভিনয় করেছেন প্রণতি ঘোষ, পদ্মা, শান্তি সান্ন্যাল, লীলাবতী, মিহির ভট্টাচার্য্য, বেচু সিংহ, শ্যাম লাহা প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বীরেন চট্টোপাধ্যায়।

কলঙ্ক

ইন্দিরা পিকচার্সের প্রথম ছবি "কলঙ্ক"-র প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মলেন্দু ঘোষ নিজেরই গল্প নিয়ে ছবিখানি পরিচালনা করবেন এবং তত্ত্বাবধান করবেন নির্ম্মল তালুকদার। ছবিখানি তোলা হবে ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে।

আন

গত ১৮ই জুলাই বোম্বাইয়ের বিখ্যাত প্রযোজক মেহবুবের 'আন' চিত্রখানির বিশ্ব-প্রদর্শনী লণ্ডনের 'রিয়াল্টো'তে সম্পন্ন হয়েছে। চিত্রখানি হিন্দীতে গৃহীত কিন্তু সাবটাইটেল আছে ইংরাজীতে। ১লা আগষ্ট ছবিখানি একযোগে ভারতের বহু চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। হিন্দী ও তামিল সংস্করণ সমাপ্ত হয়েছে এবং ইতি-মধ্যে এর প্রিণ্ট বোম্বাইয়ের পথে অগ্রসর হয়েছে। দীর্ঘদিনের সাধনায় এই 'আন' ছবি আজ মুক্ত হতে চলেছে। প্রকাশ, তিন বছরেরও বেশী সময় লেগেছে ছবিখানি সমাপ্ত করতে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ফেয়ারডুন এ ইরাণী 'কলার ফিল্ম'-এর যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন 'আন'-এর প্রতিটি দৃশ্য বহন করবে তারই বিস্তৃত পরিচয়। প্রখ্যাত সুরকার নৌসাদ পরিচালনা করেছেন 'আন'-এর সঙ্গীত। প্রকাশ, অদ্যাবধি নৌসাদ যতগুলি চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তার মধ্যে 'আন'-এর

সঙ্গীত পরিচালনা হয়েছে শ্রেষ্ঠতম এবং এর গানগুলি হয়েছে বছরের সেরা গান।

শাপমোচন

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে এস এস পিকচার্সের 'শাপমোচন' ছবিখানির কাজ হচ্ছে। রূপশ্রী দেবী নামে এক নবাগতা শিল্পীকে এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে।

হরনাথ পণ্ডিত

বীরেশ্বর কুণ্ডুর প্রযোজনায় এবং পঞ্চানন চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে 'হরনাথ পণ্ডিত'-এর চিত্রগ্রহণ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। শিক্ষাব্রতীর আদর্শ ও তার জীবনের সমস্যা নিয়ে এই কাহিনীটি রচনা করেছেন বিমল চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, সদানন্দ চক্রবর্ত্তী, সন্ধ্যা, বাণী গাঙ্গুলী, নিভাননী, তারা ভাদুড়ী, শিবকালী প্রভৃতি। সুর দিচ্ছেন সত্যদেব চৌধুরী।

পথ নির্দ্দেশ

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে 'পথ নির্দ্দেশ'-এর চিত্রগ্রহণ এ্যাসোসিয়েটেড প্রোডাকসন্স ষ্টুডিওতে সমাপ্তপ্রায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন মনীষা দেবী, সুনন্দা দেবী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন, খগেন পাঠক, শিশির বটব্যাল, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মন্ত্রশক্তি

অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি'-র পুনর্নির্ম্মাণ করছেন রসিক পিকচার্স, যাঁরা সম্প্রতি রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে পৌরাণিক কাহিনী 'ধ্রুব'র চিত্রগ্রহণ আরম্ভ করেছেন। দুখানি ছবিই 'চিত্র-পরিবেশক' নামক নবগঠিত প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিবেশিত হবে

ভানুমতী

কল্পনা ছায়া মন্দির বিক্রমাদিত্যের কাহিনী অবলম্বনে 'ভানুমতী' নামক একখানি চিত্র-নির্ম্মাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। পরিচালনা করবেন বিনয় ঘোষ। বর্ত্তমানে এই চিত্রের পরিচালক প্রাথমিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

রাইকমল

তারাশঙ্করের 'রাইকমল' অবলম্বনে বড়ুয়া চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা সমাপ্ত হয়েছে।

বিজন সেনের পরিচালনায় এই মাসেই টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হবে।

'আন' চিত্রের একটি দৃশ্যে শ্রীমতী নীলা

সাত নম্বর কয়েদী

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশান ষ্টুডিওতে তোলা হচ্ছে এস এম প্রোডাকসন্সের 'সাত নম্বর কয়েদী'। সজ্জন বলে সম্মানিত কেউ হঠাৎ অনেক দিন আগেকার একজন দাগী কয়েদী বলে জানাজানি হলে তখনও সমাজ তাকে ঠাঁই দেবে কিনা এই রকম এক সমস্যা ছবিতে ফুটিয়ে তোলার জন্য পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত চেষ্টা করছেন। মণি বর্ম্মার লেখা এই কাহিনীটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় মলিনা দেবী প্রভৃতি। কালিপদ সেন সুর-যোজনার ভার পেয়েছেন। ছবিখানি পরিবেশনা করবেন ছায়াবাণী লিমিটেড।

প্রশ্ন

প্রথম ছবি 'মীমাংসা'র পর বি আর প্রোডাকসন্স'

অতঃপর কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে 'প্রশ্ন' তোলা আরম্ভ করেছেন। ছবিখানি তুলছেন তরুণ পরিচালক শান্তি-রঞ্জন। সুরযোজনা ও নৃত্য পরিকল্পনার জন্যে নিযুক্ত হয়েছেন যথাক্রমে খগেন দাশগুপ্ত ও পিটার গোমেস।

ভোর হ'য়ে এলো

অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়বিধ্বস্ত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবনকে বিড়ম্বিত ক'রে জড়িয়ে আছে আশাভঙ্গ, দুঃখ আর লাঞ্ছনা. দুঃসহ অভাব অনটন এবং অবমাননা। তবু তারই মধ্যে জেগে থাকে ছোট্ট আশা, সামান্য স্বপ্ন দুঃখ অনটনকে হাসিমুখে বরণ করার অজেয় সাধনা; জেগে থাকে সামান্যতে সন্তুষ্ট হওয়ার অসামান্য মোহ, দুর্ব্বার জীবন-সংগ্রামে ক্ষণিকের স্বস্তি ও নিশ্চিন্তত' লাভের ক্ষীণ আশা, ভবিষ্যতের সুখকল্পনা। আজকের প্রতিপদে বিড়ম্বিত মধ্যবিত্ত সমাজের অতি অন্তরঙ্গ এবং বাস্তবাভি-মুখী কাহিনী নিয়ে রচিত 'ভোর হ'য়ে এলো' ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিও এবং ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে। কাহিনী রচনা করেছেন 'প্রত্যাবর্ত্তন'-খ্যাত সলিল সেনগুপ্ত, পরিচালনা করছেন 'পরিবর্ত্তন' ও 'বরযাত্রী'-খ্যাত সত্যেন বসু, সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন সলিল চৌধুরী। বিভিন্ন ভূমিকা রূপায়নে আছেন অভি ভট্টাচার্য্য, শোভা সেন, প্রণতি ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু প্রভৃতি। চিত্রটির পরিবেশক প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ।

নবগঠিত ওয়েষ্টার্ণ ফিল্মস লিঃ শীঘ্রই এঁদের প্রথম চিত্র-নিবেদন 'খুনী'র চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আরম্ভ করবেন। এর রচয়িতা শিশির চক্রবর্ত্তী, চিত্রনাট্য ও সংলাপের ভার নিয়েছেন পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ধীরেশ ঘোষ, সহযোগিতা করবেন প্রহ্লাদ গঙ্গোপাধ্যায়, সুর-সংযোজনা করবেন কৃতী সঙ্গীত পরিচালক কালিপদ সেন। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন—শিপ্রা দেবী, সন্ধ্যা, সাবিত্রী, নীলিমা, কানু, বিনয়কুমার, অজিত ঘোষাল প্রভৃতি শিল্পী-বৃন্দ।

চিতা বহ্নিমান

চিত্রশ্রী লিঃ-এর বহু প্রতীক্ষিত কথাচিত্র 'চিতা-বহ্নি-মান' মুক্তির পথে। কাহিনী রচনা করেছেন ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। ভূমিকালিপিতে আছেন: অভি ভট্টাচার্য, অনুরাধা দেবী, ভানু ব্যানার্জী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, ফণী বিদ্যাবিনোদ, সুদীপ্তা রায়, বলীন সোম, স্বাগতা চক্রবর্ত্তী, ও নিভাননী প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনায় উমাপতি শীল আর ছবির প্রযোজক ধীরেন শীল নিজেই ছবিটি পরিচালনা ক'রেছেন। শ্রী ও অন্যান্য জনপ্রিয় চিত্রগৃহের এটি পরবর্ত্তী আকর্ষণ।

পরিচালকের বক্তব্য

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের চিত্ররূপ সম্বন্ধে কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীনির্ম্মল দত্ত লিখিত একটি অনুরোধপত্র পত্রস্থ হইয়াছে আনন্দবাজার পত্রিকায়। পত্রলেখককে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাইয়া নিবেদন করি যে, চিত্রগ্রহণের পূর্ব্বেই আমি অবহিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। মহারাজা কৃষ্ণ-চন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ী আমি আমার আর্ট-ডাইরেক্টর এবং ষ্টিল-ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে করিয়া চিত্রগ্রহণের পূর্ব্বেই পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। এই চিত্রের বহির্দৃশ্য তুলিবার প্রয়োজনে অভিনেতা ও অভি-নেত্রী এবং আমার ইউনিটসহ পুনরায় আমর কৃষ্ণনগরে যাইবার পরিকল্পনা করিয়াছি। এজন্য নদী বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীসৌরীশচন্দ্র রায়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক পত্র দিয়াছিলাম। সেই পত্রের উত্তরে অবারিত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ও যে উৎসাহ-পত্র তিনি দিয়াছেন তাহার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। অপর ইতিহাসকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া ঐতিহাসিক ছবি তোলা সম্বন্ধে পত্রলেখক যাহা লিখিয়াছেন—সে সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই যে নিজে একজন লেখক হইয়াও যে বিষয়ে আমি অনধিকারী তাহাতে আমি হস্তক্ষেপ করি নাই; বরং যিনি ইতিপূর্ব্বে 'মাইকেল', 'রাণী ভবানী', 'মহারাজ নন্দকুমার' প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র অঙ্কনে

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছেন সেই খ্যাতিমান স্বনামধন্য কবি বিমল চন্দ্র ঘোষের সহযোগিতা ও অক্লান্ত চেষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই জটিল ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর বাংলার বিক্রমাদিত্য কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন চরিত্র যতটা সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে রচিত হইয়াছে। আমার নিজের রচনা নয়; সুতরাং আমি মোহমুক্ত হইয়া এই আত্মবিশ্বাস লইয়া বলিতে পারি—কবি বিমল চন্দ্র ঘোষ যে জীবন-চরিত্র রচনা করিয়াছেন—যদি সেলুলয়েডের উপর আমি তাহার পঞ্চাশ ভাগও যথাযথভাবে রূপদান করিতে পারি এবং যদি ঠাকুরের কৃপা আমার উপর থাকে তাহা হইলে শুধু নদীয়াবাসী কেন সমগ্র বঙ্গবাসীকে নিশ্চিত আনন্দ দান করিতে পারিব। ইতি—

সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়
৫।৭।৫২

—মহারাজার পত্র—

রাজবাটি, কৃষ্ণনগর
২৯।৪।৫২

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পেয়ে খুশী হলুম। আমি আগামীকাল জরুরী কাজে কলকাতা যাচ্ছি। আমার সঙ্গে বৃহস্পতিবার সকালে দেখা করবেন। যদি অসুবিধা থাকে তবে এখানেই অবশ্য দয়া করে আগামী রবিবার দিন আসবেন। আমি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করে রাখবো। আপনার চেষ্টা সফল হোক—আমার সহযোগিতা অবারিত থাকলো জানবেন।

আশা করি ভাল আছেন। আন্তরিক প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়
শ্রীসৌরীশ চন্দ্র রায়।

শুভ-মহরৎ

সিসটার নিবেদিতা

গত ১১ই জুলাই ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে চিত্রনাট্যম-এর আগামী আকর্ষণ 'সিস্‌টার নিবেদিতা'র শুভ-মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রখানির কাহিনীকার গোপাল ভট্টাচার্য্য, পরিচালনা করবেন বিধায়ক ভট্টাচার্য্য। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীকালিপদ বিদ্যারত্ন জ্যোতিষার্ণব এবং প্রধান অতিথি ছিলেন কমল মিত্র।

জাতিস্মর

গত ২রা জুলাই ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে হিমালয়ান পিকচার্স 'জাতিস্মর'-এর মহরৎ সম্পন্ন করেন দেবকীকুমার বসুর পৌরোহিত্যে। মাননীয় বিচারপতি পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, জে কে ঠক্কর প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ভাইস চান্সেলর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও এ্যাডভোকেট অতুল গুপ্ত আশীর্ব্বাণী পাঠান। 'সারথী' নামে কয়েকজন মিলে ছবিখানি পরিচালনা করবেন এবং সম্ভবতঃ সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা সঙ্গীত পরিচালনা করবেন।

ক্রিষ্টিন চার্টারিস্-এর

হলিউড ডায়েরী

★

টেলিভিশন ও সিনেমা

হলিউডের চিত্রশিল্প এখন টেলিভিশনকে সবচেয়ে বেশী ভয় পায়, যদিও শিল্পপতিদের কাছ থেকে মাঝে মাঝেই শোনা যায় যে টেলিভিশন সিনেমার কোনও ক্ষতি করতেই পারবে না। ষ্টুডিও মহলে টেলিভিশনকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কিও বেশ চলে। যেমন সম্প্রতি এক প্রযোজক বললেন, 'দশ বছর আগে বাইরে গিয়ে ছবি দেখতে একজনের তিরিশ সেন্ট লাগতো, আজ বাড়ীতে ব'সে টেলিভিশনে ছবি দেখতে তিনশ' ডলার লাগে।'

যাই হোক, এই টেলিভিশনের হাত থেকে দর্শককে ছবিঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য হলিউডের কম চিন্তা নেই। কি ধরণের ছবি করলে দর্শকের ভাল লাগবে, তাই নিয়ে রীতিমতো গবেষণা চলছে। আপাততঃ মনে হয় ভাল গল্প, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর রঙীন ছবি দিয়ে দর্শকদের ধ'রে রাখার চেষ্টা চলছে।

কারণ, আজ হলিউডের প্রতিটি ষ্টুডিওর বিভিন্ন দল পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং সেইসব দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পরিবেশে ছবি তুলতে সুরু করেছেন।

রঙীন ছবি তোলার হার বৃদ্ধি

আর রঙীন ছবির কথা না বলাই ভাল। এখানকার অভিমত আর এক বছরের মধ্যে শতকরা নব্বইটি ছবিই রঙীন হবে। মেট্রোর ৮৩টি ছবির মধ্যে ৩৯টি, প্যারামাউন্টের ৪৫টির মধ্যে ৩৩টি, ইউনাইটেড আর্টিষ্টের ৪২টির মধ্যে ১৬টি এবং ওয়ার্ণারের ৩৩টির মধ্যে ২৭টি রঙীন ছবি তোলার ঝোঁক দেখে বোঝা যায় হলিউড কি পরিমাণ রঙীন ছবি তোলার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছে।

হলিউডের এভাবে রঙীন ছবি তৈরি করা, দূরদেশে গিয়ে ছবি তোলার আর এক অর্থ হলো ব্যবসার দিক দিয়ে অন্যান্য দেশের ছবিকে সরিয়ে সমস্ত দেশের ছবির বাজার কুক্ষিগত করা। অবশ্য ছবি দর্শকদের আনন্দ দিতে পারলেই এটা সম্ভব। গত বছরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় আমেরিকার ছবি অত্যন্ত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। ইংলণ্ডে ছবির বাজারে প্রতিযোগিতা থাকা সত্ত্বেও গত বছরে আমেরিকান ছবি এককোটি তেষট্টি লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন করেছে। এর আগের বছরের তুলনায় এই উপার্জ্জন অনেক বেশী এবং ই, ডি, পরিকল্পনার সাহায্যে সকলেই আশা করেন যে এ বছরে আমেরিকান ছবি আরও বেশী অর্থ উপার্জ্জন করতে

মার্কিন্ চিত্রজগতের জনপ্রিয়া অভিনেত্রী ইভন্-ডি-কার্লো

সক্ষম হবে। ওয়ার্ডার ষ্ট্রীটের অফিসের আশা যে এ বছর হয়তো এককোটি পঁচাত্তর লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী আমেরিকান ছবি উপার্জ্জন করতে পারবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় গত বছর ৭৬০টি আমেরিকান ছবি দেখানো হয়, যার মধ্যে ৩৪৭টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি। অষ্ট্রেলিয়ায় যত ছবি দেখানো হ'য়েছে তার মধ্যে আমেরিকান ছবির অংশ হলো শতকরা ৮১'৩টি। ব্রিটিশ ছবির সংখ্যা এবছর সামান্য ক'মে গিয়ে ৫৯-এ দাঁড়ায় এবং অন্যান্য সমস্ত দেশের ছবির সংখ্যা ছিল মাত্র ২১টি।

'ড্রাইভ-ইন' সিনেমার জনপ্রিয়তা

টেলিভিশন বা অন্যান্য আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও 'ড্রাইভ-ইন' সিনেমার জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন কি বড় বড় সহরে যেখানে টেলিভিশনের জাল ছড়ানো আছে, সেখানেও এই 'ড্রাইভ-ইন' জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তার বোধ হয় এই কারণ যে, প্রাকৃতিক আবহাওয়া ভাল থাকলে লোকে আর ঘরে ব'সে থাকতে চায় না।

পাকা চিত্রগৃহে আমেরিকায় প্রায় এককোটি কুড়ি লক্ষ লোকের দিনে ছবি দেখার ব্যবস্থা আছে, আর 'ড্রাইভ-ইন' থিয়েটারে মোট আশি লক্ষ দর্শক ধরে। হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে, গত বছরের তুলনায় এ বছরে শতকরা আঠারো ভাগ 'ড্রাইভ-ইন' থিয়েটারের উপার্জ্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকের মতে 'ড্রাইভ-ইন' থিয়েটারের জনপ্রিয়তার জন্য পাকা চিত্রগৃহের জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছে।

সেসিল বি ডি' মিলি-র পরবর্ত্তী ছবি

দিন দিন ছবির পেছনে অর্থব্যয় এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে আর ছবি ক'রে লাভ নেই; এই স্থির ক'রে সেসিল বি ডিমিল প্রোডাকসন্স এঁদের ডিরেক্টারবর্গের কাজ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। ডিমিলের 'স্যামসন এ্যাণ্ড ডেলাইলা', 'দি গ্রেটেষ্ট শো অন দি আর্থ'-এর মত পর পর এত বড় দুটি ছবির প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনের পরও এই কথা শুনে অনেকে আশ্চর্য্য হয়েছেন; অনেকে দুঃখিতও হয়েছেন এই ভেবে যে, ডিমিলের অবসর গ্রহণের সময় এখনও আসে নি।

ডিমিল অবশ্য চিত্রশিল্প থেকে অবসর গ্রহণ করার সঙ্কল্প করেন নি। তিনি এখন তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরী করছেন এবং একাধিক সভায় জানিয়েছেন যে তাঁর পরবর্ত্তী ছবি হবে 'টেন কমাণ্ডমেণ্টস্।' এই ছবিটি নির্ব্বাক যুগে ১৯২৩ সালে তিনি আর একবার তুলেছিলেন।

মার্কিন ছায়াছবির বাণিজ্য-চুক্তি

সাম্প্রতিক ইটালীর সঙ্গে আমেরিকার এক চুক্তির ফলে স্থির হয়েছে যে, যেসব মার্কিন চিত্র-প্রতিষ্ঠান ইটালীতে ছবি তুলছেন তাঁরা এখন বারো লক্ষ ডলার আমেরিকায় পাঠাতে পারবেন। তাছাড়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠান উপার্জ্জনের শতকরা পাঁচ ডলারও আমেরিকায় পাঠাতে পারবেন।

আমেরিকা ও বেলজিয়ামের সঙ্গে এক চুক্তির ফলে প্রতি বছর ২৫১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য মার্কিন ছবি ও ৯টি re-issue বেলজিয়ামে রপ্তানী হ'তে পারবে। মোট উপার্জ্জনের অর্দ্ধেক টাকা আমেরিকায় পাঠনো চলবে। বাকী অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে ছবি 'প্রিণ্ট' করার খরচ প্রভৃতি হবে এবং অবশিষ্টাংশ এই আমেরিকান কোম্পানীর বেলজিয়ামের প্রতিষ্ঠানে যাবে।

রিটার জনপ্রিয়তার পুনরুদ্ধার

রিটা হেওয়ার্থের ছবিকে আবার জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কলম্বিয়া অর্থব্যয়ের জন্য সামান্যও চিন্তা করছে না। রিটার 'এফেয়ার্স ইন ত্রিনিদাদ' শেষ হয়ে গেছে এবং এখন 'স্যালোম' ছবিটি তোলা হবে। শোনা যাচ্ছে যে কলম্বিয়া নায়কের ভূমিকায় মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার থেকে ষ্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জারকে ধার ক'রে আনবেন। রিটার নিজস্ব ধারণা নায়কের (রোমান সেনাধ্যক্ষ) জন্য মেট্রো ষ্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জারকে ধার দিতে কোনও আপত্তি করবে না। চার্লস লটন সাজবেন রাজা হেরল্ড ও মরিস [illegible] হবেন তাঁর মন্ত্রী।

ব্রিটেন থেকে

★

লিখছেন মলি স্কট

এমাসে আপনাদের আর এখানকার চিত্রশিল্পের বেশী খবর দিতে পারছি না; কারণ খবর বলতে সেই একই কথা: এখানকার চিত্রশিল্পের দুর্য্যোগ আর দুরবস্থা ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌দের মতে গত বছরে এখানকার লোকেরা কম ছবি দেখেছে এবং গড়ে পনের দিনে মাত্র একবার ছবি দেখেছে। তার আগের বছরে গড়ে দশদিনে একবার ছবি দেখেছে। বর্ত্তমান বছর থেকে ছবি দেখার সংখ্যা আরও কমে যাবে।

'মহাত্মা গান্ধী'র জীবনী চিত্র

মহাত্মা গান্ধীর জীবন-কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে যে ছবি তোলার ব্যবস্থা প্রযোজক গ্যাব্রিয়েল প্যাস্কেল করছিলেন, তার সমস্ত ব্যবস্থা শেষ হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকায় প্যাস্কেল এখানকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এলেক গাইনেসকে মনোনীত করেছিলেন; কিন্তু গাইনেস-ই শেষ পর্য্যন্ত এই ছবিতে অভিনয় করতে সম্মত হলেন না। গাইনেসের মত হোলো যে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য একজন ভারতীয় অভিনেতাকেই মনোনীত করা উচিত। তা ছাড়া এই ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য মহাত্মা গান্ধীর বিরাট ব্যক্তিত্বের দিকে এমন দৃষ্টি দিতে হবে যার ফলে অভিনয় করার সুযোগ অনেকাংশে কমে যাবে।

প্যাস্কেল গাইনেসের মতামত ভেবে এখন স্থির ক'রেছেন যে একজন ভারতীয় অভিনেতাকেই মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকায় নির্ব্বাচিত করবেন। তবে কে যে অভিনয় করবেন তিনি এখনও পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করতে পারেন নি। হয়ত খুব শীঘ্রই একজন উপযুক্ত অভিনেতার (নবাগত) সন্ধানে তিনি ভারতবর্ষে যাবেন।

আপাততঃ যা শোনা যাচ্ছে তাতে মনে হয় চার্লস বয়ার ও রবার্ট নিউটন এই ছবিতে অভিনয় করবেন।

ব্রিটিশ চিত্রজগতের উদীয়মানা অভিনেত্রী প্যাট্রিসিয়া রক

ইউরোপীয় অভিনেত্রী সঙ্ঘ

ইউরোপের অভিনেতৃসঙ্ঘ ২য় বার্ষিক সম্মেলনে এখানে মিলিত হ'য়ে ইউরোপীয় চিত্রশিল্পকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রত্যেক দেশের সরকারকে অনুরোধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। আজ প্রতিযোগিতায় হলিউডের সঙ্গে দাঁড়ানো কঠিন, সমস্ত ইউরোপ আমেরিকার ছবিতে ছেয়ে ফেলেছে। তার ফলে ইউরোপের কোনও দেশেই সেখানকার চিত্রশিল্প মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না; কোনও রকমে প্রাণ ধারণ ক'রে আছে মাত্র। ইউরোপের অভিনেতার অর্দ্ধাংশমাত্র

আজ ছবিতে অভিনয় করছেন, অপর অর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণ বেকার।

ফরাসী অভিনেতাদের মুখপাত্র এম. জঁা দেকাস্তে পরবর্ত্তী বছরের জন্য সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি বলেন যে, হলিউডের ছবির ক্রম-বর্দ্ধমান আ্যদানীর জন্য ফরাসী ছবির নির্ম্মাণ প্রতি বৎসর কমে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, শীঘ্রই আমেরিকার চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিরা ফ্রান্সে আসছেন সরকারকে অনুরোধ করতে যেন আমেরিকার ছবির ওপর থেকে সমস্ত বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া হয়। বর্ত্তমানের চুক্তিমত বছরে ১২০টি আমেরিকার ছবি ফরাসী ভাষায় 'ডাব' করা যাবে; কিন্তু আমেরিকা চায়, যত ছবি খুশি তাঁরা ফরাসী ভাষায় 'ডাব' করবেন। দেকাস্তে বলেন যে, সকলে তাঁদের কম্যুনিষ্ট আখ্যা দেন। তাঁরা কম্যুনিষ্ট ন'ন, তাঁরা অভিনেতা, নিজেদের প্রাণ ও দেশের সংস্কৃতি রক্ষার জন্যই তাঁরা সংগ্রাম করছেন।

গ্যাব্রিয়েল পাস্কাল ও জিন সিমন্স

ব্রিটিশ ছবির প্রাধান্য

প্রযোজক জে. আর্থার র‍্যাঙ্ক সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলেন যে, পৃথিবীর ছবিঘরে আমেরিকার প্রভুত্ব আর নেই। র‍্যাঙ্ক গ্রুপের এখানে যত ছবিঘর আছে, অন্যদেশে তার সংখ্যা আরও অনেক বেশী এবং আমেরিকা ছাড়া অন্য সব দেশে ব্রিটিশ ছবির চাহিদা আছে। কিন্তু তবুও 'রেড সুজ' ছবিটা এর মধ্যেই আমেরিকা থেকে ত্রিশ লক্ষ ডলার পেয়েছে এবং শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ লক্ষ ডলার পাবে বলে তিনি আশা করেন।

ব্রিটেনে হলিউড-তারকা

হলিউডে থাকাকালীন এরল ফ্লিন আর ক্লার্ক গেবলের মধ্যে বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল না। কিন্তু এখন এই দুই হলিউডের অভিনেতা এখানে ছবি করতে এসে অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'য়ে পড়েছেন। এরল ফ্লিন এসেছেন 'মাষ্টার অব ব্যালেণ্ট্রে' ছবিতে অভিনয় করতে, ক্লার্ক গেবল ফ্লিনের অতিথি হ'য়ে আছেন এবং সময় পেলেই দুজনে গলফ খেলেন।

ক্লার্ক গেবল এখানে এসেছেন 'নেভার লেট মি গো' ছবিতে অভিনয় করার জন্য। জিন টিয়ার্নি এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন। এখানকার সুপ্রসিদ্ধা ব্যালে-নর্ত্তকী ভায়োলেটা এলভিনকে (ভায়োলেটা ভেসিলেভনা প্রোখেরোভা) এই ছবিতে অভিনয় করানোর জন্য মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভায়োলেটার সময় নেই ব'লে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এরল ফ্লিনকে একবার সাংবাদিকেরা চেপে ধরেন তাঁর প্রকৃত বয়স জানবার জন্য। এরল ফ্লিন গম্ভীরভাবে

উত্তর দেন, 'আমি ফিল্ম কোম্পানীর নায়ক ব'লে আমার বয়স বরাবর ২৯।' তারপরে একজনের কানে কানে বললেন, 'খবরের কাগজে লিখবেন না, ও বয়স আমি বিশ বছর আগে পার ক'রে দিয়েছি।'

বেটি ডেভিসও এখানে আসছেন 'ব্ল্যাক গ্রিফন' ছবিতে অভিনয় করতে।

পল গ্রেগরী ইনগ্রিড বার্গম্যানকে নায়িকা ক'রে একটা ছবি তোলার চেষ্টা করছেন এখানে। এই ছবিতে চার্লস লটনকেও অভিনয় করতে দেখা যাবে।

হলিউডে ব্রিটিশ-তারকা

সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে আমরা ষ্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার, ফার্লি গ্র্যাঞ্জার, মাইকেল ওয়াইল্ডিং, জেম্‌স ম্যাসন, রিচার্ড টড, রবার্ট নিউটন, জন ডেরেক, মাইকেল রেনি, জিন সিমন্স, ময়রা শিয়ারার প্রভৃতি অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী হারিয়েছি আমেরিকার চিত্রশিল্পের দৌলতে। আবার একটি দুটি করে অভিনেতা-অভিনেত্রী আমেরিকায় পাড়ি দিচ্ছেন। জোন কলিন্স 'ডেকামেরন নাইটস্' ছবিতে অভিনয় করতে হলিউড চললেন। আর যাচ্ছেন জন গিলগাড, যিনি বর্ত্তমানে এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেক্সপীয়ার-অভিনেতা এবং 'হ্যামলেটে' তাঁর তুল্য অভিনেতা আর নেই। তিনি 'জুলিয়াস সিজার' ছবিতে ক্যাসিয়াসের ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

এস কে ভাটিয়া জানাচ্ছেন

বোম্বাই-বার্ত্তা

এমাসে বোম্বাই সিনেমার বাজার নানারকম খবরে সরগরম হ'য়ে উঠেছে। এদের মধ্যে প্রধান হলো নিখিল ভারত চলচ্চিত্র সম্মেলনের ৭ই জুলাইয়ের অধিবেশন। ভারতের বিভিন্ন চিত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন এবং ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ বি, ভি, কেশকার এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি শ্রীচণ্ডুলাল শাহ সভাপতির ভাসণে বলেন যে, শত বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়েও ভারতের চিত্রশিল্পের অগ্রগতি ঈর্ষার ব্যাপার। ক্রমবর্দ্ধমান দুরবস্থার মধ্যেও আজ ভারতীয় ছবি রঙীন ক'রে তৈরী করার স্পর্দ্ধা রাখে। রঙীন ছবির ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতীয় ছবির বাজার বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং সেইজন্য আরও চিত্রগৃহ নির্ম্মাণ প্রয়োজন। অথচ ভারত সরকার ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ন'ন। চিত্রশিল্প আশা করেছিল যে সরকার চিত্রশিল্প অনুসন্ধান সমিতির অনুমোদনগুলি কার্য্যকরী করবেন, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কর-বৃদ্ধিই হ'তে দেখা যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন যে, শিল্পকে মৃত্যু বা সরকারী নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে রক্ষা করতে হ'লে শিল্পের মধ্যে ঐক্য প্রয়োজন এবং সেইজন্য চাই শিল্পের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। আজ চিত্রশিল্পের প্রতি বিভাগের মধ্যে যে স্বার্থের দলাদলি আছে, তাকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণই জয় ক'রে শিল্পের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করতে পারে। এইজন্যই আত্ম-নিয়ন্ত্রণ আজ আত্ম-সাহায্যের আর এক রূপ।

ডাঃ কেশকার তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় চিত্রশিল্পকে এই ব'লে সতর্ক ক'রে দেন যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের যে নীতিবোধের অভাব দেখা যাচ্ছে তা যদি অচিরে দুরীভূত না হয় তবে সরকার কঠোরতর সেন্সর ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে বাধ্য হবেন। তিনি আরও বলেন যে বর্ত্তমান সেন্সর বোর্ড গঠনের সময় থেকেই সরকার চলচ্চিত্রশিল্পকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তাতে অনিষ্টকর ফল ফলেছে। অশ্লীল ও যৌন-আবেদনপূর্ণ ছবি ও সঙ্গীত আজ দৈনন্দিন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক প্রযোজক কোনও নৈতিক মান রক্ষা করেন না বলা চলে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে এই চিত্রশিল্প সম্মেলনের কার্য্যকারিতা বা শ্রীযুক্ত শাহের অভিভাষণ সম্বন্ধে কোনও দৈনিক পত্রিকা বিশেষ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নি; কিন্তু ডাঃ কেশকারের বক্তৃতায় কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা বিশেষ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

বোম্বাই-এর 'বোম্বে ক্রনিক্‌ল' লিখেছেন যে তাঁর ভাষণ "will strike many as unnecessarily harsh and prudish.........If a stranger were to hear Dr. Keskar, he would have had the impression that Indian films were nothing but a mixture of low romance and eroticism exploiting human passions and weaknesses

……No one has thought of imposing a moral code on authors and poets to write and sing only about the dull and virtuous."

ঠিক একই ধরণের মন্তব্য করেছেন এখানকার ফ্রি প্রেস জার্নাল, দি ভারত, মাদ্রাজের দি মেইল, ইণ্ডিয়ান এক্স-প্রেস ও দিল্লীর দিল্লী এক্সপ্রেস প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকা।

ডাঃ কেশকার হয়ত একটু কড়া কথা ব'লে ফেলেছেন, কিন্তু তা কি একেবারেই মিথ্যা? একটি পত্রিকা বলছেন, ভাল ছবিও তো আছে, তবে সমস্ত চিত্রশিল্পকে খারাপ বলছেন কেন? কিন্তু দেশে বৎসরে গড়ে তিনশো' ছবি তোলা হয়, তার মধ্যে ছবি পদবাচ্য ছবি হয় গোটা-পাঁচেক এবং তা আপনাদের বাঙলা দেশেই। বোম্বে ক্রনিক্‌ল্ যে লিখেছেন যেন সব ছবিই 'a mixture of low romance and eroticism exploiting human passions and weaknesses'—কিন্তু সত্যিই কি তাই নয়? বোম্বাই-এর বা মাদ্রাজের তোলা ছবিগুলি একবার মনে মনে চিন্তা করে দেখুন। আমার মনে হয় ডাঃ কেশকার একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন, জানি না, সম্পাদকমশাই, আমার মতের সঙ্গে আপনার মতের মিল হবে কি না। সত্যি সত্যিই আরও কড়াভাবে সেন্সর করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে এমন ছবি হওয়া প্রয়োজন যার মধ্যে সামান্য অভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ থাকলে তা কেটে ফেলে দেওয়া উচিত। ভারতীয় ছবির মধ্য দিয়ে আমরা বিদেশীদের বদ্ জিনিষ গ্রহণ করতে শিখেছি। দেশ এবং দেশের লোকের স্বাধীন সত্ত্বা রক্ষা করতে হ'লে সরকারের সত্যি সত্যিই কঠিন হওয়া প্রয়োজন।

ভারত সরকারের আর একটি ভাল ব্যবস্থা এবার উল্লেখ করি। সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে ধীরে ধীরে সিনেমার গান কমিয়ে দেওয়া হবে এবং তার পরিবর্ত্তে ভারতের মার্গ সঙ্গীতের প্রবর্ত্তন করা হবে। এ ব্যবস্থা চিত্রশিল্পের কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগবে, কারণ তাঁদের গানের জনপ্রিয়তা ও অর্থপ্রাপ্তি যোগ কমে যাবে। এজন্য হয়ত সরকারকে চিত্রশিল্প দোষ দেবে, কিন্তু এই ব্যবস্থার মূলে কে? ভারতের ছবিতে যে ধরণের গান লেখা হয়, তা অনেক সময় মনে করতেই লজ্জায় মুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে, তো সরকারী রেডিও মারফৎ সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া! 'জোয়ানী ভাগ যায়ে', 'কসুর আপকা, হুজুর আপকা, মেরা নাম লিজিয়ে না মেরা বাপকা', 'যবসে বালম ঘর আয়ে জিয়ারা মচল মচল যায়ে'—এ ধরণের গানের দৌরাত্ম্য সত্যি সত্যিই বন্ধ হওয়া উচিত। চিত্রশিল্পের গান লেখকেরা যেদিন ভাল গান লিখতে পারবেন, যেদিন সুরকারেরা বিশুদ্ধ ভারতীয় সুরে তা উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন সেদিন সরকার নিজে থেকে আবার ফিল্মের গানকে রেডিওতে সম্মান দেবেন।

●

বোম্বাই-এর তিনটি চিত্রগৃহ, নিউ এম্পায়ার, প্যালেস সিনেমা ও কমল টকীজ, অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করেছেন যে উচ্চ মূল্যের আসনের দাম কমিয়ে দিলে দর্শক-সংখ্যা বৃদ্ধি হবে এবং সেইজন্য এই তিনটি চিত্রগৃহের কর্তৃপক্ষ দাম কমিয়ে দিয়েছেন। নিউ এম্পায়ার তিন টাকা বারো আনার টিকিট দু' টাকা দশ আনা ও দু' টাকা দু' আনার টিকিট এক টাকা পাঁচ আনা করেছেন। অন্য দুটি চিত্রগৃহও এই ধরণের টিকিটের দাম কমিয়েছেন।

এর ফলে ইতিমধ্যেই টিকিট বিক্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সকলে এই ব্যবস্থাকে ভাল ব'লে মেনে নিতে পারছেন না। অনেকে বলছেন যে তার ফলে চিত্রশিল্পের উপার্জ্জন অনেক ক'মে যাবে, কারণ যাঁরা ছবি দেখবেন তাঁরা টিকিটের দাম ভেবে দেখেন না।

●

বীণা রায় (কৃষ্ণা সারিন) ও প্রেমনাথের বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। এঁরা দুজন একত্র 'স্থামসন এ্যাণ্ড ডেলাইলা'র অনুপ্রাণিত হিন্দী ছবি 'ঔরৎ'-এ অভিনয় করার সময় ঘনিষ্ঠ হ'ন এবং হঠাৎ একদিন প্রেমনাথ এই সংবাদটি জানিয়ে সকলকে চমকে দেন। গত ১৩ই জুলাই এঁদের বিয়ের পাকা-দেখা হয়ে গেছে। এই দিন বীণা বিশ বছরে পড়লেন। বিয়ে হবে আগামী ২১শে নভেম্বর, প্রেমনাথের জন্মদিনে

এই সঙ্গে প্রচারিত হচ্ছে দিলীপকুমার-বিজয়লক্ষ্মী ও দেব আনন্দ-কল্পনা কার্ত্তিকের বিবাহের কথা। খবর দু'টি কতদূর সত্য এখন পর্য্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না, তবে সত্য হওয়াও আশ্চর্য্যের নয়

এখানকার চিত্রশিল্পের লোকদের বিদেশ-যাত্রা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ কাপুর বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। সোরাব মোদী, মেহতাব, নিম্মি ও মুকরী ইংলণ্ডে গেছেন। দেব আনন্দ ও চেতন আনন্দ 'আঁধিয়াঁ' ছবি নিয়ে ভেনিস যাচ্ছেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, যাঁরাই বিলেত যান তাঁদের প্রায়ই ওদেশে ছবিতে অভিনয় করার নাকি কথা হয়। অশোককুমার, দিলীপকুমার ও নিম্মি নাকি ইংরাজী ছবিতে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, কিন্তু কেউ যে কেন ইংরাজী ছবিতে অভিনয় করলেন না, সেইটাই একটা প্রশ্ন।

ব্রিটিশ প্রযোজক ও পরিচালক হার্বার্ট মার্শাল আলুওয়ালা ও অশোককুমারের যে ইংরাজী ছবি পরিচালনা করবেন, তার নাম হয়েছে 'ওয়াদিন আলি শাহ', অযোধ্যার রাজার বীর গাথা এই ছবিতে থাকবে।

প্রযোজক ফরেষ্ট জাডের ভারতে তোলা পরবর্ত্তী ইংরাজী ছবি 'দি ওয়ার্লড্‌স্ ডিলাইট' ছবিটি পরিচালনা করবেন মরিন ও' হারার স্বামী উইল প্রাইস। উর্ম্মিলা থেইসকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে

ফিল্ম টেকনিসিয়ান্স অব ইণ্ডিয়ার প্রথম ছবি 'আরমান' -এর কাহিনী লিখেছেন নিউ থিয়েটার্সের চিত্রনাট্যকার বিনয় চট্টোপাধ্যায়।

নলিনী জয়ন্তের স্বামী কর্ত্তৃক প্রযোজিত 'উঁচি হাভেলী'র কাহিনী পরিবর্ত্তন করা হচ্ছে ব'লে ছবিটির চিত্রগ্রহণ বন্ধ আছে।

বালী-সিষ্টারেরা 'রাগ-রঙ্গে'র পর এবার 'আজীব ঘর' তুলছেন। ভাই দিগ্বিজয় বালী পরিচালনা করবেন, বোন গীতা বালী হবেন নায়িকা।

নীতিন বসু নিজের ছবি 'দর্দ-এ-দিল' শেষ ক'রে ইউনাইটেড টেকনিসিয়ানের তৃতীয় ছবিটি পরিচালনা করবেন।

'মা' ছবিটির অসাধারণ সাফল্যের পর বিমল রায়ের প্রচুর সুনাম হয়েছে। তিনি 'বাপ-বেটি' ছবিটি শেষ ক'রে ফেলেছেন। 'জাগির' ছবিটি শেষ পর্য্যন্ত পরিচালনা করতে পারলেন না। এখন অশোককুমার প্রোডাকসন্সের হ'য়ে শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা'র হিন্দী চিত্ররূপ দিচ্ছেন। মৈত্র ফিল্মসের হ'য়ে 'বাদলা' ছবিটির পরিচালনাও করছেন।

নিমাই ঘোষ পাঠিয়েছেন

মাদ্রাজ-সংবাদ

চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে মাদ্রাজ সরকারের আগ্রহ থাক বা না থাক, চিত্রশিল্প সম্পর্কিত নিত্য নতুন আইন-কানুন রচনা করে চলেছেন। সম্প্রতি সরকার এক নির্দ্দেশ জারী করেছেন যে, যেসমস্ত অঞ্চলে পঞ্চাশ হাজারের কম লোক বাস করে সেই সমস্ত স্থানে একটি স্থায়ী চিত্রগৃহ থাকলে তার কাছাকাছি এক মাইলের মধ্যে কোনো ভ্রাম্যমান চিত্রগৃহ রাখা চলবে না; এবং যে সমস্ত অঞ্চলে পঞ্চাশ হাজারের বেশী লোক বাস করে তার আধ মাইলের মধ্যে কোন ভ্রাম্যমান চিত্রগৃহ রাখতে দেওয়া হবে না। এতে অবশ্য স্থায়ী চিত্রগৃহের মালিকদের সুবিধা হবে। দর্শকদের কিছুই সুবিধা হবে না।

●

সরকার আরও একটি আইন প্রনয়ণ ক'রে তামিলনাদের তাঞ্জোর, ত্রিচিনোপল্লী প্রভৃতি জেলার দৈনিক বিদ্যুৎ সরবরাহ শতকরা ৫০ভাগ কমিয়ে দিয়েছিলেন। যার ফলে এই সমস্ত জেলার প্রতিটি চিত্রগৃহের মালিকেরা দিনে একবারের বেশী ছবি দেখাতে পারছিলেন না। এখানকার প্রতিটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান এই বিদ্যুৎ সংরক্ষণ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় সরকার বিদ্যুৎ সংরক্ষণ শতকরা ৫০ ভাগের স্থলে ২৫ ভাগ করেছেন এবং এতে প্রতিটি চিত্রগৃহে দিনে দু'বার করে ছবি দেখানো চলবে।

●

চিত্রশিল্প সম্বন্ধে সরকারের মনোভাব কি এখন তা' বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাজাগোপাল আচারী চিত্রশিল্প সম্বন্ধে সরকারী কর্ম্মচারীদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন তাঁরা যেন ছবি দেখে অর্থ ব্যয় না করেন। শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ব্যাপারেই যেন অর্থ ব্যয় করা হয়। চিত্রশিল্প সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, 'ছায়াছবি আর কিছুই নয়, কেবল পর্দ্দার ওপর কতকগুলি পুতুলের নাচ।' একথা অন্য কেউ বললে না হয় একথার কোন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর এই মনোভাবে এখানকার চিত্রানুরাগী প্রতিটি ব্যক্তিই ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

●

সম্প্রতি সাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম চেম্বার অব কমার্সের এক সাধারণ সভায় পরবর্ত্তী বছরের জন্য কার্য্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে পরিষদ গঠন করা হয়েছে। সভাপতি—এ, রাগিয়া; সহ-সভাপতি—নাগি রেড্ডী, এ, ভি, মৈয়াপ্পান, এন, আয়েঙ্গার, সি, পি সারথী; সাধারণ সম্পাদক—টি, ভি সুন্দরম, এম, আর, বিঠল; কোষাধ্যক্ষ—আর, এম, প্যাটেল।

●

এখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই বোম্বাই গেছেন। এবারে বোম্বাই চললেন 'বাহার'-খ্যাত পরিচালক এম, ভি, রমন। তিনি এ, ভি, এম, এ-র পরবর্ত্তী হিন্দী ছবি 'লেড়কী' পরিচালনা করছেন। এ ছবিটি শেষ হলেই তিনি বোম্বাই যাবেন। সেখানে তিনি জি, পি, প্রোডাকসন্সের হয়ে 'শাহেনসা' ছবিটি পরিচালনা করবেন।

●

জেমিনীর ছবি হলেই একটা সোরগোল পড়ে যায়। জেমিনীর সর্ব্বশেষ তামিল ছবি 'থ্রি সন্স' (তিন পুত্র) সম্প্রতি এখানকার একাধিক চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। তবে ছবিটি অনেকটা পর্ব্বতের মুষিক প্রসবের মত হয়েছে। এখানকার সাংবাদিকদের মতে এটা নিতান্ত সাধারণ ছবি। এত সুখ-সুবিধার মধ্যেও এই ছবি তোলার পর একে সাধারণ ছবিই বলা চলে। অবশ্য ভিড় নেহাৎ কম হচ্ছে না। তবে সেটা ছবির গুণের চেয়ে প্রচারের জোরেই চলছে। ছবিটি এখন হিন্দীতে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।

●

'চন্দ্রলেখা'-খ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী রাজকুমারী একটি চিত্রপ্রতিষ্ঠান খুলছেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি হবে ইংরাজী উপন্যাস 'দি উয়োমেন বর্ণ টু লিভ'-এর কাহিনী অবলম্বনে। তাঁর ভাই ছবিটি পরিচালনা করবেন। শ্রেষ্ঠাংশে ইনি নিজেই অভিনয় করবেন।

জয়শ্রী সেন জানাচ্ছেন

কলকাতার খবর

এ মাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর হলো পরবর্ত্তী এক বৎসরের জন্য বেঙ্গল মোশান পিকচার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজক প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। গত দু'বছর ধরে সভাপতির পদে আসীন ছিলেন শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়। এই নির্ব্বাচনের ব্যাপারে অবশ্য অনেক বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। নীচে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যদের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হলো।

সভাপতি—বীরেন্দ্রনাথ সরকার, সহ-সভাপতি—ঈশ্বরীভাই দেশাই, কোষাধ্যক্ষ—প্রকাশ চন্দ্র নান, অন্যান্য সভ্য—মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, রতিলাল মেহতা, নীরোদচন্দ্র নাগ, ফণীন্দ্র বসু, সতীনাথ ঘোষ, অজিত বসু, ভি, এ, পি, আয়ার, পরিমল চট্টোপাধ্যায়, রবি গুপ্ত, নরেশচন্দ্র ঘোষ, শিশির মুখোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বসু।

প্রযোজক বিভাগ: নিউ থিয়েটার্স, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন, এ্যাসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স, রূপায়ণ থিয়েটার্স।

প্রদর্শক বিভাগ: বসুশ্রী, আলোছায়া ও ঝর্ণা।

পরিবেশক বিভাগ: কাপুরচাঁদ, শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স ও কিনেমা এক্সচেঞ্জ।

*

অভিনেতৃ সঙ্ঘ থেকে এক বিবৃতিতে আমাদের জানানো হয়েছে যে দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যের জন্য মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে সঙ্ঘের সভ্যসভ্যাগণ কর্ত্তৃক 'মিশর কুমারী' নাটকের অভিনয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ৬৮৪৮।/০ আনা। প্রমোদকর, বিজ্ঞাপন, টিকিট, পোষ্টার মুদ্রণ

ইত্যাদিতে খরচ হয়েছে ২১২৮৷৷/৫। বর্ত্তমানে কোষাধ্যক্ষের কাছে ৪৭১৯৷৷৶১৫ মজুত আছে।

*

একই দিনে তিনটির বেশী 'শো' করা চলবে না বলে কলিকাতা পুলিশ যে আদেশ জারী করেছিলেন তা' পুনর্বিবেচনার জন্য বি, এম, পি, এ, প্রদর্শক ও পরিবেশক সমিতির সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে যে আবেদন পেশ করেছিলেন তা চূড়ান্তভাবে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের বিনা অনুমতিতে এবং রবিবার আর ছুটির দিন ছাড়া এই আদেশ কার্যকরী হবে। সরকার বলছেন তাঁরা এটা করেছেন স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করবার জন্যই। সরকারের এই আদেশ যাদের জন্য তারা এটাকে গ্রহণ করলে হয়!

*

শুধু এতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষান্ত হন নি। নতুন ছবিঘরে যাতে নিজেদের গাড়ীতে আগন্তুক দর্শকরা চিত্রগৃহের সীমার মধ্যে মোটর গাড়ী রাখার পর্য্যাপ্ত জায়গা পান তার জন্য ছবিঘরের মালিকদের বাধ্য করতে কলিকাতা পুলিশ মনস্থ করেছেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের লাইসেন্স বাতিল করবার ক্ষমতাও পুলিশের থাকবে। সরকারের অন্যদিকে দৃষ্টি দেবার সময় থাক আর নাই থাক পথচারীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে যে দৃষ্টি পড়েছে তাও একটা সুলক্ষণ সন্দেহ নেই!

*

ভারতবর্ষ থেকে একটি চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দল আমেরিকান মোশান পিকচার এ্যাসোসিয়েশন ও মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে শীঘ্রই মার্কিন দেশে ছ'-সপ্তাহব্যাপী সফরে যাচ্ছেন। এই প্রতিনিধিদলে মোট ১৪জন সদস্য থাকবেন এবং এই দলের নেতৃত্ব করবেন ভারতের তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ বি. ভি. কেশকার। বাঙলা দেশ থেকে ৩জন প্রতিনিধি এই দলে স্থান পেয়েছেন। এঁরা হলেন শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুত দেবকীকুমার বসু ও শ্রীযুত নীতিন বসু। তবে দেবকীবাবু যেতে পারবেন না বলে প্রকাশ। তাঁর শারীরিক অসুস্থতাই এর একমাত্র কারণ। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আছেন—চণ্ডুলাল শাহ, ভি. শান্তারাম ও রাজ কাপুর আগষ্ট মাসের শেষের দিকে এঁরা যাত্রা করবেন।

*

বেঙ্গল মোশান পিকচার এ্যাসোসিয়েশনের পরিবেশক

শাখা 'বিজ্ঞাপন-নিয়ন্ত্রণ-আইন' সংশোধনের প্রস্তাব কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে পেশ করেন এবং এটি বিচার-বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করেন। কিন্তু খবর পেলাম পূর্ব্বের নিয়ন্ত্রণ আইনই বলবৎ আছে। প্রস্তাবগুলি নাকি বাতিল হয়ে গেছে। এই বিজ্ঞাপন-নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়েই বি. এম, পি, এ-র কর্ম্মকর্ত্তাদের একটু প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়। সারা বছরে এঁদের বিশেষ কোন কাজ-কর্ম্ম থাকে না। তাই সময় কাটাবার একটা কারণ থাকলেই হলো। এই ব্যাপারে বি, এম, পি, এ-র সভ্যদের মধ্যে মতানৈক্যও লক্ষ্য করা গেছে। এই 'বিজ্ঞাপন-নিয়ন্ত্রণ আইন' নিয়েই বি, এম, পি, এ-র মধ্যে দলাদলি সুরু হয়েছে। অধিকাংশ সভ্য ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক এই নিয়মকে মেনে নিলেও একদল সভ্য সময় সময় এই আইন ভঙ্গ করে বি, এম, পি, এ-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই 'বিজ্ঞাপন-নিয়ন্ত্রণ আইন' নিয়ে বি, এম, পি, এ-র সুনাম বিপন্ন হতে চলেছে। এই ব্যাপারে বি, এম, পি, এ-র মধ্যে দলাদলি বাংলা চিত্রশিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর বলেই মনে করি।

*

পরিচালক অমর মল্লিক তাঁর 'স্বামিজী' ছবিটি হিন্দী ও তামিল ভাষায় তোলা মনস্থ করেছেন। তিন বছর আগে বাংলা ভাষায় এ ছবিটি তোলা হয়। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি এখানকার এক নামকরা ষ্টুডিওতে এটির কাজ আরম্ভ হবে। অবশ্য বাংলা সংস্করণের কিছু কিছু অংশ হিন্দী ও তামিল ভাষায় 'ডাব' করা হবে। বাংলা সংস্করণে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই হিন্দী ও তামিল সংস্করণে অভিনয় করবেন। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন প্রখ্যাত সুরশিল্পী রাইচাঁদ বড়াল।

*

পরিচালক দেবকীকুমার বসু তাঁর পরবর্ত্তী ছবির কাহিনী নির্ব্বাচনের ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। অবশেষে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'কে তিনি মনোনীত করেছেন। ছবিটি হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি তুলবেন। ছবিটির কাজ আরম্ভ হতে দেরী আছে।

★ টুকরো খবর ★

ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় নৃত্য, নাটক এবং সঙ্গীতের উন্নয়ন সাধন করে তাদের সহায়তায় দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার 'সঙ্গীত নাটক এ্যাকাডেমী' নামক একটি ভারতীয় নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীত কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেছেন। দেশের সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নাটক ও নৃত্য সংক্রান্ত কার্য্যাবলীর সংহতি সাধনকল্পে একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়াদি বিবেচনার জন্য ১৯৪৫ সালে ভারত সরকার যে কমিটি নিযুক্ত করেন সেই কমিটি সাহিত্যের জন্য একটি, শিল্পকলার জন্য একটি এবং সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের জন্য একটি— মোট তিনটি কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করেন। ভারত সরকার গত ১৯৫১ সালের গোড়ার দিকে নয়াদিল্লীতে নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত-শিল্পীদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে একটি জাতীয় এ্যাকাডেমী স্থাপনের কথা বিবেচনা করা হয়। এই এ্যাকাডেমীর গঠনতন্ত্র রচনার

অন্ত একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। ভারত সরকার এই কমিটি রচিত গঠনতন্ত্র অনুমোদন করেছেন। রাজ্য ও আঞ্চলিক নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত এ্যাকাডেমীগুলির কার্য্যাবলীর সংহতি সাধনই এই এ্যাকাডেমীর প্রধান কাজ হবে। ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অনুরূপ অন্যান্য যাবতীয় সংস্থার সঙ্গে এই এ্যাকাডেমী সহযোগিতা করবে। এই এ্যাকাডেমীর মহাকেন্দ্র হবে নয়াদিল্লীতে। এ্যাকাডেমীর তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে পরে তা অন্য যে কোন স্থানে স্থানান্তরিত করা যেতে পারবে। একটি লাইব্রেরী ও একটি যাদুঘর এই এ্যাকাডেমীর সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

মহীশূর বিধান সভার এক অধিবেশনে চিত্রগৃহসমূহে ধূমপান নিরোধের আইন প্রণয়নের কথা হয়েছে। চিত্রগৃহে কেউ ধূমপান করলে তাকে বের করে দেওয়া হবে এবং পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানাও করা হবে। চিত্রগৃহে ধূমপান নিষেধ একথা যদি কর্তৃপক্ষ ঠিকভাবে দর্শকদের জানিয়ে না দেন তাহলে কর্তৃপক্ষকেও জরিমানা দিতে হবে।

ইতালীতে সমস্ত বিদেশী ছবিকেই ইতালীয় ভাষায় ডাব্ করিয়ে তবে দেখানো হয়। ইতালীতে ডাব করার পদ্ধতি চলে আসছে অনেকদিন আগে থেকেই। এখন ওখানে বছরে ৬০০খানি পর্য্যন্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য বিদেশী ছবি ডাব্ করা হয়। ফলে ডাব্ করার পদ্ধতিতে পৃথিবীর মধ্যে যন্ত্র ও কৃতিত্ব উভয় দিক থেকেই ইতালীয়রা সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির কীর্তি-সমূহ নিয়ে ইতালীতে গত এক বছর ধরে একখানি পূর্ণ্য-দৈর্ঘ্য ছবি তোলা শেষ হয়েছে। মিলান, ভেনিস ও প্যারিসের লুভেয়ারে গিয়ে ছবিখানি তোলা হয়। বেশী আলোর চড়া তেজে দ্য ভিঞ্চির অমূল্য ছবিগুলি রঙ-চটা হ'য়ে যাবার আশঙ্কায় এক দফায় মাত্র কয়েক মিনিট ধ'রে দৃশ্যগ্রহণ করা হয়। ছবিখানি দ্য ভিঞ্চির কীর্তিসমূহ নিয়ে তোলা হয়েছে এবং এতে কোন অভিনেতা নেই, আছে কেবল আবহ বিবৃতি।

●

সবাক ও নির্ব্বাক যুগ মিলিয়ে আজ পর্য্যন্ত যত ছবি তোলা হয়েছে তার মধ্যে দীর্ঘতম পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি হলো 'গন উইথ দি উইণ্ড।' ছবিখানির দৈর্ঘ্য বিশ হাজার ফিট। ছবিটি দেখতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগে।

●

চলচ্চিত্রের কলাকৌশলাদি বিষয়ে পাকিস্থানীদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে করাচীতে 'ইনষ্টিটিউট অব সিনে টেকনিক' নামে একটি শিক্ষালয় স্থাপিত হয়েছে।

●

গত ১৩ই জুলাই থেকে টোকিওর রয়াল ইম্পি-রিয়াল থিয়েটারে বিখ্যাত মনিপুরী নৃত্যশিল্পী রাজকুমার প্রিয়গোপাল মনিপুরী ঘরানার নাচের আসর বসিয়েছেন। আসরটি যতদিন চলে ততদিন রাখা হবে। এর আগে টোকিওতে ভারতীয় নাচ দেখানো হয়েছিল ১৯৩৭ সালে —রামগোপাল আমেরিকায় যাবার পথে কয়েকটি আসরের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

বিবিধ অনুষ্ঠান

'চলোর্ম্মি'র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৬ই জুলাই সন্ধ্যায় ভবানীপুরস্থ আশুতোষ কলেজে চলোর্ম্মি সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে আধুনিক চলচ্চিত্র বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। প্রবীন খ্যাতনামা শিল্প-সমালোচক শ্রীঅর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায় এই সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং নিউ থিয়েটার্স লিঃ-এর কর্ণধার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের কয়েকজন কর্ণধার, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবিদ এবং চিত্র-সাংবাদিক প্রভৃতিরা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক স্তরে চলচ্চিত্রশিল্পের এরূপ আলোচনা সভা এর পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

প্রারম্ভে 'চলোর্ম্মি'র অন্যতমা সম্পাদিকা শ্রীমতী বাণী রায় "মহাপ্রস্থানের পথে" এবং ইদানীং সাফল্যমণ্ডিত ক'খানি বাঙলা ছবি সম্পর্কে বলে আলোচনার উদ্বোধন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীমতী রায় প্রযোজক শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকারকে অভিনন্দন জানান। অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার বলেন সর্ব্বদাই তাঁর লক্ষ্য ছবির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দিকেই। তিনি বলেন ছবি তোলা আরম্ভ হয় খেয়াল চরিতার্থ থেকে—তাই থেকেই ক্রমে আজ এতো বড়ো একটা শিল্প গড়ে উঠেছে। এর পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুত সরকার বলেন, দর্শক ছবির মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্য ও রক্ত মাংসের জীবন্ত উত্তেজনার সাড়া উপলব্ধি করে ব'লেই তাদের অতো আকর্ষণ। চলচ্চিত্র চৌষট্টি কলার কোন একটির মধ্যে পড়ে না, চলচ্চিত্র বহু চেষ্টার প্রতিফলিত ফল। ছবি তৈরীর মধ্যে দিয়ে মানুষ সমবায় পদ্ধতিকে আদর্শ কর্ম্মপন্থারূপে আঁকড়ে ধরতে পেরেছে। চলচ্চিত্রকে নানাবিধ সামাজিক ভৎর্সনা সহ্য করতে হচ্ছে, অনেকে আশঙ্কা করেন যে, যোগ্য লোকের হাতে না থাকলে ছবির দ্বারা ভয়াবহ ক্ষতি হতে পারে। চলচ্চিত্রের লক্ষ্য ও আদর্শের কথা উল্লেখ করে শ্রীযুত সরকার বলেন, ছবির লক্ষ্য একটা স্বাস্থ্যকর ও আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেন জাতীয় চরিত্র গঠনে সহায়ত' করে।

চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করেন সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। পরিচালক দেবকী-কুমার বসু মানুষ গড়ায় চলচ্চিত্রের দায়িত্ব সম্পর্কে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, চলচ্চিত্র মানুষকে জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শ্রীযুত বসু আশা প্রকাশ করেন এই বলে যে, এখন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র চলচ্চিত্রকে যে স্বীকার করে নিয়েছে সেইটেই চলচ্চিত্রের শুধরোবার বড়ো আভাস।

প্রযোজক ও পরিচালকের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে সাহিত্যিক-পরিচালক-প্রযোজক প্রেমেন্দ্র মিত্র 'মহাপ্রস্থানের পথে'র প্রযোজকের কথা উল্লেখ করে বলেন, শ্রীযুত সরকার হাতে মশাল নিয়ে দেশের চলচ্চিত্রের প্রগতির পথ দেখিয়ে চলেছেন। শ্রীযুত মিত্র আক্ষেপ করে বলেন, দায়িত্ব কেবল প্রযোজকদেরই নয়, দর্শকদেরও দায়িত্ব আছে ভালো জিনিষকে স্বীকার করার। কিন্তু দর্শকরা বধির বলে অনেক ভালো জিনিষ অবহেলিত হয়। তিনি আশা করেন যে, সংস্কৃতি প্রসার কেন্দ্রগুলি যদি ছবির বিষয়ে অবহিত হন তাহলে ছবি ভালো হবে।

পরিচালক মিত্র বিদেশী অনুকরণের নিন্দা করেন। 'মহাপ্রস্থানের পথে'র কথা উল্লেখ করে বলেন যে, গ্রন্থখানি কল্লোল যুগের গভীর অতৃপ্তিকে যেমন তৃপ্ত করেছিল, তাঁর ছবিখানিও তেমনি এখন দর্শকদের তৃপ্ত করছে। তাঁর মতে 'মহাপ্রস্থানের পথে'র মতো বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি তোলার চেষ্টা পৃথিবীর কোথাও হয়নি।

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুজাতা রায় আলোচনায় যোগদান করে বলেন, চলচ্চিত্রকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে দেশের মোড় ঘুরিতে দেওয়া যায়। বিদেশীর অনুকরণের নিন্দা করে তিনি বলেন ভারতের চিত্রশিল্পে বাঙলা দেশই ভরসা-স্থল। চলচ্চিত্রকে শক্তিশালী করতে হলে, তিনি বলেন, সরকারের সহায়তার প্রত্যাশা না করে নিজেদের প্রত্যেককে চেষ্টা করতে হবে।

কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে কবি নরেন্দ্র দেব ছবিকে বিশ্বের কল্যাণে নিয়োগের কথা বলেন। চলচ্চিত্র জাতকে বড়ো করতে পারে, মহান করতে পারে; কিন্তু তা হচ্ছে না বলে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এককালে যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার মাধ্যম ছিল, সিনেমা আজ তাদের সরিয়ে লোকের মন অধিকার করে বসেছে, কিন্তু উপযুক্ত ছবি তৈরী হচ্ছে না। দেশের যাঁরা জাতি গঠনের ভার নিয়েছেন, আজ প্রয়োজন তাঁরা এগিয়ে এসে চলচ্চিত্রের ভার গ্রহণ করেন।

পাঁচটি প্রস্তাবে (ক) কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডকে ছবির বিচারে আরও কড়া হতে অনুরোধ করা হয়েছে, কারণ এমন কতকগুলি ছবির ছাড়পত্র তাঁরা দিচ্ছেন যা নিশ্চিতভাবে নাগরিকদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বোধকে আহত করে; (খ) ছোটদের জন্য বিশেষ করে ছবি তোলার জন্য সরকার ও প্রযোজকদের অনুরোধ করা হয়েছে; (গ) শিক্ষাপ্রদ ও জীবনী চিত্রাবলীর ওপর থেকে প্রমোদ-কর রেহাই দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে; (ঘ) কদর্য্য প্রচার উপাদানগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং (ঙ) কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়েছে তাঁরা যেন ক্লাসিক রচনা এবং প্রখ্যাত লেখকদের সাহিত্য রচনাগুলি যাতে বিকৃত না হয় তার জন্য বর্ত্তমান সেন্সর বিধি কড়াভাবে প্রয়োগ করেন।

শেষের প্রস্তাবটি সম্পর্কে শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল অভিমত প্রকাশ করেন যে, ছাপার বই আর ফিল্মের ছবি উভয়ের প্রকাশভঙ্গী একেবারেই আলাদা। লেখক কলম দিয়ে যা লেখেন পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানের ক্যামেরাতে তার মধ্যে পরিবর্ত্তন আসা অবশ্যম্ভাবী, কারণ ছবিতে স্থান ও কালের পরিধি অনেক ব্যাপক। রচনার আঙ্গিক স্বরূপ রক্ষাটাই আসল কথা। লেখকের রচনাকে দরকার মতো পরিবর্ত্তন করে শোভন ও সুন্দর করার অধিকার পরিচালকের আছে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, ক্লাসিকের মর্য্যাদা রক্ষিত হচ্ছে কিনা দেখবার জন্যে সেন্সর কর্ত্তৃক এক বিচারকমণ্ডলীগঠন করা উচিত।

সভায় প্রখ্যাত সুধী সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিল্পী উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রের যুক্ত সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপন প্রসঙ্গে চলোর্ম্মি সংস্কৃতি কেন্দ্রের এই আলোচনা সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। কেন্দ্রের সমাজ বিভাগের সম্পাদক সনৎ মতিলাল এবং প্রচারসম্পাদক অবনী মতিলাল উপস্থিত সকলকে আপ্যায়নে যত্নবান ছিলেন।

আলোচনাসভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় সেন্সর দপ্তরের পশ্চিমবঙ্গ শাখার অধিকর্ত্তা ডাঃ আর এম রে, কলিকাতা স্মল কজ্ কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, 'মহাপ্রস্থানের পথে'র পরিচালক কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজকুমার মল্লিক, চিত্রসাংবাদিক নির্ম্মলকুমার ঘোষ, মহেন্দ্র সরকার মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, পঙ্কজ দত্ত, সাগরময় ঘোষ, গৌর চট্টোপাধ্যায়, বাগীশ্বর ঝা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজ সেনগুপ্ত, বিজন দত্ত, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীমতী শীলা চ্যাটার্জ্জি, বিধানসভার সদস্য দেবী চট্টোপাধ্যায় এবং সুধীরেন্দ্র সান্যাল

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের সপ্তম বার্ষিক উৎসবে ভাষণরত এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার-ইন-চার্জ্জ শ্রীযুত এন মৈত্র। তাঁর বামপাশে উপবিষ্টদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুত এস মৈত্র ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়কে।

সুলেখা ওয়ার্কসের সপ্তম বার্ষিকী উৎসব

গত ১লা জুলাই সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেডের কারখানার ভবনে সপ্তম বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ঐ সভায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ডেপুটি চেয়ারম্যান ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় সভাপতিত্ব করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেক্টার-অব-ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডাঃ এস এন গাঙ্গুলী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রী এস মৈত্র অভ্যাগতদের স্বাগতম জানান। ডিরেক্টার-ইন-চার্জ্জ শ্রী এন মৈত্র ভারতে ফাউণ্টেনের কালি প্রস্তুত সম্বন্ধে সাংবাদিকদের এই শিল্পটিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তাঁদের কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে এই শিল্পটির প্রতি সরকারের কার্য্যকরী উৎসাহদানের কথা স্বীকার করেন। প্রধান অতিথি এস এন গাঙ্গুলী বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত 'সুলেখা কালি' বিদেশী কালির চেয়ে কোন অংশে হীন নয়। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ডিরেক্টার আর পি লাহিড়ী কর্ত্তৃক সভাপতিকে ধন্যবাদ জানানোর পর সভার কাজ শেষ হয়। এই সপ্তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় ভারত সরকার যেন তাঁদের ট্যারিফ প্রোটেকসান আইনের মেয়াদ যতদিন পর্য্যন্ত না এই দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্য স্বাবলম্বী হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দেন। এই সঙ্গে 'সুলেখা' কালি এবং এই প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দমদম স্পেশাল জেলে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দী শ্রীশঙ্করাচার্য্য মৈত্র ও তাঁর কনিষ্ঠ ভাই শ্রীননীগোপাল মৈত্রের মনে দেশীয় শিল্পের উন্নতি ও

চিত্রশ্রী লিঃ-এর 'চিতা বহ্নিমান' চিত্রে নবাগতা অনুরাধা দেবী ও অভি ভট্টাচার্য্য

প্রসার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জেগেছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন যে দেশীয় শিল্পের প্রচার ও প্রসার ভিন্ন বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলন কখনও সফল হতে পারে না। তাই জেল থেকে মুক্তি লাভের পরই তাঁদের পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর কথা মতো উৎকৃষ্ট ধরণের কালি প্রস্তুত করবেন স্থির করেন। এই 'সুলেখা' কালির প্রথম কারখানা স্থাপিত হয় রাজসাহী সহরে। পরে ক্রমশঃ ক্রমোন্নতি হতে থাকে এবং জনসাধারণ এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আজ সুলেখা কালি বিদেশী শ্রেষ্ঠ কালির সঙ্গে সমকক্ষতার দাবী করতে পারে। রাজসাহী থেকে কারখানা বর্ত্তমানে যাদবপুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সর্ব্বসাধারণের আস্থা ও দ্রব্যের উৎকর্ষের মান উচ্চতর রাখাই 'সুলেখা'র একমাত্র উদ্দেশ্য।

'পথের ডাক' নাট্যাভিনয়

গত ৮ই জুলাই মঙ্গলবার রঙমহল নাট্যমঞ্চে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীবৃন্দ কর্ত্তৃক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের ডাক' নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটি আগাগোড়া উপভোগ্য হয়েছিল। অভিনেতাদের মধ্যে কুড়োরামের ভূমিকায় মনি গঙ্গোপাধ্যায় ও রায়বাহাদুরের ভূমিকায় অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল। ডাঃ চ্যাটার্জ্জির অভিনয় হয়েছিল চলনসই। 'অতুলে'র স্থানে স্থানে সাহেবী ঢং বাদ দিলে অভিনয় মন্দ হয় নি। 'বিছে'র ক্ষুদ্র ভূমিকায় তিনকড়ি ঘোষ সুন্দর অভিনয় করেছেন। ভক্তারাম, কানাই ও যতীনের অভিনয় মন্দ নয়, স্ত্রী ভূমিকার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রমার ভূমিকায় কমল দত্তের। সুনন্দার অভিনয় মন্দ নয়। জ্যোতির্ম্ময়ীর অভিনয়ও চলনসই; এক কথায় বলতে গেলে অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এঁদের টিম-ওয়ার্ক সুন্দর হ'য়েছিল। সচরাচর সৌখীন নাট্যাভিনয়ে এরূপ দেখা যায় না। এর জন্য পরিচালক কানাই কুণ্ডু কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন।

'সান্ধ্য-বাসরে'র নাট্যানুষ্ঠান

গত ২৫শে জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ' টায় সান্ধ্য-বাসরের সভ্যসভ্যাবৃন্দ কর্ত্তৃক ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের ডাক' নাটকটি রঙমহল থিয়েটারে অভিনীত হয়। অভিনয়াংশে সকলেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নাটকটি পরিচালনায় পরিচালকের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। আবহসঙ্গীত পরিচালনা সুন্দর হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি বিশেষ উপভোগ্য হয়।

আজকাল

বর্ত্তমান জীবনের দৈনন্দিন সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত মঞ্চ ও চিত্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে 'আজ কাল' নাটক আগামী ৮ই, আগষ্ট শুক্রবার রঙমহল রঙ্গমঞ্চে হুজুগে সংঘের প্রযোজনায় ও পরিচালনায় অভিনীত হবে। অভিনয়াংশে থাকবেন—জহর গাঙ্গুলী, ছবি বিশ্বাস, উত্তম কুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আপনি কি বলেন?

মন্দির

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

বহুদিন থেকেই শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' ছবিটির মুক্তি-প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলাম এবং মুক্তিলাভের দু'দিন পরেই অধীর আগ্রহসহকারে ছবিটি দেখে এলাম। কিন্তু যা দেখে এলাম সে কি শরৎচন্দ্রের 'মন্দির', না দেবকী বোসের 'মন্দির'? কাহিনীকার হিসাবে শরৎচন্দ্রের নাম আছে, শরৎচন্দ্রের দেওয়া কাহিনীর নামটি আছে কিন্তু কাহিনীটি নেই। শরৎচন্দ্রের লেখার ওপর স্বনামধন্য পরিচালক দেবকী বোসের এইরকম যথেচ্ছাচারভাবে কলম চালাবার কি প্রয়োজন ছিল? মৃত লেখকের লেখার ওপর দিয়ে এই রকম নির্মমভাবে লেখনী চালনায় কি মৃত লেখকেরই অবমাননা করা হয় না?

শরৎচন্দ্র লিখিত কাহিনীর সঙ্গে নায়ক নায়িকার নাম ভিন্ন আর কোনকিছুরই মিল দেখতে পেলাম না। 'মন্দির' কাহিনীটিতে দেখা যায় যে অমরনাথের মৃত্যুর পর শক্তিনাথের আবির্ভাব হয়, কিন্তু চিত্রে অপর্ণার শিশুকাল থেকেই তার সঙ্গে শক্তিনাথের ঘনিষ্ঠতা দেখতে পাই। কাহিনীতে আছে, অমরনাথের মৃত্যুর পর বিধবা হয়ে অপর্ণা তার বাবার কাছে ফিরে যায়, কিন্তু চিত্রে দেখতে পাই শাশুড়ীর কাছে প্রহৃতা হয়ে অপর্ণা পিত্রালয়ে ফিরে আসে এবং সবচেয়ে বড় কথা চিত্রে শেষ পর্য্যন্ত অমরনাথকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাই।

চিত্রের প্রথমেই লিখে দেওয়া হয়েছে "শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' অবলম্বনে"। কিন্তু অবলম্বন লিখে দিলেই কি কাহিনীর জীবিতকে মৃত এবং মৃতকে জীবিত বানান যায়? অবলম্বনে'টাও কি এখানে উপন্যাসের মতনই দেখাচ্ছে না? শরৎচন্দ্রের 'মন্দিরের' বিন্দুমাত্রও আভাসও আমরা চিত্রে রূপায়িত 'মন্দিরে'র মধ্যে দেখতে পাই না। শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' না লিখে দেবকী বসুর 'মন্দির' অথবা চিত্ররূপার 'মন্দির' লিখলেই কি বেশী ভাল হোত না? 'কুন্তলীন' পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মন্দির' কাহিনীটিকে যদি চিত্রে রূপায়িত করা খুবই কঠিন বোধ হয়েছিল অথবা শরৎচন্দ্রের কাহিনীটি দর্শকসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করতে পারবে না বলেই সন্দেহ হয়েছিল তবে শরৎচন্দ্রের লেখনীর ওপর দিয়ে যথেচ্ছাচার কলম চালিয়ে 'মন্দির' কাহিনীটিকে চিত্রে রূপায়িত করার চেষ্টা না করলেই কি বেশী ভাল হোত না?

শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' না ভেবে যদি আমরা দেবকীবসুর 'মন্দির' ভেবে চিত্রটিকে বিচার করি তাহলে ছবিটি মন্দ লাগবে না। বহু ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ ঘটনার ভিতর দিয়ে নাট্যকার দর্শকদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে যথেষ্ট সক্ষম হয়েছেন।

বিকাশ রায়ের অভিনয় খুবই ভাল লেগেছে তবে তাঁর চলনভঙ্গীটির এখন একটু পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। এক সময়ে তাঁর অনন্যসাধারণ চলনভঙ্গী ও বাচনভঙ্গী দিয়েই তিনি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কিন্তু এখন তাঁর চলনভঙ্গীটি একটু একঘেয়ে মনে হয়। তবুও তাঁর অভিনয় আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। অপর্ণার ভূমিকায় যমুনা সিংহ মন্দ নয়, শক্তিনাথের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর তাঁর মুখের অভিব্যক্তি সুন্দর। তবে শীঘ্রই তাঁর মেদবহুল দেহ যে তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের পথে একটি বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সময়ে শরীরের যত্ন নেওয়ার জন্য আমরা তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি। ছোট্ট দু'টি চরিত্রে মঞ্জু দে ও অমিতা বসু বেশ সুন্দর অভিনয় করেছেন। সমর রায়কে তাঁর অভিনীত অন্যান্য ছবির চেয়ে এই ছবিতে বেশী ভাল লেগেছে। অমরনাথের পিতার ভূমিকায় নীতিশ মুখার্জ্জীর অভিনয় আমাদের আনন্দ দান করেছে।

সঙ্গীতে কালিপদ সেন প্রথম গানটির সুন্দর সুরসৃষ্টির জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

পরিচালক দেবকী বোসের কাছে আমাদের অনুরোধ তিনি যেন আর বিখ্যাত লেখকদের লেখার ওপর কলম চালিয়ে জনসাধারণের সমালোচনায় ও নিন্দার পাত্র হয়ে না দাঁড়ান।

সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে। ইতি রত্না চৌধুরী,
সুগোপা দত্ত,
মহানির্ব্বাণ রোড, বালিগঞ্জ।

প্রিয় চিত্রবাণী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সম্প্রতি বিখ্যাত মণীষীদের হত্যা করা একটা পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পল্ জিলস রবীন্দ্রনাথকে হত্যা করলেন 'জলজলার' মাধ্যমে। কিন্তু জনতা একেবারে নীরব, এমন কি বিশ্বভারতী পর্য্যন্ত, অথচ যখন দেবকী বসু বঙ্কিমচন্দ্রকে হত্যা করেছিলেন 'চন্দ্রশেখর' চিত্রে তখন সমালোচক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। দেবকীবাবু সংবাদ-পত্র মারফৎ ত্রুটি স্বীকার করেছিলেন মাত্র। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ হল কেন? দেবকী বসু হত্যার পুনরাবৃত্তি করলেন "মন্দিরে" শরৎচন্দ্রকে হত্যা করে, এ ক্ষেত্রেও সকলে প্রায় নীরব, সেন্সর কর্ত্তারা এরকম ছবি অনুমোদন করেন কি করে?

পরিচালকের স্বাধীনতা আছে বলেই কি এমন করে তাঁদের খেয়াল মত হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাবেন? জনসাধারণের উচিত এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানানো। সেন্সর কর্ত্তাদের কি কর্ত্তব্য নয় যে এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা? নমস্কার নেবেন—ইতি

শ্রীমতী সাবিত্রী দে,
বাজার পাড়া, ইছাপুর-নবাবগঞ্জ,
২৪ পরগণা

চিত্রশিল্পে অসাধুতার কাহিনী

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সত্যিই আপনাদের 'নাগরদোলা' দোলা দিয়েছে। রিক্সাওয়ালা'র আসল কথা ও সংবাদের ব্যাপারে অনেকেরই কৌতূহল ও জিজ্ঞাস্যও আছে। সংবাদটি আপনারা প্রকারান্তরে প্রকাশ করেছেন—এখানে তার দ্বার উন্মুক্ত করা হলো। এই কথা বা সংবাদটি যদি আর একটু মেহনৎ করে চিত্র-সমাজে পরিবেশন করেন তাহলে চিত্র-সমাজের হিতৈষী হবেন।

প্রকৃত 'রিক্সাওয়ালার' গল্পটি—যা'তে বাংলার এক অতি দীন পীড়িত কৃষককে কেমন করে 'রিক্সাওয়ালা' ও তার ছেলেকে 'Shoe-shine boy'-বৃত্তি গ্রহণ করতে হয় তার প্রাণস্পর্শী ঘটনা ছিল, যাতে প্রগতিশীল উদ্দীপনার দুর্বার বন্যা ছিল, যা'তে বাস্তবের 'Struggle for existence ব্যক্ত হবার প্রয়াস ছিল—সেই কাহিনীর উৎস হলেন শিল্পী উৎপল দত্ত ও বিখ্যাত পরিচালকের সহকারী রথীন বসু। তাঁরা দুই বন্ধু Bicycle thief দেখবার পর নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং পরে নিজস্ব মৌলিকতা অক্ষুন্ন রেখে এই 'রিক্সাওয়ালা' গল্পটি রচনা করেন এবং পরে চিত্রে রূপদান করবার জন্যে চেষ্টা করেন। রথীন বসু কোন একটি প্রোডাকসন্সের মধ্যে থেকে গল্পটি চিত্রে রূপায়িত করবার সুযোগ পান। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করবার কথা ছিল রথীন বসুর, নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন উৎপল দত্ত, নায়িকা শোভা সেন ও আলোকচিত্রে থাকবেন বিভূতি চক্রবর্ত্তী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরে রথীন বসুর সঙ্গে সুরকার সলিল চৌধুরীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি রথীন বসু ও উৎপল দত্ত—উভয়ের চোখে ধুলো দিয়ে গল্পটির ওপর একটু রঙ ফলিয়ে নিজের বলে ঢাক পেটাচ্ছেন। কিন্তু আসল গল্পের ভিত্তিকে পাল্টে বেশী দূর সলিল বাবু এগোতে পারেন নি। এই দুটী গল্প (অর্থাৎ রথীন বসু ও উৎপল দত্ত লিখিত আসল গল্পটি ও রঙ ফলানো গল্পটি) অনেকেরই জানা আছে—কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই পৃথক দুটি গল্পের কোথাও পার্থক্য খুঁজে পান না। লোকমুখে শোনা যাচ্ছে—রথীন বসু ও উৎপল দত্তের নাকি পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত কর্ম্মে প্রবল স্পৃহা ও পারদর্শিতা আছে; তাই তাঁরা স্ব স্ব বিষয়ে কর্ম্ম-পটুতার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার জন্য আগ্রহান্বিত।

'চিত্রবাণীর' পাঠক হিসেবে আশা করি আপনারা এই প্রেরিত সংবাদটি প্রকাশ করে প্রকৃত প্রগতিশীল চিত্র-সমাজকে হুঁসিয়ার করে দেবেন—তাঁরা যেন "মহাবিদ্যা"-ওলার কবলে না পড়েন। আপনাদের এই আগ্রহের জন্যে ধন্যবাদ। নমস্কার। ইতি—

দিলীপ কুমার মল্লিক
জ্যোতিষ রায় রোড, কলিকাতা—৩৩

কানন·চন্দ্রা·উমা

সুনীল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পের অভিনেত্রীকুলের মধ্যে একমাত্র কানন দেবীরই সমগ্র ভারতব্যাপী সুনাম ও জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল শুধু নয়, আজও সেই জনপ্রিয়তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বাঙলা দেশে থেকে, বাঙলার তোলা হিন্দী ছবিতে অভিনয় করে এক সময়ে ভারতের তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয়া অভিনেত্রী হিসাবে অভিনন্দিতা হয়েছিলেন, বোম্বাইয়ের অভিনেত্রীকুল সবিস্ময়ে এই অভিনেত্রীর অভিনয়-কলা দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলেন, বোম্বাইয়ের প্রযোজকেরা সে সময়ে এসেছিলেন প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাঁকে ওখানে নিয়ে যেতে ; কারণ তাঁর নাম তখন 'বক্স অফিস' ভ'রে দিতে পারতো। গল্পের কোনও প্রয়োজন ছিল না, দাও তাঁকে মনের মত ভূমিকা আর গান—তারপর যা করবার তিনি আপনিই ক'রে যাবেন। এই ছিলেন কানন। এই যশ-গৌরবের যিনি অধিকারিণী ছিলেন, তিনি যে কত বড় অভিনেত্রী হ'তে পারেন, কত বড় প্রতিভা তাঁর মধ্যে নিহিত থাকতে পারে—তা যে কেউ চোখ বুজে কল্পনা ক'রে নিতে পারেন।

আজকের কানন দেবীকে এই সঙ্গে কল্পনা করুন। চিত্র-সাংবাদিকতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে আজও জানি, বাঙলা দেশের বাইরে এখনও তাঁর অগুণতি গুণমুগ্ধ ভক্ত আছেন, অথচ বাঙলা দেশে আজ কানন দেবী অতীত। আজও তাঁর অভিনয়-প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নি, প্রতিভা ফুরিয়ে যায় না ব'লেই, আজও যে তিনি সুদক্ষা অভিনেত্রী তার পরিচয়ের স্বাক্ষর তাঁর অভিনীত চরিত্রে মাঝে মাঝে স্ফুরিত হয় ; অথচ সেই কাননের নামে আর দর্শকে মূর্চ্ছা যান না, পাগল হন না (এককালে হ'য়েছেন) বা দর্শকের ভিড়ে চিত্রগৃহ ভেঙে পড়ে না। আজকের দর্শক সে কাননকে চেনেন না, যে কানন ছিলেন একদা সমস্ত দর্শকের মানস-প্রিয়া, ছিলেন একমাত্র রোম্যান্টিক নায়িকা। চন্দ্রাবতীর মতো কানন তাঁর দর্শককে ধ'রে রাখতে পারেন নি, পারেন নি উমাশশীর মত একটি 'লেজেণ্ড' (legend) সৃষ্টি ক'রে অমর হ'য়ে যেতে। অভিনেত্রীর অহমিকায় তাঁর বেধেছে, তাই আজও তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টায় আলস্য নেই, কিন্তু দীপ্ত মধ্যাহ্নের রবিচ্ছটার মতো তিনি আর বিকশিত হতে পারছেন না। কানন দেবীর অভিনেত্রী-জীবনে এ-ই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

কিন্তু সমগ্র ভারতের চিত্রশিল্পের ইতিহাসের পাতা উলটে গেলেও সমস্ত দিক দিয়ে সার্থক অভিনেত্রী তো কানন দেবী ছাড়া আর একজনের কথাও মনে হয় না। ছায়াছবির অভিনেত্রী হিসাবেই যেন তাঁর সৃষ্টি! এত সুন্দর মুখশ্রী, যে কোনো দিক দিয়ে যে কোনো ভাবে ছবি তুললেই তাঁর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ছটা ঝলসে ওঠে, এত সুঠাম দেহ-বল্লরী, অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ চোখ ও তার পাগল-করা চোখের ভাষা, দুর্দ্ধর্ষ অভিনয়-প্রতিভা আর তেমনি সুকণ্ঠ—ভারতের চিত্রশিল্পে এত গুণ তো আর কোনও অভিনেত্রীর একসঙ্গে দেখা যায় নি। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কানন দেবীর সমস্ত গুণের স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের মধ্যভাগে। কিন্তু একবার যখন তিনি দর্শককে তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভায় মোহাচ্ছন্ন ক'রে ফেললেন, তারপর থেকে আর তিনি পিছু সরেন নি। কানন দেবীর প্রদীপ্ত যুগে অন্য সমস্ত অভিনেত্রী ম্লান হ'য়ে গিয়েছিলেন, এমন কি চন্দ্রাবতীও। কানন দেবীর সেই স্বর্ণ যুগের কথা আজ অনেক দর্শকেরও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়ার কথা। কানন দেবীর 'সাথী' ছবিতে গাওয়া প্রাণ-মাতানো গানের একটি কলি : 'যদি হারিয়ে যাওয়ার লগন এলো, হারিয়ে যাবো' তাই আজ বারবার স্মরণ হয়।

কানন দেবীর অভিনয়-জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। আদি যুগ বা 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে'র পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ, মধ্য বা নিউ থিয়েটার্সের যুগ এবং উত্তর-নিউ থিয়েটার্স যুগ। মধ্য-যুগেই কানন দেবীকে অভিনয়-কলা ও জনপ্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখরে পাওয়া গিয়েছিল এবং 'কানন দেবী' ব'লে তিনি পরিচিত হলেন সেদিন থেকেই।

প্রথম যুগে কানন দেবী সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও চাপা পড়েছিলেন যোগ্য পরিচালকের অভাবে। তাঁর অভিনয় ধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারেন নি পরিচালকেরা। তাঁকে অভিনয়ের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয় নি, Passive অভিনয় করতে হ'ত তাঁর। এত রূপ-লাবণ্য নিয়ে তিনি পুতুলের মত এসে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেন ('শ্রীগৌরাঙ্গ' ছবিতে বিষ্ণুপ্রিয়া), দু'এক ফোঁটা জল চোখ দিয়ে পড়তো কি না পড়তো—ক্যামেরা চলে গেছে অন্য দিকে। তিনি যে অভিনেত্রী, তাঁর মধ্যে যে বিরাট সম্ভাব্যতা থাকতে পারে—এ কথা চাপা পড়েছিল। কেউ তুলে ধরলেন ছবির পর্দ্দায় তাঁর অর্দ্ধ-অনাবৃত দেহ ('বাসবদত্তা' ছবি দ্রষ্টব্য)—অভিনয় তাঁকে করতে হয় নি। এমনকি যে 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' ছবি থেকে তাঁর অভিনয়-জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়, এই ছবিতেও তাঁকে বহুক্ষণ অর্দ্ধ-বেশে, (রাত্রে বেশ-ভূষা পরিবর্ত্তন করার অছিলায়), সমানে ক্যামেরায় রাখা হয়েছিল। কানন দেবীর অভিনয়-ক্ষমতার ওপর যেন পরিচালকের তখনও আশঙ্কামিশ্রিত সন্দেহ ছিল।

সেই যুগে কানন দেবী পরিচালকদের কৃপায় সাধারণ শ্রেণীর অভিনেত্রীর আসন থেকে অসাধারণ হ'য়ে উঠতে পারেন নি। 'কণ্ঠহার', 'বিষবৃক্ষ', 'মা', 'কৃষ্ণ-সুদামা' ছবিগুলিতে চলনসই অভিনয় ক'রে (চলনসই সুযোগই তিনি পেয়েছিলেন) তিনি কোনও রকমে টিকে রইলেন। কিন্তু আগুন ছাই চাপা থাকে কতক্ষণ? তাঁর চাপা প্রতিভা 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' ছবিতে বিস্ময়ের প্রচণ্ড আলোড়নে ভেঙে পড়লো। আলট্রা-মডার্ণ স্মার্ট নীহারিকার ভূমিকায় অভিনয়ে ও গানে তিনি সমস্ত দর্শককে জয় ক'রে নিলেন। নিউ থিয়েটার্সের বাইরে আর এক তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী অভিনেত্রীর আবির্ভাবে সকলে বিস্ময়-বিমূঢ় হ'লো। তাঁর মধুক্ষরা সুকণ্ঠের গানে ও প্রতিভা-দীপ্ত অনবদ্য অভিনয়ে দর্শক ভেঙে পড়লো চিত্রগৃহে। দর্শকে যেন নূতন ক'রে চিনলো কানন দেবীকে। ভুলে গেল আগেকার সেই মোমের পুতুলের মতো সুন্দর অথচ নির্জীব অভিনেত্রীকে। এই ছবি, এবং কানন দেবী সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকের মানস-প্রিয়া হয়ে দাঁড়ালেন। 'কানন' নাম যে সেইদিন থেকে দর্শকদের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো, তা থামলো না আজও। এই ছবিতে তো শুধু সুরু, দিগ্বিজয়ের প্রথম ধাপ মাত্র।

তারপর নিউ থিয়েটার্সের যুগ।

'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে' অসাধারণ সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেও হয়ত কানন দেবীকে হারিয়ে যেতে হ'ত, যেমন নিউ থিয়েটার্স ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনেক

প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সর্ব্বগুণ থাকা সত্ত্বেও বারবার ব্যর্থ ছবিতে আত্মপ্রকাশ ক'রে জনপ্রিয়তা রক্ষা করতে পারেন নি। সেদিক দিয়ে কানন দেবীর অভিনয়-জীবনের সবচেয়ে বড় মোড় ফিরলো সেদিন, যেদিন তিনি নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করলেন। এই প্রতিষ্ঠানের কোনও ছবিই তখন খারাপ হ'ত না এবং তাঁর ভাগ্যও বলতে হবে যে তিনি প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার পরিচালনার স্বর্ণ যুগে তাঁর ছবিতে কাজ করার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছিলেন। এই ছবিটির নাম 'মুক্তি'। গায়ক ও সুরকার হিসাবে পঙ্কজ মল্লিকের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে, তাঁরই প্রথম স্বাধীন সঙ্গীত পরিচালনায় তিনি যে তিনটি গান গাইলেন, তা সমস্ত বাঙলা দেশকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখলো; চিত্রশিল্পে অভিনেত্রীদের মধ্যে এত সুকণ্ঠও যে থাকতে পারে, তা ছিল দর্শকের কল্পনাতীত। সেইসঙ্গে প্রথমেশ-চন্দ্র বড়ুয়ার মতো জনপ্রিয় নায়কের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ও সকলকে বিস্মিত করলো। দর্শককে আরও সচেতন করলো তাঁর অপূর্ব্ব সুঠাম দেহ, স্নিগ্ধছায়া চোখ ও সুন্দর মুখশ্রী। 'মুক্তি' ছবিতেই তিনি 'তারকা' হলেন। এতদিনের ব্যর্থ ছবির তালিকা দর্শক-মন থেকে স'রে গেল। কানন দেবী হলেন তখন সে-যুগের সর্ব্বজনপ্রিয়া নায়িকা। অন্যান্য অভিনেত্রীরা সাইডিং-এ স'রে দাঁড়ালেন, যেন লাইন তাঁর। এই যুগই কানন-যুগ।

নিউ থিয়েটার্স কানন দেবীর সঠিক মূল্য নিরূপণ করতে পেরেছিল। বুঝেছিল যে সায়গলের মত এঁরও কণ্ঠে দর্শককে বিমুগ্ধ ক'রে দেওয়া যাবে। তাই সায়গল ও কাননকে একত্রে নামানো হ'ল 'সাথী' (বাঙলা) ও 'ষ্ট্রীট সিঙ্গার' (হিন্দী) ছবিতে। সঙ্গীত পরিবেশনা করাই ছিল ছবিটির উদ্দেশ্য; সেদিক দিয়ে প্রতিটি গান কানন ও সায়গল তাঁদের কণ্ঠ-মাধুর্য্যে ও গায়কী ভঙ্গিমায় অবিস্মরণীয় ক'রে তুললেন। তার ওপরেও কানন দেবী অভিনয়ের বিচিত্র-ভঙ্গিমায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিতা করলেন অভিনেত্রী হিসাবে। কানন দেবী যে-ধরণের অভিনয়ে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী, সেই অভিনয়-ধারার সূত্রপাত এই ছবিতে। সেই চঞ্চলতা, চোখ-মুখ-ভরা দুষ্টুমির উচ্ছলতা, হাসির ঝলকে গড়িয়ে পড়া, innocent frolics বলতে যা বোঝায়—তিনি তাঁর অভিনয়ে তাকে এমনভাবে ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা দিলেন যা, আজ এত বৎসরের শিল্পের প্রগতিতেও অন্য কোনও অভিনেত্রী তাঁর অভিনয়ের অর্দ্ধেকও পৌঁছতে আজ পর্য্যন্ত সক্ষম হন নি। যে fre frivolous অভিনয়ের জন্য আজ বোম্বাইএর অভিনেত্রীরা প্রসিদ্ধা, সেই নার্গিস, গীতাবলী, সুরাইয়া, নলিনী জয়ন্ত প্রমুখা অভিনেত্রীরাও কানন দেবীর অভিনয় ধারাকে অনুসরণ ক'রে চলেছেন, নূতনত্ব আনতে পারেন নি, স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি, অভিনয়-মানে তো উঠতেই পারেন নি। এই ছবিটিই তাঁকে সমগ্র ভারতে জনপ্রিয়া অভিনেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলো।

'মুক্তি' ছবির 'চিত্রা'র মতো একটি sophisticated মেয়ে বা 'সাথী' ছবির 'মঞ্জু'র মতো unsophisticated মেয়ের দুটি ভূমিকাতেই তখন তিনি সমান অভিনয় করতেন। এক কথায়, তখনকার দিনে ছবির নায়িকা যে ধরণের হ'ত, তিনিই তার ছিলেন আদর্শ অভিনেত্রী। এই sophisticated নায়িকার ভূমিকায় তাঁকে দেখা গেছে 'পরাজয়', 'অভিনেত্রী' ও 'পরিচয়' ছবিতে—চেহারার জৌলুসে যেখানে তিনি রাজকুমারী, কণ্ঠ-মাধুর্য্যে সেখানে তিনি একক সম্রাজ্ঞী। এই ছবিগুলিতে অভিনয়ের জন্য প্রশংসা তিনি অর্জ্জন করেছেন; কিন্তু গায়িকা হিসাবে মন হরণ ক'রেছেন। তাঁর ছবিতে তিনটি কাননের প্রতিযোগিতায় সঙ্গে তাঁর যুঝতে হতো: রূপসী কানন, অভিনেত্রী কানন ও গায়িকা কানন।

sophisticated ভূমিকায় কোনও ছবিতে তিনটি কানন প্রথম হয় নি, দুটি কাননই এগিয়ে এসেছে।

কিন্তু unsophisticated ভূমিকায় তিনটি কানন সমানভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। 'বিদ্যাপতি' এই দিক দিয়ে তাঁর সর্ব্ব-সুন্দর শুধু নয়, অবিস্মরণীয় ছবি। একটি ছবিকে একা কি ক'রে একজন অভিনেত্রী নিজের কাঁধের ওপরে তুলে নিয়ে হেসে, গেয়ে, নেচে, কেঁদে, অভিনয়ে অভিভূত ক'রে দর্শককে বারবার ছবিঘরে নিয়ে আসতে পারে, 'বিদ্যাপতি'তে কাননের অভিনয় তারই জলন্ত স্বাক্ষর বহন করেছে। 'বিদ্যাপতি' ছবিটির সার্থক নামকরণ তাই হওয়া উচিত ছিল 'অনুরাধা'। দুর্গাদাস, পাহাড়ী, ছায়া, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অমর মল্লিক, দেববালা প্রভৃতিকে দূরে ফেলে অপ্রতিহত ভঙ্গীতে তিনিই একমাত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, হৃদয় জয় করলেন; ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয়া অভিনেত্রীতে পরিগণিত হলেন। নির্দ্দোষ চোখের পরিপূর্ণ পরিপ্রেক্ষণ, চোখের পাতা দুটো সলাজ বিস্ময়ে ঘনঘন ফেলে সুমধুর হেসে ক্ষণকের জন্য তাকানো, অর্দ্ধেক কথা ব'লে হাসি বা বিশেষ ভঙ্গীমায় নির্ব্বাক সংলাপকেও সবাক ক'রে তোলা, যৌবনোচ্ছলা দেহলি-ঠমকে দর্শককে নিঙড়ে নিঙড়ে আপন ক'রে নেওয়া, কণ্ঠে পৃথিবীর সুধা উজাড় ক'রে দেওয়া আজ পর্য্যন্ত কোনও অভিনেত্রীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। সবাক চিত্র-জগতের একমাত্র মানসী ছিলেন কানন, আর এই ত্রিশ বছরের মধ্যে আর একজনকে তো সেই সিংহাসনে আরোহণ করতে দেখা গেল না।

অবশ্য এর মূলে পরিচালক দেবকীকুমার বসুর প্রচেষ্টা সবচেয়ে কার্য্যকরী ছিল। তাই তাঁরই 'সাপুড়ে' ছবিতে আবার প্রায় একই ধরণের ভূমিকায় তিনি আবার নিজের সুচারু অভিনয়-কলায় দর্শক-চিত্ত জয় করলেন। এরপর এলো উত্তর-নিউথিয়েটার্স-এর যুগ—দীর্ঘ কিন্তু সংক্ষিপ্ত। একাধিক ব্যর্থ ছবির পর দেবকীবাবু তাঁরই জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' কাহিনীর নায়িকা শৈবলিনীর ভূমিকা পরিবর্ত্তিত করলেন। কানন আবার এই ছবিতে প্রমাণ করলেন মনের মতো ভূমিকায় তিনি এখনও অদ্বিতীয়া এবং চিরকালের জন্যই।

নিউ থিয়েটার্সের যুগের পর 'শেষ উত্তর' ও 'যোগাযোগ' ছবি দুটিতেই ও তিনি নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখলেন। 'শেষ উত্তর' ছবিটিতে প্রমথেশ বড়ুয়া বা যমুনাকে হ্যাণ্ডিক্যাপ দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন এতদূরে যে, পিছু ছুটেও তাঁর নাগাল পাওয়া যায় না। আর 'যোগাযোগ' ছবিতে তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে অভিনয় করার মতো কেউ ছিল না—সেই প্রতিভাই কারো ছিল না; না জহর গাঙ্গুলীর, না সন্ধ্যারাণীর না আর কারো।

কিন্তু তারপর বাজে কাহিনী ও বাজে পরিচালনার ভিড়ে কানন দেবীর সিংহাসন টলতে সুরু করলো। বিদেশিনী, পথ বেঁধে দিল, বনফুল, কৃষ্ণলীলা, তুমি আর আমি, অনির্ব্বাণ—কোনও ছবিতে তাঁকে অভিনয় করতে দেওয়া হয় নি, তাঁকে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। মনের

মতন চরিত্র নেই, অভিনয়ের সুযোগ নেই—কানন দেবী সে যুগের দর্শকের মনে বেদনা দিলেন, আসন লাভ করতে পারলেন না। একেবারে শেষের দিকে 'বাঁকা লেখা' আর 'অনুরাধা' ছবিতে তিনি একটু ভাল অভিনয় করলেও—তখন দর্শক-মন তাঁর এত বিরুদ্ধে যে আর পূর্ব্বের গৌরবে ফিরে যেতে পারলেন না।

উত্তর-নিউ থিয়েটার্স যুগের একটি অঙ্কের যবনিকাপাত হ'ল এখানে। এই কয়েক বছরের মধ্যে উল্কার মত বিস্ময় সৃষ্টি ক'রে তিনি মিলিয়ে গেলেন। যাঁরা তাঁকে তার মধ্যাহ্ন সূর্য্যের দিনে পরিপূর্ণ রৌদ্রচ্ছটায় দেখেছেন তাঁরা জানেন আজকের কানন সেই কাননের ছায়ার ছায়াও নয়। কত বড় প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী তিনি ছিলেন আজকে তাঁকে দেখে কল্পনাও করা যায় না। কয়েকটি বৎসর বাঙলা দেশে থেকে ভারতের সমগ্র দর্শকশ্রেণীর হৃদয়ে তিনি অপ্রতিহত রাজত্ব ক'রে গেছেন—মুক্তি, স্ট্রীট সিঙ্গার, হারজিৎ, সপেরা, বিদ্যাপতি, জোয়ানি কী রীত, জবাব, হসপিট্যাল প্রভৃতি ছবি ভারতের সর্ব্বত্র সমানভাবে আদৃত হয়েছে এবং প্রতিবারই নূতন ক'রে তিনি দর্শকদের মন হরণ করেছেন। স্বপ্নের মতন তা শোনায়।

তারকার ego তাঁর আছে, অভিনেত্রী হিসাবে তিনি হারিয়ে যাবেন—এ তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাই প্রযোজিকা হ'য়ে তাঁকে অভিনয় করতে হচ্ছে। 'অনন্যা' ছবিতে তাঁকে নূতন ধরণের ভূমিকায় দেখা গেল; কিন্তু যতখানি ভাল লাগা উচিত ছিল, তত লাগে নি। তার কারণ তিনি প্রযোজিকা, তিনিই নায়িকা। তাঁকে প্রাধান্য দেওয়া হ'য়েছে সর্ব্ব-বিষয়ে—এমনকি মেক্‌-আপেও। প্রৌঢ়া তিনি সেজেছেন, কিন্তু তা শুধু চুলে সাদা রঙ মেখে, চোখে সুন্দর চশমা প'রে। তাঁর সৌন্দর্য্যকে তিনি চাপতে প্রস্তুত হন নি, বরং আরও উজ্জ্বল ক'রে দিয়েছেন। আর সত্য কথা বলতে গেলে সে ভূমিকা তাঁর জন্য নয়।

'বামুনের মেয়ে' ছবিতে এই লোভ কাটিয়ে উঠলেও 'মেজদিদি' ছবিতে সে লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। যে ভূমিকা তাঁর নয়, সেই ভূমিকাই তিনি বেছে নিলেন। যাঁরা মলিনাকে এই একই ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছেন, তাঁরা বুঝবেন দুটি অভিনয়ে কত পার্থক্য! মলিনা দেবীর অভিনয়ের গভীরতার কাছে তাঁকে একটি অসহায় শিশুর মত মনে হয়েছিল। তাই যে legend তিনি একদা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছিলেন, তা আজ ভাঙবার দায়িত্ব তিনিই নিয়েছেন।

কিন্তু আমি পরিপূর্ণভাবে আজও বিশ্বাস করি যে কানন দেবীর এই হারিয়ে যাওয়া রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতই ক্ষণস্থায়ী; কারণ কানন দেবীর গৌরবোজ্জ্বল অভিনয়-যুগের কথা আজও বিস্মরণের খাতায় লেখা নেই। তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠার জন্য চাই এক পরিচালক, যিনি তাঁকে তাঁরই মত একটি ভূমিকা দেবেন। আজ কানন দেবী বয়সের দিক দিয়ে নায়িকার কোঠা পেরিয়ে গেলেও অভিনয়-মানসের দিক দিয়ে এখনও তরুণী, বয়সের গভীরতা তাঁকে এখনও মন্থর ক'রে তুলতে পারে নি। 'মেজদিদি' ছবিতে তার স্বাক্ষর এখনও পাওয়া যায়। ক্ষণিকের তরুণীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় আবার পূর্ব্ব-স্মৃতির সুরভি ব'য়ে আনে। সেইজন্য তিনি যদি আবার 'বিদ্যাপতি', 'সাপুড়ে', 'সাথী' বা 'চন্দ্রশেখর' ছবির মত ভূমিকা পান, তবে আবার তিনি দর্শকের সামনে এগিয়ে আসতে পারবেন; বয়সে ছাপ (আজ বাঙলার কয়টি অভিনেত্রীকেই বা তরুণী ব'লে মনে হয়?) তাঁর দুর্দ্ধর্ষ অভিনয়-প্রতিভায় হারিয়ে যাবে। অভিনেত্রী কানন দেবী চিরন্তন তরুণী: লীলা-চপলা, প্রাণ-চঞ্চলা, যৌবনচ্ছলা।

তা ছাড়াও তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বরের দাম আজও কয়জন দিতে পারে? অভিনয় ছেড়ে দিয়ে প্লে-ব্যাক-গায়িকা হিসাবেও তিনি যদি থাকেন, তবে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেয় কে? কিন্তু অভিনেত্রী কানন দেবীকে তাতে হারাতে হয়। তাই কানন দেবীর আজ প্রয়োজন সঙ্গীত-মুখর প্রাণোচ্ছল ভূমিকা। এমনকি 'মীরাবাঈ'-এর ভূমিকাতেও আজ তিনি দর্শককে ফিরিয়ে আনতে পারেন।

তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে পাওয়া গেছে একমাত্র স্মৃতি-রেখা বিশ্বাসকে—সৌন্দর্য্যে, গানে, অভিনয়-প্রতিভায় দেড়-শো যোজন পিছিয়ে; কিন্তু সমগ্র বাঙলা ছায়াছবিতে তিনিই একমাত্র।

চিত্রবাণী প্রেস—৫, [illegible] লেন, কলিকাতা : ২৯ (ফোন : সাউথ ১১১১) হইতে নিতাই চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং চিত্রবাণী কার্য্যালয় হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদনা ও পরিচালনায় : গৌর চট্টোপাধ্যায় এম এ
সম্পাদনায় সহযোগী : লালচাঁদ দত্ত
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-সজ্জায় : রামকৃষ্ণ দত্ত ও সনৎ ভট্টাচার্য্য
কর্ম্মাধ্যক্ষ ও বিজ্ঞাপন-সচিব : নিতাই চট্টোপাধ্যায়
আলোকচিত্রগ্রহণে : কে এ রেজা, নির্ম্মল মল্লিক ও শ্রীশম্ভু

★ চিত্রবাণী ✱ সূচীপত্র ✱ মাঘ, ১৩৬১ ★

সম্পাদকীয়— ৫
আপনাদের মতামত— ৮
দিল্লীতে 'ফিল্ম-সেমিনার'-এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শ্রীনেহরুর ভাষণ ৯
দর্শকের দায়িত্ব—
ভি, শান্তারাম ১২
বিদেশী বাজারে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা—
এস. এস, ভাসন ১৫
ভারতীয় বাজারে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রতিবন্ধক—
খাজা আহম্মদ্ আব্বাস ১৮
'ফিল্ম সেমিনার'-এর আয়োজন কেন ?—
দেবিকারাণী রোয়েরিখ্ ২২
ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের আঙ্কিক হিসাব— ২৪
নতুন ছবি— ২৫
সাজঘর ; রাইকমল; দত্তক; অনুপমা; ডাকিনীর চর
আপনাদের চিঠি— ৩২
নতুন নাটক—
'বহুরূপী'র "রক্তকরবী" ৪০
ষ্টুডিও সংবাদ— ৪৩
ঘটনার অন্তরালে— ৪৬
শিল্পী-দম্পতি—পদ্মিনী সেনগুপ্তা ৫১
খবরাখবর— ৫৩
রাষ্ট্র ও ছায়াছবি—
রাজ কাপুর ৬০
বিবিধ অনুষ্ঠান— ৬৪
পুস্তক পরিক্রমা— ৬৮
চীনা নাটক ও সঙ্গীত— ৬৯

★ ● ছ বি র পা তা য় ● ★

প্রচ্ছদপটে : জনপ্রিয়া অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন

আর্ট প্লেটে : 'ইয়াসমিন' চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা ; 'বিধিলিপি' চিত্রে সন্ধ্যারাণী ; সোভিয়েট প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপরত বাংলার চিত্র-তারকারা ; 'কালিন্দী' চিত্রের পরিচালকসহ দুই নায়িকা দীপ্তি রায় ও মলিনা দেবী ; হোলি উৎসবে উল্লসিত নীলিমা দাস ; অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও নমিতা সিংহ

সাধারণ পৃষ্ঠায় : 'ফিল্ম সেমিনার'-এর উদ্বোধক শ্রীনেহরু এবং যুগ্ম-পরিচালিকা দেবিকারাণী ; 'দেবত্র' ছবিতে কানন দেবী ; অভিনেতার রূপসজ্জায় সাহিত্যিক-পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ; 'কালিন্দী' চিত্রের কাহিনীকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিচালক নরেশ মিত্র ; বিচিত্র রূপসজ্জায় শক্তিমান নট বিকাশ রায়, 'আজাদ' চিত্রে দিলীপ-কুমার ও মীণা কুমারী

চিত্রবাণী

নাট্য, চিত্র ও শিল্পকলার
সচিত্র মাসিক পত্রিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য—১২৲ (সাধারণ ডাকে): ১৫॥০ (রেজিষ্ট্রীডাকে)

সপ্তম বর্ষ	মাঘ ১৩৬১	পঞ্চম সংখ্যা

রঙীন ছবির যুগ

ভারতে রঙীন ছবি তোলার উৎসাহ যেন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। গেভাকালারে ছবি তোলার ব্যাপার বোম্বাইতে ইতিমধ্যেই বেশ কার্য্যকরী হয়েছে। তা'ছাড়া, 'টেকনিকালার'-এ ছবি তোলার জন্যে বোম্বাইতে একটি রসায়নাগারের প্রতিষ্ঠা হবে ব'লেও আশা করা হচ্ছে। ইতিপূর্ব্বে এদেশে যে কয়খানি রঙীন ছবি প্রযোজিত হয়েছে তারই গৌরবদীপ্ত সাফল্যের ফলেই এই সব রসায়নাগারের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য হচ্ছে। আজ পর্য্যন্ত ভারতে যে ক'খানি রঙীন ছবি প্রযোজিত হয়েছে তাতে এদেশের চিত্রশিল্পেরই মর্য্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাম্প্রতিককালে যে-ক'টি রঙীন ছবি মুক্তিলাভ করেছে তাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ছবি হলো মেহবুব প্রতিষ্ঠানের 'আন'। এই প্রসঙ্গে আধা-ডকুমেণ্টারী ছবি 'দি রিভার'-এরও উল্লেখ করা যায়—তবে এটি প্রযোজিত হয় হলিউডে। ইদানীং কয়েক বছরের মধ্যে যে ক'টি রঙীন ছবি তোলা হয়েছে, সেগুলি হলো—'ঝাঁসী-কী-রাণী', 'ময়ূরপঙ্খ', 'পাম্পোশ', 'রাধাকৃষ্ণ' এবং 'শাহান্‌শা'। বোম্বাইতে শান্তারাম পরিচালিত টেকনিকালারে একখানি ছবি তোলা হচ্ছে, সেটির নাম "ঝনক ঝনক পায়েল বাজে"। বাংলা দেশেও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রঙীন ছবি তুলবেন বলে স্থির করেছেন। দেবকী বসু পরিচালিত পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি 'মীরার প্রভু' বাংলায় এবং এরই হিন্দী সংস্করণ 'মীরা-কে প্রভু' তোলা হবে গেভাকালারে। আজ প্রোডাকশান্স-এর নির্ম্মীয়মান 'দস্যু মোহন' ছবির কয়েকটি নৃত্যের দৃশ্য গেভাকালারে তোলা হবে। ভারতে তৈরী যে ক'টি রঙীন ছবি মুক্তিলাভ করেছে, সংখ্যার দিক থেকে সেগুলি খুব বেশী না হলেও রঙীন ছবির গুণাগুণের বিচারে তা সার্থক হয়েছে।

নতুন যে রসায়নাগার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তার ফলে রঙীন ছবি তোলার সুযোগ সুবিধা যে আরও বৃদ্ধি পাবে তাতে সন্দেহ নেই। এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুগ্ম-প্রযোজনায় ভারতে ছবি তোলার যেসব কথাবার্ত্তা চলছে তাতে বিভিন্ন দেশের চিত্রশিল্পই উপকৃত হবে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার ভাব-ধারার বিনিময়ে ছবির মারফতে সেইসব দেশের সংস্কৃতিক যোগাযোগও দৃঢ়তর হবে। কিছুকাল পূর্ব্বে পাকিস্তানে আগফা প্রতিষ্ঠানের রসায়নাগার স্থাপিত হয়েছে। রঙীন ছবি তোলাকে কেন্দ্র ক'রেও যদি ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাতে উভয়দেশের মধ্যে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে যে-অচলাবস্থার উদ্ভব হয়েছে তারও কিছুটা সমাধান হওয়ার আশা আছে বলে মনে হয়। সাধারণ ছবির তুলনায় রঙীন ছবি প্রযোজনার ব্যয় খুবই বেশী। সেইজন্য এই জাতীয় ছবির প্রদর্শনের ক্ষেত্রও অধিকতর বিস্তৃত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। পাকিস্তান যদি বেশী পরিমাণে রঙীন ছবি তুলে সাফল্য লাভ করতে চায় তাহ'লে তার পক্ষে, ভারতীয় চিত্রগৃহসমূহেই সেইসব ছবির প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতেই হবে। ভারতে প্রযোজিত ছবি এ দেশীয় দর্শকদের কাছে প্রদর্শনের ক্ষেত্র যদিও যথেষ্ট বিস্তৃত তবুও পাকিস্তানে সেইসব ছবির প্রদর্শন ভারতীয় প্রযোজকদের কাছে সমান উৎসাহ জোগাবে। সাধারণ ছবি প্রদর্শনের বিধি-নিষেধে উভয় দেশই যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু রঙীন ছবি প্রযোজনা ও তার প্রদর্শন সেইসব বিধি-নিষেধের অপসারণের পথে কিছুটা আশার আলোকের ইঙ্গিত জানাচ্ছে ব'লেই আমরা মনে করি।

অধুনা রঙীন ছবির যে-জনপ্রিয়তা সারা পৃথিবীর দর্শকদের কাছে হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে প্রযোজিত রঙীন ছবি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রদর্শনের ফলে এদেশের চিত্রশিল্পের এবং ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের পরিচয়ও ঘটতে পারে। ভারতে যেমন বিভিন্ন জাতির মানুষ, বিভিন্ন প্রকার আচার-ব্যবহার এবং নানান্ বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যাদির সমন্বয় রয়েছে তা খুব কম দেশেই আছে। অথচ, প্রচারকার্য্য কিংবা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-মূলক ছবি হিসেবে এসব তোলার তেমন কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। ভারতীয় চিত্র-প্রযোজকরা রঙীন ছবি তুলতে গিয়ে এসবের অতি সামান্য অংশই তাঁদের চিত্র-তালিকায় স্থান দিয়েছেন। ফিল্মস্ ডিভিসন অবশ্য কোন কোন বিষয় নিয়ে কিছু কিছু ছবি তুলেছেন। বৈদেশিক প্রযোজকদের মধ্যে অনেকেই ভারতের কোন কোন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে চিত্রগ্রহণ করেছেন। সেইসব 'শর্ট' ছবির কিছু কিছু হয়তো ভারতের পক্ষ থেকে কেনা হতে পারে যদি সেগুলি উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হয়। কিন্তু রঙীন ছবির মাধ্যমে উপরোক্ত সৌন্দর্য্যগুলি ফুটিয়ে তোলার জন্যে সত্যিকার কোন প্রচেষ্টাই আজ পর্য্যন্ত দেখা যায়নি। সাধারণ 'শর্ট' ছবির কিছু কিছু তোলা হয়েছে কিন্তু রঙীন ছবি তোলার কোন উৎসাহ দেখা যায় নি—সম্ভবতঃ রঙীন ছবি তোলার ব্যয়াধিক্যই এর প্রধান কারণ। তার ওপর এইসব ছবি তোলার পর সরকার সেগুলি তাঁদের নির্দ্দিষ্ট তালিকাভুক্ত করবেন কিনা অথবা প্রেক্ষাগৃহগুলি সেসব ছবি দেখাবার আদৌ সময় পাবে কিনা সে-বিষয়েও কোন নিশ্চয়তা নেই।

অন্ততঃ এই একটি বিষয়ে সরকার চলচ্চিত্রশিল্পকে কিছুটা কার্য্যকরী সাহায্য করলে তাতে চিত্রশিল্পের তথা সারা দেশের উপকার হবে। ভ্রমণ-বৃত্তান্তমূলক রঙীন ছবি তুললে, ইংরাজীতে যে-ধরণের ছবিকে 'ট্রাভেলগ' বলা হয়,—একদিকে চিত্রশিল্পের ভাণ্ডারও যেমন সমৃদ্ধিশালী হবে তেমনি সরকারও দর্শকদের কাছে শ্রদ্ধাভাজন হবেন। সত্যিকার সাহায্য এবং উদ্দীপনা যদি সরকার পক্ষ থেকে দেখানো হয় তাহলে এদেশের প্রযোজকরাও যে রঙীন ছবির মাধ্যমে ভারতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য-সুষমার সঙ্গে সারা বিশ্বের দর্শক-সমাজের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে অগ্রণী হয়ে আসবেন সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

বঙ্গীয় নাট্যপরিষদের দাবী

বিভিন্ন অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর সংযুক্ত-সংগঠন "বঙ্গীয় নাট্য পরিষদ" দাবী করেছেন, ১৮৭৬ সালের

নাট্যানুষ্ঠান আইন প্রত্যাহার করতে হবে আর অপেশাদার নাট্যানুষ্ঠানের ওপর থেকে প্রমোদ-করের বোঝা তুলে নিতে হবে। দেশপ্রেমমূলক নাটকের প্রযোজনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ শাসকরা রচনা ক'রেছিলেন ১৮৭৬ সালের নাট্যানুষ্ঠান আইন। এই আইন অনধিকারী পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে নাটক বিচারের ক্ষমতা, আর অভিনয় বন্ধ ক'রে দিয়ে কিংবা অভিনয়ের আগে তাদের খেয়ালখুসী মতই সে-বিচার তারা করতে পারে। পুলিশের মতে, নাটক যদি কুৎসামূলক. মানহানিকর, সরকারবিরোধী বা দুর্নীতিমূলক বিবেচিত হয়, তাহলে নাটকের অভিনয় পুলিশ একেবারে বন্ধ ক'রে দিতে পারে কিংবা সংশোধনের জন্য নির্দ্দেশ দিতে পারে। আমরা দেখতে পাই "নীলদর্পণ", "ভারতমাতা" থেকে সুরু করে "সিরাজদ্দৌলা", "মিরকাশিম", "প্রতাপাদিত্য", "চন্দ্রশেখর" পর্য্যন্ত প্রায় সব জাতীয়তাবাদী নাটককেই এই আইনকর্ত্তাদের দৌলতে পুলিশের রক্তচক্ষুর সামনে পড়তে হয়েছিল। ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনে রাজদ্রোহ, মানহানি, দুর্নীতি প্রভৃতির বিচারের ব্যবস্থা আছে, তবুও পুলিশকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়ে এই আইন রচনা করেছিল সাম্রাজ্যবাদী সরকার। সরকারী আয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে বাংলা দেশে এই সাম্রাজ্যবাদী সরকারই প্রমোদ-কর আইন পাশ ক'রেছিল ১৯২২ সালে। নাট্যক্ষেত্রে এই আইন এখন শুধু প্রযুক্ত হয় অপেশাদার নাট্যানুষ্ঠানের ওপর। কত আয়ই বা সরকারের এতে হয়! দেশ এখন স্বাধীন। সংস্কৃতির বিকাশের জন্য আমাদের জাতীয় সরকার উদ্যোগীও হয়েছেন দেখা যায়। কিন্তু শুধু সরকারী উদ্যোগেই জাতীয় সংস্কৃতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের পথ প্রশস্ত হতে পারে না; জাতির ব্যাপক সহযোগিতাও চাই সরকারী উদ্যোগের সাফল্যের জন্য। তাই, বেসরকারী উদ্যোগে নাট্যসৃষ্টির পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আইন দুটি—সেই নাট্যানুষ্ঠান আইন ১৮৭৬ ও বঙ্গীয় প্রমোদকর আইন ১৯২২ অবিলম্বে প্রত্যাহার ক'রে জাতির কাছে জাতীয় নাট্য প্রচেষ্টায় সরকারের আন্তরিকতা সপ্রমাণ করা দরকার। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে যে-সব আইনের প্রয়োজন ছিল, জাতীয় সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তো সমাধি রচনা করবে সে-সব আইনের। এদিক দিয়ে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে "বঙ্গীয় নাট্য-পরিষদের" দাবী ন্যায়সঙ্গত এবং জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিতে অবশ্যপূরণীয় অবশ্য, যাতে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কিছু সৃষ্টি না হয় কিংবা উন্নতমানের নাট্যসৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয় তার তত্ত্বাবধানের জন্য নাট্যশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদের নিয়ে সরকার একটি বোর্ড গঠন করতে পারেন, এঁরাই সরকারের পক্ষে নাট্যসৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে কার্য্যকরী ব্যবস্থার দায়িত্ব নেবেন। অপরাধ অনুসন্ধানে নিযুক্ত পুলিশের নিয়ন্ত্রণে নয়, শিল্পজ্ঞানী কলা-রসিকদের নিয়ন্ত্রণেই সুস্থ, কলাসম্মত জাতীয় নাট্যসৃষ্টি সম্ভব।

'রাইকমল' চিত্রের একটি দৃশ্য

আপনাদের মতামত

সাজঘর

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'সাজঘর' ছবিটি দেখলাম। নতুন ধরণের কাহিনীসম্বলিত একখানি ছবি হবে ব'লে প্রচারিত হয়েছিল। সেদিক থেকে ছবির কাহিনীতে নতুনত্ব দেখলাম। মঞ্চ জগতের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এক অভিনেতার ঘরোয়া এবং ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনী দেখানো হয়েছে এই ছবিতে। আমার একটা নতুন জিনিষ চোখে পড়লো, তা হলো বাপ ও ছেলের নিত্যকার দুঃখদুর্দশার কাহিনী। ঠিক এ-ধরণের চরিত্র-চিত্রণ ইতিপূর্ব্বে বাংলা ছবিতে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। তবে, কয়েকটি বিষয় একটু বিসদৃশ লাগলো। যেমন থিয়েটারের দেওয়ালে টাঙানো রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবির সামনে ঐরকম একজন মঞ্চের স্বনামধন্য শিল্পীর প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান ক'রে টলতে টলতে এসে নমস্কার করা এবং পরের দৃশ্যেই তার চরিত্রের মহানুভবতার নিদর্শনস্বরূপ হাত থেকে অত মূল্যবান আংটি খুলে দিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে অর্থ সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপার কেমন যেন লাগে। আমাদের দেশের শিল্পীদের সম্বন্ধে কি ঐ ধারণাই করতে হবে? ঐরকম প্রতিভাবান শিল্পী মদের অত যার নেশা, স্ত্রী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সবটুকু নেশা এক নিঃশেষে চলে গেল এটাও কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটতে পারে ব'লে মনে হয় না। একখানি গানের ব্যাপারে দেখা গেল কোথায় কত দূরে নায়কের স্ত্রীর গৃহে রেডিওতে গান হচ্ছে আর নায়ক যেন সেই গানই শুনতে পাচ্ছে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ছবিতে বহু ঘটনাই বাস্তবানুগ ক'রে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে কিন্তু এই ধরণের ত্রুটি কিছুটা ছবির সুনাম ব্যাহত করবে। ছবির চিত্রগ্রহণ বেশ ভালো হয়েছে। কিন্তু ছবিটির গতি-ধারা যেন বড়ই মন্থর বলে মনে হলো। ছবিটি সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মতামতই জানালাম।

নমস্কার নেবেন। ইতি—

জয়শ্রী সেন, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রাইকমল

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

ইদানীং বাংলা চিত্রজগতে সঙ্গীতপ্রধান ছবি পরিবেশন করার একটা রীতি প্রযোজকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। গত এক বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সঙ্গীতপ্রধান ছবি আমরা দেখলাম, যেমন—'ঢুলী', 'বৈজুভট্ট' ও 'কবি জয়দেব'। তারপরেই আলোচ্য 'রাইকমল' ছবিটি মুক্তিলাভ করলো। একদা বাংলা সবাক ছবির প্রায় প্রথম যুগে এই ধরণের সঙ্গীতবহুল ছবি তোলা হয়েছিল—যেমন 'ভাগ্যচক্র', 'চণ্ডিদাস', 'মুক্তি' ইত্যাদি। তারপর একেবারে সঙ্গীতবিহীন, অর্থাৎ কণ্ঠসঙ্গীত বাদ দিয়ে ছবিও তোলা হয়েছিল। বর্ত্তমানে আবার এই ধরণের সঙ্গীতবহুল ছবির মুক্তিলাভের কারণ কি? একি পুরাতন রুচির পুনরাবৃত্তি? অতিরিক্ত পরিমাণ সঙ্গীত-সংযোজনা এক-দিকে যেমন আনন্দ দেয় অন্যদিকে কিন্তু ছবির কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ তা' বহুল পরিমাণে কমিয়ে দেয় বলে আমার মনে হয়। তবে, আলোচ্য 'রাইকমল' ছবিটিতে সঙ্গীতের প্রাধান্য বজায় রেখেও কাহিনী বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। সবচেয়ে ভালো লেগেছে বাংলা-দেশের সত্যিকার রূপটি এই ছবিতে ফুটে উঠেছে ব'লে। পল্লী বাংলার জনগণের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের কথা এত সুন্দরভাবে ছবিতে পরিবেশিত হয়েছে যে সত্যিই তা সম্পূর্ণভাবে মন খুসীতে ভরিয়ে তোলে। এই রূপ ফুটিয়ে তুলতে সঙ্গীতে বাংলা এবং বাঙালীর যে বৈশিষ্ট্য তা আরও বেশী সাহায্য করেছে—কীর্ত্তন এবং বাউল গানের সংযোজনা। গানগুলির সুরও শ্রুতিসুখ-কর হয়েছে—তবে আবহ-সঙ্গীতের মধ্যে কয়েক স্থানে যেন একটু বিদেশী সুর বা যন্ত্রের রেশ পাওয়া গেল। গান যেমন সর্ব্বক্ষণ মনকে মাতিয়ে রেখেছে তেমনি ছবির ফটোগ্রাফীও এত পরিষ্কার লাগলো যে মনে হচ্ছিল এ-ছবি যেন বিদেশে তোলা হয়েছে। এই ধরণের এত ভালো টেকনিক্যাল কাজওয়ালা ছবি দেখলে খুবই আনন্দ হয় যে সত্যিই আমরা ভাল ছবি তুলতে পারি। এ ছবির উদ্যোক্তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি—

পরিমল ঘোষ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

সৃজনধর্মী শিল্পকলার প্রসারে যথাসম্ভব অল্প সরকারী হস্তক্ষেপ

দিল্লীতে চলচ্চিত্র আলোচনাসভার উদ্বোধনে শ্রীনেহরুর ঘোষণা

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রযোজক, পরিচালক ও চিত্রতারকাদের সমাবেশ

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে চলচ্চিত্র আলোচনাচক্রের উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, চলচ্চিত্র, ···সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি সৃজনধর্মী শিল্পকলাগুলিকে অবশ্যই উৎসাহ দান করতে এবং যথাসম্ভব অল্প সরকারী হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে সেগুলিকে প্রসার লাভের সুযোগ দিতে হবে।

জাতীয় পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগারের প্রেক্ষাগৃহে সঙ্গীত-নাটক আকাদেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এগুলি যখন সমাজের পক্ষে বিপদ ও আতঙ্ক-স্বরূপ হয়ে ওঠে তখনই সরকার এগুলির বিষয় কঠোর হস্তে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য। সামাজিক আতঙ্ক ও বিপদকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

শ্রীনেহরু বলেন যে, ভারতে চলচ্চিত্রের প্রভাব পুস্তক ও সংবাদপত্রের সমবেত প্রভাব অপেক্ষা অধিক। তিনি পরিমাণের দিক থেকে এ কথা বলছেন, গুণের দিক থেকে নয়। পুস্তক ও সংবাদপত্রের পাঠকসংখ্যা খুবই কম। চলচ্চিত্রের সর্বব্যাপী প্রভাব পুস্তক, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের প্রভাব অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। যে বস্তুর প্রভাব ব্যাপক বা সর্বব্যাপী তা জনসাধারণের চরিত্র গঠনের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জীবনধারার পক্ষে এক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা প্রয়োজন এবং যে হেতু এটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সে জন্য সরকারও নিঃসন্দেহে এই বিষয়ে আগ্রহান্বিত হতে বাধ্য। তবে কিভাবে সরকার তা নিয়ন্ত্রণ করবেন তা স্বতন্ত্র কথা।

শিশুদের উপযোগী ছবি

শ্রীনেহরু বলেন, এদেশে শিশুদের উপযোগী ভাল ভাল ছবি তোলা প্রয়োজন। এই দিকে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প পিছিয়ে আছে। কিন্তু শিশুদের উপযোগী ছবি তোলা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই ধরণের ছবিতে উপদেশের বাহুল্য থাকা উচিত নয়। নীতিকথা প্রচারের বা উপদেশ দেওয়ার সূক্ষ্মতর উপায় আছে। শিশুদের উপযোগী ভাল ছবি শিশুদের মানসিক বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। তিনি আশা করেন চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই বিষয়ে বিবেচনা করবেন।

সরকারী প্রতিযোগিতার কথা

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, প্রযোজক হ'য়ে চলচ্চিত্রশিল্পের

প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছে সরকারের নেই। তবে তাঁরা সংবাদ-চিত্র এবং বিশেষ ধরণের কতকগুলি ছবি তুলবেন। ছবির মান উন্নত করার জন্যই এটা করা হবে। তবে এর ফলে কিছু প্রতিযোগিতার উদ্ভব হতে পারে।

প্রমোদ-কর

ছায়াছবি সম্পর্কে প্রমোদ-কর তুলে দেওয়ার প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে শ্রীনেহেরু বলেন, "মোটামুটি বলতে গেলে সর্ব্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদের ওপর কেন কর ধার্য্য করা হবে না তা আমি বুঝতে পারি না। তবে কি পরিমাণ কর ধার্য্য করা হবে তা স্বতন্ত্র কথা।

বক্তৃতার প্রথম দিকে শ্রীনেহেরু বলেন, ভারতে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত এই ধরণের আলোচনাচক্র এই প্রথম। শিল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে তাঁদের সমস্যা সম্বন্ধে যাতে আলোচনা করতে পারেন সেই জন্যেই এর আয়োজন করা হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারাই চলচ্চিত্রশিল্প সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত সম্ভব হতে পারে। পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারাই পরিচালক ও প্রযোজকরা চিত্র-শিল্পের উন্নতি সাধন করতে পারেন।

দিল্লীতে এই চলচ্চিত্র আলোচনা-সভা বা ফিল্ম সেমিনারের অধিবেশন সম্পর্কে নাকি অনেক ঘরোয়া গণ্ডগোল হয়েছে। সংবাদপত্রেও এই বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ আপত্তি জানিয়েছেন, কেউ আনন্দ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এই বৈঠকে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে তা তিনি বুঝতে পারেন নি।

তাঁর মত যাঁরা সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের অপরকে সংশোধন করার একটা স্বাভাবিক ও প্রবল ঝোঁক থাকে। তিনি জনতার ক্ষেত্রে এই ঝোঁকটা প্রয়োগ করেন, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে করেন না। ব্যক্তিগত সংশোধন বা সংস্কার চেষ্টা দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে অপরিণত।

সরকারী হস্তক্ষেপ

কিরূপ ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারেন তার উদাহরণ দিয়ে শ্রীনেহরু বলেন, প্রযোজকরা যদি এমন যুদ্ধের ছবি তোলেন যাতে যুদ্ধের মনোভাব বিস্তার লাভ করতে পারে তাহলে এই ধরণের ছবির ওপর সরকার কঠোরভাবে হস্তক্ষেপ করবেন। এটা ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা নয়। তিনি ভারতে কোনরূপ যুদ্ধের প্রচারকার্য্য চান না।

নিখিল ভারত ফিল্ম ফেডারেশনের সভাপতি এস এস ভাসন যে নোট দিয়েছেন তার উল্লেখ করে শ্রীনেহরু বলেন, তিনি ফিল্মের প্রমোদ-কর ও সেন্সার ব্যবস্থা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। সেন্সার প্রসঙ্গে শ্রীনেহরু বলেন, তিনি অতিরিক্ত বিধিনিষেধের পক্ষপাতী নন। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা অসম্ভব।

আণবিক বোমার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এর উৎপাদন একদিন সুলভ ও সহজ হতে পারে। কিন্তু তাই বলে কি আমরা কাকেও ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে পকেটে আণবিক বোমা নিয়ে ঘুরতে দিতে পারি? ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়; কিন্তু রাষ্ট্রকে কখনও কখনও হস্তক্ষেপ করতেই হয়। অবশ্য কতদূর পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করা চলে তা বিবেচনাসাপেক্ষ। কোথায় সীমারেখা টানা হবে সে বিষয় মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু মোটামুটি নীতি সম্বন্ধে একমত হওয়া সম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এক এক সময় তাঁর মনে হয় যে, সম্মেলন, আলোচনাচক্র বা অনুরূপ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে সকল আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিজেকে এত সুলভ করা উচিত হবে না। 'বিশেষ চাপে পড়ে' দ্বিধার সঙ্গে তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। হাস্যধ্বনির মধ্যে তিনি বলেন যে, খুব সুলভ হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে হলে সংশয় প্রকাশ করতে হবেই। দেবিকারাণীর অনুরোধ এড়ান তাঁর পক্ষে কঠিন হয়েছিলো।

নেহরুজী বলেন যে, সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ওপর এর খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

চলচ্চিত্র আলোচনাচক্রে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে তিনি বলেন, কয়েক বছর হ'লো আমি সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছি। কিন্তু এর ফলে আমার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়নি, অবশ্য এর ওপর খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তিনি বলেন যে, অন্য ক্ষেত্রে কাজের ক্ষতি হলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাজ করতে ইচ্ছুক নন। তিনি বলেন, 'আমি সাহিত্য আকাদেমীর সভাপতি বলে চেয়ার-ম্যান আমাকে সভাপতিত্ব করতে বলেন। অবশ্য আমি যোগ্য কিনা জানি না। যে প্রতিষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট লেখকরা রয়েছেন সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হওয়া এবং আকাদেমীর সভাপতি হওয়া খুবই সম্মানের কথা এবং প্রধানমন্ত্রার কাজের জন্য অন্য ক্ষেত্রের কাজে বাধা পড়ুক তা আমি চাই না।' চলচ্চিত্রশিল্প প্রথম অবস্থায় বিশেষ কারও সাহায্য না পেয়েও নিজের চেষ্টায় যেভাবে অগ্রসর হয়েছে শ্রীনেহরু তার প্রশংসা করেন, এবং বলেন যে, কতকগুলি ভাল ছবিও তোলা হয়েছে। আয়তনের দিক থেকে এই শিল্প বড়। কিন্তু পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় স্বভাবতঃই এর অর্থ সঙ্গতি অল্প। তা হলেও তাঁরা যান্ত্রিক ব্যাপারে অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছেন। এ জন্য তাঁদের প্রশংসা করতে হয়।

অনেকে উন্নাসিক মনোভাব নিয়ে কোন কোন ভারতীয় ছবির সমালোচনা করেন। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য সমালোচনার সঙ্গত কারণও থাকে।

বিচারপতি শ্রীরাজমন্নর প্রধানমন্ত্রীকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের জন্য অনুরোধ ক'রে বলেন, ফরমোসা থেকে ফিল্ম সেমিনার প্রায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। কিন্তু শ্রীনেহেরুই কেবল দুটি বিষয়ে আলোচনার সময় ক'রে নিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীও চলচ্চিত্র প্রযোজক। তিনি নূতন ভারতের চলচ্চিত্র রচনা করছেন।

বাঙলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীর প্রযোজক, পরিচালক, চিত্র-তারকা ও যন্ত্র-কুশলীরা এই আলোচনা-চক্রে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে উদয়শঙ্কর, এস. এস. ভাসন, বি এন সরকার, খাজা আহম্মদ আব্বাস, দেওয়ান শরার, দেবিকারাণী, দুর্গা খোটে, নার্গিস, পৃথ্বিরাজ কাপুর, অহীন্দ্র চৌধুরী, রাজ কাপুর, দিলীপকুমার, কিশোর সাহু, ডেভিড ও পঙ্কজ মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য। উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কূট-নীতিকরাও উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সপ্তাহ-কাল ধরে এই আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান চলে।

দর্শকের দায়িত্ব

ভি শান্তারাম

আজকাল শিক্ষিত নর-নারীদের মধ্যে ভারতীয় ছায়াচিত্রকে নিয়ে উপহাস করা যেন একটা রেওয়াজ হ'য়ে উঠেছে। প্রায়ই দেখা যায়, তাঁরা ভারতীয় চিত্রের বিরুদ্ধে এই ব'লে অভিযোগ করেন যে সেগুলি নাকি অত্যন্ত হাল্কা, শ্লীলতাবর্জিত এবং সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। সম্ভবতঃ সেই জন্যেই তাঁরাও প্রযোজকদের সবসময়েই কর্তব্য এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব-বোধের কথা অক্লান্তভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকেন।

তাঁদের এই সমালোচনার ধারা লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁরা এই কথাই বলতে চান, আমরা, প্রযোজকরা, যেন এক একটী 'শয়তান' বিশেষ, সমস্ত সমাজ সংসারকে ধ্বংস ক'রে দেবার জন্যেই দিন রাত উন্মুখ হ'য়ে ব'সে আছি। যদিই বা এর মধ্যে দু' একটা ছবির সৌভাগ্যক্রমে ভালো ব'লে খ্যাতি রটে, তাহলে দেখা যায়, এই সব তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচকেরা সে-সব ছবির খবর রাখেন নি, কিংবা রাখ্‌লেও সেগুলিকে অবজ্ঞা করাই সমীচীন ব'লে মনে করেছিলেন।

এটা ঠিক যে, ভারতীয় চিত্র-সমালোচকেরা নানা-শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমে ধরুন একদল আছেন যাঁরা গোঁড়া এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাঁদের অধিকাংশেরই এই ধারণা যে ছায়াচিত্র জিনিষটাই ক্ষতিকর এবং অশুভ; তার থেকে সমাজের কখনই কোন মঙ্গল সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, এই সব রুচিবাগীশ দর্শক জীবনে কখন ছায়াচিত্র দেখেন নি এবং তাঁদের পূর্বপুরুষেরা যেমন তখনকার রঙ্গমঞ্চকে ধিক্কার দিতেন এঁরাও ঠিক সেইভাবেই আজকের দিনের ছায়াচিত্রকে ধিক্কার দিয়ে থাকেন।

আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে, তখন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে যাওয়াটাকেই একটা অন্যায় কাজ ব'লে ধরে নেওয়া হোত এবং সেই সংগে এও দেখেছি যে যাঁরা সমাজ বহির্ভূত নরনারী অথবা যাঁদের জীবনে সমাজ-চ্যুতি আসন্ন তাঁরাই কেবলমাত্র মঞ্চে এসে যোগ দিয়েছেন। আনন্দের কথা এই যে আজকের দিনে রঙ্গমঞ্চে যোগ দেওয়া আর অবজ্ঞার বস্তু নয়, বরং দিনের পর দিন সম্মানজনকই হয়ে উঠছে বলা যায়। কিন্তু মজার কথা এই যে ছায়াচিত্র সম্বন্ধে একেবারেই বিপরীত ধারণা গ'ড়ে উঠেছে এবং তার জন্যে এই সব গোঁড়া প্রকৃতির সমালোচকেরাই নিঃসন্দেহে দায়ী—তাঁদের এ ব্যাধি দুরারোগ্য।

আর একদল আছেন যাঁদের অতি আধুনিক সমালোচক বলা চলে। অত্যন্ত পাশ্চাত্যভাবাপন্ন এবং সস্তা রুচিসম্পন্ন। এঁরা সাধারণতঃ ভারতীয় চিত্রকে বাজে এবং অশ্লীল বলে সর্বদা অভিযোগ ক'রে থাকেন। অথচ মজা এই যে হলিউডের খুব তৃতীয় শ্রেণীর ছবিও তাঁরা বিশেষ আগ্রহের সংগে দেখে থাকেন। ফলে তাঁদের সমালোচনা যুক্তি-শূন্য এবং অমার্জিত হয়। তাই শেষ পর্যন্ত কথাবার্তা শুনে তাঁদের প্রতি করুণাই আসে এবং তাঁদের এই স্খলন দেখে দুঃখ বোধই করতে হয়। কিন্তু এ-ছাড়াও আর এক ধরণের চিত্র-সমালোচক আছেন, যাঁরা সত্যিই ভারতীয় চিত্র ভালোবাসেন এবং এই শিল্পটির যাতে যথার্থ উন্নতি হয় তার জন্যে চিন্তা করে থাকেন। তাঁরা এই ছায়াচিত্র শিল্প-টিকে কোন কিছু প্রচার করবার একটি শক্তিশালী মাধ্যম বলে মনে করেন এবং জনসাধারণের কল্যাণকর কাজে যাতে এ বস্তুটির যথাযথ ব্যবহার হয় সেজন্য আগ্রহান্বিত থাকেন। তাঁদের ভারতীয় ছায়াচিত্র সম্বন্ধীয় সমালোচনা গুলি সত্যিই প্রনিধানযোগ্য। কিন্তু তাতেও শেষ পর্যন্ত বিশেষ কোন ভালো ফল হয় না—কারণ বেশীর ভাগ চিত্র-সমালোচকই যেখানে ভারতীয় চিত্রের নিন্দায় পঞ্চমুখ, সেখানে তাঁদের কাছ থেকে যথার্থ ভালো ছবি তৈরী করবার উৎসাহ পাবার আশা করাও প্রযোজকদের পক্ষে আকাশকুসুম। সুতরাং তাঁরা যে তিমিরে ছিলেন শেষ পর্যন্ত সেই তিমিরেই থাকেন।

এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে যে এই

অবস্থায় ভারতীয় চিত্র-প্রযোজকেরা কখন যথার্থ বাস্তব বাদী এবং শিল্পরসোত্তীর্ণ ছবি তুলবার জন্তে উৎসাহিত বোধ করবেন? তার উত্তরে সংগে সংগে এটাই বলা যায় যে তাঁরা তখনই সে ছবি তুলবেন যখন দেখবেন—এতে তাঁদের মোটেই কোন রকম আর্থিক ক্ষতি ঘটছেনা। কিন্তু যদি দেখা যায়—তাঁর সেই ছবির প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ কম অথবা নেই তাহ'লেই তিনি বাধ্য হ'য়ে (সে তিনি যতো বড়োই সাধু এবং ভালো প্রযোজক হ'ন না কেন) টাকা অর্থাৎ সমস্ত টাকাই যা তিনি এই ব্যবসায়ে ঢেলেছেন—উঠিয়ে আনবার জন্ত আজেবাজে আর হাল্কা অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। কারণ এটি না হ'লে তাঁর ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

প্রসংগটিকে বিস্তৃতভাবে বোঝানোর জন্যে উদাহরণ স্বরূপ বিখ্যাত প্রযোজক আত্রের কথাই এখানে উল্লেখ করছি। তাঁর সুন্দর ছবি 'শ্যাম্চি আই' আমাদের রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছে। সুতরাং এটা অনায়াসেই ধ'রে নিতে পারা যায় যে, ছবিটি নিঃসন্দেহে ভালো এবং প্রথম শ্রেণীর চিত্র। এই সম্মান পাওয়ার পর আচার্য আত্রেকে এখন বহু প্রতিষ্ঠান থেকে এবং বহু সংস্থা থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হ'য়েছে। সুতরাং এই ঘটনার পরে যদি কেউ জান্‌তে ইচ্ছে করেন যে সেই সব প্রতিষ্ঠানের কতো জন সভ্য এই ছবিটী দেখেছেন? আর যদি দেখেই থাকেন, তাহ'লে, আজ আচার্য আত্রেকে যাঁরা সম্মান দেবার জন্যে সকলের আগে এগিয়ে এসেছেন, তাঁরা সেদিন কোথায় ছিলেন? সর্বসাধারণ্যে যখন ছবিটিকে দেখানো হ'য়েছিলো, তখন তাঁদের এই উৎসাহ কোথায় ছিলো? তখন কেন তাঁরা তাঁকে এ অভিনন্দন জানাতে পারেন নি? যদি তাই করা হোত, তাহ'লে তা থেকে সমগ্র চিত্রশিল্প এবং স্বয়ং আচার্য আত্রেও অনেক বেশী উপকৃত হ'তে পারতেন। এই ভাবে যদি দর্শকেরা প্রযোজককে উৎসাহ দিতে থাকেন এবং সমর্থন করেন, তাহ'লে ভবিষ্যতে আচার্য আত্রের মতো প্রযোজকেরা অনেক বেশী কর্মক্ষম হ'য়ে উঠ্‌বেন এবং একের পর এক 'শ্যাম্চি আই'-এর মতো আরো অনেক ভালো ছবি তুল্‌তে থাক্‌বেন।

আমি আরো একটু জোর দিয়ে বল্‌তে চাই যে, জনসাধারণের সমর্থন সম্বন্ধে প্রযোজকেরা যদি পূর্ব থেকেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তাহ'লেই তাঁরা সেই ছবির যান্ত্রিক কাজের আরো এমন অনেক কিছু উন্নতির চেষ্টা করতে পারেন যা আজকের দিনের কোন মারাঠী প্রযোজক ভাবতেই পারেন না।

বাস্তববাদ, শিল্পকলা প্রভৃতি নিয়ে বড়োবড়ো কথা ব'লে আলোচনা করাটা খুব সহজ কাজ এবং এই উপলক্ষ্যে প্রযোজকদের 'শয়তান' বানিয়ে তোলাও খুব কষ্টকর নয়, কিন্তু এই সব শ্রদ্ধেয় সমালোচকেরা কি এক-বারও ভালো ক'রে ভেবে দেখেছেন যে, তাঁদেরই ঔদাসীন্য এবং অক্ষমতার জন্যে নতিকারের যে সব ভালো ছবি তা সর্বসাধারণ্যে অবহেলিত হ'চ্ছে অথচ অত্যন্ত বাজে এবং হাল্কা রসের ছবিই বেশীর ভাগ দর্শককে বিমুগ্ধ ক'রে রাখছে।

এটা বলা খুবই সোজা যে চিত্র-প্রযোজকদের জনসাধারণের রুচিকে বিকৃত ক'রে দেওয়া খুবই অন্যায়, তা না ক'রে মার্জিত রুচির ছবি তৈরী করাই তাদের উচিত—কিন্তু সেই সংগে একথাও মনে রাখা দরকার যে খুব কম প্রযোজকই পৃথিবীতে আছেন যাঁরা লোভের ফাঁদে পা দেন না। যদিও আমরা জানি যে চিত্রশিল্পের মাধ্যমে চারুকলার প্রচার খুবই সহজসাধ্য কিন্তু সেই সংগে এটাও মনে রাখতে হবে যে এই শিল্পটী ব্যবসায়ের দিক থেকে বড়ো বেশী মহার্ঘ—এর জন্যে বহু অর্থ অকাতরে ব্যয় করবার প্রয়োজন ঘটে—সুতরাং সেখানে যদি প্রযোজক দেখেন যে কিছু হাল্কা রসের আশ্রয় নিলে অনেক বেশী আর্থিক লাভ হয়—তখন সে পথ তাঁরা ছাড়তে পারেন না—ফলে এই হয় যে অনেক বুদ্ধিমান এবং রুচিমার্জিত প্রযোজকেরা চিত্র পরিবেশকদের সংগে আপোষ করে নিতে বাধ্য হ'ন এবং সেই অনুযায়ী চিত্র তৈরী করে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করেন। এ-সব ব্যাপারে হয় আপোষ করা আর নাহ'লে ছবি বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া অন্ত কোন পথ নেই।

যদি প্রযোজকেরা চিত্রদর্শকদের কাছ থেকে এরকম একটা প্রতিশ্রুতি পেতেন যে ভালো ছবি তৈরী হ'লে তাঁরা দেখবেনই এবং তা মার খাবে না তাহ'লে আজকের দিনের ছায়াচিত্রশিল্পের এই দুরবস্থা কখনোই ঘটতে পারতো না। যদি সত্যিই এই সব দর্শকেরা আমাদের প্রযোজকদের কাছ থেকে ভালো ছবি পাবার আশা ক'রে থাকেন তাহ'লে তাঁদের সমস্ত দেশে 'ক্লাব' বা সভা সমিতি প্রভৃতি গ'ড়ে তুলতে হবে, এবং এটাই তাঁদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে। এই সব সভা সমিতির প্রধান কাজই হবে প্রকৃত ভালো ছবি যাতে ঘন ঘন তৈরী হ'তে পারে, তার জন্যে সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং খারাপ ছবি তৈরী হ'লে তাকে সমবেতভাবে বর্জন করা। সাধারণ বুদ্ধিমান এবং সচেতন দর্শকদেরও এই নীতিকে কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। দর্শকেরা যদি খারাপ ছবিকে দিনের পর দিন বর্জন করে চলেন এবং ভালো ছবির প্রশংসা করেন, তাহলে এটা ঠিক যে কোন প্রযোজকই আর খারাপ ছবি অথবা এসব হাল্কা নিম্ন রুচির ছবি তোলবার সাহস পাবেন না। নিঃসন্দেহে এ দায়িত্ব প্রত্যেক দর্শকেরই আছে। যদি আজকের দিনে খারাপ এবং অশ্লীল ছবি তৈরীও হয় তাহলেও সে গুলিকে সমর্থন করা কোন মার্জিত রুচি-সম্পন্ন দর্শকের উচিত নয়।

এত কথা এইজন্য বলা প্রয়োজন হচ্ছে যে এই চিত্র-শিল্পটি প্রযোজকদের হাতে আজকাল প্রচারের একটা মস্ত বড়ো এবং শক্তিশালী মাধ্যম হ'য়ে উঠেছে। আমার মনে হয়, নিছক আমোদ-প্রমোদের জন্যেও যে সব ছবি তৈরী হ'চ্ছে—সেগুলিরও কিছু কিছু প্রভাব দর্শকদের ওপরে এসে পড়ে। হঠাৎ লক্ষ্য করলে অবশ্য সেই প্রভাবটাকে সহজে বোঝা যায় না—কিন্তু সে প্রভাবটা যে অনেকটা সুদূর-প্রসারী এবং গভীর হ'য়ে দাঁড়ায় সেটা ক্রমশঃ বোঝা যায়। ধরুন চুলের বিন্যাস—শাড়ী বা জামা পরবার ধরণ এই সবের মধ্যে দিয়ে প্রভাব াকে সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে, ঠিক এইজন্যেই রুচিমার্জিত শুভ ও সুন্দর ছবি তোলাটা প্রত্যেক প্রযোজকের নৈতিক কর্তব্য হ'য়ে ওঠা উচিত—তা না হলেই জনসাধারণের ওপরে তাদের খারাপ প্রভাবটা নিঃসন্দেহে গিয়ে পড়বে এবং তাদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক সব কিছুর দিক থেকেই অধঃপতন ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে।

প্রযোজকরা যে খারাপ ছবি তৈরী ক'রেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরাই যে বহুলাংশে দায়ী একথা মেনে নিয়েই বলছি—দর্শকদেরও কিছু পরিমাণে আজকের দিনের চিত্রশিল্পের এই অধঃপতনের জন্যে দায়ী করা চলে। যদি দর্শকেরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সচেতন এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হ'তেন—তাহলে তাঁদের দাবীতেই আমরা এ পর্যন্ত যে ধরণের ছবি তৈরী করেছি, তার থেকে অনেক ভালো ছবি হয়তো তৈরী করতে পারতাম! অবশ্য এটা ঠিক, দর্শকদের দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে একথাও মনে রেখেছি যে আমাদের দেশের অধিকাংশ দর্শকই নিরক্ষর এবং শিল্পকলার পরিচয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সৌভাগ্য-ক্রমেই হোক অথবা দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক এই অশিক্ষিত জনসাধারণই ভারতীয় চিত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

কিন্তু তবু আমি বলবো যে-সব শিক্ষিত জনসাধারণ বিদেশী ছবির পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে থাকেন এবং দেশী ছবিকে ঘৃণার চোখে দেখেন, তাঁদের থেকে এঁরা অনেক ভালো। কারণ তাঁরা দেশী ছবিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেন এবং উৎসাহ দেন। এটাও বলা ঠিক নয় যে, জনসাধারণ খারাপ ছবিকেই প্রশংসা করে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, জনসাধারণ ভালো ছবির যথেষ্ট মূল্য দেন—যেমন ধরুন, তাঁরা ভজন গান যেমন আগ্রহের সংগে শোনেন—আবার ঠিক তার পাশাপাশি অশোভন এবং অশ্লীল তামাসার গান প্রভৃতিকেও তাঁরা বাদ দেন না—ঠিক সেই ভাবেই তাঁরা এই দুই ধরণের ছবিকে গ্রহণ ক'রে থাকেন। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত দর্শকেরাই এইসব অশিক্ষিত এবং অমার্জিত দর্শকদের পরিচালনা করতে পারেন এবং খারাপ ছবি হ'লে তাকে বর্জন করবার

(শেষাংশ ১৭ পৃষ্ঠায়)

বিদেশী বাজারে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা

এস এস ভাসন

সোভিয়েট রাশিয়া সম্প্রতি সরাসরি পাঁচখানি হিন্দী ছবি কিনে নিয়েছে। ছবিগুলি হচ্ছে আন্ধিয়া, আওয়ারা, বৈজু বাওরা, দো বিঘা জমিন, আর রাহী। পাঁচখানি ছবির মধ্যে মাত্র তিনখানিকে নাকি রুশ ভাষায় 'ডাব' করে নেবার সময় পাওয়া গিয়েছিল। এভাবে ছবি কেনার আর দ্বিতীয় কোনও নজির নেই। রাশিয়ার যেখানে যেখানে দেখানো হয়েছে, সেইখানেই এই ছবি তিনটি দর্শকদের উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা লাভ করেছে। সম্প্রতি একদল ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পী রাশিয়ায় গিয়েছিলেন; তাঁরাও সেখানে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হয়েছেন। স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠেছে, বিদেশের বাজারে আমাদের চলচ্চিত্রের জন্য কতখানি জায়গা করে নেওয়া সম্ভব।

প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন, ভারতীয় চলচ্চিত্রের বাজার যে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও সম্প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, সে সম্পর্কে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। এ শিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে, লক্ষ লক্ষ দর্শকের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত অর্থ থেকেই এখানে চিত্র-নির্মাণের ব্যয়ভার তুলে নিতে হয়। সেই দর্শক-সমাজ আবার একটা বিরাট অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছেন ফলতঃ যে ছবি যত বেশীসংখ্যক চিত্রগৃহে দেখানো যাবে, সে ছবির উৎপাদন-ব্যয় উঠে আসবার তত বেশী সম্ভাবনা। কিন্তু এ হল নেহাৎই ব্যবসায়িক দৃষ্টির বিচার। একথা যদি ছেড়েও দেওয়া যায় তো দেখা যাবে, অন্যান্য দেশে আমাদের চিত্র প্রদর্শনের একটা অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক মূল্য রয়েছে। এক দেশের সংস্কৃতিকে অন্য দেশে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে চলচ্চিত্রের কার্য্যকারিতা যে কতখানি, ক্রমেই তা আমরা অধিকতর মাত্রায় উপলব্ধি করতে পারছি। বিভিন্ন দেশের মধ্যে মৈত্রী-সম্পর্ক গড়ে তোলবার ব্যাপারেও এর অবদান অসামান্য। চলচ্চিত্রকে বলা যেতে পারে জাতীয় জীবনের জানলা। সেই জানলার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিপাত করেই অন্যান্য জাতি বুঝতে পারে, আমাদের জীবন-পদ্ধতি কী রকম, কীভাবে আমরা বাঁচি, কীভাবে কাজ করি। সোভিয়েট রাশিয়া যে অন্যান্য দেশে তার চলচ্চিত্র প্রেরণ করতে এত উৎসুক, তার কারণ আর কিছুই নয়, সে আশা করে যে, এতে অন্যান্য দেশের মানুষ কম্যুনিষ্ট জীবনরীতি এবং শাসন-ব্যবস্থাকে উপলব্ধি করবে এবং হয়তো বা কম্যুনিষ্ট আদর্শকে গ্রহণ করবে।

সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আমরাও সঙ্গত কারণেই আমাদের চলচ্চিত্রকে অন্যান্য দেশে প্রেরণ করতে চাইব। কিন্তু এইখানেই দ্বিতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে আমাদের। বিদেশী মানুষদের কাছে আমাদের ছবি পাঠাতে আমরা যতখানি আগ্রহশীল, আমাদের ছবি দেখতে ততখানি আগ্রহ তাদের আছে কিনা? আছে, তাতে সন্দেহ নেই। উদাহরণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা ধরা যেতে পারে। শোনা যায়, গত দু-তিন বছর ধরে সেখানে নাকি বিদেশী ছবির খুবই চাহিদা। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি আর জাপানের বহু চলচ্চিত্র সেখানে নাকি সাফল্যের সঙ্গেই দেখানো হয়েছে। তা যদি হয়, তাহলে ভারতীয় চলচ্চিত্রই বা সেখানে সাফল্য অর্জ্জনে সক্ষম হবে না কেন? পাশ্চাত্ত্য দেশীয় মানুষের কাছে ভারতবর্ষ এক রহস্যময়, সৌন্দর্য্যময় দেশ। তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং আমাদের জীবন-পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে সব-কিছু জানবার প্রকৃত আগ্রহ তাদের রয়েছে। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্ত্যদেশীয় বহু পণ্ডিত ও মনীষী নিছক জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহাতেই ভারত-ভ্রমণে এসেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সকলের পক্ষেই তো আর এদেশে আসা সম্ভব নয়। স্বচক্ষে ভারতবর্ষকে দেখা যাদের সাধ্যাতীত, সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের আগ্রহ কি অতৃপ্তই থেকে যাবে? এদেশে না এসেও কীভাবে এ-দেশেকে দেখবে তারা? এর

একমাত্র উত্তর হল চলচ্চিত্রের মারফত। সম্প্রতি দুজন মার্কিন পর্য্যটক এদেশে এসেছিলেন। একজনের বাড়ি নিউ ইয়র্ক, অন্যজনের ক্যালিফর্নিয়া। এদের কাছ থেকে আমি দুটি চিঠি পেয়েছি। চলচ্চিত্রের আবেদন যে কত গভীর, কত শক্তিশালী, চিঠি দুটি পড়লেই তা বুঝতে পারা যায়। দুটি চিঠিরই অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ—

(১) "আমি আমেরিকার মানুষ। কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। গত ১লা অক্টোবর (১৯৫৩) আপনার তরফের জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। দক্ষিণ কলকাতায় তিনি আমাকে একখানি ছবি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ছবিখানির নাম 'আভাইয়ার'। ছবিতে একটি সন্ন্যাসীর চরিত্র রয়েছে। সন্ন্যাসীর সংবর্দ্ধনা-দৃশ্যে যে বিপুল জাঁকজমক দেখলাম, তা সুন্দর তো বটেই, দর্শকচিত্তে বেশ খানিকটা সম্ভ্রমও জাগিয়ে তোলে। সে-দিক থেকে বিচার করলে 'কুয়ো ভাদিস" এর অনুরূপ দৃশ্যাবলীর তুলনায় আলোচ্য দৃশ্যগুলি আরও সার্থক হয়েছে। "নাগিশের"-এর (সোনাই) মধুর সুরঝঙ্কার আমার বিশেষ ভাল লেগেছে।

"আমার বিশ্বাস, শ্রেষ্ঠ চিত্র-নির্ম্মাতাদের আপনি অন্যতম। আপনার প্রযোজিত একটি দক্ষিণ ভারতীয় চিত্র দেখবার সুযোগ করে দিয়েছেন বলে আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানাই।"

(২) "সম্প্রতি পণ্ডিচেরিতে আপনার 'আভাইয়ার' চিত্রটি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তামিল ভাষার বিন্দু-বিসর্গও আমি জানি না। তৎসত্ত্বেও ছবিটি আমার খুবই ভাল লেগেছে। দৃশ্যাবলী থেকেই ছবির কাহিনী আমি খানিকটা আন্দাজ করে নিতে পেরেছিলাম। এই অসাধারণ ছবির জন্য (প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তো খুবই সুন্দর) আপনাকে নিছক অভিনন্দন জানানোই আমার উদ্দেশ্য নয়; আমার অনুরোধ, ছবিটি আপনি বিদেশে পাঠান। ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিদেশী মানুষের মনে যদি একটা সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করতে হয়, ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের মনে যদি অনুরাগ জাগিয়ে তুলতে হয়, তবে 'আভাইয়ার'-এর চাইতে যোগ্যতর মাধ্যম আর কিছুই হতে পারে না। 'আভাইয়ারে'র দৃশ্যাবলী, মন্দির আর পুণ্যার্থীদের শোভাযাত্রা এবং এর সঙ্গীত-সম্ভারের কথা বিবেচনা করেই এ-কথা বলছি।

"আমি ফ্রান্সের মানুষ। তবে সাতাশ বছর ধরে আমি আমেরিকায় বাস করছি। আমেরিকানদের আমি চিনি। এ ছবি তাদের খুবই ভাল লাগবে। সচরাচর তারা শুধু হলিউডের ছবিই দেখতে পায়, এ ছবি সেখানে একটা পরিবর্ত্তন নিয়ে আসবে। আভাইয়ারের সাফল্য সম্পর্কে আমি সুনিশ্চিত। তবে একটা কথা, এর কোনও পরিবর্ত্তন ঘটাবেন না, এর মধ্যে কোনও প্রেম-কাহিনী জুড়ে দেবেন না (হলিউডের ধারণা এ জিনিসটি অপরিহার্য্য) এবং ভারতীয় দৃশ্যাবলী যেমন আছে, ঠিক তেমনই থাকবে। ছবির সঙ্গে ইংরেজী টাইটল দিয়ে দিলে সকলেই এর গল্পাংশ বুঝে নিতে পারবে।

"আশা করি, শিগগিরই আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ইংরেজী টাইটলসহ 'আভাইয়ার' চিত্রটি দেখতে পাব। আপনার সাফল্য কামনা করি।......"

আমার যৎসামান্য প্রচেষ্টার এই আশাতীত প্রশংসায় আমার মাথা ঘুরে যায়নি। অপরপক্ষে এরই ফলে আমার মনে একটি নতুন চিন্তার উদয় হয়েছে। সত্যিই হয়তো মার্কিন দর্শকসমাজ আমার ছবি দেখলে হবেন। কিন্তু সে ছবি দেখাতে হবে সেখানকার চিত্র-গৃহের মারফত। চিত্রগৃহের মালিক যদি নিশ্চিত বুঝতে পারেন যে, আমার ছবি দেখালে তাঁর আর্থিক লোকসানের কোনও আশঙ্কা নেই, একমাত্র তাহলেই তিনি ছবি দেখাতে রাজী হবেন। নয়তো, এরকমের ঝুঁকি তিনি কিছুতেই নেবেন না। এই একই কারণে আমেরিকার চিত্রগৃহের মালিকরা "রেড শুজ"-এর মতন প্রথম শ্রেণীর ছবি নিতেও প্রথমটায় গররাজী হয়েছিলেন। ছবিখানি ইংল্যণ্ডে তোলা এবং এর প্রযোজক হচ্ছেন বিখ্যাত ইংরেজ চিত্র-নির্ম্মাতা স্যার আর্থার র‍্যাঙ্ক।

স্যার আর্থার র‍্যাঙ্ক না হয়ে আর কেউ হলে নিশ্চয়ই মনে করতেন যে, আসলে ইংরেজবিরোধী চক্রান্তই এর কারণ ; এই চক্রান্তের জন্যই ছবিখানি দেখাতে কেউ রাজী হচ্ছে না। স্যার আর্থার কিন্তু তা ভাবলেন না। তার কারণ তিনি নিজেও চিত্রগৃহের মালিক ; চিত্রগৃহের মালিকদের অসুবিধেগুলির কথা তিনি জানেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতবর্ষের বহু লোকের মনে কিন্তু এবিষয়ে একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তাঁরা বলেন, "আমরা তো এখানে এত মার্কিন ছবি দেখাতে দিচ্ছি। সে ক্ষেত্রে তাদেরই বা আমরা ভারতীয় ছবি কিনতে বাধ্য করব না কেন। ভারতবর্ষে রাশিয়ান ছবি দেখানো হয় না, অথচ সেই রাশিয়া তো নগদ মূল্যে আমাদের পাঁচখানি ছবি কিনে নিয়েছে।"

এই যুক্তির মধ্যে একটা ভুল রয়েছে। ভুলটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়ার মধ্যে কোনও তুলনাই চলতে পারে না। রাশিয়ার কথা আলাদা, রাষ্ট্রই সেখানে বিদেশী ছবির ক্রেতা। সেখানে যত চিত্রগৃহ রয়েছে, রাষ্ট্রই তার মালিক ; চিত্রগৃহে যারা যায়, তারাও রাষ্ট্রেরই কর্মচারী। সুতরাং টিকিট-বিক্রির সমস্যা তাদের নেই। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের যদি ইচ্ছে হয় তাহলে সে একটা দামী ছবি কিনে নিতে পারে ; অতঃপর সে-ছবি যদি কোথাও সে না-ও দেখায় তাহলেও তাকে কেউ কিছু বলবার নেই। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুনাফার কোনও স্থান নেই। সেইজন্যেই এত সস্তায় এখানে রাশিয়ান বই কিনতে পাওয়া যায়। চমৎকার বাঁধাই, প্রচুর ছবি—অথচ দাম মাত্র কয়েক আনা। ও-রকম কোনও মার্কিনী বই কিনতে হলে আমাদের কয়েক ডলার খরচা পড়ে যেত। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলো-দ্দীপক তথ্যের প্রতি আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শুনেছি সোভিয়েট রাশিয়ায় নাকি পঞ্চাশ হাজার চিত্রগৃহ আছে। রাষ্ট্রই তাদের মালিক। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, সম্প্রতি যে পাঁচখানা ভারতীয় ছবি কেনা হয়েছে, এই পঞ্চাশ হাজার চিত্রগৃহেই তা দেখানো হবে। প্রত্যেকটি ছবির জন্য দাম দেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা। অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রথম শ্রেণীর একখানা ভারতীয় চিত্র দেখাবার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিটি চিত্রগৃহের খরচা পড়বে মাত্র এক টাকা। পৃথিবীর আর কোথাও এ রকম ব্যাপার বোধ হয় কল্পনাও করা যায় না।

অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা সম্পূর্ণই আলাদা। বছর পনের আগে যে সেখানে ব্যাপকভাবে "ব্লক-বুকিং" চলত সে কথা অবশ্য সত্য। "ব্লক-বুকিং" জিনিসটা আর কিছু নয়, কোনও চিত্র-পরিবেশকের হাতে ভাল ছবি থাকলে সে-ছবি কোনও চিত্রগৃহে দেবার আগে চিত্রগৃহের মালিককে তিনি এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ করে নিতেন যে, ভাল ছবির সঙ্গে খারাপ ছবিও তাঁকে নিতে হবে। তার ফল দাঁড়াত এই যে, আগে থাকতে এইভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকার দরুণ চিত্রগৃহের মালিকদের আর অন্যনিরপেক্ষভাবে বিদেশী ছবি সংগ্রহ করে দেখবার অবকাশ থাকত না। বিদেশী ছবি যে সেখানে দেখানো হত না, এ তার অন্যতম কারণ। তবে এখন আর সে অবস্থা নেই। অ্যান্টি-ট্রাষ্ট আইন এবং "ডিভোর্সমেন্ট" ব্যবস্থার কল্যাণে মার্কিন প্রযোজক-পরিবেশকরা এখন স্বার্থযুক্ত হয়ে চলচ্চিত্রের বাজার আরও বিস্তৃত করে দিয়েছেন।

দর্শকের দায়িত্ব

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

নির্দেশ দিয়ে তাঁদের মধ্যে ধীরে ধীরে রুচিবোধ গড়ে তুলতে পারেন।

এই বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত জনসাধারণ যে মুহূর্তে তাঁদের দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন হবেন, আমার মনে হয় ঠিক সেই সময় থেকেই প্রযোজকেরাও প্রকৃত ভালো ছবি তৈরী করবার জন্যে আন্তরিক উৎসাহ বোধ করবেন। এ ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ দেবার জন্যে শুধু মেডেল, পুরস্কার, অথবা সম্মানজনক অন্য যে কোনো পৃষ্ঠপোষকতা করলেই হবে না, স্বয়ং সরকারকেও আর্থিক সাহায্য করতে হবে এবং প্রকৃত ভালো ছবির বেলায় তার নির্দিষ্ট প্রমোদ-কর ফেরৎ দিয়ে তাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করতে হবে।

[অনুবাদ : নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভারতীয় বাজারে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রতিবন্ধক

খাজা আহম্মদ আব্বাস

আজকাল ভারতবর্ষে প্রতি বছরে বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ২০০টি ছবি তৈরী হচ্ছে। ভাষাগুলির মধ্যে সাধারণতঃ এই ৯টী ভাষাই বেশী, যেমন, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, বাংলা, গুজরাটী, মারাঠী, কানাড়ী, তামিল, তেলেগু এবং মালয়ালাম।

বিদেশে আজকাল প্রায়ই ভারতীয় ছবি দেখানো হ'চ্ছে এবং তা সর্ব্বত্র প্রশংসিতও হয়েছে। সে প্রশংসা বিষুবরেখা থেকে উত্তর মেরু পর্য্যন্ত প্রসারিত হ'য়েছে বলতে পারেন কিন্তু দুঃখের বিষয় পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আমেরিকাই ভারতীয় ছায়াছবি প্রদর্শন করাতে আপত্তি জানিয়েছে—মজার কথা এই যে, সেই দেশেরই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ছবি ভারতে আমদানী হয় এবং বহু অর্থ তারা এখান থেকে নিয়ে যায়! কিন্তু সেসব অনেক কথা।

আজকে যে বিষয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে যেখানে প্রায় ৪০টী বিভিন্ন দেশে ভারতীয় ছায়াছবি সম্মানের সংগে দেখানো হচ্ছে, সেখানে, এই ভারতবর্ষেই এমন জায়গা আছে যেখানে ভারতীয় চিত্র দেখানো হয়না এবং সম্ভবতঃ কখনই দেখানো হবে না—আজকে স্বাধীনতা পাওয়ার আট বছর পরেও এই আমাদের অবস্থা! এসম্পর্কে একটা সত্য ঘটনা আমি আপনাদের কাছে এখানে বিবৃত করছি।

কিছুদিন আগে একটি সোভিয়েট জাহাজ এসেছিলো। সেই জাহাজের অফিসার এবং ... ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে অনেক ভারতীয় ছবি মস্কো, লেনিনগ্রাদ, টিব্‌লিসি, তাসখন্দ প্রভৃতি জায়গায় দেখেছেন। এখন ভারতবর্ষে এসে তাঁরা আরো বেশী করে ভারতীয় ছবি দেখবার আশা ক'রেছিলেন। তাঁরা জাহাজ থেকে নেমে ডক অঞ্চল দিয়ে ভারতীয় ছবি প্রদর্শিত হ'চ্ছে এমন চিত্রগৃহের অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করলেন। ফোর্টের কাছাকাছি থেকে আরম্ভ ক'রে কোলাবা, ধোবিতালাও, চার্চগেট ষ্টেশন, এ্যাপোলোবন্দর প্রভৃতি বহু জায়গায় তাঁরা ঘুরে বেড়ালেন কিন্তু একটিও ভারতীয় ছবি দেখ্‌তে পেলেন না—যেক'টি চিত্রগৃহ তাঁদের চোখে পড়েছিলো, সব ক'টিতেই বিদেশী ছবি দেখানো হ'চ্ছে এবং তার বেশীর ভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছবি। সুতরাং বাধ্য হ'য়ে সেখান থেকে তাঁরা ফিরে গিয়েছিলেন এবং হয়ত আশ্চর্য্য হ'য়ে ভেবেছিলেন যে, ভারতবর্ষে ভারতীয় ছবি দেখানো নিষিদ্ধ কিনা কে জানে! এইটাই বিদেশীদের কাছে একমাত্র ঘটনা নয়—এর আগেও অনেক বিদেশী উৎসাহী দর্শক ভারতবর্ষে এসে ভারতীয় ছবি না দেখতে পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছেন। বারবার দেখা গেছে বিদেশী বন্ধুরা বাইরে থেকে এসে বোম্বাইয়ের ফোর্টের কাছাকাছি যে-সব বিখ্যাত হোটেলে উঠেছেন, তাঁরাও সমান বিস্ময়ের সংগে আমাদের প্রশ্ন ক'রেছেন—ভারতবর্ষে কি ভারতীয় ছবি দেখানো হয় না?

অবশ্যই এটা ঠিক যে বোম্বাইতে ভারতীয় ছবি নিশ্চয়ই দেখানো হয়, কিন্তু সেগুলি এমন সব অঞ্চলের চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হয় যে জায়গাগুলিকে একদা এই সহরের 'নেটিভ অঞ্চল' ব'লে লোকে জান্‌তো।

ব্রিটিশ শাসনের সময়ে সহরের সবচেয়ে ভালো সুখদৃশ্য এবং রম্য অঞ্চলগুলি ইউরোপীয়দের অথবা ইউরোপীয় ভাবাপন্ন ভারতীয়দের জন্যেই সুনির্দিষ্ট ছিলো। রেষ্টুরেন্টগুলিতে ইয়োরোপীয় খাদ্যাদির ব্যবস্থা থাকৃতো, দোকানগুলিতে কেবলমাত্র বিদেশী জিনিষই বিক্রী হতো এবং যেসব চিত্রগৃহ ছিলো তাতে সব সময়েই ইংরেজী ছবি দেখানো হোত যার বেশীর ভাগই হলিউড এবং ব্রিটেনের ষ্টুডিওগুলি থেকে আসতো।

(এই উপলক্ষ্যে ব'লে রাখা ভালো তখনকার সেই ব্রিটিশ আমলে কর্ত্তারা এমন একটা আইন পাশ করিয়ে রেখে দিয়েছিলেন যাতে 'ইংরেজী ভাষার' ছবিই শুধু ভারতবর্ষে আসতে পারতো আর ইংরেজী ছবি বলতে তা ব্রিটিশ এবং মার্কিন ছবিকেই বোঝাতো—ইংরেজী ছাড়া অন্যদেশের ছবি সম্বন্ধে কঠিন কড়াকড়ি ছিলো এবং তা' রীতিমত নিষিদ্ধও ছিলো বলা যায়। আজ, আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির এই অষ্টম বছরে এসেও দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে সেই পুরোনো আইন সমানভাবে আমাদের দেশে এখনও চলছে—যার সুযোগ নিয়ে বহু অপরাধ-মূলক এবং যৌন-আবেদনশীল ছায়াচিত্র আমাদের ছবির বাজার দিনের পর দিন ছেয়ে ফেলছে এবং যার জন্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, মেক্সিকো প্রভৃতি বহু জায়গার তোলা শিক্ষা-মূলক এবং প্রথম শ্রেণীর রসোত্তীর্ণ ভালো ছবি থেকে আমরা প্রতিনিয়তই বঞ্চিত হচ্ছি।)

এটা ভাবতেই খুব আশ্চর্য্য লাগে যে আজকের দিনেও যে সব চিত্রগৃহ প্রথম শ্রেণীর (শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সর্বোত্তম চিত্রগৃহগুলির কথাই বলছি) সেগুলিতে বিদেশী অর্থাৎ মার্কিন ছবিগুলিরই যেন একচেটিয়া রাজত্ব চলেছে।

এটা কি খুব বিস্ময়কর এবং অগৌরবের বিষয় নয় যে ঐধরণের কোন প্রথম শ্রেণীর চিত্রগৃহে যদি কোন ভারতীয় ছবি প্রদর্শন করবার ব্যবস্থা করতে হয়, তা হ'লে সরাসরি নিউ ইয়র্ক থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে হয়? সেখানকার বিদেশী পরিবেশক যদি অনুমতি দেন তবেই সেটা সম্ভব হবে, নচেৎ সব ব্যর্থ। আজকাল কচিৎ একটি ভারতীয় ছবি এরকম অনুমতি পাচ্ছে বটে, কিন্তু তার আগে সেই সব বিদেশী পরিবেশ-কেরা সেই ভারতীয় ছবিটির উৎকর্ষ সম্বন্ধে ভালো ক'রে বিচার ক'রে তবেই অনুমতি দেন এবং সেক্ষেত্রে সাধারণ ইংরেজী ছবি যে মূল্যে এ-সুযোগ পায় তার তুলনায় ভারতীয়-চিত্রকে প্রায় দ্বিগুণ মূল্য দিতে হয়!

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এই সব নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে বর্ত্তমানে আমাদের দেশে কোন সাংস্কৃতিক মন্ত্রীসভার ব্যবস্থা নেই, অথচ অন্যান্য সাংস্কৃতিক আলোচনার জন্যে প্রায় ৬জন মন্ত্রী নিযুক্ত আছেন দেখেছি। কেউ-ই জানেন না এরকম অবস্থায় কার কাছে অভিযোগ করলে এর প্রতিবিধান সম্ভব। আমার মনে হয় এবিষয়ে সরকারের বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত এবং সে বিবেচনা নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে করাই সমীচীন হবে।

১। প্রথমতঃ স্বদেশী জিনিষের যাতে বহুল ব্যবহার হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের দেশে যে সব টাকা রাজকর হিসেবে আদায় করা হয় তার বেশীরভাগই জাতীয় কল্যাণকর কাজে নিশ্চয়ই ব্যয়িত হওয়া উচিত। যে-সব যন্ত্রপাতি এই চিত্রশিল্পটিকে গড়ে তোলবার জন্যে একান্ত প্রয়োজন কেবলমাত্র সেইগুলই বিদেশ থেকে আমাদের কিনতে হবে। যে-সব মূল্যবান বই এই সংক্রান্ত কাজে লাগবে অথবা উচ্চ সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ যা এইসব কাজে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে—তাও আমাদের বিদেশ থেকে নিঃসন্দেহে কিনে

দিতে হবে এবং সেই সংগে মনে রাখতে হবে, সেই অর্থ দিয়ে হাল্কা হাসির বই, যৌন-আবেদনমূলক নোংরা অথবা অশ্লীল ধ'জে বই—যা আজকের দিনে সর্ব্বত্র ছেয়ে র'য়েছে, যেন কখনো না কেনা হয়। সেই বইগুলি থেকে আমাদের দেশের যুবক-যুবতীদের যে কী পরিমাণ ক্ষতি হ'চ্ছে তার কোন হিসেব-নিকেশ নেই। অন্যদিকে, বিদেশী ছবি, তা সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোক অথবা রুশিয়া, ব্রিটেন, চীন, ফরাসী অথবা ইতালীয়ান যারই হোক না কেন, ভালো-ছবি হ'লেই সাদরে তাকে আমাদের দেশে নিয়ে আসতে হবে এবং সেই সংগে তীব্র এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে আমাদের অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত যৌন-আবেদনশীল অথবা অপরাধমূলক বিদেশী ছবির জন্মে অকাতরে ব্যয়িত না হয়!

২। এই সব অনাকাঙ্খিত ছবির জন্মে আইনগত প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা করা যেতে পারে সেটা হ'চ্ছে ঐসব ছবির ওপরে মোটারকম শুল্ক ধার্য্য করা—যদি ঐধরণের প্রতিরোধ ব্যবস্থা বস্ত্রশিল্পের বেলায় প্রযোজ্য হয়, তাহলে ছায়াছবির ওপরেই বা হবে না কেন?

হলিউডের ষ্টুডিওগুলির নানারকম আর্থিক সুবিধা আছে এবং তার জন্মেই তারা তাদের ছবিতে এমন কতোগুলি চোখ ধাঁধানো চাকচিক্যের সৃষ্টি করে যেটা ভারতীয় প্রযোজকদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয় এবং তাতে হয় এই যে আমাদের দেশে এমন একদল দর্শক আছে যারা সেই সব প্রলোভনে ভোলে এবং ঐ ধরণের ছবি বেশী পছন্দ করে। এই সব স্থলে বর্দ্ধিত শুল্কের দ্বারা ঐসব ছবির আমদানী কিছুটা নিরোধ করা যেতে পারে।

এই সব বিবেচনা আজকে আমাদের বিশেষভাবে এইজন্যে করতে হবে যে এর সংগে আমাদের জাতীয় সম্মান জড়িত র'য়েছে। আমাদের স্বাধীনতার এই অষ্টম বছরে পদার্পণ করে মার্কিন ছবির দ্বারা দিনের পর দিন যে ভয়ানক ক্ষতি ঘটছে সেটাকে আর কোন মতেই সহ্য করা উচিত হবে না।

৩। শেষ পর্য্যন্ত এই কথা বলা যেতে পারে যে আমাদের বৈদেশিক নীতির মধ্যে 'নিরপেক্ষতা' সব থেকে বড়ো জিনিষ এবং সেদিক থেকে ভারত সরকারের এ-বিষয়ে খুব বড়োরকম দায়িত্ব আছে। তাঁদের সব সময়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যে এই ব্যাপারে কোন বিশেষ দলের প্রতি যেন কখনো কোনরকম পক্ষপাতিত্ব করা না হয়। এই দিক থেকে উল্লেখ করতে পারি যে ইংরেজী ছবি (অর্থাৎ মার্কিন এবং ব্রিটিশ ছবি) সম্বন্ধে ভারত সরকার একটি বিশেষ সুবিধা দিয়ে রেখেছেন, সেটা হচ্ছে উক্ত দুই দেশের ছবি আমদানি সম্বন্ধে অবাধ অধিকার প্রদান—অথচ অন্য দেশের ছবির ব্যাপারে কঠিন নিয়ন্ত্রণ-নীতি রাখা হয়েছে।

এটা আজ প্রমাণিত হ'য়েছে যে সুযোগ পেলে বিদেশে ভারতীয় চিত্র যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে পারে। কেবল-মাত্র স্বার্থপর এবং ব্যবসায়িক সংকীর্ণ বুদ্ধির জন্মেই আজো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনে ভারতীয় ছবির ভাগ্যে সে সম্মানলাভ ঘটছে না। সুতরাং এখানেও আমরা আমাদের জাতীয় সম্মানের দিক থেকেই ভারত সরকারের কাছে এই দাবী করবো যে, এমন একটা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হোক—যার থেকে যে-সব দেশ আমাদের দেশে ছবি পাঠাতে চায়—আমরাও যেন সেই সব দেশে ছবি পাঠাতে পারি—তারাও যেন আমাদের ছবি নিতে বাধ্য হয়।

এটা ঠিক যে, বিদেশে যদি ভারতীয় ছবি খ্যাতি অর্জন করে এবং আদৃত হয় তাহলে আমাদের দেশে ভারতীয় ছবির প্রতি অহেতুক অবহেলা ও ঔদাসীন্য নিঃসন্দেহে কমে যাবে।

'ফিল্ম সেমিনার' আরম্ভ হওয়ার আগে এই সমস্ত চিন্তাই আমাকে বড়ো বেশী ভাবিয়েছে। তাই আমার এই আলোচ্য বিষয়গুলিকে ভারত সরকার এবং ছায়াচিত্র-শিল্প বিশারদদের কাছে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হ'বার জন্মে পেশ ক'রে রাখলাম *

*অনুবাদ: নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

'ফিল্ম সেমিনার'-এর আয়োজন কেন ?

দেবিকারাণী রোয়েরিখ্

[সম্প্রতি দিল্লীতে 'ফিল্ম-সেমিনারে'র উদ্বোধন হয়ে গেছে। এই উপলক্ষ্যে 'ফিল্ম-সেমিনারে'র পরিচালিকা শ্রীমতী দেবিকারাণী রোয়েরিখ্ এর উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

—'চিত্রবাণী'-সম্পাদক]

সঙ্গীত নাটক আকাদামির মধ্যে ছায়াছবি বিভাগটির অন্তর্ভুক্তি একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। শিল্প এবং সংস্কৃতি ব'লতে ছায়াছবির যে একটা বিশেষ স্থান আছে তাই স্বীকার ক'রে নেওয়া হলো এই থেকে। যদিও ছায়াছবি ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত তবুও ছবি তৈরী যখন শেষ হয় তখন একে শিল্পের পর্য্যায়েই ফেলা যায় এবং শিল্পকলা যেসব উপাদানে গঠিত তারই সমগুণাগুণসম্পন্ন হলো এই ছায়াছবি। এই বিশেষ শিল্পকলাকে কিন্তু সমষ্টিগত শিল্পকলা বলা চলে, কেননা সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, অঙ্কন, ভাস্কর্য্য ইত্যাদি বহু বস্তুরই সমন্বয়ে ছায়াছবি গঠিত। শিল্পকলাকে এক নবতর দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকাশ করার কৌশলই নিহিত রয়েছে এই ছায়াছবি সৃষ্টির মধ্যে।

এইসব কারণে ১৯৫৪ সালের ২৪শে মার্চ্চের এক সভায় সঙ্গীত নাটক আকাদামির সাধারণ পরিষদ স্থির করেন যে 'ভারতীয় ছায়াছবি'কে কেন্দ্র ক'রে ১৯৫৪-৫৫ সালের কার্য্যাধিবেশনের মধ্যে সঙ্গীত নাটক আকাদামি একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবেন। ভারতীয় ছায়াছবিকে এই সর্ব্বপ্রথম সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সঙ্গীত নাটক আকাদামি এবং এর সভাপতি বিচারপতি পি, ভি রাজমন্নর যে ব্যবস্থা করেছেন তার জন্যে তাঁরা ধন্যবাদার্হ। ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে এবং ঐতিহ্যে ভারতীয় চিত্রশিল্পেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে এবং সেই চিত্রশিল্পকে সাহায্য করার জন্য চলচ্চিত্র আলোচনা সভার আয়োজন ক'রে সঙ্গীত নাটক আকাদামি তারই বাস্তব রূপ দিলেন। সঙ্গীত নাটক আকাদামি এই ধরণের কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ছায়াছবির উন্নতি সাধন করতে যে সমর্থ হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মানব মনের সুন্দর এবং মহত্তর প্রকাশ-ভঙ্গিমাগুলির প্রতি আকাদামি সত্যকার সমর্থন জানালেন। জনসাধারণের মধ্যে শিল্পকলা যাতে সহজলভ্য হয় এবং তাঁদের মধ্যে সাংস্কৃতিকচর্চা স্থান লাভ করে সেই উদ্দেশ্যেই এই চলচ্চিত্র আলোচনাসভা আয়োজিত হয়েছে ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন চিন্তাধারাকে একটি গঠনমূলক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে ছায়াছবিরও যে একটা স্থান আছে এবং জাতির জীবনে সংস্কৃতির দূত হিসেবে ছায়াছবির দানকে স্বীকার ক'রে নেওয়ার ইচ্ছাই প্রকাশ পেল এই 'ফিল্ম সেমিনার' এর আয়োজনে।

ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে 'ফিল্ম সেমিনারে'র আয়োজন যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে রইলো সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এতে আধুনিককালের চিত্র-প্রযোজনার ব্যাপারে চিত্রশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবধারার সমন্বয় সাধনের সত্যিকার সুযোগ পেলেন চিত্রশিল্পসংশ্লিষ্ট কর্ম্মীরা। চিত্রশিল্পসংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান এবং বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা যে আধুনিক চিত্রশিল্পের নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং গবেষণার কাজে সাহায্য করবে এবং জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগকারী ও প্রমোদ-ব্যবস্থা হিসেবে -এই শক্তিশালী মাধ্যমটির ক্রমোন্নতির দিকে নতুন নতুন পথের ইঙ্গিত দেবে তাতে সন্দেহ নেই। মুখ্যতঃ ভারতীয় চিত্রশিল্পের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে আয়োজন করা হলেও এই 'সেমিনার' অদূর ভবিষ্যতের বহুতর আলোচনা-চক্র ও সহযোগিতার উৎসস্বরূপ হয়ে রইলো।

এই আলোচনাচক্র আয়োজিত হওয়ায় চিত্রশিল্প-সংশ্লিষ্ট কর্ণধারদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ হলো এই সর্ব্বপ্রথম এবং ছায়াছবির শৈল্পিক উন্নতির জন্যে একটিমাত্র

নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'ফিল্ম সেমিনার'-এর উদ্বোধক শ্রীনেহরু এবং যুগ্ম-পরিচালিকা শ্রীমতী দেবিকারাণী

লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে সকলে কাজ করারও সুযোগ পেলেন। সূক্ষ্ম শিল্পরসগুণসম্পন্ন এবং সংস্কৃতিমূলক ছবি তোলার দিকে প্রযোজক এবং শিল্পীরা লক্ষ্য রাখেন না ব'লে জনসাধারণের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে এইবার তারও অবসান হবে ব'লে মনে হয়।

বর্তমানে এই আলোচনাচক্রের রূপটি শিক্ষায়তনের মতো লাগলেও এর ফলে চিত্রশিল্পসংশ্লিষ্ট প্রযোজক, পরিচালক, অভিনয়শিল্পী, কলাকুশলী, পরিবেশক, প্রদর্শক সকলেই উপকৃত হলেন কেননা এখানে তাঁরা মিলিত হ'য়ে লিখিত বিবরণী এবং সাক্ষাৎ ও আলোচনাদির মাধ্যমে পরস্পরের মতামত আদান-প্রদান করবার সুযোগ পেলেন। ছায়াছবির চারুকলার দিকটি ছবিতে ফুটিয়ে তোলার জন্যে একটি পরিকল্পনা মতো কাজ করার উৎসাহও তাঁরা পেলেন এই আলোচনাচক্রের মাধ্যমে।

ছায়াছবির সাংস্কৃতিক এবং শৈল্পিক দিকটির ওপর গুরুত্ব দিলেও চিত্রশিল্পসংক্রান্ত অন্যান্য দিকগুলিও নজর এড়ায়নি। 'সেমিনারে'র সভ্যরা চিত্র-প্রযোজনা, পরিচালনা, পরিবেশনা, প্রদর্শন, সঙ্গীত-পরিচালনা, শিল্প-নির্দেশনা, নৃত্য, অভিনয়, রূপসজ্জা, চিত্রগ্রহণ, শব্দধারণ, রসায়নাগারের কাজ, কাহিনী এবং চিত্রনাট্য, সংলাপ, গান ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে তাঁদের মতামত লিখিত বিবরণী মারফৎ জানিয়েছেন।

এটা মনে রাখতে হবে চিত্র-প্রযোজনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট শিল্পী বা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে একটি পুরো সপ্তাহ ষ্টুডিওর বাইরে থাকা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। তাঁদের সময় খুবই মূল্যবান কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা যে এই আলোচনাচক্রে যোগ দিয়েছেন তাতে ছায়াছবির শিল্প ও সংস্কৃতির দিকটির উন্নতির জন্যে

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের আঙ্কিক হিসাব

সারা বছরে শিল্পে নিয়োজিত মূলধন—৪২ কোটি টাকা

চিত্রগৃহে „ „ —২৬ „ „

ষ্টুডিয়োয় „ „ — ৬ „ „

চিত্রপ্রযোজনা ও পরিবেশনায় „ „—১০ „ „

চিত্রগৃহের সংখ্যা—৩,০০০

চিত্রগৃহে মোট আসনসংখ্যা—২০,০০,০০০

দৈনিক গড়পড়তা ছবির দর্শকসংখ্যা—২৫ লক্ষ

সারা বছরে তৈরী ছবির সংখ্যা—২৫০

ষ্টুডিয়োর সংখ্যা—৬০

পরিবেশকের সংখ্যা —৬০০

চিত্রশিল্পে নিযুক্ত কর্ম্মীসংখ্যা—১,০০,০০০

সারা বছরে ছবি দেখিয়ে যে টাকা ওঠে—২৫ কোটি

বিভিন্ন কর বাবদ সারা বছরে দিতে হয়—১২ কোটি

সারা বছরে আমদানীকৃত কাঁচা ফিল্ম—২১ লক্ষ ফুট

আমদানীকৃত কাঁচা ফিল্মের দাম—দেড় কোটি টাকা

প্রতি বছর আমদানীকৃত বিদেশী ছবির সংখ্যা—২৫০

তাঁদের আগ্রহ এবং আন্তরিকতার পরিচয়ই পাওয়া গেছে। এই আলোচনাচক্রে সভাপতি হিসেবে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের উপস্থিতি সঙ্গীত নাটক আকাদামিকে চিত্রশিল্পের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এনেছে। ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এই যে সর্ব্বপ্রথম চিত্রশিল্পসংশ্লিষ্ট কর্ম্মীরা একত্রিত হলেন তাতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সকলেই তাঁদের বিভিন্ন মতামতগুলি আদান প্রদানের এক সাধারণ মিলন ক্ষেত্র পেলেন। এর ফলে তাঁদের সকলের মধ্যেই একটা বোঝাপড়ার সুযোগ হলো এবং এই মতামত আদানপ্রদানের ফলে ভারতীয় ছায়াছবির উন্নতি ও প্রসারের ক্ষেত্রও রচিত হলো। আমরা আশা করতে পারি, এই উল্লেখযোগ্য মাধ্যমটির সাহায্যে নতুন নতুন ভাবধারা এবং সৃষ্টির পথও সুগম হবে।

আমাদের জাতীয় 'ফিল্ম সেমিনারে'র এই প্রথম অধিবেশন উন্নততর ছবি তোলার মূলে এক নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলুক এবং ছায়াছবিতে শিল্প ও সংস্কৃতি প্রসারের জন্যে সঙ্গীত নাটক আকাদামি এই ধরণের আরও অধিবেশনের ব্যবস্থা করুন এই কামনাই করি।

নতুন ছবি

সাজঘর

রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ও তার পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র ক'রে যেভাবে 'সাজঘর'-এর কাহিনী পরিকল্পিত হয়েছে তা নতুন ধরণের। কাহিনীর এই অভিনবত্ব—সেই সঙ্গে নায়িকা সুচিত্রা সেন ও নায়ক বিকাশ রায়ের অভিনয়-সাফল্য, আর চিত্রগ্রহণের বৈশিষ্ট্য 'সাজঘর' ছবিখানিকে সুষমামণ্ডিত করেছে। চিত্রনাট্য-রচনায় ও সম্পাদনায় যদি না ত্রুটি থাকত তাহ'লে ছবিখানি একঘেয়েমি-বর্জিত হয়ে অনায়াসেই দর্শকচিত্তে গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারতো। এই ত্রুটির জন্যই অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও, 'সাজঘর' প্রথম শ্রেণীর সাফল্যমণ্ডিত ছবির পর্য্যায়ে উঠ্‌তে পারলো না।

অশোক রায় বাংলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তার অভিনয় দেখবার জন্য দর্শকমহলে অপরিসীম চাঞ্চল্য। কিন্তু প্রতিভাবান অশোক যশের শিখরে উঠ্‌তে-না-উঠ্‌তেই তার কাঁধে চেপে বসেছে সাতকড়ির মতো স্বার্থান্ধ জুয়াড়ী-সঙ্গী—তারই পাল্লায় প'ড়ে অশোক নেমে চলেছে অধঃপাতের পথে— মদ ও জুয়ার নেশায় যথাসময়ে রঙ্গমঞ্চে সে উপস্থিত হয় না,—ওদিকে দেড় বছরের ছোট্ট বাপিকে বুকে নিয়ে তার স্ত্রী কল্যাণী রাতের পর রাত কাটায় তারই প্রতীক্ষায়। থিয়েটারের ম্যানেজার রবিদার স্নেহ আর কল্যাণীর ভালোবাসা অশোকের কাছে ক্রমেই মূল্যহীন হ'য়ে আসে। দর্শকেরাও ক্রমশঃ ধৈর্য হারায় তার অনুপস্থিতির জন্য। কল্যাণীর বাবা আসেন কল্যাণীকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে। কিন্তু কল্যাণী যেতে চায় না একান্ত পরনির্ভরশীল স্বামীকে ছেড়ে—ভালোবাসাই তার কাছে বড় হ'য়ে ওঠে, ভালোবাসা দিয়েই সে স্বামীর সব গ্লানি, সব অপরাধ ঢেকে রাখতে চায়। কিন্তু, ঘটনাচক্রে যেতেই হয় স্বামীকে ছেড়ে—শুধু স্বামীকে ছেড়ে নয়, তার বুকের মাণিক দেড় বছরের শিশু বাপিকে ছেড়েও। অশোকের সেই তীব্র অভিশাপ—'ছেলেকে কখনও আর দেখতে চেও না—দেখবার চেষ্টা করো না—এ-বাড়ীতে এলে তুমি বাপির মরা মুখই দেখবে।'—সে-অভিশাপ উপেক্ষা করবার মতো শক্তি বুঝি কল্যাণীর নেই। তাই সে পিতৃগৃহেই দিন কাটায় চোখের জলে বুক ভাসিয়ে। ওদিকে সর্বস্ব খুইয়ে চলে অশোক—মদের নেশায় আর জুয়ার খেলায়। শেষ পর্যন্ত ছেলের হাত ধ'রে পথে বের হ'তে হয় তাকে। এমনি ক'রে কাটে সুদীর্ঘ দশটি বছর। কল্যাণী শহরের জনারণ্যে খুঁজে বেড়ায় তার স্বামীকে, তার বুকের মাণিক বাপিকে। কিন্তু কোথায় তারা! দুঃখে, কষ্টে ও দারিদ্র্যে অশোকের চৈতন্য ফিরে আসে—মদের নেশা সে ভুলেছে, জুয়ার আড্ডাও সে আর মাড়ায় না। আর্থিক কষ্টে তার সব অভিমানই বুঝি ক্ষীণ হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত, রবিদার চেষ্টায় আবার সে রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসে—কল্যাণীকে ফিরে পায়—সুদীর্ঘ দশ বছরের পর আবার মিলন হয় মাতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে। সংক্ষেপে এই হ'লো 'সাজঘরের' কাহিনী।

প্রযোজনা :	বিকাশ রায় প্রোডাকসন্স
কাহিনী ও চিত্রনাট্য :	সলীল সেনগুপ্ত
চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা :	অজয় কর
শিল্প-নির্দেশনা :	সুনীতি মিত্র
শব্দগ্রহণ :	মণি বসু
সঙ্গীত পরিচালনা :	সত্যজিৎ মজুমদার
অভিনয়ে :	সুচিত্রা সেন, বিকাশ রায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, জীবেন বসু, মেনকা, কমল মিত্র প্রভৃতি।
পরিবেশনা :	ছায়াবাণী লিমিটেড

কাহিনীকার সলীল সেনগুপ্তই এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। কাহিনী পরিকল্পনায় তিনি যে নতুনত্বের সঞ্চার করেছেন, চিত্রনাট্য রচনাতেও যদি তাঁর মুন্সীয়ানার সেই রকম পরিচয় পাওয়া যেত তাহ'লে 'সাজঘর' নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর ছবির পর্য্যায়ে উঠ্‌তে পারতো। তিনি অভিনেতার শিল্পী-জীবনের কথা দিয়েই কাহিনী শুরু করেছেন, কিন্তু কিছুদূর যেতে-না-যেতেই শিল্পী-জীবনের চেয়ে অভিনেতার নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবনই বড় হয়ে

উঠলো। প্রথম ত্রুটি এইখানেই। দ্বিতীয় ত্রুটি—নায়কের অভিনয় প্রতিভার সম্যক্ পরিচয়-প্রকাশে। অশোক রায়কে বলা হয়েছে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—তার অভিনয় দেখার জন্য দর্শকমহলে সাড়া পড়ে যায়— ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে তার উপস্থিতির জন্য। কিন্তু, ছবিতে আমরা অভিনেতা অশোকের এমন কোনো অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় পেলাম না যাতে তাকে শিশিরকুমার, দুর্গাদাস বা অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পর্য্যায়ে ফেলতে পারি। নিছক আবৃত্তিতে অভিনয় প্রতিভার স্ফুরণ হয় না—সুকণ্ঠের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। কণ্ঠস্বরের মাধুর্যের সঙ্গে চাই ভাবের অভিব্যক্তি.— চলায়, বলায় সবকিছুতেই ফুটে ওঠা দরকার অভিনেতার অভিব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। তবেই না তার অভিনয় সার্থক। ছবিতে দেখানো হয়েছে অশোক রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ স্বচ্ছন্দগতিতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সংলাপ আউড়ে গেলেন। কিন্তু সে-আবৃত্তিতে ছবির দর্শক বা শ্রোতার বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা গেল না। 'শেষ-অঙ্ক'-এর দর্শকবৃন্দের অজস্র হাততালি থেকেই কি বুঝতে হবে অশোক রায় অসাধারণ অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন? এদিকেও পরিচালকের দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। কল্যাণীর পিতৃগৃহে যাওয়ার পর যে-ভাবে দশটি বছর কাটিয়ে দেওয়া হয়েছে—তা কাহিনীর আবেদন সঞ্চারের দিক থেকে সুবিন্যস্ত নয়। এই দশ বছর অশোক ও তার ছেলে কি শুধু পথে পথেই ঘুরে বেড়িয়েছে? সে-পথ কি ক'লকাতাতেই সীমাবদ্ধ? যদি তাই হয়—তাহ'লে অশোকের মতো কীর্ত্তিমান ও জনপ্রিয় অভিনেতাকে খুঁজে বের করা কি খুবই শক্ত? কাহিনীকার এই দশ বছরের কোনো বাস্তব-সঙ্গত বিবরণ দিতে পারেন নি। তাই. দশ বছর কোনো রকমে পার ক'রে দেওয়াতে ছবিতে ঘটনার উপস্থাপন শিথিল হ'য়ে পড়েছে। কল্যাণীর মানসিক দ্বন্দ্বেরও সম্যক বিকাশ নেই। তাছাড়া, যে ভাবে এক বৈষ্ণবীর গানের মধ্য দিয়ে বিরহবিধুরা মা যশোদার অন্তর্বেদনার পরিচয় দেওয়া হয়েছে—তাতে কল্যাণীর মাতৃত্বের করুণ দিকটা ফুটে উঠলেও, কোনো বৈচিত্র্য প্রকাশ পায়নি। কারণ বহু বাংলা ছবিতেই এ-ধরণের মামুলী দৃশ্য আছে। তাই সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তিতে ফল হিতে বিপরীত হয়েছে অশোক ও কল্যাণীর মানসিক দ্বন্দ্বের দিকটা যদি পরিস্ফুট হ'তো—তাহ'লে কাহিনীর বিন্যাসে দুর্বলতা অনেকাংশেই ঢাকা পড়ত—ছবির গতিও বাড়ত তাতে। নিঃস্ব অশোকের প্রতি বিগতযৌবনা বাড়ি-উলীর আকর্ষণও কেমন যেন বেখাপ্পা।

ফ্ল্যাশ-ব্যাকে একই দৃশ্যের (অর্থাৎ, শিশু. বাপিকে নিয়ে অশোক ও কল্যাণীর ভবিষ্যৎ-কল্পনা) পুনরাবৃত্তিতেও পরিচালক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন নি। পরিচালক অজয় কর পরিচালনার চেয়ে চিত্রগ্রহণেই বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রেক্ষাগৃহের দৃশ্য, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর রাত জেগে কল্যাণীর নীরব-চিন্তা, বস্তির দৃশ্য—বিশেষ ক'রে যেখানে বাপি ক্ষুধায় কাতর হয়ে নিচের ঘরে ব'সে আছে আর অশোক যাচ্ছে ওপরতলায় বাড়িউলীর কাছে টাকা ধার করতে, বস্তির মধ্যে জুয়া-খেলার দৃশ্য, কল্যাণীর কাছ থেকে পালিয়ে বাপি যখন অশোকের কাছে ছুটে যাচ্ছে, রঙ্গমঞ্চে যেখানে অশোক আবৃত্তি করতে করতে প'ড়ে যায় এবং কল্যাণী করিডর দিয়ে ছুটতে থাকে সেখানকার চিত্রগ্রহণ চমৎকার।

রূপসজ্জাতেও অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করা গেল। দশ বছরে অশোকের চেহারার যে পরিবর্ত্তন দেখানো হয়েছে—ঠিক সে-রকম পরিবর্ত্তন কল্যাণীর রূপসজ্জায় ফুটে ওঠেনি, এমনকি রবিদার চেহারাতেও নয়। দশ বছরে অশোক যে-কষ্ট স্বীকার করেছে—মনের দিক থেকে কল্যাণী ও রবিদা কি তার চেয়ে কম কষ্ট অনুভব করেছে? রূপসজ্জার এই অসঙ্গতি সহজেই চোখে পড়ে।

শব্দধারণ, শিল্পনির্দেশ ও সঙ্গীত-পরিচালনা যথাযথ। এই ছবিতে দুখানি মাত্র গান আছে, একখানা রবীন্দ্র-সঙ্গীত, অন্যখানা কীর্ত্তন, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের রচনা। রবীন্দ্র-সঙ্গীত হ'লো—'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে'। যদিও গানখানি সুগীত ও সুপ্রযুক্ত হয়েছে—তথাপি বলতে বাধা নেই যে, এই গানখানি এর আগেও আমরা শুনেছি 'প্রিয়বান্ধবী' ছবিতে। কোনো বিশেষ

ভাব-প্রকাশে কোনো বিশেষ সঙ্গীতের আবেদন আছে ব'লেই কি একই গানের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে? কাহিনী-কার বা পরিচালক ইচ্ছে করলে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেই এই ভাবের অন্য গানও সংগ্রহ করতে পারতেন। যেমন —"এস গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি"; "কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে"; "না না, ডাকব না, ডাকব না অমন ক'রে বাইরে থেকে"; "ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই"—ইত্যাদি।

বহু ত্রুটি সত্ত্বেও 'সাজঘর' ছবির অভিনয়-সাফল্যই ছবিখানিকে আকর্ষণীয় করেছে। সবচেয়ে ভালো অভিনয় করেছেন কল্যাণীর ভূমিকায় সুচিত্রা সেন। যে-দৃশ্যে বাপিকে ফিরে পেয়ে কল্যাণীর আনন্দের সীমা নেই, সে দৃশ্যে সুচিত্রা সেনের অভিনয়-দক্ষতার বলিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া গেল। ধীরে ধীরে তিনি যে-ভাবে মাতৃ-হৃদয়ের আবেগোচ্ছল ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন দর্শকচিত্তে তা গভীরভাবে রেখাপাত করে। বাষ্পাকুল নয়নে তিনি যে ভাবে পিসিমার কাছে গিয়ে বলছেন——'পিসিমা! পেয়েও পেলাম না— ও আমাকে মা বল্‌লো না' সেই অভিব্যক্তিও বড় সুন্দর। বিকাশ রায়ের অভিনয়-দক্ষতার নতুন পরিচয় পাওয়া গেল এ-ছবিতে। অবশ্য, রঙ্গমঞ্চের অভিনয় বাদ দিয়েই এ-কথা বলছি। মত্ত-অবস্থায়, বস্তিতে ও শেষ দৃশ্যে তাঁর অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে। সাতকড়ির মতো কুটিল চরিত্রটিকে কমেডিয়ান ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাতকড়ির কুটিলতা প্রকাশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সার্থকতা লাভ করেছে। রবিদার ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল, কল্যাণীর বাবার ভূমিকায় কমল মিত্র, টুরিং থিয়েটার কোম্পানীর ম্যানেজারের ভূমিকায় শ্যাম লাহা আর, পিসিমার চরিত্রে সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বাড়িউলীর ভূমিকায় বহুদিন পরে অবতীর্ণা মেনকার অভিনয় বৈচিত্র্যহীন। এই চরিত্রটিও ভালোভাবে অঙ্কিত হয়নি। বাপির চরিত্রটি নবাগত মাষ্টার বুলুর অভিনয়ে সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে।

রাইকমল

তারাশঙ্করের সাহিত্য-জীবনের প্রথম উপন্যাস 'রাইকমলে'র কাহিনী অবলম্বন ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের 'রাইকমল'। উপন্যাসের কাহিনী, তার সহজ সরলতা মোটামুটি বজায় রেখেই চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। চিত্রনাট্যে কোনও কোনও জায়গায় আকস্মিকতা বা কিঞ্চিদধিক অবাস্তবতা থাকলেও সমগ্রভাবে চিত্রের শৈল্পিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। মূল রচনার শেষাংশে রঞ্জনকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, যেভাবে সেখানে কমল ও রঞ্জনের মালাচন্দন হয়েছে, যেভাবে কমল বর্ত্তমান থাকতেই আবার রঞ্জন নতুন ক'রে আর একটি মেয়েকে বৈষ্ণবী ক'রে এনেছে—চিত্রনাট্যকার তা সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনীর সমাপ্তি চিত্রনাট্যকার বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের হাতে অধিকতর কাব্যধর্মী হয়েছে।

বৈষ্ণবীর মেয়ে কমল, পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়-অঞ্চলের ছোট্ট একটি গ্রামের পথের ধারে হরিদাসের আখড়ায় বাস করে। মা আর মেয়ে। পাশেই রসিককুঞ্জে আস্তানা গড়েছে প্রৌঢ় বাউল রসিকদাস মহান্ত। মহান্ত কমলকে বলে রাইকমল, কমল মহান্তকে বলে বগ্‌বাবাজী কমলের খেলার সাথী অনেক, তার খেলার সংসারে সে গৃহিণী, রঞ্জন গৃহকর্ত্তা আর কানু ননদিনী। খেলাঘরের এই সম্পর্ক কৈশোরেও তাদের মনে দাগ রাখে, কমল যেন চিরকিশোর শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পায় রঞ্জনের মধ্যে, রঞ্জনও আপন ক'রে পেতে চায় কমলকে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় জাতিকুল। রঞ্জন চাষীর ছেলে, বৈষ্ণবীর মেয়ে বিয়ে করলে তার জাত যাবে। রঞ্জনের বাবা মহেশ কাতর মিনতি জানায় কমলের মা কামিনীর কাছে, সে যেন তার ছেলেকে কেড়ে না নেয়। মেয়ের মনের কথা জেনেও কামিনী প্রতিশ্রুতি দেয়। রসিকদাসকে সঙ্গে নিয়ে মা ও মেয়ে চলে যায় নবদ্বীপে। নবদ্বীপে তাদের আখড়ায় নিত্য বসে তরুণ বৈষ্ণবের রূপের হাট। তাদের একজনের সঙ্গে কমলের বিয়ে দিতে চায় কামিনী ও রসিকদাস।

কিন্তু কমল রাজী হয় না, রঞ্জনকে সে ভুলতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত মায়ের মৃত্যুশয্যায় প্রতিশ্রুতি দেয় কমল বিয়ে করবে ব'লে। কামিনীর মৃত্যুর পর নানা কথা রটে নবদ্বীপে রসিকদাস আর কমলকে নিয়ে, রসিকদাস তাই কমলকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার প্রতিশ্রুতির কথা। কমল মালা চন্দনের যোগাড় করতে বলে, রসিক তার নির্ব্বাচিত পাত্র সুবলসখাকে খবর দিতে চায়। কমল আগে তাকে সব আয়োজন সম্পূর্ণ করতে বলে। সব আয়োজন সম্পূর্ণ, মালা গাঁথা হয়ে গেছে, রসিকদাস যাবে এবার সুবলসখাকে ডাকতে। কিন্তু কমল মালা দিয়ে বসে তারই গলায়। বিব্রত বোধ করে রসিকদাস। কোথা থেকে কি হয়ে গেল। নবদ্বীপ ছেড়ে তারা পথে বেরোয় শেষ পর্য্যন্ত আবার তারা বাসা বাঁধে কমলেরই গাঁয়ে। কৃষ্ণপ্রেম থেকে বিচ্যুত হবার আশঙ্কায় রসিকদাস একদিন পালিয়ে যায় কমলকে ছেড়ে। আবার নানা রঙের নানা ভ্রমর এসে ভীড় করে রাইকমলের রসকুঞ্জে, পাড়ায় ঘোট হয় তাকে নিয়ে। কান্থর পরামর্শে আবার মালাচন্দন করতে রাজী হয় কমল। কিন্তু পূর্ণিমার রাতে মালা হাতে সে বেরিয়ে পড়ে জয়দেবের পথে। পথে দেখা হয় রঞ্জনের সঙ্গে। রঞ্জন তখন বৈষ্ণব রাইদাস মহান্ত। কমলের প্রতি অভিমানে তারই খেলার সাথী বিধবা পরীকে বিয়ে করে সে বৈষ্ণব হয়। রাস্তার মাঝে মুখোমুখী দাঁড়ায় খেলাঘরের গৃহকর্ত্তা আর গৃহিণী। ঠিক হয় কমল মালা দেবে রঞ্জনকে। রঞ্জন তাকে নিয়ে আসে তার আখড়ায়। সেখানে অসুস্থা পরী জ্বলে মরে ঈর্ষার জ্বালায়। পরী যে তখনও বেঁচে আছে কমল তা জানতো না—সে-কথা রঞ্জনও বলেনি তাকে। মালা দেওয়া আর হয় না কমলের। রঞ্জনের অলক্ষ্যে আবার সে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

প্রযোজনা ও পরিবেশনা :	অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন
কাহিনী :	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য :	বিনয় চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা :	সুবোধ মিত্র
সঙ্গীত পরিচালনা :	পঙ্কজ মল্লিক
চিত্রগ্রহণ :	অমূল্য মুখোপাধ্যায়
শব্দগ্রহণ :	শ্যামসুন্দর ঘোষ ও সুশীল সরকার
শিল্পনির্দ্দেশনা :	সুনীতি মিত্র
অভিনয়ে :	কাবেরী বসু, চন্দ্রাবতী, নীতীশ মুখোপাধ্যায় উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, নবগোপাল লাহিড়ী, পারিজাত, ইরা চক্রবর্ত্তী, বেলারাণী, সন্ধ্যা দেবী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি

সমাজ-জীবনের উপস্থাপনায়, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে, ঘটনার নির্ব্বাচনে চিত্রখানি বাস্তববাদী দর্শকের যুক্তিবাদী মনকে মোটামুটি খুসী করবে। আর সঙ্গীতমাধুর্য্যে খুসী হবে সঙ্গীতপিপাসু চিত্ত। কিন্তু কাহিনীর অন্তর্নিহিত যে করুণ মাধুর্য্য ছিল উপন্যাসের প্রাণ চিত্রে তার অভাব রস-তৃপ্তিতে অনেকখানি ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। জয়দেবের পথে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে কমলের, সমগ্র চিত্র কাহিনীতে এই সহজ সাক্ষাৎকারের কোনও প্রস্তুতি নেই। কমল গ্রাম ত্যাগ করার পর থেকে রঞ্জন আমাদের হারিয়ে গেছে, যে-টুকু খবর আমরা পেয়েছি তার সম্পর্কে, তাতে সে আমাদের সহানুভূতি হারিয়েছে অথচ অনুপাতাতিরিক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে রাইকমল। বিশেষ ক'রে জয়দেবের পথে বর্ষাবাদলের মধ্যে তার ক্রিয়াময় সঙ্গীত অনেকখানি প্রক্ষিপ্তই মনে হয়েছে। মহান্ত চ'লে যাওয়ার পর রাই-কমলের আখড়ায় ভণ্ড বৈষ্ণবদের নিত্য নৈমিত্তিক যান্ত্রিক সমাবেশ ও লঘু পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। রঞ্জনের পারিবারিক জীবন ও কমলের প্রতি তার অকৃত্রিম আসক্তির সম্যক্ পরি-চয় দিতে পারলে রসঘন হয়ে উঠত চিত্রখানি। ঘটনা ও পরিবেশ-বৈপরীত্যের অভাবে বাস্তব জীবনের এই সরল রূপায়ণ তেমন নাড়া দিতে পারেনি আমাদের। রাইকমলের নিদারুণ দুঃখেও আমরা অভিভূত হই না, অথচ সে-দুঃখ অস্বাভাবিক এমন কথাও বলতে পারি না। মূল উপন্যাসেই এই ত্রুটি থেকে গেছে। চিত্রেও দেখলাম তারই প্রতিফলন।

অভিনয়ে রসিকদাস মহান্তের মাহাত্ম্য-মাধুর্য্য-মণ্ডিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় সুন্দর সহজ শিল্পকুশল অভিনয় ক'রেছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়। বৈষ্ণব বাউলের খুঁটিনাটি চলন ও বলনভঙ্গীর যে বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য্যপূর্ণ প্রকাশ তাঁর মধ্যে আমরা পেয়েছি, তা সুলভ নয়।

নবাগতা কাবেরী বসু অভিনয় ক'রেছেন রাইকমলের ভূমিকায়। তাঁর তৎপরতা ও স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর শিল্পী-জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সূচনা করলেও রাইকমলের রূপসজ্জায় তাঁর চাহনি, বাচনভঙ্গী ও চলনভঙ্গীতে অনেক সময় যে প্রযত্ন কুশলতা লক্ষ্য করা গেছে গেঁয়ো মেয়ে রাইকমলের চরিত্রকে তা' যেন সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করে না, রাইকমলের মধ্যে আরও যেন গ্রাম্য হাবভাবের প্রয়োজন ছিল। রাইকমলের মাকে পর্য্যন্ত যেখানে পূর্ণ বেশবাশ দেওয়া হলো সেখানে কাবেরী বসুর অঙ্গে বেশবাসের স্বল্পতা কেন? তবুও কাবেরী বসুর রাই-কমল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে দর্শকের। ননদিনী কাদুর ভূমিকাটিকে যোগ্য মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু কামিনী ও রঞ্জনের ভূমিকায় চন্দ্রাবতী ও উত্তমকুমার তাঁদের পূর্ব্বদীপ্তি অম্লান রাখতে পেরেছেন বলে মনে হয় না, অবশ্য রঞ্জনের ভূমিকায় অভিনয়দীপ্তি প্রকাশের কোনো সুযোগই ছিল না। বিভিন্ন পার্শ্বচরিত্রে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, আশা দেবী, সন্ধ্যা দেবী প্রভৃতিও অনেকখানি সাহায্য ক'রেছেন চিত্রখানির সংগঠনে।

চিত্রে গান আছে সাতাশটি। সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায় প্রত্যেকখানি গানই হয়েছে চমৎকার। তিনি নিজে যে গানগুলি গেয়েছেন—বিশেষ ক'রে যে-সব গানের সঙ্গে কোনো যন্ত্র-সঙ্গীত নেই—সে-গানগুলি বড়ই মধুর লেগেছে। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গাওয়া গানগুলি সম্পর্কেও সে-কথাই প্রযোজ্য। 'রাইকমল' ছবির শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ তার প্রত্যেকটি গান। গানের রেকর্ডিংও অপূর্ব্ব। কিন্তু এত গানের কি সত্যই প্রয়োজন ছিল? চিত্রগ্রহণ ভাল, শব্দগ্রহণও ভাল।

দত্তক

"দত্তক" ছবিখানি সম্প্রতি মুক্তিলাভ ক'রেছে চিত্রা, বীণা, বসুশ্রী ও অন্যান্য চিত্রগৃহে। নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে এক বন্ধ্যা নারীর দত্তক পুত্র গ্রহণের কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে "দত্তক"। তরুণ ডাক্তার রমেশ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী গীতা পরিবারের ছোট বৌ, সন্তান কামনায় দণ্ডী খাটবার জন্য স্বামীকে সঙ্গে ক'রে সে গিয়েছিল পঞ্চাননতলায় কিন্তু দণ্ডী খাটবার দুঃসাধ্য পরিস্থিতি দেখে স্বামী তাকে সেদিন ফিরিয়ে এনেছিল। বাড়ী ফিরে এসে বড় ভাজের গলার ঝাঁজ তার কাণে গেল। গিয়ে দেখে ছেলে কোলে এক তরুণী বিধবাকে তিরস্কার করছে বড় বৌ। বিধবাটি বড় বৌয়েরই মামাতো বোন সরলা, সম্প্রতি বাবা মারা গেছেন, তাই আশ্রয় চায় দিদির সংসারে। কিন্তু দিদি দিতে চায় না সে আশ্রয়। তাই ফিরে যাবার জন্য সরলা এগিয়ে চলে. কিন্তু মুহূর্ত্তে অবসন্ন ক্লান্ত দেহ তার লুটিয়ে পড়ে ধূলোয়, ছেলেটা ছিট্‌কে পড়ে কাঁদতে থাকে। সব চোখের সামনে দেখে গীতা স্থির থাকে পারে না, সে কোলে তুলে নেয় ছেলেটিকে, ভগবানই বুঝি তার কোলে তুলে দিলেন এই ছেলে। কিন্তু ছোট বৌয়ের এই আচরণ আত্মমর্য্যাদায় আঘাত দিল বড় বৌয়ের। সরলার আর ছেলের আশ্রয়লাভে তার বুকে যেন শেল বিঁধল। কিন্তু স্বামীকে সে কিছুতেই বাগে আনতে পারে না। কেদারনাথ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সাত আট মাইল হেঁটে নিবারণ ডাক্তারের ডিস্পেন্সারীতে কম্পাউণ্ডারী ক'রে অনেক কষ্টে সে মানুষ ক'রে তুলেছে ছোট ভাই রমেশকে। এখন সে রমেশের ডিস্পেন্সারীতেই কাজ করে, ভাই বলতে সে অজ্ঞান। ভাদ্র-বৌ গীতার ওপর কেদারের স্নেহদৃষ্টি অপরিসীম, মা-লক্ষ্মীর স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সবসময় সে সজাগ। গীতার এই সন্তানগ্রহণ সে সমর্থন করল। বড় বৌ তাই অন্য পথ ধরল। সরলা ও

প্রযোজনা : সবিতা পিকচার্স
কাহিনী : বীণাপাণি দেবী
পরিচালনা ও সম্পাদনা : কমল গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও সংলাপ : মণি বর্ম্মা
গীতরচনা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
সুরসৃষ্টি : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
আলোকচিত্রগ্রহণ : অনিল গুপ্ত
শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল
শিল্পনির্দেশ : কার্ত্তিক বসু
অভিনয়ে : ছায়া দেবী, সন্ধ্যারাণী, প্রণতি ঘোষ, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, প্রীতি মজুমদার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, মাঃ স্বপন প্রভৃতি
পরিবেশনা : মোহিনী পিকচার্স

[illegible]কে জড়িয়ে কুৎসার ইঙ্গিত করল সে স্বামীর কাছে। এবার একটু বিচলিত না হয়ে পারল না কেদার। কিন্তু মা-বাপের মুখ চেয়ে কি করবে ঠিক ক'রে উঠতে পারছিল না। শেষ পর্য্যন্ত বাড়ীর মধ্যে পাচিল তোলাই ঠিক করল, ছেলে থাকবে ছোট বৌয়ের কাছে, আর সরলা থাকবে বড়বৌয়ের কাছে। সে মীমাংসাও সম্ভব হ'ল না। ছোট বৌ সরলাকে টেনে নিয়ে গেল তার ঘরে। এদিকে কুৎসা রটতে লাগল পাড়ায়, ডিস্পেন্সারীতে দাদার মাইনে ঠিক ক'রে দেওয়ার জন্ত বলে বৌদি, রমেশও আর স্থির থাকতে পারে না। ধার ক'রে হিসেব মত দাদার বাকী মাইনে সে মিটিয়ে দেয়, সরলাকে সে চলে যেতে বলে, ছেলে নিয়ে কটু কথা বলে গীতাকে। অভিমানে ছেলে নিয়ে গীতা চলে যায় বাপের বাড়ীতে, বাধ্য হয়ে সরলা চলে যায় বড় বৌয়ের ঘরে। এবার মানসিক অস্থিরতা বেড়ে যায় রমেশের। দুষ্ট-লোকের পরামর্শে সরলাকে দিয়ে সে মামলা করাতে চায় গীতার বিরুদ্ধে, সরলা রাজী হয় না, রমেশ ভয় দেখায়, বৌদির কাছে সে প্রস্তাব করবে সরলাকে বিয়ে করার, এই চরম অপমানের ভয়ে সরলাকে মামলা করতে হয়। মামলার দিন আদালতপ্রাঙ্গণ থেকে গীতার বাবা ডেকে নিয়ে আসেন সরলাকে, বাড়ীতে এসে কেদার ও বড়বৌয়ের সাহায্যে গীতা তার বাবার মধ্যস্থতায় দত্তক নেয় সরলার ছেলেকে। বড় বৌ কোল দেয় তার বোনকে।

গোড়ার দিকে যেভাবে কাহিনী সুরু হয়েছিল, বাঁধুনির দুর্বলতা সত্ত্বেও তা' রসমধুর ক'রে তুলতে পারত ছবিটিকে যদি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হ'তেন পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার। চিত্রখানি শেষ হয়েছে শুধু আকস্মিকভাবে নয়, অযৌক্তিক যান্ত্রিকতায়, যে-স্বামীর প্রতিশোধবৃত্তি বা আধিপত্যস্পৃহা তাকে প্ররোচিত করে স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আদালতে মামলা করতে, দত্তক গ্রহণের পরই সেই স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর স্বাভাবিক মিলন সম্ভব নয়, বিশেষ ক'রে স্বামীর ঐ ধরণের মানসিক পরিবর্ত্তন মনস্তত্ত্ববিরোধী, অযৌক্তিক ও হাস্যকর। তেমনই হাস্যকর হ'য়েছে বড় বৌয়ের পরিবর্ত্তন। এই দুটি চরিত্রে মনস্তত্ত্বের ছেলেমানুষী বিচার চিত্রখানির সমস্ত মর্য্যাদা ও আকর্ষণ নষ্ট করেছে, নষ্ট করেছে রসমাধুর্য্যের সমস্ত সম্ভাবনাকে। একস্থানে দেখা যায়, সবার অলক্ষ্যে ছেলেটিকে চুম্বন করেছে বড় বৌ। পরিচালক ঐ সূত্র ধরে এগিয়ে যেতে পারতেন বড় বৌয়ের মানসিক পরিবর্ত্তনের দিকে। সরলাকে বিয়ে করতে চাওয়ার প্রতিশোধমূলক প্রস্তাবের মাধ্যমে রমেশকে ছোট না ক'রে বৌদির প্রভাবে আর পিতৃত্বের লোভের সূত্রে তার মনস্তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ করা যেত। আর যখন সরলাকে বিয়ে করার ভয় দেখাল রমেশ, তখন আত্মহত্যা করাই তো স্বাভাবিক ছিল সরলার পক্ষে, অন্ততঃ সেই উপাদানেই সে গড়ে উঠেছে, মামলা করতে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ও যুক্তিসঙ্গত নয়। মনস্তত্ত্বের এই সাধারণ ও স্বাভাবিক সূত্র ও রীতিগুলি মানলে সিদ্ধরস-চালিত একখানি মধুর চিত্র হিসেবে পরিচালক গড়ে তুলতে পারতেন "দত্তক"-কে।

"দত্তক"-এর শিল্পীগোষ্ঠীতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরাই রয়েছেন। অভিনয়ও কারও উল্লেখযোগ্যভাবে খারাপ হয় নি। কেদারের বিশিষ্ট চরিত্রে জহর গাঙ্গুলী তাঁর বিশিষ্ট অভিনয়ভঙ্গীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বড়-বৌয়ের কুটিল চরিত্রে রূপ দিয়েছেন ছায়া দেবী। ছায়া দেবীর দীপ্তিময় যুগে এই ধরণের চরিত্রে আমরা তাঁকে দেখিনি, ইদানীংকালে এই ধরণের দু'একটি চরিত্রে তাঁকে দেখলেও আমরা সন্তুষ্ট হ'তে পারিনি। কিন্তু "দত্তক"-এর বড় বৌ চরিত্রে ছায়া দেবী যেন তাঁর অতীতযুগকেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। সন্ধ্যারাণী ছোটবৌয়ের চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন, শ্রীমান স্বপনও বেশ সহজ। সরলার ভূমিকায় প্রণতি ঘোষ কোনও কোনও স্থানে অভিব্যক্তিহীন। ঘোট-পাকানো গ্রাম্য মাতব্বরের ভূমিকায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, মোক্তারের ভূমিকায় প্রীতি মজুমদার ও নিবারণ ডাক্তারের ভূমিকায় সন্তোষ সিংহ একরকম চালিয়ে গেছেন। রমেশের ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন অসিতবরণ এবং গীতার বাবার ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন ছবি বিশ্বাস।

চিত্রগ্রহণ ভাল, জ্যোৎস্নারাতের চিত্রগ্রহণ সুন্দর। গান দু'খানি মোটামুটিভাবে সুগীত ও সুরচিত হ'লেও,

গ্রামবাসীর গানখানি সুসন্নিবিষ্ট নয়। সংলাপ সর্বত্র ভাল নয়। পুকুর-ঘাটের দৃশ্যসমাবেশ উল্লেখযোগ্য। শব্দগ্রহণ ভাল।

অনুপমা

'অগ্নিপরীক্ষা'র সাফল্যের পর এম পি প্রোডাকসন্সের নবতম ছবি 'অনুপমা'। পরিচালনা করেছেন অগ্রদূত গোষ্ঠী। কাহিনী নেওয়া হয়েছে সুশীল জানার 'সূর্য্যগ্রাস' নামক প্রকাশিত উপন্যাস থেকে। কাহিনী বহু সমস্যায় কণ্টকাকীর্ণ—বিশেষ একটি পরিবারের সমস্যা, বালবিধবা মেয়ের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার বা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের সমস্যা, তাছাড়া সাধারণভাবে বেকার সমস্যা, মধ্যবিত্তের জীবননির্ব্বাহ ও সুখস্বপ্ন সার্থক ক'রে তোলার সমস্যা। এতগুলি সমস্যাকে সমান্তরালভাবে পাশাপাশি টেনে নিয়ে যাবার ফলে সব সমস্যাই তালগোল পাকিয়ে গেছে, ঘটনাস্রোত বা নাট্যদ্বন্দ্বও অসংলগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছবিতে যদি দুই জাতের সমস্যার মধ্যে একটিকে বেছে নিয়ে তারই অকরুণ রূপ ও সমাধানের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা হোতো তবে ছবির মূল্য এবং উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা জোর পেতো। তাছাড়া সুস্থ-মস্তিষ্ক বলে কথিত এম, এ, পাশ বেকারের যে পরিচয় পেলাম, তাতে তাকে একমাত্র 'ইমৃবেসাইল'ই বলা চলে, ঠিক এমনি বেকারের সন্ধান সিনেমার গল্পের বাইরে মেলে না এইটুকুই সান্ত্বনা। বাংলার দরিদ্র মধ্যবিত্ত সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা ও জীবন সংগ্রামই যদি যথার্থভাবে রূপায়নের আয়োজন করা হোতো, তবে 'অনুপমা' চিত্রসৃষ্টির দিক থেকে উপমাহীন হ'য়ে উঠতে পারত।

বহুদিন শিক্ষকতার পর বৃদ্ধ শিক্ষক শিবশঙ্কর অবসর গ্রহণ করলেন। সামান্য মাত্র পেন্সনের টাকা নিয়ে এই ক্ষুদ্র দরিদ্র শিক্ষক পরিবারটির রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রাম সুরু হল। সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙলার গৃহকোণের অবরোধ ভেঙ্গে একটি মেয়ে বহু যন্ত্রণায় এসে দাঁড়াল বজ্রমুখর বর্তমান পৃথিবীর সামনে—সে শিবশঙ্করের কন্যা কল্যাণী। এখান থেকেই সুরু কল্যাণীর জীবনে বর্তমান বহির্বিশ্বের নতুন রূপ রসবোধের শান্ত। ... সংগ্রাম করেছে নিজের মনে, সংসারের অভাবের সঙ্গে, প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে। শেষ পর্য্যন্ত সে দ্রুত ঘটনার গতিপথে এসে দাঁড়াল চরম সংগ্রামের মুখে—তা হল বর্তমান সভ্যতার আদর্শের সঙ্গে সংগ্রাম। সে দেখল নারীমুক্তির নামে বাজারের বেচা-কেনা। সেই পণ্যের বাজারে সে পারল না তার আত্মমর্যাদা, তার শুভ্র নারীত্বকে জলাঞ্জলি দিতে, অভিজ্ঞতার তীক্ষ্ণ কুটিল পথে তার মধ্যে বিকশিত হল নতুন কালের এক নারী-মহিমা।

আপনাদের চিঠি

…কুমার পাল, চুঁচুড়া

পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের পার্থক্য কী?

আপনার প্রশ্নের জবাব সংক্ষেপে দেওয়া সম্ভব নয়। … প্রধান পার্থক্য এই—ভারতীয় সঙ্গীত মেলডি-প্রধান … পাশ্চাত্য-সঙ্গীত কাউণ্টারপয়েণ্ট-প্রধান। আমাদের … একই সুরের পর্যায়ে, ওদের সঙ্গীত চলে বিভিন্ন … সংমিশ্রণে। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ হলো … সুরের অভিব্যক্তি, পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের আধার হলো যন্ত্র-… ব্যঞ্জনা। আপনি যদি নিজে সঙ্গীতবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত থাকেন—তাহলে পার্থক্যটা … বুঝতে পারবেন। আপনার কৌতূহল মেটাতে ভবিষ্যতে এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাগবাজার, কলিকাতা

সুচিত্রা সেন কী খেতে ভালবাসেন? সাবিত্রী চ্যাটার্জী কি লুডো খেলেন?

এ-ধরণের প্রশ্ন ক'রে অনর্থক পোষ্টকার্ডের পয়সা খরচ করবেন না।

সমরেন্দ্র কারকুন, ডায়মণ্ড হারবার ২৪ পরগণা

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকক্ষ অভিনেতা কি বাংলা দেশে আছে?

শুধু বাংলা দেশে কেন সারা ভারতেও তাঁর সমকক্ষ অভিনেতা দ্বিতীয় দেখিনি। দুর্গাদাসের তুলনা তিনি নিজেই।

নতুন ছবি (৩১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এই ছবির একমাত্র আকর্ষণ হোলো এর অপূর্ব অভিনয় সম্পদ। প্রায় প্রতিটি ভূমিকাই সুঅভিনীত। … মধ্যে কল্যাণীর ভূমিকায় অনুভা গুপ্তার অভিনয় বহু-… মনে রাখার মত। উত্তমকুমার, বিকাশ রায়, সাবিত্রী …পাধ্যায়, যমুনা সিংহ, অনুপকুমার এবং নীতিশ …পাধ্যায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। কলাকৌশলের … এম পি'র সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। সঙ্গীতে অনুপম …র কাজের মধ্যে 'অগ্নিপরীক্ষা'য় তাঁর কৃতিত্বের …বৃত্তির সচেতন প্রচেষ্টার সন্ধান পেলাম।

ডাকিনীর চর

বাংলা ছবিতে কাহিনীর দিক দিয়ে ভিন্নমুখী বৈচিত্র্য …রের কৃতিত্বে প্রেমেন্দ্র মিত্র একক। কাহিনীর এই …ত্ব এবং অভিনবত্বের কথা স্মরণ করলেই তাঁর নামই … মনে পড়বে। পরীক্ষা-নিরীক্ষাব্রতী প্রেমেনবাবুর …বৈচিত্র্যপুষ্ট কাহিনী চিত্রে সর্ব্বত্র যে সার্থক বা জন-… উঠেছে তা' নয়; হয়তো সর্ব্বত্র তা' হবার কথাও … তবু এই পরীক্ষামূলক প্রয়াসের প্রবৃত্তিটি তাঁর নিত্য-… এবং তার প্রশংসা না ক'রে উপায় নেই। সেই … প্রেমেনবাবুর আর দুটি ত্রুটি সহজেই চোখে পড়ে, … বেশী করেই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে। …মেন্দ্র মিত্রের কাহিনী … ওঠে। দ্বিতীয়তঃ ইদানীং কয়েক বছর ধ'রে তিনি কাহিনীর কাঠামো পরিকল্পনা সুরুই করছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য্যকে সামনে রেখে। ধীরাজবাবুকে সামনে রেখে প্রধান চরিত্র পরিকল্পনা করার দরুন এই চরিত্রটি অভিনয়ে জমিয়ে তোলার দিক দিয়ে ধীরাজবাবু হয়ত যথেষ্ট প্রেরণা পান, কৃতিত্ব প্রকাশের সুযোগও পান, কিন্তু এই মূল চরিত্রের ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে আর যারা জড়িত, তাদের চরিত্র বা কার্য্যকলাপ সুবিন্যস্ত বা কার্যকারণসম্বন্ধপুষ্ট হয় না, ফলে গল্পের গ্রন্থি অনেকটাই শিথিল হ'য়ে যায় এবং ঘটনাসংস্থাপনও অনেকটা কষ্টকল্পনার পর্য্যায়ে গিয়ে পড়ে। ঠিক এই কথাগুলিই মনে পড়ে আলোচ্য ছবিটি দেখতে গিয়ে। এটি রহস্যঘন এ্যাডভেঞ্চারময় গল্পের ছবি কিন্তু ছবির গল্প সে জমাট রহস্যরোমাঞ্চ বা কৌতূহল সঞ্চার করতে পারে নি কোথাও, সর্ব্বত্রই একটা কৃত্রিমতার ছাপ, কোথাও চমক বা চমৎকারিত্ব নেই, এমনকি ছবির সমাপ্তি পর্ব্বেও নয়। ছবিতে কাহিনী বলার মধ্যে নাটকীয়তার লেশমাত্র নেই, রহস্যসৃষ্টি বা রহস্যউদ্ঘাটনের কোনো আয়োজনই নেই।

অভিনয়ে একমাত্র ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ছাড়া আর কেউই তেমন উল্লেখযোগ্য নন। তবু ওরই মধ্যে বিজয় …, সবিতা চট্টোপাধ্যায় এবং পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সুমিতা সিংহের অভিনয়ে ভবিষ্যৎ … কোনো পরিচয় পেলাম না। … প্রেমেনবাবুর …

শিশির সামন্ত, খুরুট রোড্, হাওড়া

বাংলা কোন্ ছবিতে সর্বপ্রথম আবহ-সঙ্গীত ব্যবহৃত হয় ?

দেবকী বসু পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের 'চণ্ডীদাস' ছবিতে।

কমলকুমার সেন, সোনারপুর, ২৪-পরগণা

বাংলাদেশের কোন্ অভিনেত্রী সবচেয়ে ভাল রাধতে পারেন ?

অভিনেত্রীদের হাঁড়ির খবর কি সবাই রাখে ?

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়, মহাবত খান রোড্, নিউ দিল্লী

বর্তমানে বাংলা ও বোম্বাইয়ের উদীয়মানা নায়িকা কে কে ?

বাংলায় সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বোম্বাইতে চাঁদ ওসমানী।

সুবোধ হাজরা, বারাসাত

কানন দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী ও মলিনা দেবীর প্রথম অভিনীত ছবি কি কি ? তাঁদের অভিনয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকাগুলির নাম করুন।

প্রথম অভিনীত ছবি—কানন দেবীর 'চর দরবেশ'; চন্দ্রাবতী দেবীর 'পিয়ারী' এবং মলিনা দেবীর 'শ্রীকান্ত'। এই সব ক'টি ছবিই নির্বাক্। তাঁদের অভিনয়-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা হিসাবে যথাক্রমে 'অনুরাধা' (বিদ্যাপতি), 'চন্দ্রমুখী' (দেবদাস) ও 'রাণী রাসমনি' (রাণী রাসমণি)-র নাম করা যায়।

বংশীবদন ঘোষ, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অটোগ্রাফ সংগ্রহ করা অনেকেরই বাতিক। আমার মতে প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রী যদি অটোগ্রাফ-পিছু পাঁচ টাকা করে নেন এবং সেই টাকা রাজ্যপালের সাহায্য-তহবিলে দান করেন তাহ'লে দেশের উপকার হয়। আপনি কি বলেন ?

সাধু প্রস্তাব। অর্থ-সংগ্রহের জন্য চিত্র-তারকাদের দিয়ে 'ক্রিকেট-ক্রিকেট' খেলানোর চেয়ে আপনার প্রস্তাব অনেক ভালো।

মমতা মিত্র, আপার সার্কুলার রোড্, কলিকাতা

মঞ্জু দে-র বয়স কত ? কতদূর পড়াশুনা করেছেন ? কোন্ ছবিতে তাঁর অভিনয় সবচেয়ে ভালো হয়েছে ?

বয়স উনত্রিশ। বি-এ পাশ। 'কার পাপে' ছবিতেই তিনি তাঁর অভিনয়-জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর রেখেছেন।

সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য, বীরহানা রোড্, কানপুর

সুরশিল্পী রবীন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু জানালে খুশি হব।

রবীনবাবু ১৯১৪-সালে ক'লকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শিক্ষা করেন ধার রাজ্যের পণ্ডিত জি, কে, ধেকের কাছে। 'অধিকার' ছবিতে একটি কোরাস-সঙ্গীতে প্রথম প্লে-ব্যাক করেন। ১৯৩৯ সালে সুরকার অনুপম ঘটকের সহকারী হয়ে 'শাপমুক্তি' ছবিতে এবং কুমার শচীন দেব বর্মণের সহকারী হয়ে 'অভয়ের বিয়ে' ও 'অশোক' ছবিতে কাজ করেন। নিজের দায়িত্বে সঙ্গীত পরিচালনা শুরু করেন 'পরিণীতা' (বাংলা) ছবি থেকে।

পঞ্চানন মণ্ডল, বাজে শিবপুর, হাওড়া

দেবকী বসু, শান্তারাম, বিমল রায়, মেহবুব, সোরাব মোদী, নরেশ মিত্র, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন বসু, কালীপ্রসাদ ঘোষ এই কয়জন পরিচালক যদি সম্মিলিত-ভাবে একখানা ছবি পরিচালনা করেন তাহ'লে কেমন হয় ?

'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' ব'লে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে জানেন কি ?

অজয় মুখোপাধ্যায়, শান্তিপুর, নদীয়া

ছাত্রদের বেশি সিনেমা দেখার পরিণাম কী ?

'সিনেমা-ফোবিয়া' রোগের কবলে পড়া। ফলে, 'মহামতি অশোক' সম্পর্কে ইতিহাসের এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সে বলে—'মহামতি অশোক একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তিনি 'কঙ্কন', 'বন্ধন' প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করিয়া সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।' বানিয়ে বলছি না। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এক পরীক্ষায় জনৈক পরীক্ষার্থী এই ধরণের কথাই বলে এসেছেন।

সম্প্রতি করাচীতেও চিত্র-তারকার প্রতি মোহান্ধ এক ছোকরা তার বন্ধুকে ছুরি মারে!

আরতি সেন, বার্ণপুর, বর্দ্ধমান

শোভা সেনকে দিয়ে কি কোনো ছবিতে নায়িকার অভিনয় করানো যায় না? তাঁর এমন কি বয়স হয়েছে যে কেবল মা দিদি এই সব বুড়োটে ভূমিকায় নামতে হবে?

শোভা সেন একজন শক্তিময়ী অভিনেত্রী। তাঁকে দিয়ে নায়িকার অভিনয় করানো সম্ভব নয়, এমন কথা হলপ্ ক'রে বলতে পারি না। তবে, কোনো পরিচালকই সে চেষ্টা করে দেখেননি। মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করে করে তিনি ঐদিকেই এমন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন যে, পরিচালকেরা নতুন করে এক্সপেরিমেণ্ট করতে বোধ হয় ভরসা পা'ন না। অথচ, কোনো অভিনেত্রীকে দিয়ে যদি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করিয়ে নেওয়া যায়—তাহ'লে তো পরিচালকেরই কৃতিত্ব। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের পরিচালকেরা কোনরকম রিস্ক্ নিতেই প্রস্তুত নন।

জনার্দন পুরকায়স্থ, বহরমপুর

পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপক মুখোপাধ্যায়—এঁদের পারিবারিক নামও কি এই?

না। এঁদের পারিবারিক নাম—নগেন্দ্রনাথ সান্যাল, শচীন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস, কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কানাইলাল মুখোপাধ্যায়।

মঞ্জুশ্রী লাহিড়ী, ঘোড়ামারা, রাজসাহী

বাংলাদেশের এমন কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম করুন যাঁদের জন্ম পূর্ব্ববঙ্গে। পরিচালকদের মধ্যেই বা কে কে পূর্ব্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছেন?

বাণী গঙ্গোপাধ্যায় (খুলনা); সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (কুমিল্লা); শোভা সেন (ঢাকা); স্মৃতিরেখা বিশ্বাস (খুলনা); প্রণতি ঘোষ (ঢাকা); অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় (ঢাকা); ৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (ঢাকা); নেপাল নাগ (নোয়াখালি); নৃপতি চট্টোপাধ্যায় (ঢাকা); ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাকা); জহর রায় (বরিশাল)। পরিচালকদের মধ্যে—বিমল রায় (ঢাকা); সুশীল মজুমদার (কুমিল্লা); খগেন রায় (খুলনা); নির্ম্মল দে (ময়মনসিংহ)।

ইন্দুভূষণ দাশগুপ্ত, সোদপুর

দাদাসাহেব ফালকে-কে কেন ভারতীয় 'চলচ্চিত্র শিল্পের জনক' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে?

সত্যি বলেই। কারণ তিনিই প্রথম এদেশে পূর্ণ-দৈর্ঘ্য ছবি তোলেন। সেই ছবির নাম—'রাজা হরিশ্চন্দ্র'; ১৯১৩ সালের ১৭ই মে বোম্বাইয়ের করোনেশন থিয়েটারে এই ছবি মুক্তিলাভ করে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিলেত থেকে ফিল্ম তোলার সাজ-সরঞ্জাম এদেশে আমদানী করেন।

বারীণ রায়, বারাসাত

শোনা যাচ্ছে ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মাদার' বাংলাতে তোলা হচ্ছে। সত্যি নাকি? পরিচালনা কে করবেন?

সত্যি। তবে, একজন পরিচালকই যে তুলবেন তা নয়—আওয়াজ পিক্‌চার্সের তরফে ঘোষিত হয়েছে যে, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছবিখানি তোলা হবে; আবার, কালরূপা চিত্রপ্রতিষ্ঠান বলছেন যে, ওঁদের হয়ে ছবিখানি তুলবেন সুশীল মজুমদার। শেষ পর্য্যন্ত ক'খানা উঠবে এবং আদৌ উঠবে কিনা তা বলা শক্ত! 'মাদার' তুলতে তো আর লেখকের পরিবারকে রয়্যালটি দিতে হবে না। কাজেই, আরও কয়েকটি চিত্র-প্রতিষ্ঠান যদি কোমর বেঁধে লাগেন, তাহ'লে হয়তো আরও ঘোষণা শুনতে হবে। এই দেখুন না, দেবকীবাবু ঘোষণা করলেন তিনি 'মীরার প্রভু' ব'লে একখানা ছবি তুলবেন—ইতিমধ্যে 'ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স'ও ঘোষণা করে বসেছেন তাঁরাও 'মীরাবাঈ' তুলবেন!

রমলা মুখার্জী, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা

সুচিত্রা সেন নাকি বিমল রায় পরিচালিত হিন্দী 'দেবদাসে' চন্দ্রমুখীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন?

না, শেষ অবধি ঠিক হয়েছে বৈজয়ন্তীমালা এই ভূমিকা রূপায়িত করবেন। পার্ব্বতীর ভূমিকায় থাকবেন সুচিত্রা।

প্রভাতকিরণ ঘোষাল, চন্দননগর

অনুভা গুপ্তা বর্তমানে কোন্ কোন্ ছবিতে অভিনয় করছেন?

'মহানিশা' ও 'কাদম্বরী'-তে।

হরিশ রায়, মহম্মদবাজার, বীরভূম

কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, তুলসী লাহিড়ী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, গৌতম মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর রায়, মিহির ভট্টাচার্য, দীপক মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার—এঁরা চলচ্চিত্র-জগতে আসবার আগে কী করতেন? অর্থাৎ, চলচ্চিত্র-জীবনের পূর্বে এঁদের কর্ম-জীবন কী ছিল?

কানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে 'ই-আই-আর'-এ এবং পরে (১৯৪৮ সাল পর্যন্ত) ডাক বিভাগে কেরানীর কাজ করতেন। সন্তোষ সিংহের কর্মজীবন শুরু হয় 'মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া'-তে। চলচ্চিত্রে প্রবেশের আগে তুলসী লাহিড়ী ছিলেন রংপুর কোর্টের উকীল আর, রাধামোহন ছিলেন মেদিনীপুর কোর্টের উকীল। তবে, রাধামোহন সাংবাদিক বৃত্তিই জীবনের পেশারূপে গ্রহণ করেন—বর্তমানে সেই পেশাই আবার অবলম্বন করেছেন। বিকাশ রায় নানা জায়গায় কেরাণীর কাজ করেছেন, সহকারী প্রচার-শিল্পীর কাজ করেছেন—তবে, চিত্র জগতে আসবার আগে তিনি ছিলেন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর একজন প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। জহর গাঙ্গুলীর কর্ম-জীবন শুরু হয়—'বেঙ্গল টেলিফোন কোম্পানী'তে; কমল মিত্রের—বর্ধমান কালেক্টরীতে কেরানী হিসাবে; ধীরাজ ভট্টাচার্যের—পুলিশের 'গোয়েন্দা-বিভাগে'; নীতিশ মুখোপাধ্যায়ের—সিভিল সাপ্লাই অফিসে; জীবেন বসু—বিদেশী সওদাগরী-অফিসের কেরানী হিসেবে। চিত্রজগতে আসার আগে গৌতম মুখোপাধ্যায় বাটা স্যু কোম্পানীতে কষ্টিং অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের কাজ করতেন; গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কোনো এক অফিসের কেরানী; সমর রায় ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম ও সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের কেরানী; মিহির ভট্টাচার্য ছিলেন বীমা কোম্পানীর দালাল; দীপক মুখোপাধ্যায় ছিলেন—সামরিক বিভাগে আর, নবদ্বীপ হালদার ছিলেন ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন'-এ। এবার, আপনি কী কাজ করছেন জানাবেন কি? কারণ, ভবিষ্যতে কোনদিন দেখব আপনিও চিত্রজগতে ঢুকে পড়েছেন—তখন হয়তো আপনারই মতো কোনো পাঠক এ-জাতীয় প্রশ্ন করে বসবেন! তাই, আগে থেকে জানতে পারলেই আমাদের সুবিধে!

বীরেশ হালদার, কালীঘাট

আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান-যজ্ঞ সম্পর্কে কি কোনো ছবি তোলা যায় না?

কেন যাবে না? বোম্বাইয়ের পি, কে, আত্রে সেইরকম একখানি ছবি তোলার আয়োজন করছেন। এ-বিষয়ে তিনি বিখ্যাত দেশকর্মী জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা লাভ করবেন ব'লেও আশা করেন।

বিনয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ণিয়া

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কি কখনও কোনো থিয়েটার দেখেছেন?

হ্যাঁ। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চৈতন্যলীলা' দেখেছেন সেকালের ষ্টার থিয়েটারে। এ-বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র গোঁড়ামি ছিল না। অভিনয়-শেষে তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করে গেছেন পর্যন্ত। এখনও, পেশাদারী-রঙ্গমঞ্চের অভিনেতারা অভিনয়ের আগে রামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন।

প্রাণকৃষ্ণ বসু, গৌহাটী, আসাম

অভিনয়-শিক্ষার জন্য কি ভারত-সরকার এখন কোনো বৃত্তিদান করছেন?

হ্যাঁ। সম্প্রতি অসীমকুমার নামে এক বাঙালী ছেলে অভিনয় ও চলচ্চিত্র পরিচালনা শিক্ষার জন্য ভারত-সরকারের বৃত্তি লাভ ক'রেছেন। তিনি এখন পরিচালক বিমল রায়ের অধীনে আছেন। বিমলবাবু তাঁকে দিয়ে তাঁর 'আমানত' ছবিতে একটি ভিলেনের পার্ট করিয়ে নিচ্ছেন।

স্বাতী রায়, পাটনা

বোম্বাইয়ের দিলীপকুমার নাকি বাংলা-ছবিতে অভিনয় করবেন?

সেইরকমই কথা চলছে। প্রণতি ঘোষের প্রযোজনায় একটি বাংলা ছবিতে দিলীপকুমারকে আপনারা যথাসময়ে দেখতে পাবেন। তবে বাংলা-অভিনয়ে দিলীপকুমার কতখানি কৃতিত্ব দেখাবেন তা নির্ভর করছে তাঁর বাংলাভাষা ও উচ্চারণ শিক্ষার উপরে।

রামকুমার সেনগুপ্ত, নৈহাটী, ২৪-পরগণা

আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কী?

দিনগত পাপক্ষয়!

পঙ্কজকুমার কুণ্ডু, শিলচর, আসাম

অভি ভট্টাচার্য কি জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের ভূমিকায় কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন?

আশা রাখতে দোষ কি? গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যদি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভূমিকায় কৃতিত্ব দেখাতে পেরে থাকেন—তাহ'লে অভি ভট্টাচার্যই বা পারবেন না কেন?

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

পূর্ব-পাকিস্তানে কি আর বাংলা ছবি আসবে না?

পূর্ব-পাকিস্তান-সরকারকেই প্রশ্ন করুন।

অমলশঙ্কর রায়, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

পরিচালক সত্যেন বসু কি 'পরিবর্তন'-ছবির হিন্দী সংস্করণ তুলেছেন?

হাঁ। সম্প্রতি সেই ছবিটি 'জাগৃতি' নামে বোম্বাইতে মুক্তিলাভ করেছে। অভি ভট্টাচার্য, রতনকুমার, রাজকুমার গুপ্ত, বিপিন গুপ্ত, চন্দনকুমার প্রভৃতি এতে অভিনয় করেছেন।

অঞ্জলি ঘোষ, ভুবনেশ্বর

রঙ্গমঞ্চে ছায়াছবির শিল্পীরা কি রঙ্গমঞ্চের শিল্পীদের চেয়ে ভালো অভিনয় করেন?

না। অভিনেত্রী সরযূবালা রঙ্গমঞ্চে যেমন অভিনয় করেন ছায়াছবির কোনো অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে সে-রকম অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় আজও দিতে পারেন নি। শিশিরকুমার রঙ্গমঞ্চে আজও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন।

দাশরথি হাজরা, মেদিনীপুর

টেকনিশিয়ান ষ্টুডিয়ো-র ঠিকানা কী?

৪নং বাবুরাম ঘোষ রোড্, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩; অর্থাৎ, আগেকার কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিয়ো।

অসিত মুখোপাধ্যায়, বরাহনগর

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কবে এবং কোথায় চলচ্চিত্র-ষ্টুডিয়ো নির্মিত হয়? পৃথিবীর প্রথম কার্টুন ছবি কী?

১৮৯৩-সালে ওয়েষ্ট অরেঞ্জ (নিউ জার্সি)-এ টমাস এডিসন কোম্পানী সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র ষ্টুডিয়ো নির্মাণ করেন। ষ্টুডিওর নাম ছিল—'দি কিনেমেটোগ্রাফিক থিয়েটার।' পৃথিবীর প্রথম কার্টুন ছবির নাম—'গার্টি দি ডাইনসোর'। ১৯০৯-সালে উইনসর ম্যাককে এই ছবি তোলেন। দশ হাজার কার্টুন আঁকতে হয়েছিল এই ছবির জন্য।

তরুণকুমার রায়, এলাহাবাদ

বাঙালী অভিনেত্রীরা যখন হিন্দী ছবিতে অভিনয় করেন তখন প্রায়ই দেখা যায় তাঁদের উচ্চারণ ঠিক নেই। বাঙালী অভিনেত্রীরা ভালোভাবে হিন্দী শিক্ষা করেন না কেন?

সে-বিষয়ে নবাগতা অভিনেত্রীরা সচেষ্ট হয়েছেন। সম্প্রতি মিতা চট্টোপাধ্যায় ক'লকাতার 'ভারতীয় হিন্দী শিক্ষা পরিষদে'র হিন্দী পরীক্ষায় পাস্ করেছেন। শুধু পাস্-ই করেননি সর্বোচ্চস্থান অধিকার করেছেন। আশার কথা, কি বলেন?

বন্দনা ঘোষাল, সদানন্দ রোড্, কালীঘাট

শিপ্রা দেবী কি সিনেমা-জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন?

না। কানন দেবী প্রযোজিত 'দেবত্র'-ছবিতে শিপ্রা দেবীকে দেখতে পাবেন।

রবীন কর, উয়ারী, ঢাকা

রাজকাপুরের '৪২০'-ছবি সম্পর্কে কিছু জানাবেন?

ছবিখানি তোলা প্রায় শেষ হয়ে এলো। এর একটি নাচের সেট নির্মাণ করতেই ব্যয় হয়েছে ৬০,০০০৲ টাকা। তাহ'লেই বুঝুন গোটা ছবিখানি তুলতে কত খরচ হবে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত না রাজকাপুর '৪২০' ব'নে যান। সবই Cine-মা'র ইচ্ছে।

করবী গুপ্তা, টালীগঞ্জ, কলিকাতা

অভিনেত্রী স্নেহপ্রভার খবর কি ?

তিনি বোম্বাইয়ের 'ফেমাস্ পিক্‌চার্সে'র এক্সিকিউটিভ্ সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করছেন। এই কোম্পানী থেকে যে সব বিজ্ঞাপন-ছবি, দলিল-চিত্র ও ছোটদের ছবি তোলা হয় স্নেহপ্রভা তার খবরদারী করেন।

হরিপদ ভট্টাচার্য, গড়পার রোড্, কলিকাতা

বাংলার বাইরে কোন্ কোন্ বাঙালী অভিনেতা, অভিনেত্রী ও পরিচালক জন্মগ্রহণ করেছেন? তাঁদের কে কোথায় জন্মেছেন জানাবেন কি ?

অভিনেতা—কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (মানভূম জেলার পাচভদ্রে); অশোককুমার (মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডওয়ায়); গৌতম মুখোপাধ্যায় (বারাণসীতে)। অভিনেত্রী—চন্দ্রাবতী দেবী (মজঃফরপুর); মীরা সরকার (রেঙ্গুন); মীরা মিশ্র (কানপুর)। পরিচালক—হেমেন গুপ্ত (বিহারের রাজমহলে); প্রেমেন্দ্র মিত্র (বারাণসীতে); জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিহারের মতিহারীতে); সত্যেন বসু (বিহারের পূর্ণিয়াতে)।

কানাই বসু, ময়ূরভঞ্জ

পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনা সম্পর্কে কি কোনো পূর্ণ-দৈর্ঘ্য ছবি তোলা সম্ভব ?

নার্গিশ সেই কথাই চিন্তা করছেন।

ক্ষিতীশ ঠাকুর, বিরাটী, দমদম্

পরিচালক ধীরেন গাঙ্গুলীর পরবর্তী ছবি কি ?

'শুভ পরিণয়'। কাহিনী রচনা করেছেন—'কুঙ্কুম' (ছদ্মনাম)। সঙ্গীত পরিচালক—দিলীপকুমার গুপ্ত। প্রধান দু'টি ভূমিকায় অভিনয় করবেন—দুই নবাগত (১) দিলীপ গুপ্ত (বাবুল) ও (২) কুমারী ছবি চক্রবর্তী।

রঞ্জনকুমার সেন, চিত্রগুপ্ত রোড, নিউ দিল্লী

'বাব্লা' চরিত্রাভিনেতা নীরেন ভট্টাচার্যের খবর কি ?

সম্প্রতি ক'লকাতায় তার উপনয়ন হয়ে গেল। সে এখন পড়াশোনা নিয়ে এত ব্যস্ত যে, অন্য কোনো ছবিতে এখন আর অভিনয় করবে না।

মায়া হাজরা, বেনারস

সুরশিল্পী অনুপম ঘটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানতে চাই।

১৯১১ সালে ময়মনসিংহ জেলার পাথরাইল-গ্রামে এঁর জন্ম হয়। ১৯৩২-সালে ইনি নিউ থিয়েটার্সের 'মহুয়া' ছবিতে সর্বপ্রথম সহকারী সঙ্গীত-পরিচালকরূপে কাজ করেন। সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে ইনি সঙ্গীত পরিচালনা করেন 'পায়ের ধুলো' ছবিতে। তারপর, লাহোর ও বোম্বাইয়ে গিয়েও অনেকগুলি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেন। শাপমুক্তি' ছবির সুরশিল্পী হিসেবেই তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবিতেও এঁর সুর-সংযোজনা উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। সঙ্গীত ছাড়া নৃত্যেও এঁর বিশেষ দখল আছে। তাছাড়া, প্রায় সবরকম বাদ্যযন্ত্রই ইনি বাজাতে পারেন।

সমীরণ ঘোষ, বালীগঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা

'ডাকিনীর চর' ছবির বিশেষত্ব কি ?

দুর্বল মিষ্টিসিজম্ ও ধীরাজ ভট্টাচার্যের অভিনয়।

চারু রায়, হাজারিবাগ

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত অভিনেতা দিলীপকুমার নাকি মুসলমান ? শ্যামাও কি তাই ?

কেন, তাতে আপনার আপত্তি আছে ? হ্যাঁ, তিনি মুসলমান। তাঁর আসল নাম—ইউসুফ খান। তাঁকে 'দিলীপ' নাম দেন ভগবতীচরণ বর্মা নামে বোম্বাইয়ের এক লেখক। শ্যামাও মুসলমান। তাঁর আসল নাম—খুরশীদ। সুরসাধক কুন্দনলাল সায়গল তাঁকে 'শ্যামা' নাম দেন।

অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুপুর

কানন দেবী ও সন্ধ্যারাণীর অতীত ইতিহাস কি ?

অতীতের দিকে না তাকিয়ে তাঁদের বর্তমান ইতিহাস জানতে চেষ্টা করুন।

ডলি মজুমদার, ঢাকুরিয়া, ২৪-পরগণা

'নাগিন'-ছবির সুরসংযোজনা করেছেন হেমন্তকুমার। আমার মতে শচীন দেব বর্মণ সুর দিলে আরও ভালো হ'তো। কাহিনীর বাঁধুনি বড়ই দুর্বল, তাই নয়কি ? কাহিনীকার কি 'নবান্ন'-রচয়িতা ?

আপনার মতের সঙ্গে আমরা একমত। এ-জাতীয় ছবির সুরারোপ করতে শচীনকর্তা অদ্বিতীয়। 'নাগিন'-ছবির কাহিনী দুর্বল সন্দেহ নেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে 'নবান্ন'-রচয়িতা বিজন ভট্টাচার্য এই ছবির কাহিনী রচনা করেছেন। কাহিনী না হয়েছে বাস্তবসম্মত, না হয়েছে রূপকথা জাতীয়—অথচ, দু'রকম মালমশলাই এতে আছে। অযথা দীর্ঘ হয়েছে ছবিখানি।

পারুল সেন, ইউনিক কলোনী, বেহালা

আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে, আধুনিকা মেয়েরা চিত্রাভিনেত্রীদের অনুকরণ ক'রে এমন ভাবে বেশবিন্যাস করেন যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। আধুনিকারা এ-রকম অনুকরণ করেন কেন ?

নইলে আর আধুনিকা ! যাঁরা অন্ধ-অনুকরণে অভ্যস্ত তাঁদের সহজাত দৃষ্টি নেই—তাঁরা মেপে হাসেন, মেপে কথা বলেন, মেপে পা ফেলেন—'অন্ধের কিবা রাত্রি, কিবা দিন !' ঈশ্বর তাঁদের দিব্য দৃষ্টি দিন !

চিত্তরঞ্জন পাল, ত্রিপুরা

ছবিতে প্রণয়দৃশ্য দেখাতে হ'লে এদেশের ছবিতে সাধারণতঃ কী দেখানো হয় ?

Y-মার্কা গাছের এ-ধারে ও-ধারে নায়ক-নায়িকার ন্যাকামিভরা গান, দৌড়ঝাঁপ—কিংবা জনবিহীন এক সেতুর ওপরে নায়ক নায়িকার হাতে হাত রেখে চাঁদ, চাঁদনিরাত, রজনীগন্ধা ইত্যাদি শব্দপূর্ণ প্যানপ্যানে সঙ্গীত !

পরিমল সেন, নব-ব্যারাকপুর কলোনী, মধ্যমগ্রাম

উদ্বাস্তু-জীবন নিয়ে ভারতে তোলা কোন্ ছবি ভালো হয়েছে ? রঙ্গমঞ্চেই বা কোন্ নাটক উদ্বাস্তু-জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে ?

নিমাই ঘোষ পরিচালিত 'ছিন্নমূল'। রঙ্গমঞ্চে

অভিনীত 'নতুন-ইহুদী'র কাহিনী উদ্বাস্তু-জীবন নিয়েই রচিত।

কিরীটি দাশ, বাঁকুড়া

আপনারা সব প্রশ্নের জবাব দেন না কেন ?

প্রশ্নের মতো প্রশ্ন করলেই জবাব দিই। আপনি তো চিত্রাভিনেত্রীদের ঘরোয়া কথা ছাড়া আর কিছুই জানতে চান না! পরের ঘরের কথা জানা থাকলেও কি বলা যায়, না বলা উচিত ? অনর্থক বাজে প্রশ্ন না ক'রে মন দিয়ে 'চিত্রবাণী' পড়ুন—তাতেই বহু জিনিস জানতে পারবেন।

অনিল দে, মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা

পৃথিবীতে কোন্ কোন্ দেশে সবচেয়ে বেশি ফিচার-ফিল্ম তোলা হয় ?

সবচেয়ে বেশি ছবি ওঠে আমেরিকায়, তারপরেই ভারতের স্থান। তারপর, যথাক্রমে জাপান, ফ্রান্স, মেক্সিকো ও যুক্তরাজ্য।

বনানী চক্রবর্তী, শ্রীরামপুর

প্রীতিধারা মুখোপাধ্যায় ও জয়শ্রী সেনের মধ্যে নৃত্য বিদ্যায় কে অধিক পারদর্শিণী ?

আপনিই বলুন না। আমাদের মতে এঁদের কেউই পারদর্শিণী নন—তবে, নাচ জানেন।

আনন্দ মোহন রায়, বালুরঘাট, দিনাজপুর

অহীন্দ্র চৌধুরী কি রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন ? তিনি কি কখনও কোনো ছবি পরিচালনা করেছেন ? তাঁর বর্তমান কার্যসূচী কী ?

অহীন্দ্রবাবু রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র থেকে বিদায় নেবার কথাই চিন্তা করছেন—সম্ভবতো ১৩৬১ সাল থেকে তাঁকে আর রঙ্গমঞ্চে বা চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে না। তিনি এক সময় 'কৃষ্ণসখা' নামে একখানি ছবি পরিচালনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য আকাদামী স্থাপনের চেষ্টা করছেন সম্ভবতো অহীন্দ্রবাবুই তার নাটক বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হবেন।

কার্তিকচন্দ্র রায়, বজ্ বজ্

সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার আর কতদিন একসঙ্গে অভিনয় করবেন ?

আপনি বলতে পারেন, কতদিন আর রাজকাপুর ও নার্গিস একসঙ্গে অভিনয় করবেন ?

দীপা দাশ, রাজা বসন্ত রায় রোড্, কলিকাতা

অনুভা গুপ্তা শুনেছি কয়েকটি ছবিতে প্লে-ব্যাকে গান গেয়েছেন। কোন্ কোন্ ছবিতে ?

ঠিকই শুনেছেন। অনুভা গুপ্তা সন্ধি, কর্ণার্জ্জুন ও সম্রাট্ অশোক—এই ছবিগুলিতে প্লে-ব্যাকে গান করেছেন।

সুকুমার নন্দী, শিলচর, আসাম

পরিচালক হেমচন্দ্র এখন কোথায় এবং কী করছেন ?

বোম্বাইতে। 'তিন ভাই' নামে মোহন ষ্টুডিয়োতে একখানা হিন্দী ছবি তুলছেন। এই ছবির বিভিন্ন অংশে অভিনয় করছেন—পাহাড়ী সান্যাল, ভারতভূষণ, শ্যামা, নিরুপা রায়, নাজির হোসেন, হীরালাল, লীলা মিশ্র ও মদন পুরী। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন—অরুণকুমার।

বিরাজ মোহন আঢ্য, আহিরীটোলা, কলিকাতা

'নাগিন' ছবির শিল্প নির্দেশনা আপনার কেমন লেগেছে ? 'আনারকলির'সঙ্গে তুলনা করুন।

অত্যন্ত কৃত্রিম। বেশির ভাগ ষ্টুডিয়োর সেটে তোলা—ফলে বাস্তব সঙ্গতি রক্ষিত হয়নি। 'আনারকলি'-র শিল্প নির্দেশ অনেক ভালো। তবে, 'নাগিন' ছবির রঙীন অংশের সেটগুলি মন্দ লাগেনি—অবশ্য, সেগুলি 'রূপকথা' জাতীয় কাহিনীতেই বেশি শোভা পায়।

বলরাম মণ্ডল, শালকিয়া, হাওড়া

আমি ক্রমাগত সাতদিন স্বপ্নে সন্ধ্যারাণীকে দেখেছি—তাঁকে একবার চাক্ষুষ দেখতে চাই; সুযোগ করে দিতে পারেন ? তাঁকে না দেখা পর্যন্ত মনে শান্তি নাই।

"স্বপন যদি মধুর এমন, জাগিয়ো না আমায় জাগিয়ো না" কৃষ্ণচন্দ্র দের গাওয়া এই গানখানি শুনেছেন কখনো ? গানের এই লাইনটি মনে রাখুন—তাহলেই মনে শান্তি পাবেন।

নতুন নাটক

বহুরূপীর "রক্তকরবী"

দিল্লীর জাতীয় নাট্যোৎসবে প্রযোজিত আধুনিক নাটকের মধ্যে প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত বহুরূপীর "রক্তকরবী" গত ৭ই ফেব্রুয়ারী পুনঃ প্রযোজিত হয়েছে রঙমহল থিয়েটারে। দিল্লী থেকে ফেরার পর শ্রীমতী ইন্দ্রানী মৈত্রের প্রযোজনায় ক'লকাতার "বহুরূপী"-নাট্যসঙ্ঘ মঞ্চে উপস্থিত ক'রেছিলেন রবীন্দ্রনাথের এই প্রতীক-নাট্যখানিকে।

দিল্লী যাবার আগে "রক্তকরবী"-কে বহুরূপী মঞ্চস্থ ক'রেছিলেন নিউ এম্পায়ারে। "রক্তকরবী"-র নতুন মঞ্চব্যাখ্যা তখনও দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল সুধীসমাজের, কেউ বা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন প্রশংসায়, কেউ বা উত্তেজিত হয়েছিলেন রাবীন্দ্রিক মঞ্চরীতির অবজ্ঞায়। সেদিন নিউ এম্পায়ারের "রক্তকরবী"কে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি, জাতীয় নাট্যোৎসবের পুরস্কার-প্রাপ্ত "রক্তকরবী"-কেই প্রথম আমরা দেখলাম রঙমহল থিয়েটারে। প্রযোজিকার অচিন্তনীয় অব্যবস্থায় অভিনয় সুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়, আবার সুরু হয় প্রায় আধঘণ্টা পরে। তবুও, বাধাপ্রাপ্ত এদিন-কার নাট্যানুষ্ঠানে আলোকসম্পাতশিল্পী তাপস সেনের সহযোগিতায় "বহুরূপী" তাঁদের পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন প্রযোজনা-দক্ষতার দিক দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকগুলিকে গড়ে তুলেছেন একটা অনুভূত ভাবের বাহন ক'রে, একটা উপলব্ধ সত্যের প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে। প্রতীক নাটকগুলি সম্পর্কে এ-কথা বোধ হয় বিশেষভাবে সত্য। "রক্তকরবী"-ও এ-সত্যকে অতিক্রম করে নি। ঘটনাদ্বন্দ্ব ও চরিত্র-দ্বন্দ্ববহুল নাট্যক্রিয়াময় আমাদের প্রচলিত নাটকগুলির শিল্পরীতি "রক্তকরবী" স্বীকার করেনি। বস্তুতঃ "Story in dialogue" বলে নাট্যকুশল যে-নাটককে আমরা জানি "রক্তকরবী" সে নাটক নয়, যে-প্লট বা কাহিনী সাধারণ নাটকে অপরিহার্য্যভাবে আমরা পাই, "রক্তকরবী"-তে তা নেই। তাই, রাজা, রঞ্জন, নন্দিনী প্রভৃতি "রক্তকরবী"-র প্রধান চরিত্রগুলি ব্যক্তিত্ববিকাশের মাধ্যমে বা বিভিন্ন নাট্যক্রিয়ার পথ বেয়ে বেড়ে চলে নি, নাটকের কেন্দ্রীয় ভাব প্রকাশের এরা উপকরণমাত্র, এক বিশিষ্ট সাধারণ অবস্থানে সমাজ মানসের বিভিন্ন স্তরের এরা প্রতীক। যক্ষপুরীর শোষণজীবী রাজা সোনার লোভে মানুষের মনুষ্যত্বকে ক'রেছে যন্ত্রবন্ধনে অপমানিত, এদের প্রাণহীন যান্ত্রিক জীবনে জীবনানন্দের সঞ্জীবনী স্পর্শ নিয়ে এল প্রাণপ্রাচুর্য্যময়ী নন্দিনী। তত্ত্বের দিক দিয়ে ধনতান্ত্রিক শাসনের মানবিকতাবিরোধী শোষণের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হলেও "রক্তকরবী"-র এই কাব্যময় শিল্পভঙ্গীকে অস্বীকার করলে আমাদের চলবেনা। তা' ছাড়া, অন্যান্য প্রতীক নাটকের মত "রক্তকরবী"-র সংলাপও ভাবগর্ভ, এমনকি দ্রুত পাঠে বা দ্রুতগতি অভিনয়েও "রক্তকরবী"-র অলঙ্কার-শোভিত সংলাপের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করা অনেক সুশিক্ষিত পাঠক বা দর্শকের পক্ষেই সম্ভব হবে না। তাই, এ-নাটকের অভিনয়ে প্রচলিত নাটকের পদ্ধতি প্রয়োগ করলে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

শিল্পসম্মত নাট্য প্রযোজনায় প্রত্যেকটি মঞ্চশিল্পী ও নেপথ্য শিল্পীর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত যে আন্তরিকতা, পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন, বহুরূপীর এ-অভিনয়ে তার অভাব হয় নি; নৈপুণ্যের দিক দিয়েও বিশু পাগলার ভূমিকায় শোভেন মজুমদারকে ছেড়ে দিলে অন্যরা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। কিন্তু বহুরূপীর বিশিষ্ট অভিনয় রীতির বিশ্লেষণ না ক'রেও এ-কথা বলা যায়, "রক্তকরবী-"তে বহুরূপী নতুন কোন অভিনয় রীতির প্রবর্ত্তন করেন নি, নতুন তাঁরা যা' করেছেন তা' হ'ল প্রতীক নাট্যের প্রযোজনায়

প্রচলিত অভিনয় রীতির প্রয়োগ। নাট্যক্রিয়া, ঘটনাদ্বন্দ্ব আর চরিত্রদ্বন্দ্বকে প্রকট ক'রে নাটকের তত্ত্বময় বক্তব্যের বাস্তব ইঙ্গিতকে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট ক'রে তুলতে চেয়েছেন এঁরা এঁদের অভিনয়ে। কিন্তু এই ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বকে প্রকট করার কোনও সুযোগ নাটকের প্রথমাংশে অর্থাৎ রঞ্জন আসার আগে পর্য্যন্ত নেই আর শেষাংশের নাট্যক্রিয়া ও চরিত্রদ্বন্দ্ব ক্রিয়ামুখর ক'রে তুলেছে যক্ষপুরীর সংখ্যাভিধেয় শ্রমজীবী মানুষগুলোকে। এদের কাছে নন্দিনীর সক্রিয়তা যেন অনেক কম। অথচ নন্দিনীই তো নাটকের সব, রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে তার আমলারা পর্য্যন্ত নরম হয়েছে তারই প্রাণপ্রাচুর্য্যের প্রভাবে। নাট্যকারও বলেছেন,—"রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী ব'লে একটি মানবীর ছবি। মাটি খুঁড়ে যে পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়, মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্য্যের।" তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়ে নন্দিনীর এ রূপ ফুটে ওঠে নি, যার প্রেমে, যার সৌন্দর্য্যে যক্ষপুরীর সমস্ত মানুষ বিচলিত হয়েছে তৃপ্তি মিত্রের কান্তি সৌন্দর্য্যও সেই কল্পরূপের পরিপোষক নয়। তৃপ্তি মিত্র খানিকটা ব্যক্তিত্বময়ী ক'রে তুলতে চেয়েছেন নন্দিনীকে, রাজাকে তিনি বশে আনতে চান ধমকে। অথচ যে-নাট্যক্রিয়া বা ঘটনার দ্বন্দ্ব ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে পারে তার অবকাশ যেমন নাটকে তেমনই নন্দিনী চরিত্রে খুব কমই আছে। ফলে কবি-নাট্যকারের ভাববিগ্রহ বিশেষ ব্যক্তিসত্ত্বায় রূপান্তরের অসঙ্গত প্রয়াসে অসঙ্গতভাবে জিজ্ঞাসু ক'রে তুলেছে আমাদের নন্দিনীর ক্রিয়াকলাপ, তার চলন বলন সম্পর্কে। অতৃপ্তি তাই থেকেই গেছে নন্দিনীকে নিয়ে। বিশু পাগলার গানগুলি "রক্তকরবী"-র কাব্যময় শিল্পভঙ্গীর বিশিষ্ট উপকরণ। কিন্তু গানগুলিকে হয় বাদ দেওয়া হয়েছে আর না হয় ...ভেন মজুমদারের ধরা গলায় অস্বস্তিকরভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এতে বিশু চরিত্রের ও নাটকের ভাবময় [illegible]

অভিনয় চরিত্র বা নাটকের বস্তুসত্ত্বাও প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। কিন্তু ফাগুলাল ও চন্দ্রা এই বস্তুসত্ত্বা প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে চরিত্রে ও নাটকে তাদের নাট্যক্রিয়া-প্রধান ও বাস্তব-ঘনিষ্ঠ অভিনয়ে। এদিক দিয়ে শিল্পী মহম্মদ জ্যাকেরিয়া ও আরতি মৈত্র বহুরূপীর এই "রক্তকরবী" উপস্থাপনায় প্রধান সহকারী। সর্দ্দারের ভূমিকার অমর গাঙ্গুলী পরিচালক শম্ভু মিত্রের কম্পিত কণ্ঠের মুদ্রাদোষ সত্ত্বেও গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে পেরেছেন তাঁর অভিনয়ে, তাঁর ইতস্ততঃ নাট্যক্রিয়ার প্রয়াস অবশ্য তার ভাবসত্ত্বাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। নাটককে পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠ রূপ দিতে চেয়েছেন মোড়লের ভূমিকাভিনেতা অমর মৈত্র তাঁর হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সারি বেঁধে পিঠ কুঁকড়ে যক্ষপুরীর নিপীড়িত মানুষগুলোর অসহায় শোভাযাত্রা। কিন্তু সমগ্র নাটকের ভাবসত্ত্বা এতে বদলায় না, বদলায় নি। জালের আড়ালে থেকে যে-রাজা তার শোষণ-শাসন পরিচালনা করছিল, সেই রাজা যখন বেরিয়ে এল তার সেই ভয়ানক ব্যক্তিত্ব আমাদের চোখে পড়ল না। শম্ভু মিত্রের রূপসজ্জায়, তাঁর জালের বাইরেকার চলন ও বাচনভঙ্গী অনেকখানি বেমানান, মনে হয় এ যেন তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু রাজার প্রকৃতিই বা কি? ব্যক্তি হিসেবে যে-প্রকৃতির পরিচয় আমরা সাধারণ নাটকের

অনুরূপ চরিত্রে পাই, সেই প্রকৃতি এই জালের আড়ালে অদৃশ্য রাজার মধ্যে আমরা পাই বা কি ক'রে? রাজা তো ব্যক্তি নয়। নাট্যকার বলেন,—"It is not an individual but a doom; and therefore it should never be compared to such characters as Lady Macbeth by those who wish to find a literary precedent." অভিনয়ে র ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসও তাই নাট্যকারের অনভিপ্রেত, ধরে নেওয়া যেতে পারে। সে দিক দিয়ে শম্ভু মিত্রের রূপসজ্জা ও অভিনয় চরিত্রের ভাবসত্তাকে যেমন ক্ষুণ্ণ ক'রেছে জড়যান্ত্রিকতা আর জীবনধর্ম্মের অন্তর্বিরোধকে যেমন অস্পষ্ট ক'রে তুলেছে তেমনই নন্দিনীর ব্যক্তিগত আকর্ষণে তার মানসিক রূপান্তরের মধ্যে তার ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসও তাই সার্থক নয়। অধ্যাপকের দুর্ব্বোধ্য সংলাপ আরও দুর্ব্বোধ্য হয়েছে এই পরিবেশে। বিশেষ ক'রে, নাটকের দ্রুতগতি নাটকের শেষ বক্তব্যকে স্পষ্টতর করলেও সামগ্রিক বক্তব্যকে, নাটকের ভাবদ্বন্দ্বকে ক'রেছে অস্পষ্ট। তবুও, বহুরূপীর বহুরূপীসুলভ টীমওয়ার্ক, তাপস সেনের আলোকসম্পাত অন্ততঃ নাটকের শেষাংশকে জীবন্ত ক'রে তুলেছে, কিন্তু সেই জীবন উক্ত নাট্যাংশের প্রত্যেকটি ঘটনা প্রত্যেকটি নাট্যক্রিয়ার তাৎপর্য্য উপলব্ধিতে দর্শককে সাহায্য করে নি। এ জীবনের আনন্দ তাই অঙ্কের উত্তর মেলানোর আনন্দ, তার পদ্ধতিগত সহজ উপলব্ধি যেন দর্শক পায় না এর মধ্যে। এই ধরণের প্রযোজনা, নাটকের এই ধরণের মঞ্চ ব্যাখ্যা তাই যেমন দুঃসাহসের, তেমনই দুঃসাধ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটকের এই প্রযোজনা পদ্ধতি সম্পর্কে সুধী সমাজে তত্ত্বগত ও শিল্পগত আলোচনার সূত্রপাত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি।

—সুবোধকুমার ঘোষ

স্টুডিও সংবাদ

শাপ মোচন

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যারাগ' অবলম্বনে প্রোডাকসান সিণ্ডিকেট লিমিটেডের 'শাপ মোচন'-এর চিত্রগ্রহণ সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় চলছে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে বাংলার প্রখ্যাত চিত্র-তারকাদের সমন্বয় চিত্রামোদীদের কাছে এই চিত্রের আকর্ষণ অনেকাংশে বাড়িয়েছে। তারকাদের মধ্যে আছেন: সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, অমর মল্লিক, জীবেন বসু প্রভৃতি।

অপরাধী

থি, এম্ প্রোডাকসন্সের প্রথম চিত্র হলো 'অপরাধী'। সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় ছবিটির চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্ত হয়ে এলো। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন: অনুভা গুপ্তা, বসন্ত চৌধুরী, গীতা সিংহ, রবীন মজুমদার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শোভা সেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন গোপেন মল্লিক। সম্প্রতি সুশীল মজুমদার প্রভাবতী দেবী সরস্বতী রচিত 'দানের মর্য্যাদা' উপন্যাসের চিত্র-স্বত্ব ক্রয় করেছেন এবং 'অপরাধী'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হলেই এটির কাজে হাত দেবেন।

সবার উপরে

অগ্রদূত-এর পরিচালনায় এম পি প্রোডাকসন্সের পরবর্তী চিত্র 'সবার উপরে'র চিত্রগ্রহণ ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে অগ্রসর হচ্ছে। কাহিনী রচনা করেছেন নিতাই ভট্টাচার্য্য। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। প্রধান ভূমিকায় সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমারকে দেখা যাবে।

শৈলজানন্দের 'কথা কও'!

সাহিত্যিক-পরিচালক শৈলজানন্দ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে রাধারাণী পিকচার্সের "কথা কও" নামে একখানি ছবির একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন ব'লে প্রকাশ। গল্পটি শৈলজানন্দের নিজেরই লেখা এবং পরিচালনাও তিনিই করছেন তারু মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়। অবশ্য অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করা শৈলজানন্দের নতুন অভিজ্ঞতা নয়; ইতিপূর্ব্বে সবাক চিত্র প্রবর্তিত হওয়ার গোড়ার দিকে "পাতালপুরী" ছবিখানিরও একটি মুখ্য চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন। তাছাড়া মাঝে মাঝে সাহিত্যিকদের নিয়ে সম্মিলিত মঞ্চাভিনয়েও তাঁকে দেখা যায়। "কথা কও"-এর অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ হচ্ছেন: ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, শ্রীমান কুমার, মলিনা দেবী, মিত্রা দেবী, অপর্ণা দেবী, তপতী ঘোষ প্রভৃতি। এর গান রচনা করে দিয়েছেন প্রণব রায় এবং সুর-যোজনা করছেন শৈলেশ দত্তগুপ্ত। সংগঠনে

শ্রীমতী পিকচার্সের 'দেবত্র' ছবিতে কানন দেবী

সাহিত্যিক-পরিচালক শৈলজানন্দ অভিনেতার রূপ সজ্জায়

অন্যান্যরা হচ্ছেন : আলোকচিত্রগ্রহণে ধীরেন দে, শব্দগ্রহণে গৌর দাস, শিল্প-নির্দেশে নরেন ঘোষ ও সম্পাদনায় রবীন দাস।

রাত একটা

কথা-সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা অবলম্বনে মুভী আর্ট প্রোডিউসার্স "রাত একটা" নামে একখানি ছবির মহরৎ সম্প্রতি অরোরা ষ্টুডিওতে সম্পন্ন করেন এবং তারপরই রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে ছবিখানির চিত্র-গ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। ছবিখানি পরিচালনা করছেন কালীপদ দাশ এবং বিভিন্ন চরিত্রাভিনয়ে আছেন : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, কালী সরকার, সিপ্রা মিত্র, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

বিবর্ত্তন

ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রাবতী, মীরা সরকার, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শিল্পী সমন্বয়ে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে এস এন ফিল্মসের "বিবর্তন"-এর চিত্র-গ্রহণ এগিয়ে চলেছে। ছবিখানির প্রযোজক অমর গড়াই এবং চিত্র-নাট্যকার ও পরিচালক হলেন শৈলেন নিয়োগী। নবাগত ধীরেন ঘটক ও বৈদ্যনাথ রায় সঙ্গীত পরিচালনা করছেন।

অমলিনা

শ্বেতা প্রোডাকসন্স নামে এক নতুন চিত্র প্রতিষ্ঠান সুনীল চট্টোপাধ্যায় রচিত কাহিনী 'অমলিনা'র চিত্ররূপ দিতে ব্রতী হয়েছেন। বাংলার প্রখ্যাত শিল্পীদের ও সেইসঙ্গে অনেক নতুনকেও এই ছবিতে দেখা যাবে ব'লে প্রকাশ।

ত্রিভুজ মোটর্স লিমিটেড

সম্প্রতি শৈল প্রোডাকসান নামে এক নবগঠিত চিত্র-প্রতিষ্ঠান 'ত্রিভুজ মোটর্স লিমিটেড'-এর শুভ মহরৎ রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে সম্পন্ন করেন সবিতা চ্যাটার্জির চিত্র গ্রহণ ক'রে। ছবিটির চিত্রগ্রহণ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

দেবী মালিনী

সম্প্রতি ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনাধীনে 'দেবী মালিনী'র মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাহিনী রচনা করেছেন নিতাই ভট্টাচার্য্য। সুরযোজনা করছেন রথীন চট্টোপাধ্যায়। 'দেবী মালিনী'র ভূমিকাভিনেত্রীর অনুসন্ধান চলছে। নায়কের ভূমিকায় রয়েছেন বসন্ত চৌধুরী।

সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে সাউণ্ড এ্যাণ্ড ক্যামেরার প্রথম চিত্র 'বাঁশীওয়ালা'র মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় আছেন শ্রীভাস্কর, কাহিনী রচনায় কেষ্ট মুখার্জ্জি, সুর-সৃষ্টিতে পঞ্চানন মিত্র এবং সংলাপ রচনা করেছেন জীবানন্দ ঘোষ।

অন্তরায়

সুধীরকুমার ভট্টাচার্য্য রচিত ও পরিচালিত এস্ আর পিক্‌চার্সের প্রথম চিত্র 'অন্তরায়'-এর চিত্রগ্রহণ শীঘ্রই আরম্ভ হচ্ছে টেক্‌নিসিয়ান্স্ ষ্টুডিওতে।

বিকাশ রায়, গুরুদাস, নৃপতি, তুলসী চক্রবর্তী, সাবিত্রী, পদ্মা দেবী, রেণুকা রায়, শ্যামলী চক্রবর্তী এর ভূমিকালিপিতে আছেন।

সেই ছেলে

বিনয়কুমার বসু-মল্লিক ও নিরঞ্জন বসু প্রযোজিত শ্রীপিকৃচার্সের প্রথম সামাজিক চিত্র 'সেই ছেলে'র শুভ মহরৎ উৎসব সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্সের ২নং ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক দেবকী বসু মহরতের ক্ল্যাপষ্টিক দেন। জহর গাঙ্গুলীকে দিয়ে প্রথম সট নেওয়া হয়। ছবিখানি পরিচালনা করছেন সতীশ দাশগুপ্ত

সাগরিকা

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে এস সি প্রোডাকসন্সের 'সাগরিকা'র চিত্রগ্রহণ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। নিতাই ভট্টাচার্য্য রচিত কাহিনীটি প্রযোজনা করছেন সুকুমার কুমার এবং পরিচালনায় আছেন 'অগ্রগামী' দল। রবীন চট্টোপাধ্যায় এর সুরযোজনা করছেন এবং বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন উত্তমকুমার, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, সলিল দত্ত, জীবেন বসু, সুচিত্রা সেন, নমিতা সিংহ, যমুনা সিংহ, তপতী ঘোষ প্রভৃতি। গান রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

রাজপথ

'মা ও ছেলে'তে ৪৩ তারকার পর এবার শ্রীভারতলক্ষ্মী দিচ্ছেন একশ' এক তারকা খচিত 'রাজপথ'। এটির কাহিনী রচনা ক'রেছেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবিটির অপর আকর্ষণ হবে সঙ্গীতাংশ—যাতে স্থানীয় নামকরা প্রায় সব শিল্পীরই কণ্ঠ পাওয়া যাবে। বহু আকর্ষণের সামগ্রী এই 'রাজপথ' অবিলম্বেই কলকাতায় মুক্তিলাভ করবে শ্রীভারতলক্ষ্মী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায়।

'রাজপথ'-এর পর শ্রীভারতলক্ষ্মী তাঁদের পরবর্তী নিবেদন হিসেবে ঘোষণা করেছেন 'মীরাবাঈ'-এর নাম।

শ্রীকৃষ্ণ সুদামা

শ্যাম চক্রবর্তীর পরিচালনায় দে প্রোডাকসন্সের ভক্তিমূলক চিত্র 'শ্রীকৃষ্ণ সুদামা'র চিত্রগ্রহণ এগিয়ে চলেছে। এই ছবির ভূমিকালিপিতে আছেন: রবীন মজুমদার, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য্য, পদ্মা দেবী, নমিতা সিংহ, জয়শ্রী, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রাজেন সরকার।

প্রশ্ন

সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে প্রযোজক-পরিচালক সরোজ মুখোপাধ্যায় তাঁর নবতম চিত্র নাট্যকার সলিল সেন রচিত 'প্রশ্ন'র শুভ মহরৎ সম্পন্ন করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন চন্দ্রশেখর বসু। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন শচীন গুপ্ত। ভূমিকালিপি এখনও ঠিক হয়নি; তবে এই চিত্রে কয়েকজন নবাগত শিল্পীকে দেখা যাবে বলে প্রকাশ।

গোধূলি

কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এন্‌, টি-র আগামী ছবি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গোধূলি'র চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে প্রায় শেষ হয়ে এলো। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে আছেন দীপ্তি রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও নির্ম্মলকুমার। ছবিটি অরোরার পরিবেশনায় কলকাতার একাধিক চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

বর্ত্তমানে নির্মীয়মান 'কালিন্দী' চিত্রের কাহিনীকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিচালক নরেশ মিত্র

ঘটনার অন্তরালে

খরচের একটা সীমা আছে। সবাই তো রাজা-রাজড়া নয়, বা হালফিল সে রকম একটা কিছু ছিলও না। তবু রোজগারের টাকা, ধরুন সাড়ে ছশ' টাকার মতো, যদি প্রতি সপ্তাহে কেউ শুধু বেশভূষায় পেছনে খরচ করে তবে তার আয়ের কথা ভাবলে হয়তো মনে হবে সে উৎসের সন্ধান বুঝি আর মিলবে না। এই জাতীয় একটি ঘটনায় পিলে চমকে ওঠায় সেদিন এক নেতা আইন সভায় প্রশ্ন করে বসলেন, এর একটা বিহিত কেন করা হচ্ছে না? চলল সংবাদ শিকারের হুটোপাটি। স্ত্রীলোকের আয়ের প্রতি সবাই সন্দিহান, আর আয়ের মাত্রাটা যেখানে শুনলে ট্যারা হয়ে যাবার মতো—তবুও হয়ে যাবেন; বলবে, "আমরা কি যে-সে? মন ভুলিয়ে যেমন দেদার সংস্থান করতে হয় তেমনি উড়িয়ে দেবার মতো দেদার দিল না হলে চলে? হপ্তায় সাড়ে ছশ'? উঁহুঁ, ওটা আসলে তেরশ'; হ্যাঁ, ভুল শুনেছেন। চোপর দিন জবাবদিহি করবার জন্যে একটা লোক সদা-সর্বদা হাজির রাখতে হয়। খুব কম পক্ষে তার মাইনে হোল গিয়ে শ দেড়েক। চিঠি-চাপাটি, অনুরাগ-বিরাগ জাতীয় লেন-দেনে ধরুন আরো শ' দুই। যাতায়াত শ' চারেক। আর কাজ-কারবার রাখবার জন্যে খানাপিনায় সাড়ে পাঁচ শ'য়ের মতো। এ ছাড়া কেনা-কাটি আছে ছোট বড় রকমের, সেগুলো না হয় ধর্তব্যের মধ্যেই আনলুম না!" হায় নয়নানন্দ-দায়িনী তুমি না থাকলে দোকানদারগুলো যে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াত! ডায়ানা ডোর্স, সার্থক তোমার নাম রেখেছিলেন তোমার বাপ-মা—একে ডায়ানা তার ওপর আবার ডোর, মরি মরি!

আপনারা সবাই ভাবছেন ফোটা ফুল বাসি হলেই আবর্জনা? হ্যাঁ, মার্কিন চিত্রনটী ডায়ানা দেবী সে কথা জানেন বলেই এক পোষাকে কখনও দু'বার ছবি তোলেন না। তারপর রাত ফুরলে? সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন তো? সুদখোর মরে গিয়ে বাদুড় হয়ে জন্মায়, আর কালকের অভিনেত্রী আজকের প্রযোজিকা হয়ে নব জন্ম সার্থক করে থাকেন।

আর একজনের কথা বলি। তাঁর আবার ঘর থেকে ঘাটে যেতে খান চল্লিশেক তোরঙ্গ নিয়ে যেতে হয়। তা হবে নাই বা কেন? বছরে এগার লাখ টাকার মতো রোজগার নিয়ে এদেশে বাবুরা বাগান বাড়ী করেন, ঝানু ব্যবসায়ীরা গণেশ ওল্টায়, ফিল্ম প্রযোজকরা সচরাচর বিয়ে ক'রে বসে দিবা স্বপ্নের ছাঁদনাতলায়। কিন্তু অভিনেত্রী? তৈরী করে চল্লিশটা পোষাক রাখার জায়গা। ধরুন চতুর্থবার বিয়ে করে চিত্রনটী স্ত্রী একটি পান্নার বুটি দেওয়া নেকলেস, যার দাম কম পক্ষে হ্যাঁ পাঁচ লাখ টাকা হবে, লাভ করে বললেন, এসব জিনিষের ওপর হাত বোলানোর চাইতে একটা সুরেলা ম্যাণ্ডোলিন নিয়ে খেলা করতে তাঁর নাকি ভারী ভালো লাগে। এক বছর বাদে এ হেন চার নম্বর স্বামী বিনা নোটিশে পরলোকে পাড়ি দিলেন, আর স্বামীর ঘরের লোকেরা বললেন, ঐ নেকলেসটা শুধু ফেরৎ দিয়ে দাও, ওটা বংশগত উত্তরাধিকারের সম্পত্তি কেউ চিরদিন কাছে রাখতে পারে না। এ কি যে সে কথা? নিন্, অত তড়পে লাভ নেই। আলগোছে গ্লাস ধরে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে একটা বাঙ্লা পান গুণ্ডি সমেত গালের মধ্যে ঠুসে চুপ করে বসুন। একে স্ত্রীলোক, তায় অভিনেত্রী। ভড়কে মরা স্বামীর দুঃখে কাঁদ কাঁদ হয়ে অমনি দেখতে পাবেন উনি বললেন, আমি মাথা খুঁড়ে মরব, গলায় দড়ি দোব—আমার সোয়ামীর শেষ স্মৃতি চিহ্ন আমার গলা থেকে কেউ খুলে নিতে পারবে না—পারবে না—পারবে না। মার্কিন মুলুকের এই অভিনয়-পটিয়সী নামে অবশ্য মারিয়া ফেলিক্স; বয়েস, এই ধরুন, গোটা একত্রিশ রামো:, আপনি পিক্ ফেলেন নি; তাই বলে উঠবেন, 'অরে' আমায় মারিয়া ফেলিস্। তুই আমারে যদি 'তর' বাবুর্চি রাখতিস্।

এক ভদ্রলোক আমেরিকায় অভিনেতা হয়ে জন্মেছিলেন বটে, তবে হলিউড পৌঁছতে তাঁর সাত-সমুদ্দুর-তের-নদী পেরুতে হয়েছিল। তিনি সব প্রথম ছবিতে চান্স পেলেন ভারতবর্ষে, তারপর গেলেন সুইডেন ও জার্মাণীতে অভিনয় করবার জন্যে। সেখানে বাহবা পেলেন প্রচুর। তারপর গিয়ে পৌঁছলেন হলিউড। নামটি তাঁর জর্জ নাদের আর যে ছবিতে অভিনয় করতে গেলেন তার নাম, 'তিনটি সেতু পেরুতে হবে।' অক্ষরে অক্ষরে একবার মিলটা দেখেছেন? যেন, ধরমদাসের পেশাই হোল গিয়ে ভালো মানুষের গাঁট কাটা?

*

১৯২৮ সালে সব প্রথম খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী ক্লারা বো অনুরক্তদের মধ্যে যে যে ভঙ্গীতে তাঁকে ভালো দেখায় সেই সব ছবিগুলি পাঠিয়ে দিতেন স্নেহের পুরস্কার হিসেবে। কিন্তু কালে, এই ব্যাপারটা এমন একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেল যে, অভিনেত্রীকে আর ছবি পাঠাবার ঝামেলায় পড়তে হোল না. অনুরাগীরাই তাদের পছন্দ মতো অভিনেত্রীকে বেছে নিয়ে তার ছবিটা প্রকাণ্ড একটি স্থানে সেঁটে রাখতে লাগল। অভিনেত্রীদের পক্ষে এমন সৌভাগ্যবতী গুটিকয় এখন আছেন তাঁরা নাকি ছবির ভেতর থেকেই অনেক যোদ্ধাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একদিন সশরীরে ঘরে ফিরিয়ে এনেছেন যুদ্ধান্তে। অবাক হয়ে গেলেন? দুর্গাপুজো সরস্বতাপুজোর ঝামেলা সংতে ও ঝামেলা শেষ করতে যে আজকাল দলে দলে ভক্তিপ্রাণ ভক্ত-যোদ্ধা এখনও ঘরে ফিরে আসে তার জলজ্যান্ত প্রমাণটা কি আপনার মনে ধরছে না বুঝি?

*

মিস বো তাঁর একটি সুন্দর অঙ্গ ভঙ্গীকে উপলক্ষ্য করে যে শর-নিক্ষেপ করেছিলেন তার ফল গিয়ে পৌঁচেছিল প্রায় ২৫,০০০ লোকের ওপর। সুতরাং ঐ পরিমাণ ছবি যাঁরা সরবরাহ করেছিলেন তাঁদের এবং যাঁর ছবি সরবরাহ করা হয়েছিল তাঁর লাভের পরিমাণটা আশা করি কল্পনা করতে পারেন।

সেই সেকালের লাভের ইতিহাস আজকের সোনার খনি। তারকা-আঁকড়ানোর দল ধরুন কোন মানসপ্রিয়াকে হয়তো একখানা ভালো ছবির কথা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট একখানা চিঠি সমেত এসে হাজির ৫"×৮" সাইজের একখানা প্রিন্ট। আর তার সঙ্গে একটুখানি অনুরোধ যে, সেই ছবিটির ১০"×৮" সাইজ মাত্র এক টাকা পাঁচশিকের মতো খরচ করলেই পাঠানো হবে। ব্যস, আর যায় কোথা! মনের মধ্যে যিনি দিবারাত্র আনচান্ করছেন, একবার বিনামূল্যে ৫×৮ সাইজে তিনি, আর কিছুদিনের ভেতরই প্রায় বিনামূল্যে একবারে ১০×৮? (অর্থাৎ ১০ হাত!) খদ্দেরের কথা বলছেন? ঝুটো কাগজওয়ালার থলি থেকে পয়সা দিয়ে যে সব তারকা-আঁকড়ানোর দল মানসপ্রিয়ার লণ্ড্রির রসিদ কিনে রাখেন তাঁরা কেবল ১০ হাতের সাইজেই সন্তুষ্ট থাকবেন বলছেন? ধিক আপনার বুদ্ধিকে! তারা আরও বড় বড় সাইজের প্রিন্ট সযত্নে সংগ্রহ করতে থাকবেন এবং লাভ?

তাহ'লেও স্রেফ আন্দাজ করে নিতে ক্ষতি কি যে দেড় কোটি খানেক এরকম প্রিন্টের জগৎ-জোড়া চাহিদা মেটাতে কি পরিমাণ টাকাই না জাহাজে চাপে।

সিনেমাভক্তদের মনের মেয়ে মেরিলিন মনরো, (সন্ত দিলীপকুমারের সেই গলাকাঁপানো গান খানা মনে পড়ছে? "মন লো আমার মন ভ্রমরা, কালীপদ নীল কমলে···") তখনও তারাবাজী হয়ে যান নি। কিন্তু একখানা ক্যালেণ্ডারের জন্যে একটি 'সখি, ধর ধর' গোছের পোজ মেরেছিলেন। যিনি ছবিটি তোলবার জন্যে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছবিখানা নিয়ে কশ্চিৎ ছাপাখানায় বিক্রি করতে নিয়ে গিয়ে কবুল করলেন হাজার পনের ষোল টাকার মতো। ছেপে যখন আসল জিনিষটি বেরিয়ে এল, সেদিন সারা দেশটায় চলতে গেলে বেজায় কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসে গেছে। আহা, লালমখমলকে নিন্দায় ফেলে জন্মদিনের স্নানের ঘাঘরায় অপ্সরীটি কে গা? ক্যালেণ্ডারটি কোন বিজ্ঞাপনের জন্যে বিনামূল্যে

বিতরণ করার কথা, কিন্তু চাহিদা দেখে ছাপাখানাটি হুড়্দাড় করে প্রায় ডবল কপি নিজের পয়সায় ছাপিয়ে ফেললেন। তা ধরুন, এগার সিকে (আর তিন সিকে ঘরে টানানোর পরের খরচ; ছাপাখানার মালিক বুদ্ধিমান কিনা ওটা বাজেটে উহ্য রেখে ঘাটতি কম দেখিয়েছিলেন আর কি!) দামে কোটিখানেকের কাছাকাছি কপি বিক্রি হোল।

এটা তো সাইড পোজ মাত্তর। সোজাসুজি আরও দু'খানা ছবি ক্যামেরাম্যান তুলে তুরুপ মারবার জন্মে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তারপর মন্‌রো যখন তারকাবাজী দেখালেন, তখন বুঝতেই পারছেন সোজা পোজখানির দাম কী দাঁড়াতে পারে! সেগুলো, না বললেও চলে যে, বেশ চড়াদরে বিক্রিই হোল এবং যিনি খরিদ করলেন তাঁকে আমাদের পুঁথির ভাষায় বলতে গেলে রসিক নাগরই বলতে হয়। সেই অগ্নিময় ব্যাপারটি পানপাত্রের তলায় রাখবার গোল গোল টেবল ঢাকার ওপর ছাপিয়ে বিক্রি করতে আরম্ভ করলেন ইনি। রসিক বলে রসিক! ঠাণ্ডা গ্লাসে বিন্দু বিন্দু জলের ভেতর থেকে কাঁপা কাঁপা সেই পোজখানা যখন বেরিয়ে আসবে তখন? আরও শুনবেন নাকি, ভারী অদ্ভুত ছেলেমানুষ তো! ভদ্রলোকের ব্যবসায়িআনার কল্পনা দিয়ে আরেকটা অকটারলোনী মনুমেণ্ট যে তৈরী হতে পারে—কই সে কথা তো একবারও বললেন না?

অবশ্য এই সাংঘাতিক দুর্ঘটনা থেকে আসল দুর্ঘটনার স্রোত বইতে, সুরু হয়েছে। তারকায়িত হবার আগে থেকেই অনেক তন্বী শিখরদশনা দুর্ঘটনা ঘটার মতো পটাপট পোজ বিক্রি করে যাচ্ছেন আজকাল। আপনি ভাবছেন, যদি ছবি তুলতেই জন্মাতেন এই পৃথিবীতে! আর আমি ভাবছি ভালই হয়েছে আপনার ফটোগ্রাফার হয়ে না-জন্মে। কেননা, তুলতে গেলে চোখের সামনে গোটাকয় দাঁড়কাক, বাচ্চা হাতী, মাঝারি গণ্ডার আর পিল্‌পিলে শেয়ালছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না যে! পয়সা দিয়ে চিড়িয়াখানার ছবি আর কাঁহাতক লোকে কিনবে বলুন···

আমাদের এদেশে আউটডোরে যেতে হবে শুনলেই যেমন চিত্রকর্মীদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে, ছবি যাদের দেশে হামেশা তৈরী হয় তাদের কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে উল্টো। আপনি হয়তো বলবেন প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে যখন অন্ধকূপের আশ্রয় সন্ধানে তারা ব্যস্ত ছিল তখন আমরা ছিলুম তক্তপোশে আর এখন আমরা তক্তপোশ ছেড়ে সবে চৌবাচ্চার ধারে এসে দাঁড়িয়েছি অতএব তাদের অন্ধকূপ থেকে প্রকৃতির সন্ধানে ফের বেরিয়ে পড়াটাই অতি স্বাভাবিক। কিস্সু জানেন না। আউটডোরে পিকনিকের আবহাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ওদেশে কতো অকেজো ক্যামেরাম্যান ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘোরাফেরা ক'রে দু'পয়সা আমদানীর সুযোগ করে তা আপনি কি ক'রে আর জানবেন বলুন; আর এখানে যাঁরা ব্যস্ত হন্ তাঁদের আসল উদ্দেশ্যটি তো আপনার জানার কথা নয়।

সম্প্রতি সহরের দেওয়ালে দেওয়ালে সিনেমা পোষ্টার মারা নিয়ে কেউ কেউ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছেন। শুধু সিনেমা পোষ্টারই বা কেন, প্রাচীরপত্র লটকানোর ব্যাপারটাই তাঁরা বরদাস্ত করতে চাইছেন না। কলকাতা কর্পোরেশনের অধিকর্তার প্রতি কটাক্ষপাত ক'রে তাঁরা বলছেন যে, কলকাতা শহরকে যখন সুন্দরতর করবার চেষ্টা চলছে তখন প্রাচীরে প্রাচীরে বেপরোয়াভাবে পোষ্টার আঁটা বন্ধ করবার ব্যবস্থা কর্পোরেশন এখনও করেনি কেন। তাঁরা বলছেন, অশ্লীল সিনেমা ছবি ও ওষুধের বিজ্ঞাপনে প্রাচীর, গাছপালা, বিদ্যুতের থাম প্রভৃতি ছেয়ে গেছে। এ সব আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। যে সব অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছে তা শহরের আধুনিক রুচিসম্পন্ন মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির অভিযোগ মাত্র। গণতন্ত্রের যুগে এই সংখ্যালঘুদের কথা কে শুনবে? অর্থাৎ শহরের সৌন্দর্য-আদর্শ সংখ্যালঘু

না সংখ্যাগুরুর রুচির ওপর নির্ভর করবে, সেইটি ঠিক হলেই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি। রুচিবানদের মতে শহরের শতকরা ৯৯ জন ব্যক্তির ভালমন্দের কোনো বোধই নেই। তাঁদের মতে শহরের এই ব্যক্তিদের আদি পুরুষ ইডেন উদ্যানের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাননি। কিন্তু যে মুষ্টিমেয় কজন ব্যক্তির আদি পুরুষ এ-কার্য্য করেছেন তাঁদের নিয়েই হয়েছে মুশকিল। কারণ তাঁরা যা বলছেন, তা ঠিক নয়। অর্থাৎ শহরের শতকরা ৯৯ জন ব্যক্তির ভালমন্দের কোনো জ্ঞান নেই, একথা ঠিক নয়। তাঁদের নিজেদের সৌন্দর্য্য-আদর্শ একটা অবশ্যই আছে এবং সেই আদর্শেই শহরের চেহারা সুন্দর হয়েছে। প্রাচীরের গায়ের পোষ্টারের যে সৌন্দর্য্য তা তাঁদেরই রুচিসঙ্গত সৌন্দর্য্য।

তাছাড়া সচিত্র পোষ্টার তো ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির সম্মান পাবার উপযুক্ত। তবু তো সমস্ত মলিনতার মধ্যে ঐ সব উজ্জ্বল রং-বিশিষ্ট সচিত্র পোষ্টারগুলো চোখে ও মনে রং ধরায়। কলকাতার পথের শত শত বেকার লোকের ক্ষুধার্ত্ত চোখে পোষ্টারই তো কিছু তৃপ্তি জোগাতে পারে। কত রোগী প্রাচীরের গায়ে মাদুলি অথবা পেটেণ্ট ওষুধের বিজ্ঞাপনে আশার বাণী শোনে, কত কঙ্কালসার ব্যক্তি সালসা খেয়ে আস্ত একটা বটগাছের গুঁড়ি দু'হাতে চিরে ফেলার অথবা সিংহের সঙ্গে লড়াই ক'রে তাকে পদানত করার স্বপ্ন দেখে। কত সিনেমা-বঞ্চিত হতভাগ্য সিনেমার পোষ্টার দেখে ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজনের ফললাভ করে। তা ভিন্ন এক পোষ্টার আর একটার ঘাড়ে চাপা প'ড়ে কত কৌতুক রসের সৃষ্টি করে। কত "৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত বিশুদ্ধ গব্য শান্তিরস সালসা", "অনুস্পা কেমিক্যালের অনুপমা", "আগামী পয়লা তারিখে শুভমুক্তি—টাক পড়া বন্ধ করে" "অষ্ট ধাতু নির্ম্মিত অমোঘ যন্ত্রভট্ট" "স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থীদের নিত্যসখা পিলপিলি সাহেব"—ইত্যাদি রূপ প্রতিযোগিতাজাত সব পোষ্টার হিউমার। এর কি কোনো মূল্যই নেই?

এতে অবশ্য সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই বেড়েছে। অসুবিধার দিকটি হচ্ছে এই যে, এতে পথচারী মানুষ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হচ্ছে। তারা যথাসময়ে কোথাও পৌঁছতে পারছে না এবং এই গতির যুগেও তাদের গতি মন্থর হয়ে পড়ছে। আর সুবিধার দিক হচ্ছে এই যে এতে মানুষ শিথিলগতি হওয়াতে পথে যত দুর্ঘটনা ঘটতে পারত তা ঘটে না। চলা নিয়ে কোথাও প্রতিযোগিতা নেই। এমনকি যারা কাগজ কিনতে পারে না তারা প্রাচীরের গায়ে কাগজও পড়তে পারে। যারা থিয়েটারে যেতে পারে না, তারা তার বিজ্ঞাপন পড়ে সুখ পায়। পথে তাদের এইভাবে স্বাস্থ্যলাভ হয়। সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি দেশভেদে ভিন্ন। আদর্শের মাপকাঠি তো বটেই। মুষ্টিমেয় উৎসাহীর দল সিনেমার পোষ্টার ছবিতে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছেন। অতএব আবার

বলি, দেশ যে পথে চলেছে তাতে আর হয় তো এক বছর পরেই আজ যা অশ্লীল তা আর অশ্লীল মনে হবে না। কিছুদিন আগে বাঙালীপাড়ায় বাংলা ছবির একখানা পোষ্টার দেখেছিলাম। বেশ বড় ছবি, কয়েক মাস ধ'রে দেখাবার জন্য পেন্ট করা হয়েছিল

ছবির কাহিনীতে কোন্ ঘটনা প্রধান জানি না, তবে বাইরে যে ঘটনা কাহিনীর প্রধান উপজীব্য বলে ছবিতে ফোটানো হয়েছিল সেটি হচ্ছে এক ভদ্রবেশধারী বাঙালী যুবক এক যুবতীর মাথার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিচ্ছে। ধ'রে নেওয়া যেতে পারে বাংলাদেশের যুবকদের সামনে তাদের জীবনের সব চেয়ে বড় আদর্শই এই ছবিতে ফোটানো হয়েছিল। কোনো বাঙালী যুবক এ-ছবিকে মেরুদণ্ডহীন ইমবেসাইল বাঙালী যুবকের জীবনাদর্শরূপে স্বিকার দেয় নি, অতএব ধ'রে নেওয়া যেতে পারে অধিকাংশের অর্থাৎ মেজরিটির এটাই হচ্ছে রুচি। আর তা যদি হয় তা হলে পোষ্টার বন্ধ করার আন্দোলন না চালিয়ে আরও পোষ্টার চাই আন্দোলন আরম্ভ করা উচিত। সত্যিই, পোষ্টার না হলে কলকাতার বারো আনা সৌন্দর্য্য মাটি। অতএব যে সব বাড়ির দেওয়ালে এখনো পোষ্টারের ছাপ পড়েনি সেই সব বাড়ির বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে আইন জারি ক'রে পোষ্টার লাগানোর ব্যবস্থা করা হোক।

*

সাহিত্যজগতে রচয়িতার ছদ্মনাম ব্যবহারের রেওয়াজ সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস থেকেই প্রচলিত। চিত্র-এলাকায় আসার পর অভিনেতা-অভিনেত্রীর স্বীয় বহু ব্যবহৃত নামের খোলস পরিত্যাগ করে নতুন পোষাকী নাম গ্রহণও দীর্ঘকালের প্রাচীন পুরাতন প্রথা। কিন্তু পরিচালকের আসল নাম গোপন করে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে জনকয়েক কলাকুশলী মিলিতভাবে কোন ছবি পরিচালনা করে পরিচালকের নামের জায়গায় একজন কারুর নাম না দিয়ে একটা ছদ্মনাম ব্যবহার করার নজীর খুব হাল আমলেরই। যেমন 'অগ্রদূত' গোষ্ঠীর পিছনে রয়েছেন কয়েকজন সুপরিচিত কলাকুশলী; এঁরা সকলে মিলে পরিচালনা কাজ নির্ব্বাহ করেন এবং কোন একজনের নাম না দিয়ে পরিচালকের নামের জায়গায় একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করে আসছেন। এঁদের যুক্তি স্বীকার্য। কিন্তু আরও অনেক ক্ষেত্রে ইদানীং দেখা যাচ্ছে কয়েক-জনে একজোটে পরিচালনার কাজে নিযুক্ত হ'য়ে ছবির ভালমন্দর দায়িত্ব সবায়েরই ঘাড়ে চাপিয়ে রাখার জন্যে অথবা দায়িত্ব একেবারে এড়িয়ে যাবার জন্যও একটা ছদ্মনামের আড়াল সামনে এগিয়ে ধরছেন অসঙ্কোচে। অনেকে আবার নিজের অক্ষমতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন যাতে ছবি মুক্তির পরও তিনি মুখ বের করে চলতে পারেন। ষ্টুডিও মহলে হয়তো ছদ্মনামের অধিকারী আসল ব্যক্তিটির পরিচয় অনেকেরই কাছে জানা থাকে, কিন্তু বাজারে বা বাইরের সাধারণের মাঝে কেইবা তাঁকে চিনছে! এই-ভাবে অনেক সময়ে অযোগ্য ব্যক্তিও তার কোন অকৃতিত্বের জন্য প্রত্যক্ষ নিন্দার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার পথ করে নেয়।

বর্তমানে পরিচালকের নামের জায়গায় একটা ছদ্মনাম লাগিয়ে দেওয়ার রেওয়াজটা খুবই বাড়তির দিকে। জন-কয়েক কলাকুশলী মিলে কোন ছবি পরিচালনা করার পর কারুর নাম না দিয়ে যদি একটা গোষ্ঠিবোধক নাম ব্যবহার করেন তার একটা যুক্তি আছে, যেমন: "আর কে ফিল্ম ইউনিট" বা "ওয়েষ্টার্ণ থিয়েটার্স ইউনিট" অথবা "শিল্পী সঙ্ঘ" ইত্যাদি। কিন্তু "চিত্রদূত", "রাজ-পুত্র", "সপ্তরশ্মী", "সুদর্শন চক্র", "চিত্রযন্ত্রী", "শ্রীভট্টক" "চিত্রমিত্র", "যাত্রিক", "ভার্গব" প্রভৃতি যে সব ছদ্মনাম সাম্প্রতিক চিত্র ঘোষণার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে এঁরা কে এবং কি উদ্দেশ্যে নিজেদের আসল পরিচয় গোপন রাখতে চাইছেন তা সহজবোধ্য নয়। তবে 'অগ্রদূত' এর পাশেই 'অগ্রগামী'র মতন তাঁদের কারো কারো মনে হয়ত এ ধারণাও থাকতে পারে যে পরিচালকের ছদ্মনাম ছবির সৌভাগ্য নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সুফলদায়ক। অতএব—সিনেমারাজ্যে এর চেয়ে বড় যুক্তি আর নেই!

শিল্পী-দম্পতি

পদ্মিনী সেনগুপ্তা

[অতি সম্প্রতি কলকাতা পরিদর্শনে এসেছিলেন ব্রিটিশ মঞ্চের প্রবীণ শিল্পী-দম্পতি ডেম সিবিল থর্ণডাইক ও তাঁর স্বামী স্যার লিউইস ক্যাসন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এই বিবরণীতে তাঁদের নিকট সান্নিধ্য এবং অন্তরঙ্গ চরিতচিত্র পাওয়া যাবে—চি. স.]

ব্রিটিশ মঞ্চ জগতের শিল্পী-দম্পতি শ্রীমতি ডেম সিবিল থর্ণডাইক এবং স্যার লিউইস ক্যাসন একাদিক্রমে যেভাবে চল্লিশ বছরেরও অধিক পৃথিবীর সবচেয়ে নামকরা স্বামী-স্ত্রী জুটি হিসেবে মঞ্চাভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন তা এক স্মরণীয় ঘটনা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপারে এমনি-ধারা এক স্বামী-স্ত্রীর উদাহরণ দেখা গেছে মাদাম এবং মঁশিয়ে কুরীর বেলায়। স্বামী-স্ত্রীর একত্রে কাজ করা যেমন আনন্দের খোরাক জোগায় তেমনি উদ্দীপনারও সঞ্চার করে। এর ওপরেও আরও একটি বিষয় রয়েছে, সেটি হলো, অর্দ্ধ শতাব্দী ধ'রে অভিনয়জগতে উভয়েই জনপ্রিয় রয়েছেন। সিবিল থর্ণডাইক বা তাঁর স্বামীর সঙ্গে আলাপ করে বেরিয়ে আসার পর খুশী না হয়ে পারা যায় না।

ডেম সিবিল থর্ণডাইককে প্রথম দেখেছিলাম ইংলণ্ডের মঞ্চে বেশ কয়েক বছর আগে। তারপর এই আরও একবার তাঁকে দেখলাম নিউ এম্পায়ার মঞ্চে সম্প্রতি যখন তিনি কলকাতায় আসেন। সারা মাথায় চকচকে পাকা চুল, মুখে মধুর হাসি, এই অপূর্ব্ব প্রতিভাময়ী মহিলার সঙ্গে আলাপের সময় তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলেই আমার মনে হয়েছিল। মঞ্চের ওপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর স্বামীর পাশে। তাঁর বিয়ে হয়েছে ১৯১০ সালে এবং আজও পর্য্যন্ত তিনি তাঁর পাশেই রয়েছেন সহকর্ম্মিণীরূপে মঞ্চাভিনয়ে স্বীয় প্রতিভার দীপ্তি নিয়ে।

নিউ এম্পায়ার মঞ্চে অভিনয়ের পরের দিন তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করলাম এবং আধ ঘন্টা ধরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হলো। আলাপের সুরুতেই তিনি বললেন —"ভারতকে আমি অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি। ভারত স্বাধীন হওয়ার বহু আগে থেকেই আমি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে এসেছি। 'ইণ্ডিয়া লীগ'-এর আমি একজন সভ্যা ছিলাম এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সব সময় সমর্থন জানিয়েছি। আমি খুব খুশী হয়েছি ভারত যে স্বাধীনতা লাভ করেছে দেখে।" স্যার লিউইসও বললেন, "খ্রীষ্টীয় মতে সহনশীলতা বলতে যা বোঝায়, সেই দিক থেকে ভারতকে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ বলেই আমার মনে হয়। অন্যান্য দেশের প্রতি ভারতের মনোভাব কত মহৎ এবং কত উদার।"

তাঁরা দুজনেই বললেন, ভারতে একটি জাতীয় নাট্য-শালা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এত বিপুল পরিমাণ শিল্প-প্রতিভা এদেশে রয়েছে যে, তাদের পরিপূর্ণ উৎসাহ দেওয়া খুবই প্রয়োজন। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে অভিনয়ের উপযোগী এক জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথাই তাঁরা জানান। হাজার হাজার দর্শকের উপযোগী না হ'লেও অন্ততঃ কয়েক শো' দর্শক মাইক্রোফোনের সাহায্য ছাড়া শিল্পীদের সংলাপ শুনতে পাবেন সেখানে। স্যার লিউইস বললেন, 'মাইক্রোফোনের সাহায্যে অভিনয় করাও যা, ছায়াছবিতে অভিনয় করাও তা'—এক কথাই হলো। সহজ স্বাভাবিক অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনয়-শিল্পীরা দর্শকদেরই অংশবিশেষ হবেন, সেইটাই অধিক কাম্য। দর্শক এবং অভিনয়শিল্পীর মধ্যে দেওয়া এবং নেওয়ার একটা মনোভাব উচ্চাঙ্গের অভিনয়-শিল্পের অঙ্গ-স্বরূপ—মঞ্চে আমাদের যাঁরা দেখতে আসেন তাঁদের কাছ

থেকে আমরা তো দূরে থাকতে পারি না।'

ডেম সিবিল সেই সঙ্গে বললেন "সেইজন্যেই দরকার বেশ একটি ছোট্ট নাট্যমঞ্চের—তাতে দৃশ্যপট ইত্যাদির বাহ্যাড়ম্বর না থাকলেও চলবে—কেননা সত্যিকার ভালো অভিনয় তেমন কোনো সাজ-সরঞ্জামের অপেক্ষা রাখে না। বর্ত্তমানকালের ভারতীয় নাটক বেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে কিন্তু ইংলণ্ডের মঞ্চাভিনয়ে যেসব ভুল-ভ্রান্তি হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি যেন ভারতে না হয়—এই ত্রুটি ছিল অত্যধিক পরিমাণে বাস্তবধর্ম্মিতার আশ্রয় নেওয়া। পাশ্চাত্য নাট্যাভিনয়ের আঙ্গিকের অনুকরণ না করে ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব নাট্যধারাই যেন ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয় ভারতীয় নাট্যাভিনয়ে।"

ছোটবেলায় ডেম সিবিল কেণ্টের এক পল্লী অঞ্চলে ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের এক গৃহে কাটিয়েছেন। সেইজন্যে তাঁর ব্যবহার ইত্যাদিতে ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলের সেই নিরাড়ম্বর নিরহঙ্কার ভাবটি রয়েছে। অসামান্য সাফল্য তাঁর মনের ওপর কোনরকম বিসদৃশ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। স্যার লিউইস-এর সম্বন্ধেও ঠিক ঐ এক কথাই খাটে। ডেম সিবিল প্রথমে পিয়ানো বাজনায় পারিদর্শিণী হবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁর হাতের কব্জি কিছুটা দুর্ব্বল হওয়ায় তাঁর সে আশা পূরণ সম্ভব হলো না। তিনি ছোটবেলায় যেখানে কাটিয়েছেন সেখানকার অপেশদার নাট্য সমিতিতে যোগ দিয়ে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ খুঁজে পেলেন। সেই সম্প্রদায়ে থেকেই অভিনেত্রী হিসেবে যে-প্রতিভার পরিচয় তিনি দিলেন তাতে উৎসাহিত হয়েই পরবর্ত্তীকালে মঞ্চাভিনয়ের পেশা গ্রহণ করলেন।

ব্রিটিশ মঞ্চজগতের তৎকালীন স্বনামধন্য অভিনয়-শিল্পী বেন গ্রিট-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন ডেম সিবিল। তাঁর সঙ্গে থেকে ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সুদূর আমেরিকাতেও গিয়েছিলেন এবং সে সময় বেশীর ভাগ মঞ্চাভিনয়ে সেক্সপীয়ার রচিত বিভিন্ন নাটকে অংশ নিয়েছেন। স্বরচিত এক নাটকে একটি ছোট্ট ভূমিকায় মিস থর্ণডাইক-এর অভিনয় বার্ণার্ড শ' নিজে দেখেছিলেন এবং তিনি 'ক্যানডিডা' নাটকে একটি প্রধান ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দেন মাঞ্চেষ্টারের এক প্রসিদ্ধ নাট্য প্রতিষ্ঠানে। এর পরেই মিস থর্ণডাইকের আলাপ হয় প্রযোজক-পরিচালক লিউইস ক্যাসনের সঙ্গে এবং ১৯১০ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। এর কয়েক বছর পরে তাঁরা লণ্ডনে আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মিষ্টার ক্যাসন সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে যোগ দিলেন এবং মিস থর্ণডাইক যোগ দিলেন ওল্ড ভিক কোম্পানীতে। এই প্রতিষ্ঠানে অভিনয় করে তাঁর অভিনয়ের খ্যাতি স্বদেশে এবং বিদেশে বহুদূর প্রসার লাভ করে। ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে খেতাব পেয়েছিলেন 'ডেম কমাণ্ডার অব্ দি অর্ডার অব্ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার'। তাঁর অভিনীত দুটি বিখ্যাত ভূমিকা হলো 'লেডি ম্যাকবেথ' এবং বার্ণার্ড শ'-এর 'সেন্ট জোয়ান'।

ডেম সিবিল এবং স্যার লিউইস কলকাতা থেকে গেলেন অষ্ট্রেলিয়ায়। সেখানে তাঁরা স্যার রাল্‌ফ্ রিচার্ডসনের সঙ্গে 'স্লিপিং প্রিন্সেস্' এবং 'সেপারেট টেব্‌ল্' নাটক দুটিতে অভিনয় করবেন ডেম সিবিল জানান যে, স্যার রাল্‌ফ্ তাঁদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁদের সঙ্গেই স্যার রাল্‌ফ্ যদি ভারত ভ্রমণে আসতে পারতেন তবে খুবই ভালো হত, কেননা, ভারতে ডেম সিবিল যে আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছেন তাতে তিনি খুবই প্রীত হয়েছেন। যে আতিথেয়তা এবং সৌহার্দ্য ভারত তাঁদের প্রতি প্রকাশ করেছে তা ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, যে ভারতের প্রতি তাঁরা উভয়েই একান্তভাবে অনুরক্ত।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আবার কবে আমাদের দেশে আসছেন ?'

স্যার লিউইস উত্তর দিলেন—'তা তো ঠিক বলতে পারছি না। তাছাড়া এখন আমার বয়েস ৭৯ আর আমার স্ত্রীর বয়েস ৭২।'

কিন্তু আমি এবং আর যাঁরা তাঁদের দেখেছেন তাঁদের সকলের কাছেই তাঁরা দুজন যেন চিরকালের নবীন দম্পতি রূপেই থাকবেন। আশা করি আরও বহু বছর ধরে এই শিল্পী-দম্পতি সারা দুনিয়ার মঞ্চরসিক দর্শকদের আনন্দ দিয়ে যাবেন। ['অমৃতবাজার' পত্রিকা থেকে অনূদিত]

খবরা খবর

গেভাকালারের মোহ !

প্রযোজক-পরিচালক নরেশ মিত্র তাঁর পরবর্ত্তী ছবিটি গেভাকালারে তুলবেন বলে জানিয়েছেন। সম্প্রতি দেবকীকুমার বসুও গেভাকালারে ছবি তোলার কথা জানান। গেভাকালারে ছবি তোলার জন্যে অভিনেতা-প্রযোজক বিকাশ রায়ও তোড়জোড় করছেন বলে প্রকাশ। পরবর্ত্তী ছবিটি তিনি গেভাকালারে তুলবেন যাতে সুচিত্রা সেন দ্বৈত-ভূমিকায় অভিনয় করবেন তাঁর বিপরীতে। ছবিটি হয়ত পরিচালনা করবেন অজয় কর। গেভাকালারে ছবি তোলার মোহ যেন বাঙলার প্রযোজকদের পেয়ে বসেছে !

রবিবার দিন ছুটির দাবী

বোম্বাইয়ের বিভিন্ন ষ্টুডিওতে নিযুক্ত কলাকুশলীদের সাধারণ সংস্থা ইণ্ডিয়ান মোশন পিকচার্স এম্লইজ ইউনিয়ন সম্প্রতি প্রতিটি ষ্টুডিওতে যাতে রবিবার দিন কাজ বন্ধ থাকে এবং ঐদিনটি বাধ্যতামুলক ছুটির দিন বলে ধার্য্য করা হয় তার জন্য ব্যাপকভাবে আন্দোলন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এই সংস্থার সাধারণ-সম্পাদক ভি, বি, কুলকারণী এই প্রসঙ্গে চিত্রতারকাদের কাছে এক আবেদন জানিয়ে বলেছেন, "আপনারাও আমাদের সঙ্গে মিলিতভাবে রবিবার ছুটির দিন বলে ধার্য্য করার জন্যে দাবা জানান। রবিবার দিন কোন ষ্টুডিওতেই কাজ করবেন না বলে প্রযোজকদের জানিয়ে দিন।" তিনি আরও বলেন, "ষ্টুডিও মালিক ও প্রযোজকগোষ্ঠী কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ছুটির দিন ধার্য্য না করায় আমরা. কলাকুশলীরা সামাজিক বা পারিবারিক জীবনের সজসুখ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এতে কলাকুশলীদের স্বাস্থ্যই যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই নয়, তাদের কাজের মানও নিম্নমুখী হচ্ছে। কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো প্রযোজক বা ষ্টুডিও-মালিকদের কাছে এ কথা তুললেই তাঁরা চিত্রতারকাদের দোহাই দেন। তাঁরা বলেন তারকারা নাকি রবিবার দিন কাজ করতে চান এবং তারকাদের দাবী মেটানো ছাড়া তাঁদের উপায় থাকে না।" চিত্রতারকারা কিন্তু একথা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন রবিবার দিন ছুটি পেলে তাঁরা খুশীই হবেন কেননা এতে তাঁদের মানসিক অবসাদ কিছুটা কমবে।

অভিনেত্রীর পরিচালিকা হবার সখ

মার্কিন্ অভিনেত্রী ক্লদেৎ কোলবার্ট একটি ছবি পরিচালনা করবেন বলে মনস্থ করেছেন। তিনি সম্প্রতি তাঁর স্বামী ডক্টর জিল প্রেসম্যান-এর সঙ্গে ইতালী ভ্রমণ করেন। তিনি বলেছেন যে তিনিই প্রথম মহিলা চিত্রপরিচালিকা নন, ইডা লুপিনোও একাধারে চিত্র-পরিচালিকা ও অভিনেত্রী ছিলেন। ভারতেও জনপ্রিয়া অভিনেত্রী মধুবালা চিত্র পরিচালনার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। চিত্রগ্রহণের সময় কলাকৌশলের অন্যান্য ব্যাপার তিনি বেশ মনোযোগ দিয়েই দেখেন। 'অযোধ্যার শ্যাম' নামে যে ছবিটি তিনি পরিচালনা করবেন, সম্ভবতঃ সেইজন্যেই তার এই শিক্ষানবীশী। সহোদরা চঞ্চলের সঙ্গে 'নাতা' নামে যে ছবিটিতে মধুবালা অভিনয় করছেন তার পরিচালক ডি, এন, মোধক-এর সঙ্গে এ-ব্যাপারে প্রায়ই তাঁকে আলোচনারত দেখা যেত।

অভিনেতার মোটর গাড়ী লাভ

বোম্বাইয়ের জুবিলী পিকচার্সের যুগ্ম-প্রযোজক লেখরাজ ভকরী এবং কুলদীপ কাউর শাম্মী কাপুরকে ২৩,০০০ হাজার টাকা দামী এক প্লিমাউথ গাড়ী উপহার দেবেন বলে জানিয়েছেন। জুবিলী পিকচার্সের সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'ঠোকর' ও নির্ম্মীয়মান 'নকাব', 'নাশা' ও 'টাঙ্গেওয়ালী' ছবিগুলি তোলার সময় শাম্মী কাপুর প্রযোজকদের সঙ্গে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তারই স্বীকৃতিস্বরূপ এই উপহার দেওয়া হচ্ছে। এঁদের

আগামী ছবি শিরী ফরহাদে'ও শাম্মী অভিনয় করবেন।

হেডি লামারের ভারত ভ্রমণ

মার্কিন তারকা হেডি লামার তাঁর সাম্প্রতিক ছবি 'দি জাজমেণ্ট অফ প্যারিস'-এর আসন্ন শুভমুক্তি উপলক্ষ্যে শীঘ্রই ভারতে আসছেন। ছবিটি রঙীন ক'রে তোলা হয়েছে এবং একই সঙ্গে বোম্বাইয়ের 'রিগাল' এবং মাদ্রাজ ও কলকাতার 'গ্লো' থিয়েটারে' মুক্তিলাভ করবে বোরকার ব্রাদার্স-এর পরিবেশনায়। হেডি লামারের ভারতে থাকাকালীন কর্মসূচীও ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে গেছে।

যৌথ-প্রচেষ্টায় ছবি তোলার পুনঃপ্রচেষ্টা

জাপানের হিরোসি ওকাওয়া চিত্র-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বোম্বাইয়ের প্রযোজক এ, জে, প্যাটেলের যুগ্ম-প্রযোজনায় বাঙলার বীর বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জীবনী অবলম্বনে 'ব্ল্যাক লেওপার্ড অব বেঙ্গল' নামে যে ছবিটি তোলার কথা ছিল ভারত সরকার সম্প্রতি তার চিত্রনাট্য ও কাহিনী নামঞ্জুর করায় শ্রীযুত প্যাটেল আবার জাপানে যাচ্ছেন অন্য কোন বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি তোলার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্যে। বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনেই সম্ভবতঃ ছবিটি তোলা হবে। জাপানের তোয়ে মোশন পিকচার কোম্পানীর সঙ্গে শ্রীযুত প্যাটেলের এই বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করেই একখানি ছবি তোলার পরিকল্পনা হয় প্রথমে। পরে তা' পরিবর্ত্তন করে জীবনীচিত্র তোলার কথা হয়। শ্রীযুত প্যাটেল জানান যে তোয়ে মোশন পিকচার্সের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মকে কেন্দ্র করে ছবি তোলার যে পরিকল্পনা প্রথমে হয়েছিল তা' এখনও নির্দ্দিষ্টই আছে, তবে এর বিস্তারিত পরিকল্পনা ভারত সরকারের নির্দ্দেশমতই পরিবর্ত্তন করতে হবে।

সিলভানা মাঙ্গানোর উক্তি

কিছুদিন পূর্ব্বে ইতালীয় চিত্রতারকা সিলভানা মাঙ্গানো বলেছেন যে, অবিবাহিত মেয়েদের চেয়ে বিবাহিত মেয়েদের যৌন আবেদন সঞ্চারের ক্ষমতা বেশী। বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা পূর্ণতা লাভ করে। ঘর-সংসার আর ছেলে মেয়ে হলে মেয়েদের জীবন সম্বন্ধে অনুভূতিও বৃদ্ধিলাভ করে এবং পুরুষদের ভাল ক'রে জানবার এবং বোঝবার ক্ষমতাও বাড়ে।

সিলভানা বিবাহিতা এবং তাঁর দুটি মেয়ে আছে। তাঁর স্বামী হলেন ইতালীর একজন নামকরা চিত্র-প্রযোজক। এঁর নাম দিনো দ্য লরেনতিস। তাঁর দুটি মেয়ের নাম ভেরোনিকা এবং রাফেলা। প্রথমটির বয়েস পাঁচ বছর এবং দ্বিতীয়টির বয়েস তিন বছর।

সিলভানা অভিনেত্রীর জীবন ত্যাগ ক'রে কর্ত্তব্য-পরায়ণা স্ত্রী এবং মা হিসেবেই থাকতে চান। কিন্তু তাঁর স্বামী নিষেধ করেছেন। তাঁর অভিমত হলো, এতগুলি ছবিতে কাজ ক'রে এত জনপ্রিয়া হয়ে অভিনেত্রীর জীবন ত্যাগ করাটা সিলভানার বোকামিই হবে। সিলভানা বলেছেন, 'দর্শকরা প্রায়ই আমায় চিঠি দেন, আমি যেন চিত্রজগৎ ছেড়ে না দিই। তাঁদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় চিত্র-জগৎ ছেড়ে দেওয়াই আমার পক্ষে ভালো'।

সিলভানার ছায়াছবিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯৪৯ সালে 'বিটার রাইস' ছবিতে। তখন তাঁর বয়েস ছিল চব্বিশ বছর। পোষাক-পরিচ্ছদের এক দোকানে মডেল হিসেবে কাজ করাই ছিল তখন তাঁর পেশা। চিত্রজগতে আসার আগে তিনি কখনও বেতার অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেননি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এক স্মরণীয় আবিষ্কার স্বরূপ ব'লে সিলভানাকে দর্শকরা যে আখ্যা দিয়েছেন সিলভানা নিজে সে কথা মানতে চান না। সিলভানা যে ছবিতে অভিনয় করেন সে ছবির সাফল্য সম্বন্ধে কিন্তু স্থিরনিশ্চয় হওয়া যায়। যে সব চিত্রদর্শক সিলভানাকে পছন্দ করেন তাঁদের অভিমত হলো যে, বিবাহিত বা অবিবাহিত কোন অভিনেত্রীর সঙ্গেই তাঁর তুলনা হয় না এক বিষয়ে, তা হলো যৌন আবেদন সঞ্চারী দৃশ্যগুলিতে তিনি যেভাবে অভিনয় করেন তা' অন্যকারও বেলায় দেখা যায় না। পৃথিবীতে রোমের যে-সুনাম তারই প্রতীক হিসেবে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই সিলভানাকে আসন দিয়েছেন।

যৌন আবেদন বনাম অভিনয়কুশলতা

মেরিলীন মনরোকে ছায়াছবিতে যৌন-আবেদন নতুন ক'রে প্রবর্ত্তনের পথ-প্রদর্শক ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ব্রিটিশ চিত্রজগতে যৌন-আবেদন স্থান পাবে কিনা তাই নিয়ে এক বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে। শুধু বাক্যজালের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়। সত্যিকার ছবিতেই এর প্রভাব সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে। ক্যারল রীডের সাম্প্রতিক ছবি 'এ কীড্ ফর টু ফার্দিংস' ছবিতে দুজন নামকরা শিল্পী তাঁদের পরিচয় দিতেছেন যৌন-আবেদনময় অভিনয়ধারা বজায় রেখে। তাছাড়া 'ব্রিফ এনকাউন্টার' ছবির নায়িকা সিলিয়া জনসনও এ-বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। লণ্ডনের 'মেরিলীন মনরো' বলে খ্যাত সুন্দরী অভিনেত্রী ডায়ানা ডোর্স-এর নামও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সিলিয়া অবশ্য হৃদয়স্পর্শী অভিনয়ে দর্শকচিত্তে রেখাপাত করতে পারবেন বলে মনে হয়। ডায়ানা শুধু অভিনয়ে তেমন প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন না। তাঁর একমাত্র সম্বল হলো যৌন-আবেদন সঞ্চারের ক্ষমতা।

মিস সিলিয়া জনসন বলেন, 'ছায়াছবিতে আর সবকিছুর ওপরে অভিনয়কেই স্থান দেওয়া উচিত। একজন সত্যিকার ভালো পরিচালক এবং একজন কি দু'জন কৃতী অভিনয়শিল্পীই হলো একখানি ভালো ছবির মূল অবলম্বন।' এদিকে ডায়ানা বলেন, 'আমার মনে হয় সুন্দর দেহবল্লরী ছবির দর্শকদের বেশী আকর্ষণ করে। ছবিতে যৌন-আবেদনের একটা বিশেষ স্থান আছে এবং যৌন-আবেদনময়ীর তালিকায় আমি যে থাকব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

গান্ধীজীর ভূমিকায় ভারতীয় অভিনেতা

অটো প্রেমিঙ্গার মহাত্মা গান্ধীর জীবনী এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রাম অবলম্বনে কলম্বিয়া পিক্‌চার্সের পক্ষ থেকে "দি হুইল" নামে একটি ছবি তুলবেন। মিঃ প্রেমিঙ্গার সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ ভারতে থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সঙ্গে এ-সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শ্রীনেহরু তাঁকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যথাসম্ভব সাহায্যদানের আশ্বাস দিয়েছেন।

"দি হুইল" চিত্রটির সমস্ত বহির্দৃশ্য তোলা হবে ভারতে। অভ্যন্তর দৃশ্যগুলি তোলা হবে লণ্ডনে। গান্ধীজীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন একজন ভারতীয় অভিনেতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিত্রদর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৫৪ সালের এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলচ্চিত্র দর্শকের সংখ্যা ১৯৫৩ সালে ঐ সময়ের চেয়ে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ বেশী হয়েছে। ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে দর্শকসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল। এটা মার্কিন চিত্রশিল্পের পক্ষে আশার কথা।

সুবুদ্ধির সূচনা

দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রযোজিত চুম্বন-দৃশ্য সংবদ্ধ প্রথম ছবিটি সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানীতে তুমুল বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি করে। ছবিটি সম্বন্ধে জনসাধারণ এবং সরকার উভয় পক্ষ থেকেই বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে।

পাকিস্তান সরকারের ভারতীয়-চিত্র প্রীতি!

ইণ্ডিয়ান মোশান পিক্‌চার্স প্রোডিউসার্স এ্যাসোসিয়েশন পাকিস্তানে যে দুজন-সদস্যযুক্ত চিত্র-প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন তার অন্যতম সদস্য শ্রীযুত জৈমিনী দেওয়ান সম্প্রতি জানান যে, এ বছরে পাকিস্তান সরকার বেশী সংখ্যক ভারতীয়-চিত্র আমদানীর অনুমতি দেবেন। সম্ভবতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ২০টি করে মোট ৪০টি ছবি আমদানী করা হবে। গত বছরে ঐ সময়েই মোট ২০টি ছবি দেখানো হয়। ভারতীয়-চিত্র আমদানীর ব্যাপারে উদার মনোভাব দেখানো হবে বলেই মনে হয়। শ্রীযুত দেওয়ান আরও জানান যে, সরকারী কর্ম্মকর্তারা ছাড়াও পাকিস্তানের বেশীরভাগ প্রযোজক, পরিচালক ও পরিবেশক এ-সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে পাকিস্তানের নিজস্ব চিত্রশিল্পের মান উন্নয়ন ও জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার জন্যে ভারতীয় ছবির প্রয়োজন এখনও রয়েছে। লাহোরের চিত্রপ্রতিনিধিদের মধ্যে অবশ্য ভারতীয় চিত্রের

বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব এখনও রয়েছে এবং এখানে বিভিন্ন প্রযোজক ও পরিবেশকদের সঙ্গে তাঁর যে আলাপ-আলোচনা হয় তা' বিশেষ ফলপ্রদ হয় নি। এর পর শ্রীযুত দেওয়ান তাঁর অন্যতম সহযোগী ওয়ালী সাহেবের সঙ্গে করাচী গিয়ে পাকিস্তানের আমদানী ও রপ্তানী বিভাগের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ মিঃ আই, এ খান এবং বাণিজ্য দপ্তরের সহকারী প্রধান সচিব মিঃ ইউসুফ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এঁদের কাছ থেকে তাঁরা জানতে পারেন যে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করা সত্ত্বেও যদিও আজও পর্য্যন্ত আমদানীকৃত ভারতীয় ছবির ভাড়াবাবদ নির্দিষ্ট হারে কোন অর্থ ভারতকে মিটিয়ে দেননি, তবুও এ-সম্বন্ধে যথাশীঘ্র ব্যবস্থাবলম্বন করা হবে এবং ভাড়া হিসেবেই ভারতীয় চিত্র পাকিস্তানে দেখানো হবে।

পাকিস্তানে ভারতীয় চিত্র রপ্তানী বন্ধ করা হবে বলে ভারতীয় চিত্রশিল্পের সাম্প্রতিক ঘোষণায় পাকিস্তানের সরকারী ও চিত্রশিল্প-সংক্রান্তদের মধ্যে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হয়েছে দেখতে পান শ্রীযুত দেওয়ান।

ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান মোশন পিক্‌চার্স প্রোডিউসার্স এশোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ফিল্ম ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ার কাছে পাকিস্তানে ভারতীয় হিন্দী ছবি প্রদর্শনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে—যাতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আগামী বাণিজ্যিক আলোচনার সময় পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। গত বছরের শেষ ছ'মাসে পাকিস্তান সরকার দশটি ভারতীয় চিত্রকে পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানীর ছাড়পত্র দেন। পরে দুটির আমদানী-পত্র বাতিল করা হয়। পাকিস্তান সরকারের শুল্ক বিভাগ যে সমস্ত ভারতীয় ছবি আটক করে রেখেছিলেন তার মধ্যে থেকে 'বৈজু বাওরা', 'ঝাঁসী-কী-রাণী', 'মিঃ সম্পৎ' ও 'শ্রীমতীজী'কে আমদানীর ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ইতি-মধ্যেই এই চারটি ছবি পাকিস্তানে প্রদর্শিত হয়েছে। এ ছাড়াও 'ইলজাম' ও 'ট্যাক্সি ড্রাইভার'ও পাকিস্তানে দেখানো হয়েছে। আরও দুটি ভারতীয় ছবি পাকিস্তানে আমদানী করা হয়—একটি হলো 'জলপরী', অপরটি 'আর পার'। এর মধ্যে পাকিস্তান সরকারের শুল্ক বিভাগ প্রথমোক্তটিকে আটক রেখেছেন এবং দ্বিতীয়টির প্রদর্শনের ব্যাপারেও কতকগুলি অসুবিধা থাকায় এটির মুক্তিলাভ এখনও সম্ভবপর হয় নি

নার্গিস-দেব আনন্দ জুটি

এ. ভি. এম্'-এর পরবর্ত্তী হিন্দী ছবিতে নার্গিস ও দেব আনন্দকে সর্বপ্রথম একসঙ্গে দেখা যাবে বলে প্রকাশ মাদ্রাজেই ছবিটির চিত্রগ্রহণ করা হবে। এটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন আগা জানি কাশ্মিরী এবং পরিচালনা করবেন অনন্ত ঠাকুর। শঙ্কর ও জয়কিষন সঙ্গীত পরিচালনা করবেন। দিলীপকুমারও মাদ্রাজের অপর একটি হিন্দী ছবিতে অভিনয় করবেন। ছবিটির বিস্তারিত সূচী এখনও ঠিক হয়নি। এই বছরের শেষার্দ্ধে এটির চিত্রগ্রহণ সুরু হবে।

টলষ্টয়ের বরাত

টলষ্টয়ের অমর রচনা 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস'-এর চিত্ররূপ দেবার ব্যাপারে হলিউড ও ইতালীর তিন প্রযোজকের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়েছে। ইতালীর চিত্র-প্রযোজক দিনো দ লরেনতিস প্রথমে এটির চিত্রগ্রহণ সুরু করলেও তিনিই এই চিত্ররূপের একমাত্র নির্ম্মাতা নন। মার্কিন প্রযোজক রিচার্ড টড সম্প্রতি চিত্রনাট্য রচয়িতা রবার্ট শারউডকে এই কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনার ভার দিয়েছেন এবং ফ্রেড জিনম্যান এটি পরি-চালনা করবেন। রিচার্ড টড জানান যে এটি তুলতে তাঁর প্রায় ৭,৫০০,০০০ লক্ষ ডলার খরচ হবে এবং শীঘ্রই যুগোশ্লাভিয়ায় এটির চিত্রগ্রহণ সুরু হবে। চিত্রগ্রহণের সময় মার্শাল টিটো যুগোশ্লাভিয়ার ২০,০০০ হাজার কি তারও বেশী সৈন্য বিনা ভাড়ায় তাঁকে দিতে রাজী হয়েছেন বলে টড জানান। এছাড়া বুলগ্রেডের দুটি বিরাট রেঁস্তোরা তাঁরা চিত্রগ্রহণের জন্য পাচ্ছেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ রাখার জন্য যুগোশ্লাভিয়ায় এক সংযোগরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিখ্যাত মার্কিন চিত্র-প্রযোজক ডেভিড ও' সেলজ্‌নিক্ "ওয়ার এ্যাণ্ড পিস" তোলার বন্দোবস্ত করছেন।

তিনি চিত্রনাট্য রচনার ভার দেবেন বেন হেচেটকে। ইতালীয় প্রযোজক লরেনতিস্-এর দলের চিত্রশিল্পীরা সম্প্রতি বহির্দৃশ্যগ্রহণের জন্য ফিনল্যাণ্ড গিয়েছিলেন এবং অপরাপর বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য তাঁরা শীঘ্রই যুগোশ্লাভিয়ায় যাবেন। শেষ পর্য্যন্ত আগে কে ছবিটি তুলবেন এবং কার ছবি আগে মুক্তিলাভ করবে সে সম্বন্ধে সঠিক কিছুই বলা যায় না।

স্ত্রী ও পুরুষ ভূমিকায় একই অভিনেতা

কল্পনা করতে পারেন কি একজন অভিনেতা একটি চিত্রে দুটি বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণ করছেন—তাও আবার একটি পুরুষ ও অপরটি স্ত্রী চরিত্র? ফরাসী অভিনেতা আদ্রে ডেবারকে এই ধরণেরই দুটি বিভিন্ন ভূমিকা রূপায়িত করতে হবে আগামী ফরাসী চিত্র "লে সীক্রেট দ্য সিভেলিয়ার দ'ইয়ন"-এ। ছবিটি রঙীন ক'রে সিনেমাস্কোপে তোলা হবে।

মার্কিন অভিনেত্রীর নতুন ভূমিকা!

জনপ্রিয়া মার্কিন চিত্রনটী এসথার উইলিয়ামস্ শীঘ্রই আমেরিকার বিভিন্ন শহরে সাঁতার শিক্ষার স্কুল খুলছেন এবং তাতে শিক্ষকতাও করবেন। সম্প্রতি তিনি সিনেমাস্কোপে তোলা সঙ্গীতমুখর চিত্র "জুপিটার্স ডার্লিং-এর অভিনয় শেষ করেছেন। আর্থার মুরে এবং ফ্রেড অষ্টেয়ার-এর নাচের স্কুলের অনুকরণেই তিনি এই সাঁতার শিক্ষার স্কুল খুলছেন। এসথারের নিজের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের দিয়েই বিভিন্ন স্কুলে ছেলে-মেয়েদের সাঁতার শেখানো হবে সামান্য খরচায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিত্রগৃহ সংখ্যা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্সিল অফ মোশন পিকচার অরগেনাইজেসন-এর এক খবরে প্রকাশ যুক্তরাষ্ট্রে ১৮,০৫০টি স্থায়ী চিত্রগৃহ আছে। এর মধ্যে ৪,০৫০টি হলো উন্মুক্ত বা ভ্রাম্যমাণ চিত্রগৃহ।

মার্কিন চিত্র-প্রতিষ্ঠানের রুশ-কাহিনী প্রীতি

এম, জি, এম, সম্প্রতি পরলোকগত খ্যাতনামা রুশ সাহিত্যিক দিমিত্রি সার্গেভিচ মেরিজকোভস্কির অমর উপন্যাস 'দি রোমান্স অফ লিওনার্দো দ ভিঞ্চি'র চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন। অতীতের বিভিন্ন ধর্ম্মমতের ওপর একাধিক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার জন্য দিমিত্রি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

চিত্র-সমালোচকের রায়

'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-পত্রিকার চিত্র-সমালোচকের মতে "নিউ ইয়র্কে সম্প্রতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তোলা যে সমস্ত ছবি দেখানো হয়েছে তার মধ্যে নিছক প্রমোদ-চিত্র হিসেবে ওয়াল্ট ডিসনের '২০,০০০ লীগস্ আণ্ডার দি সী'ই হলো সবচেয়ে অদ্ভুত ছবি। জুলস্ ভার্ণের কাল্পনিক বৈজ্ঞানিক কাহিনীর নবতম চিত্রনাট্যই হলো '২০,০০০, লীগস্ আণ্ডার দি সী'—এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বৈচিত্র্য অপেক্ষা কৌতুক-এর অংশই বেশী। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণ করেছেন জেমস ম্যসন, কার্ক ডগলাস, পিটার লরি ও পল লুকাস।

গ্যেটের অমর উপন্যাসের চিত্ররূপ

ওয়ার্ণার ব্রাদার্স গ্যেটের অমর রচনা তাঁদের পরবর্ত্তী চিত্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকা মেট্রোপলিটান অপেরার তারকাদের নিয়েই গঠিত হবে। এই চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় যে সমস্ত শিল্পীদের সম্ভবতঃ মনোনীত করা হবে তাঁরা হলেন: মেরিও লাঞ্জা, জেরোস হাইনস্, এজিও পিঞ্জা, এলেনার ষ্টেবার, জ্যাক প্যালেন্স ও ম্যাডিন কর্ণার। সম্ভবতঃ মেট্রোপলিটান অপেরা নিজেদের সম্পূর্ণ অপেরা দলটিকেই ওয়ার্ণার ব্রাদার্স-এর এই ছবির কাজে লাগাবেন।

ব্রিটেনের চিত্রদর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি

গত বছরের তুলনায় এবছরে ব্রিটিশ চিত্রশিল্পের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে চলেছে। গত বছরে ব্রিটেনের চিত্রশিল্পের অবস্থা এতই সঙ্গীন হ'য়ে ওঠে যে অনেক প্রদর্শক চিত্রগৃহ বন্ধ ক'রে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ব্রিটেনের চিত্রগৃহগুলিতে দর্শক সংখ্যা সম্প্রতি আবার বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পুরোনো দর্শকদের—যাঁরা ছবি দেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তাঁদের আবার ফিরিয়ে

বিচিত্র রূপসজ্জায় শক্তিমান নট বিকাশ রায় :
'জ্যোতিষী' চিত্রে এই রূপে তাঁকে দেখা যাবে

আনার জন্যে চিত্রপ্রদর্শকদের খরচের আর অন্ত নেই। গৃহগুলিতে 'সিনেমাস্কোপে'র প্রবর্ত্তন ও অন্যান্য নতুন ব্যবস্থা করার জন্যই এই দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয়। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি বসাবার খরচও প্রচুর। এ, বি, সি, সার্কিট—যাঁদের কর্ত্তৃত্বাধীনে ব্রিটেনের চিত্রগৃহগুলির দর্শক আসনের এক ষষ্ঠাংশই রয়েছে, তাঁরা নিজেদের চিত্রগৃহগুলিকে 'সিনেমাস্কোপে'র উপযোগী চওড়া পর্দা ও বিশেষ যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত করার জন্যে বছরে ৭,৫০,০০০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করেছেন। অন্যান্য আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের জন্যেও বছরে ৩,০০০,০০০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা ছাড়াও এটা হলো অতিরিক্ত খরচ। এই প্রতিষ্ঠানের ৩৮০টি চিত্রগৃহের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩০০টিতে বিশেষ ধরণের চওড়া পর্দা ও যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। ব্রিটেনের ৪,৫০০টি চিত্রগৃহের মধ্যে প্রায় ১৫০০টিকে 'সিনেমাস্কোপ' বা ঐ-জাতীয় ছবি দেখাবার উপযোগী করে তোলা হয়েছে। এই চিত্রগৃহগুলি যদিও ব্রিটেনের সমগ্র চিত্রগৃহের এক তৃতীয়াংশ কিন্তু এই সমস্ত চিত্রগৃহের দর্শক আসন সংখ্যা ব্রিটিশ চিত্রদর্শক সংখ্যার তিন চতুর্থাংশ।

ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশন স্থাপনের উদ্যোগ

বোম্বাইয়ের কংগ্রেস সভাপতি এবং চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী এস. কে. পাতিল বিজয়ওয়াড়ায় অন্ধ্র ফিল্ম চেম্বার অফ কমার্সের সভ্যদের জানান যে, তিনি আরো কয়েকজন চলচ্চিত্রশিল্প কর্ণধারকে নিয়ে ছবি তৈরীর টাকা জোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই একটি ফিল্ম ফাইনান্স কর্পোরেশন স্থাপনের চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমানে চলচ্চিত্রশিল্প যেরূপ সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠেছে তাতে সরকার ও শিল্পের মধ্যে শুভেচ্ছা থাকা একান্তই দরকার। এই বিষয়ে তিনি সরকার ও শিল্পের সকল বিভাগের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। সেন্সর বোর্ডের কোন কোন সভ্যকে 'মুর্খ, যারা জীবনে কোন ছবি দেখে না' বলে আখ্যাত করে শ্রীপাতিল বলেন, বোর্ডের সভ্য মনোনয়নে একটা ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠি থাকা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে চিত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্কট

পশ্চিমবঙ্গে চিত্র ব্যবসায়ীদের পূর্ববঙ্গে আট লক্ষ এবং ব্রহ্ম দেশে বারো লক্ষ টাকা আটক পড়ায় এক সঙ্কটময় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্ম দেশে ভারতীয় এজেন্ট ছবি আমদানী করে ওখানকার চিত্রগৃহগুলিতে দেখিয়ে ওখানকার যাবতীয় খরচ যায় নিজের কমিশন কেটে নিয়ে বাকি টাকা ভারতে চিত্র-পরিবেশকদের কাছে পাঠাচ্ছিলো। কিন্তু ১৯৫৪ সাল থেকে তাকে আর

ভারতে টাকা পাঠাতে দেওয়া হচ্ছে না। ইউনিয়ন অব বার্মা ব্যাঙ্কের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এ-ব্যাপারে কোন কারণ জানাচ্ছেন না এবং রেঙ্গুনস্থ ভারতীয় দূতও কোন সন্তোষজনক উত্তর পাচ্ছেন না। পূর্ববঙ্গেও ঐ একই অবস্থা। যদিও করাচীস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার এদেশে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন কিন্তু কবে যে তা' এসে পৌঁছবে তার কোন ঠিক নেই।

এই বিষয়ে একটা সুরাহার আশা নিয়ে বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল দিল্লী গিয়েছিলেন। দিল্লীতে তাঁরা অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী বিভাগের পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

ছাত্রদের সিনেমা দেখার সখ

মহীশূর মহারাজ কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগ এক গবেষণা চালিয়ে দেখেন সে রাজ্যের শতকরা একান্নজন ছাত্র সপ্তাহে একবারেরও অধিক সিনেমা দেখে থাকে। কুড়িজন ছাত্রীর মধ্যে এগারজন এবং তিরিশজন ছাত্রের মধ্যে চব্বিশজন ছাত্র নিয়মিত ছবি দেখতে ছোটে। শতকরা বাইশজন দেখে ইংরেজী ছবি, আরও বাইশজন হিন্দী এবং বাকীরা তামিল, তেলেগু ও কানাড়া ছবি দেখতেই ভালবাসে।

সিডনিতে 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকাভিনয়

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী সহরে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র অভিনয় হয় ভারতীয় রাষ্ট্রের গণতন্ত্রদিবস পালন উপলক্ষ্যে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দৌতাবাসের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এটির প্রযোজনা এবং পরিচালনা করেন অষ্ট্রেলিয়াস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের প্রেস এ্যাটাসের স্ত্রী শ্রীমতী মঞ্জু সেনগুপ্তা। এর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন আটজন অষ্ট্রেলিয়াবাসী, একজন পাকিস্তানী, একজন নেপালী এবং চৌদ্দজন ভারতীয়। উপস্থিত অভ্যাগতবৃন্দ সকলেই এই অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা করেন। অভিনয়ে ও উৎকর্ষে এটি পরম উপভোগ্য হয়।

মজার খবর

বাঙ্লার এক বা তদধিক চিত্রপরিচালক 'মা', 'মা' করে ক্ষেপে উঠেছেন। কেউ গোর্কি, কেউ ভড়কি।

বাঙ্লার এক বা তদধিক প্রযোজক 'মীরা', 'মীরা' বলে বাজার গরম করা কামানের সামনে বুক পাততে এগিয়ে গেছেন।

বাঙ্লার এক বা তদধিক পরিবেশক ভ্যাবাকান্তের মতো হাঁ করে চেয়ে আছেন আসছে ভাসানের দিকে।

স্মরণ থাকতে পারে, এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় বাঙ্লার সঙ্কুচিত ছবির বাজারকে সম্প্রসারিত করাবার জন্য বহু উপায় বাৎলে গুটিকয় প্রবন্ধ দীর্ঘকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানের কেউ সে কথায় অবশ্য কর্ণপাত করেন নি। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, সুদূর দক্ষিণ-ভারত থেকে কোন চিত্রব্যবসায়ী এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে সুবৃহৎ একটি কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছেন। বাঙ্লা থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত একটানা ছবি চালাবার জন্যে তিনি প্রাথমিক সমস্ত কার্য সম্পন্ন করেছেন। বহু বেকার বাঙালী ছেলেকে তিনি জীবনযাপনের মতো মাহিনা দিয়ে কর্মে নিয়োগ করেছেন, যতটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে অবশ্য। খাটিয়ে নিয়ে যাঁরা উপুড় হস্ত করেন নি কোনদিন, তাঁরা তল্পি-তল্পা বেঁধে যতদিক থেকে পারা যায়, এই শুভ পরিকল্পনাকে একেবারে বানচাল করে দেবার সৎ-চেষ্টায় বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একজন সৌভাগ্যের উদয় ঘটালে অনেকের নির্দিষ্ট সৌভাগ্য পাছে অস্ত যায় সেই ভয়ে অনেক মার্কামারা দাগাবাজ 'ফিলিম' ম্যাগনেট ঝপাঝপ্ নালের গামলার ভেতরে লাফিয়ে পড়ে দলভারী করতে লেগে গেছেন এরই মধ্যে।

নাটকের ভোলা, মাষ্টারী করতে গিয়ে দু'বার মারা গিয়েছিলেন, বাঙালী চিত্রব্যবসায়ীর কল্যাণে তা এখন বার সাতেককেও হয়তো ছাপিয়ে যাবে। তবে তার চরম যেখান থেকে ঘটবে সেই ষিস্তের গোড়ায় আবার

(শেষাংশ ৬৩ পৃষ্ঠায়)

রাষ্ট্র ও ছায়াছবি

রাজ কাপুর

রাজনীতিকরা অভিনেতাদের সাধারণতঃ পছন্দ করেন না এবং শিল্পীরাও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ইতিহাসে এমন নজীরেরও অভাব নেই।

সমাজের এই দুই উল্লেখযোগ্য শ্রেণীর মধ্যে, অর্থাৎ যাঁরা শাসন করেন এবং যাঁরা আমোদ-প্রমোদ বিতরণের ভার নেন তাঁদের মধ্যে এই যে ঐতিহাসিক বিবাদ, এর মূলে রয়েছে পরস্পরের প্রতি আতঙ্ক। এই আতঙ্কের কারণ হলো কারা বেশী জনপ্রিয় হয়ে পড়ে সে ব্যাপারে উভয়ের অতিরিক্ত সচেতনতা। রাজনীতিকদের আশঙ্কা হলো শিল্পীরা হয়তো তাঁদের অপরিসীম জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সমাজে এক বিশৃঙ্খল জীবনধারার সৃষ্টি করবেন এবং রাষ্ট্রের সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রার পথে তা ক্ষতি-কারক হয়ে দাঁড়াবে। শিল্পীরাও এই ব'লে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন যে, শিল্পকে সত্যিকার কাজে লাগানোর এবং জনপ্রিয় করার পথে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পীদের আশঙ্কা হলো সরকারের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা তুলে দিলে রাষ্ট্র হয়তো শিল্পকে শাসনের বেড়াজালে বেঁধে ফেলবে।

অতীতকাল থেকে রাষ্ট্র এবং রঙ্গমঞ্চের মধ্যে এই অঘোষিত যুদ্ধাবস্থা চলে আসছে। তারপর ছায়াছবির আবির্ভাবের পর ছায়াছবিই রঙ্গমঞ্চের ভূমিকা গ্রহণ করলো এবং জনসাধারণের চিত্ত জয় করায় রাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো।

তারপর সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়ারও সুযোগ হয়েছে এবং রাষ্ট্র ও ছায়াছবি যদি সহস্থিতির আদর্শ মেনে চলে তাহলে তা উভয়েরই সত্যিকার উপকারে আসবে। রাজনীতিবিদ এবং শিল্পীরা এখন এটা উপলব্ধি করেছেন যে, উভয়ে যেমন যথাক্রমে শাসন করার এবং প্রমোদ বিতরণের ভার নিয়েছেন তেমনি বৃহত্তর স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তাঁদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন।

এতকাল আমরা শুধু ছবির কথাই ভেবেছি, রাষ্ট্রের কথা একেবারেই ভাবিনি এবং রাষ্ট্রও সে তার নিজের কথা ভেবেছে চিত্রশিল্পের দিকে নজর দেয়নি। এখন আমাদের চিত্রশিল্প এবং রাষ্ট্র উভয়ের কথা একই সঙ্গে ভাবতে হবে—রাজনীতিক এবং শিল্পীদের সম্বন্ধে সমান-ভাবেই চিন্তার প্রয়োজন। জাতির উন্নতি সাধন হবে উভয়ের একমাত্র লক্ষ্য এবং তার জন্যে রাজনীতিবিদ্ এবং শিল্পীরা নিজেদের সহকর্মী ব'লেই মনে করবেন। নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সমাজের উন্নতির জন্যে তাঁদের কার্য্যাবলীর মধ্যে যে সব মিল থাকবে সেগুলি খুঁজে বার করতে হবে—উভয়ের বৈসাদৃশ্যগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলে চলবে না।

এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব সাদৃশ্যের লক্ষণ আছে সেইগুলিই আমি বলবো। তার মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটি বিষয় তাঁদের মিলনের ভিত্তি হতে পারে। ভারতের মতো দেশে এই পাঁচটি বিষয় সবিশেষ কার্য্যকরী হবে ব'লেই মনে হয়।

আমরা, যাঁরা শিল্পী, এবং যাঁরা রাজনীতিক—বেশ ভালভাবেই জানি যে এদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের মনের ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে পারি এবং তাদের মনের গতিকে ভাল বা মন্দ যে কোন দিকেই ফেরাতে পারি। একটা বিষয়ে আমরা একমত, তা হলো, আমরা যে জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হই সেই জনপ্রিয়তাকে বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী ঠিক পথে চালিত করাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য—হয়তো তা অনেকের সমর্থনলাভ নাও করতে পারে।

একটা বিষয়ে আমরা উভয়েই একমত যে, যে-দেশের রাজনৈতিক স্থৈর্য্য নেই এবং যে-দেশের আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্ব্বল—যেখানে মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য, পোষাক, আশ্রয়, কাজ, শিক্ষা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাটুকু পর্য্যন্ত নেই সেখানে শিল্প এবং সংস্কৃতি কোনমতেই সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারে না। অতএব, নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে, নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব বজায় রেখে আমাদের উচিত যেসব পরিকল্পনা এবং যেসব পন্থা মেনে কাজ করলে জাতি সবল এবং উন্নততর হতে পারে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো। এইসব উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোন কাজ করা উচিত হবেনা, এক কথায় জাতীয় গঠনমূলক কোন কাজের দিক থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি সরে যেতে পারে তেমন কিছু করা আমাদের উচিত নয়।

সেইসঙ্গে এটাও ঠিক যে চিত্তের উন্নতি হতে পারে এমন ব্যবস্থাও হওয়া উচিত, কেননা কোন দেশই বিশ্বের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় না যদি না তাদের শিল্প ও সংস্কৃতির ভিত্তি বেশ দৃঢ়তর হয়। সেইজন্যেই আমাদের উচিত সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ছায়াছবির মাধ্যমে এমন কিছু পরিবেশন করা যাতে সংস্কৃতির উন্নতি অব্যাহত থাকে। এই বাণী সকল বয়সের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেই প্রচারিত হতে পারে—তা তারা শিক্ষিতই হোক আর অশিক্ষিতই হোক।

আমরা উভয়ে এটা বেশ বুঝি যে, সরকার চিত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে যেমন তাঁর শক্তি নিয়োগ করতে পারেন, চিত্রশিল্পের তরফ থেকে আবার গণতন্ত্রী সরকারের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে ততখানি শক্তিই নিয়োজিত হতে পারে। উভয়ের এই শক্তি যাতে পরস্পরের ধ্বংস সাধন না করে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত।

আমরা, রাজনীতিক এবং শিল্পীরা, এ-বিষয়ে একমত যে কতকগুলি কুপ্রভাব থেকে জনগণের নৈতিক মান রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব সরকারেরই সবচেয়ে বেশী। আবার এটাও ঠিক যে, নিয়মশৃঙ্খলামুক্ত স্বাধীন চিন্তা-সমন্বিত সৃষ্টিমূলক কাজের জন্য চারুকলা হিসেবে ছায়াছবির কতকগুলি মৌলিক অধিকার আছে। এ-ব্যাপারে বাইরের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। রাষ্ট্র এবং চিত্রশিল্প উভয়েরই যখন দেশের জনসাধারণের কাছে সমান দায়িত্ব রয়েছে তখন চিত্রশিল্পও সরকারের কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য এবং সরকারেরও কর্তব্য হলো চিত্র-প্রযোজকদের স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশে অন্তরায়ের সৃষ্টি না করা। আমার আন্তরিক বিশ্বাস প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্ম্মী এবং প্রত্যেক চিত্র-প্রযোজক এবং অভিনয়শিল্পী সমাজের হিতসাধনে এবং উভয়ের সাধারণ সংস্থা হিসেবে আমি যে পাঁচটি পরিকল্পনার কথা বললাম তা প্রাথমিক বিবেচ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন।

পরস্পরকে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি এবার সেই কথায় আসা যাক। কিছুকাল আগে অভিনয়শিল্পীদের এক সভায় শ্রীযুত নেহরু শিল্পীদের 'জনগণের কর্ম্মী' ব'লে আখ্যা দেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক কর্ম্মীকে ঠিক ঐ একই আখ্যা দেওয়া যায়, কেননা তাঁদেরও জনসাধারণের মনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। তাঁদের জনসাধারণকে বুঝে নিতে হয় এবং তাঁদের কর্ম্মপন্থার সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের মধ্যে এমনকি প্রতিটি গৃহের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী হিসেবে ছায়াছবিই কি শ্রেয়তর মাধ্যম নয়?

বর্ত্তমানে জাতিগঠনমূলক কাজে দেশের প্রতিটি পুরুষ ও নারীর সমস্যার চিত্র ছায়াছবির মারফৎ ফুটিয়ে তুলে তাদের সত্যকার অবস্থা রাজনীতিকদের বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ছায়াছবির মারফৎ আমরা নিত্যকার সত্য ঘটনাগুলিই মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারি এবং জাতির সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে রাষ্ট্রও দোষত্রুটিগুলির সংশোধন ক'রে নিতে পারেন। ছায়াছবির মারফতই আমরা জনগণের আশা ও আকাঙ্খা, সুখ ও দুঃখ এবং সমস্যা ও তার প্রতিকারের চিত্র নেতৃবৃন্দের সামনে তুলে ধরতে পারি এবং সমাধানের পক্ষে পথ খুঁজে নিতে রাষ্ট্রের পক্ষেও তখন খুবই সুবিধা হবে। জাতির উন্নতিকল্পে কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা রাষ্ট্রের পক্ষে উচিত

হবে সেবিষয়েও আমাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারি। ঠিক সেইভাবেই ছায়াছবিও দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে সেই চিত্রটি তুলে ধরতে পারবে—যাতে সরকারের নতুন নতুন পরিকল্পনার কথা চিত্রিত হয়েছে—সরকার জনসাধারণের উন্নতির জন্যে কি কি করছেন, জনগণই বা সবকারের সঙ্গে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারেন। জনগণকে শিক্ষিত ক'রে তোলার ব্যাপারে এমন একটি কার্য্যকরী মাধ্যমকে কেন্দ্র ক'রে আমরা সরকারকে সাহায্য করতে পারি।

রাজনীতিকদের সঙ্গে সমানভাবে এবং সত্যিকার সহকর্মী হিসেবে ছায়াছবির মারফৎ জাতীয় জীবনের প্রতিটি বিভাগে গঠনমূলক কার্য্যে আমরা সাহায্য করতে পারি। সেই সঙ্গেই অল্প খরচে সুস্থ আমোদ-প্রমোদের উপকরণও জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। অবশ্য, এটা ঠিকই, অন্যান্য দেশে যেমন রঙ্গমঞ্চ, বল-নাচের ব্যবস্থা, বিভিন্ন ক্লাব ইত্যাদি রয়েছে তার পরিবর্ত্তে এদেশে ছায়াছবিই জনসাধারণের আমোদ উপভোগের যে একমাত্র মাধ্যম এ-প্রসঙ্গে সে-কথা ভুললে চলবে না।

এখানে একটা বিষয়ে সতর্কও ক'রে দেবারও আছে। রাষ্ট্র যখন মহৎ উদ্দেশ্যে ছায়াছবিকে কাজে লাগাবার জন্যে চিত্রশিল্পকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবেন—তখন যেন শিল্পের সাধনায় আমরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে না ফেলি। শুধুমাত্র নিষ্ঠাচারী এবং নৈতিক উপদেশ-সমন্বিত আর দেশের নেতারা যা কিছু করেন তারই গুণগান ক'রে প্রচারমূলক ছবি তুলে কোন লাভ নেই। প্রেক্ষাগৃহের সুন্দর রূপালী পর্দ্দাকে পাঠ্য-পুস্তকে পরিণত করা অর্থহীন। রুশিয়াতে পর্য্যন্ত আগের চেয়ে ছবি তোলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আগে যেমন শুধু প্রচারমূলক ছবি তোলা হতো এখন সেখানে শৈল্পিক-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছবি তোলার দিকে খুবই আগ্রহ দেখা গেছে। রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য তা আমাদের করা উচিত, কিন্তু তাই ব'লে আমাদের স্বাধীন চিন্তা বা ক্রিয়াকলাপ বিসর্জ্জন দিয়ে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের 'জো-হুজুর' ব'লে তাঁদের প্রতিটি কথাই মেনে চলা ঠিক হবে না।

দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জাতির সংস্কৃতিকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপকে সক্রিয় সমর্থন করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। বিশেষ ক'রে চিত্রশিল্পের প্রতি রাষ্ট্রের যে কর্ত্তব্য রয়েছে তা অবহেলা করলে চলবে না। চিত্র-শিল্প যে শুধুই শিল্পচর্চ্চা নয়, অন্যান্য ব্যবসায়ের মতো চিত্রশিল্পেও যে বিপুল পরিমাণে অর্থ নিয়োগ করতে হয় এ-জিনিষটি যদি তাঁরা বুঝতে পারেন, তাহলে দেখতে পাবেন, সেদিক থেকেও তাঁদের অনেক কিছু করণীয় আছে। সেই কারণেই সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির ওপর চিত্রশিল্প নির্ভরশীল এবং সেই আর্থিক ভিত্তি যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ছায়াছবির মাধ্যমে আমরা যেসব শৈল্পিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার বাসনা পোষণ করি সেগুলি করার সুযোগ হতে পারে। বিপুল পরিমাণে লাভের আশা না ক'রেও ছবিতে নিয়োজিত অর্থ সম্বন্ধে প্রযোজকদের যাতে নিশ্চয়তা থাকে সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রের কাছ থেকে এইটুকু আশা করা খুবই ন্যায্য, কেননা রাষ্ট্র যখন বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পের প্রসার ও রক্ষাকল্পে শুল্ক-কর বসিয়ে, আয়কর থেকে অব্যাহতি দিয়ে এবং অনুরূপ ব্যবস্থাদি অবলম্বন ক'রে সেইসব শিল্পের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেন ও এ-শিল্পে মূলধন যাঁরা নিয়োগ করেন তাঁদের সহায়তা করেন তখন চিত্রশিল্পকেই বা সাহায্য করবেন না কেন?

জাতীয় শিল্পের ভিত্তিতে ছবির পরিবেশনা এবং প্রদর্শন ব্যাপারে সরকার যদি সত্যিকার কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহলে সেদিক থেকেও চিত্রশিল্পের বহু উপকার হতে পারে। এর ফলে, ছবিতে যাঁরা কাজ করেন এবং প্রযোজনার ব্যাপারে যাঁরা অর্থনিয়োগের ঝুঁকি নেন তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন।

এদেশে তোলা ছবি বিদেশে প্রদর্শনের সুব্যবস্থা সম্বন্ধেও সরকার সাহায্য করতে পারেন। ন্যায্য সুদের বিনিময়ে সরকার প্রযোজকদের ঋণ দিতে পারেন।

চিত্রশিল্পের আর্থিক দিকে এইভাবেই সরকার সাহায্য করতে পারেন।

জাতির জীবনে চিত্রশিল্পের যে-স্থান রয়েছে তা যদি সরকার স্বীকার করে চিত্র-প্রযোজকদের উৎসাহ জোগান তাহলে শিল্পীদের জীবন সম্বন্ধে জনসাধারণের যে ভ্রান্ত ধারণা এবং সন্দেহ রয়েছে তাও দূর হতে পারে। চিত্রশিল্পে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যাপারে একমাত্র সরকারই সাহায্য করতে পারেন এবং তার ফলে ছবির প্রযোজক এবং কর্ম্মীরা শান্তিতে নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন এবং আশা ও উদ্দীপনার মাঝে তাঁদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগও পাবেন।

রাষ্ট্র এবং চিত্রশিল্প উভয়কেই যখন জনসাধারণের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখতে হয় তখন উভয়ে একযোগে কাজ করতে পারবেন না কেন তার কোনই যুক্তি নেই।

মজার খবর

(৫৯ পৃষ্ঠার পর)

নাড়া পড়েছে। রূপ যার অসীম বাণী তার অনন্ত। অসীম আর অনন্তকে নিয়েই যেখানে কারবার সেখানে বাঙালীর ব্যবসায়িক একতাকে দোষ দিলে চলবে কেন!

আদি এবং অকৃত্রিম ঘোষ একদিন বজ্রনির্ঘোষ করেছিলেন ক্যাশ টাকার ব্যবসা হয় তিনি করবেন প্রথম এ রাজ্যে চালু, নয়তো লোকে তাঁর নামে কুকুর পুষতে থাকুক। পুষতেই থাকুক। অবশ্য এখন তাঁর নামে কুকুর পুষছেন বিধিলিপিকার আর একজন কৃষ্ণকায় খর্বাট ডিরেক্টার। মজা হচ্ছে এই খর্বাটকে নিয়ে। জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে সে কিছু মবলক দাঁও মেরে সহযোগীদের পথে বসিয়ে হঠাৎ সাধু-সন্ত হয়ে গেল। ক্ষোভে ছোট বৌ দত্তক নিলেন। জীবনের বিধি নর্মদার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে আইনজীবির মুসাবিদাকরা লিপি-বারতা। ওৎ পেতেছিল এ্যাটম বম্ব—আদি ও অকৃত্রিম ঘোষ ব্রেক হিরোশিমা হয়ে গেলেন। সেদিন বিধিলিপিকারের বাড়ীতে দেখি খর্বাট জীবনমৃত্যুর সম্মুখীন। ঘরের দিকে পা বাড়াতেই ঘেউ ঘউ করে তেড়ে এল প্রহরী—উভয়ে বলে উঠলেন, "রবি, ছি, ভদ্দরলোকের সামনে অসভ্যতা করে না, যাও!"

"ধার-রাম-তালা", "ধা-রুম-তোলা" অথবা "ধর-মত-লা" যে নামেই উচ্চারণ করুন, ধর্মের গন্ধমাত্র পাবেন না। খোদায় মালুম, এই সিধা সড়কের নাম কবুল হয়েছে কিরণশঙ্কর রোড। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট্ নতুন রাস্তা তৈরীর আগে বস্তীগুলোর ওপর ছেড়ে চলে যাবার নোটীশ জারী করে সর্বপ্রথম, ধর্মতলা কিরণশঙ্কর রোডে রূপান্তরিত হলে, আমি হলফ্ করে বলতে পারি, ও-রাজ্যের সমস্ত ফিল্ম বেচাকেনার বাজার রাতারাতি লোপাট হয়ে যাবে।

ধর্ম যেখানে নেই সেখানে 'ফিলিমের' ব্যবসা চলতেই পারে না; আর, ব্যবসার ব্যাপারে বাঙালী একেবারে বলতে গেলে স্বভাব কুলীন। দুটো বাঙালী ব্যবসা করতে হাত মিলিয়েছে শুনলে ভগবানও ঘুমতে ঘুমতে চমকে ওঠেন, কেননা এই হাত মিলানোর দুঃস্বপ্ন দেখলেই তাঁর ভয় হয়। ঘুম থেকে একটু পাশ ফেররার আগেই কোত্থেকে দু'ব্যাটা না জুটে কোন্ এক বিতিকিচ্ছি আদালতের দু'পাশে দাঁড়িয়ে কেবল হেঁকে হেঁকে তাঁকে জোড়া-জোড়া পাঁঠা খাইয়ে তবে ছাড়বে......বলি, হ্যাগা বয়েস তো হয়েছে, না কি, কাঁহাতক কচি-কচি পাঁঠার মাংস সহ্যি হয়! তাও আবার অম্ল-ঘি-তেলে-সারা বাঙালী রান্না। ছি, ভগবান না নারায়ণ। তা, নারাণ ঠাকুরের যে টাকার ঘানি আছে একথা বাপু কে না জানে! এই ঘাণির প্রচণ্ড পেষণে প্রাণের কেষ্ট একদিন ত্রাহি ত্রাহি করতে করতে অণু মকরধ্বজ হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, এসে বিষ্ণুরূপ ধারণ করে তবে সৃষ্টি রক্ষা করলেন। দুগ্গা দুগ্গা; সে যাত্রা দুর্গনাম না করলে ঘানিতে ব্রেক কষতো কে? ব্রেক তো কষলো, তবে তা মাত্তর কিছুদিনের জন্যে—তারপর যখন কষ্লো তখন মরণ কশা কষলো। ভগবান টাকার ঘানি থেকে ক্যাপিটালিষ্ট, স্পিরিচুয়ালিষ্ট নন্। সত্যি বলছি, নারাণ ঠাকুর তুমি মশা পিষে তেল বের কর, তোমাকে কিনা ডোণ্ট্ কেয়ার? সর্দার প্যাটেল যা বছরে পারেন নি, তুমি ১২ ঘণ্টায় তার সব শেষ করে দিলে—ষ্ট্রেট এ্যাকশেশন ক'রে। বিধবা ধার্মিক রাণীর কেয়ার টেকার হয়ে গেলে রাতারাতি!! অদ্ভুত কোয়ালিটি, যাঃ!

বিবিধ অনুষ্ঠান

'উল্কা'র শততম অভিনয় উৎসব

বাংলা নাট্যশালার পুনরুজ্জীবনে আর একটি নাটকের অবদানও নাট্যপ্রিয় জনসাধারণের স্বীকৃতি পেলো। এই নাটকটি হচ্ছে রঙ্‌মহলের 'উল্কা,' তার পরিচালক অর্ধেন্দু মুখার্জি এবং রচয়িতা ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত।

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী এই নাটকের শততম অভিনয় উৎসব অনুষ্ঠিত হলো রঙমহল মঞ্চে। অনুষ্ঠানে পৌর-হিত্য করেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে পরিচালক শ্রীমুখার্জি ও 'উল্কা' নাটকের অভিনয়শিল্পী ও রঙমহলের নেপথ্য কর্মীদের এভারশার্প, ওয়াটরম্যান, সোয়ান, ঝর্ণা কলম ও ধুতি, সার্ট প্রভৃতি পুরস্কার দেওয়া হয়।

অভিনেতা নরেশ মিত্র অনুষ্ঠানের উদ্বোধন প্রসঙ্গে রঙমহলের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকাল সংযোগের কথা উল্লেখ করে "উল্কা"-র সাফল্যের জন্য শিল্পীগোষ্ঠীর চেষ্টাকে অভিনন্দিত করেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, বাঙ্গলার মঞ্চ সমাজের অপরিহার্য অঙ্গরূপে এবং কলা ও রসজগতের দাবীতে চিরকাল টি'কে থাকবে। রঙ্গালয়ের দিক থেকে ভারতে বাঙলা দেশ অগ্রণী; কয়েক যুগের সাধনায় বাঙলা রঙ্গালয়ের একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে; বাঙলার শিল্পী ও নাট্যকারের খ্যাতি ভারত পার হয়ে বিদেশেও পৌঁচেছে। তিনি নাট্যকার ও শিল্পীদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন তাঁরা যেন নতুন ভারতবর্ষের সুস্থ, লাবণ্যযুক্ত জীবনকে ভিত্তি করে নাটক রচনা ও অভিনয় করেন তাতে ভারতের জনসমাজের কল্যাণ হবে। "উল্কা"-র পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি শিল্পীগোষ্ঠীর টিম-ওয়ার্কের প্রশংসা করেন।

সভাপতি ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাঙলা রঙ্গালয়ের দুর্দিনে 'উল্কা" যে রসিকচিত্তকে রসসিক্ত করেছে তা কম কথা নয়। তিনি বলেন, রঙ্গালয় উঠবে না, কারণ যে দেশে নাটকের ঐতিহ্য আছে সেখানে রঙ্গালয় থাকবেই। প্রসঙ্গগতঃ তিনি লণ্ডন ও প্যারিসের রঙ্গালয় সম্পর্কে ছাত্রাবস্থাকালে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রঙ্গালয় বাঙ্গলার গৌরব; ভারতের আর কোথাও তা নেই। বাঙ্গলার সাধারণ রঙ্গালয়ের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ আশী বছরের ইতিহাস। বাঙ্গলায় যেকালে সবদিক থেকে বিফলতা দেখা দিয়েছে, রঙ্গালয় তখন সকলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে। কলকাতায় যে চারটি নাট্যশালা চলছে তা গৌরবের বিষয়। তিনি বলেন, বিদেশীরাও তার প্রশংসা করে যান।

অনুষ্ঠান শেষে 'উল্কা' নাটকটি পরিবেশিত হয়। প্রথম দিনের অভিনয়ের তুলনায় বর্তমানের অভিনয় যে বহুলাংশে উন্নত তা' বলাই বাহুল্য।

নিখিল ভারত আধুনিক সঙ্গীত সম্মেলন

সরোজ সেনগুপ্ত ও বারিন ধরের ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি কলকাতায় ইডেন গার্ডেনে রনজি ষ্টেডিয়ামে দুদিন ব্যাপী এক সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সম্মেলনকে নিখিল ভারতীয় কিংবা একান্তভাবে আধুনিক সঙ্গীতের বলে অভিহিত করা না গেলেও এই অনুষ্ঠান সারা সহরেই বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করে এবং প্রচেষ্টা হিসেবেও প্রশংসিত হয়েছে। দু'দিনের এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন বোম্বাই চিত্রজগতের প্রখ্যাত প্লে-ব্যাকশিল্পী লতা মঙ্গেশকর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তালাত মামুদ, মহম্মদ রফি, গীতা রায়, মান্না দে প্রভৃতি এবং বাংলার সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, কৃষ্ণচন্দ্র দে, যুথিকা রায়, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, প্রশান্তকুমার, তরুণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী ঘোষাল প্রমুখ প্লে-ব্যাক এবং রেকর্ড ও রেডিও শিল্পীরা। তার মধ্যে বিশেষ ক'রে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও মহম্মদ রফির গান শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। শ্রীমতী সিতারার ক্লাসিক্যাল নৃত্য এবং শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় ও অজিত চট্টোপাধ্যায়ের হাস্যকৌতুক অনুষ্ঠানটিকে আরো উপভোগ্য করে তোলে।

'প্রফুল্ল' নাটকাভিনয়

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক রিক্রিয়েশান এসোসিয়েসানের সভ্যগণ তাঁদের বসন্ত-উৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে সম্প্রতি "রঙমহল" রঙ্গমঞ্চে মহাকবি গিরিশ-চন্দ্রের "প্রফুল্ল" নাটকখানি পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সাফল্যের সঙ্গেই অভিনয় করেন। প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেতৃ যথাযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বিশেষ করে যোগেশ ও রমেশের ভূমিকাভিনেতা দু'জন। পার্শ্বচরিত্র-গুলির অভিনয়ও মনোজ্ঞ হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দলিল-চিত্র প্রদর্শনী

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের সাতখানি দলিল চিত্র দেখিয়েছেন সাংবাদিকদের কাছে। চিত্রগুলির কয়েকখানি নির্ম্মিত হয়েছে ১৯৫৪ সালে আর কয়েকখানি নির্ম্মিত হয়েছে এই বছরেই। "ছুটির কয়েক-দিন" চিত্রে বাঙলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখান হয়েছে, "মাটি থেকে সোনা" চিত্রে দেখান হয়েছে জাপানী প্রথায় ধান্য উৎপাদনের পদ্ধতি, আদি-বাসীদের উন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টার পরিচয় দেওয়া হয়েছে "প্রতিবেশী"-চিত্রে—চা-বাগান অঞ্চলে ওরাঁও কুলীদের জীবনই এই চিত্রের অবলম্বন। উন্নতিশীল সেচ পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে "জল চাষের প্রাণ"-চিত্রে, সরকারের জমিদারী উচ্ছেদের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে "জমিদারী বিলোপ"-চিত্রে, "সোনালী রেশম"-চিত্রে দেখানো হয়েছে রেশম চাষের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আর ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে "জল থেকে সোনা"-চিত্রে। চিত্রগুলিতে বর্ণিত তথ্য ও ঘটনাগুলি খুবই প্রয়োজনীয়, সন্নিবিষ্ট কাহিনীগুলিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে ভাল হ'ত।

'বঙ্গে বর্গী' নাট্যাভিনয়

সম্প্রতি টাটা রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যগণ প্রতিষ্ঠাতার বার্ষিক স্মরণ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'বঙ্গে বর্গী' নাটকাভিনয়ে সমবেত দর্শক-শ্রোতাবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করেন। অভিনয় মোটামুটি প্রশংসা ও সাফল্য অর্জ্জন করে।

বঙ্গীয় নাট্যপরিষদ

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় নাট্য পরিষদের উদ্যোগে ২৫, ডিক্সন লেনে এক সাংবাদিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে। এই পরিষদ বাংলার অপেশাদার নাট্য সংস্থাগুলির একটি সম্মিলিত মিলন কেন্দ্র। এই সভায় অপেশাদার নাট্য উদ্যমের প্রসার ও প্রবৃদ্ধির পথে প্রধান দুটি অন্তরায় অর্থাৎ ড্রামাটিক পারফরমেন্সেস্ এ্যাক্ট, ১৮৭৬ এবং বেঙ্গল এ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স এ্যাক্ট, ১৯২২ এই দুটি প্রত্যাহার ও বাতিল করার দাবী জানানো হয়। এই দুটি আইন প্রকৃত রসোত্তীর্ণ নাটক রচনা, নাট্যপ্রচেষ্টা ও নতুন অভিনয়শিল্পী তৈরীর পক্ষে যে বিরাট বাধার সৃষ্টি করছে সেদিকে সভাপতি ডক্টর দাশগুপ্ত ও প্রধান বক্তা নাট্যকার-অভিনেতা তুলসী লাহিড়ী নাট্যরসিক জনসাধারণ এবং পত্রপত্রিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পরলোকে অভিনেত্রী নীহারবালা

সম্প্রতি পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীকুলরাণী শ্রীমতী নীহারবালা অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৫৬ বছর হয়েছিল। নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী অরবিন্দ আশ্রমের নলিনীকান্ত সরকারের কাছ থেকে এক পত্রে শ্রীমতী নীহারবালার মৃত্যু সংবাদ পান।

আর্ট থিয়েটার লিঃ পরিচালিত ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-কালে শ্রীমতী নীহারবালা খ্যাতির অধিকারিণী হন। তিনি 'কর্ণার্জুন' নাটকে নিয়তির ভূমিকায় অভিনয় দক্ষতার জন্য দর্শকদের অভিনন্দন লাভ করেন। তিনি অবশ্য ঐ নাটকে কৃষ্ণের ভূমিকায়ও অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভায়' নীরবালার ভূমিকায় সু-অভিনয় ক'রে তিনি স্বয়ং গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ লাভ করেছিলেন। 'ষ্টার' থিয়েটারের পর তিনি মনোমোহন থিয়েটারে যোগদান করেন। এখানে 'গৈরিক পতাকা' প্রভৃতি নাটকাভিনয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন। তারপর তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করে সেখানে কিছুকাল অভিনয় করেন। (বর্তমানে শ্রীরঙ্গম) রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হলে তিনি ঐ সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। এখানে তিনি বিভিন্ন ধরণের বহু নাটকে প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। বর্তমান শ্রীরঙ্গম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে শিশির-সম্প্রদায় কিছুকাল নাট্যনিকেতনে অভিনয় করেন। তখন এখানে মহাপ্রস্থান নামে সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত প্রণীত একখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু প্রথম রজনীর অভিনয়কালে, দৃশ্যপটে আগুন লাগায় শ্রীমতী নীহারবালা গুরুতররূপে আহত হন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) থেকে আরম্ভ করে বিগত ও বর্তমানকালের সকল শ্রেষ্ঠ অভি-নেতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তিনি নৃত্য, গীত ও অভিনয়ে সমান দক্ষ ছিলেন।

শ্রীমতী নীহারবালা রঙ্গমঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ করে ১৩।১৪ বছর পূর্ব্বে পণ্ডিচেরীস্থিত শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যান। তদবধি তিনি সেখানেই বাস করেছিলেন। তাঁর এক ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ ও দুই ভ্রাতুষ্পুত্র বর্তমান।

পুস্তক পরিক্রমা

ময়ূর মেখলা : রবীন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : প্রিণ্ট হল, ৪৪-এ-বি পদ্মপুকুররোড, কলিকাতা-২০। দাম : দু' টাকা।

ময়ুর মেখলা ছোট গল্পের বই। এতে এগারটি ছোট গল্প স্থান পেয়েছে। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত। সেই জন্যে একেবারে রসোত্তীর্ণ রচনা আশা করা অন্যায় হবে। কাঁচা হাতের হলেও লেখার মধ্যে বেশ দরদ আছে বলে মনে হয়। ছোট গল্পের একটি বিশেষ এবং প্রধান গুণ হচ্ছে লেখার মধ্যে সংযতভাব—এই গুণটি সম্বন্ধে লেখক বেশ সচেতন। গল্পগুলির মধ্যে লেখকের সংযতভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে এবং শিল্পরীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রত্যেকটি গল্পকে ছোটগল্প বলা যেতে পারে। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হিসাবে বইটি ভালই হয়েছে এবং নামটিও বেশ কাব্যিক।

বইখানির অঙ্গসজ্জা এবং প্রচ্ছদপট সুরুচির পরিচায়ক। ছাপা ঝরঝরে তবে নির্ভুল নয়, বাঁধাই সুন্দর।

বাংলা বর্ষলিপি : ১৩৬১ সন : সম্পাদক : শিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী—প্রকাশক : সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-২৯। দাম : আড়াই টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি বাংলাভাষায় "ইয়ার বুক"। এতে ভারতবর্ষের সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে এবং নয়া ভারতের পরিকল্পনাগুলির বিবরণ সহজ ও সুন্দর ভাষায় এতে দেওয়া হয়েছে। এক কথায় সকল জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিতভাবে সঙ্কলিত হয়েছে। এতে সকলে যে উপকৃত হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এরূপ একখানি পুস্তক সম্পাদনার জন্য সম্পাদক নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। বাংলা বর্ষলিপি ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য সাধারণ লোকের কাছে সমাদর লাভ করবে নিজগুণে। বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

বর্ত্তমানে প্রদর্শিত 'আজাদ' চিত্রে দিলীপকুমার ও মীণা কুমারী

চীনা নাটক ও সঙ্গীত

★ ★ ★

চীনা নাটকে নৃত্য ও সংগীত অপরিহার্য্য বিষয়। চীনা নাটকের গোড়াপত্তন হয় খৃষ্টপূর্ব্ব যুগে চাও সাম্রাজ্যের সময়ে। অষ্টম শতাব্দীতে সম্রাট মিঙ হেয়াং নট-নটী নিয়ে একটি স্বাধীন নাট্য সম্প্রদায় গঠনে সাহায্য করেন। তিনি ঐ সকল নট-নটীকে "মুক্তাবনের নবীন বাসিন্দা" বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু চীনে সাহিত্য-সমৃদ্ধ স্থায়ী নাটক রচিত হয় কন্‌ফুসাসের বংশধর কোয়াং তাও-ফুর রাষ্ট্রদূতরূপে মংগোলিয়া পরিভ্রমণ এবং কুবলাই খানের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পরে। মোগল সাম্রাজ্যকালে ৫০ বছরের মধ্যে পাঁচ শতাধিক নাটক রচিত হয়। ঐ গুলির মধ্যে একখোটি নাটক সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে নির্ব্বাচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকের নাম "পশ্চিম কক্ষের রোমাঞ্চ"। ১৬টি দৃশ্যের এই নাটকটীর রচয়িতা উয়াং শিহ-ফুয়ের ভাষা "তুষারের মত সুন্দর ও চন্দ্রলোকের মত মধুর" বলে বিবেচিত হয়েছে। নাটকটীর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, একজন বিদগ্ধ যুবকের সঙ্গে একটি সুন্দরী যুবতীর প্রেমের উপাখ্যান।

চীনা থেকে আগত সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিগণ ক'লকাতায় বিভিন্ন শ্রেণীর নাটক অভিনয় করেছেন। উচ্চাঙ্গ শ্রেণীর নাটকসমূহের মধ্যে একটি "পশ্চিম পরিভ্রমণ" নামক সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসের ভিত্তিতে অভিনীত হয়। তাতে হুয়েং সাংয়ের ভারত পরিভ্রমণের সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী অর্থাৎ তাঙ সাম্রাজ্যের শেষ ভাগ থেকে মিঙ সাম্রাজ্যের সকল অবস্থা বিবৃত হয়েছে। বানর রাজ সান উ-কুঙ ঐ নাটকের জনপ্রিয় নায়ক। অপর একটি উচ্চাঙ্গ নাটকে সুঙ বংশের যোদ্ধা রাজা সিয়াংয়ুর রণক্ষেত্রে শত্রু পরিবৃত অবস্থায় করুণ দৃশ্যাবলী সংযোজিত আছে।

গণ নাটকসমূহের মধ্যে আমাজন সুন্দরীর দ্বন্দ্বযুদ্ধে একজন নাইটকে জয় করে তাকে পতিত্বে বরণ এবং এক-জন দাম্ভিক ব্যক্তির সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ অন্যতম।

সম্প্রতি চীনা সাংস্কৃতিক প্রেতিনিধিদল ক'লকাতায় যে আসরের আয়োজন করেন তাতে চীনা মার্গ সঙ্গীতের বিপুল সম্পদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেল।

চীনা সঙ্গীতের ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। বর্তমান হোনান প্রদেশের আনিয়াং সহরের কাছে চীন ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন রাজবংশ (খৃষ্টপূর্ব ষোড়শ থেকে একাদশ শতাব্দী) শাং নৃপতিদের রাজধানী ছিল বলে জানা যায়। সেখানে খননকার্য্যের ফলে কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র পাওয়া গেছে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিখ্যাত দার্শনিক কন্‌ফুসিয়স্ যে ধর্ম-সঙ্গীত-সংগ্রহ সম্পাদনা করেন তাতেও তৎকালীন রাজ দরবারের সঙ্গীত এবং লোক সঙ্গীতের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাং (খৃঃ অঃ ৬১৮—৯০৭) রাজত্বকালে বিচিত্র সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভগবান বুদ্ধের বাণী প্রচার করা হতো এবং তাঁর জীবন-কথাও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বিবৃত করা হতো বলে জানা যায়। এরও অনেক আগে থেকেই বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান করে ধর্ম-কাহিনী বিবৃত করা চীনে প্রচলিত ছিল।

এই আধুনিককাল পর্য্যন্ত ধর্ম-সঙ্গীতের অনুষ্ঠান ঐতিহ্যানুগতভাবেই প্রচলিত ছিল। চীনাদের বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যাধিক্য রীতিমত বিস্ময়ের। চীনা সঙ্গীত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যা ১৩০ বলে নির্দেশ করে থাকেন। চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের কয়েকজন সদস্য চীনা বাঁশী এবং আরও কয়েক রকমের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে শোনান।

চীনা মার্গ-সঙ্গীতের যে ক'জন স্রষ্টা ও ধারকের গান অনুষ্ঠান-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছিল তাঁদের মধ্যে পো ইয়া, ওয়াং উয়েই, লি পো ও ইউয়ে ফেই-এর নাম করা যেতে পারে। পো ইয়া খৃষ্টের জন্মের এক সহস্রাব্দ বছর পূর্বে চৌ বংশের রাজত্বকালে সঙ্গীত রচনা করে গেছেন। তাঁর সঙ্গীতে চীনের গগনভেদী পর্বত আর দুরন্ত ঝরণার অন্তর্বাণীই যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। পো ইয়া বীণার জন্যই সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালের সঙ্গীতজ্ঞগণ তাকে বাঁশীতে রূপ দিয়েছেন। সাংস্কৃতিক দলের সুম য়ু-তে বাঁশীতেই পো ইয়ার সঙ্গীত-রচনা শোনান।

ওয়াং উয়েই তাং-বংশের (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী)

রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। তাঁর রচনা সেই দুর্দিনের ভয়াবহ অস্ত্রের সংঘর্ষ আর সৈন্যদের শঙ্কাই যেন ধারণ ক'রে আছে। লি পো নবম শতাব্দীর লোক। তাঁকে এখনও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিরিক-কবি বলে গণ্য করা হয়। তাঁর সঙ্গীতে মনের কোমলতা, প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা যেমন অনুভব করা যায়, তেমনি নির্জন মুহূর্তের "নষ্ট্রালজিয়াও" মনকে আবিষ্ট করে তোলে।

উইয়ে কেই সুং (খৃঃ অঃ ৯৬০—১২৭৬) রাজত্বকালে বীরশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক-মনের দুর্দম আশা ও উদ্দীপনাই তাঁর সঙ্গীতের বিশিষ্ট্য।

চীনে প্রায় স্মরণাতীত কাল থেকে মার্গ সঙ্গীতের ঠিক পাশাপাশি লোক সঙ্গীতের ঐতিহ্যও প্রবাহমান আছে। সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গীতজ্ঞ সদস্যগণ ক'লকাতার কয়েকটি অনুষ্ঠানে চীনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও কালের লোক-সঙ্গীত গেয়ে শুনিয়েছেন। দুরন্ত বিস্তৃত মাঠ, বসন্তের প্রাণোচ্ছল উৎসব, শরতের আনন্দ, হাড়ভাঙা খাটুনি আর হাত-পা বিছিয়ে বিরামের আগ্রহ চীনা সঙ্গীতের বিষয়বস্তু—কিন্তু সর্বোপরি আছে মানুষের সঙ্গে মানুষের একাত্মতা কামনা। এটা ভারতের লোক-সঙ্গীতেরও একটা উজ্জ্বল দিক, আর শুধু ভারত কেন বোধ করি সকল দেশের লোক-সঙ্গীতেরই এ এক মূলসূত্র।

ইতিহাসের কোন এক অজানিত সূত্রে চীনা লোক-সঙ্গীতের এই মানবিক আবেদন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলে গেছে। মহাকবি কালিদাসের রচনার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে চীনা প্রেম-গীতির সুর কানে এলেই ফিরে ফিরে তাঁদের মহাকবির সেই বিখ্যাত শ্লোকগুলিই মনে আসবে। এখানে একটি হাজাখ লোক-সঙ্গীত উল্লেখ করা হ'লো। প্রেমিকার প্রথম দর্শনে রোমাঞ্চিত প্রেমিকের মনে হলো—

হাজার হাজার সুন্দরী আমি দেখেছি
কিন্তু তোমার মত কেউ নয় :
সকালে মেঘের ফাঁকে সূর্য যেমন
ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে
তোমার রং তেমনি উজ্জ্বল ;
সদ্য ফোটা ফুলের চাইতেও
তুমি সুন্দর ;
তোমার মুখের কথা যেন
সুরভি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ;
মুক্ত বাগিচার পাতার আড়ালে
বুল্‌বুলি গান গেয়ে ফেরে,
—তুমি তাই গো, তুমি তাই ॥

সিংঘাই অঞ্চলের একটি লোক-সঙ্গীতের ভাবার্থ এখানে দেওয়া হলো। প্রেমিকা বহু দূরদেশে, তার জন্য প্রেমিকের আকুতি শোনা যায়—

বহু দূর, বহু দূরে দেশে
এক সুন্দরী মেয়ে আছে,
যারা তার দোরের পাশ দিয়ে যায়
সতৃষ্ণ নয়নে তারা
বারবার ফিরে চায়।
আমার যা আছে সব ফেলে দেব
যদি সেই দূরের মেয়ের সঙ্গে
ভেড়া চড়াতে যেতে পাই।
আহা, তবে রোজ তার
রক্তিম গাল আর তার পোষাকের
সোনালী কাজ দেখে মুগ্ধ হই।

সিংকিয়াং প্রদেশের আর একটি লোক-সঙ্গীতে এই আকুতি আরও করুণ হয়ে উঠেছে—

তারিম নদীর ধারা ব'য়ে যায় ;
নিঃসঙ্গ হাস আকাশে
বৃত্তাকারে ওড়ে ;
গো-ধূলি হ'য়ে এলো
—তোমার দেখা নেই।
রাত ঘন হ'য়ে আসুক, ভোর হোক
তবু তোমার পথ চেয়ে থাকি।
আহা ভেড়ার পাল মাঠে
ঘুমিয়ে পড়েছে,
দূর পাহাড়ে শুধু এক সঙ্গীহীন
লণ্ঠন জ্বলছে।

বঁধু, রাত ঘন হয়ে আসুক, ভোর হোক
তবু তোমার পথ চেয়ে রইবো।

উনান্ প্রদেশের একটি লোক-সঙ্গীত শুনুন্। প্রেমিক প্রেমিকার কামনায় উন্মনা হ'য়ে উঠেছে। তার মনের কথা এই—

পাহাড়ের ওপরে যখন চাঁদ ওঠে
ভাবি, তুমি বুঝি
ঐ দূর পাহাড়ে আছো।
সখি, তুমি চাঁদের মত পাখা মেলে
আকাশে ভেসে বেড়াও।
পাহাড়ের নীচে ঝরণার জল দেখো,
কী স্বচ্ছ।
পাহাড়ের ওপরে চাঁদের আলো পড়লে
কেবলি তোমার কথা মনে আসে।
এখন তো নীচে থেকে হাওয়া
বইছে—
তোমাকে কত ডাকছি,
তা কি তুমি শুনতে পাও?

সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের অনুষ্ঠান-সূচীতে এমন আরও অনেক ভাবের লোক-সঙ্গীত আছে। মাঠের ফসল পেকে উঠেছে, চাষীর শ্রমের ফল এত দিনে সোণা হ'য়ে উপচে পড়ছে। সারাদিন ধ'রে তারা মুঠো মুঠো সোণা ঘরে তুলেছে। এখন বিশ্রামের সময়। আকাশ মেঘশূন্য, নীল। চাঁদ উঠেছে। মনের আনন্দে খোলা মাঠে দল বেঁধে বসেছে। তারা গান গাইছে, আনন্দ করছে—তার বাধা নেই, বুঝি শেষও নেই।

নবীন চীনের জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে চীনের সুপ্রাচীন সঙ্গীত ঐতিহ্যেও নব-চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। সুর-স্বর-সঙ্গতি ও ভাবে চীনের সঙ্গীত আজ নব-রূপ লাভ করেছে, বিশেষজ্ঞের আসন ছেড়ে আজ সে দেশের গাইবার উপযোগী হ'য়ে উঠেছে। জাতীয় ঐক্য দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে সঙ্গীত কলাকে সাফল্যের সঙ্গে নিয়োজিত করা হয়েছে। নতুন সুর অর্কেষ্ট্রার পক্ষেও খুবই উপযোগী। ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সময়ে কবি অতুলপ্রসাদ সেন যে গান রচনা করেছিলেন সুর ও ভাবের দিক থেকে তার সঙ্গে চীনের নতুন গানের অনেকখানি মিল আছে।

সঙ্গীত জগতে এই নতুন আন্দোলনের সূচনা করেন সিয়ন সিং-হাই। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'পীত নদীর গান' চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের অনুষ্ঠান-সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। জাতীয় মুক্তির জন্য চীনা জনগণ যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল এই গানের মধ্যে তারই মর্মকথা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের পূর্বে পীত নদীর অববাহিকা জুড়ে যে পরম শান্তি বিরাজ করতো প্রথম দিকে তার প্রশান্ত বর্ণনা। ঠিক এর পরই পাওয়া যায় শান্তিকামী জনগণের অপরিসীম দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগের মর্মস্পর্শী বিবরণ। অবশেষে দেখি, তাদেরই মরণপণ সংগ্রামে জাতির মুক্তি। জাতির এই অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রতীক যেন পীত নদীর রুদ্র স্রোতধারা। তাই এর সার্থক নাম 'পীত নদীর গান'।

সমগ্র চীন দেশ জুড়ে আজ পুনর্গঠনের কাজ চলছে। এই জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে জনগণকে অনুপ্রাণিত করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন লোক সঙ্গীতের সুর অনুকরণে নতুন নতুন গান রচনা করা হয়েছে। সিনকিয়াং, মঙ্গোলিয়া ও অপর কয়েকটি অঞ্চলের এমনি ধারা সঙ্গীত সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের অনুষ্ঠান সূচীতে ছিল।

এঁদের কণ্ঠে আরও একটি বিশেষ গান উল্লেখযোগ্য। এর নাম 'ভারতের প্রতি' রচনা করেছেন ইউয়ান সুই পো এবং সুর দিয়েছেন চ্যাং উয়েন-কাং। গানটির ভাবার্থ এই:

কী আশ্চর্য সুন্দর সে দেশ
তার সবখানে সবুজ কার্পেট বিছানো
গোলাপগুলি গোলাপদানির মতই বড়।
তরুতলে চাঁদের আলোয়
ময়ূরের পেখম ঝিকমিকিয়ে ওঠে।
চির বসন্তের দেশ,
সম্পদ ও সৌন্দর্যের দেশ॥
হাজার শহীদের তাজা খুনে
তার মাটি উর্বরা,
তারা সব দুঃসাহসী, দৃঢ়চেতা
আমাদের ভাইদের মতই।

দু' হাজার বছরের
মৈত্রী আমাদের
কোনোকালে শিথিল হবে না ॥
পাহাড় সে যত উঁচু হোক
ছিয়ানব্বুই কোটি ভাইয়ের
সহ-স্থিতি ভেঙ্গে দিতে
কিছুতে পারবে না
—এই নতুন নিশানা দুনিয়া দেখুক ॥
উত্তুরে হাওয়া বও,
আরো জোরে বও
আমার গানে পিকিংয়ের শুভেচ্ছা সম্প্রীতি
ব'য়ে নিয়ে যাও—
যেখানে গঙ্গার ধারে
হাওয়ায় তাল-নারকেলের পাতা
ঝিরঝিরিয়ে কাঁপে,
সারা বছর ফুল ফোটে ॥

চীনে বহুকাল ধ'রে নৃত্যের প্রচলন রয়েছে। শত শত বছর ধ'রে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে চীনা নৃত্যের উৎকর্ষ অব্যাহত রয়েছে। চীনে প্রত্যেক অভিনেতা গাইতে ও নাচতে জানবেন সবসময় এইটাই আশা করা হয়। চীনের পল্লী অঞ্চলে উদ্দীপনাময়ী গণনৃত্যের প্রচলন আছে। অবশ্য অতীতকালে চীনের খুব অল্প-সংখ্যক শহরবাসীই জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাধীন নৃত্যকলার বিষয় অবগত ছিলেন। আশার কথা এই যে, বর্ত্তমানে এইরূপ অজ্ঞলোকের সংখ্যা চীনে প্রায় নেই বললেই চলে।

চীনাগণতন্ত্র থেকে আগত সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ ভারতীয়দের তাঁদের নির্ব্বাচিত নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন। চীনের একটি উচ্চাঙ্গের নৃত্যকলার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো দেবকন্যার সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার। ফুলের রাণী দেবকন্যা শিষ্য পরিবৃতা তথগতের ওপর পুষ্প-বৃষ্টি করার সময়ে অবগত হন যে, বিমলা কীর্ত্তি বৈশালী নগরীতে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। ঐ সংবাদ পেয়ে দেব-কন্যা ও তাঁর ফুলসহচরিগণ সুমেরুর ওপর দিয়ে উড়ে বৈশালীতে পৌছন এবং সেখানে পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকেন।

চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল আরও কতকগুলি নৃত্য প্রদর্শন করেন যাদের উপপাদ্য বিষয় হলো রণোদ্যম। উইঘুর জাতীয় তরবারী নৃত্য ও দামামা নৃত্য উক্ত পর্য্যায়ে পড়ে। প্রাচীন চীনে দ্বিফলাযুক্ত তরবারীকে পবিত্র অস্ত্র-রূপে দেখা হতো। সেটি সুদৃঢ় চরিত্র ও মহান উদ্দেশ্যের দ্যোতক ব'লে পরিগণিত হত। উইঘুরের যুদ্ধজয় ও অন্যান্য উৎসবে ছেলেমেয়েরা সমবেতভাবে দামামা সহযোগে যে নৃত্য করে তাই দামামা নৃত্য নামে অভিহিত হয়।

দৈনন্দিন কার্য্যাবলী এবং পারিবারিক জীবনধারা অবলম্বনেও কয়েকটি চীনা নৃত্য গড়ে উঠেছে। একটি নৃত্যে দেখা যায় যে, তাকে ঘাড়ে করে পাহাড়ের সানুদেশে পুষ্প সুশোভিত পীচ বৃক্ষ শ্রেণীর ধারে নিয়ে যাবার জন্য জনৈক ক্ষুদ্র বালিকা পিতামহকে অনুরোধ জানাচ্ছে। অপর একটি নৃত্য, একদল বালিকা বসন্ত সমাগমে পার্ব্বত্য পথ ধরে বন ও নদী পার হয়ে অবশেষে চা-পাতা আহরণের জন্য সবুজ পাহাড়ে আরোহণ করল। ফেরবার পথে তারা সকৌতূহলে প্রজাপতি ধরতে লেগে গেল।

অনেকগুলি চীনা নৃত্যেই পৃথিবীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। দক্ষিণ সান্‌সির 'পদ্মপুষ্প নৃত্য' এই শ্রেণীর একটি অতি সুন্দর নৃত্য। উক্তনৃত্যের কমনীয় গতির সাহায্যে ঐ অঞ্চলের সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি উদ্‌ঘাটিত হয়। নৃত্যটির সঙ্গে এইরকম সঙ্গীত সংযোজিত হয়:—

সবুজ হ'ল জল, আর আকাশ হ'ল নীল,
পদ্ম ফুটিছে, উচ্চে সূর্য্য মুখ চাহি,
গন্ধ তা'র দূরে বায় বাতাসের সনে।
মোদেরও মাতৃভূমি পদ্মপুষ্প সম—
মহান, উজ্জ্বল আর মনোমুগ্ধকর।

চিত্রবাণী প্রেস, ১৮, হাজরা লেন, কলিকাতা-২৯ হইতে নিতাই চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং চিত্রবাণী কার্য্যালয়, ৫, হাজরা লেন, কলিকাতা-২৯ (ফোন: সাউথ ৩২৭৩) হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদনা ও পরিচালনায় : গৌর চট্টোপাধ্যায় এম এ
সম্পাদনায় সহযোগী : লালচাঁদ দত্ত
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-সজ্জায় : রামকৃষ্ণ দত্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ ও বিজ্ঞাপন-সচিব : নিতাই চট্টোপাধ্যায়
বিজ্ঞাপনে সহকারিতায় : গৌরবরণ ভট্টাচার্য্য

—চিত্রবাণী—

সূচীপত্র

কার্ত্তিক, ১৩৫৯

স্বর্গতা প্রভা দেবী— ৩
সম্পাদকীয়-- ৫
নতুন ছবি— ৭
অনিবার্য্য ; শ্যামলী ; পল্লীসমাজ ; বিন্দুর ছেলে ; ভুলের শেষে ; কপালকুণ্ডলা ; মহিষাসুর বধ ; নেভার টেক নো ফর এ্যান আন্সার ষ্টোরী অফ্ রবিনহুড্
হলিউড ডায়েরী— ১৩
ব্রিটেন থেকে— ১৬
বোম্বাই-বার্ত্তা— ১৭
কলকাতার খবর ২৬
চার্লি চাপলিনের কর্ম্মপদ্ধতি— ২৯
আকাশবাণী—বেতারবন্ধু ৩২
রঙীন ছবির হুজুগ—বিমল রায় ৪১
নতুন নাটক— ৪৪
কেরাণীর জীবন ; বড়বউ
অথ "কুক্কুট-আহব" দর্শনান্তে
রাজা ভড়ং—মৃগাংক সেন ৪৯
অভিনয়শিল্পের রীতি ও পদ্ধতি—
কনষ্টান্টিন ষ্টানিস্লাভস্কি
অনুবাদক : সুবোধকুমার ঘোষ ৫৫
চলচ্চিত্রের ধর্ম্ম—ফণী মজুমদার ৫৯
ষ্টুডিও সংবাদ— ৬০
বিবিধ অনুষ্ঠান— ৬৫
মাদ্রাজ-সংবাদ— ৬৭
টুকরো খবর— ৬৮
আপনি কি বলেন ?— ৭০

ছ বি র পা তা য়

আর্ট প্লেটে : উদয়ন পিকচার্সের 'কবি চন্দ্রাবতী' চিত্রে অনুভা গুপ্তা (১ম মলাট) ; এম পি-র 'আঁধি' ছবিতে দীপ্তি রায় ; মার্কিনদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদল : ছবিতে দেখা যাচ্ছে হ্যারী ষ্টোন, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, নার্গিস্, সূর্য্যকুমারী ও বীণা রায়কে ; মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান-এর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় রত নার্গিস্ ; এম-জি-এম ষ্টুডিওতে ওয়াল্টার পিজিয়ন ও গ্রীয়ার গার্সন-এর সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন রাজকাপুর, নার্গিস্ ও চন্দুলাল শা ; অপর ছবিতে ভারতীয় চিত্রাভিনেতা ডেভিডকে ঘিরে রয়েছেন জিন সিমন্স, ষ্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার ও পরিচালক জর্জ্জ সিড্নী ; কিছুকাল পূর্ব্বে এক সাক্ষাৎকারের ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ও শ্রীমতী দেবিকারাণীকে,

সাধারণ পৃষ্ঠায় : চিত্রগ্রহণের অন্তরালে : 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র' ছবির দৃশ্যগ্রহণের ক্ষণপূর্ব্বে পাহাড়ী সান্যাল ; চিত্রগ্রহণের বিরতির সময় চা-পান করছেন মলিনা দেবী ; 'রোশেনারা' ছবির মহড়া দিতে ব্যস্ত দেবযানী ; 'কুয়ো ভেডিস'-এর দুটি ছবিতে রবার্ট টেলার ও ডেবোরা কার ; চার্লি চাপলিন ; 'আঁধি'-র এক দৃশ্যে দীপ্তি রায় ও মাষ্টার বিভু ও অপর এক ছবিতে মাষ্টার বিভু ; 'ভোর হ'য়ে এলো'র দুটি ভিন্ন দৃশ্যে প্রণতি ঘোষ ; 'ঝাঁসী-কি-রাণী'র একটি দৃশ্যে সোরাব মোদী ও শিখারাণী বাগ এবং এই ছবির অপর একটি যুদ্ধের দৃশ্য ; 'পথিক' ছবির মহরৎ-অনুষ্ঠানে বাংলা চিত্রজগতের বিশিষ্ট চিত্রতারকাদের দেখা যাচ্ছে দুটি ভিন্ন ছবিতে ; 'ঝাঁসী-কি-রাণী'র নাম-ভূমিকায় মেহতাব ; নলিনী জয়ন্ত ; 'প্রতীক্ষা' চিত্রে স্মৃতিরেখা বিশ্বাস ও অপর একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে স্মৃতিরেখা ও সিপ্রা দেবীকে ; বোম্বে টকীজের 'সমন্বয়' ছবির মহরৎ-উৎসবে গৃহীত চিত্র ; নৃত্য ও অভিনয়শিল্পী জয়শ্রী সেন ; মার্কিন চিত্রতারকা শেলী উইণ্টার্স।

জন্ম ঃ ১২ই আগষ্ট, ১৯০৩ ঃ ঃ মৃত্যু ঃ ৮ই নভেম্বর, ১৯৫২

স্বর্গতা প্রভা দেবী

প্রভা দেবীর মৃত্যু বাংলা ছায়াছবির জগতে এক স্মরণীয় ঘটনা। একাধারে মঞ্চ ও ছায়াছবির জগতে এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী যে আসন দখল করেছিলেন আজকের দিনের অন্য কোনো অভিনেত্রীর পক্ষে সম্ভব হবে না সেই শূন্য আসনকে পূর্ণ করা।

এই অভিনয়-শিল্পীর প্রতিভার প্রথম বিকাশ দেখা যায় নৃত্য ও গীতে অতি ছোট বেলা থেকেই। কিন্তু তাই ব'লে যে তিনি উত্তর জীবনে অভিনয়-শিল্পকেই জীবনের সঙ্গী আর ব্রত হিসাবে গ্রহণ করবেন তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। মাত্র ন' বছর বয়সেই অভিনয়-জীবনের প্রথম পদক্ষেপ তাঁর হলো মঞ্চের মাধ্যমে। স্বর্গীয়া তিনকড়ি সুন্দরীর প্রচেষ্টায় তৎকালীন থেসপিয়ন থিয়েটারে তিনি প্রথমে যোগদান করলেন। সেখানে 'নূরমহল' নাটকে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। পরে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর অধীনেও মঞ্চাভিনয় চালিয়ে যান। শিশিরসম্প্রদায়ের সঙ্গে থেকে আমেরিকায় গিয়েও অভিনয় করে এসেছেন। মঞ্চাভিনয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ছায়া-ছবিতে অংশ গ্রহণ করেন। তখন চলছিল নির্ব্বাক ছবির যুগ। ১৯২১ সালে ছায়াছবিতে অভিনয় সুরু করে প্রায় ষোলো-সতেরোটি ছবিতে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। নির্ব্বাক যুগে প্রথম প্রধান ভূমিকায় সুযোগ পান 'বিষবৃক্ষ' ছবিতে। তারপর এলো সবাক ছবির যুগ। শিশিরবাবু তখন নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানে ছবি তুলছিলেন। সেখানে তিনি প্রথম অভিনয় করেন 'পল্লীসমাজ' ও পরে 'সীতা' ছবিতে। সেই থেকেই তিনি চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করলেন। অদ্যাবধি তিনি শতাধিক ছবিতে স্বীয় অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

চিত্রবাণী
নাট্য, চিত্র ও শিল্পকলার
সচিত্র মাসিক পত্রিকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য—১২৲ (সাধারণ ডাকে) : ১৫৷৷০ (রেজিষ্ট্রীডাকে)
পঞ্চম বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৫৯ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বাংলা ছবির স্বর্ণযুগ

ভারতীয় চিত্রজগতে বাংলার হৃত নেতৃত্ব ফিরে আসার দিন সমাগত একথা আমরা আগেই বলেছি। তার পর থেকে গত দু'মাসের মধ্যে বাংলা ছবির ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যাকিছু ঘটেছে এবং ঘটছে তা আমাদের এই বিশ্বাসকেই দৃঢ়তর করছে। নিত্য-নতুন ছবির মুক্তি হ'য়ে মাত্র দু'এক সপ্তাহ চলার পরেই তার আয়ু শেষ হ'য়ে যাওয়া যেমন সেই ছবির পক্ষে সুস্থ লক্ষণ নয় সমগ্র চিত্রশিল্পের পক্ষেও ঐ কথাই খাটে। কিন্তু ইদানীংকালে আমরা দেখেছি কয়েকখানি ছবি মুক্তিলাভের পর বেশ কয়েক সপ্তাহ ধ'রে চলেছে দর্শকসমাগমের সংখ্যা সমানভাবে অব্যাহত রেখে। কয়েকখানি ছবি আবার রজত-জয়ন্তী-সপ্তাহ উদযাপনের পথেও অগ্রসর হয়েছে। দর্শকচিত্তে আবেদনসৃষ্টি করা ব্যতিরেকে, দর্শকদের আকর্ষণ করার শক্তি না থাকলে কোনো ছবির পক্ষেই রজত-জয়ন্তী সপ্তাহ উদযাপন করা কখনই সম্ভব হয় না, বিশেষতঃ আর্থিক অনটন ও দুশ্চিন্তা যে-সময় আপামর সকলকেই ঘিরে ধরেছে। এইজন্য আমরা দ্বিগুণভাবে উৎসাহিত বোধ করছি যে বাংলা ছবি আজ সকল শ্রেণীর দর্শকের স্নেহ-অর্জ্জনে ধন্য হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিককালে বাংলা ছবির সাফল্য যেমন বাংলা চিত্রশিল্পকে শক্তিশালী করে তুলছে তেমনি সেসব ছবির প্রযোজককেও শক্তি এবং সাহস সঞ্চয়ে সাহায্য করছে। এতে তাঁরা পরবর্ত্তী ছবি তৈরীর কাজে ভীত বা পশ্চাৎপদ হবেন না। ব্যক্তিগত মালিকানা বা যৌথ প্রতিষ্ঠান যাঁরাই ছবি প্রযোজনা করুন না কেন ছবির সাফল্য তাঁদের তথা সমগ্র চিত্রশিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতিতে সাহায্য করবে। বাংলা ছবি যেমন আজ দর্শকসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহযোগিতা ও স্নেহলাভে সমর্থ হয়ে চিত্রশিল্পকে শক্তিশালী করে তুলছে, চিত্রশিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তিরও আজ উচিত নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বজায় রেখে বাংলা চিত্রশিল্পকে সমগ্র বিশ্বে গরীয়ান ও মহীয়ান ক'রে তোলা। চিত্রশিল্পের বিভিন্ন বিভাগে—প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শন—পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে একযোগে কাজ করা। একটি বিশেষ শিল্পের সঙ্গে জড়িত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে অপরকে বাঁচাবার মনোভাব না থাকলে তা' কারও পক্ষেই হিতকর হয়না। প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শক—চিত্রশিল্পের এই তিনটি সম্প্রদায়কে হতে হবে একাত্ম—বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলে বাংলা চিত্রশিল্পকে উৎকর্ষের চরম শীর্ষে তুলে ধরতে হবে। কেবলমাত্র প্রযোজক একার চেষ্টাতে এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে পরিপুষ্ট

করতে পারেন না। বাংলা দেশের প্রযোজকদের মধ্যে আজ আমরা লক্ষ্য করছি,—কি কাহিনীগত, কি কলাকৌশলগত—সর্ব্ববিষয়ে উন্নত চিত্রনির্ম্মাণের সাধনায় তাঁরা ব্রতী হয়েছেন। সাহিত্য-রসপুষ্ট কাহিনী দিয়ে, জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশাকে বাস্তবধর্ম্মী ছবিতে ফুটিয়ে তুলে, দর্শকসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্ত প্রযোজকরা সচেষ্ট হচ্ছেন—পরিবেশক ও প্রদর্শকদের সহযোগিতা ব্যতীত প্রযোজকদের সে-উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হওয়া সম্ভব নয়। ছবির মুক্তিপথে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করা, অন্যায়ভাবে অকারণে কোনো ছবির সাফল্যকে দুর্ব্বল করে দেওয়া—এসব মনোভাব পরিহার করতে হবে। আজ চিত্রশিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিটি সম্প্রদায় ও ব্যক্তির উচিত একযোগে কাজ ক'রে এই শিল্পকে সুষমামণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করা এবং এইটাই আমরা আশা করি। বাংলা ছবি নিজ বৈশিষ্ট্যে ও নিজ গুণে বাংলা চিত্রশিল্পকে পরিপুষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে—এদেখে আজ যেমন আমরা উৎসাহিত ও আশান্বিত হচ্ছি, অচিরেই যে বাংলা ছবি এক আদর্শ স্থাপন করবে সেটাও তেমনি আমরা কামনা করি। ইতিমধ্যে বিশ্বের দরবারে বাংলা দেশে তোলা বাংলা ছবি প্রশংসা-লাভে ধন্য হয়েছে। এইসব নানাবিধ কারণে আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে, বাংলা চিত্রশিল্প একটা যেন স্বর্ণযুগের ইঙ্গিত করছে এবং সেই স্বর্ণযুগে পৌঁছোবার জন্য সকলেই একযোগে কাজ করবেন এইটাই আমরা দেখতে চাই।

পরলোকে প্রভা দেবী

গত ৮ই নভেম্বর শনিবার প্রত্যুষে লোকান্তরিতা হলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্রলোকের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী প্রভা দেবী। কি মঞ্চে কি পর্দ্দায় তাঁর অভিনয়দীপ্ত প্রতিটি ভূমিকা দর্শকচিত্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো কাহিনীতে বর্ণিত চরিত্রের নিখুঁত প্রতিকৃতিরূপে। তাঁর অভিনয়ে দর্শকরা হতেন মুগ্ধ। বিশেষ করে, করুণ ভূমিকার অভিনয়ে দর্শকদের নয়ন হয়ে উঠতো অশ্রুসজল। কি বাচনভঙ্গীতে, কি ভাবপ্রকাশে অত নিখুঁতভাবে অভিনীত চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হতো একমাত্র তাঁর মতো শিল্পীরই পক্ষে। অভিনয়শিল্পীর জীবন তাঁর সুরু হয়েছে অতি অল্প বয়সেই। মঞ্চাভিনয়ের মধ্য দিয়েই তাঁর অভিনয়-জীবনের বনিয়াদ সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল—এমনকি সাগরপারে গিয়েও তাঁর সেই কৃতিত্বের পরিচয় তিনি দিয়ে এসেছেন। বাংলার রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন নটগুরুর অধীনে তাঁর নাট্যচর্চ্চা পরিপূর্ণ সাফল্যের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল। মঞ্চাভিনয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে। সেও আজকের কথা নয়। নির্ব্বাক যুগের চিত্রগুলিতে যেমন তিনি অভিনয়-দক্ষতা দেখিয়েছেন সবাক চিত্রের যুগেও ঠিক তেমনিভাবেই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছিলেন স্বীয় অভিনয়-কুশলতার পরিচয় দিয়ে। তাঁর এই আকস্মিক তিরোধানে একাধারে বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রজগতে যে ক্ষতি হলো তা অপূরণীয়। কারণ তাঁর অভিনয়-ধারা ছিল অনন্যসাধারণ। বাংলা দেশ তথা সমগ্র ভারতে তাঁর মতো শক্তিশালী অভিনেত্রী একেবারেই বিরল। এমনকি, তিনি বিদেশের মঞ্চের বা ছায়াচিত্রজগতের যে কোনো অভিনেত্রীর সমকক্ষ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তাঁর স্মৃতি জড়িয়ে থাকবে যেসব ছবিতে তাঁকে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে তারই মাধ্যমে। দর্শকদের হৃদয়ে যে-পরিতৃপ্তি তিনি দিয়ে গেছেন তা প্রতিটি দর্শকের কাছেই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি, তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জানাই অন্তরভরা সমবেদনা।

নতুন ছবি

কপালকুণ্ডলা

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জনপ্রিয় এবং বহুজনপরিচিত উপন্যাসরাজির মধ্যে কপালকুণ্ডলা অন্যতম। এই উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাস এবং ঘটনাবলীর স্থান নির্ব্বাচন ইত্যাদি সাধারণ পাঠক-পাঠিকাকে অতি সহজেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। কয়েকটি অসাধারণ চরিত্রসৃষ্টিও এই উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপরন্তু চলচ্চিত্রের দিক থেকে বলতে গেলে বলা যায়, ছায়াছবির নির্ব্বাক যুগ থেকেই সুরু হয়েছে এর চিত্ররূপদানের প্রচেষ্টা এবং আজ পর্য্যন্ত বারকয়েক এটির চিত্ররূপ দেখা গেছে এমনকি হিন্দীতে পর্য্যন্ত।

বর্ত্তমান চিত্ররূপটি দিয়েছেন আজ প্রোডাকসন্স। বিচিত্র কাহিনীমূলক 'কপালকুণ্ডলা' চিত্রটি স্বভাবতঃই দর্শকদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যে যে ঐতিহাসিক পরিবেশের কিছু কিছু সমাবেশ রয়েছে তা' সর্ব্বক্ষেত্রে যাথাযথ না হওয়ায় দর্শকচিত্তকে ক্ষুণ্ণ করে। ছবির গতি বেশ স্বচ্ছন্দ, কৌতূহল ও আবেগ ফুটিয়ে তোলার জন্য নাটকীয়তারও সৃষ্টি হয়েছে বহু দৃশ্যে, কিন্তু, তবুও ছবিটি আগাগোড়া সর্ব্বত্র সমানভাবে দর্শকমনকে আবিষ্ট করে রাখতে সক্ষম হয়নি।

অভিনয়ের দিক থেকে কপালকুণ্ডলার ভূমিকায় প্রণতি ঘোষের অভিনয় দর্শকচিত্তে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে—কিন্তু উপন্যাসে বর্ণিত নায়িকার সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে সমন্বয় রেখে আকৃতিগত মিল যেন হয় নি। নবকুমারের ভূমিকায় সমীরকুমারের অভিনয় এবং অভিব্যক্তি একান্ত নৈরাশ্যজনক। কাপালিকের অংশে নীতিশ মুখোপাধ্যায় একটি দৃশ্যে তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন—যেখানে কাপালিক পড়ে গিয়ে আহত হচ্ছেন। তাছাড়া অন্যান্য অংশেও তাঁকে মানিয়েছে বেশ এবং তাঁর অভিনয়ও উপাদেয়। মতিবিবির ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর সাফল্যলাভের প্রচেষ্টা লক্ষ্যনীয়, কিন্তু সম্ভবতঃ সুযোগের অভাবেই তিনি আশানুরূপভাবে চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন নি। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় যথাযথ হয়েছে।

সঙ্গীতাংশে উল্লেখ করার মতো কিছু নেই। চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ মোটামুটি ভালই হয়েছে। ইদানীং বহু ব্যর্থ ছবির পরিচালক অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে কিছুটা সংযমের পরিচয় দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন।

বিন্দুর ছেলে

আর সব দিকের দৈন্য সত্ত্বেও কাহিনী-মাধুর্য্য এবং সু-অভিনয়গুণে ছবি কতটা হৃদয়গ্রাহী হয়ে জনপ্রিয় হতে পারে তার নিদর্শন হলো "বিন্দুর ছেলে"। বড় জা-য়ের ছেলে অমূল্যর ওপর সন্তানহীনা বিন্দুর অবিরাম দুর্ব্বার স্নেহ এবং সেই স্নেহকে ঘিরে ছোট-খাটো মান-অভিমান ও ভুল বোঝাবুঝির মধ্য দিয়ে গ্রামের একটি মধ্যবিত্ত সংসারে যে বিপর্যয়ের ছায়াপাত হবার উপক্রম হয়েছিল তারই আবেগচঞ্চল কাহিনী 'বিন্দুর ছেলে'।

'বিন্দুর ছেলে'র কাহিনী বাংলার পাঠক ও দর্শক-সমাজের কাছে চিরপরিচিত। তাই কাহিনীর পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। কাহিনীর আবেদন থাকলেও যথাযথভাবে তার চিত্ররূপ দেওয়া কঠিন কাজ। চিত্রনাট্য-রচয়িতা মূল কাহিনীকে অনুসরণ করেই চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। চিত্রনাট্য সম্বন্ধে কাহিনীকে অনুসরণ করে যে তার যথাযথ নাট্যরূপ দিতে পেরেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। চিত্ত বসুর পরিচালনায়ও যথেষ্ট

মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া গেছে। আজ পর্য্যন্ত চিত্ত বসু যে ক'টি ছবি পরিচালনা করেছেন তার মধ্যে 'বিন্দুর ছেলে' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। চিত্রনাট্য, পরিচালনা, অভিনয় এবং আঙ্গিক সকল দিক দিয়েই ছবিটি শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'র সার্থক চিত্র-রূপায়ণ হয়েছে।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে বিন্দুর ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর সংযত ও সুষ্ঠু অভিনয়। তাঁর সাবলীল অভিনয়গুণে এই চরিত্রটি সার্থক ও প্রাণবন্ত হয়েছে। এ ছবিতে তাঁর অভিনয় বহুদিন মনে থাকবে। বড়-জা অন্নপূর্ণার ভূমিকায় মলিনা দেবীর অভিনয় খুবই সুন্দর হয়েছে। এ ধরণের চরিত্র-রূপায়ণে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই বললেই চলে। এর পরই নাম করতে হয় অমূল্যর ভূমিকায় মাঃ বিভুর অপূর্ব্ব অভিনয়ের কথা। কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ হলো বালক অমূল্য। এই ভূমিকাটি মাঃ বিভুর অভিনয়গুণে সার্থক হয়ে উঠেছে। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে 'যাদবে'র ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল ও 'মাধবে'র ভূমিকায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় যথাযথ। 'পূজারী'র ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ও প্রশংসনীয়। কুচক্রী ননদিনী 'এলোকেশী'র ভূমিকায় রেণুকা রায়ের অভিনয়ও মনে রাখবার মতো।

রামানন্দ সেনগুপ্তের আলোক-চিত্রগ্রহণ মন্দ নয়। শব্দগ্রহণে শব্দযন্ত্রী সত্যেন চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শিল্প-নির্দ্দেশনা ও সম্পাদনার কাজও সুন্দর হয়েছে। এজন্য শিল্প-নির্দ্দেশক সুনীল সরকার ও চিত্র-সম্পাদক রবীন দাস ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

সঙ্গীত-পরিচালনায় কোথাও নতুনত্বের ছাপ নেই। সঙ্গীত পরিচালক কালিপদ সেন আমাদের হতাশ করেছেন। ছবিতে একখানা গান ছিল তাও মোটেই শ্রুতিমধুর হয় নি।

পল্লীসমাজ ঃ অনিবার্য্য ঃ শ্যামলী

এই তিনখানি ছবিই একই জাতের এবং একই ধাতের। না টেকনিক্যাল দিক দিয়ে, না নাটকীয়তা সঞ্চারের দিক দিয়ে, না গল্প বলার আঙ্গিক ও ভঙ্গীর দিক দিয়ে তিনখানি ছবিই কোনোরূপে দর্শকের উপভোগের পর্য্যায়ে আসতে পারে নি। 'পল্লীসমাজ' ছাড়া বাকী ছবিগুলি কাহিনী ও বিন্যাস পরিকল্পনার দিক দিয়ে দৈন্যভারজর্জ্জরিত। 'পল্লী-সমাজ' শরৎচন্দ্রের নাটকীয়তাবহুল বহুপঠিত হৃদয়-বেদনের বর্ণাঢ্যচিত্র কাহিনী। কিন্তু যে কাহিনীও পরিচালকের সাহিত্য ও কাণ্ডাকাণ্ডবোধহীন সস্তায় বিস্তিমাতের সুলভ প্রচেষ্টায় চিত্রপদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে নি। শরৎচন্দ্রের এই কাহিনীর ওপর এই জাতীয় অন্যায় অবিচার এবং শিশু-সুলভ ধৃষ্টতা আমরা পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর কাছ থেকে আশা করতে পারিনি। ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্রের কাহিনী নিয়ে ছবি করার সময় তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত থাকবেন আশা করি।

'পল্লীসমাজে'র কাহিনী চিত্ররসিক প্রতিটি দর্শকেরই অতি প্রিয় এবং পরিচিত—তাই কাহিনীর পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

চিত্র-নাট্যরচনায় সজনীকান্ত দাসের অক্ষমতার পরিচয় আরও একবার পাওয়া গেল। অভিনয়ে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই ব্যর্থ হয়েছেন। ছবির প্রধান চরিত্র রমেশের ভূমিকায় বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের নির্ব্বাচন হাস্যাস্পদ। তাঁর প্রাণহীন অভিনয়ে রমেশ চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, দেশসেবায় আত্মনিয়োগকারী প্রগতিশীল মনোভাব মোটেই ফোটে নি। রমার ভূমিকায় বিগতযৌবনা সুনন্দা দেবী সম্পূর্ণ বেমানান। একমাত্র জ্যাঠাইমার ভূমিকায় মলিনা দেবীর অভিনয়ই মনে রেখাপাত করে। আঙ্গিকের দিকে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। আলোকচিত্র এবং শব্দগ্রহণ যথাযথ। নীরেন লাহিড়ীকে এতদিন চিত্র-পরিচালক হিসেবেই দেখেছিলাম। সঙ্গীত পরিচালকের নতুন পদ তিনি গ্রহণ করেছেন এই ছবিতে। ছবিটির সঙ্গীত বলতে কিছুই নেই।

চিত্রনাট্যের অক্ষমতা, ভূমিকাবন্টনের যথেচ্ছাচারিতা আর পরিচালকের খামখেয়ালীপনা সব মিলিয়ে ছবিটি এ বছরের ব্যর্থ ছবির তালিকা বৃদ্ধি করেছে।

'অনিবার্য্য' চিত্রের কাহিনী হলো এই—মনোজ অন্য-লোকের হাতগুণে তাদের ভাগ্যের কথা জানিয়ে দেয় কিন্তু নিজের ভাগ্য ফেরাতে পারে না। বাড়ীওয়ালার মেয়ে মিনতির সঙ্গে তার ভালবাসা আছে। মিনতির বাবা শরৎবাবু মনোজের অফিসের ম্যানেজার এবং মালিক বোস-সাহেবের সোদরপ্রতীম বন্ধু। পাটনায় কোলিয়ারির মালিকানা নিয়ে গোলমাল বাধায় বোসসাহেব শরৎবাবুকে নিয়ে গেলেন কিন্তু ফেরবার পথে রেল দুর্ঘটনায় শরৎবাবু মারা গেলেন। পাটনায় যে-ব্যক্তি বোসসাহেবকে ফাঁকি দেয় তারই ছেলের সঙ্গে বোসসাহেবের মেয়ে মঞ্জুর বিয়ের কথা ছিলো। ফিরে এসে বোসসাহেব মঞ্জুকে সে সংস্রব ত্যাগ করতে হুকুম দিলেন। মঞ্জু সে-হুকুম অমান্য ক'রে গৃহত্যাগ করলো। মন ভেঙ্গে যাওয়ায় বোস-সাহেব মনোজকে অফিসের ম্যানেজার করেছিলেন এবং

তাঁর সম্পত্তিও মনোজ ও মিনতিকে দেবার জন্যে উইল করলেন। ওদের বিয়ে হলো। ফুলশয্যার রাত্রে আকস্মিকভাবে মনোজ নিজের হস্তরেখায় হত্যার লিখন আবিষ্কার করলো। বিভ্রান্ত হয়ে সে হাত দেখা ছেড়ে দিলো। ওদিকে বোসসাহেবের সম্পত্তি দখল করার চেষ্টা করতে লাগলো দুর্বৃত্ত দালাল বসন্ত। ষড়যন্ত্র করে সে মনোজকে লম্পট প্রমাণ করিয়ে বোসসাহেবের কোপে ফেলে দিলো। মনোজ চাকুরী ছেড়ে দেয়। তারপর সাংসারিক দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং নিজের হাতের রেখায় অখণ্ড লিখনের কথায় উন্মাদপ্রায় হয়ে গৃহত্যাগ করলো। এই সুযোগে বসন্ত বোসসাহেবের আরও ঘনিষ্টতা অর্জ্জনে সক্ষম হলো। আগে-লেখা উইল বদলে সম্পত্তি হাতাবার জন্যে সে তারই রক্ষিতা লাকিকে নিঃসঙ্গে বোসসাহেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করলো। উইল নকল করে সে বোসসাহেবকে হত্যা করা ঠিক করলো। হত্যাকাণ্ড হয়ে যায় আরকি ঠিক সেই সময়ে উন্মাদ মনোজও এসে পড়লো বোসসাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যেই, কিন্তু সামনে পড়ে গেলো তারই ভাই সরোজ আর ছুরি বিঁধলো সরোজেরই বুকে। বসন্তরা পালালো কিন্তু স্বেচ্ছায় মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আত্মহত্যা করলো। সরোজ অবশ্য প্রাণে বেঁচে মনোজকে খুনের দায় থেকে রেহাই দেয়।

তিনটি পরিবারের মাধ্যমে এই কাহিনী শোনানো হয়েছে। মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে পরিস্ফুট করার জন্য নানা অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার সমবেশে রচিত এই কাহিনীটি একান্তই দুর্ব্বল। কিন্তু তা আরও দুর্ব্বলতর হয়ে প্রতিভাত হয়েছে চিত্রনাট্য-রচনা ও সম্পাদনার জন্য। এই চিত্রের নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন অনুভা গুপ্তা। দর্শকমনে কোন আকর্ষণই তিনি সৃষ্টি করতে পারেন নি। নায়কের চরিত্রে বিমানও তাই। ভিলেনরূপে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় চালিয়ে গেছেন মাত্র। অপরাপর ভূমিকার মধ্যে একমাত্র তুলসী চক্রবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য। কলাকৌশলের দিক থেকে এই চিত্রের অসাফল্যের প্রধান কারণ—আলোকচিত্রগ্রহণ। কোন কোন দৃশ্য এতই অস্পষ্ট যে, খুব বেশী পরিচিত পাত্র-পাত্রীদেরও নিতান্ত অপরিচিত বলে মনে হয়।

ইদানীংকালের অন্যতম ব্যর্থ ছবি হিসেবে 'শ্যামলী' বেশ সহজেই নাম করে নিতে পারে। কাহিনী, চিত্রনাট্য, অভিনয় বা অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ—কোনো দিক দিয়েই ছবিখানি বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারে নি। এই আর্থিক বিপর্য্যয়ের দিনে অর্থহীন কতকগুলি ব্যর্থ ছবি তুলে প্রযোজক হবার বাসনা চরিতার্থ না করাই ভালো। এইসব ছবির প্রযোজকরা যদি সেই টাকাটাকে অকারণে এইভাবে নষ্ট না করেন তবে প্রযোজকরা নিজেরাও যেমন উপকৃত হবেন তেমনি উপকৃত হবে চিত্র-শিল্প। শিল্প-প্রসারের চেষ্টা করতে গিয়ে দুর্ণাম সংগ্রহ করার পরিবর্ত্তে সেই টাকাটা সত্যকার কোনো জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করলে টাকাটার যথার্থ সদ্ব্যবহার হতে পারে।

মহিষাসুর বধ

শ্রীশ্রীচণ্ডী অবলম্বনে 'মহিষাসুর বধ' চিত্রটি প্রযোজনা করেছেন নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স। মহামায়া শক্তির পূজাকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাকে অবলম্বন করেই এর চিত্ররূপ গড়ে উঠেছে।

'মহিষাসুর বধে'র কাহিনী সর্ব্ব-জনবিদিত তাই তার বিশদ বিবরণ-দানে বিরত থাকলাম। ছবিতে

যে-রূপটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে তা একান্ত মঞ্চঘেঁষা। ছবির সংলাপও ঐ পথকেই অনুসরণ করেছে তার ওপর 'সোনায় সোহাগা'র মতো হয়েছে অধিকাংশ মঞ্চশিল্পীদের বিভিন্ন ভূমিকায় নির্ব্বাচন—তাতে ছায়াছবির আবেদন এ-ছবিতে কোথাও ফুটে ওঠে নি। ছবির কোনো দৃশ্যই মনে রেখাপাত করে নি। দেবতাদের ওপর অসুরের অত্যাচার আর তার পরে দেবতাদের অসহায় অবস্থা আমাদের বাস্তব জীবনের উদ্বাস্তুদের কথই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এতে দেবতাদের যে চরিত্রগুলির রূপ দেওয়া হয়েছে তাতে দেবতাদের চরিত্র ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। অভিনয়ের দিক থেকে একমাত্র কমল মিত্রের অভিনয়ই উল্লেখযোগ্য। ছবির দৃশ্যপট হয়েছে বিসদৃশ এবং এ-বিষয়ে অর্থব্যয়ের কার্পণ্য বেশ চোখে পড়ে। অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ অনুল্লেখ্য।

ভুলের শেষে

প্রাচীন সংস্কারপন্থী উগ্র প্রভুত্বপরায়ণ হৃদয়বিশিষ্ট জমিদার স্বামীর হাতে সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তিসম্পন্না বিচার-বিবেচনাশীলা স্ত্রীর নিগ্রহের কাহিনীই এই চিত্রে ফুটে উঠেছে।

বাপ মা-হারা হৈমবতী তার দাদার স্নেহ-যত্নে বড় হয়ে ওঠে। লেখাপড়া, গান-বাজনা সবকিছুই সে শিখেছে। একদিন পুকুরে স্নান করার সময় জমিদার রায় বাহাদুরের নজরে পড়ে সে এবং পরে তাঁর সঙ্গে হিমুর বিয়ে হয়। হিমুর একটি ছেলে হয়। এই সময় হিমুর দাদা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই তিনি হিমুর সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। রায় বাহাদুর ভুল বুঝলেন হৈমবতীকে তিনি যেতে দেন না তার দাদার কাছে। এক রাত্রে হিমু ছেলেকে নিয়ে লুকিয়ে চলে যায় দাদার সঙ্গে দেখা করতে। রায় বাহাদুর ক্রুদ্ধ হয়ে ছোটেন সেখানে —ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, কিন্তু স্বামীগৃহে হৈমবতীর প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়। দাদার মৃত্যুর পর হৈমবতী ভরণপোষণের জন্য নার্সের জীবিকা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। এক সহৃদয় চিকিৎসকের চেষ্টায় সে এক ক্লিনিকের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার সুযোগ পায়। কিন্তু সেই চিকিৎসকের অনুপস্থিতির সুযোগে সেই ক্লিনিকের মালিক তাকে উপভোগ করার চেষ্টা করে। সেই সময় হৈমবতী তাকে এক ফুলদানী দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে পালিয়ে যায় এবং আত্মগোপন করে থাকে। পরে এক কৌতূহলী ঘটনার মধ্য দিয়ে হৈমবতী তার স্বামী আর পুত্রের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায়।

অভিনয়, কলাকৌশলের কাজ, সঙ্গীতাংশ সব কিছুতে উন্নত মান বজায় রাখা সত্ত্বেও ছবিখানি ব্যর্থ এবং বিড়ম্বিত হয়েছে একমাত্র দুর্ব্বল ও বিন্যাসকৌশলবর্জ্জিত কাহিনীর দোষে।

অভিনয়ের দিক থেকে কমল মিত্র ও ভারতীদেবী যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় প্রাণস্পর্শী অভিনয় করেছেন। ছোট-খাটো ভূমিকাগুলির মধ্যে অমর মল্লিক, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তুলসী লাহিড়ীর অভিনয় ভালই হয়েছে। সঙ্গীতের মধ্যে আবহ-সঙ্গীতের অংশটিই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে তবে কণ্ঠসঙ্গীতের মধ্যে একমাত্র 'ও শ্যামলী' গানটি ছাড়া অপর গানগুলি মোটেই শ্রুতিসুখকর হয় নি। শব্দগ্রহণ, চিত্রগ্রহণ ও শিল্প-নির্দ্দেশনার কাজ ভালই হয়েছে।

নেভার টেক নো ফর এ্যান আন্সার

জীবনের নৈরাশ্যকে কখনো মেনে নিতে নেই, এই আপ্তবাক্যকে একটি ছোট অনাথ ছেলে আর তার

একমাত্র সঙ্গী একটি গাধার গল্পের মধ্য দিয়ে মনোজ্ঞ নাটকীয়তার মধ্যে ফুটিয়ে তোলো হয়েছে।

পেপিনো ও তার বাহন ভায়োলেটার (একটি গর্দ্দভের নাম) মধ্যে ভীষণ অন্তরঙ্গতা—কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কিন্তু একদিন ভায়োলেটার হলো অসুখ। ডাক্তার ডাকলো পেপিনো—তিনি একটি ইনজেকসন দিয়ে গেলেন কিন্তু জানিয়ে গেলেন ভায়োলেটার অবস্থা ভাল নয়। দৈবের ওপর পেপিনোর ভীষণ বিশ্বাস; সে ঠিক করলো সেণ্ট ফ্রান্সিসের সমাধিতে পেপিনোকে নিয়ে গিয়ে তার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করবে, কারণ সে শুনেছিল সেণ্ট ফ্রান্সিস মূকদের ভালবাসেন। ফাদার ডোমিকো জানালেন,—সেণ্ট ফ্রান্সিসে যেতে হলে পোপের অনুমতি চাই। কিন্তু একটি ছোট্ট ছেলের পক্ষে তা কি সম্ভব! কিন্তু তাও সম্ভব করে তুললো পেপিনো তার বিশ্বাসের জোরে।

সমস্ত ছবিখানিই ইতালীতে তোলা আর সেইসঙ্গে পোপের আবাসস্থল ভ্যাটিক্যানোর অংশও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো হয়েছে। অত্যন্ত প্রতিভাবান ইতালীয় বালক ভিটোরিও ম্যান্থনতোর অভিনয় দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। বৃটিশ চিত্রশিল্পের এ একখানি অনবদ্য সৃষ্টি। আলোকচিত্র ও অন্যান্য কলাকৌশলের দিকেও এবছরের একটি বিশিষ্ট শিল্প-কৃতিত্ব। মরিস ক্লক ও র‍্যালফ স্মার্টের যুগ্ম-পরিচালনায় তোলা হয়েছে। নিউ এম্পায়ারে সম্প্রতি এই ছবিটি দেখানো হয়েছে।

ষ্টোরী অব্ রবিনহুড

কার্টুন ছবির জন্য প্রখ্যাত হলেও ওয়াল্ট ডিসনে মানুষ নিয়ে ছবির প্রযোজনায় ইতিমধ্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং রূপবিন্যাসে তাঁর একটি নিজস্ব ধারা আছে। অপূর্ব্ব একটা কাব্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন তিনি তাঁর ছবিগুলিতে।

ফরেষ্টের বিখ্যাত দস্যু রবিনহুডের দুর্দ্ধর্ষ কীর্ত্তি এই ছবিখানিতেও তিনি মিষ্টি রূপকথার আমেজ এনে দিয়েছেন। রবিনহুডের উপাখ্যান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে সুপরিচিত। বিশেষতঃ কিশোর-কিশোরীদের কাছে এ-কাহিনীর আবেদন চিরন্তন। গল্প পড়তে পড়তে পাঠকের মনে রবিনহুড সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি হয় ওয়াল্ট ডিসনে তাতে রং ফলিয়েছেন তাঁর প্রতিভার স্পর্শে—তাই গল্পের মতই চিত্রটি মনোরম হয়ে উঠেছে ছায়াছবিতেও।

কাহিনীর পটভূমিকায় শেরউড ফরেষ্টে ছবিখানির অধিকাংশ গৃহীত হওয়ায় বাস্তবতার দিক থেকে এর যেমন একটা আবেদন সৃষ্টি হয়েছে, মধ্যযুগীয় চারণদের গানে তা পেয়েছে তেমনি প্রাণের স্পন্দন এবং সেই অনুপাতে প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রী তাঁদের চরিত্রগুলি ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। যে কোন দর্শক এ ছবি দেখে আনন্দ পাবেন। সম্প্রতি লাইট-হাউসে প্রদর্শিত হয়েছে এই ছবিটি।

"ষ্টোরি অব রবিনহুড"-এর সঙ্গে দেখানো হয় "ওয়াটার বার্ডস" নামক প্রাকৃতিক জীবনের একখানি অপূর্ব্ব ছবি। নানাজাতের জলা-পাখীদের বিচিত্র জীবনধারাকে দেখানো হয়েছে এতে। এ এক পরম বিস্ময়কর সৃষ্টি বলে প্রতীয়মান হবে।

ক্রিষ্টিন চার্টারিস-এর

হলিউড ডায়েরী

★

এবারে এখানকার খবর পাঠাবার কথা বলতেই প্রথমে মনে পড়ে ভারতীয় চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে যে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলটি যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনে এসেছেন তাঁদের কথা।

৮ই অক্টোবর তাঁরা এখানে এসে পৌছলেন। মার্কিন চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির সভাপতি ফ্র্যাঙ্ক ফ্রীম্যান, পরিচালক ফ্র্যাঙ্ক কাপরা ও চিত্র-জগতের অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। মিঃ ফ্রীম্যান ও পরিচালক কাপরা তাঁদের এক ভোজসভায়ও আপ্যায়িত করেন। এই ভোজসভায় পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও উপস্থিত ছিলেন আর তিনি একটি ছোট্ট ভাষণও দিলেন।

এখানকার সাংবাদিকেরা প্রতি-নিধিদলের নেতা মিঃ চণ্ডুলাল শাহকে ঘিরে ধরলেন—ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্বন্ধে নানান তথ্য জানবার জন্য বহু প্রশ্ন তাঁরা করলেন—মিঃ শাহ সেসব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ শাহ জানালেন ভারতীয় ছবিতে ভারতবাসীর জীবন, ইতিহাস ও সংস্কৃতির যথার্থ রূপটিই ছবিতে দেখাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়।

মেট্রো-গোল্ড্‌উইন-মায়ার এবং টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স ষ্টুডিও দুটি তাঁরা পরিদর্শন করেন। এখানে পরিচালক ড্যারিল এফ. জ্যানুক এক ভোজসভায় প্রতিনিধিদলটিকে আপ্যায়িত করেন। মিঃ জ্যানুক বলেন যে, ভারতে চিত্রগ্রহণ করার জন্যে একটি দলকে সেখানে পাঠাবার ইচ্ছা তাঁর আছে এবং সেখানে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের কর্ম্মী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সহযোগিতা আশা করেন।

ছবিটা উল্টো নয়—ছবিতে উল্টে রয়েছেন হলিউডের নবীনা চিত্রতারকা
[illegible]

এর পর ইউনিভার্সাল ইন্টারন্যাশনাল ষ্টুডিওর প্রেসিডেণ্ট মিঃ মিণ্টন র‍্যাকমিল এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলটিকে। তারপর ষ্টুডিওর বিভিন্ন বিভাগে তাঁদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখানো হলো। তাঁরা ষ্টুডিওর সেট ও বহির্দৃশ্যগ্রহণের বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাগুলি দেখে প্রীত হন এবং বিস্ময়বোধ করেন,—কারণ এমন বিরাট ব্যবস্থা নাকি তাঁদের দেশের ষ্টুডিওতে নেই—তার ওপর মেক-আপ করার পদ্ধতি ও মাল-মশলা দেখেও তাঁরা চমৎকৃত হন। তাঁরা এদেশের কলাকুশলীদের কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন।

এখানে বেশ একটা মজার ব্যাপারও হলো। ভারতীয় চিত্রতারকাদের মাথায় 'বিন্দি' দেখে এখানকার চিত্রতারকারা খুব আকৃষ্ট হলেন। একজনের মাথা থেকে সেটা নিয়ে এ্যান শেরিডানের কপালে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো—এই ব্যাপারে সকলেই বেশ কিছুটা আনন্দ উপভোগ করলেন। মার্কিন মহিলা চিত্রতারকারা যেসব গহনা ইত্যাদি পরেছিলেন তা দেখে ভারতীয় চিত্রতারকারা নেচে উঠলেন—তাঁদের প্রিয়জনকে উপহার দেবার জন্যে সেসব জিনিষ কেনার জন্যে তখুনি তাঁরা দৌড়োন আরকি!

এই সভা উপলক্ষ্যে ষ্টুডিওটি ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা ও নিশান দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

শুনলাম এখানে এঁদের ভ্রমণপর্ব্ব শেষ হওয়ার পর দেশে ফেরার পথে মিঃ বীরেন্দ্রনাথ সরকার জাপানে যাবেন ওখানকার চিত্রশিল্প ও চলচ্চিত্রের বাজার সম্বন্ধে খবরাখবর জানতে। শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখার্জ্জী যাবেন লণ্ডনে তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। মিঃ মুখার্জ্জী চিত্র-ব্যবসায় ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্যে কিছুদিন আগে লণ্ডনে গেছেন। দলের অন্যান্য শিল্পীরা চলে গেলেন হাওয়াই দ্বীপের হনোলুলুতে। এঁরা এই পথে ফেরাই স্থির করলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় ওঁরা বললেন যে, তাঁরা 'ওয়াইকিকি' স্থানটি দেখতে চান—

ও-জায়গাটি নাকি বেড়াবার পক্ষে ভারী চমৎকার। পরে আমার কাছে খবর এসেছিল যে, সেখানে তাঁরা পৌঁছলেন রাত্রে এবং সে-রাত্র কাটিয়ে পরের দিনে ভোর-বেলাতেই স্থানটি পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন। সেখানে মিঃ জে জে ওয়াতুমল তাঁদের নিয়ে ঘুরিয়ে সব জায়গাটি দেখান। মিঃ ওয়াতুমল একজন ওখানকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং তিনি একজন ভারতবাসী। 'ওয়াতুমল ফাউণ্ডেশান' তাঁরই অর্থে পুষ্ট।

সেখানে ঘুরে বেরাবার সময় নববিবাহিত প্রেমনাথ-দম্পতি হনোলুলুর বাজারে গিয়ে আলোহা সার্ট আর সেইসঙ্গে জাঁকালো রং-এর এক 'সারং' কিনে ফেলেন। 'সারং' হলো ওদেশবাসিনীদের বহির্বাসের নাম।

বিগত বিশ্ব-সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতার ছ'জন প্রতিযোগিনী একটি ছবিতে একই ধরণের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিকায় মানে একেবারে সুপারের অংশে অভিনয় করছেন। ইউ-নিভার্সাল ইণ্টারন্যাশনাল-এর 'মিসিসিপি গ্যাম্বলার' ছবিতে এঁদের দেখা যাবে। এই ছবিতে নায়িকার বিবাহ-দৃশ্যে এঁদের দেখা যাবে।

'কিং সলোমন'স্ ওয়াইভস্' নামে এখানে একখানি ছবি তোলার উদ্যোগ চলছে। ছবির স্যুটিং সুরু হবে ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে। বাইবেলে আছে রাজা সলোমনের ৭০০ স্ত্রী আর ৩০০ পুত্রকন্যা ইত্যাদি ছিল। এতে হলিউডে যত সুন্দরী আছে তাদের অবশ্য ছবিতে কাজ দিতে বেশ কিছুটা সুবিধা হবে।

ওয়াল্ট ডিসনে নবতর পরিকল্পনায় একখানি ছবি তুলছেন। এটির নাম 'হিয়াওয়াথা'। 'স্লিপিং বিউটি'র পরে তিনি এই ছবি তোলার কাজে হাত দেবেন—ইতি-মধ্যে অবশ্য প্রাথমিক কাজ সুরু হয়েছে। সঙ্গীতাংশ হবে এই ছবির অন্যতম সম্পদ। আজ পর্য্যন্ত সঙ্গীতপ্রধান যত ছবি ডিসনে তুলেছেন তার মধ্যে এই ছবিটি এক নবতম বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করবে। সঙ্গীতজগতের কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞকে তিনি এই ছবিতে নিয়োগ করবেন বলে প্রকাশ।

'টারজান'কে কেন্দ্র ক'রে অধুনাতম যে-ছবিটি তোলা হচ্ছে সেটি হলো 'টারজান এ্যাণ্ড দি শি ডেভিল'। এই ছবিতে টারজানের প্রণয়িনীর ভূমিকায় থাকছেন জয়েস ম্যাকেন্‌জীকে—ইনি হলেন ১৬ নম্বরের'মিসেস টারজান'। এই ছবিতে টারজনও হলেন পঞ্চম 'টারজান'—লেক্স বার্কার।

ব্রিটেন থেকে

★

লিখছেন মলি স্কট

ব্রিটেনের চলচ্চিত্রজগতের দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য খবর প্রথমেই জানিয়ে নিই। চার্লি চাপলিনের অধুনাতম কৌতুক-চিত্র 'লাইমলাইট'-এর শুভমুক্তি উপলক্ষ্যে চাপলিন স্বয়ং এসেছেন লণ্ডনে। ১৬ই অক্টোবর তারিখে এটির প্রথম প্রদর্শনী হয় এবং এটির প্রথম প্রদর্শনীলব্ধ সমস্ত অর্থ সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে খরচ করা হবে। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের ভগ্নী শ্রীমতী মার্গারেট এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন এবং চার্লি চাপলিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ছবিটির কাহিনী চাপলিনের নিজেরই রচনা এবং এটির চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ করতে তাঁর আড়াই বছর সময় লেগেছে।

দ্বিতীয় খবর হলো, হলিউডে যাবার পথে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের লণ্ডন পরিভ্রমণ। লণ্ডনের ডরচেষ্টার হোটেলে আর্থার র‍্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এক ভোজ-সভায় এঁদের সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়।

উপস্থিত এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে ছবি তোলা হচ্ছে সেটি হলো 'মৌলিন রোগ'। লণ্ডন ফিল্ম ষ্টুডিওতে এ-ছবি তোলা হচ্ছে আর পরিচালনা করছেন হলিউডের চিত্র-পরিচালক জন হাষ্টন। ফরাসী শিল্পী তুলো-লত্রেক্-এর জীবনীকে কেন্দ্র ক'রে এ-ছবি তোলা হচ্ছে।

●

বিশ্ববিখ্যাত আইস-স্কেটিং শিল্পী বোলটাকে এবার এক ছায়াছবিতেও দেখা যাবে। 'ইনভিটেশান টু দি ডান্স' ছবিতে এঁর প্রধান ভূমিকায় অবতরণ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জেন কেলী এ-ছবির পরিচালক আর কাহিনী রচনা করা ছাড়া নিজে অভিনয়ও করছেন। লণ্ডনে এটি তোলা হচ্ছে আর এটি হবে রঙীন ছবি। সঙ্গীত-প্রধান এই ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এতে কোনো সংলাপ থাকবে না— অথচ সঙ্গীত আর নৃত্যের মধ্য দিয়েই চারটি কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলা হবে। এ ধরণের ছবি হিসেবে এটিই সর্ব্বপ্রথম ছবি বলা যায়।

এস কে ভাটিয়া জানাচ্ছেন

বোম্বাই-বার্ত্তা

এখানকার ছবির বাজার বিশেষ সুবিধার নয়। হিন্দী ছবির কাহিনীবিহীন একঘেয়েমি আর দর্শকরা ভালভাবে নিতে পারছে না। তার ফলে প্রায় সমস্ত ছবিই এখন প'ড়ে প'ড়ে মার খাচ্ছে। বড় বড় তারকা, পরিচালক বা সঙ্গীত-পরিচালকের মোহ আর দর্শকদের নেই।

সাধারণতঃ ছুটি-ছাটার সময় বা বোনাস পাবার পর কিছুদিন এখানকার ছবিতে দর্শকসংখ্যা বেড়ে যায়; কিন্তু এবার তারও ব্যতিক্রম দেখা গেল। বোনাসের পর শ্রমিকেরা বিশেষ ছবি দেখে নি, দশহরা বা দেওয়ালীর ছুটিতেও ছবির বাজার আগেকার মতই মন্দা রয়ে গেল; যদিও দশহরার চেয়ে দেওয়ালীতে ছবির বাজার সামান্য ভাল বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তা' এত সামান্য যে চিত্র-শিল্পে ভয় ধরে গেছে।

কেন আজ বোম্বাইয়ের চিত্রশিল্পের এই অবস্থা—এ কথা সকলেই আজ প্রশ্ন করছেন! ভারতীয় জীবনবাদকে অস্বীকার ক'রে মার্কিন সংস্কৃতিকে আজ বোম্বাইয়ের ছবি ভারতের বুকে চালাতে চেষ্টা করছে, যার গ্ল্যামার আছে, অথচ প্রাণ নেই—এইটুকু আর দর্শকে মেনে নিতে পারছে না। তারা আজ ভারতীয় ছবিতে চেনা-জানা জীবনের ছাপ চায়, চায় এমন কাহিনী যা নিজের বলে মেনে নিতে তাদের বাধবে না।

শুধু এই কারণেই বিমল রায়ের 'মা' ছবির এত জন-সাফল্য, 'রত্নদীপ' বা 'যাত্রিক' এত সম্বর্দ্ধিত, দত্ত ধর্ম্মাধি-কারীর মারাঠি ছবির হিন্দীরূপ 'নান্‌হে মুন্নে'র এই জন-প্রিয়তা! দর্শকের আত্ম-সচেতনতায় অনেক প্রযোজককেই সমাজ-সচেতন হ'তে হচ্ছে। ছবির কাহিনী নির্ব্বাচনে একেবারে বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। বিমল রায়ের পরবর্ত্তী ছবি হচ্ছে সর্ব্বহারাদের কাহিনী 'দো বিঘা জমিন্', রাজ কাপুরের জুতো-পালিশকরা ছেলেদের জীবনী 'বুটপালিশ', দিলীপকুমারের কয়লা-খনির শ্রমিকদের ইতিহাস 'কালা আদমি', ডি ডি কাশ্যপের 'নয়া ঘর', জিয়া সারহাদির 'ফুটপাথ', রমেশ সায়গলের 'শিকাস্ত' প্রভৃতি।

চিত্রশিল্পের এই দুর্য্যোগে কিন্তু একটা সুফল ফলেছে। দুর্য্যোগ যখন আসে তখন শুধু প্রযোজকই একা ঘা খায় না, পরিবেশক ও প্রদর্শককেও ঘা দিয়ে যায়। এই দুর্য্যোগে তাই পরিবেশক বা প্রদর্শকেরাও কম ক্ষতিগ্রস্ত হন নি। তার ফলে একদল পরিবেশক হঠাৎ স্থির করেছেন যে, যে-যে প্রদর্শক সোজা ব্যবসা না করবেন, তাঁদের সঙ্গে এঁরাও কোনও সম্পর্ক রাখবেন না। সাদা কথায়, পরি-বেশকেরা বলতে চান 'ব্ল্যাক মানি' নেওয়া চলবে না, 'হাউস প্রোটেকশান' বলে কোনও কথা থাকবে না; টিকিট বিক্রীর শতকরা একটি ভাগ যদি প্রদর্শক নিতে চায় তো ছবি দেব, নয়ত ছবির মুক্তিই দেওয়া হবে না।

একে ভাল ছবির অভাব, তারপর পরিবেশকদের এই ধনুক-ভাঙা পণ, তার ফলে প্রদর্শকেরা কেউ কেউ নীচে নেমে আসছে। এইসব সর্ত্তেই যে শুধু তারা রাজী হচ্ছে তা নয়, অনেক পরিবেশকের বাড়ীতে তারা ধর্ণা দিতেও সুরু করেছে।

বম্বে টকীজের কর্ম্মী সংঘের প্রথম ছবি 'সমঝার'-এর মহরৎ উৎসবে কিষণচাঁদ জনাব আবদুল খাম চাচাকে মাল্যভূষিত করেন। আবদুল খান চাচা এই প্রতি-ষ্ঠানের সবচেয়ে পুরানো কর্ম্মী। এই উৎসবে ইন্দিই পৌরোহিত্য করেন।

হলিউড-ফেরৎ ফিল্ম-ডেলিগেশন-এর সভ্যদের নিয়ে এখানে বেশ হৈ চৈ পড়ে গেছে। প্রত্যেকেই প্রায় বিভিন্ন ভোজসভায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন আর হলিউডে তাঁদের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বর্ণনা করছেন। তবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে চিত্রশিল্পের অসন্তোষের সীমা নেই। যাঁরা নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অবাঞ্ছিত ছিলেন। এই ব্যাপার নিয়ে এখানকার চিত্রশিল্পে যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে।

আই, এম, পি, পি,. এ'র সভ্যদের মধ্যেও এই ব্যাপারে দলাদলির সূত্রপাত হয়েছে। একদল সভ্য প্রকাশ্যেই আই, এম, পি, পি, এ'র সভাপতি শ্রীযুত চণ্ডুলাল শাহের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব আনার চেষ্টা করছেন। এবারে সভাপতি নির্ব্বাচিত হচ্ছেন জৈমিনী দেওয়ান। সম্ভবতঃ শ্রীযুত শাহ নিজেই পদত্যাগ করবেন। আই, এম, পি, পি, এ'র এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হলিউডে যে ডেলিগেশন গেছে তার সভ্য নির্ব্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের কোন হাত ছিল না। আরও শোনা যাচ্ছে যে এই নির্ব্বাচন এবং প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যাপারে আই, এম, পি, পি-কে নিমন্ত্রণই করা হয় নি। আই, এম, পি, পি, এ-র মধ্যে দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সুরু হতে আর খুব বেশী দেরী নেই বলেই মনে হয়।

এখানকার অধিকাংশ অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক ও পরিচালকের মতে যাঁদের যাওয়া উচিত ছিল তাঁদের অনেককেই এই দলে নেওয়া হয় নি। এক সাক্ষাৎকারে শ্রীযুত কিশোর সাহু তো সেদিন এই ব্যাপারে তাঁর মতামত স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করলেন। তাঁর মতে এই প্রতিনিধিদলকে কোনমতেই ভারতের চিত্রশিল্পের সত্যকার প্রতিনিধি বলা চলে না। যিনি এই দলের নেতা সেই চণ্ডুলাল শাহ-কে ব্যক্তিগতভাবে নিমন্ত্রণ করা হয় নি। আই, এম, পি, পি, এ-র সভাপতি হিসেবেই তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়। কাজেই তাঁর পক্ষে যাকে-তাকে নিয়ে দলভারী করা উচিত হয় নি। তিনি আরও বলেন যে, এটা সত্যিই দুঃখের ব্যাপার যে আই, এম, পি, পি, এ-র সভাপতির এত বড় গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই পদমর্য্যাদাকে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির কাজেই ব্যবহার করলেন।

সম্প্রতি প্রায় ডজনখানেক ছবির মহরৎ হলো। মহরৎগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অমিয় চক্রবর্তীর প্রযোজনা ও পরিচালনায় 'পতিতা', লতা মঙ্গেশকরের প্রযোজনায় 'ঝুবিলী', সি, রামচন্দ্রের প্রযোজনায় 'লাহিরে', এইচ, জি, ফিল্মসের 'বাজ', অজিতের 'বিরলা', বিমল রায় প্রোডাকসনের 'দো বিঘা জমিন', অশোককুমার প্রোডাকসনের 'পরিণীতা' অশোককুমার ও আলুওয়ালীয়ার যুগ্ম-প্রযোজনায় 'ফিরদাউস', হিন্দুস্থান চিত্র প্রতিষ্ঠানের 'খুন-এ-নাহক' এবং আরও কতকগুলি ছবি। তবে এই ছবিগুলির কাহিনীগত একটা বিশেষত্ব যা চোখে পড়ে তা হলো প্রায় প্রত্যেকটি ছবির কাহিনীই গড়ে উঠেছে দীন মজুর, নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনকে কেন্দ্র ক'রে। তবে এতগুলি ছবির একসঙ্গে মহরৎ হলেও পূর্ব্বের মহরৎ-সম্পন্ন প্রায় ডজন-খানেক ছবির কাজ বন্ধ হয়ে আছে। এর কারণ হলো এখান কার অধিকাংশ চিত্রতারকাদের বিদেশ ভ্রমণের হুজুগ। এই ব্যাপারে প্রযোজকদের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি ও অসুবিধা

বাংলা চিত্রের নবীনা নৃত্যপটিয়সী শিল্পী জয়শ্রী সেন

ভোগ করতে হচ্ছে। এখানে একজন তারকাই একসঙ্গে প্রায় আট-দশটি ছবিতে কাজ করেন। কাজেই কোন কারণে যদি তিনি বাইরে যান তো একসঙ্গে প্রায় ডজন-খানেক ছবির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। দেব আনন্দ সম্প্রতি ভিয়েনা যাওয়ায় প্রায় ছ'টি ছবির কাজ বন্ধ হয়ে ছিল। তাঁর প্রত্যাগমনের পর অবশ্য সে ছবিগুলির স্যুটিং যথা-রীতি চলছে। তবে হলিউডে ফিল্ম ডেলিগেশন যাওয়ার ফলে বোম্বাই-এর ছবির কাজকর্ম্ম প্রায় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। বীণা রায় ও প্রেমনাথ কাজ করছিলেন 'আউরৎ', 'গহর', 'শোলে', 'প্রিন্স সেলিম ও আনারকলি', 'সৈয়দ' 'মেহমান', 'দর্দ-এ-দিল' ছবিগুলিতে। তাঁদের বিদেশ ভ্রমণ-কালে এই ছবিগুলির স্যুটিং বন্ধ ছিল। নার্গিস ও

এম, জি, এম-এর মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'কুয়ো ভেডিস্' ছবিতে রবার্ট টেলর ও ডেবোরা কার

ব্যাপারে গীতাবালীর ভগ্নীরও কিছু অংশ আছে। এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন গীতাবালী অন্যান্য ভূমিকায় আছেন রাম সিং ও কে, এন, সিং, সুর দিচ্ছেন ও, পি, নায়ার।

●

এখানে চলচ্চিত্রশিল্পের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত কর্ম্মীরা নিজেদের সমিতি গড়ে তোলার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। প্রায় প্রত্যেক বিভাগেরই নিজস্ব সমিতি ছিল, ছিল না কেবল শব্দযন্ত্রীদের। এবারে তাও হ'ল। এখানকার শব্দযন্ত্রীরা এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ফেমাস সিনে ল্যাবরেটরীতে মিলিত হন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে শব্দযন্ত্রীদের অভাব অসুবিধা দেখার জন্য সমিতির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং শব্দযন্ত্রীদের একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য আবেদন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মুকুল বসু।

রাজকাপুরের অনুপস্থিতির জন্যও 'আ:', 'পহেলী সাদী', 'ধুন' ও 'পাপী' ছবির কাজ বন্ধ ছিল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কারণে-অকারণে বিদেশভ্রমণ অন্ততঃ যতদিন ছবিগুলি না উঠছে ততদিন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা উচিত।

●

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রযোজক হবার সখ দেখা গিয়েছিল। এবারে এখানকার প্রযোজকদের একজনকে অভিনেতারূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যাবে। 'বাজী' ও 'জাল' ছবির স্বনামধন্য প্রযোজক ও পরিচালক গুরু দত্ত তাঁর পরবর্ত্তী 'বাজ' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। এই ছবিটির প্রযোজনার

অতীতের সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই নানাপ্রকার মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন। অতীতে তাঁরা একদিন জনপ্রিয় তারকাই ছিলেন এবং যশ ও অর্থ দুই প্রচুর পেয়েছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁদের দু'একজনের অবস্থা খুবই খারাপ। এঁদের মধ্যে স্নেহপ্রভা স্নায়ুদৌর্ব্বল্যজনিত ব্যাধিতে আক্রান্তা হয়েছেন এবং চিকিৎসার জন্য তিনি এখানের এক নার্সিং হোমে আসেন ও প্রায় মাস খানেক ধরে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। ডাক্তারের অভিমত হল এই যে অতিরিক্ত চিন্তার জন্যই তাঁর এই অসুখ দেখা দিয়েছে। বনমালারও মানসিক রোগ হয়েছে।

তাঁর মনে সব সময়েই এক ভীতির সঞ্চার হয়ে রয়েছে। তাঁর মনে মৃত্যুভয় ঢুকেছে। তিনি অভিনয়ে অর্জ্জিত অর্থ ব্যবসায়ে খাটাতে গিয়ে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন এবং অনেকের মতে সেই থেকেই তাঁর এই মানসিক বিকার দেখা দিয়েছে। একদিন যাঁরা চিত্রশিল্পকে সেবা করেছেন দর্শকদের চিত্রের মাধ্যমে আনন্দ দিয়েছেন তাঁদের শিল্প-সাধনার এই দুঃসহ পরিণতিতে চিত্রানুরাগীমাত্রই দুঃখিত হবেন।

●

ভূতের মুখে রামনামের মত না হলেও প্রায় অনুরূপই ঘটনা সেদিন হয়ে গেল। কিশোর সাহু প্রযোজিত ও পরিচালিত 'খুন-এ-নাহক' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে বোম্বাই রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি ও বোম্বাই সহরের প্রাক্তন মেয়র শ্রীযুত এস, কে, পাতিল এক অভিভাষণে চিত্রশিল্পের ওপর সরকারের অন্যায় প্রমোদকর বসানো নিয়ে অনেক কথা বলেন। তিনি প্রাদেশিক সরকারসমূহের কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে, চিত্রশিল্পের ওপর তাঁদের এতটুকুও দরদ নেই এবং এ সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন, যা চিত্রশিল্পের পক্ষে বিশেষ ভালো নয়। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ-প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হয়ে গেল তার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, চলচ্চিত্র অনুসন্ধান কমিটি বিভিন্ন রাজ্যে এক হারে এবং শতকরা বিশ টাকা করে কর বসানোর জন্য যে সুপারিশ করেছিলেন তা বাতিল হয়েছে। তাঁর মতে অর্থমন্ত্রীরা প্রমোদকর নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা করেন নি। যদি তাঁরা একটু ভেবে দেখতেন তাহলে তাঁরা বুঝতে পারতেন যে প্রমোদকর কমিয়ে দিলে টিকিটের দামও কমে এবং তার ফলে ছবির দর্শকের সংখ্যাও বেড়ে যায়। এতে সরকারের আয়ও বেশী হয়। ছবির সেন্সর-ব্যবস্থারও তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর মতে ভারতে ছবির সেন্সর-ব্যবস্থায় যথেষ্ট গলদ আছে। যাঁরা ছবি সেন্সর করেন ছবি সম্বন্ধে তাঁদের কোন জ্ঞানই নেই। তাঁরা ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগার ওপরই গুরুত্ব দেন। বছরে হয়ত তাঁরা দু'-একটি ছবি দেখেন এবং তা দেখেই মনে করেন যে ছবি সম্বন্ধে তাঁরা সবজান্তা হয়ে গেল। পরিশেষে তিনি জানালেন যে পার্লামেণ্টের আগামী অধিবেশনে প্রমোদকর নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি প্রস্তাব উত্থাপন করবেন।

●

সেদিন প্রখ্যাতা প্লে-ব্যাক শিল্পী লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানতে পারলাম যে তিনি শীঘ্রই লণ্ডনে যাচ্ছেন। ক্লাসিকাল মিউজিক্যাল সোসাইটি অব ইংলণ্ড তাঁকে ইংলণ্ড ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং তিনি তা'

চিত্রগ্রহণের অন্তরালে

'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণের প্রাক্কালে পাহাড়ী সান্যালকে দেখা যাচ্ছে।
ফটো: নির্ম্মল মল্লিক

গ্রহণ করেছেন। বিদেশ ভ্রমণের ফলে তাঁর ছবির প্রযোজনার কাজ ব্যাহত হবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে সে-ব্যাপারে কোন অসুবিধা হবে না। কারণ তিনি যে-ছবিটি প্রযোজনা করছেন সে-ছবিটি হবে সঙ্গীত-প্রধান এবং তার জন্য স্যুটিং খুব বেশীদিন বন্ধ যাবে না। তিনি আরও জানালেন যে আগামী বছরের গোড়ার দিকে বোম্বাইতে একটি অপেশাদার সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করছেন। কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত উভয়েরই ব্যবস্থা এতে থাকবে এবং বিজয়ী সঙ্গীতজ্ঞদের পুরস্কারও দেওয়া হবে।

কুলদীপ কাউরকে শীঘ্রই প্রযোজক হিসাবে দেখা যাবে। তিনি পরিচালক রমেশ সায়গলের সঙ্গে যুগ্ম-প্রযোজনায় একটি ছবি করছেন। এই ব্যাপারে বেশ একটা মজার কাহিনী শোনা যাচ্ছে। কুলদীপ কাউর অসৎ উপায়ে টাকা জাল করতে গিয়ে প্রায় ১ লক্ষ টাকা নষ্ট করেছিলেন। তিনি সে টাকার আশা ছেড়েই দেন। এই সময় একদিন রমেশ সায়গল তাঁকে এই বলে আশ্বাস দেন যে তাঁর টাকা ফেরৎ পাবেন। তখন কুলদীপ তাঁকে বলেন যে, তিনি যদি সে টাকা সত্যিই ফিরে পান তো সেই টাকা তাঁর ছবিতেই নিয়োগ করবেন। এক সপ্তাহ পরে কুলদীপ কাউরের মামলার নিষ্পত্তি হয় এবং তিনি তাঁর অপহৃত টাকা ফিরে পান এবং তাঁর পূর্ব্ব অঙ্গীকারমতো রমেশ সায়গলকে পুরো টাকাটাই দেন। ছবিটির নামকরণ হয়েছে 'সি কাস্তে'।

●

মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'প্রতীক্ষা' চিত্রে
স্মৃতিরেখা ও সিপ্রা

এখানে সান্টা ক্রুজ বিমানঘাঁটিতে বাংলার একজন কর্ম্মোৎসাহী অভিনেতাকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। কলকাতা আর বোম্বাইতে একই সঙ্গে কয়েকটি ছবিতে ইনি অভিনয় করছেন। সেজন্য এঁকে বিমানযোগেই যাতায়াত করতে হচ্ছে। ইনি হলেন অভি ভট্টাচার্য্য। চণ্ডু ষ্টুডিওর 'নয়না' ছবিতে ইনি গীতাবালীর বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন রবীন্দ্র দাভে। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন নিরু, বিমান ব্যানার্জ্জী ও রমেশ প্রভৃতি। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন গোলাম মহম্মদ।

চণ্ডু ষ্টুডিওতে আরও দুটি ছবি তোলার তোড়জোড় চলছে। একটি হলো 'সচ', অপরটি 'মুসৌরী'। প্রথমটির কাহিনী লিখেছেন প্রবীণ চিত্রনাট্য-রচয়িতা নিরঞ্জন পাল। এন, আর আচার্য্য ছবিটি পরিচালনা করবেন। একটি প্রধান চরিত্রে নিরুপা রায়কে দেখা যাবে—তাছাড়া নবাবিষ্কৃত এক কিশোর অভিনেতাকে এই ছবির নায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে—তার বয়স মাত্র ছ'বছর। 'মুসৌরী' ছবিটি তোলা হচ্ছে নানাভাই ভাট-এর পরিচালনায়—দিওয়ালীর দিন থেকে এটির চিত্রগ্রহণ সুরু হয়েছে।

★

ভারতের রাষ্ট্রমঞ্চের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীজওহরলাল নেহরু ও ভারতের বিগত যুগের রঙ্গলোকের সর্ব্বাধিক পরিচিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী দেবিকারাণীর কালিম্পং-এ সাক্ষাৎকার

ফটো : নীরোদ রায়

★

অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্মেলন

★

মার্কিন রাষ্ট্রমঞ্চের শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সকাশে ভারতের বর্ত্তমান রঙ্গলোকের সর্ব্বজনপরিচিতা নটী শ্রীমতী নার্গিস

★

আমেরিকায় ভারতীয় চিত্রতারকাবৃন্দ

★

হলিউড পরিভ্রমণকালে মেট্রো-গোল্ডুইন ষ্টুডিওতে ভারতীয় ফিল্ম ডেলিগেশনের সম্বর্দ্ধনা : বাদিক থেকে দেখা যাচ্ছে: ওয়াল্টার পিজিয়ন, রাজকাপুর, নার্গিস্, চণ্ডুলাল শা ও গ্রীয়ার গার্সন

★

★

হলিউড পরিভ্রমণকালে এম্-জি-এম্ ষ্টুডিওতে ভারতীয় ফিল্ম ডেলিগেশন : বাদিক থেকে : জিন সিমন্স, ষ্টুয়াট গ্র্যাঞ্জার, পরিচালক জর্জ্জ সিডনী এবং ভারতীয় চিত্রজগতের সর্ব্বজন-পরিচিত অভিনেতা ডেভিড

★

কালবৈশাখীর দুরন্ত ঝড়ের অনুরূপ
হৃদয়াবেগের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে
বাংলার চিত্রমানের প্রবর্দ্ধন-প্রয়াসী
আর একটি গরীয়ান এম. পি নিবেদন

আঁধি

শ্রেঃ দীপ্তি রায়
রাধামোহন • বিভু

পরিচালনা: অগ্রদূত

কাহিনী : সৌরীন্দ্র মোহন :: :: সুর: দুর্গা সেন

১৪ই নভেম্বর থেকে উত্তরা • পূরবী • উজ্জ্বলা ও

অজন্তা, বেহালা : শ্যামাশ্রী, হাওড়া : মায়াপুরী, শিবপুর
পারিজাত, শালখিয়া : নিউ তরুণ, বরানগর : মাণা, পানিহাটী
উদয়ন, শেওড়াফুলি : শ্রীকৃষ্ণ, বালী : নৈহাটি সিনেমা
রূপালী, চুঁচুড়া : জ্যোতি, চন্দননগর

জয়শ্রী সেন জানাচ্ছেন

কলকাতার খবর

ভারত থেকে যে চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলটি আমেরিকায় গিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই স্বদেশে ফিরে এসেছেন। এই দলের দু'জন সভ্য বাদে সকলেই গত ২৩শে অক্টোবর রাত্র ন'টার পর বিমানযোগে কলকাতায় এসে পৌঁছোন। এই দলে ছিলেন—নার্গিস, রাজকাপুর, প্রেমনাথ, বীণা রায়, গহর, চণ্ডুলাল শাহ, সূর্য্যকুমারী, মিন্নু কাতরাক্, আচারেকার, ডেভিড এবং কে, সুব্রহ্মণ্যম্। শ্রীযুত সরকার স্বদেশে ফেরার পথে এক সপ্তাহকাল জাপানে ভ্রমণ করে এসেছেন। শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে লণ্ডনেই তাঁর স্বামীর সঙ্গে অবস্থান করছেন। দমদম বিমানঘাঁটিতে ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর তরফ থেকে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। বিমান-ঘাঁটিতে চিত্র-সাংবাদিক, চিত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

দলের নেতা শ্রীযুত চণ্ডুলাল শাহ্ বলেন যে, আমেরিকায় তাঁরা যেখানেই গেছেন সেখানেই বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়েছেন। এই ভ্রমণের ফলে উভয় দেশের চিত্র-সংশ্লিষ্টদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, আমেরিকা সবসময়ই ভারতকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। তারা ভারতকে জানতে ও বুঝতে চায়। প্রতিনিধিদলের প্রত্যেকেই আমেরিকার প্রশংসা করেন। প্রেমনাথ জানান যে, তিনি ওখানে ছবিতে অভিনয়ের জন্য আহ্বান পেয়েছিলেন। কিন্তু বোম্বাইতে তাঁর অসমাপ্ত ছবিগুলি শেষ না করে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না। দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী সূর্য্যকুমারী এক প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, হলিউডে অভিনয়ের জন্য তিনিও আমন্ত্রিত হন তবে তিনি এখনও সঠিক কিছু স্থির করেন নি। প্রায় পনেরো দিন তাঁরা হলিউডের বিভিন্ন ষ্টুডিও ও চলচ্চিত্র-শিল্পের কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। ওখানকার চলচ্চিত্র-শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান থেকেই তাঁদের আপ্যায়িত করা হয়। হলিউডের প্রায় প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও হয়। কলকাতায় রাত্রিযাপনের পর ২৪শে অক্টোবর প্রত্যূষেই তাঁরা বিমানযোগে বোম্বাই যান।

এই দলেরই অন্যতম সভ্য শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ সরকার গত ২৮শে অক্টোবর বিমানযোগে জাপান থেকে কলকাতায় এসে পৌঁচেছেন।

চিত্রসাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর আমেরিকা ও জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এই ভ্রমণের ফলে উভয় দেশের মধ্যে সখ্যতার সম্পর্ক আরও দৃঢ়তর হয়েছে। ভারতকে

চিত্রগ্রহণের অন্তরালে

চিত্রগ্রহণের প্রাক্কালে 'রোশেনারা' ছবির একটি দৃশ্যে মহড়া দিচ্ছেন দেবযানী ফটো : নির্মল মল্লিক

আমেরিকা আজ বন্ধুভাবে পেতে চায়। তিনি হলিউডের প্রত্যেক ষ্টুডিওই ঘুরে দেখে এসেছেন এবং দেখে এটা বুঝেছেন যে, ওখানকার ষ্টুডিওর প্রত্যেকটি কর্ম্মীই নিয়মানুবর্ত্তী ও অত্যন্ত কর্ম্মনিষ্ঠ। ছবি তোলার আগে তারা সব বিষয়ই ভালোভাবে পর্য্যালোচনা করে তবে ছবি তোলার কাজে হাত দেয়। আমেরিকায় সকল দেশের ছবি সম্বন্ধেই একটা আগ্রহ আছে। ভালো ছবি হলেই তা' তারা গ্রহণ করে। ভালো ছবিকে যে কোন দেশের হলেই হলো তা সে জাপানী বা ইতালীয়ই হোক্‌ আর ভারতীয়ই হোক্‌। তবে ভারতীয় ছবিকে সব দিক দিয়েই ভালো হতে হবে। শ্রীযুত সরকারের মতে ছবি সুসম্পাদিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ছবির দৈর্ঘ্য সাধারণ আমেরিকান ছবির মত হওয়া চাই এবং ইংরাজীতে সাব-টাইটেল জুড়ে দিতে হবে।

এম জি এম-এর টেকনিকলারে রঙীন ছবি 'কুয়ো ভেডিস'-এ রবার্ট টেলর ও ডেবোরা কার

আমেরিকার ছবির বাজার সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ওখানকার বাজার ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাচ্ছে। ছবি তোলার খরচ কমানোর দিকে প্রযোজকদের দৃষ্টি পড়েছে। আমাদের দেশের মত ওখানে বড় বড় অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাই ছবির প্রযোজক হচ্ছেন। শ্রীযুত সরকার বলেন ওখানে রঙীন ছবি তোলার একটা হুজুগ পড়েছে। অধিকাংশ ছবিই টেকনিকলারে তোলা হচ্ছে।

জাপানের চিত্রশিল্পের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানী চিত্রশিল্পের অবস্থা বেশ ভালোই ছিল কিন্তু যুদ্ধের পর আজিকের দিক থেকে জাপানী ছবির মান অনেক নেমে গেছে। কয়েকটি ভালো ছবি দেখেই জাপানী ছবির বিচার করা চলে না। ওখানেও অনেক খারাপ ছবি তোলা হয়। ভারতীয় ছবি সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ আছে তবে তা' ভালো ছবির বেলায়। ওখানে ছবি তোলার খরচা পড়ে গড়পড়তা আড়াই লক্ষ টাকা।

সম্প্রতি কয়েকটি ছবির সেন্সরের ব্যাপারে কলকাতার আঞ্চলিক সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালী ও যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় পাওয়া গেছে। স্থানীয় চিত্রশিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তিই এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। 'বিন্দুর ছেলে' ছবিটির ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। ছবিটিতে একটি দৃশ্য ছিল যাতে ছ'বছরের ছেলে অমূল্যকে চুম্বন করছেন তার ছোট মা বিন্দু। দৃশ্যটি ছিল সম্বন্ধ।

সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষ দৃশ্যটি বাদ দিতে বলেন। ছবিটির আর একটি দৃশ্যে 'শালা' শব্দের ব্যাবহার ছিল। সে দৃশ্যটি থেকে ঐ শব্দটিও বাদ দেওয়া হয়। ছবিটির কর্ত্তৃপক্ষ অনেক বাদ-প্রতিবাদের পর সেন্সরের নির্দ্দেশ মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে কেন্দ্রীয় সেন্সর কর্ত্তা (সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যান) শ্রীযুত আগরওয়ালা বি, এম, পি, এ'র সেক্রেটারীর এক পত্রের উত্তরে জানিয়েছেন যে মা-র সন্তানকে চুম্বন-দৃশ্য আপত্তিকর নয়।

●

শ্রীযুত আগরওয়ালা এই ব্যাপারে চিত্রসাংবাদিকদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন এবং সেন্সরের ব্যাপায় নিয়ে আলাপ-আলোচনাও করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত আগরওয়ালা জানান যে 'বিন্দুর ছেলে' ছবিটির 'চুম্বন দৃশ্য'টি কাটবার কারণ হলো বিসদৃশ শব্দ। যাইহোক, ছবির সেন্সর ব্যাপারে সেন্সর-কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালীপনা বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বোম্বাইয়ে বাঙলার অভিনেতাদের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে বলে মনে হয়। বাঙলার অধিকাংশ অভিনেতাই বোম্বাইয়ের ছবিতে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ পাচ্ছেন। ইতিমধ্যে অনেকে একাধিক ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধও হয়েছেন।

প্রথিতযশা অভিনেতা অভি ভট্টাচার্য্য বোম্বাই-এর একাধিক ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল মুকুল রায় প্রোডাকসন্সের 'সৈলাব' ছবিটি। এ ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন গীতাবালী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন স্মৃতিরেখা বিশ্বাস আর আগা। ছবিটি পরিচালনা করবেন [illegible]। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন মুকুল রায় স্বয়ং। বর্তমানে অভি ভট্টাচার্য্য কলকাতায় চিত্রভারতীর 'ভোর হ'য়ে এলো' ছবিতে অভিনয় করছেন। এই ছবিতে অভিনয়ের সময়েই তিনি বোম্বাই-এর এই ছবিটিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। তিনি সম্প্রতি বোম্বাইয়ে অভিনয়ের জন্য গিয়েছিলেন। স্যুটিং শেষ হলেই আবার তিনি বিমানযোগে কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন।

জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা অসিতবরণও বোম্বাই চললেন। তিনি অশোককুমার প্রোডাকসন্সের 'পরিণীতা' ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তিনি 'কবি চন্দ্রাবতী' ছবিটি শেষ করে বোম্বাই যাবেন।

বাঙলার আর একজন অভিনেতাও শীঘ্রই বোম্বাই যাচ্ছেন। তিনি হলেন হাস্যরসাভিনেতা জহর রায়। তিনি বিমল রায় প্রোডাকসন্সের 'দো বিঘা জমিন' ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। যাক তবু ভালো যে বোম্বাই এতদিনে বাংলার অভিনেতাদের কদর বুঝতে পেরেছে।

●

অভিনেতা বিকাশ রায়কে হয়তো এবার পরিচালকের নতুন পদে দেখা যেতে পারে। তিনি স্বর্গত: ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' ছবিটি পরিচালনা করতে পারেন।

●

প্রযোজক-পরিচালক দেবকীকুমার বসু সম্প্রতি তাঁর নিজস্ব চিত্রপ্রতিষ্ঠান দেবকী বসু প্রোডাকসনের হয়ে 'পথিক' ছবিটির মহরৎ সুসম্পন্ন করেন। এরপর তিনি তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন 'শ্রীচৈতন্যদেব'-এর জীবনী অবলম্বনে একটি ছবি তুলবেন। এ ছবিটি তিনি অনেকদিন পূর্ব্বেই তুলবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে তিনি এ ছবিটির তুলতে দ্বিধা করছিলেন। কিন্তু তিনি এখন এ ছবিটি তোলা একরকম স্থির করেছেন। তবে ছবিটি পূর্ব্বের পরিকল্পনা মতো হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তোলা হবে।

চার্লি চাপলিনের
★ ক পদ্ধতি ★

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে গত তিরিশ বছর ধ'রে যে-মানুষটি অফুরন্ত হাসির খোরাক জুগিয়ে এসেছেন তিনি হলেন চার্লি চাপলিন। লক্ষ লক্ষ দর্শক এই হাস্যরসিক 'ভাঁড়'টিকে চার্লি, শার্লোট, কার্লিটস্ বা কারলিনো বলে জেনে এসেছেন এবং হাস্যকৌতুকরসাভিনেতা হিসেবে ইনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ইনি যখন কোনো ছবি তোলার কাজে ব্যাপৃত থাকেন সে সময়কার কর্ম্মচাঞ্চল্যের পরিচয় কেউই জানেন না। ছবি তোলার সময় প্রতিটি মুহূর্ত্তকে কাজে লাগিয়ে কারও কোনো কিছু অনুকরণ না ক'রে, অতিশয় গোপনীয়তা অবলম্বন ক'রে চার্লি তাঁর ছবি তোলার কাজ সেরে নেন—পত্র-পত্রিকাদি বা জনসাধারণের কোনো প্রতিনিধিরই সেখানে প্রবেশের কোনোরকম উপায় নেই। তাঁর সহকর্ম্মীরা ছাড়া খুব কম লোকই তাঁর ছবি তোলার সময় উপস্থিত থেকেছেন।

চার্লি সম্প্রতি যে ছবিটি তুলেছেন সেটি একখানি বিয়োগবিধুর-মিলনান্ত ছবি। এ-ছবির নাম হলো 'লাইমলাইট' এবং এটি তাঁর ৮১তম ছবি এবং এটির মুক্তিও সমাসন্ন। তিনি এই সর্ব্বপ্রথম তাঁর ছবির সেটে গিয়ে একজন ফটোগ্রাফারকে খুশীমতো ছবি তোলার অনুমতি দিয়েছেন। যিনি ফটো তুলতে গিয়েছিলেন তাঁকে পাঁচদিন চার্লির বাড়ীতে আর ষ্টুডিওতে কাটাতে হয় এবং বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে ষ্টুডিওতে তাঁর কার্য্যাবলীর বহু ঘটনা ফুটিয়ে তুলেছেন।

আজ চার্লির বয়স ৬৩ বছর—পক্ককেশবিশিষ্ট সৌম্যমূর্ত্তি বেঁটে-খাটো মানুষটি এখনও চলে-ফিরে বেড়ান ঠিক সেই ভাঁড়টির মতোই এবং এখনও আগেকার মতোই তাঁর সেই চিরাচরিত অঙ্গভঙ্গী করেন।

তাঁর কর্ম্মপদ্ধতি, তাঁর অসাধারণ কর্ম্মক্ষমতা, একাদিক্রমে কাজ করে যাওয়ার যে ক্ষমতা, তার কাছে অল্পবয়স্ক অনেক যুবকও পিছিয়ে পড়বে আর হাঁপিয়ে উঠবে। 'লাইমলাইট' ছবির তিনি একাধারে প্রযোজক, কাহিনীকার, সংলাপ-রচয়িতা, গীতিকার, কোরিওগ্রাফার, পরিচালক, সম্পাদক এবং অভিনেতা। অভিনয়-শিল্পীদের পোষাক-পরিচ্ছদের পরিকল্পনাও তিনি দিয়েছেন—সেইসঙ্গে ছবির

মধ্যেকার বহু ভূমিকার মেক-আপ করার কাজেও তিনি স্বয়ং হস্তক্ষেপ করেছেন।

চার্লির অপরিসীম কর্ম্মক্ষমতার মতোই তাঁর প্রতিটি ছবির আবেদনও অসীম। চার্লির তোলা কোনো ছবিতেই কোনো আর্থিক ক্ষতি হয়নি। 'তাঁর অতি-পুরানো' ছবিও আজও বিদেশের বাজারে বেশ জনপ্রিয়তার সঙ্গেই চলে। মার্কিন টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানসমূহ বহুবার চার্লির ছবিগুলির চিত্রস্বত্ব বহু টাকার লোভ দেখিয়ে কিনে নেবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তা ফলবতী হয়নি। তাই চার্লিও বলেন, 'জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমি ছবি তৈরী করবো। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, শেষ ছবি যা আমি তুলবো তাই যেন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি হয়।' 'লাইমলাইট' ছবির সেটে প্রযোজক-পরিচালক চার্লি চাপলিনকে সর্ব্ববিষয়েই নজর রেখে যেতে হয়েছিল। সেটগুলির যেসব নমুনা আঁকা-অবস্থায় ছিল সেগুলি সম্বন্ধে তিনি বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন, প্রত্যেক শিল্পীর সাজ-পোষাক নিজে দেখে নিয়েছেন, ছোট-খাটো ভূমিকাতে যেসব শিল্পী অভিনয় করেছেন তাঁদেরও তিনি পরীক্ষা করে দেখে নেন, আলোকসম্পাত ও অন্যান্য দৃশ্যাদির খুঁটি-নাটি সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করে নিয়েছেন। ফ্লোর-এর মধ্যে উঁচু পাটাতন থেকে দেখা গেছে পক্বকেশ-বিশিষ্ট 'বব'-ছাঁটকরা চার্লির মাথাটি মঞ্চের চতুর্দ্দিকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে দেখছে, কৌতুক-ভূমিকাভিনেতাদের অংশ যাতে আরও উন্নত করা যায় তার চেষ্টা করছে, সেট-এর অদল-বদল করছে, বব এলড্রিশের পাশে এসে খানিকক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছে — ইনিও একজন বেশ কর্ম্মঠ সহকারী পরিচালক। চার্লি বলেন —'আমি যদি এই কাজে আনন্দ না পেতাম তাহলে নিজে এতটা পরিশ্রম করতাম না। আমি সব জিনিসই শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে চাই। পশুদেরও সেরকম কোনো স্বভাব নেই যে তাদের যা করবার আছে সেই কাজ তার হ'য়ে অন্য কেউ করে দেবে।'

সত্যি কথা বলতে কি চার্লির এই ছবির কাজ সুরু হয়েছিল প্রায় আড়াই বছর আগে। এটির চিত্রনাট্য রচনার কাজ আরম্ভ হয় সেই সময়ে। একটি সৎ-উদ্দেশ্যমূলক কাহিনী হিসেবে এটির সুরু হয়েছিল এবং সোজাসুজিভাবেই তার পরিণতি হয়। চার্লি বললেন—'সোজাসুজি জিনিষটাই এত সোজা নয়।' তিনি নিজে হাতে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে সমস্ত চিত্রনাট্যটি লিখলেন, তারপর টুকরো টুকরো অংশগুলিকে একত্রিত ক'রে তাঁর একজন সেক্রেটারীকে দিলেন টাইপ করার জন্য। চার্লি নিজে হাতে যে খসড়াটি লিখেছিলেন সেটি দাঁড়িয়েছিল ৭৫০ পৃষ্ঠায়। এই কাহিনীতে যে-চারটি প্রধান চরিত্র আছে তাদের সম্পূর্ণ জীবনী চার্লি লেখেন আর তাতে তাদের শৈশবকাল বা পারিবারিক বৃত্তান্তও বাদ যায় নি। এর বেশীর ভাগ অংশই পরে বাদ দেওয়া হয়েছিল—পাকাপাকিভাবে যখন কাহিনীটি ঠিক করা হয়। পরে অবশ্য চার্লি বলেছেন—'তবুও ঐ ফেলে-দেওয়া পাতাগুলি থেকেও আমার

কাহিনীর চরিত্রগুলিকে বলিষ্ঠ করার উপকরণ সংগ্রহ করেছিলাম।'

'লাইমলাইট' ছবির মোট 'স্যুটিং দিন' নির্দ্ধারিত ছিল ৩৬ দিন। এ-ছবির বেশীর ভাগ অংশই তোলা হয়েছিল চার্লি চাপলিনের নিজের ষ্টুডিওতে আর এ-ষ্টুডিওর মালিক তিনি ১৯১৮ সাল থেকে।

কিন্তু মাঝে কিছুদিন অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হওয়ার দরুন এ ছবির স্যুটিং শেষ করতে লেগেছিল ৫০ দিন। চার্লির পক্ষে পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি তোলার বেলায় এটিও একটি নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি করেছে। বিলম্ব হওয়ার ফলে চাপলিন তাঁর ছবির বাজেট সম্বন্ধেও বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। দৈনিক স্যুটিং শেষ হওয়ার পর চার্লি বিদ্যুৎগতিতে ছুটতেন প্রোজেকশান রুমের দিকে ছবির 'রাস-প্রিণ্ট' দেখার জন্যে। মেক-আপ-করা অবস্থাতেই তিনি দেখে নেন যে দৃশ্যগুলি তাঁর ভাল লাগে। সেইসঙ্গে বলেন—'কোনো দৃশ্য যদি আমার খারাপ লাগে তখন মনে হয় আমি আত্মহত্যা করি।'

সাউণ্ড ষ্টেজের ওপর উঠে অভিনেতা চার্লি আর পরিচালক চার্লি অনবরত উভয়ে একাত্ম হবার চেষ্টা করতে থাকেন। সন্তুষ্ট না হয়ে হঠাৎ হাত নেড়ে উঠলেন, তারপর পরিচালক চার্লি শুধরে দেয় অভিনেতা চার্লিকে। আবার সুরু হয় চার্লির অভিনয়। মাঝে মাঝে এমনও হয়, কোনো একটি দৃশ্যের হয়তো বহুবার চিত্রগ্রহণ হয়ে গেছে, ক্যামেরার আড়াল থেকে তাঁর সহকারী বললেন—'এ-দৃশ্যটি একটি ছোট-খাটো রত্ন বিশেষ।' অধিকাংশ সময়ে একমত হলেও কিন্তু তিনি আবার একবার চিত্রগ্রহণ করার জন্য বলে ওঠেন—'ঠিক আছে, এই দৃশ্যটি আরও একবার অভিনয় করে দেখে নেওয়া যাক।' আরও একবার দৃশ্যটির চিত্রগ্রহণ হ'ল—হয়তো বারকয়েকই হ'ল—চার্লি চুপচাপ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, হাত দুটো পিছনের দিকে পকেটে রাখলেন, মাথাটি একপাশে হেলিয়ে

দিলেন। তারপর চিন্তান্বিত হয়ে নিজের ঠোঁট দুটো চেপে ধরলেন, হাতের লাঠিতে একটু ফুঁ দিলেন, অভিনেতা চাপলিন আলোর মধ্য দিয়ে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর পরিচালক চার্লি বললেন 'এই-বার ভালই হয়েছে, এটার প্রিন্ট করা হোক।'

'লাইমলাইট' ছবির কাহিনী হ'ল ঐক্যতান বাদকদের জীবনী নিয়ে—এককালে চার্লি নিজেও একজন বাদক ছিলেন। ছবির নায়ক হলো ক্যালভেরো। চার্লি চাপলিন অভিনয় করেছেন এই ভূমিকায়। ক্যালভেরো হলো একজন নামকরা কৌতুকাভিনেতা বিভিন্ন-বারে সে ঘুরে বেড়ায় যদি কিছু সুযোগ পাওয়া যায়। নায়িকা হলো তেরেজা—সে একজন যুবতী নর্ত্তকী। এই ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিংশবর্ষীয়া ইংরাজ অভিনেত্রী ক্লেয়ার ব্লুম। বহু প্রার্থীর মধ্য থেকে এঁকে নির্ব্বাচিত করা হয়। বাতজ্বর হয়ে তেরেজা অসুস্থ হয়ে পড়ে, সে আশঙ্কিত

হলো আর বোধ হয় সে চলতে ফিরতে পারবে না—আত্মহত্যার চেষ্টা করে সে। ক্যালভেরো সে-সময়ে গিয়ে তাকে বাঁচায় সেবা-শুশ্রূষা ক'রে তাকে সুস্থ ক'রে তোলে। প্রতিদানে ক্যালভেরোকেও সে সাহায্য করলো তার দুর্দ্দশা আর অসহায় অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্যে। ক্যালভেরোর আবার সুদিন ফিরে আসে—ক্যালভেরো আবার একদিন স্বনামধন্য ভাঁড় হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে, একজন হাস্যউদ্রেককারী পশুর পরিচালক, আত্মভোলা বেহালাবাদক আর সেইসঙ্গে কৌতুকাভিনেতা হিসেবে আবার সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো।

যেসব দৃশ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে হবে সে-সব দৃশ্যে চার্লি চাপলিন যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সেইসঙ্গে কৌতুক সৃষ্টি করার জন্যে তাঁকে বহু পরীক্ষা করতে হয়েছে আর তাদের উন্নতির জন্যে বেশ ধৈর্য্য ধরে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। এক দৃশ্যে বয়স্ক অভি-নেতা বাষ্টার কীটন পিয়ানো বাজাচ্ছেন আর চাপলিন বেহালা বাজাচ্ছেন—কিন্তু এই দৃশ্যটিকে চিত্রে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে তাঁদের পুরো একদিন সময় লেগে যায়। বাষ্টার কীটনের বয়স ৫৬ বছর আর চাপলিনের ৬৩ বছর—কিন্তু তাঁদের বয়সের কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে তাঁরা নাচলেন, দৌড়-ঝাঁপ করলেন, তাঁদের অভিনীত দৃশ্যটির বারবার মহলা দিলেন, নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। অসংখ্যবার চাপলিন ঘুরপাক খেলেন, উল্টে-পাল্টে আছড়ে পড়তে লাগলেন মঞ্চের সম্মুখভাগে—যেখানে 'ফুটলাইট' আছে সেখানে গড়াগড়ি খেয়ে ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগলেন—সেখানে ঐক্যতান বাদকের দল রয়েছে, তাঁর সহকর্ম্মীরা সবসময় প্রস্তুত হয়ে আছেন—যদি, তিনি পড়ে যান তৎক্ষণাৎ তাঁরা চার্লিকে ধরে ফেলবেন। বাষ্টার কীটনও উইংসের ধারে ছিটকে এসে পড়তে লাগলেন; পিয়ানোর সঙ্গে ধাক্কা খান আর মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়েন। মঞ্চের ওপর যাঁরা কাজ করছিলেন, অন্যান্য নাচিয়েরা, সকলে একসঙ্গে বসে দেখে সে-দৃশ্য উপভোগ ক'রে হাসিতে ফেটে পড়েন—যেন সে-দৃশ্য তাঁরা এর আগে কখনও দেখেননি।

আকাশবাণী

বেতারবন্ধু

আমাদের কথা

বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলি প্রচারের ভার থাকে বিভিন্ন বিভাগের ওপর। প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলির আকৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বেতারের বিবিধ বিভাগগুলি সৃষ্টি হয়েছে। চরিত্রগত বৈষম্য ও বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক বিভাগ কর্ত্তৃক প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলির সমন্বয় নিয়েই বেতারের পূর্ণ, সম্পূর্ণ এবং অখণ্ড বিকাশ। এই সসম সমন্বয় যে দেশে যত ব্যাপক ও গভীর বেতারের সার্থকতা ও স্ফূরণ সে দেশে তত বেশী।

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের বিবিধ বিভাগ সমালোচনার দিকে সেজন্য আমরা এতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছিলাম এবং বিগত ক'মাস ধরে এই জন্যে কলিকাতা বেতারের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তার গুণাগুণ ও ভালোমন্দ বিচার বিবেচনা করেছি। কেবলমাত্র কটু কথায় বা তীক্ষ্ণ শায়ক-সন্ধান নয়—বিভিন্ন বিভাগ কর্ত্তৃক প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলির সমালোচনার সঙ্গেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কি করলে এবং কেমন করে বিভাগগুলিকে আরো উন্নত ও সুসম্বদ্ধ করা যেতে পারে।

'চিত্রবাণী'র 'বেতারবন্ধু'র এই ইঙ্গিত কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের দেবতারা কিভাবে নিয়েছেন জানি না তবে এইভাবে বেতার সমালোচনায় নতুন দিকের সন্ধান দেবার জন্যে বেতার কল্যাণকামী বন্ধুদের সম্বর্দ্ধনা এবং অভিনন্দন লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি। আজ এবারের আলোচনার সঙ্গেই বেতার বিভাগ পরিক্রমা শেষ হয়ে যাবে বলেই আমাদের এই ভূমিকা।

বেতার শ্রোতৃ সংঘ

'বেতার শ্রোতৃ সংঘ শ্রোতাদের প্রতিষ্ঠান। শ্রোতা এবং শিল্পীদের সমস্ত স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখাই এই সংঘের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বেতারের কল্যাণকামী বন্ধুরা শুনে খুশী হবেন কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত [illegible] এই সংঘকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রত্যেক বেতার শ্রোতার এই সংঘে যোগ দিয়ে সংঘকে শক্তিশালী এবং সক্রিয় করে তোলা উচিত। কেবলমাত্র এক টাকা চাঁদা দিয়েই 'শ্রোতৃ সংঘে'র সভ্য হওয়া যায়। শ্রোতৃ সংঘের আঞ্চলিক বৈঠক এবার বসবে দক্ষিণ কলিকাতায়—স্থান সম্ভবতঃ আশুতোষ কলেজ হলে। ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই এই বৈঠক বসবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ সম্পর্কে সম্পাদক, বেতার শ্রোতৃ সংঘ, ১৬।এ, ডাফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা : ৬-এ উৎসাহী শ্রোতারা চিঠি লিখতে পারেন।

সঙ্গীত বিভাগ

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় বিভাগ হলো এইটে। এই বিভাগের কথা আগেই লেখা উচিত ছিল। বেতার বিভাগ পরিক্রমার শেষ পর্ব্বে এই আলোচনা করছি এই কারণে যে "বেশটুকু (শ্রেষ্ঠ) দিয়েই শেষ করা দরকার।"

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের এই বিভাগই কলিকাতা বেতারের গর্ব্ব ও গৌরব।

এমন একদিন ছিল যখন বেতারে সম্ভ্রান্তবংশীয়া মেয়েরা সাহস করে আসতেন না। সঙ্গীত বিভাগে যাঁরা আত্মপ্রকাশ করতেন সমাজে তাঁরা 'ভাল নয়' বলে পরিচিত ছিলেন। ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বংশের বিধি-নিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন প্রথম যে-মেয়ে তিনি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত বিভাগের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রইলেন—তিনি ৺কুমারী পুষ্পরাণী চট্টোপাধ্যায়। কুমারী পুষ্পরাণীকেই এই দিক দিয়ে **'প্রথমা'** বলা যেতে পারে যদিও তিনি ছোটদের প্রথম বন্ধু ৺গল্পদাদু পরিচালিত 'ছোটদের আসর'-এ প্রথম গান গাইতে আসেন এবং সান্ধ্য-সঙ্গীত আসরে উন্নীত হন।

তারপর ধীরে ধীরে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের আগমনে বেতারের সঙ্গীত বিভাগ ভরে উঠতে থাকে।

সঙ্গীত বিভাগের স্মরণীয় অনুষ্ঠান **'মহিষাসুরমর্দ্দিনী'** —'বেতার-বিচিত্রা' আলোচনায় বিগত বারে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

'সঙ্গীত-আলেখ্য' (Musical Block Programme) সঙ্গীত বিভাগের এককালীন উপভোগ্য অনুষ্ঠান ছিল—এই ধরণের অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক ও পরিচালক ছিলেন **বাণীকুমার**। এই ধরণের বেতার-পাগল মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। সারা জীবন এঁর কেটে গেল বেতারের সেবায়। শ্রীযুক্ত ভদ্রের তবু সান্ত্বনা আছে বেতারের বাইরে তাঁর ক্ষেত্রটা খুব সঙ্কীর্ণ নয় বরং সাম্প্রতিককালে তা আরো বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু বাণীকুমার বেতারকে ইহকাল-পরকাল করেছেন—জীবনের শ্রেষ্ঠ যা কিছু দিয়েছেন কিন্তু বেতার এই মানুষটীকে যোগ্য সম্মান আজও দেয় নি। মূলতঃ সঙ্গীত বিভাগের বিস্তৃতি ও স্ফুরণের পিছনে এই শান্ত-সদাশিব মানুষটির দান অসামান্য। আজ সঙ্গীত-বিভাগ থেকে 'বেতার-বিচিত্রা' এবং 'সঙ্গীত-আলেখ্য' দুটিকেই একেবারে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বেতারের সঙ্গীত বিভাগ যে ম্লান ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য।

সঙ্গীত-বিভাগের এই দু'টি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বেতারে সুরু হয়েছিল সুরের খেলা. কত শিল্পী, কত সুরকার এসে ভীড় করেছিলেন সেদিনের বেতারকে তা আজকে ভাবতে অবাক লাগে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্বর্গতঃ শিল্পী **শৈল দেবী**, **সুশীলা সেন মণিপুরী** প্রভৃতির নাম। সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে মনে পড়ে স্বর্গতঃ **হিমাংশু দত্ত**, **সুরসাগর**, **সুরনাথ মজুমদার**, **শচীন দেব বর্ম্মণ**, **গিরিণ চক্রবর্ত্তী**, **শৈলেশ দত্তগুপ্ত**, **বিনোদ চক্রবর্ত্তী** প্রভৃতির কথা। সঙ্গীত পরিচালকদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে কত নবাগত ও নবাগতা যে নতুন প্রতিভাধর শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই—আজকে বেতারে **'শিল্পী সৃষ্টি'** পথটাই কর্ত্তারা নিজেরা বন্ধ করে দিয়েছেন উপরোক্ত অনুষ্ঠান দুটির প্রচার বন্ধ করে দিয়ে। বিশেষ করে 'সঙ্গীত আলেখ্য' প্রতি সপ্তাহে প্রচারিত হতো এবং প্রতি সপ্তাহে নতুন সঙ্গীত-পরিচালক এবং নতুন শিল্পী দিয়ে এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হওয়ার কণ্ঠ-বৈচিত্র্যে এবং সুরমাধুর্য্যে অনুষ্ঠানগুলি অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে উঠতো সেকথা বলা বাহুল্য। নতুন সুর ও নতুন রূপ নিয়ে এইসব অনুষ্ঠান মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বেতার-সঙ্গীত-বিভাগকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলো। কিন্তু আজকের বেতারে শিল্পী তৈরী এবং সুর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা গর্ব্বভরে বলতে পারে কি?

সঙ্গীত বিভাগের গর্ব্বের বস্তু পঙ্কজকুমার মল্লিক পরিচালিত **'সঙ্গীত শিক্ষার আসর'**। এই আসর বাংলা দেশে সঙ্গীত বিস্তারে শুধু সাহায্য করে নি উপরন্তু কিছু শিল্পী 'তৈরী' করতে সমর্থ হয়েছিল এবং আজও হচ্ছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় ১৯৪০-৪১ সালে এই বেতার থেকে

'সঙ্গীত শিক্ষার আসর' শুধু বন্ধ করে দেওয়া হয়নি—প্রায় একশো দশ জন সঙ্গীত-শিল্পীকে কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য দূরে রাখা হয়েছিল—অবশ্য কারণটা আর কিছু নয় সেদিনের বেতারে কর্ত্তার গদি যাঁরা দখল করেছিলেন তাঁদের নামে নানা দুর্নীতির অভি-যোগ ওঠে। বেতার থেকে পোষ্য-পোষণ দূর করবার জন্যে সামান্যতম সন্দেহে বহু স্বনামধন্য শিল্পীকে দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়—কেবল পঙ্কজ মল্লিক ন'ন—আজকের বেতার যাঁদের নিয়ে গর্ব্ব করে সেই বিজন ঘোষ দস্তিদার, সুপ্রীতি ঘোষ, সুরকার সুরনাথ মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, সেতারী শোভা কুণ্ডু (অধুনা ঘোষ) প্রভৃতিকে বেতার থেকে দূরে রাখা যায়—বেতারের সবচেয়ে **মসীলিপ্ত যুগ** এটা।

পঙ্কজকুমার মল্লিককে বাদ দিয়ে 'সঙ্গীত-শিক্ষার-আসর' পরিচালনা হাস্যকর, সেকথা বেতার কর্তৃপক্ষ বুঝে এবং জনমতের চাপে পড়ে তাঁকে বেতারে আবার ফিরিয়ে আনেন।

সঙ্গীত বিভাগের **স্বর্ণ যুগ** বলতে আমি বুঝি ১৯৩৬-১৯৩৯ এই কটা বছরকে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কলি-কাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত বিভাগ কি কণ্ঠ-সঙ্গীতে, কি যন্ত্র-সঙ্গীতে আশ্চর্য্য সমন্বয় রেখে ক্রমোন্নতি করে বললে ভুল বলা হবেনা—এই বিভাগ পৌঁছেছিল ক্রমোন্নতির শীর্ষে—সঙ্গীত-বিস্তারে ব্যঞ্জনায় রচনায় তা নিখুঁত হয়ে উঠেছিল।

কণ্ঠ-সঙ্গীতে নতুন বৈচিত্র্যময় সুরের মায়াজাল বুনলেন আত্মভোলা **কবি ও সুরকার কাজী নজরুল ইসলাম।** বাংলা দেশের সঙ্গীতে তিনি আনলেন নতুন আবেগ, ছন্দ, সুর ও গতি। তাঁর প্রবর্ত্তিত সুর ও গান আজকের বেতারে 'নজরুল-গীতি' নাম নিয়ে নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজও বেঁচে আছে। কবি নজরুল ইসলাম বাংলা দেশের সঙ্গীতকে যেমন রচনা ও সুরবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করে গেছেন তেমনি শিল্পী-তৈরীও তিনি নেহাৎ কিছু কম করে যান নি—যে বেতারের তাঁর কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল বাংলা দেশের সেই বেতার অকৃতজ্ঞভাবে

তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে বেতার থেকে বিদায় করে দিয়েছিল। এটা কলিকাতা বেতারের **ঘৃণ্যতম অপরাধ।** বেতার ত্যাগ করে যাবার কিছুকাল পরেই তাঁর মানসিক বিকলতা আসে। আমার তো মনে হয় বাংলা দেশের বেতার বাংলার এই শ্রেষ্ঠ সুরকার ও রচয়িতাকে **হত্যা** করেছে।

এই 'স্বর্ণময় যুগে' বেতারের সঙ্গীত বিভাগের আর একজনের বিস্ময়কর প্রতিভার উল্লেখ না করলে খুবই অন্যায় হবে। যন্ত্র-সঙ্গীত নিয়েই ছিল এঁর কারবার। সুর-পাগল আত্মভোলা লোক—বেতারে যোগ দিয়েই তিনি যন্ত্র-সঙ্গীত রাজ্যে আনলেন আলোড়ন, নূতন করে সংগঠন করলেন যন্ত্রীদের, বহুজনাকে হাতে করে শিক্ষা দিলেন—গড়ে উঠলো 'বেতার যন্ত্রী সংঘ'—বিদেশী যন্ত্রের কোন রকম সাহায্য না নিয়েই তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের যে যুগ প্রবর্ত্তন করেছিলেন যন্ত্রসঙ্গীতের রাজত্বে তা ভাবতেও অবাক লাগে। এই অদ্ভুত প্রতিভাধর লোকটি শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। এঁর নাম **স্বর্গতঃ সুরেন্দ্রলাল দাশ**—বেতারে **'ঠাকুর্দ্দা'** নামে সুপরিচিত ছিলেন। যন্ত্রসঙ্গীতের রাজত্বে এঁর পরিক্রমণ বিস্ময়কর এবং সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। যন্ত্রসঙ্গীত ছিল ধ্যান, সাধনা ও স্বপ্ন। তাই বিবিধ যন্ত্র নিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার সুসম সমন্বয় ঘটিয়ে যন্ত্রসঙ্গীতের রাজত্বে তিনি দিয়েছিলেন প্রাণের স্পর্শ—আজকে ভাবতেও লজ্জা আসে বাংলা দেশের অকৃতজ্ঞ বেতার তাকে যোগ্য শ্রদ্ধা সম্মান তো দেয় নি, উপরন্তু চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করেছে। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার উত্তরাধিকারিণী তাঁর কন্যা সেতারী **বাসন্তী দাশকেও** বেতারে জায়গা দিতে চায়নি—পোষ্যপোষণ বেতার থেকে দূর করতে গিয়ে কলিকাতা বেতার প্রতিভাবানদের বিদায় করেছে বেতার থেকে।

১৯৪০-৪১ সালের কথা মনে হলে লজ্জা পাই। তখনকার, সঙ্গীত-বিভাগের কর্ত্তা ডক্টর সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর (পরিচয় গ্রামের সম্পর্কেই বা যে দিক দিয়েই হোক) সঙ্গে পরিচয় থাকাটা যেন অপরাধজনক হয়ে ওঠে। তুচ্ছতম। কারণে 'বিনা বিচারে বন্দী'দের মতো বেতার থেকে নির্ব্বাসন করা হয় বহু তরুণ ও প্রতিভাধরদের। এর মধ্যে আমার মনে পড়ে সঙ্গীত-শিল্পী বীরেন বিশ্বাসের কথা। প্রসিদ্ধ গায়ক গিরীণ চক্রবর্ত্তীর উত্তর সাধক হিসাবেই এঁকে আমার অভিহিত করতে ইচ্ছা হোত সে সময়ে। বেতারে নিগৃহীত এই শিল্পী আজ 'বৃত্তিচ্যুত' করেছেন নিজেকে কলিকাতা বেতারের ওপর অভিমানে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর আসছে অন্য বৃত্তিতে নিযুক্ত হওয়ায় কিন্তু বাংলা দেশ বেতার কেন্দ্রের অকারণ অত্যাচারের ও অবিচারের দরুন একজন প্রতিভাধরকে হারিয়েছে—আমার প্রতিবাদ সেইখানেই। এমনি করে বেতারের অন্ধকারে অসংখ্য প্রতিভাধরদের 'গুমখুন' করা হয়েছে বাংলা দেশে বেতারে।

ডক্টর সুরেশ চক্রবর্ত্তী ও শচীন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্যের (এলাহাবাদের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য পরিবারের ছেলে ইনি) রাজত্বকালে বেতারে অনেক নতুন জিনিসের প্রবর্ত্তন ঘটে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পথিকৃৎ **আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী** মহাশয় কর্ত্তৃক দোঁহাকার আধ্যাত্ম জীবন দর্শনের ব্যাখ্যা এবং সঙ্গীত রূপারোপ। এটা ছিল সে-সময়কার মনে রাখবার মতো অনুষ্ঠান।

তারপর অনেক দিন গেছে—সে সময়ে বেতারের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ছিলেন সৃষ্টির উন্মাদ আনন্দে ভরপুর—টাকাটা সে-জীবনে বড় জায়গা অধিকার করে ছিল না বলেই বেতারের বিভিন্ন দিকে এত অগ্রগতি ও উন্নতি ঘটেছিল। আজকে যাঁরা বেতারের বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তার গদি দখল করে বসে আছেন তাঁদের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে কাউন-পওর ঠিক রাখা, চাকুরী বজায় রাখা [illegible] ডাউয়ের গতিতে ওপর দিকে ওঠার 'খিড়কি দরজা' [illegible] বেতারের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতি নয় আত্মোন্নতিতে ব্যাকুল-কাতর-লালসা তাঁদের সর্ব্বাঙ্গে তাই বেতারে শিল্প-সৃষ্টি ও শিল্পী-তৈরী আবার নতুন করে হবে না এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

কলের জল আসার মতো সহজ লভ্যতার মধ্যে দিয়ে নিত্যকার অনুষ্ঠান আজো বেতারে প্রচার হয়। বৈচিত্র্য, আনন্দ, নতুনত্ব, প্রাণ কিছুই নেই এতে। পথ দিয়ে চলতে চলতে রাস্তার কলে টুকরো কাট-গুঁজে দেওয়া কলে অবিরত ধারায় কলের জল পড়ে যেতে দেখেছি, হয়তো আপনারাও দেখেছেন। যার দরকার হচ্ছে সে জল নিয়ে যাচ্ছে। ঝরঝর করে অকারণে জল পড়ে যাচ্ছে। কি জানি কেন পথের ধারে কলের জলের এই বিরামবিহীন ঝরঝরানি আমাকে কলিকাতা বেতারে প্রচারিত অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আজকের বেতার বিরামহীন অনুষ্ঠানের উৎস—তার মধ্যে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

আজকের বেতারের দেবতারা চান সমস্ত শিল্পীরা নতজানু হয়ে তাঁদের কাছে প্রোগ্রাম প্রার্থনা করুক। কর্ত্তারা নড়ে থাবেন না, কেবল চেয়ার জুড়ে বসে চাকুরী রক্ষা করবেন। তাই বেতার-কর্ত্তাদের চাকুরীই বেতারে রক্ষা হয়—ক্ষয়িষ্ণু শিল্প ও শিল্পী-জীবনে প্রাণের আহ্বান আনবার চেষ্টা হয় না।

বেতার-কর্ত্তাদের মানসিক পরিবর্ত্তন এবং চিত্তদারিদ্র্য যতদিন না বদল হচ্ছে ততদিন বেতারের উন্নতি কল্পনা মাত্র।

বেতারের প্রথম যুগ থেকে সঙ্গীত-বিভাগের সঙ্গে শিল্পী হিসাবে যুক্ত ছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে বেশী করে মনে পড়ে **কৃষ্ণচন্দ্র দে** (অন্ধ গায়ক), **আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, উত্তরা দেবী** এঁরা আজও আছেন বেতারে আজকের এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা।

সঙ্গীত বিভাগের আলোচনা শেষ করবার আগে বেতারের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের বেতার থেকে দূরে সরিয়ে রাখার তীব্র প্রতিবাদ না করে পারি না।

শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পী **সুচিত্রা মিত্র**। বেতারের সঙ্গীত আসরে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না।

বাংলা দেশের নামী মেয়ে বিজন ঘোষ দস্তিদার বেতারের বাইরে, কিন্তু কেন? বেতার-কর্ত্তাদের সঙ্গে তাঁদের যে বিষয় নিয়েই বিরোধ থাকুক না কেন—বাংলা দেশের শ্রোতারা কর্ত্তাদের অন্যায় জেদের জন্য কেন দুজন শিল্পীর সঙ্গীত-পরিবেশনথেকে বঞ্চিত হবেন? শ্রোতারা একযোগে দাবী করলে প্রতিবাদ জানালে এই ধরণের অন্যায় জেদ ও ভেদের প্রাচীর তাসের বাড়ীর মতো ধ্বসে পড়বে।

কলিকাতা বেতারের সঙ্গীত বিভাগ বহু গুণীর সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছে—তাঁদের নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু সেই উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্যে কোন উত্তর সাধকের আগমন ঘটেনি—যাঁরা এসেছেন তাঁরা বারে বারে সে-গতিকে রুদ্ধ করেছেন; উন্নতির উৎস-মুখকে করেছেন নষ্ট।

সাম্প্রতিক কালের আর একজনের একটু বিশেষ পরিচয় দিতে ইচ্ছে করে—ইনি ডক্টর সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কলিকাতা বেতারের সঙ্গীত বিভাগকে ইনি যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তার তুলনা হয় না। এঁরই উৎসাহে কাজী নজরুল ইসলাম, স্বনামধন্য স্বর্গতঃ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী শচীন দেব বর্ম্মণ প্রভৃতি সুরকার সুর নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ডক্টর চক্রবর্ত্তী নানা গুণীকে বেতারে আহ্বান করে এনেছিলেন। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বিদ্যালয়গুলি **বাসন্তী বিদ্যা বীথি, সঙ্গীত শিক্ষালয়** প্রভৃতি সঙ্গীত আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করে বেতারের সঙ্গীত অনুষ্ঠানকে উপভোগ্য করে তুলেছিলেন। আজ ডক্টর চক্রবর্ত্তী রাগে ক্ষোভে অভিমানে বেতারের কর্তৃত্ব পদ থেকে নিজেকে অপসারিত করে নিয়ে বেতারের বাইরে অবস্থান করছেন। অবশ্য খুব সম্প্রতি সঙ্গীত বিভাগের বিচিত্র বিকাশ নিয়ে আলোচনা করছেন বেতার-বৈঠকে। গুণী এবং সত্যকার রসজ্ঞ হলেও এঁর প্রধান ত্রুটী এঁর বাচনিক বিকৃতি। সঙ্গীত-শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানসঞ্চয় করলেও কেবলমাত্র বাচনিক ত্রুটির জন্য আলোচনাগুলির রসগ্রহণে ও উপলব্ধিতে বহু বাধা দেয়। এঁর উচিত লিখিত ভাষণগুলি অন্য কাউকে দিয়ে পড়ানো অথবা নিজের ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়া। বেতারের সঙ্গীত বিভাগ এদেশের সঙ্গীতে বিপুল আলোড়ন আনতে পারে, আবিষ্কার ও অন্বেষণ করে নিতে পারে বহু প্রতিভাধর ও নতুন শিল্পীকে কিন্তু বেতারের সেই উৎসাহী কর্ম্মপাগল কর্ম্মী কই?—কোথায় সেই দীপঙ্কর?

লণ্ডন-'বিচিত্রা'

বেতার বিভাগ পরিক্রমা শেষ করবার আগে এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে কিছু না বললে ত্রুটি থেকে যাবে। ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনে (B.B.C.) কলিকাতা বেতারের সহকারী অনুষ্ঠান পরিচালক শ্রীকমল বোস যোগদান করেন এবং প্রতি শনিবার আধঘণ্টার জন্য বাংলা ভাষায় লণ্ডন থেকে যে-অনুষ্ঠান প্রচার করতে থাকেন তা স্বল্পকালের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে—এই অনুষ্ঠানের নাম 'বিচিত্রা'। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই ধরণের অনুষ্ঠান প্রচারিত হলেও শ্রীযুক্ত বোসের যত্ন, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় বাংলা ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠানটি সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কলিকাতা বেতার কর্তৃক পুনঃপ্রচারের ফলে স্থানীয় শ্রোতাদের শোনবার সুবিধা ঘটায় এই অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পায়। অনুষ্ঠানটির জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ঘটেছিল মূলতঃ এর লক্ষ্য ছিল গত বিশ্বযুদ্ধে 'অক্ষশক্তির' প্রচার-কার্য্য চালানো কিন্তু পরিচালনার গুণে এই অনুষ্ঠানটি বাংলা দেশ এবং লণ্ডনে বা ইউরোপে প্রবাসী বাঙালীর মধ্যে একটা যোগসূত্র হয়ে ওঠে। বাংলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, তার

সঙ্গীত ও সাধনাকে এই 'বিচিত্রা' মাধ্যমেই বিদেশীদের কাছে তুলে ধরার সুযোগ শ্রীযুক্ত বোস-করে দেন। 'বিদেশীর চোখে বাংলা', 'বিদেশে বাঙালী' প্রভৃতি অভিনব অনুষ্ঠানগুলি 'বিচিত্রা'র বড় সম্পদ হয়ে ওঠে—আজও 'বিচিত্রা' এই সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। ১৯৪৮-৪৯ থেকে কলিকাতা বেতার কর্ত্তৃক পুনঃপ্রচার বন্ধ করে দেওয়ার ফলে স্থানীয় শ্রোতারা এই অভিনব অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন—এই নিয়ে প্রতিবাদও কম হয় নি—'বিচিত্রা' কলিকাতা বেতারের প্রধান আকর্ষণ ছিল—কলিকাতা বেতারের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে একে একে অনেক কিছুই বন্ধ করে দিয়েছেন বেতারের কর্ত্তারা নিজেদের খামখেয়ালীপনায়—'বিচিত্রা' বন্ধ করে কলিকাতা বেতার নিজেদের বৈচিত্র্যের অংশটা একেবারে কমিয়ে এনেছেন। বিচিত্রা' কলিকাতা কর্ত্তৃক পুনঃপ্রচারিত না হলেও 'রেডিও সিলোন' সম্প্রতি এটি পুনঃপ্রচার করার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতি শনিবার রাত ৭-৪৫ মিঃ ১৩ ও ১৯ মিটারে লণ্ডন থেকে 'বিচিত্রা' প্রচারিত হচ্ছে। কোন্ দূর দেশে বসে বাংলা দেশের একটি ছেলে বাংলা দেশ ও বাঙালীদের উদ্দেশ্যে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে শ্রদ্ধা আজও জানায় এই বলে :

'হে বাঙলা, বাঙালীর লহ নমস্কার'!

'বেতার-জগৎ'

কলিকাতার বেতার কেন্দ্রের মুখপত্র 'বেতার জগৎ' দিয়ে আমার আলোচনা শেষ করি।

বাংলা দেশের সবাসাচী মহাস্থবির সাহিত্যিক-পরিপরিচালক শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীই এর প্রথম সম্পাদক। তখন বেতারের আদি যুগ—বেতার পাগল মিঃ ষ্টেপলটনের যুগ। 'বেতার জগৎ'কে প্রতিষ্ঠিত ক'রবার জন্যে তাঁর কি তাড়া! এই তাড়া খেয়ে স্বয়ং সম্পাদককেই বিজ্ঞাপনের খোঁজে বেরোতে হতো—কখনো কখনো শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র ভদ্রকেও। 'বেতার জগৎ'-এর চাহিদা আছে এই কথা সাহেবকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য অনেক সময় এঁরাই 'বেতার জগৎ' এর কপিগুলো কিনে নিতেন। তখন এর দাম ছিল দুপয়সা। এতে থাকতো অনুষ্ঠান-লিপি, এই সম্পর্কীয় দু'চারটা কথা আর বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকারই 'বেতার জগৎ'কে জাতে তোলবার চেষ্টা করলেন। তিনিও পাগলা ষ্টেপলটনের তাড়া খেয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত সরকার অধুনা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আছেন। হাসির গানে তাঁর নামও নেহাৎ কম ছিল না। কলিকাতা বেতারের তিনি **প্রথম সরকারী পেনসনপ্রাপ্ত লোক**। যাহোক তিনি 'বেতার জগৎ'-এর বহুবিধ সংস্কার ক'রে ছিলেন—শিল্পীদের ছাব ছাপা তাঁর যুগ থেকেই সুরু হয়। তবে তাঁরও ত্রুটি ছিল কিছু—বেতারে স্বনামধন্য ও গুণী ব্যক্তিরা যে বক্তৃতা দিতেন তা বেতারেই ফাইল চাপা পড়ে থাকতো। পত্রিকাকে সাহিত্য পদবাচ্য ক'রে তোলার চেষ্টা তিনি করেন যখন তাঁর পেনসন নেবার সময় হলো।

তবে তাঁর সময়ে আর কিছু থাক না থাক অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ থাকতো—শিল্পীদের নাম, গাইবার সময় কাল, কি ধরণের গান, গানের প্রথম লাইন প্রভৃতি যেমন থাকতো তেমনি বিভাগীয় অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণও থাকতো—আজকের দিনের 'বেতার জগৎ' অনুষ্ঠান মুদ্রণের নামে কর্ত্তারা যে ছেলেখেলা? বোল-খেলা করেছেন তা করা হ'তো না। আজকে বেতারে প্রদত্ত বক্তৃতা, গল্প, কবিতাগুলি 'বেতার জগৎ'-এ ছাপা হলেও মুদ্রণ-পারিপাট্য সত্ত্বেও বানান ভুলে যে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তা উল্লেখযোগ্য। অনিমা ঘোষ-এর জায়গায় অনিমা মোম হলে অনিমা নামক বঙ্গবালার মনের ও মুখের চেহারা কি হয় তা মনে করার আগে পাঠক উচ্চহাস্যে ফেটে পড়বেন নিশ্চয়ই।

বেতার উন্নতি করুক আর নাই করুক—'বেতার জগৎ' অসম্ভব উন্নতি করেছে, সুরুচিরও প্রশংসা করবে। তবে অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ যদি না-ই রইলো তাহলে অনুষ্ঠান-লিপি ছেপে লাভ কি—অনুষ্ঠান-লিপির পুরো বিবরণ আজকের বেতার-শ্রোতাদের দাবী।

আগামী মাস থেকে নতুন ধারায় ও নতুন রীতিতে 'বেতার-বন্ধু' বেতার সমালোচনা সুরু করবেন।

রঙীন ছবির হুজুগ

বিমল রায়

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

[বোম্বাই চিত্রজগতে যোগদান ক'রে বাঙলা দেশের যে কজন পরিচালক বিশেষ কৃতিত্ব এবং বাঙলার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন তার মধ্যে বিমল রায় অন্যতম। 'উদয়ের পথে', 'অঞ্জনগড়', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'মা' (হিন্দী) প্রভৃতি চিত্রের পরিচালক বিমল রায়ের এই রচনাটি গত শারদীয়া 'চিত্রবাণী'র জন্য লিখিত। কিন্তু রচনাটি বিলম্বে পাওয়ায় ঐ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু চিন্তাশীল পাঠকপাঠিকার আগ্রহ উদ্দীপ্ত করবে।—'চিত্রবাণী'-সম্পাদক]

বিজ্ঞানের উন্নতিতে আজ অনেক কিছু সম্ভব—কত অসম্ভবকে সে আজ করেছে সম্ভব। আজকের চিত্রশিল্প অনেকটাই বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। কিছুদিন আগেও যা ছিল মুখে মুখে শোনার জিনিষ, একদা সেই পেল কথা গেঁথে ভাব ও স্থান বিচার ক'রে নাটকরূপে তাকে মঞ্চে রূপ দেওয়ার অধিকার ও সেইসঙ্গে একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিতও সে দিল। আজ সেই পেল একেবারে রাজকীয় সম্মান—পর্দায় রূপ দেওয়ার অধিকার—এ সম্মান অভূতপূর্ব জয়যাত্রার পথে একটা অসমসাহসিক পদক্ষেপ!

প্রথম যুগের চিত্রশিল্পের সঙ্গে আজকের দিনের চিত্রশিল্পের তুলনা করলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রথমে তোলা হ'ল শুধু ছবি—ছায়ার চলা-ফেরার ওপরই তার দখল। পরে এল শব্দ-বের হ'ল সবাকচিত্র। আর আজ—শুধু কথা নয়, শুধু ছায়া নয়, গান, সুর, ছন্দ, নৃত্য, তাল সব—আর কি চাই! এক এক ধাপে এক একটা আকাশচুম্বী উন্নতি। মানুষ মুগ্ধ, স্তম্ভিত, দিশেহারা; শুধু সেখানেই শেষ নয়, তারপর যা এল সে তারো চমকপ্রদ; আরো চাকচিক্যপূর্ণ, কথার সঙ্গে গান আর ছবির সঙ্গে সঙ্গে রং—একেবারে সোনায় সোহাগা—এতযে অভাব ছিল তা' আজ পূর্ণ হ'য়ে গেল।

রঙীন ছবি দেখানো হবে শুনলেই মানুষ আনন্দে নেচে ওঠে; সত্যি কথা, ভাল যা তা' সবসময়েই ভালো—সকলের রুচিকে বজায় রেখে যে জিনিষ দেওয়া যায় তার দাম অনেক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশের পক্ষে এই যে একটা রঙীন ছবি তোলার হুজুক এসেছে তা আজকের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সেই সম্বন্ধেই আমার অভিমত ব্যক্ত করছি। এ অভিমত ভালো কি খারাপ তা' বলতে পারিনা—আমার দৃষ্টিতে যা' ধরা পড়েছে শুধু তাই ব'লব।

বিজ্ঞানের যতটুকু উন্নতি অন্যান্য দেশে আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হ'য়েছে, আমাদের দেশে ততটা এখনও সম্ভব হয় নি। তার কারণ হয় ত' বহুবিধ। নিছক চিত্রশিল্পের দিক থেকে দেখতে গেলে দেখতে পাই, যে ছবি আজ আমাদের চোখের সামনে সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ব'লে দাবী করছে তার প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিষ পর্য্যন্ত বিদেশে তৈরী—সেখান থেকে যন্ত্র এমনকি যন্ত্রী আনিয়ে আমরা চিত্রশিল্প গ'ড়ে তুলেছি। এ শিল্পের যন্ত্রপাতির দিক থেকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল আজও আমরা হ'তে পারি নি। আগে তারই সম্পূর্ণতা প্রয়োজন এবং তারই ওপর ভিত্তি ক'রে বিচার করতে হবে রঙীন কি রংবিহীন চিত্র তার সৌন্দর্য্য বাড়াবে।

আমাদের দেশের চিত্র-পরিচালক ও প্রযোজকরা মনে করেন যতবেশী টাকা খরচ ক'রে ছবি তোলা যাবে ততই ছবির দাম বাড়বে। এমনিতেই যে সমস্ত ছবি আজ পর্য্যন্ত তোলা হয়েছে, তার পেছনে কয়েক লাখ টাকার নীচে কোন অঙ্ক চোখে পড়ে না। তার কারণ কি বেশী টাকা আছে বলেই বেশী টাকা খরচ করতে হবে—না, টাকা বেশী ঢাললে বেশী টাকা আসবে—কোন্‌টা? যা-ই ভেবে থাকুন না কেন এপথ সম্পূর্ণ ভুল পথ তা' হয়তো এতদিনে তাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। না উঠলেও তা' ফুটতে বেশী দেরী নেই।

তার ওপর এসেছে আবার রঙীন চিত্রের যুগ—দু-চার-পাঁচ লাখ টাকা খরচ ক'রে তাদের তৃপ্তি হ'ল না—এবার বড় দাঁও—একেবারে ৩০ থেকে ৫০ লাখ-টাকা

খরচের ফিরিস্তি নিয়ে বসেছেন, আর তা না হবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই—ব্যবসা তো! যেভাবেই হোক টাকা লুঠতে হবে। আর বিংশ শতাব্দীর যুগে যার বেশী চাক-চিক্য, যার বেশী জৌলুষ, তারই হাতে তো বাজার! আর বাজার হাতে রাখবার জন্যই চাই রঙীন চিত্র—বিজ্ঞান যখন এত সুযোগ ঘরের দোর-গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে গেছে তখন আর পায় কে!

কিন্তু ব্যাপার যত সোজা ভাবা যায় তত সোজা নয়। বেশী টাকা তোলার আশা আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছু নয়। অন্ততঃ আজকের ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে সে কথা বলা চলে। জনসাধারণ একে দরিদ্র, দ্বিতীয়তঃ করভারে প্রপীড়িত—খাদ্যহীনে শীর্ণ, বেকার-সমস্যায় ধ্বংসোন্মুখ, এদের সামনে এত টাকার ছবি তুলে এদের মনোরঞ্জন ক'রে তার বেশী টাকা, মানে লাভের অঙ্ক তোলা বড়ই শক্ত ব্যাপার! এখানে শুধু ব্যবসা-বুদ্ধি খাটালে চলবে না, হৃদয়বুদ্ধিও খানিকটা খাটানো উচিত।

তা' ছাড়া যে খরচের একটা রঙীন ছবি তোলা হবে—ঠিক সেই খরচেই আরো কম ক'রে ১০।১২খানা ভাল ছবি তোলা যেতে পারে। যদি আমাদের দেশে রঙীন চিত্র নিয়ে গবেষণা হ'ত বা তার মালমশলা, সাজ-সরঞ্জাম এতটা দামী না হ'য়ে সুলভ হ'ত তবে যে-টাকা ছবি তোলার জন্য বা ছবিকে 'প্রিণ্ট' করার জন্যে বিদেশে প্রেরণ করা হয়, সে টাকা দেশে থেকে যেত। সত্যি, যে-টাকায় ছবি তোলা হয় তার প্রায় অর্দ্ধেকের মত টাকা বিদেশে চলে যায়। যদি তা' সম্ভব হ'ত তখন ডবল রঙীন ছবি তুললেও কেউ প্রতিবাদ করতে আসতো না।

একেই তো ভারতবর্ষ গরীব, শিল্পপ্রধান দেশ নয়. যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ, তাদের সবেতেই বিদেশী ছাপ-মারা মূলধনে বাজার ছাওয়া,—লাভের বেশী অংশ চলে যায় বিদেশী ধনাগারে—তার ওপর যদি না ভেবে-চিন্তে, সুফল-কুফলের দিকে মোটেই নজর না দিয়ে, শুধুমাত্র হুজুগে মেতে এতগুলি টাকা ধুলোর মত মুঠো মুঠো উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা শিল্পপতিরা জেনে-শুনে করেন, তবে শিল্পের ইতিহাসে এটা খামখেয়ালীর একটা চরম দৃষ্টান্তস্বরূপই থেকে যাবে। ধ্বংসোন্মুখ এই শিল্পকে আরও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেওয়া ছাড়া হয়তো এর থেকে অন্য কোন সুফল পাওয়া যাবে না।

দোষ শুধু একটা নয়—যে টাকা ব্যয় করে তাঁরা ছবি তুলছেন ব্যবসার দিক থেকে তার চেয়ে বেশী টাকা না তুলতে পারলেই তো ব্যবসা অতলতলে তলিয়ে যাবে বলে মরাকান্না সুরু ক'রে দেবেন; দোষ গিয়ে পড়বে জনসাধারণের ঘাড়ে—যেহেতু, যত বেশী লোকের ছবি দেখা দরকার—তত বেশী লোকে দেখলো না। এমন জিনিষের মর্ম্ম তারা বুঝলো না, অতি মূর্খ, অতি নির্ব্বোধ, তা' নয় তো দেশের আজ এই অবস্থা হবে কেন। জ্ঞানে বিজ্ঞানে আজ না হয় কত উন্নতি হ'তে পারতো হোলো না কেবল...............

এই ধরণের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে মিষ্ট কথায় উড়িয়ে দিতে চাইবেন। জনসাধারণ মর্ম্ম বুঝল না বা তারা বেশী পরিমাণে কেন দেখলো না। কি তার দোষ, কি তাদের অভিযোগ এই সমস্ত বিষয় কেউ একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন আসল সমস্যাটা কোথায়? যে পাইকারী হারে জলের মত টাকা ঢেলে তাঁরা রঙীন ছবি তুললেন সেই পরিমাণ টাকা থেকে কি পরিমাণ টিকিট বিক্রী হ'লে লাভ হ'তে পারে—তাঁরা তা ভেবে দেখেন নি। সাধারণ ছবির বেলায় যে বিক্রী হয় তার চেয়ে ১০ কি ১২ গুণ বেশী বিক্রী হ'লে তবে লাভ হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, শুনতে পাওয়া যায় সাধারণ ছবিই অনেক সময় মার খায়—মানে, আশাতীতরূপ বিক্রী হয় না। তবেই বুঝতে পারা গেল যে বিক্রী বজায় রেখে লাভ তুলতে হ'লে টিকিটের মূল্য কম ক'রে দ্বিগুণ বরা উচিত। অর্থাৎ দিনে-দুপুরে ভদ্রভাবে ঘরে ডেকে এনে জনসাধারণের পকেটে হাত চালিয়ে দেওয়া। ফলে, তাঁরা দূর থেকেই প্রণিপাত ক'রে সভয়ে দূরে সরে পড়েন। ছবি দেখার আশা তাঁদের মনের মধ্যেই গুমরে মরে।

তা' ছাড়া বড় বড় সহর বাদ দিয়ে ছোট ছোট মফঃস্বল সহরের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে এই রঙীন চিত্র দেখানো অত্যন্ত অসুবিধাজনক। সেখানকার প্রেক্ষাগারগুলির অপ্রসারতা, প্রয়োজনীয় আলোর অভাব—এ সমস্ত কারণে বড় বড় কয়েকটা সহরে প্রেক্ষাগৃহ ছাড়া বাইরে এইসব ছবি দেখানোতে ভয়ানক অসুবিধে রয়েছে। ছবি তুলে যদি দেখানোই না গেল তবে এমন ছবিতে কাজ কি?

যে কতকগুলি অসুবিধাজনক পরিস্থিতির জন্যে রঙীন ছবি এখন আমাদের দেশে তোলা এবং দেখানো বিশেষ ক্ষতিকর তা' বলা হ'ল। অন্ততঃ আজকের দিনের জনসাধারণের এই আর্থিক দুর্দ্দশায় এ ছবি থেকে প্রযোজকেরা যে লাভবান হবেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে এবং ব্যবসার দিক থেকেও তা' না হওয়া সত্যিই মারাত্মক!

ন·তুন নাটক

মিনার্ভায় 'কেরাণীর জীবন'

গত ২৩শে অক্টোবর নূতন নাটক "কেরাণীর জীবন" মঞ্চস্থ হয়েছে 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে। নাটক রচনা ক'রেছেন সৌখিন সম্প্রদায়ের নাট্যকার ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা ক'রেছেন রঞ্জিৎ রায় আর শিক্ষকতা ক'রেছেন সন্তোষ সিংহ। এই নাটকের প্রযোজনায় মিনার্ভার প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন নিউ থিয়েটার্স-খ্যাত জলু বড়াল।

সওদাগরী অফিসের হেড ক্লার্ক বা বড়বাবু বিধুভূষণ মুখুজ্যেকে দশটা-পাঁচটা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বকাটে ছেলে, বিধবা মেয়ে ও অন্যান্য পরিবার-পরিজন প্রতিপালন করতে হয়। বাড়ীওয়ালা, মুদি, গোয়াল', কয়লাওয়ালা প্রভৃতি পাওনাদারদের নিত্যনৈমিত্তিক তাগিদে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও কাউকে সে চটাতে পারে না, কাউকে কিছু দিয়ে কাউকে মিষ্টি কথা বলে বিদায়ের চেষ্টা করে, বলে,—"পালিয়ে তো আর যাচ্ছিনে।" কিন্তু সংসার ক্রমশ: অচল হ'য়ে ওঠে, বয়াটে বড়ছেলেটা মদ খেয়ে খেয়ে যক্ষ্মা বাধিয়ে আসে—তার চিকিৎসার খরচও আছে। নানা দুশ্চিন্তায় ও হাড়ভাঙা খাটুনিতে বিধুও অসুখে পড়ে, দেখা দেয় সঙ্কট। এদিকে অফিসে একদিন 'লেট' হওয়ায় ছোটসাহেব মি: গুহ অত্যন্ত ইতরভাবে তাকে গালাগালি করে, যা' বিধুর একুশ বছরের চাকুরী-জীবনে কোনও দিন ঘটে নি। ক্রমাগত এমনি ব্যবহারে মানসিক দিক দিয়ে বিপর্য্যস্ত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে সে। এই অবস্থায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবশ্য বড়সাহেবের দয়ায় অফিসে মেজমেয়ে মিনুর চাকুরী হওয়ায় কিছুটা সুরাহা হলেও শেষ পর্য্যন্ত স্ত্রী ও বড়মেয়ে মাধুর গহনাপত্রও বিক্রী হ'তে লাগলো। তার ওপর বড়ছেলে পটলের অসুখ হ'ল বাড়াবাড়ি, সে-মারা গেল, দুর্ব্বল-স্বাস্থ্য বিধু এই ধাক্কা সামলাতে পারল না, সেও হার্টফেল ক'রে মারা গেল —এখানেই নাটকের শেষ।

কেরাণীর জীবন চিত্রিত ক'রতে গিয়ে নাটকে যা' দেখানো হয়েছে; তা' সত্যকার কেরাণী-জীবনের চিত্র না হয়ে, হয়ে উঠেছে কেরাণী-জীবনের ব্যাঙ্গাত্মক বিকৃতি। এই নাটকের কেরাণী সাধারণভাবে ফাঁকিবাজ, আড্ডাবাজ আর অফিসারের সমালোচক,—বিশেষ ক'রে কেরাণী নিবারণের মুখে যে গানখানা দেওয়া হয়েছে কিংবা অপর একটি কেরাণীকে দিয়ে যে-কবিতাটি পড়ানো হয়েছে তাতে ফাঁকিবাজ ও মেরুদণ্ডহীন চরিত্রটিকেই গুরুত্ব দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। সেইজন্যই বোধহয় অফিসারের অভদ্র ব্যবহার আর অন্যায় জুলুম সবাই মাথা পেতে নেয়, ব্যক্তিগতভাবে বা সঙ্ঘবদ্ধভাবেও প্রতিবাদ করে না। আজকের দিনে এই ঘটনা যেমন অবাস্তব, কেরাণীরা মূলত: ফাঁকিবাজ এটাও তেমনি অসত্য। মালিকের শোষণ—অল্পবেতন, গুণের অস্বীকৃতি ও অন্ধ প্রভুভক্তির উৎসাহ, অমানুষিক কাজের চাপ (work load), মাথাভারী শাসনযন্ত্র এবং স্বৈরাচারী ও আমলাতান্ত্রিক পরিচালনপদ্ধতি, সহকর্ম্মীদের মধ্যে সুস্থ সামাজিক জীবনে বাধা, আইনসম্মত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দমন ও ট্রেড ইউনিয়ন বা কর্ম্মচারী সংগঠনের সহযোগিতা অস্বীকার প্রভৃতির আকারে কেরাণীকুলের ওপর যে শাসনতান্ত্রিক চাপ সৃষ্টি ক'রে তা' থেকেই যে কাজে ফাঁকি, অফিসারের সমালোচনা ইত্যাদি কিছু কিছু পরিমাণে দেখা দেয় এবং সমগ্রভাবে কেরাণীরা যে ফাঁকিবাজ নয়, অফিসাররূপী স্বাক্ষরকারী সাক্ষীগোপালরাই অফিসের সব কাজ যে উঠিয়ে দেয় না বা দিতে পারে না এই ধরণের বিশ্লেষণ না থাকায় কেরাণীর সে জীবনের সঠিক চিত্র ফুটে ওঠে নি নাটকে। অফিসার চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকার মোটামুটি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু অফিসার হলেই বর্ব্বর হয় না এটা যেমন তিনি দেখাতে চেষ্টা ক'রেছেন, কেরাণীর চরিত্র-চিত্রণে সে-পরিশ্রম তিনি করেন নি। নায়ক বিধুভূষণকে দুদিনই 'লেট'-অবস্থায় হাজির করেছেন অফিসে। তা' ছাড়া মালিককে একদম অনুপস্থিত রেখে

আর তাকে ন্যায়বান বিচারক বলে কল্পনা ক'রে (যেমন রবীন বা মিনু মিঃ গুহকে ওপরওয়ালার ভয় দেখিয়েছে) এক নিদারুণ মিথ্যা চিত্র এঁকেছেন নাট্যকার। মালিকরা কখনও তাদের প্রতিনিধি অফিসারদের অসম্মান বা বিরোধিতা করে না,—আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এটা সাধারণ সূত্র। তাই অন্যদিকটাও দেখানো উচিত ছিল, বিশেষতঃ কেরাণীর কেরাণী-জীবনের উৎস যখন সেই মালিকেরই ব্যবস্থা। কর্ম্মচারীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ, ট্রেড-ইউনিয়ন ইত্যাদিকে অনুপস্থিত রেখে নাট্যকার আজকেরদিনের বাস্তব ঘটনাই শুধু চেপে গেছেন তা' নয়, মেরুদণ্ডহীন কেরাণীর অসহায় অবাস্তব চরিত্রকে গৌরবান্বিত ক'রে তুলতে চেয়েছেন দর্শকদের কাছে। সর্ব্বোপরি, বয়াটে পটল ও ফাঁকিবাজ নিবারণের অনুপাতাতিরিক্ত অবস্থান, মিনু-রবীনের অনাবশ্যক ও আরোপিত রোমান্স নাটককে শুধু ভারাক্রান্ত করেনি, বিপথে চালিত ক'রবারও চেষ্টা ক'রেছে। মুদি-পটলের বাক্যালাপ রসাল হলেও অবাস্তব ও বিসদৃশ। পটলের বন্ধুর টাক' দেওয়ায় করুণ রসের সৃষ্টি হয় বটে, যুক্তিসম্মত নাট্যরস নিষ্পত্তির কোনও সহায়তা হয় না।

এসব সত্ত্বেও নাট্যকারের মুন্সিয়ানা আছে স্বীকার করতে হবে। অফিসের ঘনিষ্ঠ পরিবেশসৃষ্টিতে নাট্যকারের আন্তরিকতা প্রশংসার্হ। নায়ক বিধুর চরিত্র বিশেষত্ববর্জ্জিত হলেও ছোটসাহেব মিঃ গুহ, কেরাণী সত্যেন ও তার দুজন সহকর্ম্মী, বিধুর স্ত্রী দামিনী, বড় মেয়ে মাধু, বেয়ারা হলধর যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। অবশ্য তাদের সংলাপ সর্ব্বত্র সুনির্ব্বাচিত নয়, যেমন মাধুর প্রথম সংলাপ "জন্মেই বাপকে খেয়েছিস" ইত্যাদি ঠিক এইভাবে বোধ হয় চলে না, 'বাপ' কথাটা বাদ দিয়ে অন্য কথায় অর্থ প্রকাশ করলেই মাধু-চরিত্রটি আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠতো। দৃশ্যসংস্থানের দিক দিয়ে নাট্যকার উন্নততর শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন—একই দৃশ্যে একই সঙ্গে তিনটি কামরায় কথাবার্ত্তা চালিয়ে

নাটককে তিনি শুধু দ্রুতগতিই করেন নি, নাট্যদ্বন্দ্বময়ও ক'রে তুলেছেন। কিন্তু সমগ্রভাবে নাটকটি স্বাভাবিক নাট্যদ্বন্দ্বের পথ বেয়ে অগ্রসর হ'তে পারে নি, অগ্রসর হয়েছে লক্ষ্যাধর্ম্মী সরলরৈখিক পথে। বিধুভূষণের বাড়ীতে কেবলই চলেছে দুর্দ্দশার ওপর দুর্দ্দশা, বিপর্য্যয়ের ওপর বিপর্য্যয়, এই দুর্দ্দশা থেকে, বিপর্য্যয় থেকে বাঁচবার শক্তিশালী প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা তেমন নেই পরিবারে, মাধুর সক্রিয়তাকে বাদ দিলে একেবারে নেই বলা যায়।

অভিনয়কুশলতায় সর্ব্বপ্রথমে নাম করতে হয় ছোট-সাহেব মিঃ গুহের ভূমিকায় শ্রীগৌরীশঙ্করের। এই অভিনয়শিল্পীটির গাম্ভীর্য্য, দাপট, সুন্দর ইংরাজী উচ্চারণ আর সপ্রতিভ অভিনয় মর্য্যাদাসম্পন্ন ক'রে তুলেছে মিঃ গুহকে। এর পরেই নাম করতে হয় চঞ্চলা লীলা-চপলা বিনুর (বিধুর ছোটমেয়ে) ভূমিকায় যে-মেয়েটি অভিনয় ক'রেছেন, মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে এই চরিত্রে। পটলের চরিত্রে সাধারণ মঞ্চে নবাগত ঠাকুরদাস মিত্র আর মাধুর ভূমিকায় শ্রীমতী রমা ব্যানার্জ্জি চরিত্রোপযোগী মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন যথাক্রমে তাঁদের অসংযত ও সংযত অভিনয়ে। ঠাকুরদাসবাবুর কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য্য না থাকলেও বাচনভঙ্গীতে আর চক্ষু-ভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু প্রস্থানকালীন অন্যান্য অঙ্গ-ভঙ্গীর প্রশংসা করা যায় না, যেমন কাৎ হয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রস্থানের ভঙ্গী। এই ভঙ্গীটি শিল্পীর মুদ্রাদোষ বলেই আমাদের মনে হ'ল। রমা দেবীকে এর আগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি লীলা-চঞ্চলা নারীর ভূমিকায়, কিন্তু মাধুর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভূমিকায় তিনি শিল্পজীবনের আর একটা দিকের সন্ধান পেলেন। প্রবীণ অভিনয়শিল্পী শিবকালী চট্টোপাধ্যায় মুদির ভূমিকাটিকে বেশ উপভোগ্য ক'রে তুলেছেন। বড়সাহেবের ভূমিকাভিনেতা সমর মিত্র, রবীনের ভূমিকায় সুশীল রায়, দামিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী বেলারাণী আর নিবারণের ভূমিকায় রঞ্জিৎ রায়, অন্যান্য কেরাণী ও বিধুবাবুর ছোটছেলের ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় ক'রেছেন তাঁরা চরিত্রানুগ অভিনয় ক'রেছেন। নায়ক বিধুর ভূমিকাটি বিশেষত্ববর্জ্জিত হলেও দক্ষ শিল্পী সন্তোষ সিংহ ভূমিকাটিকে জীবন্ত ক'রে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু তাঁর অভিনয়-দীপ্তি স্থানে স্থানেই শুধু ঝলসে উঠেছে।

ভূমিকা-নির্ব্বাচনে আর অভিনয়ে সবচেয়ে বেদনার কারণ হয়েছে মিনুর ভূমিকাটি। নাটকটি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা'তে বেশ স্থান রয়েছে মিনুর। মিনু পূর্ণযৌবনা আত্মমর্য্যাদাসম্পন্না, শিক্ষিতা, তেজস্বিনী মহিলা। এই চরিত্রটিতে চিত্রাভিনেত্রী সুদীপ্তা রায়ের নির্ব্বাচন শুধু ভুলই হয় নি, অন্যায় হয়েছে। স্থূলদেহিনী শিল্পীর বিলম্বিত চলনভঙ্গী, চরিত্রবিরোধী প্রস্থানভঙ্গী (রবীনের প্রথম প্রবেশের পূর্ব্বে), অনভ্যস্ত বাচনভঙ্গী ও স্বরক্ষেপ আর অতিনিম্ন কণ্ঠস্বর 'মিনু'-চরিত্রকে একেবারে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে। তাঁর কণ্ঠে যে দুটি গান দেওয়া হয়েছিল প্রেক্ষাগৃহের নবম সারিতে বসেও তার

কথা বিন্দুবিসর্গ শোনা যায় নি। বাড়ীওয়ালার ভূমিকাভিনেতার গলা আছে কিন্তু শিল্পসম্মত স্বরক্ষেপের যোগ্যতা নেই।

সুসঙ্গত আলোকসম্পাত ও দৃশ্যসজ্জা নাটকের প্রয়োগ-কৌশলের দিকটা উন্নত ক'রেছে। রূপসজ্জায় পটল কিছুটা বেমানান আর রবীন কিছুটা অতিরিক্ত বয়সের মনে হলেও মোটামুটি সকলেরই যথাযথ হয়েছে। বঙ্কিং রায়ের বিশিষ্ট সুরে গান বাঁধা হয়েছে, কিন্তু সে গান তাঁর কণ্ঠে উপভোগ্য হয়েছে, অন্যের কণ্ঠে হয় নি।

—সুবোধকুমার ঘোষ

রঙমহলে 'বড়বউ'

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর 'বড়বউ'-এর অভিনয় সুরু হয়েছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও ব্যবহারজীবী ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের একখানি উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়েই সৃষ্ট হ'য়েছে নাটক 'বড়বউ'। শোনা যায় নাট্যরূপ দিয়েছেন কাহিনীকার নিজে। নাটকটি পরিচালনা ক'রেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত।

মৃত্যুশয্যায় জমিদার যোগেন্দ্র উইল ক'রে যান তাঁর সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাবে তাঁর ছোট ছেলে সুরেন আর অপরার্দ্ধ পাবে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতী নারায়ণী। বড় ছেলে সত্যেন হাবা-পাগলা কিন্তু বড়বউ নারায়ণী বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা, কর্ত্তব্যপরায়ণা। বিষয়-ভাগ সুরেনের পছন্দ হ'ল না। শত্রুতা সুরু করলো সে নারায়ণীর সঙ্গে বন্ধু ও মোসায়েব পরেশের পরামর্শ নিয়ে। মামলা-মোকর্দ্দমা চলল, অন্যান্য নির্য্যাতনেরও চেষ্টা হ'ল, কিন্তু নারায়ণীকে দমানো গেল না। শেষ পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমায় নারায়ণীর জিৎ হ'ল। নারায়ণীর দৃঢ়তা, অচল পতিভক্তি ও বুদ্ধিমত্তা শ্রদ্ধাবনত করল সুরেনকে। এদিকে বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে সত্যেন হ'ল অসুস্থ আর সেই অসুখে সত্যেন মারা গেল। এক করুণ পরিবেশে শান্তি ফিরে এল সংসারে। 'বড়বউ' নাটকের এই হ'ল কাহিনী।

আজকের দিনের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'বড়বউ' নাটকের বিষয়বস্তু অনেকখানি পশ্চাৎমুখী। সমাজে আজ যারা ক্ষয়িষ্ণু শক্তি, সেই জমিদার শ্রেণীর এমন একটা সমস্যা নিয়ে নাটকে আলোচনা করা হয়েছে যা তাদেরও আজকের দিনের প্রধান সমস্যা নয়, জমিদারী বা সম্পত্তি ভাগ আজ তাদের প্রধান সমস্যা নয়, জমিদারী রক্ষার সমস্যাই প্রধান সমস্যা। যে জমিদারকে নাটকে রূপ দেওয়া হয়েছে, তিনি আবার ব্যবসায়ীর প্রতি বিরূপ অথচ, সমাজ-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে ব্যবসায়ী শ্রেণীই সামন্তবাদ থেকে ধনবাদী যুগের বিকাশে সাহায্য করেছে, তাই তার অস্তিত্ব সত্যের খাতিরে আজ আর কল্পনা করা যায় না। আজকের দিনে যা সামাজিক নয়, সত্যও নয়, নাটকে তাকে রূপ দিয়ে সামাজিক শিল্পক্ষেত্রে প্রগতি বিমুখতাকে উৎসাহিত করার অর্থ সমাজের অগ্রগতিরই বিরূপতা। নাটক যাঁরা দেখতে যান তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই যে-নাট্যবস্তুর নাড়ীর যোগ নেই, সাধারণ মঞ্চে তার রূপায়ণ বিরাট এক সামাজিক অপরাধ। জমিদার পরিবারের এই সম্পত্তি ভাগের নাটক আমাদের সত্যকার অধ্যাত্ম-চেতনাকে জাগ্রত করে না বরং সিদ্ধরসের নিপুণ পরিবেশনে অবাস্তব চিন্তাধারার প্রেরণা দেয় অবচেতন মানসে।

কাহিনীকার-নাট্যকার সুনিপুণভাবে নাট্য ও ঘটনা-দ্বন্দ্বের মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন নাটককে। বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি ক'রে সিদ্ধরসপিপাসু দর্শকের অধ্যাত্ম চেতনাকে দোলা দিয়ে নাটক পৌঁছেছে তার বাঞ্ছিত পরিণতিতে, সেইজন্যই এই কাহিনীর নাটক আরও ক্ষতিকর হয়েছে। বিশেষ ক'রে সম্পত্তিভাগের সমস্যা রূপায়ণের মধ্য দিয়ে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হ'য়েছে নাটকে তা হ'ল হাবা-পাগলা স্বামীর প্রতি প্রশ্নহীন দ্বিধাহীন অন্ধ পতিভক্তির আদর্শ। সনাতন সিদ্ধরসের উপকরণে সুকৌশল উপস্থাপনায় সাময়িকভাবে দর্শকেরা হয়তো এই আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বাহবা দিতে পারে কিন্তু বাস্তব জীবনে কোন মেয়েই, সে যে-শ্রেণী থেকেই আসুক না কেন—মেনে নিতে পারে না এই আদর্শকে, মেনে নেয় না, মেনে নেওয়া উচিতও নয়। তাই এতবড় সামাজিক অসত্য আজকের দিনে আর হ'তে পারে না। অথচ, সামাজিক সত্যকে রূপ

দেওয়াই আজ সমাজ-কল্যাণকর শিল্পসাহিত্যের কাজ।

আঙ্গিকের দিক দিয়েও নাট্যবস্তুর উপস্থাপনায় কিছুটা চাতুর্য্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দু-একটা দৃশ্যের নাটকীয় পরিণতি ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে দর্শকমনকে। এমনি একটি দৃশ্য—দ্বিতীয় দৃশ্যে যোগেন্দ্রের মৃত্যুর দৃশ্য। ছোট ছেলে সুরেন বড়বউ নারায়ণীর হাতে বাপের উইল দেখে ধৈর্য্যহারা হয়ে যায়, সে-টা দেখতে চায়, সন্দেহ ক'রে কি যেন নারায়ণী লিখিয়ে নিয়েছে তার বাবাকে দিয়ে। এই সন্দেহের ফলে নারায়ণী দেখতে দেয় না উইল, উত্তেজিতভাবেই কথা বলে, এমন সময় সুরেন তাকে বলে 'Shut up', আর এই কথার শব্দে যোগেন্দ্রের হার্টফেল সত্যই নাট্যকীয় রসসমৃদ্ধ। কিন্তু সুরেনের যা চরিত্র, নারায়ণীকে সে আগে ও পরে যেভাবে সামনা-সামনি ভয় করে চলেছে তাতে ঐভাবে 'Shut up' বলা সুরেনের পক্ষে সম্ভব কিনা, নাট্যকারের আর একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ হেমনলিনীর চরিত্র, বড়-জা নারায়ণীর প্রতি তার অচলা শ্রদ্ধা। হঠাৎ তাকে দিয়ে এক দৃশ্যে উড়নচণ্ডীর ভূমিকা অভিনয় করিয়ে নারায়ণীর প্রতি অশ্রদ্ধাজনক কথা বলিয়ে আবার হঠাৎ পরেই নারায়ণীর প্রতি অধিকতর ভক্তিপরায়ণা-ভাব দেখিয়ে নাট্যকার আদৌ রসজ্ঞানের পরিচয় দেন নি। নাটক যেভাবে উপস্থাপিত হ'য়েছে তাতে নারায়ণীর প্রতি হেমের অশ্রদ্ধা সুপ্রকাশিত না হ'লেও ক্ষতি ছিল না। আর নাট্যকার যদি এই অনুপাতাতিরিক্ত অশ্রদ্ধাকে এতই প্রয়োজন মনে করে থাকেন, তাহ'লে তার পরিবেশ সৃষ্টি করে মনস্তাত্বিক বিবর্ত্তনের বিভিন্ন স্বাভাবিক স্তর দেখানোর চেষ্টা করেন নি কেন?

তুলসীর অনাবশ্যক চরিত্রটা বোধ হয় গান শোনানোর জন্যই আমদানী করা হয়েছে।

অভিনয়ে সুরেনের মানসিক দ্বন্দ্ববহুল চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য্য। প্রতিটি দৃশ্যে আঙ্গিক ও বাচনিক অভিনয় তার প্রায় এক সঙ্গেই শিল্পসম্মতভাবেই তাল রেখে চলেছিল। অবশ্য ধীরাজবাবু উত্তরজীবনে বিশেষ বাচনভঙ্গীকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তাঁর অভিনয়-সৌন্দর্যের আলোচনা আমরা করছি। তবে দুটি দৃশ্যের শেষে অন্ধকার হয়ে যাবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে মদ খেতে গিয়ে প্রয়োজনীয় চক্ষুভঙ্গী তিনি করতে পারেন নি। আমাদের মনে হয়, এখানে মদের গ্লাস উঁচু ক'রে ধরে—"এতে কি সে জ্বালা মিটবে" ইত্যাদি সংলাপ বলে যাওয়া উচিত, চোখের অভিনয় তাহ'লে সহজ হবে। হাবা-পাগলা সত্যেনের ভূমিকায় প্রধান অভিনয়-শিল্পী জহর গঙ্গোপাধ্যায় যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে স্বরের অস্বাভাবিক বিকৃতি দর্শকমণ্ডলীতে হাসির উদ্রেক করেছিল। নারায়ণীর ভূমিকায় সাধারণ মঞ্চে নবাগতা শ্রীমতী বাণী গঙ্গোপাধ্যায় আঙ্গিকভঙ্গীতে, পদক্ষেপ, স্বরভঙ্গী, প্রস্থান ও প্রবেশে যথেষ্ট শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার অভাব আশানুরূপ গাম্ভীর্য্য আনতে পারেন নি বড় বউ চরিত্রে। জমাট মুহূর্ত্তে গলাটা একটু চড়িয়ে দিয়ে অভিনয়ের চেষ্টা করলে সম্ভবতঃ কিছুটা আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে বলে আমাদের ধারণা। শ্রীমতী ঝর্ণা হেমনলিনীর ক্ষুদ্র করুণ ভূমিকাটিতে ছাপ রাখতে সমর্থ হলেও স্থানে স্থানে (যেমন নারায়ণীর সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীন উক্তি করতে) অশোভন উৎসাহের আধিক্য দেখা গিয়েছে, অবশ্য তার জন্য নাট্যকারই হয়তো অনেক অংশে দায়ী। এছাড়া ভূপতির ভূমিকায় নবাগত তরুণ শিল্পীটি, যতীনের ভূমিকায় দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগতি, গোবিন্দনাথ ও ক্ষান্তর ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরা যথাযথই অভিনয় করেছেন। পরেশের ভূমিকায় ভানু চট্টোপাধ্যায়, সুরেনের উপযুক্ত পার্শ্বচর হয়ে উঠলেও মায়ের ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভার অভিনয় বড়ই নিষ্প্রভ।

—সুবোধকুমার ঘোষ

অথ "কুক্কুট-আহব" দর্শনান্তে রাজা ভড়ং

মৃগাংক সেন

[বাঙলা দেশের প্রথম শ্রেণীর চিত্রপত্রিকাগুলির অন্যতম 'পট'-এর গত পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত Stop this cock-fight! নামক প্রবন্ধ নিয়ে সম্প্রতি স্বর্গরাজ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সঞ্চার হয়েছিল, বর্তমান রচনার লেখক তারই বৃত্তান্ত পেশ করেছেন এখানে। —'চিত্রবাণী'-সম্পাদক]

মহর্ষি বৈশম্পায়নের কাছে সংশোধন করবার জন্যে রাজা ভড়ং নামে এক থল্লট একটি থিসিস্ কিছুদিন হোল দিয়ে গেছেন। রাজা ভড়ং সটান কবি সত্যেন দত্তের কাব্য থেকে নেমে এলেন। তাঁর ধারণা, অন্যান্য সতীর্থদের মতোই; আঠারো-বছর যে-কোন কাজে নিযুক্ত থাকলেই বিধাতা থিসিস্ লেখবার অধিকার দিয়ে দেন। একে খর্বাট তায় থল্লট তার ওপর বিংশ শতাব্দীতে জন্মান্তর গ্রহণের জন্য দালালী বিদ্যায় পারদর্শী—এ সমস্ত তত্ত্ব অবশ্য মহর্ষির জানাই ছিল, তাই কুলাজ নিয়ে বৃথা বাক্যব্যয় না করে সরাসরি উত্তরপত্রটি দেখতে বসে গেলেন রাজা ভড়ংয়ের।

ইদানীংকাল মহর্ষির একটু কেমন যেন বদ্‌রোগ ধরেছে। দার্শনিক বুকনাগুলো আজকাল অপরের মুখ থেকেই শুনতে ভালবাসেন। কারণ, বুকনী আওড়াতে আওড়াতে মনুর ছেলেরা বেশ অবতার ব'নে যায়। তিনি হাঁ করে চেয়ে থাকেন আর ভাবেন, হায় রে, কি কুক্ষণেই না জ্ঞান দান করবার প্রবৃত্তি তাঁর মনে জেগেছিল! সেইজন্যেই না এই অনড্ডানগুলো তাঁর চোখের ওপর বুড়ো আঙুল তুলে খবরের কাগজের অফিসে ঢুকে প'ড়ে সিনেমা-কলমের ওপর দেদার ঘাসকাটা কল চালিয়ে যায়, সুবিধে পেলেই এর-ওর-তার পিঠ চাপ্‌ড়ে দেয়, আর বঞ্চিত হলেই খাম্‌চা মেরে বুড়বুড়ি কাটতে থাকে, সুরু করে কাগজ ফেলা ঝুড়ির অন্দরমহল সাফ্ করতে!

যাই হোক্, যা ভুল হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন আর বৃথা আফশোষ করে কি লাভ। ভাবলেন, তখনকার দিনে ইচ্ছা হওয়া মাত্রই কি-না পাওয়া যেতো। আর এখন?—শুধুই আঠারো-বছর রগ্‌ড়ানোর যোগ্যতা। যে যেমনভাবে রগ্‌ড়ে চলেছে. অবশ্য নিরেট পাথর কিংবা নিরন্তর বাঁক বইবার ক্ষমতা থাকা,—এ দু'টোর যে কোন একটা গুণ থাকলেই যথেষ্ট, আর আঠারো-বছর বাদে সে সেইরকমই ফল পেয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ নামধেয় এক শিষ্য তাঁর এই আঠারো-মার্কাদের দেখেই 'অচলায়তন' বলে একটি ছোট্ট নাটক লিখেছিলেন। মহর্ষির মনে আছে, কী তারিফই না করেছিলেন শিষ্যকে। কিন্তু সেকাল আর একাল? তখন জন্মাতো সব সিদ্ধিদাতারা এখন তাঁর বাহনগুলোই কেবল জন্মাচ্ছে যে! 'বনফুল' নামে তাঁর আর একটি ভক্ত এই কথা জানতে পেরে এই ব্যাপারের ওপর তদ্বির করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-বিশ্বকর্মাকে নিয়ে একটা কথিকা লিখেছিল! বেশ লিখেছিল কিন্তু। নাঃ, মনুর নাতি-পুতিগুলো একেবারে গোল্লায় গেছে। মহর্ষি চশমাটা মুছলেন।

থিসিসের কয়েক ছত্র পড়েই বৈশম্পায়ন ঈদৃশ আশাভঙ্গজনিত বিকল অবস্থার কুক্ষিগত হলেন, এবং বেশ অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে—

জম্বুদ্বীপে গাঙ্গেয় অববাহিকার দক্ষিণতম অঞ্চল বঙ্গদেশ নামে খ্যাত। আর এই দ্বীপেরই পশ্চিমপ্রান্তে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার কিয়দ্দূরে 'বোম্বাই' নামে একটি প্রায়-দ্বীপ আছে। বঙ্গদেশের গঠন ব-দ্বীপ সদৃশ। তাই এর তিনটি কোণের সমষ্টি দুই-সমকোণের সমান। দুই সমকোণের অর্থ, অন্য যা অপরের নেই, এর তা আছে। অথচ দ্বীপের মতো উন্মুক্ত নয় বলে একটু লজ্জিত, নম্র এবং বেশ সম্ভ্রমবোধপূর্ণ। বঙ্গদেশ বাঙালীর, বোম্বাই পর্তুগীজের (বহম্-বী), পরে মারাঠা দস্যুদের ও তারপর তাদের তহশীলদার গুজরাতীদের। বাঙলাদেশের ছেলেরা আজন্ম বর্গীদের কথা শুনে ভয়ে-ভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে; ছেলেদের বাপেরা খাজনা জুগিয়েছে চার-ডবল চোখে; বাপেদের

শাসন কর্তারা তখন ব-দ্বীপটিকে "স্ব" না করে প্রাণপণে নমাজ পড়েছেন আর সার টমাস রো'র জ্ঞাতিভাইদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার শপথ করেছেন। সার সেসব বার্তা দেশে যা-রয়-সয় করে পৌঁছে দিয়েছেন। তার ফলে, আমরা অনেক অনেকদিন বাদে বাঙলাদেশে দেখেছি যখন মৃত্যুপণ করে কয়েকজন ছোকরা এই জ্ঞাতিভাইদের দেশে পাঠাবার জন্যে জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন সে খবর তারা বোম্বাইয়ের খবরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় দেখবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছিল কিনা জানিনে, কিন্তু পর্তুগীজ স্নেহচ্ছায়ায় পুষ্ট বোম্বাই নগরীতে চোলাই মদের কারবার ও বড়ো বড়ো কাপড়ের মিল খোলার বন্দোবস্ত পাকা-পোক্ত হয়ে যাচ্ছিল বেশ। মহর্ষি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, থিসিসের ভেতর এসব প্রাথমিক সন্ধানের কোন খোঁজ-খবর নেই। এ কেমন কথা? এ আবার কি রকম লেখা?

বরং, এসবের বদলে তাতে লেখা রয়েছে যে,—

১। বাঙলা দেশ নিতান্ত গরীব, হা-ঘ'রে;

২। কেউ তাদের হাত ধরে হাঁটিয়ে না দিলে, দু'মুঠো অন্ন ছুঁড়ে না দিলে হা-ঘ'রেদের কোন উপায়ই থাকতো না;

৩। অন্য কেউ তাদের কথা ফলাও করে না ছাপলে বিশ্ববাসী তাদের ভদ্র ও শিল্পগুণের কথা জানতেই পারতো না;

৪। ভালমানুষেরা তাদের এই গুণপনার কথা বুঝে তাদের মধ্য থেকে বেছে বেছে জনকয়েক ধরে নিয়ে গিয়ে পিলে চমকে দেবার মতো টাকা দিয়ে, খাইয়ে পরিয়ে পুষে না রাখলে তাদের গুণের সম্মান করতো কে?

৫। এইসব ঠাকুর-গোঁসাইদের কাগজওয়ালারা এখানে কষ্ট করে এসে, এবং নিজের দেশ থেকে, এখানকার কথা লোক-সমাজে বিশেষ করে প্রচার করে কি তাদের মহত্বের পরিচয় দেয় নি?—এইসব আবোল-তাবোল প্রলাপময় বোম্বাই থিসিস।

মহর্ষির হঠাৎ মনে পড়ল, শয়তান নামে তাঁর এক গোঁয়ার-গোবিন্দ ভৃত্য শয়তানীর স্বপক্ষে এইরকমই কি যেন সব দালালী করেছিল। ফস্ করে মহর্ষি বৈশম্পায়নের মতো লোকেরও মুখ থেকে কি-একটা খিস্তি বেরিয়ে এলো। একবার দাড়ি কামাতে কামাতে এক ওস্তাদ নরসুন্দর তাঁর নরম গালের খানিকটা চামড়া পাঁঠা-ছাড়ানোর মত করে

ছাড়িয়ে ফেলায় সংযমের সংস্কৃত বাঁধ ভেঙেও একটা প্রাকৃত শব্দ বলে ফেলেছিলেন। সেই শব্দটিই আবার তাঁর মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল এই থিসিসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি পড়ে। খাতাখানা টান মেরে গোময়-পঙ্কের মধ্যে ফেলে দিয়ে এক আর্যপুত্রকে তলব করে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন: রাজা ভড়ং বলতে চায় "এ"স্তার "ক্যা"বলা মনোবৃত্ত "জ"ইয়ে রেখে সে নাকি মহাপণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বাঙলার কয়েকজন বাপ্‌কা বেটা বোম্বাইয়ের লপ্‌চপানি দোরস্ত ক'রছে দেখে ইনি এক মুর্গীর-লড়াইয়ের থিসিস লিখে আমার কাছে দিয়ে বলেছেন, যারা ছকু কথা বলছে তাদের চরবার জায়গা আলাদা করে দেওয়া হোক। কতকগুলো ভ্যান্‌তাড়া উপসর্গও জুড়ে দিয়েছে; তুমি এই ব্যাপারে উপযুক্ত গবেষণা করে আমার কাছে একটা বিবরণী পেশ করবে হপ্তা খানেকের মধ্যেই। দরকার বোঝ তো গুরু-মা'র কাছ থেকে পুষ্পকরথের রাহা-খরচটা চেয়ে নিও।

যেমন কথা তেমনি কাজ। আর্যপুত্র ঐশী ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমস্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে, জনমতের সঙ্গে, উপযুক্ত মতের সঙ্গে, বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রমশালী ব্যক্তি-বর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে গবেষণালব্ধ ফলগুলি যথারীতি লিপিবদ্ধ করলেন ও সপ্তম দিবসের গোধূলি বেলায় মহর্ষির চরণপ্রান্তে নিবেদন করলেন।

মহর্ষি বৈশম্পায়ন মহা আগ্রহভরে পত্রখানি তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন। কেননা, এ পত্র আর্যপুত্রের লেখা। খাদ এতে নেই। আশৈশব তাঁর কাছেই এর শিক্ষা হয়েছে, পঁচিশ-ত্রিশটা টাকার জন্যে, আর যাই হোক বাপ-মাকে ড্যাম্‌-রাস্কেল জাতীয় ম্লেচ্ছ বচনে আপ্যায়িত করবে না, থিসিস লিখতে গিয়ে থাইসিসগ্রস্ত ফুসফুস খুলেও দেখাবে না। কি বা হঠাৎ অবতার সেজে আপন খেয়ালেই বাণী দিতে সুরু করবে না।

আর্যপুত্র লিখছে : পথে যেতে যেতে হঠাৎ একজনের সঙ্গে দেখা। একটা কবরস্থানের পাশে বসে বসে সে কাঁদছিল। কারণ জিগ্যেস করায় সে বললে, যৌবনে তার কি-এক দুর্মতি হওয়ায় নাম-করবার জন্যে সে ম্লেচ্ছদের দরবারে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনেই সে তার ভুল বুঝতে পারলে। তারপর যখন সে সত্যি সত্যি নাম কিনলে তখন তার আর অনুশোচনার শেষ রইল না। তাই সে চিরজীবন কেঁদেই যাচ্ছে। লোকটা বললে তার নাম মধুসূদন। এরপরে আরও কয়েকজনের সঙ্গে তার দেখা। তারা কেউ বা ফুলের বনে, কেউ বা ফলের বনে, মহানন্দে গান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও নিরানন্দ তাদের স্পর্শ করে নি। আর কি তাদের চেহারার দ্যুতি! তাদের জিগ্যেস করতে তারা বললে, অপরে কি বলবে আর অপরে কতখানি করবে এ ভেবে জীবনে তারা কখনও কিছু করেনি। তারা তাদের কর্তব্য করে গেছে মাত্র। সেখানে কোন ফাঁক রাখে নি। নাম জানতে চাইলে, তারা প্রথম তিনজন বললে, বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎ হচ্ছে তাদের নাম। এরপর জগদীশ, অরবিন্দ থেকে আরম্ভ করে প্রায় একশ'টা নাম করে গেল, সব মনে নেই, তারা সবাই নির্লিপ্ত হয়ে মহাশান্তির আস্বাদ উপভোগ করছে। এরা সবাই বাঙালী, বাঙ্‌লার আদরের ধন।

এইসব স্থায়ী সত্য দিয়ে আর্যপুত্র সপ্রমাণ করেছে যে,—

১। বাঙ্‌লা দেশ গরীব, বিনা স্বার্থে কেউ তাকে বড়লোক করে দিতে আসেনি কখনও, তবু সে বড়লোক হতে পারে নি—গোঁসাই লোকেদের এমনই সুন্দর হাত-যশ। হা-ঘ'রে আছে, তবে কয়েকজন মাত্র। তা'রা এই যারা, সিনেমা-কলামের ঘোড়-সওয়ার হয়ে খবরের কাগজের স্বর্গে বাতি দেবার ব্যবস্থা করছে।

২। শ্রীমান বাঙালীর হাত ধরে কেউ হাঁটায় নি, সে নিজেই হাঁটতে জানে, শিখেছে। অন্ন ছুঁড়ে দিয়েছে সত্যি কিন্তু সে কণামাত্র, মুষ্টিপূর্ণ নয়। এর কারণ, রবীন্দ্রনাথ থেকে পিকাশো পর্য্যন্ত সব মনীষীর কথা যখন সারা জগৎ জেনে ফেলে তখন আশপাশ থেকে আল-টপ্‌কানো একটু-আধটু দরদ দেখাতে না পারলে ভদ্র-সমাজে বাস করাই যে অচল হয়ে পড়ে। তার ওপর বুদ্ধিমান হওয়ার লোভটা? সেটা যাবে কোথায়!

৩। বোম্বাই বাঙালীর গুণপনার কথা বুঝেছে সত্যি কথা! তাই, ৺হিমাংশু রায় হিন্দী-ফিল্ম, অর্থাৎ ঐ ভাষায় ভদ্রপদবাচ্য জিনিষ বলতে যা বোঝা যায়, আজ বাস্তব সত্যে পরিণত করে গেছেন। শরদিন্দু, অশোককুমার, অনিল বিশ্বাস প্রভৃতি এবং দেবিকারাণী নিজেদের বীর্য-শুল্কে বরমাল্য, ছিনিয়ে নিয়েছেন, উপযাচক হয়ে নয়। আর যাঁরা আছেন, তাঁরা যেভাবে অর্থ পান এবং পাওয়া সম্ভব-পর করেছেন তার উল্লেখ না করাই ভালো। তাই নীতিন বসুকে দিয়ে সেখানে 'দীদার' তোলানো হয়; 'কৃষ্ণলীলা' দেখাবার জন্যে দেবকী বসুর ডাক পড়ে; 'জলজলা'র মতো অপমানজনক ছবিতে সুর লাগাবার জন্যে পঙ্কজ মল্লিকের প্রয়োজন হয়; অসিতবরণের

মতো অভিনেতাকে দিলীপকুমারের এক-দশমাংশ অর্থ দিয়ে ছবির কাজে নিয়োগ করা হয়; বাঙ্‌লার তৈরী ছবির প্রবেশ যত রকমে সম্ভব বন্ধ করে দেওয়া হয়; এবং বোম্বাই থেকে উল্লেখ্য কোন মূলধনই বাঙ্‌লায় খাটানো হয় না;—এই তো প্রেম ও সম্প্রীতির নিদর্শন! তারপরেও বোম্বাইয়ের হা-পিত্যেশ ম্লেচ্ছ-সমাজের মুখাপেক্ষী; বাঙলা আদব-কায়দা কিছু কঠিন কিনা।

৪। ফলাও করে বাঙলার কথা জানানো সেটা বোম্বাই জনসাধারণের অন্তরের তাগিদ, কাগজ-মালিকদের বদান্যতা নয়। এসব করে যে গুণের প্রকাশ হয় তা মহত্ত্বের নয়—ছাপার অক্ষরে কাগজ বের করার স্বাভাবিক মর্যাদাবোধে, এদেশে কাটতি বাড়াবার ও বৃহত্তর ভদ্র সমাজে পরিচিতির পথ প্রশস্ত করার অন্যতম অনুপ্রেরণা লাভ যায়। একথা অবশ্য মনোরমা অর্থ-ভোক্তীরা ঠিক বোঝে না।

সবশেষে লিখেছে: এস্তার ক্যাবলা মনোবৃত্তি জিইয়ে রাখার মালিক স্বয়ং রাজা ভড়ং "কুক্কুট আহব" দেখার যে বৃত্তান্তের ওপর পিসিস লিখেছেন সেটার আদৌ কোন ভিত্তি নেই—সেটা একেবারে তাঁর 'রজ্জুভ্রমে সর্পদর্শনের' সামিল। কেন না, জনমত থেকে এইটুকু মাত্র খবর পাওয়া গেল যে, একটি ময়ূর পেখম তুলে যখন সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর নয়নতৃপ্তির কারণ হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে এক লক্কা পারাবত এসে খুব ডিগবাজী খেয়ে যখন কিছুই করতে পারলো না, তখন ঝাঁ করে একটি ময়ূর-পালক ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল। ময়ূর সেই দেখে একটু মুচকী হেসেছিল মাত্র। এই দৃশ্যকেই রাজা ভড়ং আপনার বিচারবুদ্ধির বলে মুরগীর লড়াইয়ে পরিণত করেছেন আর কি! পাঠ শেষ করে মহর্ষি বৈশম্পায়ন একটা সুবৃহৎ দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন: তাই বলো, আমি ভেবেছিলুম বোম্বাই বাঙ্‌লার একটা হাড়্‌-আখড়াই হয়ে গেল বোধহয়। এতক্ষণে বুঝলুম, এটা হিন্দী চিত্র-শিল্পের মালিকানা মনোবৃত্তির হয়ে বাঙ্‌লার শান্ত মর্যাদা-বোধের ওপর দালালী করা হচ্ছিল! রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছিলেন দেখছি। বলেছিলেন, ডিমোক্রেসীর নিজের কিছুই করবার নেই। ভালো মন্দ সে কিছুই করতে পারে না। কিন্তু, কাণে মন্ত্র দেবার বিদ্যা যে আয়ত্ত করেছে, সে নিজের কথাটা জোর করে ডিমোক্রেসীর মুখ দিয়ে বলিয়ে নেয়। এইজন্যই মন্ত্র দাতারা ডিমোক্রেসীর রাজ্যে এত বেজায় তৎপর। *

চোখ-বুঁজে খানিকক্ষণ ধ্যানে বসলেন মহর্ষি

গেছে, তাঁর অনুশোচনার আর অন্ত রইল না। ব্রাহ্মণ অকপটে সবই ব্যক্ত করে ফেললেন।

গৃহিণী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণী, সব ব্যাপারটাই জানতেন। ব্রাহ্মণ সুস্থ হলে বললেন, ঐ রাজা রাজ্যলাভের পূর্বে এক তস্কর ছিল। ব্রাহ্মণের চোখ কপালে ওঠে আর কি! যাই হোক, এর পর ব্রাহ্মণ এক কঠোর প্রতিজ্ঞা করে বসলেন। প্রতিজ্ঞা হচ্ছে এই যে অভুক্ত হয়ে মৃতপ্রায় হলেও অজ্ঞাতকুলশীলের আপ্যায়নে আর কখনও তিনি সাড়া দেবেন না।"

'লখন শেষ হলে এক দিব্য-জ্যোতিতে মহর্ষির মুখ পরিমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর্যপুত্রকে বললেন, এই শ্রুতি-লিখনটি তুমি রাজা ভড়ং বরাবরেষু করে পাঠিয়ে দাও। আর লিখে দিও যে, তার থিসিসের জবাব সে এই থেকেই পেয়ে যাবে। নিজের সম্পর্কে সঠিক প্রত্যয় না জন্মানো পর্যন্ত এইসব ছাই-পাঁশ লিখে সে যেন আমার সময়ের প্রত্যবায় না ঘটায় ভবিষ্যতে। তার থিসিস পড়ার চেয়ে আরও জরুরী কাজ আমার চিত্ত জুড়ে অবস্থান করছে

আর্যপুত্র গুরু-আজ্ঞা যথারীতি প্রতিপালন করেছিলে

[তদনন্তর মিথ্যা সত্যদর্শন কাহিনী সমাপ্তম্]

*"ডিমক্রাসির গুণ এই যে, নিজে ভাববার না আছে তার উদ্যম, না আছে তার শক্তি। যে-চতুর লোক কানে মন্ত্র দেবার ব্যবসা আয়ত্ত করেছে সে নিজের ভাবনা তাকে ভাবায়......"

[পৃঃ ৪০২, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৯শ খণ্ড "যাত্রী"]

ত্রিকালজ্ঞের হৃদিপটে কি কথা জাগল তিনিই জানেন। আর্যপুত্রকে একটি শ্রুতিলিখন লেখবার জন্যে তৈরী হতে বললেন। আর্যপুত্রও শশব্যস্তে এগিয়ে এলেন।

"যোগবাশিষ্ঠে উল্লেখ আছে, স্বপাক অন্নগ্রহণই হচ্ছে সবচেয়ে প্রশস্ত। নিজে অক্ষম হলে গৃহবর্তিনী কোন নিকট আত্মীয়া এ-কার্য সমাধা করতে পারেন।

একবার এক ব্রাহ্মণকে সে-দেশের রাজা নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। আচার্য গ্রহণের অস্থবিধা জেনেই ব্রাহ্মণ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অবশেষে গৃহিণীর পেড়াপীড়িতে তাঁকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই হ'ল। রাজা স্বয়ং উপস্থিত থেকে তদারক করে মহা আপ্যায়ন করে ব্রাহ্মণকে খাওয়ালেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু খাওয়া শেষ করেই কতকগুলো অদ্ভুত অনুভূতির পরবশ হয়ে পড়লেন। বাড়ী ফেরবার পথে সেই অনুভূতিগুলো তাঁকে নিরন্তর পীড়িত করতে থাকল। অবশেষে তিনি একটি বেজায় কু-কার্যও করে ফেললেন। গৃহে ফিরে, খাদ্য তখন প্রায় হজম হয়ে

অভিনয়শিল্পের রীতি ও পদ্ধতি

লেখক: কনষ্টান্টিন ষ্টানিস্লাভস্কি
অনুবাদক: সুবোধকুমার ঘোষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অধ্যায়

'ষ্টুডিও' বা থিয়েটারসংলগ্ন আটপৌরে থিয়েটারটা কি? আপনাদের সঙ্গে এই প্রশ্নটাই আজ আলোচনা ক'রব আর আপনাদের সহযোগিতায় নিজেও আমি একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা ক'রব। আমার মনে হয়, এটা এখন পরিষ্কার যে একটা নাট্যবিদ্যালয় (এই-ভাবে যদি বলা যায়) আমাদের যুগের চাহিদার সঙ্গে থাপ খায়; কেননা, এরকম নানা ধরণের, নানা প্রকৃতির ও নানা আদর্শের বহু বিদ্যালয় সম্প্রতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সারা দেশে। তবুও যত বেশীক্ষণ আপনি সজীব থাকবেন, যতখানি সম্পূর্ণতার সঙ্গে মনকে মুক্ত ক'রবেন আপনি সব রকমের বাহ্যিক, সাধারণভাবে গৃহীত পূর্ব্ব-কল্পনা থেকে, সৃষ্টির কাজে নিজের ও অপরের ত্রুটিগুলি ঠিক ততখানি স্পষ্ট ক'রে আপনি বুঝতে পারবেন।

নিজের সৃষ্টির কাজ দিয়েই মানুষের সারাটি জীবন গড়া, তার সৃষ্টির কাজ শুধু থিয়েটারেই আছে আর এই থিয়েটারেই পূর্ণ বিকাশলাভ করে তার জীবন,—পুরো-পুরি এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেছেন যাঁরা, ষ্টুডিওই তাঁদের প্রথম বিরতিক্ষেত্র। বাইরে থেকে অভিনয় করা আর সৃজনী-শিল্পে প্রভাব বিস্তার করার কোনও কারণই নেই, সৃজনী-শিল্পের চালক-শক্তি একটিই আর সে হ'ল আমাদের প্রত্যেকেরই ভেতরকার সৃজনীশক্তি। পুরনো দিনের থিয়েটারে লোকে সৃষ্টির কাজে সমবেত হওয়ার শুধু ভাণ ক'রত, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মগৌরবায়ন, সহজলভ্য খ্যাতি অর্জ্জন, বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন আর তথা-কথিত 'অনুপ্রেরণা'র অনুশীলনের জন্যই তারা সেখানে আসত।

'ষ্টুডিও'র কাজের প্রত্যেকটি দিক সযত্নে সংগঠিত করতে হবে। ষ্টুডিওর সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আর তাদের সঙ্গে আশ-পাশের অন্যান্য লোকজনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে পরস্পরের প্রতি পরম শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। নাট্যকলা যাঁরা শিখতে চান ষ্টুডিওতে তাঁদের সাত্ত্বিক শক্তির মূল ভিত্তিই হবে অবিচ্ছিন্ন মনো-যোগক্ষমতার বিকাশ। ষ্টুডিও অভিনয়শিল্পীকে শিক্ষা দেবে কেন্দ্রসন্নিবেশের কৌশল। এই উদ্দেশ্যে, আনন্দময় স্বচ্ছন্দ ও উন্মাদনাময় পরিবেশে যাতে অভিনয়শিল্পীর ভেতরকার শক্তিগুলির বিকাশ সম্ভব হয়, তার জন্য নানাধরণের কৌতূহলোদ্দীপক ও আনন্দদায়ক সহকারী পন্থা আবিষ্কার ক'রতে হবে ষ্টুডিওকে, আর অপরিহার্য হলেও এইসব কাজকে হেয় মনে ক'রলে চলবে না। সৃষ্টির কাজে প্রেরণার উৎস সন্ধানে আমাদের আধুনিক অভিনয়শিল্পীরা সাধারণতঃ নিজেদের বাইরে তাকাতেই অভ্যস্ত। এটা তাদের দুর্ভাগ্য। বাইরের ঘটনাই সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়, এমনকি সৃষ্টির প্রধান কারণই প্রকৃতপক্ষে এই,—অভিনয়শিল্পী এমনি একটা ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে আছেন দেখা যায়। তিনি মনে করেন,—মঞ্চে তার সাফল্যের প্রকৃত কারণগুলি সবই বাইরের ঘটনা,—যেমন পৃষ্ঠপোষকতা আর ভাড়াটে দর্শকরা। মঞ্চে তার বিফলতার কারণও তাই তার শত্রু আর অনিষ্টকারীরা, কেননা তিনি কি করতে পারেন তা' দেখাবার কিংবা তার প্রতিভার পূর্ণ গরিমায় উন্নীত হবার সুযোগ তারাই কখনও তাকে দেয় নি। কাজে কাজেই, অভিনয়-শিল্পীকে ষ্টুডিও প্রথম যা' শিক্ষা দেবে তা' হ'ল এই যে সব কিছুই, সব সৃজনী-শক্তিই সে দেখতে পাবে তার নিজেরই মধ্যে। প্রত্যেকটি বিষয় ও কাজে আত্ম-পরীক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী। শক্তির জন্য আর সৃষ্টির কাজের উৎস ও ফলাফলের জন্য নিজের অন্তরে অনুসন্ধানই হবে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। সৃষ্টির' কাজটা কি? এমন

জীবনই সাধারণতঃ হ'তে পারে না যেখানে সৃষ্টির কাজের কিছু কিছু উপাদান নেই। এটা বুঝতে শিখতে হ'বে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে। ব্যক্তিগতভাবে যে সহবৃত্তি আর প্রবৃত্তি নিয়ে অভিনয়-শিল্পী তাঁর জীবন কাটিয়েছেন,তা যদি থিয়েটারের প্রতিভার ভালবাসা নষ্ট ক'রে দেয়, তা'-হলে তার ফলে দেখা দেয় স্নায়ুতন্ত্রের দৌর্ব্বল্যবোধ, জন্ম নেয় মূর্চ্ছা প্রবৃত্তি আর এই প্রবৃত্তি রূপ নেয় বাহ্যাভিনয়ে আতিশয্য। অভিনয়শিল্পী এইভাবেই প্রকাশ করতে চান তাঁর অভিনয়শক্তির বিশেষত্ব আর একেই বলতে চান তিনি তার 'অনুপ্রেরণা', কিন্তু যা কিছুই আসুক না কেন বাইরের উৎস থেকে, জীবনে তা সহবৃত্তির কার্য্যাবলীকেই শুধু প্রেরণা দিতে পারে, অবচেতন মানসকে জাগিয়ে তুলতে পারে না। অথচ এই অবচেতন মানসেই থাকে সত্যিকারের সহজ জ্ঞান ও আন্তর প্রকৃতি। কাজের কোনওরকম পরিকল্পনা না ক'রে শুধু সহবৃত্তির তাড়নায় যে মঞ্চের ওপর ঘোরাফেরা করে তার প্রেরকশক্তিকে পশুদের থেকে পৃথক করা যায় না—একটা কুকুরও তো বাগে পেলে চুপি চুপি এগিয়ে যায় পাখীর দিকে কিংবা বিড়ালও পেছু নেয় ইঁদুরের।

প্রবৃত্তিগুলি অর্থাৎ সহবৃত্তিগুলিকে শোধন ক'রে নিতে হবে মননশক্তি বা মানুষের চেতনশক্তি দিয়ে আর উন্নীত করতে হবে তাকে সতর্ক মনোনিবেশের সাহায্যে। তাহলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে পার্থক্যটা। প্রবৃত্তিতে যা' কিছু ক্ষণিকের, যা' কিছু পরিবেশসাপেক্ষ, যা' কিছু অপ্রয়োজনীয় ও অসুন্দর সে-সবই বেরিয়ে আসবে তখন। শিল্পীদের মনোযোগ এদের ওপর নিবদ্ধ করতে হবে না। যা' কিছু সহজ জ্ঞান থেকে অভিন্ন; যা কিছু সব সময় সব জায়গায় সব প্রবৃত্তিতে যাকে পাওয়া যায়, প্রত্যেকটি মানব হৃদয় ও মানব মনে যা কিছু সাধারণ শিল্পীর মনোনিবেশ করতে হ'বে তার ওপরই। শিল্পের কোন রাজপথ নেই। দৃশ্যসজ্জার একই ধরণের বাহ্যিক প্রক্রিয়া, একই ধরণের উপকরণ মেরী ও জন উভয়ের ওপরই চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়; যা সম্ভব তা হ'ল তাদের অনুপ্রেরণা আর তাদের নিজস্ব প্রাকৃত শক্তির বিরাট মূল্য সব মেরী ও সব জনের কাছেই পরিষ্কার ক'রে দেওয়া আর কোথায় এর সন্ধান ক'রতে হবে, কি ক'রেই বা নিজেদের অন্তরে একে বাড়িয়ে নেওয়া যায় সেটা তাদের দেখিয়ে দেওয়া। অবিরাম এক কাজ থেকে আর এক কাজে সরিয়ে বা একই সময়ে অনেক দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়ে শিক্ষার্থী শিল্পীদের যে ক্ষতি করা হয়, তার চেয়ে বেশী ক্ষতি আর কিছুতে সম্ভব নয়। নতুন নতুন প্রসঙ্গ সম্প্রতি উত্থাপিত হ'য়েছে অনুশীলনের জন্য, অথচ থিয়েটারে বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে যার কার্যকারিতা পরীক্ষিত হয় নি,—সেইসব প্রসঙ্গ শিক্ষার্থীদের মাথায় যদি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও অনুরূপ ক্ষতি করা হ'বে তাদের। একই সময়ে, তাই, অনেক কিছু করার চেষ্টায় বা কতকগুলি বাহ্য লক্ষণের সুবিধা দেখে বিশেষ ভূমিকাভিনয়ে আপনার বিশেষ নৈপুণ্যের সন্ধানে শিক্ষা সুরু ক'রবেন না আপনি শিক্ষার্থী হিসেবে। যথেষ্ট সময় দিতে হবে আপনাকে আপনার মানসিক অভ্যাস পরিবর্তনে, কেননা এই অভ্যাসই আপনাকে বাধ্য করে বাস্তব জীবনে ও অভিনয় জীবনে বাইরের শক্তির ওপর নির্ভর ক'রতে। আপনার ভেতরকার আর বাইরেকার জীবন মিশে যায় যার ভেতর এমন এক দাবকপাত্র হিসেবে অনুভব করুন আপনার সৃজনশীল জীবনকে, প্রফুল্ল হৃদয়ে নিজের ওপর কোনওরকম জবরদস্তি না ক'রে সুরু করুন আপনার অনুশীলন। ষ্টুডিও হচ্ছে এমন একটি জায়গা লোককে যেখানে তার নিজস্ব চরিত্র আর অন্তরের শক্তিকে লক্ষ্য করতে হ'বে। জীবন প্রবাহে নিজেকে ভেসে যেতে দেয় এমন মানুষ হিসেবে নিজের ওপর লক্ষ্য রাখলে চলবে না, এমন মানুষ হিসেবে নিজের ওপর লক্ষ্য রাখার অভ্যাস তাকে রপ্ত করতে হ'বে যে শুধু শিল্পকে ভালবাসে না, নিজের সৃষ্টির কাজ দিয়ে অন্তরে ও বাইরে অপরের দিনগুলি যে ভরে দিতে চায় তার শিল্পের সুখ ও আনন্দে। কেমন ক'রে হাসতে হয় যে জানে না, সবসময় গজর গজর ক'রে বা মনমরা হ'য়ে যে থাকে আর সহজেই যে রেগে যায় কিংবা সাধারণভাবে যে একটি ভিজে কম্বল, ষ্টুডিওতে তার স্থান নেই। ষ্টুডিও যেন শিল্পমন্দিরের

প্রবেশদ্বার। জলন্ত অক্ষরে আমাদের সবার জন্যই এখানে নোটিশ লিখে দেওয়া উচিত,—“শিল্পকে ভালবেসে আর শিল্পে আনন্দ অনুভব ক'রে সব বাধা অতিক্রম করতে শেখ।” লম্বা ও সুন্দর চেহারা বা কৌশলী ও সুকণ্ঠ বলেই শুধু যদি বিশেষ ক্ষমতা নেই এমন কতকগুলি অশিক্ষিত লোককে ষ্টুডিওতে ঢোকাতে হয়, তাহলে আরও শত শত অক্ষম শিল্পীকেই ছেড়ে দেওয়া হবে অক্ষমতায় ভরাক্রান্ত অভিনয়শিল্পীদের সমাজে। শিল্পকে ভালবাসেন বলেই শিল্পসাধনায় রত হ'য়েছেন আমাদের ষ্টুডিও থেকে এমন সুখী কর্ম্মীরা আর বেরিয়ে আসবেন না, বেরিয়ে আসবে তারাই সবরকম ষড়যন্ত্রে যারা অভ্যস্ত। নিজেদের দেশের বিশ্বস্ত সেবক মনে ক'রে দেশের সামাজিক জীবনে প্রবেশের জন্য নিজের সৃষ্টির কাজকে ব্যবহার করার কোনও ইচ্ছাই এদের নেই, দেশের প্রভু হয়েই এরা বসতে চায় আর চায় সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে দেশ তাদের সেবা করুক।

যারা আবার ষ্টুডিওর সুনামকে দেখেন সবকিছুর ওপরে অথচ যাদের সুবিধার জন্য ষ্টুডিও তাদের সেই উৎসাহভরা হৃদয়কে করেন উপেক্ষা তাদের পেছনেও কোনও যুক্তি নেই। ষ্টুডিওতে যিনি শিক্ষা দেবেন, তাকে মনে রাখতে হবে যে তিনি শুধু অধ্যক্ষ বা শিক্ষক নন, তিনি বন্ধু ও সহকর্ম্মী। তাঁকে মনে রাখতে হবে, তিনি যেন এক ঠিকা শিল্পকর্ম্মী। তাঁর কাছে শিক্ষা নেবার জন্য যাঁরা এসেছেন তাঁদের শিল্পপ্রীতির সঙ্গে তাঁর নিজের শিল্পপ্রীতি এক হ'য়ে গেছে এরই মধ্যে। শুধু এই ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে, সহপাঠীদের সঙ্গে আর সব শিক্ষকদের সঙ্গে ঐক্যতান-বোধ-জাগরণের পথে শিক্ষার্থী-দের পরিচালনা ক'রতে হবে শিক্ষককে। তাহলেই পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছার মনোভাব গ্রহণ ক'রেছে সাধারণ রীতি হিসেবে, এমন এক প্রাথমিক শিল্পীগোষ্ঠি-রূপে গড়ে উঠবে ষ্টুডিও আর ক্রমে সম্ভব হ'বে সেখানে যুগোপযোগী নাটকের সুসজ্জ প্রযোজনা।

এম. পি'র মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'বাঁধি' চিত্রের একটি দৃশ্যে দীপ্তি রায় ও মাষ্টার বিভু

পরিভাষা :— পূর্ব্বকল্পনা—Preconception,
সহবৃত্তি—Instinct
প্রেরকশক্তি—Incentive
ভাড়াটে দর্শক—Claques
দৃশ্যসজ্জা—Mis-Enscene
সহজাত—Organic

ষ্টুডিও থিয়েটার সংলগ্ন আর্টপৌরে থিয়েটার—শিল্পীকে নিজস্ব চরিত্র আর অন্তরে শক্তি লক্ষ্য করতে শেখায় ষ্টুডিও—বাইরের ঘটনা নয়, অন্তরের শক্তিই সৃজনীশিল্পের চালকশক্তি—প্রবৃত্তিকে শোধন ও উন্নত করতে হবে মননশক্তি, চেতন-শক্তি ও সতর্ক মনোনিবেশ—সুকান্ত সুকণ্ঠ অশিক্ষিত শিল্পীর ষড়যন্ত্র নয়, চাই সুশিক্ষিত শিল্পপ্রেমিক শিল্পীর ভালবাসা—'শিল্পকে ভালবেসে, শিল্পে আনন্দ অনুভব ক'রে—সব বাধা কাটিয়ে ওঠ'— (ক্রমশঃ)

চলচ্চিত্রের ধর্ম্ম

ফণী মজুমদার

★

মানুষের ধর্ম্ম কি? শত সহস্র বৎসর ধরে শত শত ভাষায় অনেক বাণী, অনেক দর্শন, অনেক বাদ আউড়েও জগৎ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ায় ইতি করতে পারেনি।

কিন্তু যদি লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখতে পাওয়া যাবে—বাণীকার, দর্শণকার, মতবাদকারগণ যত কিছু 'কারণ'ই আমাদের পান করাতে চেয়েছেন—সব 'কারণের' উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের মানসচক্ষুর সম্মুখে মানুষের ধর্ম্মের রূপাবলী সাজিয়ে আমাদের মাতাল করে তোলা।

মানুষ জড়দেহধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব. জড়দেহের সমন্বয়ে প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়রাজির সহযোগেই সে রূপ রস গন্ধ ভাব অনুভূতি সংগ্রহ করে মনের দ্বারে পৌঁছে দেয়। সেখানে মন তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় চক্ষুকে অন্তর্মুখীন করে তা দিয়ে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কেই মনের পটে প্রতিফলিত করে দেখবার চেষ্টা করে।

মানুষের এই যে সব কিছুকেই রূপের আকারে মানসপটে দেখবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, একে মানুষের ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া যায় কিনা বলতে পারিনা, তবে একে মানবীয় ধর্ম্ম বলে জোর গলায় প্রচার করা চলে। সেই কোন এক অজ্ঞাতকল্পে মানুষ-সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রতি মানুষ অবিচ্ছেদে অহরহ এই মানবীয় ধর্ম্ম পালন করে আসছে, মানুষ স্বীয় মানসপটে কল্পলোকের স্বপ্ন আলোকশিখাময়ী তুলিকায় নিত্য আঁকছে আলপনা, দার্শনিক, কবি, নাট্যকার, সাহিত্যিক, রচয়িতা, চিত্রকর, ভাস্কর, অপেন আপন পরিভাষায় নব নব রূপ নব নব চিত্রাবলীর অঙ্কন ও পরিবেশন করছেন, মানুষের মনের পর্দায়।

ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য সমস্ত কিছুকেই রূপে দেখতে ও দেখাতে চাওয়ার এই যে স্বাভাবিক মানবীয় ধর্ম্ম, এর প্ররোচনাতেই বর্ত্তমান যুগের বিচারবাদী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু হয়ে আবিষ্কার করলেন চলচ্চিত্র। চিত্রকর ভাস্কর যেথানে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উপায়ে নিশ্চলরূপ সচল-ভঙ্গীতে প্রকাশ করেন সেথানে চলচ্চিত্রকার রূপের প্রত্যক্ষ ও প্রধান বাহন চক্ষুর পুরোভাগে প্রত্যক্ষ উপায়ে ছড়িয়ে দেন আপন সচল-ভাত রূপাবলী।

পৃথিবীর সমস্ত ধ্বনি, রূপ, রস অনুভূতি মুখ্যতঃ চক্ষুর ও গৌণত: অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের গোচর ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলে দর্শকের মানসপটে অঙ্কিত করাই চলচ্চিত্রের মানবীয় ধর্ম্ম।

চিত্রভারতীর 'ভোর হ'য়ে এলো' চিত্রে লাঞ্ছনা-বিড়ম্বিত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণে প্রণতি ঘোষ

ষ্টুডিও সংবাদ

কবি চন্দ্রাবতী

বাঙলা লোকসাহিত্যের অবিস্মরণীয় কবি, বাঙলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি 'কবি চন্দ্রাবতী'র অপূর্ব্ব হৃদয়াবেদনভরা জীবনালেখ্যের চিত্ররূপ দিচ্ছেন উদয়ন পিকচার্স। প্রযোজনা করছেন সুবোধ দাস। পরিচালনা করছেন হীরেন নাগ, চিত্রগ্রহণে আছেন বিমল মুখোপাধ্যায়, শব্দগ্রহণে লোকেন বসু, শিল্পনির্দ্দেশনায় কার্ত্তিক বসু, সুরযোজনায় কালীপদ সেন এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, প্রণতি ঘোষ, গীতশ্রী প্রভৃতি। এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের উদ্যম, নিষ্ঠা এবং চিত্রের বিষয়বস্তুর প্রতি গুরুত্ব ও মমত্ববোধের গুণে এই ছবিটি সকল শ্রেণীর দর্শককে খুসী করার, বিচক্ষণ গুণগ্রাহী চিত্ররসিকদের পরিতৃপ্ত করবে বলেই মনে হয়। ছবিটি নভেম্বর মাসের মধ্যেই মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে মুক্তিলাভ করবে নারায়ণ পিক্চার্সের পরিবেশনায়।

ভোর হ'য়ে এলো

বাঙলা ছায়াছবির প্রতি চিত্ররসিকের হৃত পৃষ্ঠপোষকতা ফিরিয়ে আনার দাবী নিয়ে মুক্তি-প্রতিক্ষায় রয়েছে যে ছবিগুলি তার মধ্যে অন্যতম হোলো 'ভোর হ'য়ে এলো'। আজকের মধ্যবিত্তের জীবনে যে অমারাত্রির অন্ধকার অতলস্পর্শী, যে অভাব অনটন ও অর্থহীনতার বিড়ম্বনা অন্তহীন, ছোট্ট আশা, সামান্য চাওয়া, বিভাবুদ্ধি ও অসাধারণ ধৈর্য্য নিয়েও সাধারণভাবে বাঁচবার অধিকারে বঞ্চিত যে মধ্যবিত্তসমাজ তাদেরই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জীবনস্বপ্ন, সংগ্রাম ও স্বপ্নভঙ্গের সকরুণ চলমান ছবি 'ভোর হ'য়ে এলো'—নবগঠিত প্রতিষ্ঠান চিত্রভারতীর প্রথম একনিষ্ঠ উদ্যম। এই চিত্রের কাহিনী লিখেছেন 'প্রত্যাবর্ত্তন'-খ্যাত সলীল সেনগুপ্ত এবং পরিচালনা করছেন 'পরিবর্ত্তন' ও 'বরযাত্রী'-খ্যাত সত্যেন বসু। প্রকাশ, মধ্যবিত্তসমাজের রক্তক্ষরা জীবননাট্যের রূপায়নে নায়ক শিবনাথ ও নায়িকা ইন্দ্রানী চরিত্রকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন অভী ভট্টাচার্য্য ও প্রণতি ঘোষ। সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটি ছোট্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন শোভা সেন। নবাগত দুটি কিশোর অভিনেতার অভিনয় নাকি এই চিত্রের অন্যতম আকর্ষণ। চিত্রগ্রহণ করছেন প্রভাত ঘোষ, শব্দগ্রহণে আছেন লোকেন বসু, শিল্পনির্দ্দেশনায় বংশীচন্দ্র গুপ্ত এবং সুরযোজনা করছেন সলিল চৌধুরী। বর্ত্তমানে ছবিটির চিত্রগ্রহণ ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে সমাপ্তপ্রায়। প্রাইমা ফিল্মসের পরিবেশনায় ছবিটি খুব সম্ভবতঃ আগামী ডিসেম্বর মাসে মুক্তিলাভ করবে।

সোরাব মোদী প্রযোজিত 'ঝাসী-কী-রাণী' চিত্রের একটি দৃশ্যে সোরাব মোদী ও শিখারাণী বাগ

প্রতীক্ষা

বিচিত্র এই মানুষ, তার চেয়েও বিচিত্র তার মন, তার সংস্কার। এই বিচিত্র মানুষ ও তার সংস্কার নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রদীপ পিকচার্সের প্রথম ছবি 'প্রতীক্ষা'। এই ছবির অভিনয়াংশে আছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, সিপ্রা দেবী প্রভৃতি। কিনে ক্রাফ্‌টের পরিবেশনায় ছবিটি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে।

'ঝাঁসী-কী-রাণী' চিত্রে একটি যুদ্ধের দৃশ্য

ঝাঁসী-কী-রাণী

মিনার্ভা মুভিটোন-এর "ঝাঁসী-কি-রাণী" এখন মুক্তি-প্রতীক্ষায়। সোরাব মোদী পরিচালিত এই রঙীন ছবিটি ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। টেকনিকলারে সমৃদ্ধ এই ছবিটি যাতে সার্থক হয় তার জন্য এই ছবির পরিচালক, প্রযোজক সকলেই আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন। প্রকাশ, এই ছবির ঘটনাবলী যাতে নির্ভুল থাকে তার জন্য ৬৭জন ঐতিহাসিকের পুস্তকাদি থেকে দেখে নিয়ে আলোচনা করা হয়। সাড়ে পাঁচ একর পরিমিত জমির ওপর ঝাঁসীর দুর্গের 'সেট্'টি তৈরী করা হয় এবং তখনকার দিনের উপযুক্ত আসবাব-পত্তর, ঝাড়-লণ্ঠন, কাঁচের ও অন্যান্য জিনিষ-পত্তর দিয়ে সাজানোর বন্দোবস্ত হয়। তখনকার দিনে অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে সামরিক অফিসার ও সিপাহীদের ইউনিফর্ম্ম ইত্যাদি তৈরী করাবার জন্য সামরিক ঘাঁটি মীরাট থেকে দর্জ্জিদের আনানো হয়েছিল। চারশো' জন টেকনিশিয়ান, ইলিকট্রিশিয়ান, সূত্রধর, মুটে ইত্যাদি কাজে লেগেছিল সেট তৈরী করবার জন্য। ছবি তোলার সময় হয়েছিল এক ফ্যাসাদ—যুদ্ধের দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ চলার সময় হাজার হাজার লোক এসে দেখতে থাকেন চিত্রগ্রহণ, মোটর গাড়ীতে একেবারে জায়গাটি ভরে যেতো। সবাই বলতো, সেটি হলো 'সোরাব মোদীর কেল্লা'। ছবিটির এখন সম্পাদনা চলছে এবং এরই মধ্যে নাকি সাট লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী'র ছোটবেলাকার ভূমিকায় আছে বাংলার কিশোর-শিল্পী শিখারাণী বাগ ও বড় বয়সের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মেহতাব।

এম পি প্রোডাকসন্স

এম পি প্রোডাকসন্স বর্ত্তমানে তাঁদের তিনটি উল্লেখ-যোগ্য ছবির নির্ম্মাণ-কাজে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। ছবি-গুলি হলো 'আঁধি', হিন্দী 'বাবলা' ও 'সাড়ে চুয়াত্তর'।

আঁধি—অগ্রদূত-এর পরিচালনায় 'বাবলা'র অনুরূপ আর একটি হৃদয়াবেদনসমৃদ্ধ ছবি হলো 'আঁধি'। 'আঁধি' 'বাবলা'র কাহিনীকার সৌরীন্দ্রমোহনেরই আর একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। ভূমিকালিপিতে রয়েছেন—দীপ্তি রায়, রাধামোহন, মাঃ বিভু। সুর দিয়েছেন দুর্গা সেন। ছবি-খানির চিত্রগ্রহণ সমাপ্তির পথে।

বাবলা (হিন্দী)—ভারতের ও ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে সম্বর্দ্ধিত 'বাবলা'র চিত্ররূপ গড়ে উঠছে 'অগ্রদূত'বৃন্দেরই পরিচালনায় ও তরুণ হিন্দী সাহিত্যিক গুঞ্জনের সংলাপ রচনায় হিন্দী ও তামিলে। হিন্দী সংস্করণে মাতাপুত্রের অবিস্মরণীয় ভূমিকা দুটির পুনরভিনয় করছেন শোভা সেন ও মাঃ নীরেন ভট্টাচার্য্য।

হিন্দী 'বাবলা'র উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হবে কুমার শচীন্দ্রদেব বর্মণের সুরযোজনা।

সাতে চুয়াত্তর—রঙ্গচিত্রের ক্ষেত্রে এদেশের একখানি অনন্যতর পরিবেশনপ্রয়াসী ছবি। প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিকদের অন্যতম বিজন চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী। পরিচালনা করছেন 'বসু পরিবার'-খ্যাত নির্ম্মল দে। বাংলার নামকরা হাস্যরসাভিনেতাদের বিশিষ্ট সমন্বয় ছাড়া ছবিটি একটি প্রতিভাময়ী নবাগতার সন্ধান দেবে, তিনি সুচিত্রা সেন।

মিঃ সম্পত

জেমিনীর ষ্টুডিওর পঞ্চম চিত্রাবদান "মিঃ সম্পত" হিন্দী চিত্ররাজ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কাহিনী নিয়ে উপস্থিত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। এখানকার সমাজ-জীবনের নানা-দিককে ব্যঙ্গ ও পরিহাসের মধ্য দিয়ে প্রভূত হাস্যোদ্দীপক করে ফোটানো হয়েছে ছবির ঘটনাবলীতে। বিশেষভাবে শিক্ষিত শিল্পীবৃন্দ সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কঠিন চরিত্রাবলীকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যাতে দর্শকদের ওপরেও তাঁদের প্রভাব গিয়ে পড়তে পারে। ছবিটি অবিলম্বে বিশিষ্ট কয়েকটি চিত্রগৃহে মুক্তি-প্রতীক্ষার।

বউদির বোন

খগেন রায়ের পরিচালনায় চিত্রভাস্বর হাসির ছবি 'বউদির বোন' তোলা হচ্ছে ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচু মিত্র, হরিধন, আরতি দাস, পরিতোষ রায়, অনুপ সরকার, নীলমণি ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স

নবগঠিত পরিবেশক-প্রতিষ্ঠান শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স দুখানি ছবির স্বত্ব সম্প্রতি গ্রহণ করেছেন। একখানি হলো এস পি পিকচার্সের কালিদাসের "বিক্রম-উর্ব্বশী"র চিত্ররূপ যার চিত্রনাট্য লিখেছেন মন্মথ রায়। দ্বিতীয় ছবিখানি হচ্ছে এস বি প্রোডাকসন্সের শরৎ-চন্দ্রের "চরিত্রহীন"-র চিত্ররূপ যার চিত্রনাট্য লিখেছেন নিতাই ভট্টাচার্য্য। এতে সুনন্দা দেবী, ভারতী দেবী, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি অভিনয় করবেন।

সবুজ পাহাড়

বিশ্ববাণী প্রোডাকসন্সের "সবুজ পাহাড়" ছবিখানির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। জন্মান্তরবাদের রহস্য ভেদ করে মানুষ কি তার ঈপ্সিতকে পায়? কাহিনীকার দেবপ্রসাদ কর এই প্রশ্নেরই সমাধান করতে চেয়েছেন ছবির মাধ্যমে। দেবকীকুমার বসু চিত্রনাট্য সংবর্দ্ধন করেছেন এবং চিত্রনাট্য রচনা ও পরিকল্পনা করেছেন অপূর্ব্বকুমার মিত্র। ভূমিকায়

'পথিক' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত চিত্রতারকাবৃন্দ : মণিকা গুহ ঠাকুরতা, সুনন্দা দেবী, অমৃতা গুপ্তা, মঞ্জু দে, ভারতী দেবী, শোভা সেন, বনানী চৌধুরী প্রভৃতি।

আছেন : মলয়া সরকার, অজিত-প্রকাশ, ছবি বিশ্বাস, রেণুকা রায়, ভানু বন্দ্যোঃ, অমিতা বসু প্রভৃতি। দক্ষিণামোহন ঠাকুর সুর-সংযোজনা করেছেন। মতিমহল থিয়েটার্সের পরিবেশনায় ছবিখানি মুক্তি পাবে।

হরনাথ পণ্ডিত

বীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডুর প্রযোজনায় ও শচীন্দ্রনাথ কুণ্ডুর তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল ফিল্ম প্রডিউসার্সের প্রথম শিক্ষা-মূলক ছবি 'হরনাথ পণ্ডিত'-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্তিপথে। গত সপ্তাহে এর তিনখানি গান গৃহীত হয়েছে। বিমল চট্টোপাধ্যায় লিখিত কাহিনীর পরিচালনা করছেন পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী। ব্যবস্থাপনায় আছেন সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় বিকাশ রায়, কানু বন্দ্যোঃ, সদানন্দ, পঞ্চানন ভট্টাঃ, ভূপেন চক্রবর্তী, সন্ধ্যারাণী, বাণী গাঙ্গুলী, প্রীতিধারা প্রভৃতি আছেন।

অমরেশ চরিত

'চিত্রকর' নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে বিধায়ক ভট্টাচার্য্য রচিত 'অমরেশ চরিত' তোলা শীঘ্রই আরম্ভ করবেন। কাহিনীকারই ছবিখানি পরিচালনা করবেন এবং সুরযোজনা করবেন নচিকেতা ঘোষ। শিল্পীদের মধ্যে কমল মিত্র, জীবেন বসু, বেণু মিত্র, মলয়া সরকার, শোভা সেন প্রভৃতি ছাড়া নতুন কয়েকজনকে গ্রহণ করা হবে।

শুভ মহরৎ

পথিক

সীমাহীন রুক্ষ পথে এগিয়ে চলেছে এক নিঃসঙ্গ পথিক। সারাদিনের অবিশ্রান্ত যাত্রার শেষে ক্লান্ত দেহ আর অবসন্ন মন নিয়ে সে থামে এক অপরিচিত পথের বাঁকে। তাকিয়ে দেখে, চারদিকে তার নতুন পৃথিবী, নতুন পরিবেশ। পথের পথিক এসে দাঁড়ায় সেই নতুন প্রাণের নীড়ে,—নতুন মানুষের ভীড়ে। শুরু হয় এক বিচিত্র আবেগমথিত নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতময় নতুন পথ চলার কাহিনী—"পথিক"।

'পথিক' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভ্যাগতদের একাংশ : সামনের সারিতে দেখা যাচ্ছে : চিত্রলেখা দেবী (পাহাড়ী সান্যালের স্ত্রী), লক্ষ্মী সান্যাল (পাহাড়ী সান্যালের কন্যা), মণিকা গুহ ঠাকুরতা (এই চিত্রের নায়িকা চরিত্রের জন্য নির্ব্বাচিতা), সুনন্দা দেবী, অনুভা গুপ্তা ও ভারতী দেবী ফটো : নির্ম্মল মল্লিক

চিত্রমায়ার ষষ্ঠ নিবেদন 'পথিক' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান হয়ে গেল গত ২০শে অক্টোবর ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে। দেবকী বসু প্রোডাকসন্স লিমিটেডের এই ছবি-খানি প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন দেবকীকুমার বসু। কাহিনী রচনা করেছেন তুলসী লাহিড়ী। এই 'মহরৎ' অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য এই যে, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কোন শিল্পীকে সামনে রেখে প্রথম ছবি তোলা হয় নি। গীতার বিশ্বরূপ দর্শন স্তোত্র পাঠের মধ্য দিয়ে সুসজ্জিত শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তির ছবি নেওয়া হোল; ক্ল্যাপষ্টিক ধরলেন পাহাড়ী সান্যাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

বাঙলার বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিত্র-ব্যবসায়ী ও শিল্পী।

অভিনেতা শম্ভু মিত্র নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। বহুদিন পরে অতীতের সুপরিচিতা কিশোরী অভিনেত্রী মণিকা গাঙ্গুলী আবার চিত্রাবতরণ করছেন। অন্যান্য ভূমিকায় রূপারোপ করবেন কাহিনীকার তুলসী লাহিড়ী, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, কালী সরকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, গঙ্গাপদ বসু এবং আরো অনেকে।

সঙ্গীত পরিচালনা করবেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর। চিত্রগ্রহণ করছেন বিশু চক্রবর্ত্তী, শব্দগ্রহণ করছেন লোকেন বসু, শিল্প-নির্দ্দেশনার ভার নিয়েছেন সত্যেন রায়চৌধুরী। পরিবেশনা করবেন—নারায়ণ পিকচার্স লিমিটেড।

অগ্নিযুগ

ভারতীয় কৃষ্টি মন্দিরের উদ্যোগে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের "অগ্নিযুগ"-এর মহরৎ সম্পন্ন হয়েছে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর। সে-যুগের বিপ্লবী নেতা শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ কাহিনী রচনা করেছেন। পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন অমলেন্দু বসু; সুরযোজনায় অপরেশচন্দ্র লাহিড়ী; শিল্পনির্দ্দেশে দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়।

সত্যনারায়ণ

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে শ্রীসত্যনারায়ণ পিকচার্স তাঁদের প্রথম ছবি "শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ"-এর মহরৎ সম্পন্ন করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পৌরোহিত্যে। এর কাহিনীটি রচনা করেছেন মণি সিংহ এবং পরিচালনা করছেন হরি ভঞ্জ।

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ছবির মহরৎ

সমন্দর

গত ২৪শে আগষ্ট বম্বে টকীজের কর্ম্মী সংঘের প্রথম ছবি 'সমন্দর'-এর (সমুদ্র) মহরৎ হয়েছে। প্রথম 'শট'-এ কাজ করলেন শ্রীমতী ঊষাকিরণ। জনাব আব্দুল খান চাচা বম্বে টকীজের সবচেয়ে পুরোনো কর্ম্মী এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

বছরখানেক আগে বম্বে টকীজের অবস্থা একটু খারাপ হয়ে পড়েছিল। যাঁরা কাজ করতেন, সময় মতন মাইনে পেতেন না, কখনও কয়েকমাস ধরেও মাইনে বাকী থাকত। এমন সময় সমস্ত কর্ম্মী সংঘবদ্ধ হয়ে ষ্টুডিও চালাবার ভার নেন।

এঁদের কর্ম্মী সংখ্যা ২১৭—তাদের মাসিক বেতন ৭০৲ টাকা থেকে ৭০০৲ টাকা অবধি। একটা Limited Liability Co-operative Society ক'রে এঁরা কাজ সুরু করেন।

এক বছর ষ্টুডিও চালাবার পরে এঁরা একখানা ছবি করবেন স্থির করলেন। প্রথমেই এঁরা পরিচালক ফণী মজুমদারকে এ সম্বন্ধে বলেন। তিনি শুধু এঁদের উৎসাহ দেওয়াই নয়—কোন পারিশ্রমিক না নিয়ে ছবি করতে প্রতিশ্রুতি দেন। কর্ম্মী সংঘ উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য শিল্পীদের অনুরোধ জানান এঁদের সাহায্য করতে। ফলে দেব আনন্দ, দিলীপকুমার, নলিনী জয়ন্ত, ঊষাকিরণ, গোপ, শেখ মুক্তার, বিপিন গুপ্ত—সবাই পারিশ্রমিক না নিয়ে কাজ করতে স্বীকার করেছেন।

ছবির গল্প লিখেছেন ফণী মজুমদার। চিত্রনাট্য লিখেছেন নবেন্দু ঘোষ ও সংলাপ কৃষণ চন্দ।

সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করবেন তিমিরবরণ ও সূর্য্য পাল।

এ ছবি থেকে যা লাভ হবে তা থেকে ৪০% খরচ হবে নূতন যন্ত্রপাতি কেনায়, ৪০% কর্ম্মী সংঘের তহবিলে রাখা হবে ১০% কর্ম্মী সংঘের বোনাস ১০% শেয়ার ক্যাপিট্যাল।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'পরিণীতা'র হিন্দী চিত্রের রূপায়ণ বোম্বে টকীজে মহড়া চলছে। পরিচালনার ভার নিয়েছেন খ্যাতনামা পরিচালক বিমল রায়—যিনি "মা" ছবিটি পরিচালনা করে সুনাম অর্জন করেছেন। অশোককুমার ও মীনাকুমারী যথাক্রমে শেখর ও ললিতার ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

বিবিধ অনুষ্ঠান

চুঁচুড়া চৌমাথা ব্যায়াম সমিতির তৃতীয় বার্ষিক উৎসব

গত ২৬শে অক্টোবর চুঁচুড়া চৌমাথা ব্যায়াম সমিতির ৩য় বার্ষিক উৎসব উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথমে গত বিশ্ব-অলিম্পিকে 'বিশ্বশ্রী' বা 'মিঃ ইউনিভার্স' আখ্যাপ্রাপ্ত মনোহর আইচকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে এক মানপত্র দেওয়া হয়। পরে সমিতির কিশোর-বয়স্ক সভ্য-সভ্যাগণ কর্তৃক ব্রতচারী নৃত্য ও অন্যান্য ব্যায়াম-ক্রীড়া পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমান অভিক কুমার দত্তের বিভিন্ন যোগাসন ও যোগনাথ সেনের চলন্ত মোটর-গাড়ীকে আটকে রাখার শক্তি ও কৃতিত্ব দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হন। সেইসঙ্গে প্রতিটি ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে বোঝাতে থাকেন ব্যায়াম-শিক্ষক নীলমণি দাস (আয়রন-ম্যান)। পরে অনুষ্ঠিত হয় 'শুম্ভ-নিশুম্ভাসুরমর্দ্দিনী' শীর্ষক মুদ্রা-গীতি-নাট্যাভিনয়। এটির রচয়িতা ও সূত্রধার হিসেবে ছিলেন সহদেব মল্লিক, সঙ্গীত-পরিচালনা করেন যামিনী রায়। সঙ্গীতে ও অভিনয়ে অংশ নেন সমিতির সভ্য-সভ্যাবৃন্দ। কয়েকটি দৃশ্যের প্রয়োগ-কৌশল ও অভিনয় দর্শকদের বিশেষভাবে আনন্দ দেয় ও বিস্মিত করে। সমিতির সম্পাদক বিভূতিভূষণ দত্ত অনুষ্ঠান-টিকে সার্থক ও উপভোগ্য করার জন্য সবিশেষ পরিশ্রম করেছেন।

সোরাব মোদী প্রযোজিত রঙীন ছবি 'ঝাঁসী-কী-রাণী' চিত্রে নাম-ভূমিকায় [illegible]

বৈজয়ন্তী'র বিজয়া সম্মিলনী

গত ২৬শে আশ্বিন রবিবার সন্ধ্যা ছ'টায় 'বৈজয়ন্তীর' সভ্যবৃন্দ কর্তৃক বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার দিকে সভ্যরা বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শ্রোতাদের আনন্দ দেয়।

ভারতীয় ললিতকলা কেন্দ্রের সঙ্গীত সম্মেলন

গত ৩১শে আশ্বিন শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় মহাবোধি সোসাইটি ভবনে ভারতীয় ললিতকলা কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক বিভাগ কর্তৃক ষষ্ঠ সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'প্রাচীন বাংলা গান'। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু। প্রবীণ ও নবীন শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। শিল্পীদের কণ্ঠসঙ্গীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

মৈত্রী সঙ্ঘের বিজয়া সম্মিলনী

গত ১১ই অক্টোবর শনিবার হাজরা লেনস্থ "মৈত্রী সঙ্ঘে"র কিশোর বাহিনী ৺বিজয়া সম্মিলন উপলক্ষ্যে তাদের নিজস্ব পূজা প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ করেছিল অমর কথা-শিল্পী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'বিন্দুর ছেলে'। কিশোরদের উদ্যম ও প্রচেষ্টা অভিনয়ের মাধ্যমে সত্যই সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করে। অভিনয়ে যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দেয় 'বিন্দু'র ভূমিকায় মিনতি রায়, এলোকেশীর ভূমিকায় কল্পনা ঘোষ ও অন্নপূর্ণার ভূমিকায় সান্ত্বনা দাশগুপ্তা। এ ছাড়াও তপন বিশ্বাস, কল্যাণ বসু, আশুতোষ বসু, বন্দনা বসু, চন্দনা দাশগুপ্তা, অমরনাথ, মাষ্টার অবনী ও মাষ্টার শ্যামের অভিনয়ও উল্লেখ-যোগ্য। পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যথাক্রমে নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিব্যেন্দু বিশ্বাস।

ঐ দিনই কালিপদ সেনগুপ্তের পরিচালনায় সঙ্ঘের সাধারণ বিভাগ কর্তৃক তুলসীদাস লাহিড়ীর "পথিক" অভিনীত হয়। অভিনয়ে নাটকের প্রধান চরিত্রগুলিতে শ্রীমতী গীতা দে, শ্রীমতী সবিতা সাহা, সন্তোষ গাঙ্গুলী, শচীন ভট্টাচার্য্য ও গিরীন্দ্রলাল সরকার বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

হিন্দী চিত্রজগতের জনপ্রিয়া অভিনেত্রী নলিনী জয়ন্ত

নিমাই ঘোষ পাঠিয়েছেন

মাদ্রাজ-সংবাদ

মাদ্রাজ চিত্রশিল্পের অবস্থা ক্রমশঃই মন্দার দিকে চলেছে। প্রথমতঃ এখানকার নামকরা অভিনেত্রী বা অভিনেতারা প্রায় সকলেই একে একে বোম্বাই-এর ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন এবং পাকা-পাকিভাবেই বোম্বাইয়ে বসবাস করছেন। কাহিনীর নতুনত্ব বলতে কিছুই নেই। সেই একঘেয়ে কাহিনী। এতে দর্শকদের ছবি দেখার আগ্রহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ছবির আয়ও এতে অনেক কমে গেছে। জানুয়ারী মাস থেকে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত মাদ্রাজ রাজ্যে চিত্রশিল্প বাবদ আয় হয়েছিল প্রায় এক কোটি তেরো লক্ষ টাকা। কিন্তু আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত আয় হয়েছে তিরাশি লক্ষ ৮০ হাজার টাকা; পরের ক'মাসে আয় আরও কমে গেছে। এখানকার প্রযোজকরা প্রায় সকলেই বেশ চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন।

তাঁদের সকলেরই এখন ভালো কাহিনীর দিকে নজর পড়েছে। তাঁরা এখন বেশ ভালোভাবেই বুঝেছেন যে চিরাচরিত প্রথায় স্বামী-স্ত্রীর কলহ এবং পুনর্মিলন--এই ধরণের বস্তাপচা কাহিনী নিয়ে ছবি তুললে তা' চলবে না। তাই এখন ধনিক-শ্রমিক সমস্যা, চাষী-মজুরের জীবনী নিয়েই ছবি তোলার চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য ছবি না চলার আর একটা কারণও আছে, তা' হলো সাধারণ মানুষের আর্থিক অসঙ্গতি। কিন্তু এখানে ছবির অবস্থা যত খারাপই হোক এখানকার রাজ্য-সরকারের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কোন উদার দৃষ্টিভঙ্গী নেই। তাঁরা এটাকে কর আদায়ের একটা অঙ্গ হিসেবেই দেখেন। সহযোগিতা তো দূরের কথা তাঁরা প্রকাশ্যেই এর বিরুদ্ধাচরণ করেন। সমালোচনার কোন কারণ যে নেই তা' নয় কিন্তু সেটা গঠনমূলক হওয়াই দরকার।

●

এখানকার জলহাওয়ার দোষ কিনা জানিনা। এখানে কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীই হোন আর বহিরাগত কোন নামকরা ব্যক্তিই হোন তাঁরা কোন ছাত্রসভায় বক্তৃতা দিতে গেলেই আগে ছাত্রদের সিনেমা দেখতে নিষেধ করেন। তাঁদের কাছে ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতনের একমাত্র কারণ হোলো সিনেমা দেখা। কিছুদিন পূর্ব্বে জেনারেল কারিয়াপ্পা মাদ্রাজে ছাত্রদের এক সভায় ঠিক এই কথাই বলেন। আবার সেদিন ছাত্রদের এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজাগোপালাচারী অনুরূপ ভাষণই দিলেন। পাচিয়াপ্পার কলেজ ইউনিয়নে সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি যে বক্তৃতা দিলেন তার সারমর্ম হলো: সিনেমা দেখা ছাত্রদের অনুচিত। যদি কোনদিন ছবির উন্নতি হয় সেদিন তিনি নিজেই ছাত্র-দের ছবি দেখতে বলবেন। তিনি বলেন যে, চিত্রশিল্পের বিরুদ্ধে তাঁর কোন রাগ নেই। কিন্তু যেসব প্রযোজক অশ্লীল ছবি তোলেন তাঁদের বিরুদ্ধেই তাঁর বক্তব্য। এইসব ছবির সমস্ত অংশ সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষের কাটা সম্ভব নয়। সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষ নিতান্ত আপত্তিজনক অংশগুলিই বাদ দিয়ে থাকেন।

●

এবার এখানকার চিত্রশিল্পের উল্লেখযোগ্য খবরাখবর জানাচ্ছি।

এখানকার নামকরা অভিনেত্রী ভানুমতীর ষ্টুডিওটির নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হয়ে এলো। এই ষ্টুডিওটির নাম-করণ হয়েছে 'ভারিণী' ষ্টুডিও। ষ্টুডিও নির্ম্মাণ শেষ হলেই সেখানে ছবি তোলা সুরু হবে। ভানুমতীর নিজস্ব ছবি 'চণ্ডীরাণী'র স্যুটিং হচ্ছিল বাউহিনী ষ্টুডিওতে। তিনি এখন ছবির বাকী অর্দ্ধাংশ তাঁর নিজস্ব ষ্টুডিওতেই তুলবেন বলে স্থির করেছেন।

●

শরৎচন্দ্রের কাহিনীর জনপ্রিয়তা এখানে দিন দিন বাড়ছে। বিনোদ পিকচার্স শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন। দেবদাস ও পার্ব্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন যথাক্রমে নাগেশ্বর রাও এবং সাবিত্রী।

★ টুকরো খবর ★

বর্ত্তমানে নিউ দিল্লীতে কোনো ষ্টুডিও নেই। বিশেষ খবরে প্রকাশ যে, এখানে দু'টো ষ্টুডিও নির্ম্মাণের জন্য জায়গা পছন্দ করা হয়েছে এবং নক্সা প্রভৃতি মঞ্জুর করার জন্য মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কি করা কর্তব্য সে বিষয়ে গভীর আলাপ-আলোচনা করছেন বলে জানা গেছে।

●

দিল্লীর রাজ্য-সরকার চিত্রগৃহে ধূমপান নিষিদ্ধ করে দেওয়ার আইনের একটি খসড়া পরিষদের আগামী অধিবেশনে পেশ করার জন্য তৈরী করেছেন। খসড়াতে আছে, সিনেমা, থিয়েটার বা প্রেক্ষাগৃহে কোন ব্যক্তিকে ধূমপান করতে দেখলে তাকে টিকিটের দাম ফেরৎ বা কোন ক্ষতিপূরণ না দিয়েই বাইরে বের করে দেওয়া যাবে, ৫৭ ধারায় গ্রেপ্তার করা যাবে অথবা ২০৲ টাকা জরিমানা করা যাবে। সিনেমা বা থিয়েটারের হলে প্রদর্শনী আরম্ভ হবার আধঘন্টা আগে ধূমপান বন্ধ করে দিতে হবে এবং প্রদর্শনী শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাউকে ধূমপান করতে দেওয়া হবে না।

এস, পি-র মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'আঁধি' চিত্রে মাষ্টার

●

সম্প্রতি দিল্লীতে ভারত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের যে বৈঠক হয় তাতে চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটি কর্ত্তৃক সমস্ত রাজ্যের প্রমোদ-কর শতকরা কুড়ি টাকাতে বেঁধে দেওয়ার কথা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রীরা বেশীর ভাগই রাজী হননি।

●

আগামী ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে নভেম্বর নিউইয়র্কে যে ইন্টারন্যাশনাল আর্ট ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল হচ্ছে তাতে সম্ভাব্য প্রদর্শনের জন্য ভারত থেকে ৩ খানা ছবি পাঠানো হচ্ছে। উৎসবে প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত ছবিগুলির মধ্যে যেগুলি প্রদর্শনের যোগ্য বলে নির্ব্বাচিত হবে সে-গুলিকে শিল্পসম্পর্কিত বিশিষ্ট চলচ্চিত্র এই বলে সার্টিফিকেট দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। ভারতীয় ছবি তিনখানির নাম 'ইণ্ডিয়ান আর্ট থ্রু দি এজেস্', 'ফরগটন্ এম্পায়ার' ও 'সেভেন প্যাগোডা মহাবালিপুরম'। ভারতবর্ষ ছাড়া অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন, ইটালী, নেদারল্যাণ্ড, কানাডা ও ইউনাইটেড ষ্টেটস্ এই উৎসবে যোগ দেবে।

●

লাহোরের এক খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানে প্রেরিত ভারতীয় ফিল্মের সমস্ত প্রিন্টগুলি অতর্কিতে বাজেয়াপ্ত করেছেন। এর ফলে পাকিস্তানের যে সমস্ত পরিবেশক ইতিমধ্যে ভারতীয় ফিল্মের জন্য মোটা টাকা আগাম দিয়ে বসে আছেন তাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

ইউনাইটেড ষ্টেটস্-এর বাণিজ্য বিভাগের মতে বর্ত্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার চিত্রগৃহ আছে এবং প্রতি সপ্তাহে কমবেশী প্রায় ২২০,০০০,০০০ দর্শক ছবি দেখে থাকেন।

●

১৯৫২ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বারোমাসে ইতালীর চলচ্চিত্রশিল্পের উৎপাদন হচ্ছে—পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি ১২৮; ডকুমেন্টারী ৪২২ এবং সংবাদচিত্র ৩৬৭। ঐ বারোমাসে ছবির রপ্তানী ১৯৪৯ সালের দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। ইতালীয় ছবির মুখ্য বাজার হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড।

●

প্যারিসের এক সংবাদে প্রকাশ, এখন থেকে ফ্রান্সে বিদেশী ছবির আমদানী কমিয়ে দেওয়া হবে। ১৯৫২-৫৩ সালে মোট ছবি আসতে দেওয়া হবে ১৩৮ খানা মাত্র। কোন্ দেশের কত ছবি আসতে দেওয়া হবে তা প্রকাশ করা না হলেও একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আমেরিকান ছবির পূর্ব বছরের সংখ্যা ১২১খানাকে কমিয়ে ১১২ খানিতে দাঁড় করানো হয়েছে।

কিনে ক্যাক্ট পরিবেশিত মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'প্রতীক্ষা' চিত্রে স্মৃতিরেখা বিশ্বাস

চিত্রভারতীর বাস্তবধর্ম্মী ছবি 'ভোর হ'য়ে এলো'-র নায়িকার ভূমিকায় প্রণতি ঘোষ

বিমানে দীর্ঘ পাড়ির একঘেয়েমী নষ্ট করার জন্য পৃথিবীর মুখ্য যাত্রীবিমানগুলিতে সিনেমা দেখাবার উদ্যোগ হচ্ছে। পরীক্ষামূলকভাবে সম্প্রতি বি ও এ সি একটি বিমানে চিত্রপ্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতে অসুবিধে ঘটেছিলো অনেক যাত্রীদের। এইজন্যে পরিবর্তিত ব্যবস্থায় সিনেমার ব্যবস্থা করা হবে বিমানের একধারে যাতে চিত্রামোদী যাত্রীরাই কেবল দেখতে পান।

●

ভেনিস ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। Jeux Interdits নামে একটি ফরাসী ছবি প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন ফ্রেডারিক মার্চ 'ডেথ অব এ সেল্সম্যান' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য।

আপনি কি বলেন?

বিন্দুর ছেলে

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

দরদী-কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অমর-কাহিনী 'বিন্দুর ছেলে'র চিত্ররূপ দেখলাম। এরকম হৃদয়াবেদনসমৃদ্ধ প্রাণবন্ত কাহিনী একমাত্র শরৎচন্দ্রই সৃষ্টি ক'রতে পারেন। 'বিন্দুর ছেলে'র চলচ্চিত্র রূপায়ণ আমাদের নিরাশ করে নি। হাসিকান্নার আলোছায়ায় আমাদের মনকে স্নিগ্ধ করেছে, তৃপ্ত করেছে। অভিনয়ের টিম-ওয়ার্ক খুব ভাল লেগেছে। অন্নপূর্ণার ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন মলিনা, তাঁর অভিনয় শুধু নৈপুণ্যে উজ্জ্বল নয় প্রতিভার স্পর্শেও গভীর। বিন্দুর ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সব ছবি জুড়ে আছেন এই বিন্দু এবং অন্নপূর্ণা এবং এঁরা এঁদের অভিনয়-কৃতিত্বে ছবিটিতে প্রাণসঞ্চার করেছেন। অন্যান্যেরা নিজ নিজ ভূমিকায় সু-অভিনয়ই করেছেন।

শরৎচন্দ্রের কাহিনী ও সংলাপের মাধুর্য্যে পরিচালনার দোষ-ত্রুটি সহজেই দর্শকের চোখ এড়িয়ে যায়। চিত্রনাট্য ও পরিচালনার যে একটিমাত্র ত্রুটি অত্যন্ত বড় হয়ে চোখে লেগেছে তা' হ'ল খেমটাওয়ালী নাচগানের দৃশ্যটি যেন ছবির একটি ছন্দপতন হ'য়েছে।

আলোকচিত্রগ্রহণ প্রশংসনীয়।

সব জড়িয়ে 'বিন্দুর ছেলে' একটি উপভোগ্য ছবি হয়েছে। ছবিটির সাফল্য কামনা করি।

শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ইতি—

শ্রীপাঁচুগোপাল দে
শেওড়াফুলী, হুগলী

বেতার কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা

মাননীয় 'চিত্রবাণী' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের একটা বিষয় কিছুতেই বুঝে উঠতে পারা যায় না। বেতার পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষের কোনো নির্দ্দিষ্ট রীতি-নীতি আছে, না, কর্ত্তার স্বেচ্ছার ওপর ভর দিয়ে যথেচ্ছাচারই নিয়ম? 'প্রোগ্রাম' পেশের কায়দাটাকে বিশ্লেষণ ক'রলেই হয়তো দ্বিতীয়োক্তটাই স্বীকার করতে হয়।

গত ২৪শে অক্টোবর রাত ৮-৩০ মিনিটে রাজেন্দ্রপ্রসাদের ৫।৬ মিনিটের বক্তৃতার জন্যে সেদিনের নাট্যাভিনয় সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা হোলো। প্রতি বুধবার রাত ৮-৪৫ মিনিটে অরূপ ও অপরূপের আসরটিকে নির্দ্ধারিত ১৫ মিনিটের পরিবর্ত্তে ২৯শে অক্টোবর ৫ মিনিটের আসর দিয়ে বাকী ১০ মিনিট রেল সম্বন্ধে জনৈক কর্ত্তৃপক্ষের বক্তৃতাটি

বাংলায় অনুবাদ ক'রে শোনানো হোলো। আবার অনেক সময় এ আসরটিকে পরিবর্ত্তন করা হয়, কিছুদিন পূর্ব্বে সে অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে একটি বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ শুনিয়ে তাই-ই হয়েছে। গত কয়েক মাস পূর্ব্বে রাত ৮·৪৫ মিনিটে ষ্টুডিও রেকর্ডে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিবেশনের অনুষ্ঠান 'বেতার জগৎ'-এ নির্দ্ধারিত ছিলো কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ উজাড় করে বক্তৃতার অনুবাদ শোনানো হোলো।

কিন্তু বেতার কর্ত্তৃপক্ষদের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—বাংলার বেতার শুধুমাত্র বাংলার বাঙ্গালীদের নয়। বাংলার বাইরে সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালীদের তাতে দাবী আছে। জাতীয়তাকে যাঁরা ভালবাসেন, সেই শ্রেণীভুক্ত বাঙ্গালীরা All-wave-set-এর গ্রাহক হলেও হিন্দী ছায়াছবির সঙ্গীত ইত্যাদির মধ্যে মোহযুক্ত নন, জাতীয় অনুষ্ঠানগুলির তাঁরা ভক্ত। স্থানীয় বাঙ্গালীর ওপর কৃপাবশতঃ তাঁরা যদি নির্দ্ধারিত অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমার অনুরোধ প্রবাসী বাঙ্গালীদের ওপর তাঁদের হৃদয়হীন কৃপাকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করুন, অর্থাৎ স্থানীয় মিটারেই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হোক। নতুবা নতুন অনুষ্ঠানটী সর্ব মিটারে প্রচারিত না-করে স্থানীয় বা অ-স্থানীয় মিটারে স্থান দিয়ে নির্দ্ধারিত অনুষ্ঠানটী যেকোনো মিটারে পরিবেশন করুন। অনেক সময় তাঁরা এই পন্থা অবলম্বন করে থাকেন; আবার অনেক সময় তা প্রত্যাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এ দু'য়ের এলোমেলো তারতম্যের কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

আশা করি, কলিকাতার বেতার কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা 'বেতার-জগতে' প্রকাশিত অর্থাৎ নির্দ্ধারিত অনুষ্ঠানগুলিকে পরিবর্ত্তন না করে মিটারের পরিবর্ত্তন করতে সম্মত হবেন। নতুবা অনুষ্ঠান দিয়ে এই রকম পরিবর্ত্তনের পাগলামি বা ছেলেমানুষী যথেচ্ছাচার লক্ষ্য করা সত্ত্বেও 'বেতার-জগৎ' ক্রয় করে জাতীয় সরকারের মুদ্রাভাণ্ডারে অহেতুক অর্থ-জোগানদেবার মতো উদার তথা দানশীল চরিত্রের ব্যক্তি এ-দুনিয়ায় দুর্ল্লভ।

নমস্কার নেবেন। ইতি-

সন্দীপন,
কুকস্ কমপাউণ্ড,
পুরুলিয়া (মানভূম)

চিত্রগ্রহণের অন্তরালে

'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র' ছবির শুটিং-য়ের ফাঁকে চা-পানে ক্লান্তি দূর করছেন মলিনা দেবী: চিত্রগ্রহণ করছেন সুরেশ দাস ফটো: নির্ম্মল মল্লিক

চিত্রবাণী প্রেস—৫, হাজরা লেন, কলিকাতা-২৯ (ফোন : সাউথ ১১১১) হইতে নিতাই চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

মুদ্রিত [illegible] লয় হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

শারদীয়া চিত্রবাণী

১৩৫৯

সম্পাদনা ও পরিচালনায় : গৌর চট্টোপাধ্যায় এম এ
সম্পাদনায় সহযোগী : লালচাঁদ দত্ত
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-সজ্জায় : রামকৃষ্ণ বসু ও রামকৃষ্ণ দত্ত
কর্ম্মাধ্যক্ষ : নিতাই চট্টোপাধ্যায়
বিজ্ঞাপন-সচিব : অধর মুখোপাধ্যায়
সহকারিতায় : গৌরবরণ ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

আশ্বিন, ১৩৫৯

সম্পাদকীয়-- ৫
১৯৫২—
মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ৭
'শ্রীকান্ত'র চিত্ররূপ— ৯
ছায়াছবির গল্প (কবি চন্দ্রাবতী)— ২৬
'চিত্রা'র আত্মকাহিনী—
'নরাধম' কর্ত্তৃক শ্রুতিলিখিত ৩৪
নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার—
অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১
ফুটবল-রীলে—
শ্রীবিরূপাক্ষ ৫৭
মণিপুরী নৃত্যের ইতিহাস—
গুরু আতম্বা সিং ৬১
উপন্যাসের রূপান্তর—
বিপিনবিহারী রায় ৬৫
চলচ্চিত্রশিল্পে মাদ্রাজ—
বীরেন নাগ ৭০
সঙ্গীত-শিল্পী পরিচিতি— ৭৩
আলি আকবর খাঁ, তিমিরবরণ,
রাধারাণী, রবিশঙ্কর
অন্তরালের সঙ্গীতশিল্পী— ৮৫
লতা মঙ্গেশকর, গীতা রায়
ধুরন্ধরের চিঠি— ৮৯
বিশ শতকের নাট্যধারা—
সুবোধকুমার ঘোষ ৯৪
মার্লিন ডিয়েট্রিক—
সিদ্ধার্থ সান্যাল ১০৫
সোভিয়েট রঙ্গজগতে—
নিমাই ঘোষ ১১৩
বাংলা থিয়েটার উঠে
যাচ্ছে কেন ?—
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১২৮
সুরঝংকৃত গ্রামোফোন
রেকর্ডের জন্ম কাহিনী—
শ্রুতিধর ১৩২
মুগ্ধ যাঁদের গান শুনে— ১৩৫
বিমলভূষণ (মুখোপাধ্যায়),
সত্য চৌধুরী, দ্বিজেন চৌধুরী,
সাবিত্রী ঘোষ, দিলীপকুমার রায়,
শচীন গুপ্ত, ভারতী বসু
ছবির প্রচার—
ভবানী রায় ১৫৮
কোথায় আনন্দ ?—
ফণীন্দ্র পাল ১৬৪
[illegible]ন্তের প্রত্যাবর্ত্তন— ১৬৭

ছ বি র পা তা য়

আর্ট প্লেটে : 'দর্পচূর্ণ' ছবিতে কানন দেবী ; 'মায় কানন' চিত্রে অঞ্জলি রায় ; 'ভোর হ'য়ে এলো' ছবিতে প্রণতি ঘোষ ; 'কবি চন্দ্রাবতী'র নায়িকা অনুভা গুপ্তা ; এম-পি'র 'আঁধি' চিত্রের এক দৃশ্যে রাধামোহন ভট্টাচার্য্য ও দীপ্তি রায় ; 'কাজরী' ছবির এক দৃশ্যে নীরেন চট্টোপাধ্যায় ও জয়শ্রী সেন ; অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ; নার্গিস : সুরাইয়া ; 'মীমাংসা' চিত্রে বিপিন মুখোপাধ্যায় ও প্রমীলা ত্রিবেদী ; 'উর্বা-কিরণ' চিত্রে নিম্মি ; 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে সুচিত্রা সেন ; 'আজকে যাঁরা বিস্মৃত' ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রথম যুগের জনপ্রিয়া নায়িকা মাধুরী ও বেবী গার্বো ; 'চতুরঙ্গ' : নীলিমা, মঞ্জু, অনুভা ও দীপ্ত ; 'প্রতীক্ষা' চিত্রে সিপ্রা দেবী ;

সাধারণ পৃষ্ঠায় : মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ; 'কবি চন্দ্রাবতী' চিত্রে নাম ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা, জয়ানন্দের ভূমিকায় অসিতবরণ, বংশীদাস-রূপে পাহাড়ী সান্যাল, এবং একটি দৃশ্যে অনুভা ও পাহাড়ী ; নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ; 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে শিশিরকুমার ও প্রভা ; আলি আকবর খাঁ ; তিমিরবরণ ; রাধারাণী ; রবিশঙ্কর ; লতা মঙ্গেশকর ; গীতা রায় ; বিমলভূষণ ; দ্বিজেন চৌধুরী ; সত্য চৌধুরী ; সাবিত্রী ঘোষ ; দিলীপকুমার রায় ; 'ভোর হ'য়ে এলো' চিত্রের দুটি বিভিন্ন দৃশ্যে অভি ভট্টাচার্য্য ও প্রণতি ঘোষ ; 'সাড়ে চুয়াত্তর' চিত্রের এক দৃশ্যে উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট) ; মার্লিন ডিয়েট্রিক ।

চিত্রবাণী
নাট্য, চিত্র ও শিল্পকলার
সচিত্র মাসিক পত্রিকা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য—১২৲ সাধারণ ডাকে) : ১৫।৷৭ (রেজিষ্ট্রী ডাকে)

পঞ্চম বর্ষ	শারদীয়া ১৩৫৯	প্রথম সংখ্যা

পঞ্চম বর্ষের যাত্রাক্ষণে

পঞ্চম বর্ষের আজ যাত্রারম্ভ, যাত্রা সুরু পশ্চাতের অরুণিত অতীত ছেড়ে সম্মুখের উজ্জ্বলতর উদিতির উদ্দেশে, প্রারম্ভ আজ প্রারব্ধ পরিক্রমণের নতুন এক পর্যায়। বর্ত্তমানের তোরণ-প্রান্তে পৌঁছে প্রসারিত প্রেক্ষণায় ভাসমান দিগন্তবিলীন বিস্তৃত পথ-রেখা—উপান্তের আলোকস্তম্ভে প্রজ্জ্বলিত কল্প-শিখা—অম্লান, অকম্প, অর্কোদীপ্ত—যে শিখার দিশারী-আলোকে যাত্রাসুরু একদিন চার বছর আগে।

'চিত্রবাণী'র জীবনে আরও একটি শুভ্র শারদীয়ার আবির্ভাব। সমুজ্জ্বল এই চতুর্বর্ষের ইতিহাস সাফল্যের নিরিখে গৌরবময়, অভঙ্গ-ব্রাত্যের অনমনীয়তায় সার্থকতাপূর্ণ, অমলিন রুচি-শালীনতার সৌষ্ঠবে সুন্দর। প্রতিরোধহীন নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে, অমার্জ্জিত মালিন্যের আবিলতায় যখন শঙ্কিত চলচ্চিত্রের মননশীল সংস্কৃতির জগৎ, আমোদ পরিবেশনার অবিরত ভূলুণ্ঠিত যখন প্রলুব্ধ আদর্শ স্ফীত-বিত্তের অমোঘ আকর্ষণে, তখন সেই সুনিশ্চিত সঙ্কটের প্রলয়মুখে অভ্র লেহনের বলস্ফূর্ত্ত দৃঢ়তায় দাঁড়িয়েছে 'চিত্রবাণী', দাঁড়িয়েছে সংস্কারব্রতীর মুক্ত-পিধান তীক্ষ্ণ নির্ম্মমতায়, নিরপেক্ষ সেবার নিঃস্বার্থ মহত্বে। চিত্রজগতের এই ঐকান্তিক সেবার অভীপ্সা সঞ্জীবিত যাঁদের প্রেরণার প্রাণপ্রাচুর্যে সেইসব সংখ্যাতীত শুভাকাঙ্খীদের জানাই আন্তরিক শুভকামনা আজকের এই নির্মেঘ আলোক-স্বচ্ছ শরতের দিনে, পঞ্চম বর্ষের যাত্রাক্ষণে।

১৯৫২

★ ★

মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়

বাংলা চিত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবনে আজ সত্যিই আনন্দিত হবার কথা। পূর্ব্বেকার মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির তুলনায় এবছরের ছবিগুলি অধিকতর সাফল্যলাভ করেছে। বাংলাদেশে তোলা দু'খানি হিন্দী ছবি বাংলাদেশের বাইরে অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এইসব ছবির সাফল্যের একমাত্র কারণ হলো নতুন টেকনিকে তোলা অভিনব কাহিনীর উপাদান। চিত্রশিল্পের পক্ষে এটি শুভ সঙ্কেতের সূচনা করেছে এবং এটি যে চিত্রশিল্পের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর ফলে বহু প্রযোজক বাংলাদেশে হিন্দী ছবি তোলার জন্য বিশেষ উৎসাহিত হয়েছেন।

নতুন ক'রে ছবি তোলার এই যে উদ্যম দেখা দিয়েছে এ-বিষয়ে আমাদের অর্থাৎ প্রযোজকদের খুবই সতর্ক থাকা উচিত, আমরা যেন বিদেশীর অনুকরণে ছবি না তুলি—বিদেশী ব'লতে আমি অ-ভারতীয় বোঝাতে চাই। প্রমোদের নামে গতানুগতিক পাইকারীভাবে কতকগুলি অবেদনহীন যৌন-লোমহর্ষপূর্ণ ছবির অনুকরণ যেন না ক'রে বসি। চিত্রশিল্পের যে সত্যিই বহুমুখী এবং কার্য্যকরী ক্ষমতা আছে সে সম্বন্ধে কোন শ্যানধারণা না নিয়ে অকারণে শুধু ছবিতে প্রমোদ উপভোগের কথাটার ওপরই আমরা জোর দিই। এটা সত্যি যে প্রত্যেক ছবিতেই প্রমোদের উপকরণ কিছু থাকবেই, কিন্তু সে প্রমোদ পরিবেশনে একমাত্র যৌনতাসর্ব্বস্ব ছবি তোলার পদ্ধতিকে গ্রহণ করলেই চলবে না।

মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়

ছবি দেখতে যাঁরা আসেন তাঁদের মনের খবরটাও উপেক্ষা করলে চলবে না। নিঃসন্দেহে দেখা গেছে যে দর্শকসমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের ধাত বিভিন্ন ও বিচিত্র, সেই বিভেদ হোলো বয়স, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং পরিবেশের তারতম্য অনুসারে। আবার তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই হোলো মনের দিক দিয়ে পিছিয়ে। সেজন্যই বলি আমরা যে-ছবি তুলবো তার একমাত্র উদ্দেশ্য শুধু দর্শকদের ভুলিয়ে রাখা বা আনন্দ পরিবেশনই নয় সেই-সঙ্গে তাদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বও ছবিকে নিতে হবে। সবাই জানেন যে, সত্যিকারের প্রমোদ মানেই কোনো না কোনো ভাবে শিক্ষা দেওয়াও বটে।

ছবির কাহিনী সম্বন্ধে ব'লতে গেলে এই কথাই বলতে হয়, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে তোলা হিন্দী ছবির প্রযোজকদের দেখতে হবে যেন অভিনয়শিল্পীদের কণ্ঠে উচ্চারিত [illegible] নিখুঁত হয় এবং উচ্চারণ-ভঙ্গীটিও যেন ঠিকমতো [illegible]। [illegible] বিষয়বস্তু বা কাহিনী-

গত উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও সে ছবির সাফল্য অনিশ্চিত থেকে যাবে। তেমনি ছবির সঙ্গীতাংশ সম্বন্ধেও যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে কারণ কোন ছবির সাফল্য বা অসাফল্য সমান-ভাবে নির্ভর করে এই সঙ্গীতাংশের ওপর।

পরিশেষে সমস্ত প্রযোজকের কাছেই আমি আবেদন জানাই, ছবিতে প্রদর্শিত দুর্নীতি যেন সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা হয়। অবশ্য যাঁরা বুঝতে পারেন না কোথায় তাঁদের অনুশোচনার কারণ ঘটেছে এবং কোথায় তাঁদের শুধরে নেওয়া প্রয়োজন, তাঁরা আমার এই ধারণাকে বিদ্রূপ করতে পারেন তবু আমি নিঃসন্দেহ যে অন্ততঃ কেউ কেউ আমার এ কথায় কান দেবেন এবং ভবিষ্যতে তাঁরাই একদিন আর পাঁচ জনকে পথ নির্দ্দেশ করবেন।

শ্রীমতী কানন দেবী

দীর্ঘ দিন পরে তাঁকে আবার দেখা যাবে নবরূপে
নবতর মাধুর্য্য-মহিমায় তাঁর নিজস্ব চিত্র প্রতিষ্ঠান
শ্রীমতী পিকচার্সের আগামী 'দর্পচূর্ণ' ছবিতে

স্বর্গতঃ বড়ুয়া সাহেবের পরিচালনায় শেষ ছবি 'মায়াকানন'-এর নায়িকা শকুন্তলা চরিত্রে শ্রীমতী অঞ্জলি রায়

"শ্রীকান্ত"-র চিত্ররূপ

[শরৎচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস-সাহিত্যের মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে দীর্ঘদিন ধরে সমানভাবে পরিচিত ও প্রিয় 'শ্রীকান্ত' যতখানি, ততটা বোধ হয় আর কোনো উপন্যাসই নয়। একাধারে বহু চরিত্রের ভিড় দীর্ঘ চারটি পর্ব্বে, বহু ঘটনার ঘনঘটা, বহু আবেগ-অনুভূতি হৃদয়াবেদন, বহু বিচিত্র মন দেওয়া-নেওয়া, উল্লাস ও অশ্রুজল, বৈচিত্র্যময় পটভূমিকা ও পরিবেশে সার্থক এবং কৌতূহলোদ্দীপক এই উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে সকল শ্রেণীর দর্শককে পরিতৃপ্ত করার অপরিমিত এবং অনন্যসাধারণ উপাদান। দীর্ঘ চারটি পর্ব্বের এই অদ্ভুত চিত্রোপযোগী উপাদান নিয়ে বিরাট এক অনন্যসাধারণ ছবি তোলা যেতে পারে যা' ভারতীয় চিত্রশিল্পে আজো সম্ভব হয় নি, যা' ভারতীয় চিত্রশিল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাসে নতুন ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি বিকীরণ করতে পারে। তাই 'শ্রীকান্ত'র চিত্ররূপ হয়তো বহু নিষ্ঠাবান চিত্রনির্ম্মাতার বহুদিনসঞ্চিত স্বপ্নের আকারেই আজো বিদ্যমান। ছোট বড় সমস্ত চরিত্র নিয়ে 'শ্রীকান্ত'র চারটি পর্ব্বে চল্লিশটি প্রধান ও অপ্রধান পুরুষ ও মহিলা চরিত্র। 'শ্রীকান্ত'র চিত্ররূপ যদি ভবিষ্যতে কোনোদিন তোলা হয় তবে এই চল্লিশটি চরিত্রের মধ্যে কোন্ চরিত্রটি আপনার কল্পনা ও ভালোলাগাকে নাড়া দেয় এই প্রশ্ন করা হয়েছিল বাংলা চিত্রজগতের প্রবীণ ও নবীন দলের অভিনেতা-অভিনেত্রীকে। তার উত্তরে শিল্পীরা যা' জানিয়েছেন তা'এখানে সবিস্তারে প্রকাশিত হোলো। ভারতীয় চিত্র-ইতিহাসে এই অপূর্ব্ব শিল্পীসমাবেশ ও মণিকাঞ্চন যোগ হয়তো কোনোদিনই সম্ভব হবেনা, তবু যদি কোনোদিন সত্যিই সম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায় তবে ভারতীয় দর্শক উল্লসিত হবেন ঠিকই, তার চেয়েও বেশী উল্লসিত এবং উৎফুল্ল হবো আমরা এই শিল্পীসমাবেশের প্রাথমিক আয়োজন ও নির্ব্বাচন পর্ব্বে উদ্যোগী হ'তে পেরেছিলাম ব'লে!

প্রথমেই জানানো হচ্ছে সম্পূর্ণ ভূমিকালিপি, পরে প্রধান চরিত্রগুলির ভূমিকা-গ্রহণেচ্ছু শিল্পীদের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বক্তব্য—'চিত্রবাণী'-সম্পাদক]

ভূমিকালিপি

প্রধান চরিত্র

রাজলক্ষ্মী	···	চন্দ্রাবতী দেবী
অন্নদাদিদি	···	কানন দেবী
পিসিমা	···	মলিনা দেবী
কমললতা	···	ভারতী দেবী
অভয়া	···	সুমিত্রা দেবী
টগর বোষ্টমী	···	প্রভা দেবী
সুনন্দা	···	মঞ্জু দে
মালতী	···	অনুভা গুপ্তা
পুঁটুরাণী	···	তৃপ্তি মিত্র
নিরুদিদি	···	সিপ্রা দেবী

শ্রীকান্ত (ছোট)	···	মাষ্টার নীরেন ভট্টাচার্য্য
শ্রীকান্ত (বড)	···	রাধামোহন ভট্টাচার্য্য
ইন্দ্রনাথ	···	কমল মিত্র
শাহজী	···	কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
নতুনদাদা	···	বিকাশ রায়
গহর	···	অসিতবরণ মুখোপাধ্যায়
বজ্রানন্দ	···	উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়
মনোহর চক্রবর্ত্তী		তুলসী চক্রবর্ত্তী
ছিনাথ বহুরূপী	···	ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট)
অভয়ার স্বামী	···	অমর মল্লিক
মেজদা	···	শ্যাম লাহা
মন্মথ	···	[illegible] মিত্র
[illegible]	···	[illegible]রিমোহন বসু

অপ্রধান চরিত্র

দ্বিতীয় পর্ব্বে

নন্দপাগড়ী ... জীবেন বসু
(বিখ্যাত মিস্ত্রী, বর্ম্মা-জোড়া যাঁর নাম !)
জাহাজের ডাক্তারবাবু ... ছবি বিশ্বাস
রোহিণীদাদা ... পাহাড়ী সান্যাল
(অভয়ার ভরসা ও সম্বল)
দা-ঠাকুর ... তুলসী লাহিড়ী
(বর্ম্মার হোটেলওয়ালা)
ঠাকুর্দ্দা ... ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
রাঙাদিদি ... শোভা সেন
(পুঁটুরাণীর গুরুজন)

তৃতীয় পর্ব্বে

সতীশ ভরদ্বাজ ... অভি ভট্টাচার্য্য
(শ্রীকান্তের সহপাঠী)
কুশারী-দম্পতি ... জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও দীপ্তি রায়
(গঙ্গামাটির নায়েব পরিবার)
যদু তর্কালঙ্কার ... কালী সরকার
(আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন পণ্ডিত, কুশারীর ভাই ও সুনন্দার স্বামী)
চক্রবর্ত্তী-দম্পতি ... আশু বসু ও বনানী চৌধুরী
(গয়না বাঁধা রেখে যাঁরা অতিথি সৎকার করেন)
পাঞ্জাবী ডাক্তার ... গৌতম মুখোপাধ্যায়
(রেল লাইনের ডাক্তার)
শিবু ও রাখাল ভট্‌চায ... নবদ্বীপ হালদার ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
(দুই পাণ্ডিত্যাভিমানী পুরোহিত)

চতুর্থ পর্ব্বে

দ্বারিকাদাস গোঁসাই
(কমললতার বড় গোঁসাই) ... [illegible] সরকার
পদ্মা ... সন্ধ্যারাণী
(কমললতার সহচরী
যতীন ... মাষ্টার সত্যব্রত
(মন্মথ-র ভাইপো)
গণৎকার
(জনৈক উড়িষ্যাবাসী) ... হরিধন মুখোপাধ্যায়
কালিপদবাবু ... গৌরীশঙ্কর
(শশধরের পিতা)

রাজলক্ষ্মী (চন্দ্রাবতী দেবী)

রাজলক্ষ্মী, 'সত্যিই এমন নাম কে রেখেছিল কে জানে !' রূপে-গুণে, অর্থে, প্রাণতায় রাজলক্ষ্মী রাজলক্ষ্মীই। ক্ষমায়, ধর্ম্মে, 'যাদুমন্ত্রে বশীভূত করবার ক্ষমতায়' বোধ-হয় এর জুড়ি মেলে না। তবু কয়েকদিনের 'পিয়ারী'-বৃত্তিতেই সে তথনকার সমাজে অচল ঃ ঠাকুর্দ্দা চিনতে পেরেও একটু মুচকি হেসে পা সরিয়ে নেন; রতন বারবার বরখাস্ত হয়েও চাকরী ছেড়ে যেতে পারে না; বজ্রানন্দ দু'দিনের স্নেহ-চর্য্যাতেই সকল সন্ন্যাস পরি-ত্যাগ করে কেমন ছোট ভাইটির মতো হয়ে ওঠে; "বঙ্কু সবকিছু জেনে-শুনেও মা বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে না"—বরং খানিকটা গর্ব্বই অনুভব করে (অবশ্য সম্পত্তি পাবার ও বিয়ে করবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত); সুদূরের অভয়া শ্রদ্ধা জানায়; কমললতার মতো উচ্ছল-যৌবনা বৈষ্ণবীও হার না মেনে পারে না; আর অনন্ত বৈরাগী শ্রীকান্তের হৃদয়-জুড়ে জননী-জায়া-পরিচারিকার বর্ণাঢ্য রূপের কল্যাণমূর্ত্তি নিয়ে, কথনো সরল পরিহাসে, কথনো লঘুতায়, কথনো বা আত্মসমর্পণের অকুণ্ঠ উৎসর্গের আড়ালে যে 'মন্ত্র', যে 'ইষ্ট দেবতা'-কে খুঁজে পায়, বন্ধনের নাগপাশে জর্জ্জরিত করেও যে মহামুক্তির আস্বাদ দেয়, যে ভালোবেসে বাঁচতে চায় একটিমাত্র মুহূর্ত্তের বৈচিমালার শুভক্ষণকে কেন্দ্র করে, যে সকল অহঙ্কারকে ফেলে দিয়ে বলতে পারে "তোমাদের মতো পুরুষের জন্যে কত শত মেয়ে ঐ জিনিষটাকে ("সম্ভ্রম") ময়লার মতো ফেলে দিতে পারে তা যদি জানতে; কিন্তু থাক সে কথা"—যে অনায়াসেই বিপদে সাড়া দেয় অথচ বিদায়ে

বাধ সাধে না, যার অদ্ভুত ক্ষমতাবলেই সুনন্দা ও কুশারী-গিন্নীর মধ্যেকার অচলায়তন বিচ্ছেদটা ভেঙে পড়ে, যার কামগন্ধহীন ভালোবাসা দূর থেকে মঙ্গলকামনা ক'রে প্রিয়তমের শত অমঙ্গলকে দূরে সরিয়ে রাখে, যে পাবার আগে আপনা হতেই শতগুণ দেয়, যে জীবিকার জন্যে জড়োয়ার সাজ পরে—অদৃষ্টের পাক্-চক্রে সেই কুলটা, সে-ই বহু-বিবাহিতা, সমাজ-সংসার-সংস্কার-বিবর্জিতা, তথাকথিত সকলের ঘৃণ্যা। কিন্তু এরই মধ্যে অন্নপূর্ণারূপী সাক্ষাৎ বাঙলাঘরের মায়ের পরিচয় পাই, এই চরিত্রেরই অনুচিন্তনের মাঝে খুঁজে পাই অলক্ষ্য অথচ সদা পরিদৃশ্যমান স্বাধিকারবোধদৃপ্তা, স্বাবলম্বিনী, নিষ্ঠাময়ী বাঙলার চিরবধূকে।

তবু আশ্চর্য্য, শ্রীকান্তের চোখ দিয়ে তার স্বার্থপরতা, প্রিয়তমের গুরুগম্ভীর শাসনে অবনত হয়ে থাকার বাসনা ও চির জীবন-জনম একই ধ্যান-জ্ঞানে কাটিয়ে দেবার সাধনার মধ্য থেকেই, শাশ্বতী রাজলক্ষ্মীকে আবিষ্কার করি: তার সমস্ত দোষ-গুণের মাঝেই নিজেকে হারিয়ে ফেলি। তার ছিম্‌ছাম চেহারা, 'অর্থের বিনিময়ে আয়ত্ত বিদ্যা' ও সাতাশ বছর বয়ঃক্রম, এমনকি, ভক্তির প্রাবল্যে নাক-চুল-কাটা অবস্থাটাও যেন বেশ আয়ত্ত হয়ে আসতে পারে, মনে হয়।

এই চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ আমার বহুদিনের। এদেশের চিত্র-নির্মাতারাও কি-জানি কেন, "চন্দ্রমুখী" দেখবার পর ঐ ধরণের চরিত্রে আমায় নিয়োজিত করে ফললাভ করেছেন। সমাজচ্যুত অথচ জীবনবোধ ও আত্মসম্মানে সম্রাজ্ঞী, সেবাপরায়ণ এবং কিছুটা জ্ঞানী—এই ভাব-সমন্বয়কে আমি, বোধ হয়, ভালই ফুটিয়ে তুলতে পারি।

অন্নদাদিদি (কানন দেবী)

পরিপূর্ণ বিষাদের কালো ছায়াখানি।

সাতপাকের মোহে বুঝেছিলেন, স্বামীছাড়া বাঙালী-মেয়ের আর অন্য কোন অস্তিত্বই নেই। কিন্তু হলে হবে কি, ঘর-জামাইটি ছিলেন লম্পট, অর্থগৃধ্নু এবং পরে খুনী। ক্রমে ফেরার। পরে ফিরলেন তিনি; চিনলেন অন্নদা, ঘর ছেড়ে বাইরে পা দিলেন। যাতনার দরজা উন্মুক্ত হোল, যত্নের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হোল পেছনে। সহধর্ম্মিণী, তাই মুসলমান হোতে হোল, সাপুড়ে হোতে হোল—নেশাবাজ, হতশ্রী একটা পুরুষ, স্বামী বলেই, তার ধ্যান-জ্ঞান অনুশীলনেই জীবন উষর হয়ে গেল। অথচ সাধ্বী; পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, শুচিতায় হার মানায় কে? স্নেহ-ভালবাসার অপ্রতুল ভাণ্ডার যাঁর মন, ঝলসে দেবার মতো যাঁর রূপের জ্যোতি, পিতা যিনি পেয়েছিলেন ধনবান্—তাঁকেই অবশেষে দুটি কানের মাকড়ি বিক্রি করে মৃত স্বামীর ঋণ শোধ করতে হোল। স্নেহের বিনিয়োগে ইন্দ্রনাথের মতো দামাল ছেলেকেও বশীভূত করেছিলেন তিনি। অথচ, হিন্দুয়ানীর চরম ধর্ম্ম দেখিয়েও নারীত্বের পরিচিতি পান নি। পেয়েছেন অপযশ, ঘৃণা, লাঞ্ছনা, দুঃখ এবং অপরিসীম অর্থকষ্ট।

গঙ্গার পাড়ে নিজের সিঁদুর নিজেই মাটী ঘসে ঘসে তুললেন, নোয়া-শাঁখা ভাঙলেন; নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন তারপর, একটা করুণ হাতছানি রেখে। সমাজ-সংসার কেউই ফিরেও চাইলে না।

অন্নদাদিদির চরিত্রায়ণ আমার মনোলোকের বাসনা। অন্যান্য ছবিছাড়াও আমার 'অনন্যা' যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা মনে হয়, 'অন্নদাদিদি' রূপে আমাকে দেখলে খুব নিরাশ হবেন না। আঙ্গিক ও কণ্ঠবৈশিষ্ট্য যেখানে আমাকে ঢেকে দেখাবে না আমার রূপায়ণকে, ঠিক সেই রকম একটি চরিত্র "অন্নদাদিদি"। শরৎচন্দ্রের এই অমর সৃষ্টির প্রতি আমার বাস্তবিক একটা উদগ্র ভালোবাসা আছে।

পিসিমা (মলিনা দেবী)

সংসারের সবচেয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্না আদর্শ গৃহিণী হচ্ছেন পিসিমা। পিসেমশায় থেকে দেউড়ির দারোয়ান পর্য্যন্ত যাঁর 'হাঁ'-কে 'না' করবার দুঃসাহস রাখে না; এমনকি 'নাকঝাড়া', 'থুতুফেলার' টিকিট দস্তখতকারী একবার শ্রীকান্তকে ধমকাতে গিয়ে বেজায় 'থ' বনে গেল, যে

মেজদার দাপট ছোটদের কারো কাছেই অবিদিত ছিল না। স্বল্পভাষিণী অথচ ন্যায়-নিষ্ঠাবতী ; লুকিয়ে লুকিয়ে নিরুদিদির মতো অসহায়া, 'একঘরের' কাছেও দান পাঠান ; সু-রসিকা তো বটেই—কেননা ছিনাথ বহুরূপীর ন্যাজ কেটে দেবার কথায় পিসেমশায়কে বলেন : ওটা কেটে তোমার কাছেই রেখো, অনেক কাজে লাগতে পারে।

সকলের অলক্ষ্যেই কাজ করে যান ; সবাইয়ের ওপরই স্নেহ-ভর্ৎসনা-ঘেরা শান্ত-সুস্মিত দৃষ্টি ; অথচ পাঁজি দেখে বার্তাকু ভক্ষণ করেন, আবার অসুখ করলে খাইয়ে-দাইয়ে শ্রীকান্তকে নিজের ঘর খুলে বিছানার ওপর শুইয়েও রাখেন।

এমন চরিত্রকে অনুধাবন করার মাঝে কোথায় যেন একটা অন্তর্লিহ গর্ববোধ লুকিয়ে থাকে, চারিত্রিক ভঙ্গিমাতে অসম্পূর্ণ নিজেকে একবার পুরোপুরি দেখে নিতে বাসনা হয় ; হয় না কি ? এই পিসিমার ভেতর দিয়ে ?

সচরাচর মাসিমা-পিসিমা ক'রে যেসব চরিত্রগুলোর মধ্যে আমাদের ঠেসে ধরা হয়, তাদের চাপে আমরা প্রায়ই কোনঠাসা হয়ে পড়ি। কিন্তু এই 'পিসিমা' যে একেবারে অন্যজাতের সে কথা তো আগেই বলেছি। মঞ্চে ও শরৎচন্দ্রের বা ঐ-ঘেঁষা গুটিকয়েক ছবির মধ্যে আমার যে পরিচয় দিতে পেরেছি, আশা করি, এই 'পিসিমার' ভেতর দিয়ে আমি তার শতগুণ ধরে দিতে পারব। এটা যেন আমার নিজের গড়া একটা ভূমিকা।

টগর বোষ্টমী (প্রভা দেবী)

কণ্ঠি বদল করেছে বলেই যে নন্দ পাগড়ীকে বিয়ে-করা সোয়ামী বলতে হবে এমন কোন কথা এদের শাস্ত্রে লেখা নেই।

ইয়া দশাশয়ী চেহারা, দাপটের চোটে নন্দ বেচারী অস্থির। নিজের খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আগে, তারপর সংসারের আর সব। চলেছে নন্দ পাগড়ী বর্মা-মুলুকে, এবারে একেবারে টগরকে সঙ্গে নিয়ে।

জাঁহাবাজ মেয়েছেলে। গলার স্বরেও কমতি নেই। ডেকের ভেতর কয়েকটা কাবুলিওয়ালা মিন্‌সের দিকে ঘন ঘন নরম দিষ্টি ছুঁড়ে মারতেও ঘাটতি নেই। ওদিকে নন্দর খাবারের হাঁড়ি যে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, কারোর বলবার জো আছে! দুপুরবেলা ঘুমোলে কারোর ডেকে তোলার সাধ্য আছে? তবু মিস্তিরীর কী আশ্চর্য্য স্নেহ, অবিমিশ্র কৌতুকবোধ।

মাথা ধরলে বিরাট পাগড়ী বাঁধে—বিশ বছরের কষ্টি-বদলানো দেহে এতটুকু টোল খেতে দেবে না সে কোনমতেই।

একটু খুঁজে-পেতে দেখলে, দেখা যাবে, এই সব মিস্তিরি-কুলকে এই টগর বোষ্টুমীরাই চিরকাল ধাতে রেখে এসেছে।

প্রভা ছাড়া ন্যাকা ন্যাকা কথা-বলা দজ্জাল মেয়েছেলের চরিত্র অভিনয় করার কথা কেউ ভাবতে পারে,—আপনারাই বলুন না, এঁ্যা? আমার অতশতয় দরকার নেই বাপু, এই "বোষ্টুমী"-ই মাৎ করে দেব, দেখ'খন!

অভয়া (সুমিত্রা দেবী)

চওড়া কপাল, অপরূপ রূপসী, 'চাপা-আগুন' মনে হয় যেন মেয়েটিকে। বাইশ-চব্বিশ বছর বয়েস, রোহিণী-দাদাকে সঙ্গে নিয়ে বর্ম্মা-মুলুকে হারিয়ে-যাওয়া স্বামীকে খুঁজতে বেরিয়েছে, তার জন্যে সে কৃতসঙ্কল্প, কোন বাধা, কোন ছোট দেওয়া-নেওয়া, কোন ওজর-আপত্তিতেই টলতে রাজী নয়। ভেতরে হয়তো একটুখানি কমপ্লেক্স্‌ও আছে—রূপ যার এতো, একবার চাইলেই যেখানে মা-লক্ষ্মী সংসার সাজিয়ে দেন, এমন শুশ্রূষা পরিচর্য্যা করবার দক্ষতা যার আছে, হৃতস্বামীর সম্মুখীন হ'লে তাকে আপন করে নিতে পারবেই। এই তার অনুমান। এই তার দাবী।

অথচ, তা হোল না। সারাগায়ে বেত্রদণ্ডের কলঙ্ক মাখিয়ে সতী-সাধ্বীকে পরমগুরু স্নেহের গঙ্গা বইয়ে দিলেন অতএব পালিয়ে আসতেই হোল—সংস্কারকে পেছনে ফেলে রেখেই। একেবারে সটান রোহিণী দাদার কাছে, যার হৃদয়-দুয়ারে ওর আসন পাতাই ছিল। তবু মনে মনে বিদ্রোহ করে, বারবার প্রশ্ন করে নিজেকে, শ্রীকান্তকে—ভুল তার কিছু হয়েছে কিনা! তার এই প্রাণ, এই সফল যৌবনের জীবনস্পৃহা কি এতই নগণ্য যে রুদ্ধ-দ্বার স্বীকৃতির গর্ব্বে বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রতিবাদে নিজেকে সঁপে দিতে হবে? অথচ, সকল সম্পদই তো তার উন্মুখ হয়ে রয়েছে ফুলে-ফলে ভরিয়ে দেবার,—এ সংসারকে। কঠোর যুক্তি নিয়ে চলে, যেখানে আজন্ম সংস্কারও হোঁচট খায়, বাধ্য হয় মাথা নোয়াতে।

প্রত্যাশা না নিয়েই আকর্ষণ করে, প্রাণ ঢেলে সেবা ক'রে, যত্ন ক'রে আপন করে নিতে চায়। এ মেয়ে তবুও অধঃপতিতা, সমাজে অস্পৃশ্যা একেবারেই উপেক্ষিতা। এমন, যা রাজলক্ষ্মীকেও বিশেষ প্রভাবিত করেছিল।

অভয়ার সঙ্গে প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য যে আমারও খানিকটা আছে, একথা অন্তরে-অন্তরে বুঝি। 'স্বামী' ছবিতে আমার অংশটুকু যাঁদের পরিতৃপ্ত করেছে, তাঁরা, আমার মনে করা অন্যায় নয়, 'অভয়া'-রূপে আমাকে দেখবার দাবী নিশ্চয়ই করতে পারেন। আমারও দৃঢ় ধারণা, 'অভয়ার' মধ্য দিয়ে আমি তাঁদের সে দাবীটুকু নিঃসন্দেহে পূরণ করে দিতে পারি।

কমললতা (ভারতী দেবী)

প্রকৃত উর্ব্বাঙ্গিনী, 'একজোড়া মোটা কালো ভুরুর' পাল্লায় পড়ে অবশেষে নবদ্বীপে আসে কমললতা। এক টাকার বিষ কিনতে পাঠালো যাকে, সে হতভম্ব হোল: বদনামের ভাগী হয়ে আত্মহত্যা করলো, করালেন নিজের 'জোড়াভুরু' কাকা। শিলেটের মেয়ে। বাপের সম্পত্তি ছিল! ভরা যৌবনের স্বপ্নে বিভোর—পদস্খলনও হোল। অথচ উপায় নেই। সমাজের সাজা মাথা পেতে নিতেই হবে!

প্রাণে-টগমগ, যার কীর্ত্তন শুনে গহর মজলো, শ্রীকান্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল—সে কেন এভাবে আত্মসমর্পণ করলো গেরুয়া রঙের কাছে? আশ্চর্য্য লাগে। জাগিয়ে দেবার, বাঁচিয়ে রাখার কী অপূর্ব্ব উন্মাদনা ওকে ঘিরে

থাকে ওর চারিদিকে, কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেবে কে? আবার বদনাম। গহর বেচারা! ইষ্টিশান থেকেই ছাড়াছড়ি। শ্রীকান্তকে কী চোখেই না দেখেছিল! শেষ বিদায়ের আগে অন্ধকারে একটা টিপ ক'রে বুঝি পেন্নামও করলো।

কমললতার কামনা জড়ায় না কাকে; কেন জড়াবে না? দোষটা তার কি? কেই-বা তাকে দেখিয়ে দেবে কোথায়? রক্তের ডাকে, মাংসের হিসাবেই মানবী সে। তবু কতো নিঃস্বা, কতো অনুশাসনের চাপে প্রপীড়িতা, কী ভয়ঙ্কর আত্ম-অস্বীকারের আয়োজন তার চারিপাশে, তার সত্তার বিরুদ্ধে।

কমললতাই তো শ্রীকান্তকে দেখিয়ে দিয়েছিল তার আসল রূপ; ধরা দিয়েও অভিমান করে দূরে সরেছিল; তারপর অনায়াসেই বিচ্ছেদকে আপন করে নিলো—কোন অনুযোগ, অভিযোগ করলে না; যাবার আগে শুধু রেখে গেল বৈরাগীর পদপ্রান্তে একটি উজ্জ্বল প্রণাম। অসময়ে, মন-গোধূলি বেলায়।

'বন বুল বুল গাহি গান' দেখার পর, মনে হয় না, 'কমললতা' করায় আমার অভিনয় বাঙলার দর্শকসমাজ সইতে পারবেন না। ঠিক এই ধরণের চরিত্রই আমি চাই, যেখানে আপাতঃ আনন্দ থাকলেও ভেতরে ভেতরে একটা করুণতার ছাপ থাকবে! উপরন্তু আপনারাও নিশ্চয়ই বলবেন, প্লে-ব্যাক গানে আমি লিপস্ ভালই দিয়ে থাকি—কমললতার কয়েকখানা কীর্ত্তন থাকতে পারে এটা তো ঠিক।

পুঁটুরাণী (তৃপ্তি মিত্র)

সরল গ্রাম্য মেয়ে। জানে চোদ্দ বছর পেরিয়ে গেলে আর বিয়ে হবে না। বিয়ের খদ্দের মাত্রেই ভাল। শ্রীকান্তকেও পছন্দ হয় আবার শশধরকেও। জানে, বিয়েতে টাকাটাই আসল। সেটা যেমন করে হোক্ জোগাড় করা চাই-ই।

[illegible]তি দিয়ে লজ্জা দিয়ে সংসারকে [illegible] করার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। [illegible], সব লজ্জা খুইয়ে এসেছে শ্রীকান্তের [illegible] করতে। ধরা পড়লেও, সত্যি কথাকে বেঁকিয়ে বলার বালাই নেই—যা বলার অকপটেই বলতে পারে।

সংসারে গড্ডালিকা প্রবাহের মতো এরা আসে যায়; গুরুজনদের বিধান, সে যতো কঠোরই হোক্, মাথা পেতে নেয়। ভাগ্যকে বিশ্বাস করে ভগবানের চাইতে বেশী। আর, মেয়েমানুষ তো ভাগ্য নিয়েই জন্মায়!

পুরুষ মানুষ, অবিবাহিত অথবা মৃতদার হলেই, যখন বাপ্-মায়ের বিশেষ খাতিরের কারণ হয়ে ওঠে—এরা বুঝে নেয় ঠিক তখন তাকে কেন 'অমন' করা হচ্ছে। কোন সঙ্কোচ নেই দ্বিধা নেই; এরা যথারীতি যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়েই আছে।

পুঁটুরাণীর ভাগ্য ভাল যে, শ্রীকান্তের কাছে শশধরের কথাটা বলতে পেরেছিল। এর মধ্যে ঠাকুদ্দার হাত কতখানি কে জানে! তা না হলে, ঠিক ঐ সময়ে, তিনি বাহিরেই বা চলে গেলেন কেন?

"গোপীনাথ" (হিন্দী) ও গণ-নাট্য সংঘের নাটকগুলোতে আমাকে যারা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এটুকু বুঝেছেন যে, বেশী কথা বলার চেয়ে ভাব-ব্যঞ্জনা ও সূক্ষ্ম প্রকরণাদির ভেতর দিয়েই আমি অভিনীত অংশটিকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করি। বাঙলার গ্রাম্য মেয়ে, ভাষা নেই ভাব আছে, দাবী নেই ক্ষমা আছে, এমন চরিত্রই হচ্ছে "পুঁটুরাণী"—যার রূপ-যশও বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। বহু চরিত্র থাকা সত্ত্বেও "পুঁটুরাণী" তাই আমার selection.

সুনন্দা (মঞ্জু দে)

নির্ভীক নারীত্বের সমুজ্জ্বল শিখা এক। শিবু তর্কালঙ্কারের মেয়ে, যদু কুশারীকে হৃদয়-বিদ্ধ করিয়া জয় করিয়াছে, মানুষ করিয়া তুলিয়াছে—পার্থিব স্নেহ-শ্রদ্ধার উপরে প্রকৃত ধর্মাধর্ম-জ্ঞানকে স্থান দিবার উপযুক্ত শিক্ষা, সৎসাহস ও বুদ্ধি দিয়াছে। শ্যামবর্ণা, সুন্দরী, বিদুষী, কিছু-প্রগল্ভা, ধীর, স্থৈর্যশালিনী ও স্বামী-পুত্রের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার। কষ্টে পড়িয়া স্বামীকে হাটে বেগুন বিক্রি করিতে পাঠাইয়াছে, কিন্তু দমে নাই।

কানাই বসাকের স্ত্রী-পুত্রকে কড়ায়-গণ্ডায় তাদের সম্পত্তি না বুঝানো পর্যন্ত রেহাই নেই—এমনই ধনুকভাঙা জেদ। ভাণ্ডারের মুখের উপর সত্য বাক্য বলিয়াছে, অপ্রিয় জানিয়াই। রাজলক্ষ্মীকে বিভ্রান্ত করিয়াছে; শ্রীকান্ত-'লক্ষ্মী'র মধ্যে একটা হাল্কা ব্যবধান করিয়া দিবার সহায় হইয়াছে; আবার ভাঙা সংসারে জোড়া লাগাইয়াছে—সুখকে দশগুণ করিয়া বাড়াইয়া দিয়াছে। অহং-শূন্যা, বিনয়ী, ক্ষমাশীলা সে। বয়সে যদিও তরুণী।

তবু, রাজলক্ষ্মীর যেন মনে হয়, তার এ সমস্ত বিদ্যাই যেন অপরের মনে কষ্টের উদ্রেক করিবার জন্যই; মনে হইয়াছে, এ বিদ্যা হয়তো প্রকৃত বিদ্যা নহে।

অথচ, সুনন্দার সহিষ্ণুতা, অকপট-আচরণ, "পান হঠাৎ করোয়নি, হঠাৎ একদিনই ছিল," 'লক্ষ্মী'কে মুগ্ধ করিয়াছে, বশীভূত করিয়াছে। এমনকি, শ্রীকান্তকেও ভুলাইয়াছে। হায় রে!

আমাকে দিয়ে খালি sophisticated রোল করানো হয় কেন জানিনা, দু'পাতা ইংরিজি পড়েছি বলে? "সুনন্দা" চরিত্রটি বাস্তবিক আমার এত ভাল লেগেছে যে আর কি বলব। অমনি তেজোদৃপ্ত', দরিদ্রা অথচ আদর্শাশ্রয়ী পার্ট না করলে আমার অভিনয়-জীবনই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কেবল মনে হচ্ছে, সুনন্দা আর মঞ্জু দে—দুজনেই এক নয় তো? আপনারা হাসবেন হাসুন, আমার আপত্তি নেই। আমার বক্তব্য আমি খোলাখুলি প্রকাশ করলুম।

মালতী (অনুভা গুপ্তা)

ছোটঘরের মেয়ে। আঁট-সাঁট গড়ন। অতি অস্বাভাবিক রকমের সাজ-পোষাকবিলাসিনী। কাঁচপোকার টিপ পরে, রূপো-পেতলের গয়না পরে। নবীন ভালবেসেছে। ঝগড়া করে বটে, কিন্তু মালতীর জন্যে অনেক করেছে। অনেক কিছু বিলাসের উপকরণ জুগিয়েছে; বিয়েও করেছে। ছোট জাত, তাই হাতের শাঁখাগুলো পটাপট্ ভেঙে দিলেই বিধবা করে দেওয়া যায়! নবীন রেগে একদিন তাই করে দিলে।

জীবনটা সত্যি-মিথ্যের আলো-আঁধারি। নবনে যখন মাথা ফাটিয়ে জেলে গেল তখন কান্নাকাটি করলে, দুঃখু করলে। গঙ্গামাটির মা—রাজলক্ষ্মী, চুপিচুপি দু'শ টাকা দিলেন; নবনে-মালতী একরাতেই কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল—পুলিশের খপ্পর থেকে।

কিছুদিন পরে নবনের কোন পরিবর্ত্তন হোল না বটে, কিন্তু মালতী বেশ আর একটা ভাঙা করে নতুন সংসার পাততে এলো গঙ্গামাটিতেই। নবনের সে-রকম কিছু দোষও যে ছিল তা নয়।

এই ধরণের নিষ্ঠুর এবং উস্কে-দেওয়া চরিত্র অভিনয় করবার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। প্রচলিত নীতি ও সমাজ-বোধ এদের অত্যন্ত অল্প বলেই এরা সুখকে আয়ত্তের মধ্যে পায়, খামখা গুমরে মরে না। শরৎচন্দ্র ছাড়া অন্য কেউ লিখলে এই মালতীকে একটা কিম্ভুত করে দাঁড় করানো হোত; সেইজন্যেই মালতীকে খুঁজে দেখার এত আগ্রহ আমার।

স্থূল হলেও আবেদন যার সূক্ষ্ম, এই চরিত্রই আমার বেশ ভালো লাগে। 'রত্নদীপে' যে আমি আপনাদের খুসী করতে পেরেছি, তার অন্যতম কারণ হয়তো শ্রদ্ধেয় দেবকীবাবু আমার এই মনোভাবটি সুস্পষ্ট ধরতে পেরেছিলেন। 'কবি', 'রত্নদীপ' ও 'শ্রীকান্তে' 'মালতী' আমার তো মনে হয়, একই সিঁড়ির বিভিন্ন কয়েকটি ধাপ মাত্র। এ-চরিত্রের সদ্ব্যবহার, আশা করি, আমার দ্বারা অসম্ভব হবে না।

নিরুদিদি (সিপ্রা দেবী)

পাকচক্রে পড়ে লোকাচার-দুষ্ট সামাজিক অনুশাসনের কবরে আজ 'একঘরে'। মূর্তিমতী বেদনা। অথচ একদিন ছিল, যখন পাড়ার সবাইকার খোঁজ রাখতেন, অসুখে কষ্টে আপ্রাণ সেবা-শুশ্রূষা করে ভালো করে তুলতেন, নিঃস্বার্থভাবেই।

এখন, দেখবার মধ্যে আছে পোড়্ভাঙা শ্রীকান্ত, আর পিসিমার গোপন [illegible]। এঁরই শেষদৃষ্টি অতীব মর্মন্তুদ। [illegible] ধীরে ধীরে গ্রাস করতে আসছে।

'কালো কালো ভয়ঙ্কর দুতেরা দাঁড়িয়ে আছে জানলার বাইরে, ম্লান ভাবে ডেকে বললেন, "শ্রীকান্ত আজ তুই বাড়ী যা।" ওরা কেবল শ্রীকান্তের জন্যেই ভেতরে ঢুকতে পারছে না, তাই বাইরে থেকেই চোখ রাঙাচ্ছে। দেখেছিস? তারপর তারা এলো···মৃত্যুর ঘোরে কী সে আকুল মিনতি, কী ভয়!'

ছোট্ট চরিত্র, কিন্তু দশটা বড় বড় চরিত্র-ও এ-ট্রাজেডী, এ-বেদনা-বিধুরতায় ম্লান হয়ে যায়। অন্তরে, যে জীবনে কোনদিন, খুব বড় ব্যথা পেয়েছে, অথবা, দেখবার সুযোগ পেয়েছে, শুধু সে-ই নিরুদিদির মতো সার্থক চরিত্রসৃষ্টিকে অবলম্বন করে দুর্বল সমাজের চোখে নতুন করে আবার জল এনে দেবে, দিতে পারে।

ট্রাজেডীই আমার অভিনয়-জীবনের রক্ষাকবচ। জীবনে অনেক ভাঙ্গা-গড়ার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকায় এবং বিশদ করে, ভাল চাইতে গিয়ে বিপদ বরণ করে নেবার অযথা বিড়ম্বনা আমাকে বহুবার ভোগ করতে হয়েছে। নিরুদিদির শেষদৃশ্যটি আমাকে, কেন জানিনা, যতবার পড়ি ততবার অভিভূত করে ফেলে। সাদাসিধে হলেও একটু ট্রাজেডী আছে এমন চরিত্র অভিনয় করে, মনে হয়, আমি বাঙলার দর্শকসমাজকে কিছু খুসী করতে পেরেছি।

শ্রীকান্ত (রাধামোহন ভট্টাচার্য্য)

আপাতঃদৃষ্টিতে গোবেচারা, পরের অন্নে ও দয়ায় মানুষ নির্বিরোধ আদর্শ-সংসর্গ নির্ব্বাচনে পটু, নেতার একান্ত ডিসিপ্লিন্ড শিষ্য হিসাবে এই চরিত্রের সূত্রপাত —বয়স বড় জোর বার হইতে চৌদ্দ। এরপর প্রায় ছিন্ন-বিছিন্ন বিশ বৎসরের ইতিহাস—রোগের ভোগের বাসনার অভিমানের উৎপ্রেক্ষিতার, বৈরাগ্যের, অনুশোচনার, অভিজ্ঞতার। অতিসাধারণ বাঙালী-ঘরের ছেলে, দাপট নাই, বিক্রম নাই, অর্থ নাই, কিন্তু প্রাণ আছে; বিপর্যস্ত হইবার দেহ আছে কিন্তু কাহারো উপরে আক্রোশ নাই; বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার [illegible] করিবার, দুরন্ত রোগে শিয়রে বসিয়া নীর[illegible]বা করিবার, "আসি-বার পূর্বে খুঁটির ধারে তখনকার বহুমূল্যবান পাঁচ পাঁচটি টাকা রাখিয়া আসিবার" অপরের ব্যথায় ব্যথী হইবার সৎসাহস আছে। ভালোবাসিবার মতো হৃদয় আছে, নিজেকে পূর্ণ সমর্পণের সৎসংকল্প আছে, কিন্তু পুরুষ মানুষ হইয়া জন্মিয়া 'সম্ভ্রম' ত্যাগ করিবার মতো বৈপ্লবিক চেতনা নাই—অথচ কলঙ্ক-কালিমা বহন করিয়া বেড়াইবার দুর্জয় সাহসেরও অভাব নাই। সাহসী, তামাকুপ্রিয়; চা-জল খাবার নিঃসঙ্কোচে গলধঃকরণ করিতে আপত্তি নাই; ছুঁৎমার্গ নাই, জাতি-বিচার নাই; তবু একান্তভাবেই যার হাতে আপনাকে সঁপিয়া শান্তি, তার উপরই রাজ্যের আঘাত, অপমান, অভিমান হানিয়া, এমনকি, অভয়া ও তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম তফাৎ লইয়া খানিকটা মনোকষ্ট; সংসারে ভক্তি করিবার মতো একমাত্র পিসিমা ছাড়া আর কেহ নাই, এমন ব্যক্তি যে বারবার জ্বরে অসুখে বিধ্বস্ত, সময়ে সময়ে অর্থাভাবে বিড়ম্বিত, বিপদে 'লক্ষ্মী' ছাড়া গতি নাই; মনের অন্ধ প্রকোষ্ঠে এক বৈরাগীকে লইয়া শুধু বাস করে—সে শুধু নিশ্চুপ নিশীথে একান্ততার মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়ায় আর বলে, 'ছি, ছি।' তাই কমললতাকে ভালো লাগে: নিজে বৈরাগ্য-অহমিকাবোধে, অপরের নির্ভয় আশ্রয়স্থল না হওয়ায়। একদিকে যেমন বেপরোয়া, আবার অন্যদিকে ততখানিই নীড়-অভিলাষী, শান্ত, সংযত, রসিক ও নির্জনতা-প্রিয়। সমাজ অব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন—কন্যাদায়গ্রস্তকে বিমুখ করতে নারাজ, জীবিকা-কল্পে চাকুরী ছাড়া অনন্যোপায়, প্রায়-ক্ষীণজীবি অথচ দৃঢ়-চেতা। এ-ই তো বাঙলার পুরুষের সাধারণ ছবি, ইনিই একাধারে শিব-শঙ্কর-পরশুরাম-কার্তিকেয়। মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত, প্রথমটি বর্মা যাওয়া পর্য্যন্ত; দ্বিতীয়টি বর্মা হইতে ফিরিয়া আসার পর। এমন চরিত্রের সহিত একাত্ম হইতে কে না চায়!

শ্রীকান্ত চরিত্রটি পছন্দ হওয়ার মূলে আমার দুইটি কারণ রহিয়াছে; প্রথমতঃ, এই চরিত্র খাঁটি ও নির্ভেজাল বাঙালী চরিত্র; দ্বিতীয়তঃ ইহা জ্ঞান ও স্বীয় জীবনদর্শনকে লাঠি উঁচাইয়া দেখাইতে চাহে না এবং মূলতঃ শম্বুকবৃত্তি-পরায়ণ! অথচ অতি সহজেই দাগ কাটে: সহজ বলার

কারণ, অতি দুরূহ আভিনয়িক কার্য্য-কলাপের পরবশ বলিয়াই। আমার অভিনয়-রীতির সহিত যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে তাঁরা হয়তো জানেন, আমার কৌশল ভাষণে উপলব্ধ বিষয়বস্তুর প্রতি অসংশ্রবঘটিত জ্ঞানোন্মেষক, পরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তিতে। শ্রীকান্তের মার্জিত অসহায়তা একটি রূপক নিশ্চয়ই।

ইন্দ্রনাথ (কমল মিত্র)

বাঙ্‌লা সাহিত্যের বিস্ময়কর চরিত্রসৃষ্টি এই 'বড়লোক রায়েদের ছেলে ইন্দ্রনাথ বয়েস ১৬।১৭, খুব লম্বা-চওড়াও নয়, অথচ ধনঞ্জয়ের মতো আজানুলম্বিত বাহুযুগল, যা দিয়েযে অসাধ্য সাধন করতে পারে। কিল-চড়-লাথি, ঘুসোঘুষি, পটাপট ছাতাভাঙার শব্দ, মুখ-খারাপ, 'ওরে বাপরে' ইত্যাদির ভেতর থেকে অনায়াসে, ফুটবল ম্যাচ গ্রাউণ্ড থেকে, ঠিক আপন শিষ্যটিকে বেছে নিয়ে পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে আসতে পারে। কেউ তার পথ রুখে দাঁড়াবার সাহস করে না, দু'ঘা দেবার মতো স্পর্দ্ধার কথা চিন্তাই করতে পাবে না।

অথচ, সংসার সম্পর্কে একেবারই নির্বিকার, ভবঘুরে, একটু ফিটফাট, পরোপকারী, দুরন্ত সাহসী, অজাতশত্রু, সর্বময়গতি, দয়ালু, বিরাট হৃদয়, ছকবাঁধা লেখাপড়ায় বিরোধী, কিছু অভিমানী ও নির্জ্জনতা-বিলাসী ; স্থিরপ্রতিজ্ঞ, বলবান ও মন্ত্রগুণ-বিশিষ্ট যার বাগ্‌ভঙ্গী। যা সহজে বশ মানায়, পোষে।

দু' পাঁচ বছরের পরিসরের মাঝেই হঠাৎ দেখা দিয়ে সমস্ত চেতনাকে অসাড় করে দিয়ে, আবার অকস্মাৎই অন্তর্দ্ধান হয়, ফেলে রেখে যায় একটা বুকভাঙা স্মৃতি, মুগ্ধ ভালবাসা, অপার বিস্ময়।

বোধহয় মীনরাশিতেই তার জন্ম, এবং চন্দ্রও তুঙ্গে ছিল তার। অন্ধকারকে জয় করাতেই তার আনন্দ : আর অদ্ভুত তার বাঁশী বাজাবার ক্ষমতা, দাঁড় বাইতে পটু, দক্ষ নাবিক সে—নদীর গতিবিধির যে কোন অবস্থাতেই।

বন-জঙ্গল, সাপ-খোপ, ভূতের ভয় কবে তাড়িয়েছে ; সারাবাড়ীর যা সাহস হোল না, এই ছোট ছেলেটাই তাই করলে', হ্যারিকেন আলো নিয়ে গিয়ে ছিনাথ বউরুপীকে আবিষ্কার করলে বাঘের চামড়ায় ভিতর থেকে ! ইস্কুলে কি একটা, পণ্ডিতের পিঠের ওপর করে,' শিক্ষকের শিখা-গুচ্ছটি সযত্নে কাঁচি দিয়ে কেটে পকেটের মধ্যে ন্যস্ত করে। ('পাছে খোয়া যায়'—এই ভয়ে), রেলিঙ টপকে সেই যে বেরিয়ে এল, তারপর থেকে আর গেটের পথ দিয়ে ঢুকতে পারলে না। অথচ অন্নদাদিদির জন্যে প্রাণ কাঁদে ; চুরি করে মাছ ধরে বিক্রি করে, টাকা নিয়ে গিয়ে দেয় ; শাহজী দু' একটা কি বিদ্যে দেয় নি বলে মারামারি-গালমন্দ করে ; এক সঙ্গে বসে তোফা গাঁজা খায়—তাছাড়া কাঁচা সিদ্ধি, চুরুট ('বাপরে সে কি টান !') তো আছেই।

অথচ, নতুনদাদাকে খাতির করে ; সদ্যমৃত শিশুকে পরম যত্নে কবর দেয়—তার মুখের ওষুধের গন্ধ পায়, সে 'ভেইয়া' বললে বলে, 'আমাকে ভয় দেখিয়ো না ভাই, তাহলে অজ্ঞান হ'য়ে যাব।' আধিদৈবিক ব্যাপারে বিশ্বাসী, মৃতের আত্মার উপস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ, প্রাণের ডাক রাম নামে ভক্তিমান, শিশুর মতো কোমল, এবং ঐ বয়সেই যা তার পক্ষে জানা অসম্ভব তা সে সকলের অগোচরে, আঁধার রজনীতে, উত্তুঙ্গ জলোচ্ছ্বাসের ঘূর্ণাবর্ত্তের মাঝে থেকে জেনেছে। নিজের সাহসকে সহজেই শিষ্যের মধ্যেও সঞ্চারিত করেছে।

প্রকৃতির একান্ত নিজের, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ প্রাণের জোয়ার নির্ভীক এই ইন্দ্রনাথ—অন্নদাদিদির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেও হারিয়ে যায়। মনে মনে ইন্দ্রনাথ না হতে চায় কে ? আমি তো চাই-ই।

আমার আয়তনের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের হয়তো পুরোপুরি মিল নেই, তবু শিশুকালের কথা মনে পড়লে ওর সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে পড়ি। আমার স্বরক্ষেপ ও সহজাত চরিত্রায়ণের কথা হয়তো সকলেই জানেন। কঠিন, দুর্জ্জেয়, নির্ভীক অথচ অন্তরে কোমল—এমন চরিত্র অভিনয় করেই মনে হয়, মঞ্চে ও পর্দায় আমি আপনাদের অনেককে আনন্দ দিতে পেরেছি। সুতরাং 'ইন্দ্রনাথের' প্রতি যে একটা আজন্ম টান আমার থাকবে এ আর বেশী কথা কি।

শাহজী (কানু বন্দ্যোপাধ্যায়)

বড়লোকের ঘর-জামাই। অন্নদার মতো স্ত্রী। কিন্তু তাতেও মন ওঠে না ঠিক যে কারণে লজ্জা ঢাকতে যুবতী বিধবাকে হত্যা করে ফেরার হতে হয় সেই কারণেই শাহজী পালিয়ে গিয়েছিলেন। নামটা ছদ্ম। অন্নদাকে দেখতে যখন সেই ছদ্মবেশে ফিরে এলেন, তখন একজন সাপুড়ে, মুখের ভাষা অন্য, পরণে গেরুয়া জামা-কাপড়। নেশাভাঙ বেশ রপ্ত হয়েছে; কেশে কেশে দম আটকে যায়; নগণ্য, করুণাশ্রয়ী, আত্ম-ধিক্কারে-জর্জরিত এক পুরুষের কঙ্কাল—অন্নদার স্বামী। মুসলমান।

অন্নদা ঘর ছাড়লেন—সহধর্মিণী কিনা! সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বেদনা, হতাশা ও রিক্ততাও ভাগাভাগি হয়ে গেল।

নিজে অন্নদার ওপর অত্যাচার করতেন বটে, কিন্তু অপরে কিছু বললে সইতে পারতেন না। ইন্দ্রের ওপর আক্রোশ শেষে হয়েছিল খানিকটা সেইজন্যেই।

নেশাই মৃত্যু ঘটালো। বিষাক্ত গোখরো সাপ মারলো ছোবল গলায়। সাপের হাতেই মরলেন কিন্তু দুজনে একসঙ্গে। আক্রোশে টেনে টেনে সাপটাকে এমন লম্বা করে দিলেন যে গোখরোও সে ধমক্ সামলাতে পারলো না।

মৃত্যুর পরে অন্নদা দিলেন উপহার। নীল ঠোঁটের ওপর তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসার সর্ব্বশেষ চুম্বন শাহজী জানতেও পারলেন না। এমনই হতভাগ্য!

শাহজী চরিত্রটি আমাকে খাপ খাবে বলেই ভালো লেগেছে। কবিগুরুর একটা কথা বিশেষ করে মনে পড়ে: যা পাবার তা লোকে অত্যন্ত করে চেয়ে নেবে, কিন্তু দেবার কথা উঠলেই ভেবে নেবে, বোধ হয় একটু কোথায় ভুল হয়েছিল। এমনি ধরণের কথাই যেন মনে হচ্ছে। 'শাহজী'র পাপ আর প্রায়শ্চিত্ত দুই-ই বাঙলা ছবিতে আজ বারো-চোদ্দ বছর করে চলেছি, ভাগ্যরূপী অন্নদাকে তো খুঁজে পাইনি। তবে 'শাহজী' সাজলে হয়তো খোদ অন্নদাকে পাবো—এই যা সান্ত্বনা!

অভয়ার স্বামী (অমর মল্লিক)

অভয়ার মতো মেয়ের স্বামী হয়েছে যে দেশ ছেড়ে বর্ম্মা মুলুকে আখের গুছতে এসেছে। পরণে তার সাহেবী পোষাক, কিন্তু এতো নোংরা আর দুর্গন্ধময় যে ভূতও ভিড়তে পারে না। উঁচু উঁচু দাঁত, পুরু ঠোঁট আর গালময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দু'কশ বেয়ে পান গড়িয়ে পড়েছে, রস শুকিয়ে গিয়ে ঠোঁট দু'টোর ওপর এক কিম্ভূত-কিমাকার রঙ্ হয়ে কামড়ে বসে আছে। পাক্কা চোর, তাই অতিমাত্রায় কথা বলে, মিথ্যে বলে, মন গলিয়ে দেবার বিদ্যেটা বেশ আয়ত্ত করেছে। বর্ম্মাদেশের একটি মেয়েকে বিয়ে ক'রে, এক পাল ছেলে-পুলে নিয়ে দিব্যি দেশের কথা ভুলে এখানে গেড়ে বসে গেছে।

বর্ম্মাশেল থেকে বিতাড়িত, পরে একটা কাঠের ব্যবসায়ে চাকুরী নেয়—সেখান থেকেও চুরির দায়ে বরখাস্ত।

অভয়াকে ফিরিয়ে নেবার ছল করে হৃত চাকরী ফের বাগিয়ে নিলে, তারপর অভয়ার ওপর পশুর মতন নির্যাতন আরম্ভ করলে, অপবাদ দিলে—আরো কত কি।

আগে দেশে টাকা পাঠাতো কিন্তু নিজের হাল-চালের কোন খবরই দিত না। পরে তাও বন্ধ করে দেয়।

টিপিক্যাল স্বার্থপর, জোচ্চোর বাঙালী—যাদের জন্ম দিয়ে, কুলাঙ্গার করে, বিদেশ থেকে লজ্জা দেশে প্রায় আমদানী হয়ে থাকে।

আমেরিকান কয়েকটা বদমায়েস চরিত্রের সঙ্গে বেশ মিল আছে: এরা ইউনিভার্সাল বলেই হয়তো!

বর্ণে-গন্ধে Villain, পোড়-খাওয়া, মাঝ-বয়েসী এমন চরিত্র যে আমার খুব প্রিয়, এ আমার অভিনয়ের সঙ্গে যাঁরাই পরিচয় রেখেছেন তাঁরাই বলতে পারবেন। আর বানিয়ে মিথ্যে কথা বলা? এসো না দাদা, মল্লিক-মশায়ের সঙ্গে বাজী ধরে বল্‌তে। দশ হাত পিছিয়ে যাবে। 'অভয়ার স্বামী'র যা ভাব-গতিক পড়ে দেখলুম তাতে এইটুকু বিশ্লেষণই তো ক্ষমতা অনুযায়ী করতে পেরেছি। Description কিরকম মিলে গেছে লক্ষ্য করেছ? বহুদিন বাদে এইরকম একটা মার্কামারা Villain Role দেখলুম। যদি কোনদিন সম্ভব হয় তো দেখো, মল্লিক-মশায় যা বলে, তা সুযোগ দিলে করতেও পারে, ফাঁকিটি পাবে না ভাই।

গহর (অসিতবরণ)

শ্রীকান্তের সহপাঠী। জাতিতে মুসলমান্। কিন্তু দরদী, মন-প্রাণ-খোলা অখ্যাত এক গ্রাম্য কবি সে। কৃত্তিবাসের চেয়ে জবর রামায়ণ লেখার বাসনা পোষণ করে; সীতা হরণের দুঃখে সে আকুল হয়ে ওঠে। অল্প-শিক্ষিত, কিন্তু প্রকৃত রসের সন্ধান সে পেয়েছে। কমল-লতায় আপনাকে জড়িয়ে ফেলেছে, প্রিয় ভৃত্য নবীনের যথেষ্ট বীতরাগের কারণ হয়েছে, মঠ-কীর্ত্তন করেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। ট্রাজেডী তার যে, সে ভালো-মানুষ। কী চাইলে, পেলে কী, কতখানি দিলে কিছুরই হিসেব-নিকেশ রাখলে না। এক গোছা নোট রেখে গেল শুধু কমললতার জন্যে, শ্রীকান্তের জিম্মায়। আর এক ফোঁটা চোখের জল।

অতি দয়ালু এবং তদধিক বিশ্বাসী। চক্রবর্তী মশাই—এক বিষয়ী ব্যক্তি, গহরের দয়ার দান এবং বিশ্বাসের কড়ির উপযুক্ত মর্যাদাই রাখলেন। গহর কোন-দিন এসবে ভ্রূক্ষেপও করে নি। শ্রীকান্তও স্বীকার করেছে, এমন বাপ-মা যার, বিশেষ করে মা, সে অমন হবে না তো হবে কি?

কবির নীরব ভালোবাসার মধ্যেই সার্থকতা; দুঃখ এই যে, তার অর্থ এবং প্রযত্ন মঠাধীশরা সানন্দে উপভোগ করলেন কিন্তু তার পুণ্যময় প্রেমের মর্যাদা দিতে পারলেন না। বড় গোঁসাই ব্যথিত হলেন এতে। কমললতা মঠ ছাড়লো—গহর তখন আর-এক পৃথিবীর পথে বহু বহু দূর এগিয়ে গিয়েছে। হায়, গহর! আল্লার দরবারে তোমার কী বিচার তোলা আছে কে জানে!

সমস্ত বইখানার ভেতর এর চেয়ে আর্টিস্টিক চরিত্র আমার আর কোনটা লাগে নি। কোট-প্যান্ট-সার্ট আর অযথা গান গেয়ে গেয়ে যেন পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি। এমনি একটা আত্মভোলা, নিরহংকার গ্রাম্য-কবির পার্ট করার জন্যে অন্তর খুব সায় দিচ্ছে। আর তাছাড়া, আপনারা তো দেখেছেন অনেক ছবিতেই, ভালো ছেলে অথবা ভালো-মানুষ বনে যেতে আমার কতো কম সময় লাগে! সবচেয়ে বড় কথা, একটা জাত-বিয়োগান্ত (মানে pseudo নয়) চরিত্র এখন আমার চাই-ই।

নতুনদাদা (বিকাশ রায়)

একটি 'লবেজান' Snob Role করিবার ইচ্ছা আমার অনেকদিন হইতে আছে। character acting করিয়া করিয়া আমার এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, নিজেকে অত্যন্ত Serious ছাড়া কল্পনা করা নিজের পক্ষেই দুষ্কর হইয়া গিয়াছে। অথচ, আমি যে Serio-comic role কতো দক্ষতার সহিত করিতে পরি তাহার খোঁজ বোধ করি আমার গৃহিণী ছাড়া আর কেহই রাখেন (কথাটা তাঁর কাণে না পৌঁছাইলেই ভালো হয়) না। সত্যসত্যই "নতুনদাদার" চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গিয়া যেন একটি নূতন উদ্যম পাইলাম। এখন একটা departure-এর জন্য প্রাণটা ছটফট করিতেছে—আপনারা বিশ্বাস করিবেন কিনা জানিনা। কিন্তু, বিশ্বাস করুন!

মনে হইতেছে, ইন্দ্রদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া পড়িয়াছি। ইন্দ্রের মাসীমা, অর্থাৎ আমার মা, মানে নতুন-দা'র গর্ভধারিণী সঙ্গে আসিয়াছেন। আমার ধারণা, দর্জি-পাড়া লণ্ডনের একটি রাজ-সংস্করণ। আমার বেশভূষা তাই অতীব জমকালো। এন্ট্রান্স পাশ করিয়াছি, ভবি-ষ্যতে ডেপুটি হইতে হইবে। সুতরাং আগে হইতে তালিমের প্রয়োজন আছে কি না? আমার স্থির বিশ্বাস আমার চেয়ে ভালো গান আর কেহ গাইতে পারে না; হারমোনিয়াম আমি না ধরিলে কোথাওকার কোন যাত্রা আরম্ভই হইতে পারে না; আমার সাহস আর যে কোন দশটা লোকের চেয়ে বেশী; আমি সৌখীন, মুখে বার্ডসাই তো আছেই। খোট্টা এবং খোট্টা দেশের লোকগুলার প্রতি স্বভাবতঃই আমার একটা অনুকম্পা, মানে অসহ্য বীতরাগ আছে। উহারা আদৌ মনুষ্যপদবাচ্য নহে। এই আমার সংস্কার। আমাকে সহুরে দেখিয়া ইন্দ্ররা একটু চমকাইয়াছে। অতএব তাহাদের বশ্যতাকে কাজে লাগানোই উচিত।

রাত্রে তো বাহির হওয়া গেল। ওপারে "যাত্রায়"

আমার ডাক পড়িয়াছে। ইন্দ্র ও তাহার এক বন্ধু, কান্ত না-কি, আমাকে নৌকায় করিয়া লইয়া চলিয়াছে। যেমন নৌকার ছিরি, তেমনই ছিরি তাহাদের পোষাকের। কান্তের গায়ের তেলচিটা র‍্যাপারখানা দেখিয়া তো গা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছে—ওখানা পাতিয়া বসা চলে। আমার আরাম বিধানের জন্য এই খোট্টাদেশের গেঁয়োভূতগুলা কতো তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেছে না। (এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, এখানে ষ্টুডিয়োয় অনেক বৃহৎ বৃহৎ তারকারা এই "নতুনদাদার" ভূমিকাটি এতো ভালো করেন যে, খামখা rehearsal-এর প্রয়োজন হয় না।)

কখনও পাল তুলিয়া দেয়, কখনও দাঁড় বাহিতে থাকে আবার কখনও গুণ্ টানে—কিন্তু সময় যে উৎরাইয়া যাইতেছে সেদিকে মূর্খদের খেয়াল নাই। আমি তো দিব্য কম্ফর্টার, ওভারকোট, পায়ে পম্পস্ ও গরম মোজা এবং দস্তানায় হাত ঢাকিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু আমার ব্যস্ততা কি উহারা লক্ষ্য করিতেছে? আমাকে বাধ্য হইয়াই কতকগুলা অপ্রীতিকর কথা বলিতে হইতেছে। কি করি বলুন!

হঠাৎ আমাকে এক বালির চরে নামাইয়া উহারা কোথায় যেন অদৃশ্য হইল। আলো-আঁধারির রাত। কতক্ষণ একা থাকা যায়? 'ঠুন ঠুন পেয়ালা' গানটিও কেন যেন মনে আসিল। গানে এত বিপদ আছে এই অসভ্য দেশে কে-ই বা জানিত। কতকগুলা কুকুরের তাড়নায় বিরক্ত হইয়া পাশের এক খালে সবশুদ্ধ ডুবাইয়া গলাটি বাহির করিয়া বসিয়া রহিলাম। পরে কান্তের র‍্যাপারখানি পরিয়া বাড়ী পৌঁছাইলাম। একটা অসভ্য জায়গায় বেড়াইতে আসার বদ-ইচ্ছা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়া গেল!

মন্মথ (শম্ভু মিত্র)

'বাপ্, এমন বিদঘুটে ভুরু লোকের হতে পারে আগে জানতুম না'—এই গোছের পাকা বদমাস টাইপের একজন শিলেটী লোক। ঘোরতর পাপ করে অনুগত ভাইপোর ঘাড়ে দিব্যি চাপিয়ে দিলে; রক্ষকের অগোচরে তাঁর সবচেয়ে বড়ো সর্ব্বনাশ সাধন করলে; বিয়ে করবার আশ্বাস দিয়ে একটা অযৌক্তিক দাঁও কষ্‌লে—টাকার হিসেবে; দিব্যি বেরিয়েও গেল বিপদ থেকে।

তবু কামনার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে অন্তরে। কমললতার পেছু তাই ছাড়ে নি। সুবিধে পেলেই শ্লথ মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করতে চায়—পেতে চায় অভীপ্সিতাকে; তাকে কুলছাড়া করিয়েও ক্ষুধা মেটেনি পাষণ্ডের। সুযোগ ঘটলেই তার অপযশ গায়; পূর্ব্ব-ইতিহাস উন্মুক্ত করে দেখাতে চায় ভদ্রলোকদের; গাছ-পালার আড়াল থেকে ঊষাকে দেখে, আর পুরু ঠোঁটটা চেটে নেয়।

চরিত্র ছোট, কিন্তু ঘটনা পারম্পর্য্যের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে অনেক দূর। যতীনকে টেনে এনেছে। একটা ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েছে।

এসব চরিত্রের যথাযথ রূপ দিতে পারলে এবং চিত্রনাট্যকার মশাই সদয় হ'লে, এর অভিনয় দেখিয়ে মানবসমাজের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করা যায় হয়তো ভীষণভাবে উত্তেজিত ক'রে তুলতেও পারা যায়।

অভিনয়ের আয়তন অল্প, সংযত অনুকার্য্যের দ্বারা চরিত্রটিকে মূর্ত্ত করে তুলে ধরতে হবে দর্শকের সামনে—তারপর শেষপর্য্যন্ত তাকে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু বাড়ী যাবার পথেও এক একবার চিন্তা করে দর্শক শিল্পকলার বোধ খানিকটা ঝালিয়ে নেবেন আপনার অন্তরের মধ্যে—প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এর মধ্য দিয়েই হয়েছে, যার জন্যে এই "কালো জোড়া ভুরুর" চরিত্রটিকেই আমি বেছে নিয়েছি সর্ব্বাগ্রে। ছাঁচে-ঢালা টাইপ চোখে ভেসে ওঠার কথা শম্ভু মিত্তিরের কখনও মনেও আসে নি। তবু অনেক টাইপের আড়াল থেকে দর্শকের মনের কোণায় আমি উঁকি দিয়ে দেখে যাবো, নাট্যকলার সাধনায় এই আমার ছোট্ট লক্ষ্য। এই ব্রতেই আমি ব্রতী।

বজ্রানন্দ (উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়)

যুবক। ঋজু দেহ। বলিষ্ঠ চেহারা। 'নারায়ণ' বলে এসে দাঁড়ালো। রাজলক্ষ্মী তখন গঙ্গামাটি যাবার পথে

শ্রীকান্তের আহার ঠিক করে দিচ্ছে। দেবে-দ্বিজে অসাধারণ ভক্তি বলেই বজ্রানন্দ (ওরফে "আনন্দ") 'লক্ষ্মীর' আপন জন হয়ে গেল—সেবায়, যত্নে, হয়ে গেল যেন ছোট ভাইটি। "এই রকম বোনেদের দর্শন পাবার জন্যেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়" বজ্রানন্দদের।

ছিন্ন-ভিন্ন গেরুয়া ধুতি-পাঞ্জাবী, পায়ে ছেঁড়া জুতো। দেখে বুঝবার উপায় নেই যে, এ একজন বড়ঘরের ছেলে, ডাক্তারী পাশ করে জনগণের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করেছে। ভারী বাক্সটা রাজলক্ষ্মীদের গোযানে শওয়ার করে দিয়ে কতো আলোচনাই না করলে—পায়ে হেঁটে-হেঁটে যেতে। 'লক্ষ্মী'র নতুন করে চোখ খুললো।

আহারে বিলক্ষণ রুচিসম্পন্ন, স্পষ্টবক্তা, মায়াবন্ধনহীন, আদর্শে বিশ্বাসী, জ্ঞানী ও হাতে-কলমে সেবাপরায়ণ ছেলে—এই বাঙলা দেশেরই ধন।

যেমন গ্রাম গড়ার কাজে, তেমনই 'লক্ষ্মী'র প্রসাদে নবরীতিতে ইস্কুল-হাসপাতাল-বাড়ী প্রভৃতি তৈরী করায়, উদ্যোগ ও কর্ম্মে সে নিপুণ: অথচ, নিজের জন্য সে কিছুই রাখে নি!

আমাকে আপনারা ভারী বিপদে ফেললেন দেখতে পাচ্ছি। এ যেন বাঁশ বনে ডোম-কাণা হবার অবস্থা! কোন্‌টা পছন্দ হোল আর কোন্‌টা যে হোল না, ভাবতে ভাবতেই দু'রাত কেটে গেল। তারপর এই "বজ্রানন্দ"কে সবচেয়ে আপন বলে মনে হোল। "বসু পরিবার" নিশ্চয় দেখেছেন? ঐ ভাব নিয়েই আগাগোড়া চরিত্রটা analysis করে ফেললুম! কেন জানি না, আজকাল Stevenson-এর philosophyটা খুব আমার প্রতি affectionate বলে মনে হচ্ছে, অবশ্য, sofar as film-acting is concerned.

***ছিনাথ বহুরূপী* (ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়) [ছোট]**

আপাতঃদৃষ্টিতে হাসির খোরাক জোগালেও, ভেতরে ভেতরে অতি করুণ রসে সিক্ত চরিত্র।

পেটের দায়ে বছরের একটি বিশেষ সময়ে নানান সাজে সেজে এসে পয়সাটা-সিধেটা বড়লোকের ঘর থেকে আদায় করে যায়।

বিপদ ঘটবার আগের দিন নারদ সেজে এসে প্রচুর আনন্দ দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাঘের সাজ সাজতে গিয়েই দেখা দিল যতো বিপদ। ব্যাপারটা এতোদূর গড়াতে পারে কল্পনাই করে নি। কিন্তু বাঘ দেখে দেউড়ির দারোয়ান থেকে কর্ত্তাবাবু স্বয়ং এমনকি পড়ার ঘরের ছেলেরা পর্য্যন্ত এ কেলেঙ্কারী করতে পারে, এটা কি ভেবেছিল? আর ভাবলেই বা অমন সাজ সে কেন করতে যাবে?

ইন্দ্রনাথ এসে সে-যাত্রা সন্দেহ না ভাঙালে কি যে হোত কে জানে? তাই গাছের ধারে (আড়ালে) দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। তারপর শাস্তির বহর, খড়ম পেটা, লেজ কেটে নেওয়া প্রভৃতির কথা শুনে বেচারা একেবারে কেঁদে ফেললে। হাতজোড করে বললে, দোহাই বাবু আমায় মাফ করবেন।

আমার মনে হয় আমায় খুব Suit করবে এই পার্টটা। চিত্রে আসার আগে "বহুরূপীই" তো ছিলাম মশাই! অবশ্য সাজ না করেই আনন্দ দিতুম, বন্ধু-বান্ধবদের। তারপর কি কুক্ষণে ছবিতে এসে আপনাদের সবাইকেই নাচাচ্ছি, আর, কোন্ দিক থেকে আমাকে নাচতে হচ্ছে—তা অন্তর্যামীই জানেন! আমার সদাই ভয়, কোন্ দিন না শেষে সাজ খুলে এসে আপনাদের সবাইকার স্নেহ-দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হয়: অ মশয়, শুনত্যাছেন! অমি ভানু, ভানু—ছিনাথ নই, ঘাবরাবার কারণ নাই, বোঝল্যান?

***মনোহর চক্রবর্ত্তী* (তুলসী চক্রবর্ত্তী)**

আধা-বয়েসী ভদ্রলোক। গোপনে বন্ধকী-তমসুকিয়ানা চালান। বেশ আত্মতৃপ্ত। সুতরাং, অপরকে উপদেশ দেবার বেশ খানিকটা অধিকার আছে বৈকি!

শ্রীকান্তকে উপযুক্ত পাত্র ঠাউরে সংসারে কেমন করে চলা উচিত, কীভাবে উত্তরপুরুষের জন্য সঞ্চয় করে রেখে যাওয়া উচিত, অল্প খরচ করে কী-করে দিন গুজরাণ করতে হয়—[illegible] ব্যাপারে লম্বা-লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে উচিত-কর্ম্মাদি শিখি[illegible]লেন।

কিন্তু, নিজের অতিবুদ্ধিই শেষে গলার দড়ি হয়ে দেখা দিল একদিন। বর্ষায় দুরন্ত প্লেগের সময় একটা বেজায় সস্তা বাড়ীভাড়া করে রোগ থেকে বাঁচতে গিয়ে "স্বপ্ন দেখতে দেখতে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কুঁচকী ফুলিয়ে তুললেন।" তারপর পাশের ঘরে দু'টো ঘাড়াঘাড়ি মড়া নিয়ে, সামনে আর একটা আধ-মরা লোককে সামলাতে সামলাতে শ্রীকান্তর রাত কাটলো; প্রাজ্ঞ মনোহরও শেষ হলেন।

মরবার আগে তখনও সিন্দুকের কথা, চাবির কথা, দেশে নাতি-পুতির কথা চিন্তা করছেন। একেই বলে জ্ঞান!

এ-ও একটা বিশেষ টাইপ। খোজাপ্রহরী-মার্কা যখেদের ওপর বেশ একটা তীব্র শ্লেষের আভাষ পাওয়া যায় প্রাজ্ঞ চক্রবর্তীর ভেতর দিয়ে। তাই নয় কি?

ঝোলে-ঝালে-অম্বলে-ট'কের কথা উঠলেই তুলসী চক্কোত্তির অমনি ডাক পড়ে, জানি ভায়া! সেই অপরেশ মুখুজ্যের আমল থেকে যাত্রা, মঞ্চ আর এই হাল্-ফিল বায়োস্কোপ—অনেক কিছুই দেখলুম। প্রথমে ডুয়েট নাচতুম আর সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ করে গান! তাই ভেড়া বলো ভেড়া, বাঘ বলো বাঘ, শেয়াল বলো শেয়াল, তুলসী চক্কোত্তি ঠিক আছে—শুধু মেক-আপ বদলানোর সময়টুকু দিয়ো। "মনোহর" দেখেছিল অনেক, উপদেশও দিতো, কিন্তু নিজের পয়ে কিছুই উঠল না। তুলসী চক্কোত্তির "মনোহর" হয়ে দেখতে তাই বাসনা রইলো!

মেজদা (শ্যাম লাহা)

বয়সের অধিক গাম্ভীর্য্য সঞ্চয় করিয়াছেন। শাসন-দমনাদির ব্যাপারে আপনার রাজ্যের সর্বেসর্বা। ছোটদের কঠোর ডিসিপ্লিনের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার আপনা হইতেই নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন। সুবিধা পাইলেই জিওগ্রাফীর পড়া ধরা ও সঙ্গে সঙ্গে সন্নিকটবর্ত্তী ঝাউ-গাছের ছড়ির ব্যবস্থা হুকুমমতো বরাদ্দ।

নিজে বারকয়েক এণ্ট্রান্স ফেল করিয়া অধিকতর মনঃসন্নিবেশ করিয়াছেন পাশের পড়ায়। গ্রীষ্মের দিনে কয়েক মাইল [illegible] হাঁটিয়া তাসের [illegible] আসিয়া আম্রা এবং শীতকালে নিজের হাত-পা লেপের মধ্যে ঢুকাইয়া বইয়ের পাতা উল্টাইবার জন্য সেবকরা সব সময়েই প্রস্তুত। "থুথু ফেলা", "নাকঝাড়া", "বাইরে যাওয়া" ইত্যাদির টিকিট লিখিয়া, কাগজ-আঁটা-কাঁচি-খাতা প্রভৃতি সামলাইয়া বেশ নিজের রাজ্যটি বাগাইয়া বসিয়া আছেন। সপ্তাহান্তে টাইম-মাপিয়া, ফাঁকি দেওয়ার জন্য শাস্তির বিধিগুলি নিজের পেনাল কোড অনুসারে নিজেই সারেন।

অথচ ছিনাথ বহুরূপীর সাজে ইনিই একদিন সেজ উল্টাইয়া গোঁ গোঁ করিয়া মূর্চ্ছা গেলেন; আবার পিসিমার হাতে একদিন সোজাসুজি ধরা পড়িয়া শ্রীকান্তকে কেন, আর সবাইকেও, শাসন করিবার মিথ্যা বিড়ম্বনাটুকু হারাইয়া ফেলিলেন।

একটি গ্রাফিক ষ্টাডি। এ-চরিত্র অভিনয় করায় আনন্দ আছে। যথাযথরূপ দিতে পারিলে, দর্শকে হয়তো সারা জীবনেও ভোলে না।

সত্য কথা বলিতে কি জানেন, আমি একটু discipline-এর ভক্ত। উল্লুক হইতে বাঘ পর্যন্ত হেন জন্তু-জানোয়ার নাই যা বাড়ীতে পোষ মানাই নাই, discipline ভঙ্গ করিলেই একেবারে zoo-garden-এর কর্তাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। বহুদিন আগে একটা বাঘের বাচ্চা এক থাব্‌লা মাংস হাতের উপর হইতে খাইয়া লইয়াছিল। অনুগতজাতীয়দের এ অন্যায় কি করিয়া বরদাস্ত করি বলুন, এঁয়া! আসল কথা কি জানেন, situational fun-এর চেয়ে characteristic paradox-এই আমি বেশী প্রাণবন্ত হই বলিয়া "মেজদা"কে আমার এতো ভাল লাগিয়াছে।

রতন (হরিমোহন বসু)

আদর্শ ভৃত্য। এরা পয়সার বিনিময়ে বশ্যতা বিনিয়োগ করতে আসে না, আসে প্রভুর সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে, প্রভুর মঙ্গল চিন্তাতেই জীবনটা শেষ করে দিতে।

জাতিতে নাপিত। কাজেই অতি চতুর। বোকার ভাণ করলেও এক লহমায় সব কিছু বুঝে নিয়ে কর্তব্যকর্ম

করার বুদ্ধি ও সৎসাহস রাখে। আসলে রাজলক্ষ্মীর চাকর, কিন্তু বশ হয়ে গেল শ্রীকান্তের।

কখন তামাক দিতে হবে, কখন চা দিতে হবে, কোন্ ঘরে বিছানার বন্দোবস্ত করতে হবে—কখন খেতে যাবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, এসব এদের জন্মগত জ্ঞান। এই জ্ঞান দিয়ে দু'টি মিলনোন্মুখ সত্তার মাঝখানে এরা সুন্দর সেতু রচনা করে দেয়, জীবনের ফাঁক-অংশটুকু ভরাট করে দিতে সাহায্য করে। গল্প এবং নাটককেও একটা মসৃণ-মোলায়েম গতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে প্রভূত সাহায্য তো করেই।

কালিদাস থেকে আরম্ভ করে অধুনাতম লেখকরা নায়ক ও নায়িকার সাযুজ্য সংরক্ষণে এইসব দ্যুতিদের ব্যবহার সঠিক জানেন; শরৎচন্দ্রও যে কিছু কম বুঝতেন না, রতনের চরিত্র থেকেই তার আর-একটা, বহু উদাহরণের মধ্যে অন্যতম হিসেবে, দেখতে পাই।

বহুদিন আগে একটা করবার মতো চরিত্র পেয়েছিলুম "ভুলি নাই" ছবিতে। আপনারা একটু বোধহয় প্রশংসাও করেছিলেন। বুঝলেন, একবার সড়ক ধরিয়ে দিতে পারলে, কোন অভিনেতার পক্ষেই আর হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয় না। এমন পাকা সড়কের পার্টই মনে হচ্ছে "রতন"। ঐ সড়কের পাশে-পাশেই অভিনয়-জীবন সুরু করি; আমার স্থির বিশ্বাস, চতুর নাপতে রতনের সেবাপরায়ণ বিশ্বস্ততার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে, সড়কের ওপর দিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যেতেও খুব বিলম্ব হবে না।

কবি চন্দ্রাবতী

[আজ থেকে আড়াই শো বছর আগে। মুসলমান আমলের শেষভাগ। সারা ভারতে তখন চলেছে এক বিরাট রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা। সে ঝঞ্ঝা ও বিক্ষুব্ধ আলোড়নের কিছুটা এসে লাগে বাংলার শ্যামাঞ্চলে, কিছু বা লাগেনা। সুদূর পল্লীর নির্জ্জনতায় বাংলার সমাজ-জীবন তখন মানুষকে কেন্দ্র ক'রে প্রবহমান। তাই সেখানে বড় একটা ধাক্কা লাগেনি রাষ্ট্রিক কাঠামোর বহির্ভাঙ্গনের। কিন্তু তবু তার অবশ্যম্ভাবী ফলের হাত থেকে বাংলাও রেহাই পায়নি। তাই দেখা যায় সে সময় বাংলার রাজনৈতিক চেতনা বিকাশলাভ করেছিল জনগণের মধ্য দিয়ে, রাষ্ট্রিক কাঠামোর ভিত্তি টলিয়ে—বহিরঙ্গনের আভরণ ছুঁয়ে নয়। বাংলার সেই গণ-অভ্যুদয়ের মূলে আজ তাই পল্লীর দান অনস্বীকার্য্য; পল্লীর শিল্প, কাব্য, সঙ্গীত—আজও তাই বাংলার স্বকীয় মৌলিকতা রক্ষা ক'রে সারা ভারতের জন-জাগরণের প্রকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হ'য়ে আসছে।

এ কাহিনী তারই একটি সাক্ষ্য। এই কাব্যসঙ্গীতময়, প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরা বাংলার কবি চন্দ্রাবতীর কাব্যসাধনা ও ঘটনাপ্রধান জীবনালেখ্যকে চিত্রায়িত করছেন উদয়ন পিক্‌চার্স। আশা করা যায় এই চিত্রের প্রযোজক এবং নবীন উৎসাহী কর্ম্মীদের নিষ্ঠা ও কর্ম্মকুশলতাগুণে এই জীবনালেখ্যর চিত্ররূপ মহিমা ও মাধুর্য্যে যোগ্য রূপায়ণ হ'য়ে উঠবে এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যময় কবি জীবনের, তাঁর কবিমানস ও সৃষ্টিপ্রেরণার।

—'চিত্রবাণী'-সম্পাদক]

ছায়াছবির গল্প

ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটওয়ারী গ্রাম। ফুলেশ্বরী নদীর ধারে এই গ্রামখানি দেখলে সত্যিই মনে হয় যেন কোন এক নিপুণ শিল্পীর পটে আঁকা ছবি। আর সেই পটের মতই পাটওয়ারীর জীবনযাত্রার পটভূমি! সে আরও বিচিত্র—বিচিত্র তার জামদানী জাজিমের খোল: রূপে রসে, বর্ণে গন্ধে, ফুলে ফলে, ধনে ধান্যে, কাব্যে ছড়ায় হাজারো নক্সা আঁকা। গোটা বাংলা দেশ যেন পূর্ব্ববঙ্গের ছায়া-ঘেরা ছোট্ট এই পল্লীটির মাঝে খুঁজে পেয়েছিল তার প্রাণ, শুনেছিল তার মরমের গান—সে গান আজও বেঁচে আছে—বেঁচে আছে নব পরিণীতার বাসরে, ঘেঁটু-মনসার ব্রত উদ্‌যাপনে—বিলে-নদীতে, মাঠে-হাটে। আর তার রচয়িতা? সোনার আখরে আজও তাঁর নাম সমুজ্জল লোক-সাহিত্যের ইতিহাসে। বাংলার কবি—অবিস্মরণীয় বংশীদাস।

ছোট্ট ছিমছাম ভিটেখানি। ঝকমকে তকতকে নিকোনো উঠোন। ছড়িয়ে-পড়া সিঁদুর খুঁটে তুলতে কষ্ট হয় না একটুও। বেড়ার ধার ঘেঁসে যেখানে রাংচিতের লতা ঘন হয়ে এসেছে খুব, ঠিক তার পাশেই তুলসীমঞ্চ। ওপর থেকে ঝোলানো ফুটো ঘটে জলের ঝারি। সে জল বাঞ্ছিত। আর অবাঞ্ছিত জল রুখতে খড়ই তো যথেষ্ট। শাল সনে ছাওয়া দো-চালা দু'খানি ঘর। মাটির দেওয়াল—চিত্রিত গ্রাম্য পটুয়ার আঁকা দু'চারটি পটে: কোথাও বর চলেছে পাল্‌কী চেপে, কোথাও বা মনসার মূর্ত্তি আঁকা। তাতে আছে প্রাণ, আছে প্রভা।

ভিটেখানার দিকে একনজর চাইলেই ছবির মতন চোখে পড়ে মালিকের মন ও জীবন। বংশীদাসের মনটা যেন উপ্‌ছে পড়েছে ভিটেমাটির খুঁটি-নাটিতে। সরল অনাড়ম্বর জীবন!

ঋজু ও ছিপছিপে গড়নের এই বংশীদাস। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। বলিষ্ঠ লোমশ বুকের খাঁজে তার গাবের আঠায় মাজা ধবধবে পৈতে। তরতরে নাকে ও চওড়া কপালে সুনিপুণ রসকলির ছাপ। ভক্তির বিজ্ঞাপন নয়, ভক্তের অন্তরের আকুতি ঠাঁই পেয়েছে ঐভাবে।

জাতে ব্রাহ্মণ হলেও বংশীদাস কিন্তু পুরোহিত নয়। বিদেশী দেবতার পূজো ছেড়ে দেশী মানুষকেই সে বরণ করেছে। ভাসান গান গেয়ে রুজি-রোজগারেই চলে তার সংসার। কবি গানের ছড়া লিখে ভাসানের গান বেঁধে রামায়ণের কাব্য রচনা করেই তার দিন কাটে। শুধু সৃষ্টিতেই শেষ নয়, সুরের কাঠামোয় কণ্ঠের মাধুর্য্যে তাকে রূপ দিতে না পারলে বংশীদাসের মন খুঁতখুঁতিয়ে ওঠে। তাইতো সে নিজেই নিজের গানের গায়ক। তার মতন

জয়ানন্দের ভূমিকা রূপায়িত করছেন অসিতবরণ আর কবি চন্দ্রাবতীরূপে রয়েছেন অনুভা গুপ্তা

মরমী কবিয়াল, সুরেলা ভাসানিয়া নাকি ও তল্লাটে আর নেই। তার জুড়ি মেলাই ভার। তাইতো বংশীদাসের এত নাম-ডাক। নবাব জমিদারের দরবার থেকে সুরু করে বাউল পটুয়াদের আখড়া অবধি বংশীর আমন্ত্রণ, আসেনা এমন কোন গেরস্ত নেই সারা ময়মনসিংহে। এই তো সেদিন ধনেখালির মালীরা এসেছিল বংশীকে ডাকতে। বিয়ের উৎসবে তাকে ভাসানের আসর দিতে হবে। বংশী প্রথমটা একটু নিমরাজি হয়, স্থানটার দূরত্ব মনে মনে হিসেব ক'রে। কিন্তু অন্নদা মালী একেবারে নাছোড়বান্দা। গলায় কাপড় দিয়ে বারেবারে মিনতি করে। অগত্যা বংশী তার অছিলার মোড় ঘুরিয়ে বলে 'কি করি বল্? দু'দিনের পথ। আমার চন্দ্রা-মা'কে একলা ফেলে কি ক'রে যাই বল্?'

কথাটা চন্দ্রার কানে যায়। অসহায় অপরাজিতার লতাটাকে আর রাংচিতের বেড়ার ওপর তোলা হয় না। ছুটে আসে তক্ষুনি। অন্নদা-দের আঙুল নেড়ে বলে—'বাবার কথা তোমরা একটুও বিশ্বাস কোরো না। আমি তো একলাই থাকি, ভয় কিসের! দিনের বেলা জয়ানন্দের সঙ্গে ছড়া কেটে আর খেলে সময় থাকলে তো ভয় দেখবো! আর রাতের কথা? তখন তো খুড়িমাই আছেন, ভয় আর তা'হলে দেখবো কখন?'

বংশীদাসের আর ওজর চলে না। চন্দ্রা ছুটে গিয়ে ঘর থেকে নামাবলী আর কাপড়ের ঝোলা এনে দেয়। হাসতে হাসতে কাঁধের ওপর নামাবলী ফেলে বংশী বেরিয়ে পড়ে দলবল নিয়ে। চন্দ্রা চেয়ে থাকে সেইদিকে যতক্ষণ দেখা যায়। তারপর এসে মাটি থেকে অপরাজিতাটাকে তুলে দেয় বেড়ার ওপরে।

এমনি করেই দিন কাটে কিশোরী চন্দ্রাবতীর। পাটওয়ারীর শ্যামলিমায় বংশীর স্নেহধারায় সে যেন খুঁজে পায় তার মনের সহজ সুরটিকে। তন্বী দেহের সুশ্রী গঠনের মাঝে বাপের আদরেই গড়ে ওঠে তার মন। তাই সে ভালোবাসে ভাগ্নাকে, ভক্তি করে রামায়ণীকে, শ্রদ্ধা করে কবিয়ালদের।

খুব ছোটবেলায় চন্দ্রা মাকে হারায়। [illegible]য়ের স্মৃতি তার মনের কোণে হারিয়েও হারায়নি আজো। সেই আবছা স্মৃতিকে ঘনিষ্ঠ ক'রে রাখার জন্যেই বুঝিবা সে অত অন্তরঙ্গভাবে ভালোবেসেছে কবিতাকে। তার ওপর শিশু-কাল থেকেই বংশীর সান্নিধ্যে থেকে চন্দ্রার মনে কবিতার প্রভাব প্রবল হ'য়ে ওঠে। এর জন্যে ওকে কষ্ট করতে হয়না একটুও। এ যেন ওর সহজাত। মাঝে মাঝে চন্দ্রা পরখ করে তার কিশোর কবিমনের সৃজনী-প্রতিভাকে। কাজের ফাঁকে কখন একসময় তাকের ওপর থেকে পেড়ে নেয় বংশীর তুলোট কাগজের নতুন কবিগানের খাতাখানা, হয়তো ভাসানের, নয়তো বা রামায়ণের। সবেতেই চন্দ্রার অদ্ভুত দখল। টুপ ক'রে বংশীর অসমাপ্ত পদ পূরণ ক'রে রাখে। বংশীও অবাক্। কাঁচা হাতের লেখা দেখে ধ'রে ফেলে। আনন্দে অধীর হ'য়ে ওঠে। বলে, 'তুই মা বড় হলে কবি হবি!'

চন্দ্রাবতীর সে কবিখ্যাতি এখনও পাটওয়ারীতে ছড়িয়ে না পড়লেও এরই মধ্যে জয়ানন্দের মনের মণিকোঠায় পৌঁছে গেছে। তাই সে যখন বংশীকে রওনা ক'রে ওদের বাড়ীতে এসে হাজির হয় তখন জয়ানন্দ যেন একটু বিদ্রূপের সুরেই বলে,

'কবি চন্দ্রা আইলো ক্যান এ বিথানে।'

চন্দ্রা অমনি গম্ভীর হ'য়ে গ্রাম্য সুরে জুড়ে দেয়,

'জয়ের আশায় মন উজানে গো টানে'।

এর পর আর চলে না কবির লড়াই। হাসির তোড়ে খুলে যায় চন্দ্রার কপট গাম্ভীর্য্যের মুখোশ। জয়ানন্দও যোগ দেয় তাতে সহজ মনের টানে।

জয়ানন্দ চন্দ্রার প্রতিবেশী, সহপাঠী, খেলার সাথী। পদ্ম-দীঘির নির্জন আবহাওয়ায় বসে ছড়া কাটে, পদ্য লেখে। সন্ধ্যার অন্ধকারে বংশীকে ঘিরে উঠোনে ব'সে ব'সে গল্প শোনে: নানান গল্প। কবে, কোথায়, কোন্ আসরে বংশী জয়ী হ'য়েছিল, কে কে গেয়েছিল, কে কি বলেছিল এমনি ধারা অজস্র গল্প।

জয়ানন্দের ভারী ভালো লাগে এই বংশীকে। আর চন্দ্রাকে? সে তো খুব ছোটবেলা থেকেই মনে করেছে নিজের ব'লে। তাছাড়া তার কাছেই তো জয়ের পদ্য

লেখার হাতে খড়ি। পদ্মদীঘির পাড়ে যেদিন সে প্রথম একটা ছড়া লিখেছিল সে-কথা আজও তার মনে পড়ে। আর আজো অলক্ষ্যে একবার কেমন যেন তার মুখখানা রাঙা হ'য়ে ওঠে,—যত না লজ্জায়, তত ভাল লাগার আতিশয্যে। ছড়া শুনে চন্দ্রা বলেছিল ঠাট্টা ক'রে,—'ছিঃ, জয়, তোমার ছন্দ-জ্ঞান নেই একটুও! চন্দ্রাবতীর সঙ্গে কি কখনও ভোলা মহেশ্বর মেলে?'

'তবে কিসের সঙ্গে মেলে?' একটুও না ভেবে বোকার মতো প্রশ্ন করেছিল জয়। তার জবাব আজও তার স্পষ্ট মনে পড়ে। মনে পড়ে সেদিন সে দেখেছিল চন্দ্রার মনের মুকুরে তার মুখের ছাপ, কত স্বচ্ছ, কত অনাবিল। পদ্মর পাপড়ি ছিঁড়ে মধু খেতে খেতে বলেছিল চন্দ্রা,—'চন্দ্রাবতীর মিল শুধু একটা কথায়—জয়াবতী।'

চন্দ্রাবতী যে একদিন জয়াবতী হবে একথা এঁচে রেখেছিল গ্রামের সবাই। ছোটবেলা থেকেই ওদের জানা-শোনা, চেনা-পরিচয়। দু'জনে দু'জনকে ছেড়ে থাকতে পারে না একটুও। চন্দ্রার সংসারের কাজ আছে তবুও তার ফাঁকে জয়ানন্দের সঙ্গে তার দেখা করা চাই-ই। জয়ানন্দও চন্দ্রাকে নানাভাবে সাহায্য করে, সজনে ডাঁটা পেড়ে দেয়, কলসী তুলে আনে আরও কত কি! সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি জয়ানন্দ আর চন্দ্রাবতী দু'জনে গোটা পাটওয়াড়ী গ্রামখানাকে চষে বেড়ায়। বংশীদাসের নজর এড়ায় না কিছুই। তার ভারী ভালো লাগে দু'জনের এই মেলামেশাকে। ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে ওঠে থেকে থেকে।

এমনিভাবে গড়িয়ে যায় বছর, বছরের পর বছর।

চন্দ্রা এখন বড় হয়েছে। কৈশোরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। দেহে এসেছে এক অপূর্ব্ব লাবণ্যের জোয়ার। দু'কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেছে তার উদ্দামতা। কিন্তু দেহের এই উদ্দামতার সঙ্গে মনের মিল নেই একটুও। কিশোর বয়সের লীলাচপল মনটা যেন হঠাৎ এখন থমকে দাঁড়িয়েছে, ঝর্ণার শীর্ণ জলধারা যেমন পাহাড়ের খাঁজে আটকে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়। চন্দ্রার মনও ঠিক তেমনি। অগভীর চাঞ্চল্যের মাঝে নেমে এসেছে গভীরতা ও গাম্ভীর্য্য। সে এখন দায়িত্বশীলা। সংসারের ভার তার ওপর। তাছাড়া বংশীর বয়স হয়েছে, তাকেও দেখাশোনা করতে হয়। ওদিকে কবিখ্যাতিও তার ছড়িয়ে পড়েছে।

বংশীকে এখনও বেরোতে হয় গানের আসরে। দু' পয়সা না হলে সংসার চ'লে কিসে! চন্দ্রা আজকাল তার কবি। ভাসান থেকে সুরু ক'রে কবিগানের ছড়া সবই সে

কবি বংশীদাসরূপে পর্দার বুকে ভাস্বর করে তুলেছেন পাহাড়ী সান্যাল

লিখে দেয়। তা' শুনিয়ে আসরে বংশী বাহবা পায় খুব। সবাই তারিফ্ ক'রে বলে,—'বয়সের সঙ্গে তোমার কলম যেন দিন দিন খুলছে। খাসা গান বেঁধেছো! আহা কলম তোমার যাদু জানে!'

গর্ব্বে বংশীর বুকখানা ফুলে ওঠে। বলে, 'এমন কলম কি আর আমার হয়! এ আমার চন্দ্রামায়ের বাঁধা গান!'

বিমুগ্ধ শ্রোতারা অবাক হ'য়ে যায় কথাটা শুনে। এই-ভাবে এক কান দু' কান ক'রে গ্রামের পর গ্রাম ছড়িয়ে পড়ে চন্দ্রাবতীর কবিখ্যাতি। সারা পূর্ব্ববঙ্গে রাষ্ট্র হ'য়ে যায় তার রামায়ণ রচনার প্রশংসা।

এদিকে জয়ানন্দও কবিয়াল হয়ে উঠেছে। আজকাল মাঝে মাঝে আসরে বেরোয়। সংসারের খরচ চালায়। কিন্তু চন্দ্রার ওপর তার টান একটুও কমে না। দিনান্তে একবার না একবার আসে। দেখা হয়। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহের মাঝে দিন যায়।

আজকাল কিন্তু গ্রামের মধ্যে চন্দ্রাদের এই মেলামেশা নিয়ে মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়। অলস পরচর্চ্চা যাদের উপ-জীবিকা তারা এতে বেশ একটু আমোদ পায়। চোখ-মুখের অর্থপূর্ণ ভঙ্গী ক'রে মন্তব্য করতেও ছাড়ে না,—'কাজটা ভালো হচ্ছে না বংশী, দিনকাল খারাপ, একটু সমঝে চলো।'

বংশীদাস আত্মভোলা মানুষ। মেয়ের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। জয়ানন্দকে সে জানে আর এ-ও জানে ওদের দু'জনের মন মিলেছে কবিতাকে কেন্দ্র ক'রে। ওদের আর প্রয়োজন নেই লোক-দেখানো মন্ত্র পড়ে মিলনের অভিনয় করার। তাই বলে প্রতিবাদ ক'রে,—'ছিঃ, তোমাদের মতো নীচু মন নিয়ে কবি চন্দ্রাবতীকে বিচার করা শোভা পায় না।'

গ্রামের লোকের কথায় চন্দ্রা কান দেয় না। এতে তাদের মেলামেশার স্বাচ্ছন্দ কোথাও আড়ষ্ট হয় না। সেদিন সন্ধ্যায় চন্দ্রা দাঁড়িয়েছিল দোর-গোড়ায়। হিজল গাছটার গা ঘেঁসে। মনটা তার আজ একটু খারাপ। বংশী ক'দিন হলো গেছে দূরের একটা গ্রামে গানের আসরে। বাপের জন্যে চিন্তা আর উদ্বে[illegible] তাকে-ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছে। তার ওপর নতুন একটা ভাসান গানের কাব্য রচনায় ব্যস্ত। তাই চন্দ্রা একটুও টের পায় না কখন তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে জয়ানন্দ। হঠাৎ জয়ানন্দকে দেখে কেমন যেন একটু চমকে ওঠে। পরক্ষণেই বুকটা ভ'রে ওঠে অজানা আনন্দের আতিশয্যে। ছুটে যায় ঘরে। মালতী ফুলের একটা মালা এনে পরিয়ে দেয় জয়ানন্দকে। জয়ানন্দ অবাক বিস্ময়ে অপলকে চেয়ে থাকে চন্দ্রার দিকে। চন্দ্রা বলে,—'মনে আছে জয়? একদিন ছড়া কেটে বলেছিলাম—জয়ের আশায় মন উজানে গো টানে। সত্যিই আজ আমার জয় হয়েছে, আজ আমার ভাসান গান বাবা গাইবেন হিঙ্গুল বাড়ীর আসরে। আজ আমি জয়ী, সত্যিকারের জয়াবতী।'

সত্যিই চন্দ্রাবতীর রচিত রামায়ণ গানের জয় হয়েছে। হিঙ্গুল বাড়ীর আসরে শ্রোতারা অজস্র বাহবা দিয়ে চন্দ্রাবতীর জয়গান করেছে। বৃদ্ধ বংশীদাসের বর্ণনায় আর কেনারামের কণ্ঠে অপূর্ব্ব সে রামায়ণের ব্যঞ্জনা। সেদিনের আসরের মূল গায়েন ছিল কেনারাম।

কেনারামকে বংশীদাস পায় পথে। সে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনী। হিঙ্গুলবাড়ী যাওয়ার সময় বংশী যখন তার দলবল নিয়ে 'জালিয়া হাউর' নামে মস্ত একটা বন পেরোচ্ছিল তখন সদলে তাদের ওপর কেনারাম চড়াও হয়। কেনারাম পূর্ব্ববঙ্গের নামকরা দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত। তাকে দেখে বংশীদের মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে যায়।

হাতের খাঁড়া নাচিয়ে বংশীর কাছে এসে কেনারাম হাঁকে,—'যা আছে দাও, নইলে প্রাণ যাবে।'

'আমরা গরীব ব্রাহ্মণ, আমাদের কিছুই নেই। সংসার চলে গান গেয়ে।'

'তবে তৈরী হও মৃত্যুর জন্যে।'

বংশী তখন শেষ মিনতি করে—'একবার মায়ের নাম ক'রবো, এই ভিক্ষে দাও।'

বংশীর সে-ভিক্ষা মঞ্জুর হয়। জীবনে শেষবারের মতো বংশীদাস তার দল নিয়ে সেই গহন বনেই সুরু করে ভাসানের করুণ গান। চন্দ্রাবতীর রচিত লখিন্দর-বেহুলার সেই মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী ও বংশীর সুললিত কণ্ঠ কেনারামকে

সম্মোহিত করে। পাষাণে ফাটল ধরে। কেনারামের হাত থেকে খাঁড়া হয় ধূলিসাৎ। সে যোগ দেয় বংশীর দলে। হিঙ্গুলবাড়ীর আসরে মূল গায়েন হ'য়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।

ফিরে এসে এ-কাহিনী বংশী সবিস্তারে বর্ণনা করে চন্দ্রার কাছে। চন্দ্রা বিস্মিত হয়। ভাবে,—'কেনারামের এ-পরিণতির মূলে তার রচনাই দায়ী। বাবারও অনেক কৃতিত্ব আছে।' ঠিক করে নতুন ভাসান রচনার মধ্যে এ-কাহিনীও সে জুড়ে দেবে

এর পর কয়েকমাস কেটে গেছে।

বংশীদাস নিত্য সকালে আপন উপাস্য দেবতা শিবের ধ্যান করেন। চন্দ্রাবতী পাশে বসে বিভোর হয়ে শোনে পিতার গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠের সেই দেবমহিম গান। কিন্তু সে ধ্যানে আজ বিঘ্ন ঘটেছে। দীন দরিদ্র বংশীদাস ভাবেন কি করে তাঁর লক্ষ্মীস্বরূপিনী মাকে তার উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করবেন? ঘটক নানা দেশ থেকে নানা পাত্রের খবর নিয়ে আসছে—কোনটাই বংশীদাসের মনঃপুত হয় না। লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না—লাখ কথার শেষে বিয়ে স্থির হল সেই জয়ানন্দের সঙ্গেই। উৎফুল্ল মনে বংশীদাস চলেছেন ঘরের দিকে চন্দ্রামাকে এ শুভ-সংবাদ দিতে। কিন্তু বিধি বাম!

চিরদিনের আবেগপ্রবণ জয়ানন্দ। চন্দ্রার হাতের দেওয়া মালা তার সমগ্র সত্ত্বাকে টেনে নিয়ে গেছে চন্দ্রার দিকে। চন্দ্রাকে তার চাই-ই। নির্জ্জন মালতী বনে চন্দ্রা তখন ফুল তুলছে বাবার পূজার জন্য—কাছে এলো জয়ানন্দ—ভীরু কম্পিত হাতে তুলে দিল একখানি চিঠি—সে চিঠি তার বুকের রক্তে লেখা। "চন্দ্রা! আমায় তুমি গ্রহণ করবে?"—চন্দ্রা কি জানাবে সে কথা! সে যে কুমারী—সে যে সংযমী—ঘরে তার পিতা রয়েছেন—স্বাধীন মত তো চন্দ্রার কিছু থাকতে পারে না। চন্দ্রার দ্বিধা জড়তা জয়ানন্দের কাছে রূপ নিল সংশয়, অবিশ্বাস আর ছলনার রূপ নিয়ে। এই তবে চন্দ্রাবতী! এই তার প্রেমের মূল্য! তাই যদি হয় তবে দূরে যাক্ এ পরিচিত বিশ্ব—জয়ানন্দ বরণ করে নেবে নিরুদ্দেশকে ফুলেশ্বরীর তরঙ্গ ভঙ্গের ওপর দিয়ে কালো আকাশের বুকে মিশে গেল জয়ানন্দের চিরদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী—তার ছোট নৌকাখানি। কেউ জানলোনা সে কথা—যারা জানলো তারাও প্রকাশ করলোনা সে কথা।

এদিকে আঘাত আর ওদিকে আনন্দ: প্রথম ধাক্কার আঘাত সামলে বংশী এসে দাঁড়ায় মেয়ের পাশে

হাওর ভরা দেশ এই পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ। উন্মুক্ত আকাশের নীচে দিকসীমাহীন জলের প্রসার—ধূ ধূ করা জল—অথৈ অসীম জল—আকাশে একবিন্দু কালো মেঘ দেখা দিল—অমনি জেগে উঠল জলের বুকে শিবের তাণ্ডব নৃত্য—সে নৃত্যে সইল না জয়ানন্দের এ ক্ষুদ্র ডিঙি নৌকা—তলিয়ে গেল জয়ানন্দ কোন্ সাত সাগরের তলায় পাতালপুরীর দেশে।

জেগে উঠে দেখে একি অবাক কাণ্ড! এ কোথায় আমি! এ কে সুন্দরী আমায় সেবা করছে! এ সুন্দরী জুবেদা—শ্রদ্ধেয় রহমৎ ফকীর সাহেবের কন্যা। ফকীর সাহেব এ অঞ্চলের মালিক—অতুল তাঁর ঐশ্বর্য্য—কিন্তু ঐশ্বর্য্যের আড়ালে চাপা পড়েনি তাঁর ভাবুক উদাসীন মনটি—সেই ঝড়ের রাতে তিনি ফিরছিলেন মহাল থেকে —পথে এক নির্জ্জন চড়ার ধারে কুড়িয়ে পেলেন জয়ানন্দের অচৈতন্য দেহ। জয়ানন্দ পেল স্নেহের আশ্রয়—জুবেদা পেল তার নিঃসঙ্গ জীবনে একজন সাথী! জুবেদা ভাবে কে এই প্রিয়দর্শন তরুণ—তাঁর সর্ব্বদেহে মনে এ কিসের ব্যাকুলতা—তাঁর চোখে এ কি শরাহত দৃষ্টি! কে তাকে আঘাত দিয়েছে—কেন দিয়েছে? আমি কি পারবো না তাঁর সেই দুঃখ ভুলিয়ে দিতে—আমি কি পারবো না ভালবাসার প্রলেপে তার সেই ক্ষত আরাম করতে।

—আর জয়ানন্দ ভাবে—এ কে এল আমায় নতুন আশার আলোকে জাগিয়ে তুলতে! কে এই সর্ব্বস্নেহময়ী, সর্ব্বপ্রীতিময়ী মূর্ত্তিমতী দেবী!

শ্রদ্ধা পরিণত হয় প্রীতিতে, প্রীতি পরিণত হয় প্রেমে। জয়ানন্দের মনের কোণে মেয়েটি বুঝি স্থান পায়।

গ্রাম দেশে খবর রাষ্ট্র হ'তে সময় লাগেনা। দশখানা গ্রাম ডিঙিয়ে খবরটা একদিন হঠাৎ এসে হাজির হয় পাটওয়াড়ীতে,—'জয়ানন্দ বিয়ে করেছে জুবেদাকে। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে সে।'

বৃদ্ধ বংশীদাস শয্যা নেয়। চন্দ্রার বুকে শেল বেঁধে। তবুও সে সহ্য করে সব। সহ্য করে পাথুরে বুকে নয়, মরমী কবির কোমল বুকে। সান্ত্বনা খোঁজে কাব্য রচনায়। এমন রামায়ণ সে রচনা করবে যা ছাড়িয়ে যাবে কৃত্তিবাসকে। ছাড়িয়ে যাবে অপূর্ব্ব কারুণ্যে, ব্যঞ্জনায় আর মর্ম্মস্পর্শনে। তাই চন্দ্রা যায় পদ্মদিঘির পাড়ে, সন্ধ্যার ধূসর নির্জ্জনতায়। চোখের জল ফেলে আর মনে মনে ছন্দ গাঁথে রামায়ণ রচনার,—সীতার করুণ বনবাস।

বংশী 'পের মন স্থির হয় না। প্রথম ধাক্কার আঘাত আসরে। ংশী [illegible] দাঁড়ায় মেয়ের পাশের মুখ তুলে চাইতে পারে না। আকাশে চোখ রেখে প্রশ্ন করে—'তোর কি হবে মা?' চন্দ্রা জবাব দেয়। চেষ্টা করে সুরটা স্বাভাবিক করবার—চেষ্টা ক'রে বলে—'হিন্দুর মেয়ের দু'বার বিয়ে হয় না বাবা! আমি যে জয়ানন্দকেই মন দিয়েছি।' তবুও শেষের দিকে গলাটা তার কেমন যেন বুজে আসে।

বংশী তবুও স্থির থাকতে পারে না। চন্দ্রা যদি তার কাছে কাঁদতো বুকফাটা কান্না তাহলে হয়তো সে আশ্বস্ত হতো। কিন্তু তা তো হবার নয়। বংশী তাই আরও অধীর হয়ে ওঠে। নিজের যা কিছু ছিল সব দিয়ে ছোট একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেয় চন্দ্রার জন্যে। ভাবে হয়তো পূজা-অর্চ্চনায় ভুলে চন্দ্রামা তার এত বড় আঘাতটা সইতে পারবে।......

এদিকে আঘাত আর ওদিকে আনন্দ।

বহু সমারোহে জয়ানন্দের বিয়ে হয়ে যায় জুবেদার সঙ্গে মুসলমান মতে। জাঁকজমকের রোশনাই,—আলোয়, আতরে, ফুলে ফুলে আবিল হয়ে ওঠে। জুবেদা সার্থক হয় তার স্বপ্নের সফলতায়। জয় করে জয়ানন্দকে।

উৎসব একদিন শেষ হয়। থেমে আসে কলকাকলী। সন্ধ্যা ঘনায়মান। নিস্তব্ধতার আবরণে জুবেদার দেখা হয় জয়ানন্দের সঙ্গে। উঠোনের একটা ঝাঁকরা হিজল গাছের তলে। জুবেদা জয়ানন্দের হাত ধ'রে বলে,—'আজ আমি জয়ী, তোমাকে জয় করেছি।' জয়ানন্দ চমকে ওঠে কথাটা শুনে, স্বপ্নভাঙ্গা মানুষের চমকে ওঠার মতো। মনে হয় কথাটা যেন আসছে অনেকদূর থেকে, অনেক অনেক দিন পেরিয়ে। মনে পড়ে চন্দ্রার মুখ। রাং চিতের বেড়ার ধারের সেই হিজল গাছ। কলমী ফুলের মালা। জয়ানন্দ আর দাঁড়াতে পারে না। তীব্র অনুশোচনার কশাঘাতে বুকটা ফুলে ওঠে।

সেই রাতেই চন্দ্রাকে চিঠি লেখে। লেখে,—'আমায় ভুল বুঝোনা চন্দ্রা। প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দাও। এক-বার অনুমতি দাও দেখা করবার।' সে চিঠির কোন জবাব আসে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে। নির্জ্জন দেউলে নেই

বাংলার প্রথম মহিলা-কবি 'কবি চন্দ্রাবতী'র কাব্যসঙ্গীতময় জীবননাট্যের চিত্ররূপে নাম ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা

চিত্রভারতীর প্রথম নিবেদন 'ভোর হ'য়ে এলো'র
নায়িকারূপে শ্রীমতী প্রণতি ঘোষ

সন্ধ্যারতির সুর। মন্দিরের দরজা বন্ধ। চন্দ্রা তন্ময় হ'য়ে ভুলে আছে শিব-পূজোয়। ফুলের সাজির পাশেই তুলোট কাগজের পুঁথি। অসমাপ্ত রামায়ণের শেষ অধ্যায় আজ তাকে শেষ করতেই হবে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে ওঠে। আকাশে সুরু হয় বৈশাখী তাণ্ডব। মেঘের মাদল আর বজ্রের হাঁক। বৃষ্টির ধারা নামে কান্নার সুরে। সে-সুর ছাপিয়ে ওঠে শব্দ,—খট্ খট্ খট্।

মন্দিরের রুদ্ধ দরজায় আঘাত করে জয়ানন্দ—চন্দ্রা! চন্দ্রা! চন্দ্রা! সাড়া নেই। শুধু তার ডাক ফিরে আসে মন্দিরের দেওয়ালে আঘাত ক'রে। আকুল আহ্বান মিশে যায় একটানা বৃষ্টির মুখে। তবুও উন্মুক্ত হয় না দেউলের অর্গল। শেষ মিনতি জানায় জয়ানন্দ—চন্দ্রা! চন্দ্রা! চন্দ্রা! আকাশের বুক ওঠে কেঁপে কেঁপে। ঝড়ো হাওয়া যায় সন্‌সনিয়ে। তবুও মন্দির নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ তার অন্তঃপুরচারিণী। নিষ্ফল হতাশায় অন্তর কেঁপে ওঠে জয়ানন্দের। ক্ষণ বিদ্যুতের আভায় নজরে পড়ে দেউল প্রাঙ্গণে সদ্যফোটা একরাশ রক্ত সন্ধ্যামালতী। সমবেদনায় তারা মূক। উন্মুখে চেয়ে আছে তার মুখে। জয়ানন্দ যেন দেখে তাদের ভেতর তার প্রেমের সার্থকতা, নিষ্কলুষতার নিদর্শন রেখে যাবার প্রকৃষ্ট পন্থা। ছুটে গিয়ে উত্তরীয় ভ'রে তুলে আনে সন্ধ্যামালতী। তাদের অলক্ত রসে মন্দিরগাত্রে লেখে তার মর্ম্মবাণী, শেষ অভিজ্ঞান—'চন্দ্রা আমায় ভুল বুঝো না। আমি তোমারই জয়ানন্দ। তুমি জয়াবতী।'

আর দাঁড়াতে পারে না। কানে আসে ফুলেশ্বরীর শীতল আহ্বান। বর্ষণবিক্ষুব্ধ নদীর আকুল গর্জ্জন শেষবারের মতো দেউলের পাষাণ-ফলকে দৃষ্টির মিনতি রেখে জয়ানন্দ ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুলেশ্বরীর বুকে,—ঝুপ্!

মন্দির কেঁপে ওঠে। কেঁপে ওঠে মন্দিরবাসিনীর বুক—ঝুপ্। তারপর সব নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ। ক্লান্তবর্ষণ প্রকৃতি শান্ত, সমাহিত। শুধু চন্দ্রার বুকের শব্দ আরও স্পষ্ট, আরও দ্রুত। উঠে গিয়ে খুলে দেয় মন্দিরের দ্বার। ধীরে ধীরে পেরিয়ে আসে চৌকাঠ। নজরে পড়ে অলক্তরসে লেখা জয়ানন্দের শেষ মিনতি। বুকের ভেতর থেকে কি যেন একটা ঠেলে ওঠে। স্বপ্নভাঙা শিশুর আকুলতায় ভেঙে পড়ে। ভেঙে পড়ে মন্দির সোপানে—ভূলুণ্ঠিতা চন্দ্রা। আর ওঠে না। সব নীরব। শুধু থেকে থেকে ফুলেশ্বরী কেঁপে ওঠে, গর্জ্জে ওঠে—ঝুপ্—ঝুপ্—

'চিত্রা'র আত্মকাহিনী

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

নরাধম কর্ত্তৃক প্রতিলিখিত

নিস্পন্দ নিথর রাত। উদাসী রাতের নিঃসীম অন্ধকারে বোধ হয় সময় বোবা হ'য়ে গেছে! কত রাত হবে? জোনাক্-জ্বলা আকাশচারী তারারা এখন কোথায় মুখ লুকিয়ে আছে? কিন্তু আমিই বা কোথায়?

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলাম। সত্যিই তো, এই গহন নিঃসঙ্গ রাতে আমি এ কোথায় বসে আছি? আমার চারপাশে হাল্কা পালকের মত কুয়াশা, পরশ আছে—উষ্ণতা নেই, নেই তার অন্তরের শৈত্য, নেই তার কামনা-কুল আলিঙ্গনের মদিরালসতা। বাতাস চলৎশক্তিহীন, নিষ্প্রাণ।

শরীরে রোমাঞ্চ! এ কোথায়? হাত দিয়ে অনুভব করলাম: শক্ত মাটি! পকেটে হাত দিলাম—না, দেশলাই নেই! চোখ জেলে চারিদিকে তাকালাম—একটি প্রশস্ত ঘর ব'লে মনে হ'ল! জ্ঞান, বুদ্ধি সমস্ত যেন এক নিমেষে অবলুপ্ত হ'য়ে গেল। সমস্ত অন্তরাত্মা আর্ত্তনাদ করে উঠতে চাইল—এ কোথায়? এ কোন মৃত্যুপুরীতে একা বাসর জাগিয়ে বসে আছি?

কখন ভোর হবে? কখন দেখা দেবে সূর্য্য-সারথী, কখন এই অন্ধ-নীল কুয়াশার অন্ধকার কেটে আলো ফুটে উঠবে, আর শেষ হবে এই ঘরে একা থাকার দুঃসহ স্বপ্ন!

সামনে আবছা-সাদা কি যেন নড়ে উঠলো! উত্তপ্ত রক্তে নেমে এলো হিমানী-প্রবাহ! বিজ্ঞানী, অনুসন্ধিৎসু মনেও চাঞ্চল্য: সংস্কারাচ্ছন্ন মনের চিরন্তন প্রতিক্রিয়া! ভূত!

'ভয় পেয়েছেন?'

স্পষ্ট শুনতে পেলাম। অগ্রগামী সাদা ছায়ামূর্ত্তির কণ্ঠস্বর সেই নিস্তব্ধ রাতকে আলোড়িত করে তুললো। কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হ'য়ে আসে, মরিয়া হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কে? এ আমি কোথায়?

অন্তরঙ্গ স্বর শোনা সেই ছায়ামূর্ত্তির: আমি 'চিত্রা' চিত্র-গৃহের পর্দ্দা, আদর ক'রে রজত-পটও কেউ কেউ বলেন! আর আপনি 'চিত্রা'র হলে। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, না?

এক নিমেষে সব মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, আজই রাত ন'টার প্রদর্শনীতে 'মহাপ্রস্থানের পথে' দেখতে এসেছিলাম! কত, কতদিন পরে আবার এই চিত্রগৃহে নিউ থিয়েটার্সে'রই এক ছবিতে ফিরে পেয়েছিলাম অতীতকে। নিউ থিয়েটার্সে'র স্বর্ণযুগের ঐতিহ্য। ফিরে পেয়েছিলাম বারংবার নিরাশ হৃদয়ের সুখ-শান্তির প্রলেপ, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের নিউ থিয়েটার্সে'র ছবিকে ঘিরে ফেলে-আসা অতীত-রঙীন স্বপ্ন!

ছবি? নিউ থিয়েটার্স! নিখিল ভারত-বন্দিত চণ্ডীদাস, দেবদাস, ভাগ্যচক্র, মীরাবাঈ, মায়া, গৃহদাহ, মুক্তি, বিদ্যাপতি, সাথী, দেশের মাটি, রজত-জয়ন্তী, অধিকার, ডাক্তার, প্রতিশ্রুতি, কাশীনাথ, উদয়ের পথে, রামের সুমতি......

একটির পর একটি ছায়ামূর্ত্তি স'রে যায়: শিশিরকুমার ভাদুড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, সায়গল, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ মল্লিক, শ্যাম লাহা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, উমাশশী, চন্দ্রাবতী, কানন, লীলা দেশাই, মলিনা, যমুনা, মেনকা, দেববালা, মনোরমা, রাজলক্ষ্মী, নিভাননী, ছায়া দেবী, ভারতী দেবী, প্রভা আরও, আরও অনেকে! মনে পড়ে গেল দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, নীতিন বসু, ফণী মজুমদার, হেমচন্দ্র চন্দ্রের নাম!

নরাধম, কিন্তু নরোত্তমদের তো ভুলি নি! ভুলি নি 'চিত্রা'র সঙ্গে আমার অন্তরের নিবিড়তা! এই ঘরে ব'সে নিউ থিয়েটার্সে'র ভাল ছবি দেখে সমস্ত দর্শকের সঙ্গে সমানভাবে আনন্দ উপভোগ করেছি, অধীর হ'য়ে উঠেছি, উজাড় ক'রে দিয়েছি প্রাণের সমস্ত আবেগ, উচ্চ-প্রশংসায় রাতের আকাশকেও রোমাঞ্চিত করেছি···আর, আর উত্তর-কালে নিউ থিয়েটার্সে'র একটির পর একটি ব্যর্থ ছবি এই

ঘরে ব'সে দেখে অঝোরে কেঁদেছি, রাতের চোখে এনে দিয়েছি জল, ক্ষুব্ধ হতাশায় বারবার শপথ করেছি—আর নয়, আর এখানে আসব না তোমার সম্পর্ককে অচ্ছেদ্য রাখতে, চাই না তোমাকে···কিন্তু তবু এসেছি, তবু এই ঘরে ব'সে ছবি দেখেছি, ব্যথা পেয়েছি, কেঁদেছি আর শপথ করেছি—আর নয়, আর নয়!

চিত্রার পর্দাটি আমার এই স্বল্প আত্মবিস্মৃতিতে একটু বিস্মিত হয়েছিল, বললো: পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে গেল কি? তা হয়, রাত বারোটার পর যখন সবাই চলে যায়, তখন আমি আর এই ঘরের চেয়ার, কুশনেরা মাঝে মাঝে এসে গল্প করি---অতীত ঐশ্বর্য্যের রোমন্থন। কোনও আসনের কোনোদিন ক্ষোভ ছিল না, ভাল সোয়ারির অভাব হয় নি—মাঝে কয়েক বছরের কি দুঃস্বপ্নই না গেল?

জিজ্ঞাসা করলাম: অতীতের কথা সব মনে আছে?

উত্তর পেলাম: সব কি মনে থাকে? প্রায় বাইশ বছর তো এই বাড়ীতে কাটালাম—কত কান্না-হাসির রঙীন মুহূর্ত্ত এসেছে, চলে গেছে! বনেদী জমিদারের মত আজ আমাদের নাম আছে, আভিজাত্য আছে—কিন্তু ঐশ্বর্য্য নেই। মাঝে মাঝে এক একবার সমারোহ হয়, কিন্তু তার পরেই কম্পিত বুকে দাঁড়াতে হয়—কে জানে আবার কতদিনের দারিদ্র্য আর নিরানন্দ! কত দেখলাম, কত শুনলাম—আমাদের আভিজাত্যকে স্পর্দ্ধা ক'রে কত নতুন মুখ এলো, কিন্তু বনিয়াদ কোথায়, ঐতিহ্য কই? আজ তারা একবার করুণা ক'রে আমাদের মুখের দিকে তাকায় —কিন্তু বিলিতি এসেন্সে কি আতরের অভিজাত সুরভির স্পর্শ পাওয়া যায়?

বললাম: 'চিত্রবাণী'র সম্পাদক শারদীয়া সংখ্যায় আমার একটা লেখা চেয়েছেন। 'নরাধম' বলে আমি পরিচিত, কিন্তু এ নামটি সজদোষে অর্জ্জিত। সত্য সত্যই আমি 'নরাধম' নই। আমি এবারে এমন একটি লেখা দিতে চাই যাতে আমার এই দুঃসহ নামের জ্বালা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি। যদি অতীত দিনের কথা কিছু বলে যাও—

'চিত্রা'র পর্দার মুখে হাসি ফুটে উঠলো, বললে —সব কথা তো আর মনে নেই, থাকা সম্ভবও নয়। হয়ত অনেকের নাম ভুলে যাব, হয়ত অনেকের ওপর অবিচার করবো, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দিনক্ষণও ভুল হতে পারে, তবু শুনুন—

মুখোমুখি বসলাম।

'চিত্রা'র পর্দা বলতে সুরু করলো:

স্যার এন, এন, সরকারের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের খেয়াল হ'ল চলচ্চিত্রের ব্যবসা করার। হ'ল ইণ্টারন্যাশানাল ফিল্ম ক্র্যাফ্‌টের পত্তন, তোলা হ'ল ছবি কিন্তু—কিন্তু ছবি প্রদর্শনের সুযোগ আর সুবিধা কোথায়? চিন্তিত হয়ে উঠলেন ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সরকার।

পরিকল্পনা হ'ল আমাদের সৃষ্টির। এমন একটি ছবিঘর করতে হবে যাতে ভারতীয় চিত্রশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। ততদিনে ভারতে সবাক ছবির হিড়িক এসে গেছে। যুগোপযোগী ক'রে আমাদেরও সবাক ছবির জন্ত তৈরী করা হ'ল। পত্র-পত্রিকা উল্লসিত হ'য়ে উঠলো, সংবাদ প্রকাশিত হ'ল: বড়দিনের সময় আমাদের শুভমুক্তি!

সেটা ১৯৩০ সাল। কিন্তু আমাদের দেরী আর সইল না। দ্বারোদ্‌ঘাটন হ'ল ৮ই নভেম্বর ১৯৩০ সালে। রাধা ফিল্মসের নির্ব্বাক ছবি শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' দিয়েই আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল। সেদিনের কথা ভোলবার নয়, ভোলবার নয় সমস্ত দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা আর অভিনন্দনে উচ্ছ্বসিত সেই পরম লগ্নটি!

তারপরে উল্লেখযোগ্য চিত্রমুক্তি হ'ল ১৯৩১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্মক্র্যাফ্‌টের 'চোরকাঁটা'। কিন্তু প্রথম কথা আমরা শুনি আমাদেরই যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি ছোট্ট ভাষণের মারফৎ। বোম্বের দি ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানী পরীক্ষার জন্তই এই ভাষণের শব্দ গ্রহণ করেছিলেন। সমস্ত ঘরময় এই কথা শুনে আমাদের প্রত্যেকেরই শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল—কিশোরীর প্রথম যৌবন লাভের মত সে এক বিচিত্র অনুভূতি!

একে একে মুক্তিলাভ করলো একুশে ফেব্রুয়ারী বার্টার

কীটন অভিনীত ইংরাজী ছবি 'স্পাইট ম্যারেজ', আঠাশে ফেব্রুয়ারী এম-জি-এম-এর 'নেভি ব্লু জ' ও লরেল হার্ডির 'মেন অব ওয়ার', ৭ই মার্চ্চ 'বিগ্রহ,' ১৪ই মার্চ্চ এম-জি-এম এর 'মাদাম এক্স'। হ্যাঁ, ভাল কথা ; ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে এই চিত্রগৃহ থেকে 'চিত্রা' নামে একটি প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশিত হতে সুরু করলো, তাতে থাকতো চিত্রায় মুক্তি-প্রাপ্ত ও আগামী ছবির সম্বন্ধে রসালো সংবাদ আর থাকতো দর্শকসাধারণের ছবির সম্বন্ধে মতামত। বাঙালী দর্শকদের কাছে সে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

২১শে মার্চ্চ। ভারতে প্রস্তুত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাক ছবি 'আলম আরা' এখানে দেখানো সুরু হয়। দর্শকের সে কি উৎসাহ আর উদ্দীপনা। ছবিটি চললো দু'সপ্তাহ। তারপর এলো ৩রা এপ্রিল থেকে 'চোরকাঁটা', সবাক হ'য়ে। ছবিটি এক মুহূর্ত্তে সকলের চিত্ত জয় করে নিল। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই কাহিনীটি চিত্রায়িত করেন প্রফুল্ল রায়, চিত্রগ্রহণ করেন নীতিন বসু। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না গুপ্তা, প্রেমকুমারী নেহেরু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রেণু দেবী, বোকেন চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, চানী দত্ত প্রভৃতি। এক মাসেরও ওপর চলেছিল এই ছবিটি, মেয়েদেরও এত ভিড় হতে সুরু করে যে তৃতীয় সপ্তাহ থেকে মহিলাদের জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

২৮শে এপ্রিল সুরু হ'ল 'রিডেম্পশান', ২রা মে 'মোণ্টানা মুন', ৯ই 'হোয়াইট স্যাডোজ ইন দি সাউথ সিজ', ১৬ই 'কল অফ দি ফ্লেশ', ৩০শে প্রভাত-এর 'দি ফাইটিং ব্লেড' বা 'খুনী খাঞ্জাহার'। ৬ই জুন লন চ্যানী'র সংলাপ-মুখরিত 'দি আনহোলি থ্রি', ১৩ই 'দি ডেভিল মে কেয়ার' ও 'আন-এ্যাকাষ্টমড ম্যাজ উই আর' এবং ২০শে 'অল কোয়া-য়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট'। ৪ঠা জুলাই থেকে ফিল্মস অব দি ইষ্ট লিঃ-র শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' ছবিটির প্রদর্শনের কথা বিজ্ঞাপিত করা হয়, কিন্তু সম্ভব হ'ল না 'অল কোয়া-য়েটে'র অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তার জন্য। অবশেষে ১১ই জুলাই 'স্বামী' ছবিটি মুক্তিলাভ করে, কিন্তু তখন দর্শকদের প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে আবার 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট' ছবিটি দেখানো হবে। 'স্বামী' ছবিটির প্রদর্শনের সময়ও মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ছবিটি চলে দু' সপ্তাহ।

২৫শে জুলাই থেকে 'ফ্রি য়্যাণ্ড ইজি', ৩১শে 'ইন গে-ম্যাড্রিড', ৮ই আগষ্ট থেকে ইউনিক পিকচার্সের 'হাম' বা 'চুপ' নামে বাঙলা ছবি, ১৫ই আগষ্ট নর্ম্মা শিয়ারারের 'দি ডাইভোর্স'। আবার ২২শে আগষ্ট এলো পূর্ব্ব প্রতি-শ্রুতিমত 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট' এবং এবারও দু' সপ্তাহ ছবিটি চললো!

৪ঠা সেপ্টেম্বর। ইণ্টারন্যাশানাল ফিল্ম ক্র্যাফ্ ট-এর 'চাষার মেয়ে' মুক্তিলাভ করে। এর আগে কোনও ছবি আর এরকম জনসম্বর্দ্ধনা লাভ করে নি। চার সপ্তাহ ধ'রে সমানভাবে দর্শকদের আনন্দ বিতরণ ক'রে এসেছে, আর মুহুর্মুহু দর্শকদের আনন্দোল্লাসে আমাদের হৃদয় স্পন্দিত হয়েছে। ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন প্রেমকুমারী নেহেরু, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, রেণু দেবী।

২রা অক্টোবর 'টেণ্ডার হর্ণ,' তারপর 'কল অব দি ফ্লেশ', ৭ই নভেম্বর 'রেজারেক্সন', ১৪ই অরোরার 'পূজারী', ২১শে গ্রেটা গার্বোর 'ইন্সপিরেশান' এবং ২৮শে বড়ুয়া চিত্র প্রতিষ্ঠানের দেবকীকুমার বসু পরিচালিত ও তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, সবিতা দেবী ও শান্তি গুপ্তা অভিনীত 'অপরাধী' ছবিটি। সে যুগের এত ভাল ছবি আর দেখা যায় নি। চার সপ্তাহ ধ'রে ছবিটি আমাদের এখানে চলে।

এরপর থেকেই এলো নিউ থিয়েটার্সের যুগ। ২৪শে ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করে শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'। পরি-চালনা করেছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিভাননী। আগেকার সমস্ত জনপ্রিয়তার রেকর্ড ভেঙে ছবিটি পাঁচ সপ্তাহ ধ'রে চললো।

বছর ঘুরে গেল। ১৯৩২ সাল। ৩০শে জানুয়ারী চার্লি চ্যাপলিনের 'সিটি লাইটস্'—চললো দু'সপ্তাহ, ১৩ই ফেব্রু-য়ারী লরেল-হার্ডির 'পার্ডন আস', ২০শে নর্ম্মা শিয়ারারের

'ষ্ট্রেঞ্জারস্ মে কিস', ২৭শে 'টেমিং অব দি শ্রু'। ৫ই মার্চ্চ 'আঁখিজল' আর ২১শে মার্চ্চ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর প্রথম সবাক চিত্ররূপ 'বিচারক'। পরিচালনা করেছিলেন নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, চিত্রগ্রহণ করেন নীতিন বসু। ২২শে মার্চ্চ রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'র মুক্তিলাভ, দু' সপ্তাহ চলে এই ছবিটি।

১৬ই এপ্রিল সুরু হ'ল দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত 'ভাগ্যলক্ষ্মী' ছবিটি। দুর্গাদাসের অভিনয়-নৈপুণ্যে ছবিটি বেশ কয়েক সপ্তাহ চললো, তারপর এলো ২৮শে মে নিউ থিয়েটার্সের তোলা রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা', ১লা জুলাই শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরিচালিত শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর ভারতে তোলা সর্ব্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ইংরাজী সবাক ছবি 'নুরজাহান'।

বললাম—ভোর হ'য়ে এলো। প্রথম দিকটা একটু তাড়াতাড়ি শেষ করলে হয় না?

পর্দ্দা উত্তর দিল—এ কি তাড়াতাড়ি হবার? কত দিনের স্মৃতি-বিজড়িত ইতিহাস, কত কথা মনে পড়ে যায়, বলতে বলতে কত রাত কেটে যাবে সেই আরব্যোপন্যাসের সহস্র রজনীর গল্পের মত···সব তো মনে পড়ে না, আর বেশীও তো বলি নি। যেখানে শেষ করেছি, সেখানেই শেষ হলো 'চিত্রা'র প্রথম যুগ! বাঙালী দর্শকের কাছে 'চিত্রা'র প্রতিষ্ঠা ও তাদের কাছে নিউ থিয়েটার্সের পরিচিতি! 'অপরাধী' ছবির লাজুক ছেলে প্রমথেশচন্দ্র ভবিষ্যতে কি সুনাম অর্জ্জন ক'রে গেলেন। নির্ব্বাক ছবির জনপ্রিয় নায়ক দুর্গাদাস সবাক যুগে মৃত্যু পর্য্যন্ত আরও জনপ্রিয় হ'য়ে রইলেন। দেখেছি এক একজনকে ভীরু পায়ে আসতে, আমাদেরই ছায়ায় ব'সে তাঁরা উত্তর-জীবনের যশ সঞ্চয় ক'রে গেলেন। যাক্ সে কথা! কে আজকের এই প্রৌঢ়া নিভাননীকে দু' একটি ছবিতে ছোট ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে দেখে মনে করবে যে একদা 'চিরকুমার সভা', 'দেনা-পাওনা' প্রভৃতি ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় তিনি হাজার হাজার দর্শককে মুগ্ধ করেছেন? আজকের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মলিনাকে দেখেই বা কার মনে হয় যে ছোট ছোট হাসির ছবিতে ছোট-খাটো ভূমিকায় তিনি নাচতেন, গাইতেন? আমার হৃদয়ে এঁদের প্রত্যেকের কথা গাঁথা হয়ে আছে। এঁরা যত উন্নতি করছেন, তত আমার বুক ভ'রে ওঠে। শিশুর মত আমার বুকে এঁদের আমি মানুষ করেছি!

কিছুক্ষণের জন্য পর্দ্দাটি থামলো।

তারপর বলতে সুরু করলো: সত্যিই ভোর হ'য়ে আসছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আকাশে নতুন সূর্য্যোদয়, মহানগরীর বুকে জাগবে কর্ম্ম-চঞ্চলতা। আমাদের এই বিশ্রম্ভালাপ শেষ হয়ে যাবে। এভাবে আর আপনাকে কবে এত কাছে পাবো জানি না—আজই মনের সমস্ত কথা উজাড় ক'রে দিয়ে যাই:

এর পর এলো 'চণ্ডীদাস'। সারা বাঙলা দেশে সাড়া প'ড়ে গেল। এতদিন চলচ্চিত্র সম্বন্ধে লোকের যে ধারণা ছিল, এই ছবিটি তা সব বদলে দিল। সব দিক দিয়ে জড়িয়ে ভারতের সর্ব্বপ্রথম সার্থক সবাক ছবি হ'ল এইটি। দেবকীকুমার বসুর অদ্ভুত প্রতিভাবলেই সম্ভব হয়েছিল এই আপাত-অসম্ভব কাজ। কি অভিনয়ে, কি গানে, কি কাহিনীর আবেদনে, কি ছবির সামগ্রিক গতিতে—সমস্ত দর্শক পাগল হ'য়ে উঠেছিল। কেউ কল্পনা করতে পারে নি আমাদের দেশে এ ধরণের ছবি সম্ভব হতে পারে! দর্শকের ভিড়ে ভেঙে পড়েছিল এই ছবিঘর, সমস্ত রাস্তায় জনতা আর টিকিটের জন্য আকুতি! টিকিটের ঘর খোলার আগে থেকে হাজার হাজার দর্শক ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতো টিকিট কিনতে, হতো মারামারি, খণ্ডযুদ্ধ, লোকের মাথার ওপর দিয়ে লোকে হেঁটে চলে যেত টিকিট কিনতে!

লোকে ছবি দেখত। উমাশশীর জন্য রোজ চোখের জল ফেলে চলে যেত তারা, আবার আবার আসত ছবি দেখতে, গান শুনতে। প্রত্যেকটি গান কলকাতা সহরের প্রত্যেকের মুখে মুখে ফিরতো। গান দিয়ে যে ছবিকে দর্শকদের মনের মণিকোঠায় তুলে দেওয়া যায়, তাই দেখিয়ে দিয়ে গেল এই ছবিটি। কলকাতা সহরের সমস্ত 'রেকর্ড' ভেঙে দিয়ে ছবিটি অপ্রতিহত গতিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এগিয়ে চললো। এই দিন থেকে আমরা হ'য়ে গেলাম অন্য ভাইদের ঈর্ষার বস্তু!

কিন্তু এই তো সবে শুরু। তার পরেই এল আর একটি ছবি 'মীরাবাঈ'! সে-ও এক বিচিত্র অনুভূতি। দুর্গাদাস-চন্দ্রাবতীর জুটি সকলকে অভিভূত করলো, সকলে কাঁদলো চন্দ্রার কণ্ঠে মীরার অপূর্ব্ব ভজন শুনে। এ-ও দেবকী বসুর আর এক সৃষ্টি! এ ছবিরও চলার যেন আর শেষ নেই। 'চণ্ডীদাস' আমাদের যে আভিজাত্য সৃষ্টি করে দিয়ে গেছলো তারই উত্তর-সাধক হ'য়ে দেখা দিল এই ছবিটি। আজ মনে পড়ে, এই ছবিতে পাহাড়ী-মলিনা ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এর মধ্যে গেছে 'কপালকুণ্ডলা', 'রূপলেখা'। তারপর সমগ্র ভারত-বর্ষের আজও পর্য্যন্ত সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবি 'দেবদাস'। এই ছবিটির কথা কি বলা যায়, না ভোলা যায়! সে কি উত্তেজনা আর উদ্দীপনা! সমস্ত কলকাতা ভেঙে পড়েছে আমাদের ছবিঘরে—দেবদাস-পার্ব্বতীর জন্য সকলে কেঁদে আকুল, সকলের মুখে ঘুরে ফেরে শুধু এদের দুজনেরই কথা, সকলের মুখে সায়গলের কণ্ঠের দুটি গজল গান, অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র অমর সঙ্গীত! আজ সকলে হাসে, কিন্তু 'ও তোর মরণ' গানটিও কি সকলে প্রাণের আবেগে সব জায়গায় গায় নি?

অথচ শুনি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় নাকি এ ছবি সম্বন্ধে একেবারেই আশা রাখেন নি। তিনি নাকি ভেবেছিলেন, এই ছবিটির মুক্তি হ'লে দর্শকে চেয়ার আস্ত বলতে আর কিছু রাখবে না। আজ হাসি পায়! শুধু এই একটি ছবি নিউ থিয়েটার্স তুলে গেলেই ভারতের চলচ্চিত্রেতিহাসে চিরকালের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে যেতে পারতো।

আমরা তাকিয়ে দেখতাম, সে যুগের ছেলেরা বড়ুয়া-সার্ট, বড়ুয়া-কোট পরে বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর আমরা হাসতাম। গর্ব্বে বুক ভ'রে উঠতো!

তারপর এলো 'ভাগ্যচক্র'। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পীর বাঙলা ছবির প্রথম পরিচালনা। এ ছবিটিও জন-সাফল্যে সম্বর্দ্ধিত হয়ে উঠলো। পাহাড়ী সান্যালকে প্রথম নায়কের ভূমিকায় দেখা গেল; ভারতের মধ্যে প্রথম এই ছবিতেই 'প্লে-ব্যাক' পদ্ধতিতে গান গাওয়া হয়। প্রত্যেকটি গানই লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে।

নিউ থিয়েটার্স আর 'চিত্রা'র তখন কি প্রতাপ আর সম্মান। কোনও ছবি বাদ যায় না যা জনপ্রিয় হয় না, এমন গান ছবিতে থাকে না যা লোকে না গেয়ে থাকতে পারে!

'মায়া', 'গৃহদাহ', 'দিদি',—একটির পর একটি ছবি নিউ থিয়েটার্স থেকে বার হয়ে আমাদের এখানে আসছে আর জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে যাচ্ছে। কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কণ্ঠ-সম্পদ কমতে লাগলো তো এলেন সায়গল—কণ্ঠ-মাধুর্য্যে আজও যিনি সারা ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর তাঁর সঙ্গে ভারতের প্রথম গ্ল্যামার-গার্ল লীলা দেশাই। সে যুগের দর্শকের মনে এঁরা দুজন যে কি বিপ্লব এনেছিলেন—তা আজ আর বলা যায় না!

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস। মুক্তিলাভ করলো বড়ুয়ার 'মুক্তি'। কাননবালাকে দেখা গেল আলট্রা-মডার্ণ একটি গ্ল্যামার-গার্ল হিসাবে। তাঁর অভিনয় ও কণ্ঠ-মাধুর্য্যের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া গেল এ ছবিতে। পঙ্কজ মল্লিককেও দেখা গেল একটি ভূমিকায়, শোনা গেল তাঁর অপূর্ব্ব কণ্ঠের কয়েকটি মধুর গান। গানের এত জনপ্রিয়তা বুঝি আর কোনও ছবিতে হয় নি। এই ছবিটির জন-প্রিয়তার মূল কারণ পঙ্কজ মল্লিক এবং তার পরে কানন ও প্রমথেশ বড়ুয়া। কী অদ্ভুতভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল এ ছবিটি!

অথচ এ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প চলতি আছে: শুভ-মুক্তির ঠিক আগে বড়ুয়া সাহেব ছবিটি দেখে নাকি এত হতাশ হয়েছিলেন যে, সরকার সাহেবকে একটি চিঠি লিখেছিলেন: I am extremely sorry for the picture. Hope to compensate you in my next. এবং ছবিটির ব্যর্থতার লজ্জার হাত থেকে আত্ম-রক্ষার জন্য বিলেতে চলে গেছিলেন। ছবিটির অসাধারণ জনসমাদরের পর তাঁর সহকারী ফণী মজুমদার কেবল্ করেন এবং তারপর ফিরে আসেন বড়ুয়া সাহেব।

'বিদ্যাপতি' ছবিটি আবার সারা ভারতে অদ্ভুতপূর্ব্ব

সাড়া আনলো। কানন দেবী সমগ্র ভারতের জনপ্রিয়া তারকা বলে পরিচিত হলেন। সে কি অভিনয়, আর সে কি গান! দুর্গাদাস, পাহাড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অমর মল্লিক, কানন, ছায়া দেবী, দেববালা, লীলা দেশাই—কি তারকা-সম্মেলন।

একা সায়গল নয়, এবারে এলেন তাঁর সঙ্গে পঙ্কজ মল্লিক। এঁদের নিয়ে বাঙলার চিত্রশিল্পেতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তারকা-সম্মেলন দেখা গেল নীতিন বসুর 'দেশের মাটি' ছবিতে। উমাশশী, চন্দ্রাবতী, দুর্গাদাস, সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক—আর সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও উমাশশীর কণ্ঠের সঙ্গীত-সম্পদ! ছবিটি মুক্তিলাভ করেছিল ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সালে। ৩রা ডিসেম্বর এল ফণী মজুমদারের পরিচালনায় তোলা 'সাথী'। একসঙ্গে প্রথম দেখা গেল সায়গল ও কাননকে। গানে গানে ছবিটি ভ'রে উঠলো।

এইভাবে চললো নিউ থিয়েটার্সের অপ্রতিহত জয়যাত্রা। 'অধিকার', 'সাপুড়ে', 'জীবন-মরণ', 'ডাক্তার', 'নর্ত্তকী', 'পরিচয়', 'মীনাক্ষী'!

ভাঙন লাগলো নিউ থিয়েটার্সে। কুশলী পরিচালকেরা ধীরে ধীরে চলে যেতে সুরু করলেন। গেলেন দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, ফণী মজুমদার। নীতিন বসুও 'কাশীনাথ' ছবিটি শেষ করে চলে গেলেন। সুরু হ'ল নতুন দলের যাত্রা! হেমচন্দ্র চন্দ্রের 'প্রতিশ্রুতি' ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার মুক্তিলাভ করলো—অসাধারণ জন-সম্বর্দ্ধনা লাভও করলো। কিন্তু তারপর আর কোথায়?

জয়-গৌরবের যে উত্তুঙ্গ শিখরে আমরা উঠেছিলাম, তার ভিত্তিতে ভাঙন ধরেছে। নড়বড় করছে আমাদের আভিজাত্য; শেয়ার মার্কেটে সর্ব্বস্ব-হারা লোকের যে দুর্দ্দশা হয়, আমাদেরও তখন সেই অবস্থা। চাল আছে, চুলো নেই। গায়ে সিল্কের জামা আছে, পেটে ভাত নেই। কোনও ছবির মুক্তির প্রথম দিনে নিউ থিয়েটার্সের ছবি দেখতে লোকে ছুটে আসে—কিন্তু আভিজাত্য দেখে, তাদের প্রাণ আর ভরে না। চেয়ার শূন্য থাকে—কারও উষ্ণ স্পর্শ পায় না।

কিন্তু আভিজাত্যের কি দাম নেই, দাম নেই এত দিনের ঐতিহ্যের, এত শিক্ষা আর ত্যাগের? তাই যখন অবস্থা চরম সীমায় এসে পড়ে, তখন আসে এক একটি যুগান্তকারী ছবি। এইভাবেই এসেছে 'উদয়ের পথে', এসেছে 'রামের সুমতি' আর আজ 'মহাপ্রস্থানের পথে'।

যুগ বদলেছে, মানুষের রুচি বদলেছে—কিন্তু আমাদের আভিজাত্য যায় নি। আমাদের ছবি দর্শককে মনে নেয় না, তবুও তো দর্শকদের মন চুরি করার জন্য 'ষ্টান্ট' দিতে পারি না। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তো বাধে। আমাদেরই ছবিতে নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখা যায়।

তাই দিনের পর দিনের নিঃসঙ্গতার পরও মাঝে মাঝে যখন আবার দর্শকের ভিড়ে সমস্ত চিত্রগৃহ সচকিত হ'য়ে ওঠে, মনে প'ড়ে যায় অতীতের কথা। কিন্তু কাকেই বা বলবো সে কথা! গভীর রাতে এই ঘরে আমরা সবাই মুখোমুখি বসি আর অতীত রোমন্থন করি!

আবার আসবেন আপনি। আপনার মত দু'একজনের সঙ্গে কথা বলেও আনন্দ হয়! আজ আর বেশী নয়! ভোর হ'য়ে এসেছে!

নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলের সাহস তো বড় কম নয়! এই এত অল্প বয়সে লুকিয়ে লুকিয়ে থিয়েটার দেখবে। স্কুলে পড়ে, কোথায় মন দিয়ে লেখা-পড়া করবে তা নয়—খালি রোজ রোজ থিয়েটারে যাওয়া। বাড়ীশুদ্ধ লোক অস্থির হয়ে উঠেছে—না, এ বন্ধ করতে হবেই। তাছাড়া আর একটা কথা—ছেলেটি পয়সাই বা পায় কোথা থেকে? আর এমনি মজা যে, ছেলেটি তার ঘরের সামনে এমনভাবে জুতো রেখে যাবে যেন ঘরেই আছে। টেবিলের ওপর বই খোলা, যেন পড়তে পড়তে কোথায় উঠে গেছে। ছেলেটির পিতা খুব বড় জ্যোতিষী। কোষ্ঠী দেখে বলেন, বাধা দিলে হবে কি? ও একজন মস্ত অভিনেতা হবে। ছেলেটির থিয়েটার দেখার সঙ্গী হয় তারই একজন বন্ধু ও ভাই। একদিন হয়েছে কি, থিয়েটার দেখতে গিয়ে ছেলেটির টিকিট-এর দাম কম পড়েছে। ছেলেটি অনুনয়-বিনয় করে "আমার

রঙ্গভূমি ভালোবাসি হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন

আলোকচিত্র : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেক্ষাগৃহে ঢুকিয়ে দিন, পয়সা কাল দিয়ে যাব।" বুকিং অফিসের বাবু কথা শুনলে না, নিয়ে গেল তাকে অধিকারীর কাছে।

একজন ভদ্রলোক ঘরে চেয়ারে বসে, মুখে গড়গড়া। আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন রীতিমত। এতটুকু ছেলে থিয়েটার দেখতে এসেছে।—হ্যাঁ, খোকা, তুমি পয়সা পাও কোথা থেকে?

ছেলেটি মাথা নীচু করে বলে—স্কুলের টিফিনের পয়সা জমিয়ে থিয়েটার দেখতে আসি।

ভদ্রলোক গড়গড়া থেকে মুখ তুলে বলেন—না খেয়ে, থিয়েটার দেখতে এসেচো। যাও বাড়ী যাও, পয়সা বাড়ীতে গিয়ে ফেরৎ দেবে। এত অল্প বয়সে পড়াশোনা না করে থিয়েটার দেখতে এসেচো। যাও বাড়ী যাও।

ছেলেটি মুখ নীচু করে চলে এল। এখন সেই সঙ্গী ভদ্রলোক বলেন—তখন তো জান না রসরাজ, গোকুলে কে বাড়চে।

এই ছেলেটিই হচ্ছেন—নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

১৯২৯ সালের ১৫ই জানুয়ারী—বর্ত্তমান "শ্রী" তখন কর্ণওয়ালিস থিয়েটার নামে খ্যাত। ম্যাডান কোম্পানী বাড়ীটিকে আমূল সংস্কার করে থিয়েটার খুলছেন। সকাল থেকেই বুকিং অফিসে ভীড়—হ্যাঁ, মশাই, একজন শিক্ষিত অধ্যাপক নাকি আজ বেতনভোগী হয়ে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে যোগদান করছেন, সত্যি নাকি?

সকাল থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সকলের মনেই একটা সন্দেহ এবং একটা কিরকম যেন ভাব। একটা অধ্যাপক, শিক্ষিত লোক শেষ পর্য্যন্ত থিয়েটারে যোগ দিলে।

সন্ধ্যায় ভেঙ্গে পড়লো লোক। কি অসংখ্য জনতা। বেশীর ভাগ লোকই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়।

এই সময় (১৯২০-২১) দেশে জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব। হিন্দু-মুসলমানের মিলনকে বিষয়বস্তু করে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'ভীমসিংহ' নাটক নিয়ে আসেন। এটাকেই বহুলাংশে বদল করে 'আলমগীর' নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

শিশিরকুমার নিজে বলেছেন—এই নাটকের অভিনয় দর্শকদের মনে এক অদ্ভুত সাড়া এনে দেয়। এমনকি অভিনয়ের পরও অগণিত দর্শক উন্মুক্ত মাঠে (শ্রী) সমবেত হয়ে নাটক সম্বন্ধে নানাবিধ আলাপ-আলোচনায় মত্ত হ'ন।

'সেদিন কিন্তু একমাত্র "বিজলী" ছাড়া অন্য কোন পত্রিকাতেই সে-অভিনয়ের উল্লেখ ছিল না।' এটা কিন্তু শিশিরকুমার অভিমান ভরে বলেন।

'আলমগীর' যুগান্তর আনলে হবে কি? তাঁর সমানে ঝগড়া চলেছে পার্শী কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে। শিশিরকুমার বলেন—"এ্যারে, তারা এসেছে ব্যবসার খাতিরে, সস্তার জিনিষ আর জাঁকজমক পোষাক দেখিয়ে বাঙ্গালীকে ভোলাতে। তা নাহলে মনে ক'রো 'আলমগীরে' সাধারণ ছোট রাজপুত জমিদার—তার সাধারণ দৃশ্যপট দেখে বলে—ইয়ে কিয়া হুয়া। সোনা ফলাও, লাখ লাখ রূপায়া আমাদের খরচা করনে ইয়ে কিয়া হুয়া। অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন, সেখানে সাধারণ দৃশ্যপট! সেদিনই বুঝেছিলাম এখানে আমার চলবে না।"

সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "সীতা" নিয়ে নিজে দল গঠন করে নামতে মনস্থ করলেন। কিন্তু অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই নাটক অভিনয় করা সম্ভব হয় না। তখন তিনি স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে দিয়ে "সীতা" নাটক লিখিয়ে অভিনয় করেন। প্রকৃতপক্ষে নাটকটি শিশিরকুমারের। এই নাটকটির সঙ্গে শিশিরকুমারের অন্যতম অন্তরঙ্গ ৺ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুকবি হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রভৃতি যুক্ত ছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি এমন সুন্দর অভিনয় সমস্ত কুশীলবদের, রুচিসম্মত পোষাক, সুলিখিত দৃশ্যপট, অপূর্ব্ব সঙ্গীত প্রভৃতির যোগাযোগ বর্ত্তমানে দেখা যায় না। সঙ্গীতে সুর দেন স্বর্গীয় গুরুদাসবাবু। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করেন নৃপেন মজুমদার ও ৺বঙ্কিম দে। কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের গান এমন এক অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করেছিল যা বর্ত্তমানে দুর্লভ।

'সীতা' নাটকের শেষদৃশ্যে প্রথম প্রথম রঙ্গমঞ্চে একশো জন করে লোক নামতেন। প্রসাদ রায় 'বসুমতী'তে লিখেছেন—"যে এঁরা শুধু কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকতেন না, অভিনয় করতেন, কথা বলতেন।" সুনিয়ন্ত্রিত জনতার দৃশ্যে শিশিরকুমারের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। নব-নাট্য আন্দোলনের যুগ-প্রবর্ত্তক ডিউকের মেনিনজেন ও জনতা ও কাটাসৈনিকের ভূমিকাকেও উপেক্ষা করতেন না।

শিশিরকুমারের 'সীতা' নাটক সম্বন্ধে আরও অনেক কল্পনা ছিল। তাঁর মুখে শুনেছি, তিনি কল্পনা করেছিলেন যে শেষ দৃশ্যে সীতা পাতাল প্রবেশ করে প্রেক্ষাগৃহের মাঝ-খান থেকে বার হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্য রঙ্গ-মঞ্চকে (সেইরকম) বিশেষভাবে তৈরী করা প্রয়োজন এবং বাড়ীওয়ালা যদি সাহায্য না করে তো সম্ভব নয়। তাই তো তিনি বলেন—"নিজের রঙ্গমঞ্চ না হলে কিছু সম্ভব নয়। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করবো, না এইগুলো করবো।"

অধুনা "শ্রী"—'নাট্য মন্দির' নাম গ্রহণ করে বাঙলার নাট্যশালার ইতিহাসে এক দান রেখে গেছে। এখানেই শিশিরকুমার সগৌরবে শিক্ষিত নট-নটী নিয়ে একাধিক নাটক মঞ্চস্থ ক'রে দিনের পর দিন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর হাত থেকে ভাল ভাল নাটক বেরিয়েছে, ভাল ভাল নাট্যকার সৃষ্টি হয়েছেন, উচ্চশ্রেণীর নট-নটী তৈরী হয়েছেন। এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যৌবনে 'আলমগীর' নাটকের নাম-ভূমিকায় শিশিরকুমারের প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতরণ আর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের নাটকে বৃদ্ধ মহর্ষি বাল্মিকীর ভূমিকায় প্রথম

অবতরণ। যৌবনে বুদ্ধদেবের প্রথম অবতরণ বৃদ্ধের ভূমিকায় যার ফলে নাট্যজগতে মনোরঞ্জন 'মহর্ষি' নামে খ্যাত।

তখনকার দিনে প্রায় সমস্ত রাত্র ধরে অভিনয় হ'ত। এক একটা নাটক প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা ধ'রে চলতো। আমার মনে হয় এবং অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যও এ কথা বলেছেন যে 'শঙ্খধ্বনি' নাটক তিনি মঞ্চস্থ করেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে। এটি ছিল দু-ঘণ্টার নাটক। বোধ হয় এমন দিন আসবে যে-লোকে ধৈর্য্য ধরে আর ৫।৭ ঘণ্টা বসে নাটক দেখবে না। এই এক্সপিরিমেন্টটাই বোধ হয় তিনি করেছেন। নাটকটি তাই ছোট হওয়ার দরুন চলে নি। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের যুগে আলোক এবং দৃশ্যপটের অনেক উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও একথা বলবো যে 'শঙ্খধ্বনি' নাটকের দৃশ্যের মত দৃশ্য বর্ত্তমানে কোথাও দেখিনি। দোল-খেলা হচ্ছে তার বিভিন্ন রং-এর দৃশ্য, রঙ্গমঞ্চে বৃষ্টি হচ্ছে তার দৃশ্য এসব এখন কল্পনাও করা যায় না। হয়তো রঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতি হয়েছে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে কিন্তু একথা আমি জোরের সঙ্গেই বলবো যে দিগ্বিজয়ী, ভীষ্ম, সীতা, নর-নারায়ণ, শঙ্খধ্বনি, তপতী, প্রভৃতি নাটকের মতো দৃশ্যপট ও সাজ-পোষাক বর্ত্তমানে কোথাও দেখি নি।

রঙ্গজগতে শিশিরকুমার এক যুগের সৃষ্টি করেন। কিন্তু 'শরৎ-শিশির' প্রতিভা আর 'রবীন্দ্র-শিশির' প্রতিভার যোগাযোগ যেমন বিস্ময়কর তেমনি উল্লেখযোগ্য।

'দেনা পাওনা' নাটক নাটকান্বিত হয়ে 'ষোড়শী'তে দাঁড়ায়। শিশিরকুমার শরৎবাবুকে বলেছিলেন যে 'জীবা-নন্দ'কে মারতে হবে। অত বড় একটা দুর্দ্দান্ত জমিদার নিষ্কর্ম্মাভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। ষোড়শীর সঙ্গে স্বামীরূপে চলে যাওয়াও যা বেঁচে মরে থাকাও তা। শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর বন্ধু সুধা মুখোপাধ্যায় দেনা পাওনার রূপ দেন। অথচ কোন জায়গায় এর উল্লেখ নেই।

নাচঘর (৪র্থ বর্ষ—১২শ সংখ্যা)—'ষোড়শী'র জীবা-নন্দকে দেখলে স্বয়ং জীবানন্দের স্রষ্টাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বেন। কারণ শিশিরকুমার হয়তো স্রষ্টার মানস-কল্পনাকে অতিক্রম করেছেন। এঁর শক্তি ও কলাজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান এই জীবানন্দের ভূমিকায় দেখেছি।

'পল্লীসমাজ' নাটকটি প্রথমে স্টারে অভিনীত হয় তবে তা' সাফল্যলাভ করতে পারে নি। শরৎবাবু শিশিরবাবুর শরণাপন্ন হ'ন। শিশিরবাবু নাটকটিকে অদলবদল করে 'রমা' নাম দিয়ে মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকে রমেশের ভূমিকায় শিশিরকুমার, গোবিন্দ গাঙ্গুলী-র ভূমিকায় যোগেশচন্দ্র, আকবর সর্দ্দাররূপী জীবন গাঙ্গুলী, রমার ভূমিকায় প্রভা দেবীর আর জ্যাঠাইমার ভূমিকায় কঙ্কাবতীর স্মরণীয় অভিনয় আজও চোখের সামনে ভাসছে।

নবনাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার 'বিরাজবৌ' নাটকটির নিজে নাট্যরূপ দিয়ে নবনাট্যমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। নীলাম্বরের ভূমিকায় 'মা—রান্না হয়ে গেছে' আজও কানে বাজে।

শান্তশীল গোস্বামীর "শিবহে" নৃত্যসহযোগ গানটি এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন যে, এটা শিশিরকুমারেরই কল্পনা-প্রসূত। 'God makes sport of us when we die'—গ্রীক নাটকে এই রকম দেখা যায়।

তারপর সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে "বিজয়া"। শিশিরকুমার, বিশ্বনাথ, শৈলেন, আর কঙ্কা-র সম্মিলিত অভিনয় খুবই কম দেখা যায়। সেই সময় 'নাচঘর' মন্তব্য করেছিলেন—'শিশিরকুমার যেন একটি জীবন্ত গ্রামের ছেলে ('পরেশ')-কে রঙ্গমঞ্চে ছেড়ে দিয়েছেন।'

শিশিরকুমারের 'শ্রীরঙ্গম' প্রেক্ষাগৃহের ওপরে তাঁর নিজের ঘরে জোর আড্ডা। 'বিপ্রদাস' সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। অনেকে বললেন—এ-নাটক চলবে না।

যেখানে বাধা সেইখানেই আগ্রহ শিশিরকুমারের। বিপ্রদাস বইটির ওপর লিখেছিলেন—এ নাটকের অভিনয় আমি করবো এবং এটা চলবে।

এই উপন্যাসটিকে নাটকান্বিত করেন প্রথমে তারক মুখোপাধ্যায়। কিন্তু পরে মনোরঞ্জনবাবুর অনুরোধে বিধায়ক ভট্টাচার্য্য নাট্যরূপ দেন এবং মহাসাফল্যের সঙ্গে তা' অভিনীত হয়।

ঠিক এমনিভাবেই কিন্তু চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন

বিন্দুর ছেলে'কে নাটক করে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, তিনি নিজে না নেমে, তাঁর হাতের-তৈরী নট-নটীদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছেন।

'বিপ্রদাস' অভিনয়ের সময়ে শিশিরকুমার মাঝে মাঝে দেওঘরে যেতেন। একদিন বৃহস্পতিবার অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে। সেদিন তিনি রাত্রে রওনা হবেন। মিড-উইকের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে 'বিপ্রদাস'। সেদিনও কি বিক্রী! শিশিরকুমার শিশুর মত সারল্যের হাসি হাসলেন বললেন—প্রলয় ঘটালে দেখচি।

সমস্ত নাটকেই শিশিরকুমারের বিশেষ বিশেষ নিজস্ব নাটকীয় ইঙ্গিত আছে। 'রাসবিহারী'র সর্ব্বশেষ সংলাপ, জীবানন্দের মৃত্যু, "রিজিয়াতে" ঘাতকের মৃত্যু এবং শেষদৃশ্যের সংলাপ শিশিরকুমারের নিজের দেওয়া। ভীমসিংহ—রূপায়িত হ'ল "আলমগীর"-এ।

এইজন্যই গিরিশযুগে যে যে নাটক অভিনীত হয়েছে শিশিরযুগেও তাঁর হাতে সেই নাটকগুলি নূতনভাবে অভিনীত হয়েছে এবং যুগের সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, জনা, বলিদান, প্রফুল্ল, সাজাহান, পুণ্ডরীক, অশোক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'প্রফুল্ল' নাটক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন—সবই বুঝি, কিন্তু তাঁর 'হাইটটা' পাবো কোথায়। এই ছ'ফুট লম্বা চেহারা' তার তো একটা দাম আছে।

শিশিরকুমারের ইঙ্গিতে লেখা হয় "মহাপ্রস্থান"। শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রস্থান নয়, একটা যুগের মহাপ্রস্থান। রচনা করেন সত্যেন গুপ্ত। তাই নাট্যকার লিখেছেন—

তোমার মর্ম্মের কথা
লিখিয়াছি আমি
আর কেহ নাহি জানে
জানে অন্তর্যামী

দর্শক ও মঞ্চের মধ্যে একটা যোগাযোগ শিশিরকুমার সব সময়ে উপলব্ধি করেছেন। তাই 'শেষ-রক্ষা'র শেষ-দৃশ্যে দর্শক ও অভিনেতারা এক সঙ্গে মিশে যান। এটাই পূর্ণ রূপ পায় 'রীতিমত নাটকে'। যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন যে এই নাটকে অভিনেতারা যখন দর্শকদের সঙ্গে বসে দর্শক হিসাবে অভিনয় করেন এবং নাট্যাচার্য্য স্বয়ং "বক্স" থেকে অভিনয় দেখেন তখন প্রথম প্রথম সেটা মহাআশ্চর্য্যের ব্যাপার ব'লে মনে হ'তো। একজন অভিনেতার মুখে শুনেছি যে তিনি যখন 'রীতিমত নাটকে' রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে যোগাযোগের কথাটা বলেন তখন সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে কি করে সম্ভব হবে। কিন্তু তিনি কিছুমাত্র হতাশ না হয়ে ছক এঁকে সমস্তটা এমনভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে জিনিষটা সোজা হয়ে গেল। তারপর থেকেই শিশিরকুমারের অনুকরণে নাটকাভিনয়ের ধারা অপরাপর রঙ্গমঞ্চও গ্রহণ করেছে।

'রীতিমত নাটকে' 'প্রফেসর দিগম্বর' চরিত্র এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই নাটকে তাঁর পরিচালনা 'পীরানদোল্লার' সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

যে কথা বলছিলাম। সমস্ত নাটকেই শিশিরকুমারের একটা ধারা আছে—আভিজাত্য আছে যেটা তাঁর পরিচালনায় চোখে পড়ে। যাঁরা 'বিপ্রদাস' দেখেছেন তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে শিশিরকুমার যখন 'বিপ্রদাস' নাটক নিজে অভিনয় করেন, তখন তাঁর বিশেষ বিশেষ নাটকীয় ইঙ্গিত চোখে ধরা পড়ে। "সতী" বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বাড়ীর লক্ষ্মী বিদায় নিচ্ছে। তাই এই দৃশ্যে দেখলাম সিঁদুর, আলতা দিয়ে মঙ্গলকামনা করে তাকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে। এইসঙ্গে দেখলাম দ্বিজদাসকে। সতী তার কতখানি ছিল অথচ সতী হঠাৎ চলে গেল। তাই এই দৃশ্যে দ্বিজদাসের সঙ্গে "সতীর" একটা বোঝাপড়া এবং প্রণাম করতে গিয়ে কপালে আলতার দাগ লাগায় নাটকটির সৌন্দর্য্য অনেকখানি বৰ্দ্ধিত হয়েছিল।

'বসন্তলীলা' সম্বন্ধে হেমন্তকুমার বলেছেন যে 'বসন্তলীলা' খাঁটি গীতিনাট্য এবং শিশিরকুমার এই ধারাটি প্রথম প্রচলিত করেন। শিশিরকুমারের "আলমগীর" তাঁর যৌবনের শ্রেষ্ঠ দান, যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বুঝবেন যে বর্ত্তমানে বার্দ্ধক্যের 'আলমগীর' কিভাবে রূপ পেয়েছে। একে বলে ছাঁচে-ঢালা। বার্দ্ধক্যের ছাঁচে তিনি 'আলমগীর'কে ঢেলেছেন। তখন ছিলেন অসীম শক্তিসম্পন্ন যুবক, এখন বৃদ্ধ। বার্দ্ধক্যের প্রাণ থেকে বার হওয়া কথা—"আমার দ্বারা সাম্রাজ্য শাসন আর চলে না।" রুগ্ন আলমগীর শয্যা ত্যাগ করে এসে অসুস্থ অবস্থায় দিলিরের সঙ্গে কথা বলছে—বর্ত্তমানে তিনি এই দৃশ্যটিকে কিভাবে বার্দ্ধক্যের রূপ দিয়েছেন তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বুঝবেন।

শিশিরকুমার সেদিন বলেছিলেন—"বাঙ্গালীর রুচিবোধ অনেক বদলে গেছে। সেদিন যে জিনিষকে আদর করে নিতো আজ আর তা নেয় না।"

এটা তিনি 'ষোড়শী'র অভিনয় সম্পর্কে বলেছেন। কারণ 'ষোড়শী'র আর পূর্ব্বের মত জনপ্রিয়তা নেই বলে লোক হয় না। তাই তিনি বললেন—নাট্য-মন্দিরে যখন রুশরা "ষোড়শীর" অভিনয় দেখতে আসে তারা আশ্চর্য্য হয়েছিল যে রাশিয়া যা এখন চিন্তা করছে শরৎচন্দ্র অনেক পূর্ব্বেই তা চিন্তা করে গেছেন। 'জমিদারী যায়, মহাজন ক্যাপিটালিষ্ট যায়, যাকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্নরূপে লোকেরা গ্রহণ করেছে দেবী ভৈরবী তাকে শাড়ী পড়ে 'স্বামী' বলতে হয় কিন্তু থেকে যায় জমি আর প্রজা। সাগরসর্দ্দার তাই বেঁচে থাকে মরে না।

কিন্তু শিশিরকুমার আজও আশাবাদী। তিনি বলেন—"হ্যাঁ, চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংঘাতের ফলেই মঞ্চের এই অবস্থা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু এটা সাময়িক। ইংলণ্ডেও এক সময় তা' রঙ্গমঞ্চকে আঘাত হেনেছিল কিন্তু বিলীন হয়ে যায় নি। আজ সেখানকার মঞ্চ তার বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে আবার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।"

তিনি বলেন—"অভিনেতা কালের সাক্ষী" রঙ্গমঞ্চ একমাত্র স্থান যেখানে সমস্ত কলার সমন্বয় ঘটে।

১৯৪২ সালে শিশিরকুমার "শ্রীরঙ্গম" খোলেন। তখন থেকে তিনি একভাবে অভিনয় করে আসছেন এবং এখনও করছেন। শিশিরকুমার তারাকুমার মুখোপাধ্যায় নামে এক স্কুল মাষ্টারের নাটক "জীবন-রঙ্গ" নিয়ে শ্রীরঙ্গমের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন। "জীবন-রঙ্গ" নাটকখানি চলে নি। শিশিরকুমার বলেন 'জীবন-রঙ্গ' নাটকখানি 'মাস'-এর জন্য নয় ক্লাস-এর জন্য, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য। তাঁর অভিনীত আর একখানি স্মরণীয় নাটক হলো 'মাইকেল মধুসূদন'। মাইকেল-এর মতো জিনিয়াসের চরিত্র যথাযথ রূপ পেয়েছে জিনিয়াস শিশিরকুমারের হাতে। মাইকেল চরিত্রটির এমন উপলব্ধি এবং নিখুঁত পরিবেশন শিশির-প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। নাটকটির প্রথম অঙ্কে পিতা-পুত্রের মর্ম্মান্তিক সংঘাত যে রূপ পেয়েছে তা বর্ণনাতীত। অভিনয়ের পর ডাঃ সুনীতিকুমার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং এই দৃশ্যটি বাদ দিতে নিষেধ করেন, কারণ অনেকের মত ছিল যে এই দৃশ্যটি মেলোড্রামাটিক এবং এর সার্থকতা নেই। এই নাটকটির বিশেষত্ব হলো শিশিরকুমারের মুখে বিভিন্ন আবৃত্তি। এর পর আরেকখানি উল্লেখযোগ্য নাটক—'দুঃখীর-ইমান'।

তুলসী লাহিড়ী রচিত এই নাটকখানি মঞ্চস্থ ক'রে শিশিরকুমার নাট্যজগতে এক নূতনের ইঙ্গিত করেছেন। যুদ্ধের পটভূমিকায় রংপুরের এক থানার ঘটনাকে কেন্দ্র

ক'রে তুলসীবাবু অনেক পরিশ্রম ক'রে এই নাটক লেখেন। অনেক চেষ্টা করেন নাটকটির অভিনয়ের জন্য। কিন্তু সফল কাম হ'ন না। গ্রাম্য-দৃশ্য, নায়ক-নায়িকা, চাষা-চাষী—কে সাহস করে এই নাটকটি নেবে? শেষে তিনি শিশির-কুমারের দ্বারস্থ হলেন। গতানুগতিক একঘেয়ে থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের এবং নূতন ধরণের রচনার সন্ধান পেলেন শিশিরকুমার। এই নাটকটিতে এক্সপেরিমেন্ট করা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। কারণ তিনি রঙ্গমঞ্চে ব্যবসা করতে আসেন নি। তিনি নাটকটি পড়ে অদল-বদল ক'রে নাম দিলেন 'দুঃখীর-ইমান' এই সময় কলকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য নাটকখানি ভালভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি, কিন্তু অভিনবত্ব ছিল ব'লে এটি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল।

'মায়া', 'উড়ো চিঠি', 'দেশবন্ধু', 'বন্দনার বিয়ে', 'তুলসীদাস', 'উল্কা', 'তাইতো', 'ভিখিরির মেয়ে', 'বিপ্র-দাস', বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি নাটকও অভিনীত হয়।

'বিন্দুর ছেলে' শিশির-প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন একথা পূর্ব্বেই বলেছি। শিশিরকুমার তাঁর এই নাট্য-নৈবেদ্য নিবেদন করেছেন সমস্ত নূতন নাট্যকারদের ভিতর দিয়ে। তাঁর অধিকাংশ নাট্যকারই নূতন।

কিন্তু 'পরিচয়' নাটকে রায়বাহাদুরের ভূমিকায় এক অদ্ভুত নাট্যরসের সঞ্চার করেন। 'পরিচয়' নাটকের নাট্যকার একবারে নূতন, তাঁর নাম জিতেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায়। নাট্যকার যেমন সাহসী ও বলিষ্ঠ, শিশিরকুমারও তেমনি সাহসের পরিচয় দিলেন সেই নাটক মঞ্চস্থ ক'রে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটা দিক নিয়ে এই নাটকটির মূল উপাদান রচিত। তাই প্রচার-পত্রে ঘোষিত হ'ল--

'পরিচয়'

যুগের	পরিচয়
জাতির	পরিচয়
সমাজের	পরিচয়
ব্যক্তির	পরিচয়

এই নাটকের ব্যর্থতা দেখে ৫০তম রাত্রে শিশিরকুমার বলেন—আমাদের দেশে দর্শকদের মন গেছে চীপ সেন্টিমেন্টের দিকে, তাই নতুন কিছু করতে গেলেই ব্যর্থ হই। এখন আমরা হয়েছি পিক পকেট।

এরপর আসে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'তখৎ-এ-তাউস' বা ময়ূর সিংহাসন।

শিশিরকুমার বলেন—অভিনয় জিনিষটা মানুষের স্বভাবজাত। যা নই তাই হবার চেষ্টা, পরকে অনুকরণ করা এ সমস্ত শিশুকাল থেকেই প্রকাশ পায়।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯৩৩ সালে শিশিরকুমার যখন এলাহাবাদ ভ্রমণে যান তখন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অভিনন্দন-মানপত্র দেন—সেই সময়ের কথা। শিশিরকুমার বক্তৃতা আরম্ভ করলেন—

Frankly speaking I am feeling nervous because whenever I speak I have a prompter by my side.

প্রেক্ষাগৃহ হাস্যে মুখরিত হ'ল।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারই সর্ব্বপ্রথম অভিনয়ের ওপর প্রাধান্য দেন। নাট্যমন্দিরে তিনি শুধু নবযুগের শঙ্খধ্বনি করেন নি।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, একদিকে ভারতের নাট্য-শাস্ত্র অন্যদিকে পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারই গিরিশচন্দ্র প্রবর্ত্তিত অভিনয়ের এই নতুন ধারাকে একেবারে বদলে দিয়েছেন। এ অভিনয় বাস্তব-মুখী। অমিত্রাক্ষর ছন্দ, কবিতা, কথোপকথনের ভিতর দিয়ে সহজ সরলভাবে প্রকাশ করা শিশিরকুমারের অন্যতম অবদান। এইখানেই যাত্রার অভিনয়-কৌশলের সঙ্গে এর মূলগত প্রভেদ।

শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর, ভাবব্যঞ্জক ভাবা-ভঙ্গিতে অসামান্য ক্ষমতাশালী, অঙ্গভঙ্গী অতি শোভনীয়, আবৃত্তিতে অতি নিপুণ। সবচেয়ে বড় কথা, একই নাটকে একাধিক বিভিন্ন ভূমিকায় বৈচিত্র্যময় স্বরচাতুর্য্য দ্বারা আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছেন। উদাহরণ দেওয়া

যেতে পারে—রঘুপতি ও দুর্জয়সিংহ 'বিসর্জনে', রমেশ ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী 'রমা'তে, 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ ও রমেশ, 'বলিদানে' করুণাময় ও দুলালচাঁদ, 'জনা'তে-প্রবীর, বিদূষক ও নীলধ্বজ, 'সাজাহান' নাটকে সাজাহান ও ঔরংজীব, 'আলমগীরে' আলমগীর ও রাজসিংহ প্রভৃতি।

শিশিরকুমারের আর একটি স্মরণীয় অভিনয় হলো 'রিজিয়া' নাটকে 'বক্তিয়ার' ও 'ঘাতকের' ভূমিকায় অভিনয়। অনেক বিখ্যাত সমালোচকের মতে 'বক্তিয়ার' রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গত ২রা ও ৩রা আগষ্ট তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই বার্দ্ধক্যেও তাঁর পূর্ব্বেকার সেই 'বক্তিয়ার' কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয় নি। শুধু তাই নয় এত বৃদ্ধ বয়সেও এত দৈহিক শক্তির প্রকাশ অপর কারও অভিনয়ে দেখেছি বলে মনে হয় না। সেদিন দেখলাম শিশিরকুমার যেন নূতন ক'রে দৈহিক শক্তি ফিরে পেয়েছেন। রিজিয়ার সঙ্গে সংঘাতের দৃশ্যে বক্তিয়ারের কথা—'এই দণ্ডে নিষ্কাসিত অসি মম যদি দ্বিখণ্ডিত করে তব শির, কি করিতে পার তুমি সাহাজাদী'—রিজিয়ার দিকে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি আর মাঝে মাঝে অসিতে হাত দেওয়াএই—দৃশ্যটি অবিস্মরণীয়। একটা ভঙ্গীর দ্বারা হিংস্রতার, প্রতিশোধ গ্রহণের যে রূপ ফোটালেন তার তুলনা মেলে না।

'সাজাহান' নাটকে শিশিরকুমারের 'সাজাহান' শিল্পীর অনুপম সৃষ্টি--শিল্প ও সৌন্দর্য্যবোধের অপূর্ব্ব নিদর্শন। নিজে কিছু সংলাপ জুড়ে তিনি সাজাহানের চরিত্রটির সৌন্দর্য্য অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এখন একটি নাটকের অভিনয় হয় না কিন্তু এক সময়ে এই নাটকটি একটি যুগের সৃষ্টি করেছিল সেটি হচ্ছে—'সধবার একাদশী'।

নাচঘর (৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)—শিশিরকুমারের মুখ দিয়ে নিমচাঁদের প্রত্যেকটি বচন ফুটে উঠেছিল এক একটি হীরার টুকরার মত! নিমচাঁদের অচেতন মাতলামী ও সচেতন রসনিপুণতা এবং অধঃপতনের মধ্যে ও তার আত্ম-সম্মান-জ্ঞান—এগুলি শিশিরকুমারের অভিনয়গুণে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। (সধবার একাদশী)

'প্রফুল্ল' নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে রঙ্গমঞ্চে—নবশক্তি (২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)—শিশিরবাবুর যোগেশ—'প্রফুল্ল' অভিনয়ের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর অনাড়ম্বর রিক্ততা। মঞ্চের ওপর কথা বলছেন, অঙ্গভঙ্গী করছেন, মাতাল হয়েছেন, কিন্তু তিনি যে অভিনয় করেছেন একথা আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও অনুভব করতে পারি না।

শিশিরকুমারের অভিনয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর বাচন-ভঙ্গী ও স্বর বিক্ষেপ। সেইসঙ্গে তাঁর ইঙ্গিত কথা না বলে ভাবের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা।

অনেকেরই আজ হয়তো মনে নেই, কিন্তু আমাদের আজও মনে আছে। শিশিরকুমার অভিনীত 'বসন্তলীলা' নাটক। প্রথম গীতিনাট্য। নাটকখানির বৈশিষ্ট্য নাচ ও গানের মাধ্যমে অভিনয় করা। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুকবি হেমেন্দ্রকুমার রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রভৃতি এতে যোগ দিয়েছিলেন।

বর্ত্তমানে অনেকের হয়তো স্মরণ নেই শিশিরকুমারের একসঙ্গে দুটি বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় 'পাষাণী'তে 'ইন্দ্র' এবং 'গৌতম'। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের চরিত্র। পাশাপাশি দুটি চরিত্রের রূপদান যে কি শক্ত এবং কঠিন তা দর্শক-মাত্রেই বোঝেন। এই দুটির অপূর্ব্ব অভিনয় আজও চোখে ভাসছে। অবশ্য এখন শিশিরকুমার একই নাটকে দুটি বিভিন্ন ভূমিকায় একসঙ্গে অভিনয় করেন। যেমন 'আলমগীর' ও 'রাজসিংহ', 'ঔরংজীব' ও 'সাজাহান'।

শিশিরকুমার বেশ কৌতুক করে বলেন, ট্রামে চড়ে গেলে কেউ ধরতে পারতো না যে এই লোকটিই 'আলম-গীর।'

ভারতবর্ষের মধ্যে নাট্যমন্দিরের মত অত বড় রঙ্গমঞ্চ কোথাও নেই। এই এতো বড় রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা কত কঠিন তা অনেকেই জানেন। শিশিরকুমারের 'রমা' 'দিগ্বি-জয়ী', 'তপতী' প্রভৃতি নাটকে আমরা তাঁর শক্তির পরিচয় পেয়েছি। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে 'নাদির সার শিবির দৃশ্যে' প্রায় এক ফারলং ধরে লম্বা আর পরপর সৈনিক দাঁড়িয়ে, যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের বোঝানো সম্ভব নয়। 'রমা'য় পল্লীগ্রামের দৃশ্য এবং রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়ে গ্রাম দেখতে

দেখতে শিশিরকুমার 'রমেশে'র ভূমিকায় আসছেন তা ও এক স্মরণীয় দৃশ্য। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের সমালোচনা সম্বন্ধে তখনকার দিনে পত্রিকার মত—

নবশক্তি (তৃতীয় বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা) :—"রঙ্গমঞ্চের ওপর নাদিরের প্রতিপদক্ষেপ তাঁর মুখের একটু হাসি, চোখের সামান্য ভ্রূকুটি, আদরের ক্ষুদ্র চাপড়টি পর্য্যন্ত অর্থপূর্ণ। তার ওপর আছে শিশিরবাবুর অনন্যকরণীয় কণ্ঠস্বর। এই স্বরের বিচিত্রলীলার মধ্যে নাদির-চরিত্রের বিভিন্ন রূপকে তিনি যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা আমাদের অনতিসামান্য অভিজ্ঞতার মধ্যে খুঁজে পাই না।"

প্রসিদ্ধ নাট্য-সমালোচক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কাছে শুনেছি এবং তিনি বহুস্থানে বলেছেন—'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে'র মত এমন সুন্দর টিম-ওয়ার্ক নাটকে তিনি কখনও দেখেন নি। তিনি 'আলমগীরে'র চেয়েও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'কে প্রশংসা করেন বেশী। এই নাটকে শিশিরকুমার চার-চারটি ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন। ভীম, ব্রাহ্মণ, বৃহন্নলা ও শ্রীকৃষ্ণ।

নবশক্তি (১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা):—'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে' মহাবলী ভীমের অসংযত শক্তিমত্ততা, লাঞ্ছিত পাণ্ডবের প্রতিহিংসাতৃষ্ণা, বীর অন্তরের সমরবাঞ্ছা, ছদ্মবেশের নিরুপায়তায় নিষ্ফল আক্রোশ শিশিরকুমার যে সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। ভীমের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় অন্যান্য ভূমিকা থেকে এত বিভিন্ন ও নূতন যে এই মায়াবী-নটের অভিনয়-প্রতিভার বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সন্দেহের আর লেশমাত্র অবকাশ থাকে না।

এই নাটকেই 'শ্রীকৃষ্ণ'-র ভূমিকায় কিছুমাত্র নূতনত্ব না থাকলেও ভীমাভিনয়ের অসংযমের পর পাণ্ডবসখার শান্ত সমাহিত ভাব অত্যন্ত আরামদায়ক। ব্রাহ্মণের ভূমিকায় শিশিরকুমারের সুন্দর অভিনয়ের বর্ণনা করা যায় না। এ যেন শিল্পীর এক ভয়ঙ্কর সৃষ্টি। প্রকৃতির

প্রলয়লীলায় এক অনৈসর্গিক স্ফূলিঙ্গ। অঙ্গসজ্জা, ভাবাভিব্যক্তি ও অভিনয়ের দিক দিয়ে এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাতে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ব্রাহ্মণের 'কা-কা-আ-হা' আমরা শীগ্‌গিরই ভুলতে পারব বলে মনে হয় না।'

১৯২৮ সাল। এক সাহেব ভদ্রলোক 'সীতা' নাটক দেখতে এসেছেন। তখনকার দিনে বাঙ্গালী পাড়ায় সাহেব এলে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে যেতো। সাহেব হলেন মার্কিনদেশীয়, নাম ইলিয়ট। 'সীতা' দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। বাঙ্গালীরা এত ভাল অভিনয় করতে পারে! শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন! তারপর শোনা গেল যে তিনি শিশির-সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক চুক্তি করেছেন, তাঁদের আমেরিকাতে নিয়ে যাবেন।

নাট্যমন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়েছে। শিশিরকুমার নিজে ষ্টারে যোগদান করেছেন। এখানে 'চিরকুমার সভায়' রসিক, 'কর্ণার্জুন' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। সদলবলে গেলেন আমেরিকায়। তাঁর দলের প্রায় সকলেই গেলেন। নট-নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শৈলেন চৌধুরী, অমলেন্দু, শীতল পাল, তারাকুমার ভাদুড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, রবি রায়, প্রভা, কঙ্কাবতী, শেফালিকা প্রভৃতি। সেখানে গিয়ে ইলিয়ট সাহেব তাঁর চুক্তি ভঙ্গ করেন। এমন সব প্রস্তাব করেন যা যে কোন সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান এবং জাতির পক্ষে অপমানকর। ফলে শিশিরকুমার, বিদেশে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হ'ন। শিশিরকুমার কথা প্রসঙ্গে তাই প্রায়ই বলেন—"ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, তখন বিলেতে রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্স। এরা জগতের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে ভারত এমনি বর্ব্বর যে তাদের কোন নাটক নেই, নট নেই, রঙ্গমঞ্চ নেই। 'A nation is known by its theatre'। কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয়, কেউ বলতে পারে না। বা[illegible] বড়াই করুক, নিজে কিছু করতে পারে না। ভাবছি কি করি, অসহায় অবস্থা, তখন কাণ্ডারীরূপে একজন উপস্থিত হলেন এবং তিনিই 'ভাণ্ডারভোল্ট থিয়েটারে' অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।"

আমেরিকা থেকে ফেরবার পথে শিশিরকুমার চিন্তা করছেন কিভাবে কলকাতায় যাবেন। কারণ সত্য ঘটনা অনেকেই জানেন না। ফলে কলকাতায় তাঁদের অসাফল্যের খবর পৌঁচেছে।

...চিন্তা করছেন—ব্যস্ মাথায় প্ল্যান এসে গেছে। "চলো দিল্লী", ভারতবর্ষের রাজধানী নয়াদিল্লীতে এলেন। রঙ্গমঞ্চের 'আলমগীর,' 'নাদির-সাহ' পৌঁচলেন নয়াদিল্লীতে। তাঁর বন্ধু-বান্ধব বড় বড় সরকারী অফিসারদের বললেন—একবার বড়লাটের মিলিটারী সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পার?

কেউ-ই সাহস করে না।

শিশিরকুমার তাই বলেন—গোলামী করে করে এমনই মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে যে সাহেবের সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিয়ে দিতে কেউ-ই নেই।

হাতে কতকগুলি ইংরাজী পত্রিকা নিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবী-চাদর-পরিহিত খাঁটি স্বদেশী শিশিরকুমার চলেছেন টাঙ্গা করে মিলিটারী সেক্রেটারীর অফিসে। "বহুবিধ বাধা অতিক্রম করে দেখা করলাম। সাহেব প্রথমে আমলই দিতে চায় নি। তখন বার করলাম 'দি নিউ ইয়র্ক সান' পত্রিকার সমালোচনা, লিখেছেন ষ্টিফেন র‍্যাথবোন আর 'দি ইভনিং ওয়ার্ল্ড'।"

মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল আগ্রহভরে পড়েন আর শিশিরকুমারের মুখের দিকে তাকাতে থাকেন। বাবা! 'দি নিউ ইয়র্ক সান' বলছেন— "bell-like voice" শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বরকে।

তাই শিশিরকুমার বলেন—"ওদেশের বিখ্যাত পত্রিকার ওপর জনসাধারণের কত উঁচু ধারণা আর বিশ্বাস।"

মিলিটারী সেক্রেটারী ছুটলেন শিশিরকুমারকে নিয়ে বড়লাটের কাছে। বড়লাট লর্ড আরউইন। shake-hand হ'ল। পরিচয় হ'ল। বিশেষ সংবাদ হিসেবে "সীতা" নাটকের অভিনয়ের কথা প্রচার করার হুকুম হ'ল

এক বিশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে।

বড়লাট-ভবনের রঙ্গমঞ্চে 'সীতা' অভিনীত হ'ল। সাহেবে সাহেবে লোকারণ্য, পুলিসে পুলিস, মায় মেয়েদের গ্রীণরুমে।

শিশিরকুমার হুঙ্কার দিলেন—তাহলে কি অভিনয় হবে না? মানে আর কিছুই নয় মেয়েদের গ্রীণরুমে পুলিশ!

পুলিস তৎক্ষণাৎ সরে গেল।

সাহেবদের বোঝবার সুবিধার জন্য শিশিরকুমার ইংরাজীতে নাটকের ঘটনা ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন, প্রোগ্রামে তাই ছাপা হয়।

বড়লাট পিঠ্ চাপড়ালেন, তৎকালীন ভারত সরকারের তরফ থেকে সার্টিফিকেট্ দিলেন।

শিশিরকুমার বলেন—আরে, সে কি কাণ্ড! যখন যা চাইছি তাই হাজির হচ্ছে। গভর্ণমেন্টের "সে বেটা" আমরা সাজ-পোষাক যা চাইছি তাই এনে উপস্থিত করছে।

শিশিরকুমার এখন প্রায়ই বলেন—ভাবো দেখি, লক্ষ টাকার ওপর দেনা করে দেশে ফিরেচি। ফিরে দিব্যি নিদ্রা দিচ্ছি আর আমেরিকা-ভ্রমণের গল্প করে রাজা-উজীর মারচি।

সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অত্যন্ত উঁচু। তিনি বলেন,—"সমুদ্রের ওপারে সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় নাট্য ধারার ইঙ্গিত দেয়, নাট্যকার সৃষ্টি করে, নট-নটী আবিষ্কার করে এবং তাদের ধারা অভিনয়-পদ্ধতি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ গ্রহণ করে। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক উল্টো। সৌখীন সম্প্রদায় পেশাদার রঙ্গমঞ্চকেই অনুসরণ করেন। কিন্তু এর কোন সার্থকতা নেই। অথচ আমাদের দেশে সৌখীন সম্প্রদায় থেকেই বড় বড় অভিনেতা বেরিয়েছে। সৌখীন সম্প্রদায় এগিয়ে এসে রঙ্গমঞ্চকে ইঙ্গিত দিক, নতুন পথ দেখাক।"

'রঙমহলে' অভিনীত 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে শিশিরকুমার ও প্রভা

শিশিরকুমারেরও প্রথম নাট্যাবতরণ সৌখীন সম্প্রদায়ে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেও তিনি সৌখীন সম্প্রদায়ে বহুবার অভিনয় করেছেন।

"জেনারেল এসেম্বলিস্ ইন্‌ষ্টিটিউসন" থেকে বি, এ পাশ করার সময় তাঁর প্রথম নাট্যাভিনয় 'মার্চেন্ট্ অফ্ ভেনিস'-এ স্ত্রী-ভূমিকায় "পোরশিয়া" বেশ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তখন থেকেই শিশিরকুমার নাটক এবং অভিনয় সম্বন্ধে এত সচেতন যে তিনি স্বর্গীয় হরিনাথ দে'র কাছে গিয়ে পোষাক-পরিচ্ছদ কিরকম হবে জেনে আসেন।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদানের পূর্ব্বে নাট্যাচার্য্য সৌখীন থিয়েটার, যেমন কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট এবং ওল্ড ক্লাব থেকেই অভিনয়ে খ্যাতি লাভ করেন।

সৌখীন থিয়েটারে তিনি 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে 'চাণক্য'র ভূমিকায় অভিনয় করে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন। শিশিরকুমার নূতন রূপ দিলেন। তিনি 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের দোষ-ত্রুটি সেই সময় থেকেই ধরতে পেরেছিলেন তাই আমরা তাঁর 'চন্দ্রগুপ্তে' গ্রীস পাত্র-পাত্রীর নাম-গন্ধ দেখি না। এই নাটকের ভিতর একসঙ্গে চারটি নাটক আছে। তিনি নাটকটিকে "চাণক্য"তে দাঁড় করাবার চেষ্টায় ছিলেন গোড়া থেকেই। তখন তাঁর বয়স ১৮ বৎসর।

দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন—"আমি লিখলাম 'চন্দ্রগুপ্ত' আর তুমি করলে 'চাণক্য'।" দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মুখ গম্ভীর।

শিশিরকুমার 'বৈঠকী আড্ডায়' বৈঠক জমাতে অদ্বিতীয়। তাঁর "টেবল-টক্" আর উইটের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই জানেন।

দেওঘরে শিশিরকুমার অবস্থান করছেন। ক'দিন নাপিত আসে নি। অসম্ভব দাড়ি গজিয়েছে। অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন আর বলছেন—হ্যাঁ হে, একবার নর সুন্দরের খবর নাও। তাকে বুঝিয়ে বল ব্যাটা জানে না তো যে এ নট্ তায় আবার ব্রাহ্মণ আর যে ব্রাহ্মণ চাণক্য সেজেছে।

তাঁর এক আত্মীয় বেশ বলেন যে বড়বাবু যেদিন 'মুড-এ' থাকেন বৈঠকটি হয় স্বর্গ আর যেদিন 'মুড-এ' থাকেন না সেদিন বৈঠকটি যেন শ্মশান।

রূপসজ্জার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন—দ্যাখো আমাদের দেশে, রূপসজ্জার জন্য সবরকম সরঞ্জামের কোন অবকাশ নেই। গরমে রং, পাউডার, তুলি সব একসঙ্গে গলে ঝরে ঝরে পড়ছে। এতে কি আর রূপসজ্জা চলে?

সেক্সপীয়রের নাটকের বাংলা অভিনয়ের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—'ঠিক ইংরাজীর বাংলা' করা চলে না এবং ঠিক সে গুরুত্বও পায় না। এই জন্য নাটকগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি।'

নট-নটী সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে শিশিরকুমার বলেন—'বাংলা দেশে কখনও অভিনেতার অভাব হয় নি। একাধিক শক্তিশালী নটের অভাব কোনদিন হয় নি। অভাব হয়েছে নাট্যকারের।'

তাঁকে ঘিরে তাঁর বন্ধুরা, শিল্পীরা যখন গল্প করেন তখন সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগে যে নানা বিষয়ে নানা ধরণের প্রশ্ন করে চলেন অথচ উত্তর দেবার জন্য তাঁকে একটুও ভাবতে হয় না। অনর্গল উত্তর দিয়ে যান। যেন সব আগাগোড়া তৈরী করে আসা।

একদিন এক জমিদার এসে তাঁকে বলেন—'আচ্ছা থিয়েটারের দরকার কি?'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'স্কুলের দরকার কি?' জমিদার ভদ্রলোক স্তম্ভিত হলেন।

তাই শিশিরকুমার বলেন—'আমি বলি থিয়েটারের দরকার আছে। খালি রাজনীতির দ্বারা একটা জাতি বড় হতে পারে না। তার শিল্প, সাহিত্য, কলা—এর ফলেই সে শ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। ছোট্ট দেশ গ্রীস—সে জাতিকে দিয়েছে 'ইমাজিনেশন'। রোম দিয়েছে 'কনষ্টিটিউশন' আর ভারতবর্ষ জগৎকে দিয়েছে 'দর্শন'। সেক্সপীয়র, কালিদাস আজও চির নূতন। টিটিয়ান র‍্যাফেল এঁরা অবিস্মরণীয়।

তাইতো সেদিন বললেন—'একা যতটুকু সম্ভব ততটুকুর চেষ্টার ত্রুটি করি নি কিন্তু একার দ্বারা সমস্ত সম্ভব নয়। তাই সফলকাম হতে পারি নি। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ক'রে কতবার বাড়ী পরিবর্ত্তন করতে হয়েচে, পথে পথে ঘুরতে হয়েচে সেইজন্য সরকারের সাহায্য দরকার, স্থায়ী রঙ্গশালা দরকার।'

এই সেদিন বললেন—'আরে বাপু, এখন নাটক পুলিশের হাতে। দারোগার কাছে গিয়ে নাটক পেশ করতে হবে। তবু বলতে হবে দেশ স্বাধীন হয়েচে।'

আর একটা কথা তিনি প্রায়ই বলেন—'দ্যাখো, অভিনয়ের জন্য যারা আসে তারা জিজ্ঞেস করলেই বলে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত, নয়তো স্কুলে কিছুদূর পর্য্যন্ত পড়েচে। কেরাণীগিরি করতে হলে বি, এ পাশ করতে হবে, কিন্তু অভিনয়টা যেন রাস্তার জিনিষ। কোন জ্ঞানের দরকার নেই।'

তাঁর কাছে একখানা বই আছে। তা পড়ে তিনি

বলেন—'প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ও পরিচালকদের জ্ঞান থাকা দরকার কোন্ দিক থেকে প্রবেশ করবে, প্রস্থান করবে, কোথায় দাঁড়াবে, কি ভাবে কথা বলবে।'

একদিন একজন সাংবাদিককে বললেন—'সমালোচনা তোমরা যা করবে তা গঠনমূলক হওয়া দরকার। নাটকে কি বলতে চেয়েছে এবং নাটকের চরিত্রানুযায়ী নট্-নটী কতটা তার মর্য্যাদা দিতে পেরেছে। তা নয়—নাটক কিছুই হয় নি, অভিনয় কিছুই হয় নি। আরে, আমি বলি যে আমি মাসের পর মাস ধরে শেখালাম, পড়ালাম, বোঝালাম, আর আমি বুঝি না কি হয়েছে বা না হয়েছে! ভারী বয়ে গেল তোমার বলাতে। তোমার মতামতের কি মূল্য হে?' বলে হাসতে লাগলেন।

বালকদের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন আছে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে বালকদের নাটক একান্ত প্রয়োজন তার প্রথম ধারণা তাঁরই মনে আসে এবং 'স্কুলের আয়না' মঞ্চস্থ করেন।

রঙ্গালয়কে লোকশিক্ষার আকাররূপে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যে সাহস ও ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন বাঙ্গালার রঙ্গালয়ে সেটাই সর্ব্বাপেক্ষা বড কথা। দৈব তাঁর সহায় ছিল সন্দেহ নেই; দুর্লভ প্রতিভা অনন্যসাধারণ প্রয়োগ-শক্তি, উদাত্ত মধুর কণ্ঠ অনবদ্য শিক্ষকতা, প্রখর ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বিশিষ্ট গুণগুলি একাধারে একটি শিল্পীর মধ্যে পাওয়া শক্ত। নট হিসাবে শিক্ষক হিসাবে অসীম হলেও নাট্য-প্রযোজক হিসাবে পাষাণে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি বাঙ্গলার রঙ্গালয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

তিনি বলেছেন—'যৌবনে শক্তি ছিল অসীম, সাহস ছিল যথেষ্ট, তাই নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস রেখে যতটুকু সম্ভব করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পূর্ণতা লাভ করতে পারি নি, কারণ একার দ্বারা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই পারি নি।'

তিনি অবসর মুহূর্ত্তে পায়চারী করেন আর আবৃত্তি করেন—

"রঙ্গভূমি ভালোবাসি
হৃদে সাধ রাশি রাশি —
আশার নেশায় করি জীবন যাপন'

শিশিরকুমার পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এ কথা আজ সকলেই জানেন। শিশিরকুমার নিজে গর্বভরে বলেন—আমেরিকাতে আমরা অভিনয় করে এসেছি। এ কথা জোর করে বলতে পারি যে, ভারত তথা বাংলার অভিনেতারা অপর দেশের অভিনেতাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

'চাইনীজ-কালচারাল-মিশন' যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁরা বিশেষ করে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার বাসনা প্রকাশ করেন যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধ ক্রমে শ্রীরঙ্গমে 'তথৎ-এ-তাউস' অভিনীত হয়।

১৯৫১ সালের ১৭ই জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যায় পুডভ্কিন ও চেরকাশভ এসেছিলেন 'ষোড়শী' নাটকের অভিনয় দেখতে। শিশিরকুমারের সহজ সরল অভিনয় তাঁদের এতই মুগ্ধ করে যে তাঁরা অভিনয়ের মাঝে সাজঘরে ছুটে আসেন অভিনন্দন জানাতে। সবচেয়ে বড় কথা তাঁরা বলেন—"মস্কো আর্ট থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা ষ্ট্যানিস্লাভস্কীর সমতুল্য আপনি। আপনি যখন কথা বলছেন, তখন আমরা বশীভূত হই। আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন। আরো একবার বলি আপনি একজন বিরাট অভিনেতা।"

আর একটি স্মরণীয় দিন। গত ৫ই ডিসেম্বর মার্কিন নাট্যকার পল এলিয়ট গ্রীণ নাট্যাচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই মিলনকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক মিলন বললেও কিছুমাত্র ভুল হবে না।

এলিয়ট গ্রীণ শিশিরকুমারের প্রখর ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করেন এবং বলেন—'শিশিরকুমার ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতীক।'

শিশিরকুমার বেশ জোরের সঙ্গে বলেন—'চলচ্চিত্রের আবির্ভাব ও সংঘাতের ফলে গত ২০ বছর ধ'রে ভারতীয় নাট্যমঞ্চের অগ্রগতি যদিও স্তিমিত হয়ে এসেছে, তবুও তা পুনরুজ্জীবিত হবেই।'

আর একটি কথা তিনি বলেন যা সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য তা হলো:—'ভারতে নাট্য-কলার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা এখনও [illegible] এখানকার লোক

বিশ্ববিদ্যালয় কিম্বা শিক্ষায়তনে ছাত্রদের নাট্যরচনা শিক্ষা দেওয়া হয় না। নাট্যকলার ভিতর দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার একটা আন্দোলন এদেশে আরম্ভ হয়েছিল ৪২ বৎসর আগে যখন আমি ছাত্র। কিন্তু তাদের অর্থাৎ সে কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবাগীশ মনোবৃত্তির জন্য সেটা চাপা পড়ে যায়। তিনি তাই প্রায়ই বলেন—'বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিন্তু জ্ঞানলাভের অবকাশ নেই। প্রশ্ন-উত্তর, এই প্রশ্ন—এই উত্তর এই নিয়ম বাঁধা। এতে জ্ঞান-লাভ হয় না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। শিশির 'যুগ' কথাটাকে অনেকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। তাঁদের মতে নাট্যজগতে শিশিরকুমার একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্ সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি একা নন, তিনি বহু। এ-যুগের শ্রেষ্ঠত্ব বলতে যদি কেবলমাত্র শিশিরকুমারের একক কৃতিত্বকেই ধরে নিই তবে যুগের প্রতি যেমন অবিচার করা হয়, শিশিরকুমারের প্রতিও তেমনি অবিচার করা হয়। কারণ শিশিরকুমার পৃথিবীর সেইসব অনন্যসাধারণ নাট্য-প্রতিভার অন্যতম যাঁরা শুধু নট-নটী, নাট্যকার সৃষ্টি করেন না, নাট্যজগতের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করেন। শিশিরকুমারের প্রেরণা এবং প্রভাবে বহু সৃজনী-প্রতিভার সৃষ্টি হয়েছে এবং নিজে নট-নটী সৃষ্টি করেছেন বলেই 'শিশির-যুগ' নামটি সার্থক হয়েছে। একের গৌরবে যেমন বহুবচন, বহুর গৌরবে তেমনি একবচন বিধেয়। শিশির-যুগের অঙ্গনে বহু শক্তিমান নটের আবির্ভাব হয়েছে এবং এঁরাই 'শিশির-যুগ'কে সার্থক করেছেন।

সেদিন 'আলমগীরে'র ত্রিশ বছরব্যাপী অভিনয় উপলক্ষ্যে অভিনয়ের পূর্ব্বে শিশিরকুমার পুরো একঘণ্টা ধরে তাঁর অভিনয়-জীবনের সমস্ত ইতিহাস শোনালেন। মানস্বিতার ও বাগ্মিতার মধুর যোগাযোগে সেই একঘণ্টা যেন মুহূর্ত্তে কেটে গেল। উদ্দীপনাময়ী ভাষায় তিনি এই ব'লে শেষ করেন—সকল সভ্যদেশে সরকারী সাহায্যে থিয়েটার গড়ে উঠেছে। এখানেও তা দরকার হবে। বাঙ্গালী জাতি আবার জাগবে—এই কথাটি তিনি বারবার বললেন।

শিশিরকুমার ত্রিশবছর ধ'রে একান্তভাবে নাট্যসেবা ক'রে আসছেন। শিশিরকুমারের নাট্যসেবার ইতিহাস ব্যক্তির ইতিহাস নয়, একটা জাতির ইতিহাস, একটা যুগের ইতিহাস। পরাধীন দেশে, অনগ্রসর দেশে, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে তাঁকে একা সংগ্রাম করতে হয়েছে। যে কোন স্বাধীন দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করলে তাঁর অসাধারণ শিল্প-প্রতিভার সমাদর যে বহুগুণ বেশী হ'ত একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

আমাদের সৌভাগ্য যে তাঁর প্রতিভা আজও অটুট। ২রা অক্টোবর মহাষ্টমীর পুণ্য শুভ এবং মহান তিথিতে তাঁর আবির্ভাব। স্মরণীয় দিনে এই আবির্ভাব যুগের ঘোষণা করেছে।

একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় রবীন্দ্র-শরৎ-শিশির প্রতিভার এরূপ যোগাযোগ কখনই ঘটে না। যাঁরা তার ভাষণ শুনেছেন, বক্তৃতা শুনেছেন তাঁরাই জানেন, যে তাঁর মতো এমন বক্তা বর্ত্তমানে দুর্লভ।

তিনি শতায়ু হ'ন। সুস্থ থাকুন। নাট্যকারকে তিনি বলেছেন—'সবল, নির্ভীক, সাহসী, বলিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি করতে যাতে অভিনেতা সম্পূর্ণরূপে দর্শকদের সামনে রূপদান করতে পারেন। 'যোগেশের' মতো বা 'করুণাময়ের' মতো মেরুদণ্ডহীন চরিত্রের বর্ত্তমানে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। সকলকে এ কথা স্মরণ করতে বলি।'

শিশিরকুমার ভাদুড়ী অভিনীত ভূমিকাগুলি যথাসম্ভব এখানে দিলাম।

আলমগীরে—আলমগীর ও রাজসিংহ; রঘুবীরে—রঘুবীর; চন্দ্রগুপ্তে—চাণক্য; সীতায়—রাম ও শম্বুক; পাষাণীতে—ইন্দ্র ও গৌতম; ভীষ্মে—ভীষ্ম; বিসর্জ্জনে—রঘুপতি ও জয়সিংহ; শেষরক্ষায়—চন্দ্র ও ললিত; জনায়—প্রবীর, নীলধ্বজ, বিদূষক; পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে—ভীম, ব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ, বৃহন্নলা; সধবার একাদশীতে—নিমচাঁদ; ষোড়শীতে—জীবানন্দ; প্রফুল্লতে—যোগেশ, রমেশ; নর-নারায়ণে—কর্ণ; প্রতাপাদিত্যে—প্রতাপ ও রডা; বিল্বমঙ্গলে—বিল্বমঙ্গল; সাজাহানে—সাজাহান

ঔরঙ্গজেব ; বলিদানে—করুণাময়, দুলালচাঁদ ; হারেহাদায় —রুদ্রগিরি ; শংখধ্বনিতে—কেতনলাল ; দিগ্বিজয়ীতে—নাদিরশাহ ; তপতীতে—রাজা ; রমাতে—রমেশ ও গোবিন্দ গাঙ্গুলী , ভ্রমর-এ—গোবিন্দলাল ; বিবাহ বিভ্রাটে —মিঃ সিং ; মুক্তার মুক্তিতে—রতনচাঁদ ; খাসদখলে—নিতাই ; মন্ত্রশক্তিতে—মৃগাঙ্ক ; চিরকুমার সভায়—চন্দ্র, রসিক ; কর্ণার্জ্জুনে—কর্ণ ; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়—নিমাই ; অশোক-এ—অশোক ; রিজিয়াতে—বক্তিয়ার ও ঘাতক ; পুণ্ডরীক-এ—পুণ্ডরীক, মহাপ্রস্থানে—শ্রীকৃষ্ণ ; বিরাজ বৌ-এ—নীলাম্বর ; সরমা-তে—রাবণ ; রীতিমত নাটক-এ —দিগম্বর ; শ্যামাতে—চন্দনক ; যোগাযোগে—মধুসূদন ; অচলায়—কেদার ; বিজয়া-তে—রাসবিহারী, নরেন ; দক্ষযজ্ঞে—দক্ষ ; বৈকুণ্ঠের খাতায়—কেদার ; অভিমানিনীতে —রাজা বীরেন্দ্র সিংহ ; জীবনরঙ্গে—নাট্যাচার্য্য অমরেশ ; উড়ো চিঠিতে—সুনীল ; মায়াতে—দাদামহাশয় ; মাইকেল মধুসূদনে—মাইকেল ; দেশবন্ধুতে—কল্লোল ; বিপ্রদাসে—বিপ্রদাস ; বিন্দুর ছেলে-তে—যাদব ; পরিচয়ে—রায় বাহাদুর ; তখৎ-এ-তাউসে—জাহান্দারশাহ ; মিশর-কুমারীতে—সামন্দেশ।

'সীতা' নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনীর পাত্র-পাত্রী

রাম—শিশিরকুমার
লক্ষ্মণ—৺বিশ্বনাথ
ভরত—তারাকুমার
শত্রুঘ্ন—৺তুলসী বন্দ্যোঃ
বাল্মিকী—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বশিষ্ঠ—৺ললিত লাহিড়ী
লব—জীবনকুমার গাঙ্গুলী
কুশ—ননীগোপাল সান্যাল পরে রবীন্দ্রমোহন রায়
শম্বুক—৺যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
দুর্ম্মুখ—৺অমলেন্দু লাহিড়ী
সীতা—প্রভা
শূদ্রাণী—নিরুপমা পরে চারুশীলা

'আলমগীর' যেদিন অভিনীত হয় সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস গ্রেপ্তার হ'ন। কিন্তু সংবাদ আসে—অভিনয় চালিয়ে যেতে।

'রঘুবীর' যেদিন অভিনীত হয় মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হ'ন। গান্ধীজীর অহিংস-নীতি তখন প্রবল আর 'রঘুবীরে' দেখানো হয়েছে অহিংসার দ্বারা দেশকে স্বাধীন করা যায় না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, দিঘাপাতিয়ার মহারাজা শিশিরকুমারকে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণের আভাস দেন কিন্তু দেশবন্ধু বা দিঘাপতিয়ার মহারাজার সে-বাসনা পূর্ণ হয় নি তাঁদের আকস্মিক মৃত্যুতে।

আমেরিকাতে 'সীতা' নাটক অভিনীত হচ্ছে সেখানকার বিরাট রঙ্গমঞ্চে যেখানে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহে মার্কিনদেশীয় দর্শকে পরিপূর্ণ তাই দেখে 'দুর্ম্মুখ' রূপী শীতল পাল ভীত হয়ে পড়েন। "মহারাজ"—বলে তাঁর মুখে আর কথা সরে না। শিশিরকুমা'র 'রাম' সেজে সীতাকে বাতাস করছেন। ব্যাপারটা বুঝলেন। বললেন—'রে, দুর্ম্মুখ ভয় নাই, শ্বেতাঙ্গ যবনের দেশে কেহ বুঝিবে না মোদের ভাষা, মোর নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া যাও।'

শিশিরকুমারকে চলচ্চিত্র সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হ'লে পরিষ্কারভাবে বলেন যে, তিনি ষ্টেজের লোক, সিনেমার জন্য তিনি ন'ন।

[এই রচনায় উপাদান সংগ্রহে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন অশোক ভাদুড়ী]

ফুটবল রীলে

শ্রীবিরূপাক্ষ

বছর বিশেক কি তারও দু'এক বছর আগেকার কথা বলছি। কলকাতা বেতার কোম্পানীর খেয়াল হ'ল ফুটবল খেলার ধারা-বিবরণী প্রচার করতে হবে। বেতারের প্রোগ্রাম পরিচালক নেপেন মজুমদার মহাশয় ফুটবল খেলা দেখতে গেলে ষ্টেশনে থাকবে কে—অতএব তাঁর দুই সহকারী রাইচাঁদ বড়াল ও বীরেন ভদ্র মহাশয়ের ওপর ভার পড়লো ফুটবল মাঠে গিয়ে সব ব্যবস্থা করবার।

রাইচাঁদ সঙ্গীতজ্ঞ হলেও খেলা বোঝেন ভাল কিন্তু ব'কতে একেবারেই নারাজ আর ভদ্র মহাশয় ব'কতে দড় হলেও খেলা সম্বন্ধে বলতে গেলেই একেবারে দস্ত কচমড—কিচ্ছু বোঝেন না। কিন্তু রীলের আয়োজন হয়ে গেছে, তখন ত আর পেছনো চলে না, দুই মহারথীকেই যেতে হল।

সেই প্রথম কলকাতা ষ্টেশন থেকে ফুটবল রীলে।

মোহনবাগান বনাম ক্যালকাটা ক্লাবের খেলা—মাঠে লোক ধরেনা। চতুর্দিকে শুধু অগণিত কাল মাথা। ক্যালকাটা ক্লাবের ইউরোপীয় দর্শকদের ঠিক মাথার ওপরের গ্যালারীতে বেতার কোম্পানীর লোকদের বসবার জায়গা হয়েছে—আলাদা কোন কেবিন তখন ছিল না এবং পরিকল্পনাও হয়নি। সেই প্রথম পরীক্ষা কিনা?

যাই হ'ক শ্রোতাদের খেলা বোঝবার সুবিধের জন্যে 'বেতার জগতে' মাঠের একটা নক্সা এঁকে সেটাকে আটটা লাইন দিয়ে ভাগ ক'রে নম্বর দিয়ে দেওয়া হল। বল কোন্ জায়গায় আছে সেটা সেই চৌকো ঘরের নম্বর দেখে বলে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। কোন দিকে ত্রুটী কিছুই নেই।

ফুটবল মাঠে মাইক্রোফোন বসিয়ে তার সামনে বলে যাবার ব্যবস্থা সে সময় কিছু ছিল না। টেলিফোনের যন্ত্রের মত একটা যন্ত্র মুখের সামনে থাকতো—যন্ত্রটি মুখের সামনে ঝুলিয়ে মাথা আর গালের সঙ্গে বেঁধে দেবার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করে দিয়ে গেলেন। সে এক কিম্ভুত-কিমাকার ব্যবস্থা!

বেতারের সে সময়কার বড় সাহেব ছিলেন বদরাগী ষ্টেপলটন্ সাহেব। ভদ্রলোক তাঁর সহকারীদের যেমনি ভালবাসতেন তেমনি খিঁচুতেন। তিনি এসে ভদ্র মহাশয়কে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, যে খবরদার বেশি চেঁচিও না যেন, চতুর্দিকে সাহেব মেমরা রয়েছেন, ওঁরা বিরক্ত হতে পারেন।

ভদ্র মহাশয় মাথা নেড়ে বললেন, সে বিষয়ে ভেবনা সাহেব আমি চুপি চুপিই বলবো। মনে মনে ভাবলেন, চেঁচামেচি করবার জন্যই ত আসা হ'ল, এ আবার কি হুকুম! যাই হ'ক প্রতিবাদ করে লাভ নেই···এখন মুখের সামনে যন্ত্র আঁটা হয়ে গেছে। সাহেব মেমেরা বারবার ওপর দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন, আর মুচকে মুচকে হাসি। সঙ্কোচ জিনিষটি ভদ্র মহাশয়ের কিঞ্চিৎ কম হলেও সাহেবদের সেই অবিরত চাউনি আর মেম সাহেবদের হাসি অসহ্য হয়ে উঠতে লাগলো। তখনো খেলা আরম্ভ হয়নি। সংয়ের মত পট্টি বেঁধে বীরেনবাবু বসে আছেন।

রাইচাঁদবাবু পাশে বিরাট বপুখানি নিয়ে অস্বাভাবিক একটা গাম্ভীর্য্য নিয়ে বসে আছেন।

বীরেনবাবু বললেন, ভাই রাই, তুমি খেলোয়াড়দের নামগুলো বলে যাও ভাই, আমি ত' কাউকে চিনি না ততক্ষণ যন্ত্রটা তোমার কানে দিই।

রাইবাবু সিল্কের রুমালে গোঁফটা মুছে স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি নামগুলো বলছি, তুমি বলতে সুরু কর।

বীরেনবাবুর উদ্দেশ্য—একবার রাইচাঁদ মুখের সামনে সেই ঘোড়ার ঘাসের থলির মত যন্ত্রটা এঁটে বসেন। তাই গম্ভীরভাবে কান থেকে যন্ত্রটি খোলবার আয়োজন করতে করতে বলে উঠলেন, আহা ততক্ষণ চালাও না। খেলা চললে বল কোথায় যাচ্ছে, [illegible]রে আমি ঠিক বলবো'খন।

রাইচাঁদ চটে গেলেন, খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, দেখ্ বীরেন ও রকম করলে মাইরি আমি এখান থেকে উঠে যাব বলছি।

বীরেনবাবুও তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, আরে বাবু রীলের জন্যে কি শুধু একা আমিই দায়ী। তবে তুমি এলে কেন ?

রাইচাঁদ তাঁর মুখের দিকে কটমট করে চেয়ে বললেন, আমি পাশে থেকে বলছি ত' !

বীরেনবাবু বললেন, পাশে থেকে বলা আর মুখের সামনে যন্তর বসিয়ে বলা এক হ'ল ? শ্রোতাদের সুবিধের দিকে একটু লক্ষ্য রাখা চাই ত !

রাইচাঁদের বিরক্তি আর উষ্মা আরও বেড়ে গেল। দপ্ করে বাক্স [illegible] দোরে থাকু সুবিধে, [illegible] মোড় [illegible] লোয়াড়রা বেরিয়ে [illegible]।

পাশেই বেতারের কন্ট্রোল বিভাগের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবার জন্য ফোন। সব সেই গ্যালারির ওপরে।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং !

ষ্টার্ট !

বীরেনবাবুর মাইক্রোফোন সজীব হয়ে উঠলো। তিনি সুরু করলেন, নমস্কার ! এখন আমরা কলকাতা ফুটবল খেলার মাঠ থেকে রীলে আরম্ভ কচ্ছি। আজ মোহনবাগানের সঙ্গে ক্যালকাটা ক্লাবের সেমিফাইনাল রীলে—থুড়ি—খেলা হচ্ছে। মাঠে দু দিক থেকে দু দল এসে দাঁড়িয়েছেন। ও রাই, নামগুলো বলুনা ভাই !

রাইচাঁদ তন্ত্রধারকের মত নাম বলতে সুরু করলেন, বীরেনবাবু পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন। সাহেব মেমেদের মধ্যে ঈষৎ বিরক্তির সঞ্চার হতে লাগলো। পাশে বসে ভ্যাজর ভ্যাজর করলে এ সময় কার আর পুলক জাগে বলুন না ? যাই হ'ক, এ পর্য্যন্ত বেশ নির্ব্বিবাদে চললো। তার পরই হ'ল বিপদ !

বীরেনবাবু রামের ঘাড়ে শ্যাম এবং শ্যামের ঘাড়ে রামকে চাপিয়ে প্রাণভরে বেভুল ব'কে যেতে লাগলেন। আর রাইবাবু মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে উঠলে গুঁতো দিয়ে বলতে সুরু করলেন, দূর, কি সব ভুল বল্‌ছিস।

গুঁতো দিতেই বীরেনবাবু যন্ত্রে হাতটা চাপা দিয়ে রাইবাবুকে বলতে থাকেন, বেশ বাবা তোমার মুখে এটা এঁটে দিচ্ছি, তুমিই কারেক্ট করে বল।

রাইবাবু শান্ত হয়ে যান একেবারে। পাছে বীরেন মুস্কিলে ফেলে ভেবে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলে ওঠেন, থাক্ থাক্ এইবার ঠিক করে বল।

বীরেনবাবু পুনরায় আরম্ভ করেন, মাঠে খেলা দেখার

জন্যে আজ অসম্ভব ভীড় হয়েছে। বল দ্রুতগতিতে এক-বার এর পায়ে লেগে ওর পায়ে গিয়ে লাথি খাচ্ছে! ঐ বল চলেছে ছ'নম্বর ঘর, ছ নম্বর, ক্যালকাটার গোলকীপার ছ'নম্বর থেকে বল শুট করে ন'নম্বরে পাঠিয়ে দিলে।

রাইবাবু এই সময় বীরেনবাবুর জামার হাতা ধরে টেনে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, দুর ও বুঝি ক্যালকাটার গোলকীপার? ও সেণ্টার ফরওয়ার্ড!

বীরেনবাবু তৎক্ষণাৎ ভ্রম সংশোধন করে বলে উঠলেন, মশাই মাফ করবেন ইতিপূর্ব্বে ঐ যে ছ'নম্বর থেকে ন'নম্বর ঘরে বল গেল সেটা শুট করেছিলেন ক্যালকাটার সেণ্টার ফরোয়ার্ড।

ইতিমধ্যে চার পাঁচজন বল শুট করতে করতে এগিয়ে গেছেন হঠাৎ মোহনবাগানের এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে বল নিয়ে ঠোকাঠুকি করতে করতে কি রকম ফাউল হয়ে গেল।

বীরেনবাবু বলে যেতে লাগলেন, সাত নম্বর ঘরে একটা ধাক্কাধাক্কি হয়ে গেল। রেফারী হুইসিল দিতেই খেলা বন্ধ। এইবার একজন বল মারছে—বোধ হয় সেণ্টার ফরোয়ার্ড।

—ধ্যেৎ! হাফ ব্যাক!—রাইবাবু ভুল শুধরে দেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—হাফ ব্যাক! শুট করেছে, বল তিন নম্বর চার নম্বর পেরিয়ে একেবারে ছ'নম্বর ঘরে—দিলে দিলে দিলে। ঐ যাঃ—এঃ একেবারে রগ ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। নাঃ মোহনবাগানের আজ খুব বরাত খারাপ দেখছি। মাঠে যাচ্ছেতাই করে সবাই চেঁচাচ্ছে। যাক্ আবার সুরু হল।

খেলা দেখতে দেখতে ও বলতে বলতে কখন যে গলার স্বর পঞ্চমে চড়েছে তা বীরেনবাবুও টের পান নি। ওদিকে সাহেব মেমেরা ক্ষেপে আগুন। নিজেদের ভাষায় বক্তার উদ্দেশ্যে তাঁরা যে ভাল ভাল বিশেষণ প্রয়োগ করছেন তা তাঁদের মুখভঙ্গী দেখেই বেশ বোঝা গেল। একটি মেম শেষ পর্য্যন্ত আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললেন

Would you speak softly, Babu? বাবু একটু আস্তে কথা বলবেন কি?

বীরেনবাবু বিরক্ত হয়ে সে দিকে চাইলেনও না জবাবও দিলেন না। রীলে করা হচ্ছে—আস্তে কি বলা হবে?

হাফ-টাইমের সময় বড় কর্তা ষ্টেপলটন্ ছুটে এসে বললেন, **Mr. Bhadra, Don't shout please!** দয়া করে চেঁচিও না। সাহেব মেমেরা বলছে ভবিষ্যতে এখানে আর আমাদের বসতেই দেবেনা।

বীরেনবাবু বললেন, সাহেব আস্তে বললেও যে বিপদ ওদিকে কন্ট্রোলের লোকেরা যে পঞ্চাশবার বলছে গলা তুলুন মশাই, নইলে, কিছু শুনতে পাচ্ছি না—গাঁজা খেয়ে ঝিমুচ্ছেন নাকি?

সাহেব নিজেই তখন ফোন ধরলেন। কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে কথা বলে বোধ হয় বীরেনবাবুর কথার সত্যতা যাচাই করে নিলেন। শেষ পর্য্যন্ত রফা হলো—মিডিয়ম আওয়াজ দাও!

পুনরায় খেলা সুরু হল।

এবার বীরেনবাবু সকলকে সন্তুষ্ট রাখতে লগলেন। গোল হব হব সময়ে চেঁচান আর বাকী সময় প্রায় বিড় বিড় করতে থাকেন। রাইচাঁদের আর সাড়াশব্দ নেই খেলা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে এই এই···হায় হায় হায় ···চু···চু করে চলেছেন।

বীরেনবাবু ধাক্কা দিয়ে যদি সে সময় বলে ওঠেন, ও রাই কি হচ্ছে, একটু বলে দাও!

রাইবাবু খেলোয়াড়দের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে থাকতে বীরেনবাবুকে হাতের কনুয়ের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বিরক্তভাবে বলে ওঠেন, আঃ চুপ কর না—এ সময়···

কথাটা আর শেষ হয় না। যেন বীরেনবাবু চুপ না করাতেই মোহনবাগানের খেলোয়াড় বলটা প্রতিদ্বন্দ্বীর গোলে ঢোকাতে পাচ্ছে না!

'চুপ কর' শুনে বীরেনবাবু চটে বলে উঠলেন, চুপ করবো কি? [illegible] লোক [illegible] হাঁ করে বসে আছে যে [illegible] ছে? [illegible] শুনবে কি!

ঠিক এমনি সময় ক্যালকাটার গোলের মুখে দড়াম করে মোহনবাগানের কে একজন বল মারলে আর বীরেনবাবু চীৎকার করে বলে উঠলেন—হ্যাণ্ডবল্!

যেমনি হ্যাণ্ডবল্ বলা আর অমনি রাইচাঁদ থেকে আরম্ভ করে গ্যালারীশুদ্ধ সাহেব মেম হেসে লুটোপুটি।

বীরেনবাবু ভাবলেন, তাইত এতে হাসির কথাটা কি হল? রাইচাঁদকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল বল দেখি রাই!

রাইবাবু হেসে বলে উঠলেন, হ'ল তোমার মুণ্ডু! গোলকীপার বল হাতে ধরলে সেটা কি হ্যাণ্ডবল হয়রে গাধা?

বীরেনবাবু বললেন, তাই নাকি! কিন্তু এর আগে যে কতকক্ষেত্রে······

তাঁর আলোচনা শেষ হবার আগেই বাঁশি বেজে উঠলো···ফুর্‌র্!

খেলা শেষ হয়ে গেল সেদিনের মত। দু পক্ষই নির্গোল। কিন্তু গোল বাধলো অফিসে গিয়ে। রাইচাঁদ রেগে নেপেনবাবুর ঘরে গিয়ে অভিযোগ পেশ করে বললেন, নেপেন দা, দেখুন সত্যি যদি ফুটবল, ক্রিকেট রীলে করাতে চান তাহলে একজন ভাল লোককে দিন। বীরেনের মত এরকম আহাম্মুখকে আমার সঙ্গে পাঠাবেন না। যা খুশী বলে যায়—খেলার 'ক' 'খ'-ও জানে না—ছিঃ ছিঃ, একেবারে অপ্রস্তুতের একশেষ!

বীরেনবাবুও বলে উঠলেন, মশাই, রাইয়ের মত ভ্যাবাচাকা-মার্কা লোককে নিয়ে রীলে করতে পাঠাবেন না কখনও আমার সঙ্গে। বাবু একেবারে সাহেব মেমদের মুখ দেখে লজ্জায় মরে গেলেন। একটা জিনিস ত' আমায় বললেই না উপরন্তু কেবল বলে, চুপ কর্, চুপ কর্! সিম্পলি ডিস্‌গাষ্টিং!

দুটি আঙুলের অগ্রভাগে সিগারেটটি চেপে ধরে টানতে টানতে সহাস্যমুখে নেপেনবাবু বলে উঠলেন, তাই নাকি! আচ্ছা, আজ ত' তাহলে রীলেটা শুনলে হ'ত হে!

ইতিমধ্যে ষ্টেপলটন সাহেব চুরুট-মুখে বেতার অফিসে ঢুকেই সরাসরি নেপেনবাবুর ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, **Mr. Mazoomder, Did you listen to our football relay?** (মিঃ মজুমদার, আমাদের ফুটবল রীলে শুনেছিলে?)

একগাল হেসে স্বচ্ছন্দচিত্তে মজুমদার মশাই বলে উঠলেন, ওঃ! সিম্পলি চার্মিং! (সত্যি, চমৎকার!)

মণিপুরী নৃত্যের ইতিহাস

গুরু আতম্বা সিং

[বর্তমানকালের মণিপুরী নৃত্যকলায় গুরু আতম্বা সিং হলেন প্রবীণতম ও শ্রেষ্ঠ ধারক এবং বাহক। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যশিক্ষার প্রবর্তন সুরু করেন তখন গুরুজীই ছিলেন তাঁর প্রধান সহযোগী এবং উৎসাহী উদ্যোগী। বর্তমানে তাঁর বয়স একাত্তর বছর। বহু তথ্যপূর্ণ এই রচনাটিতে মণিপুরী নৃত্যের ইতিহাস ও তার বিভিন্ন ধারা নিয়ে সরস আলোচনা করেছেন।]

মণিপুররাজ ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকালে তদীয় মাতুল খেলেই লুংলা তেলহেইবা—মৈরাং নামক স্থানের রাজা ছিলেন—মৈরাং অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। মাতুল একদিন মহারাজের কাছে আরও কিছু জায়গা চাইলেন—মহারাজ বিনা আপত্তিতে কিছু জায়গা ছেড়ে দিলেন। কিছুদিন পর পর আবার কিছু জায়গা চাইলেন সেবারও মহারাজ কোন আপত্তি করলেন না—কিন্তু তৃতীয়বার মহারাজ দিতে আপত্তি করলেন—তখন মাতুল ব্রহ্মদেশের রাজার সাহায্য নিয়ে মণিপুর আক্রমণ করলেন—মহারাজ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে আসাম রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন রাণীদের সংগে নিয়ে। দুই পুত্র মধুচন্দ্র ও লাবণ্যচন্দ্র বন্দী

গুরু আতম্বা সিং

হলো শত্রুর হাতে। মণিপুরবাসী মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রকে জানতো ঈশ্বর বলে—রাজার অভাবে সারা মণিপুর হলো ম্রিয়মান।

আসামের রাজা স্বর্গদেব আশ্রয় দিলেন মহারাজকে, কিন্তু মাতুলের কাছ থেকে এলো চিঠি—মহারাজকে তাড়িয়ে দিতে নতুবা মেরে ফেলতে। কারণ, ভাগ্যচন্দ্র অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক, তাকে আশ্রয় দিলে আসাম রাজ্যের অকল্যাণ হবে। আসামরাজ মন্ত্রীদের সংগে বসলেন পরামর্শ করতে। মন্ত্রীদের একজন বললেন—আমরা শুনেছি মণিপুররাজ ঈশ্বরতুল্য—যদি তাই হয় তবে আমাদের যে পাগলা হাতী আছে, তার কাছে মহারাজকে পাঠানো হোক, উনি যদি সত্যি ঈশ্বরতুল্য হন তবে পাগলা হাতী ধরতে পারবেন, অন্যথায় হাতীর পায়ে প্রাণ দেবেন। মহারাজকে জানানো হলো হাতী ধরবার কথা এবং সময় দেওয়া হলো তিন দিন—মহারাজ মহারাণী মনের দুঃখে এই অগ্নি-পরীক্ষার কথা জানালেন অন্তরের দেবতা গোবিন্দজীকে। ভক্তের আহ্বান পৌছলো ভক্তের ভগবানের কাছে। আগের দিন রাত্রে স্বপ্নযোগে মহারাজকে দেখা দেন গোবিন্দজী এবং অভয় দিয়ে বলেন—'রাজা তোমার কোন ভয় নেই তুমি দক্ষিণ হস্তে মালা জপ করবে এবং বাম হস্তে [illegible] হাতীর কাছে যাবে, তাহলে [illegible] তোমার বশ [illegible] তারপর তুমি আসামের রাজার সাহায্য নিয়ে [illegible]যে যাবে এবং মাতুলকে

মণিপুরী 'বসন্ত-রাস' নৃত্যে বৃন্দার ভূমিকায় একটি বিশেষ নৃত্য-ভঙ্গীমায় রেবা দত্ত

দিলো। ভাগ্যচন্দ্র একেবারে মাতুল-রাজার সম্মুখীন হ'য়ে এক আঘাতেই তাকে করলেন দ্বিখণ্ডিত এবং নিজের পরিচয় দিলেন সবার কাছে। প্রজারা তাদের রাজাকে ফিরে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলো। ভোগবিলাসের ভিতর দিয়ে দিন কেটে যায়—মহারাজ ভুলে গেলেন গোবিন্দজীর কথা। আবার একদিন স্বপ্ন-যোগে গোবিন্দজী দেখা দিলেন মহারাজকে এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন পূর্ব কথা। পরদিন প্রভাতে মহারাজ লোকজন-সহ গেলেন নোমাইজীন পাহাড়ে—কিন্তু সারাদিন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেলনা কাঁঠাল

পরাস্ত ক'রে নিজ রাজ্য পাবে—কিন্তু আমার বিগ্রহ তৈরী ক'রে তুমি রাস-উৎসব করবে শ্রীবৃন্দাবনের মতো। তুমি ভাল করে আমার রূপ ছাখো, মণিপুরের কাছে 'নোমাই-জিন' পাহাড়ে 'কাইনা' নামক স্থানে একটি কাঁঠাল গাছ দেখতে পাবে, সেই কাঁঠাল গাছ কেটে আমার এই মূর্ত্তি তৈরী ক'রে প্রতিষ্ঠা ক'রবে।' পরের দিন সর্ব্বসমক্ষে যখন মহারাজ পাগলা হাতীর সামনে গেলেন—তখন হাতী শুঁড় মাটিতে লাগিয়ে এবং সামনের দুই পা নত ক'রে মহারাজকে প্রণাম জানালো এবং মহারাজ তার পিঠে উঠে ব'সে চামর ব্যজন করতে লাগলেন এবং চারিদিক থেকে জয়ধ্বনি উঠলো—ভগবান—মহারাজ ভগবান।'

আসামের রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তাঁর সেই ব্যবহারের জন্যে। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র কিছুদিন পর ফিরে গেলেন মণিপুরে এবং নাগাবেশে বাস করতে লাগলেন রাজা-রাণীর কাছে—একদিন নাগাবেশে মাতুল রাজার সংগে দেখা করতে গেলেন—প্রহরীরা বাধা দিলো। [illegible] বললেন, যে, [illegible] করতে যাবেন এবং রাজাকে উপঢৌকন [illegible] প্রহরীরা

গাছের সন্ধান। মহারাজ মনের দুঃখে লোকজনদের বললেন—'যদি কাঁঠাল গাছের সন্ধান না পাই তবে আমি রাজধানীতে ফিরে যাবো না।' কাতর প্রার্থনা জানালেন গোবিন্দজীকে—আবার রাত্রে স্বপ্নে দেখতে পেলেন গোবিন্দজীকে। 'কাল প্রভাতে "কাইনা" নামক স্থানে কাঁঠাল গাছ দেখতে পাবে'—গোবিন্দজী বললেন মহারাজকে এবং সেই সঙ্গে রাস-নৃত্যের ভংগী-ও দেখালেন

গুরু য়ায়ুবী সিং—মৃদঙ্গ-বিশারদ—মণিপুরী নৃত্যে তাঁর মৃদঙ্গ সঙ্গং প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সহায়ক

তাঁকে। তার পরের দিন প্রভাতে মহারাজ কাইনা-য় গিয়ে কাঁঠাল গাছ দেখলেন এবং তিনখণ্ড ক'রে সেখান থেকে নিয়ে এলেন। এর এক খণ্ড কেটে গোবিন্দজীব মূর্ত্তি তৈরী করে প্রতিষ্ঠা করা হলো এবং শহরে যারা বিখ্যাত গায়ক, বাদক ও পণ্ডিত লোক ছিলেন তাঁদের ডেকে বলা হলো রাসলীলার কথা।

ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের মাতা মাইচলা কুমুদিনী—মহারাজ যার কাছে ভংগী কথা বলেছিলেন—উনি ওস্তাদদের সাহায্যে প্রথম ভংগীর ও ছেলেদের ভংগী তৈরী করেন এবং রাজবাড়ীর মেয়েদের শিখিয়ে দেন। সবই হলো, কিন্তু গোবিন্দজী একা, রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকা না হ'লে রাস হবে কি ক'রে—সেই সময় মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের কন্যা—অপূর্ব্ব সুন্দরী ভক্তিমতী "সিজালায়রেবী"কে রাধা ক'রে গোবিন্দজীর পার্শ্বে দাঁড় করানো হয় এবং রাস-উৎসব সম্পন্ন হয়। সেই থেকে গোবিন্দজীর পূজা-অর্চ্চনার ভার পড়লো রাজকন্যার হাতে। রাজকন্যাও গোবিন্দজীকে স্বামী জেনে নিজেকে বিলিয়ে দেয় তার পায়ে। মণিপুরে প্রবাদ আছে যে—রাজকন্যার বিছানায় নাকি কোন কোন দিন গোবিন্দজীর চূড়া-ধরা-বাঁশী ইত্যাদি পাওয়া যেতো। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত মণিপুরে "মহারাস" প্রধান উৎসবরূপে চলে আসছে। মণিপুরের বিখ্যাত নৃত্য গুরুদের মধ্যে গুরু মুক্তার সিং ছিলেন সর্ব-গুণে গুণী। তাঁর পুত্র "থোক্ চোং আংগাহাল" এবং ঐ সময় আরও কয়েকজন গুরু ছিলেন—"গুরু হুই ডুম্ ঝুল মচা", "হুই ড্রুগ রুদ্র সিং", "থুমুলম্বা"—এঁরা বর্ত্তমানে ইহ-জগতে নেই তবে এঁদের ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন এখনও জীবিত আছেন। গুরু আমুবি[illegible] সিং উদয়শঙ্করের সংগে [illegible] ৭২ বছর বয়[illegible]। আমি খুব ছোট বেলায় [illegible] করেছি [illegible] চোং আংগাহাল-এর

'বসন্ত-রাস' নৃত্যে শ্রীরাধার ভূমিকায় মাধুরী ঘোষ

'বসন্ত রাস' নৃত্যে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে নীলিমা দাস

মণিপুরী রাস নৃত্যের আর একটি ভঙ্গিমায় গীতা ঘোষ

কাছে। তারপর বড় হ'য়ে উপরোক্ত আরও তিনজন গুরুর কাছে নাচ, গান ও মৃদঙ্গ শিক্ষা করেছি। আমার বয়স বর্ত্তমানে ৭১ বছর—আমার জীবনের ১৫ বছর কবিগুরুর সংগে কাটিয়েছি শান্তিনিকেতনে। যাক্ বর্ত্তমানে মণিপুরে আরও ২।৩ জন বয়োবৃদ্ধ গুরু আছেন—আমার গুরুভাই এবং সঙ্গী য়্যামুবী সিং বিখ্যাত "গুরু ওয়াহেম্বম্ চোওবা খোংমা"-এর কাছে মৃদঙ্গ শিক্ষা করেছে ও গুরু আংগাহাল ও গুরু লেম্ ডাং আংগুতোর ও আমার কাছে নৃত্য শিক্ষা করেছে—বর্ত্তমানে সে মণিপুরের বিখ্যাত মৃদঙ্গ-বাদকদের মধ্যে অন্যতম।

মণিপুরী নাচের মধ্যে ভংগী দুই প্রকার—ছেলেদের ও মেয়েদের। বৃন্দাবনপারেংও দুই প্রকার। খুরুং পারেং শুধু মেয়েদের নাচ—এই পাঁচ রকম নাচই আসল এবং প্রথম রাস থেকে আজ পর্য্যন্ত চলে আসছে—ভংগী-নাচের বোল বা নাচের টেকনিক সকল ওস্তাদেরই এক। অন্যান্য নাচের কিছু কিছু তফাৎ আছে। প্রবাদ আছে, ভংগী-নাচ ভুল শেখালে বা ভুল নাচলে পাপ হয়। এ ছাড়া লায় হার ওবা, খুবাক ইসে, পুং চালন, থাম্বাল চোংবা নানা ধরণের নাচ আছে। মণিপুরী নাচ-গানও বোলের সংগে হয়। [illegible] আসল ৫টি নাচ জানলে বোল তৈরী করে অন্য নাচ তৈরী করা যায় এবং গুরুরা তাই করেন। মণিপুরী নাচে তাণ্ডব ও লাস্য আছে—ছেলেদের নাচ তাণ্ডব উচ্ছল ক'রে অর্থাৎ লাফিয়ে করতে হয়—কিন্তু মেয়েদের নাচ লাস্য—তাদের নাচে বেশী লাফানো উচিত নয়।

বর্ত্তমানে মণিপুরীর নামে নানা রকম মেশানো নাচ চলছে—আমার মতে যাঁরা শিক্ষক তাঁদের এ সব করা উচিত নয়—তাতে মণিপুরী নাচের সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে আসল নাচ লুপ্ত হয়ে যাবে।

[আমার প্রিয় ছাত্রী ও ছাত্র 'নৃত্যভারতী'র প্রতিষ্ঠাত্রী ও পরিচালক নীলিমা দাস ও প্রহ্লাদ দাস আমার কথাকে বাংলায় সাজিয়ে দিয়েছে—তাদের আমি জানাচ্ছি আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।—লেখক।]

এম পি প্রোডাকসন্সের হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল চিত্র
'সাড়ে চুয়াত্তর'-এর নায়িকা নবাগতা
সুচিত্রা সেন ঃ ছবিখানি বর্ত্তমানে দ্রুত সমাপ্তিমুখে

ত্থমুক্ত 'ঊষাকিরণ' ছবিতে নিম্মি

উপন্যাসের রূপান্তর

বিপিনবিহারী রায়

আমি একজন সাধারণ "দর্শক", মাঝে মাঝে একটু আনন্দ পাবার জন্যে ঘণ্টা ২।৩ সময় কাটাতে যাই ছবি দেখে। কিন্তু নতুন ছবি দেখতে যাবার আগে, অর্থাৎ টিকিটের দামটা খরচ করে ফেলবার আগে, একবার পত্র-পত্রিকাগুলি পড়ে দেখি, তাঁরা ছবিখানা সম্বন্ধে কিরকম মন্তব্য করেছেন—উদ্দেশ্য যে, আমার নগদ পাঁচ সিকে বাজে ছবি দেখে অপব্যয় না হয় (অবশ্য এ প্রবন্ধে আমি কেবলমাত্র বাংলা ছবির কথাই বলছি)। কিন্তু এখানেই হয় মুস্কিল, যতই কাগজ পড়তে থাকি ততই মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হতে থাকে। কারণ, দেখি যে একই ছবির সাতখানা কাগজে সাত রকম সমালোচনা বেরিয়েছে, এমনকি, যে ছবিকে একটা কাগজ উচ্চ প্রশংসা করেছে, অপর একটা কাগজ তার যথেষ্ট নিন্দা করেছে। অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে, যদি সত্যিকার উৎকৃষ্ট ছবি হয় (দুর্ভাগ্য বাংলা দেশে বাংলা ছবি সে পর্য্যায়ে পড়ে হয়ত বছরে দু'বছরে একটা) তাকে সকল কাগজই প্রশংসা করে। সাধারণতঃ কিন্তু দেখতে পাই সমালোচনা-বৈচিত্র্য, যাতে আগেই বলেছি আমার মত লোকের ধাঁধা লেগে যায়। অবশ্য নতুন ছবির উৎকর্ষের মান নির্দ্ধারণ করবার আর একটা উপায় আছে, সমালোচকেরা যাই বলুক, যে ছবি এক, দুই বা বড় জোর তিন সপ্তাহ দেখানোর পর উঠে যায়, তাকে বাজে ছবি বলেই ধরে নেওয়া চলে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এ-উপায়ের ওপর নির্ভর করে থাকা চলেনা, কারণ তাহলে নতুন ছবি দেখতে অন্ততঃ একমাস অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

ব্যাপারটা কেন এমন হয়? চিন্তা করে দেখে এইটুকু বুঝেছি যে, এদেশে চিত্র-সমালোচনার বা চিত্র-সমালোচকের কোন নির্দ্ধারিত মানদণ্ড নেই, সমালোচনাটা হয় একেবারে subjective অর্থাৎ ব্যক্তিগত, objective অর্থাৎ বস্তুগত সমালোচনার কোন মানদণ্ড নেই। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলি। চিত্র-বিষয়ক প্রত্যেকটি পত্রিকার একজন বা ততোধিক লোক আছেন, তাঁরা নতুন ছবি প্রদর্শিত হলেই দেখে এসে একটা সমালোচনা লিখে ফেলেন। সেটা সেই ব্যক্তির শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি অনুযায়ী হয়, এই শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদিরও কোন নির্দ্দিষ্ট মান নেই, কাজেই কারো দৃষ্টিভঙ্গী অন্যের সঙ্গে মিলবে না। আগেই বলেছি, যদি ছবি খুব ভালো হয় তার বেলা অন্য কথা, রাম, শ্যাম, যদু সকল সমালোচকই প্রায় এক ধরণের সমালোচনা লেখেন। কিন্তু "সাধারণ" পর্য্যায়ে যেসব ছবিকে ফেলা যায়,—এবং সেই রকম ছবিই প্রতি মাসে গড়পড়তা তিনটে ক'রে "মুক্তি" পায়—তার সমালোচনা নানা ধরণের হয়ে থাকে, কেউ বা বলে ভাল, কেউ বা বলে মন্দ, কেউ বলে মাঝারি, আবার কেউ বা ভাল, মন্দ বা মাঝারি স্পষ্ট করে কোনটাই না বলে এমন বাক্যজাল সৃষ্টি ক'রে সমালোচনা লেখেন, যার অর্থ আমার মত সাধারণ দর্শকের পক্ষেও বুঝতে পারা দুঃসাধ্য। কতকগুলি বড় বড় সাধারণের দুর্ব্বোধ্য টেক্‌নিক্যাল কথা দিয়ে এইসব সমালোচনা এমন ধোঁয়াটে করে লেখা হয়, যার অর্থ এ-ও হয়, ও-ও হয়। যদি কোন সমালোচক লেখেন যে 'অমুক এই ছবিতে উৎকৃষ্ট অভিনয় করেছেন, কিন্তু তাঁর কথা আগাগোড়াই এত অস্পষ্ট যে প্রায় কিছুই বোঝা যায় না" তাহলে, পাঠক, আপনি কি বুঝবেন? আমি সে ছবিটি দেখেছিলাম এবং এই বুঝেছিলাম যে, যেহেতু উক্ত অভিনেতা একজন "নামকরা" ব্যক্তি, তাঁর "অভিনয়" খারাপ হয়েছে এ কথা বলবার সাহস সমালোচকের ছিল না, তাই ওই রকম পরস্পর বিরোধী কথা লিখেছেন, যার কোন মানে হয় না। "অপারেশন সাকসেসফুল কিন্তু রোগী বাঁচলো না"—এ সেই রকম কথা নয় কি?

সকল [illegible] চলচ্চিত্র সমালোচনা [illegible] একটি প্রবন্ধে

বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা সম্ভব নয়, সেজন্য আমি এর একটিমাত্র দিক নিয়ে আলোচনা করবো। প্রায়ই দেখতে পাই সমালোচক বলছেন, যে মূল উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে চিত্র সৃষ্টি হয়েছে, চিত্রে অনেক স্থলে মূল কাহিনীর ঘটনা বা চরিত্রের অদল-বদল করা হয়েছে, "বইতে তো এ ঘটনা নেই, অথবা, এ চরিত্রের রূপ যা ফোটানো হয়েছে তার সঙ্গে বই-এর সৃষ্ট চরিত্রের ঠিক মিল হচ্ছে না" এই ধরণের বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রায়ই দেখতে পাই। এর দু-একটি দৃষ্টান্ত পরে দিচ্ছি, আগে সাধারণভাবে জিনিসটা বিচার করা যাক। এ রকম সমালোচনা প্রযুক্ত হয় সাধারণতঃ যেসব বিখ্যাত ও জনপ্রিয় উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র প্রস্তুত হয়ে থাকে, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বা কোন আধুনিক জনপ্রিয় লেখকের রচনা সম্বন্ধে অর্থাৎ যেসব বই সাধারণ পাঠকের কাছে সুপরিচিত। কথাটা এই দাঁড়ায়, মূল উপন্যাসে যা যা চরিত্র বা ঘটনার সমাবেশ আছে, সবটা হুবহু ছবিতে তুলতে হবে? তা হতে পারে না, কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন অবশ্যম্ভাবী, কারণ উপন্যাস, তার নাট্যরূপ (রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য) ও তার চিত্ররূপ (ফিল্মে তোলার জন্য) একবারে হুবহু এক হতে পারে না। তবে এটা অবশ্য দেখতে হবে পরিবর্ত্তনের দ্বারা কোন চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করা না হয়, অথবা ঘটনা সমাবেশে মূল কাহিনীর ক্ষতি না হয়, অর্থাৎ মোটের ওপর উৎকর্ষসাধনই হবে পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য। উপন্যাস আমরা শুধু পাঠ করে তার ভাব ও রস গ্রহণ করি, সেই বই-এর নাট্যরূপ দিতে হলে আবশ্যক অনুযায়ী বদল, ছাঁটাই বা কিছু জোড়াতালি না দিলে তাকে রঙ্গমঞ্চে ঠিক ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। আবার চিত্ররূপ ঠিক নাট্যরূপ মিলেও চলবে না, এই মাধ্যমের উপযোগী করে তোলবার জন্য আরো কাট-ছাঁট জোড়াতালি ইত্যাদির প্রয়োজন। উপন্যাসে কোন লোমহর্ষণ বা মর্মস্পর্শী ঘটনার বর্ণনা থাকতে পারে, যেটা পাঠকের মনে যথেষ্ট [illegible] করে। এই ঘটনা রঙ্গমঞ্চে কেবল- [illegible] মুখে বর্ণিত করা [illegible] হয়ত উপায় [illegible] বিধি খুব [illegible] তার ওপর ক্রিয়া-কলাপ (action) খুব বেশী দেখানো চলে না, মুখে বর্ণনা দিয়েই সারতে হয়। যদিও, তরবারী ক্রীড়া, পিস্তলের গুলীতে হত্যা ইত্যাদি ছোট-খাটো action, এমনকি, কামানের গোলায় দুর্গ-প্রাকার ধ্বংস এ ধরণের দৃশ্যও সীমাবদ্ধভাবে দেখানো চলে এবং দেখানোও হয়েছে, কিন্তু action দেখাবার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র যে চলচ্চিত্র সে-বিষয়ে সন্দেহই নেই। সেইজন্য কোন উপন্যাসের নাট্যরূপ হবে বাক্যবহুল, তার চিত্ররূপ হবে কার্য্য-বহুল। এ-প্রসঙ্গে ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ে গেল। অমরেন্দ্র দত্ত প্রতিষ্ঠিত "ক্লাসিক থিয়েটারে" বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল" নাটকাকারে রূপান্তরিত হয়ে "ভ্রমর" নামে অভিনীত হচ্ছে (আমি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা বলছি)। কলকাতার পথে পথে প্রাচীরপত্রে বড় বড় অক্ষরে দেখা গেলো—"রঙ্গমঞ্চে অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল" (তখন অমরেন্দ্র দত্ত গোবিন্দলালের ভূমিকায় অভিনয় করতেন)। অর্থাৎ একটা আস্ত, জ্যান্ত ঘোড়ায় চড়ে গোবিন্দলালের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবটা এতই চমকপ্রদ যে সেটা একটা বিশেষ আকর্ষণ ব'লে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মনে রেখাপাত করতে তিনটি যে বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে—পুস্তক, তার নাট্যরূপ ও তার চিত্ররূপ—এই তিনটির মধ্যে মূলগত প্রভেদ যথেষ্ট রয়েছে। এখন দেখা যাক, মূল বই থেকে অদল-বদলের কথা। এর প্রথম উদাহরণ একটি বহু পুরাতন যুগের উপন্যাসের নাট্যরূপ থেকে দেবো। বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত উপন্যাস "চন্দ্রশেখর"কে প্রথম নাটকাকারে পরিবর্তিত করেন অমৃতলাল বসু, যিনি একাধারে ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ, নাট্যকার ও অভিনেতারূপে খ্যাত ছিলেন। এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ষ্টার থিয়েটারে সম্ভবতঃ ১৮৯৬ কি ১৮৯৭ সালে, এবং তার পর থেকে আজও পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বছরের ওপর এই নাটকের অভিনয় হয়ে আসছে। এই নাটককে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত গল্পাংশের কিছুমাত্র পরিবর্তন বা ক্ষতিসাধন না করেও অমৃতলাল একটি সম্পূর্ণ নূতন চরিত্রের সমাবেশ করেন, তার নাম "পদ্মগোকুল বিশ্বাস"। অষ্টাদশ

শতাব্দীতে যখন ইংরাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকগণ এদেশে ব্যবসার নামে শোষণ ও নানা অত্যাচার-অনাচার চালাতে থাকেন, তখন অনেক কুলাঙ্গার বাঙ্গালী তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ও তাদের নানা কুকার্য্যে সহায়তা ক'রে প্রভূত লাভবান হয়েছিল, সেইরূপ একটি ইংরাজের পদলেহী চাটুকার বাঙ্গালী এই গন্ধগোকুল বিশ্বাস। এর ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী বুলি ও তৎসহ ভঙ্গীমার জন্য যদিও চরিত্রটি "কমিক" বা হাস্যোদ্রেককারী রূপেই চিত্রিত হয়েছিল, তথাপি এর কুকার্য্যের জন্য দর্শকমনে যথেষ্ট বিরাগভাবেরও উদ্রেক হতো। নিপুণ হস্তের অঙ্কিত এই চরিত্রটি অদ্ভুতভাবে মূল কাহিনীর সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। এই পঞ্চাশ বছরেরও বেশী কাল হাজার হাজার দর্শক (ও সমালোচক) "চন্দ্রশেখর" নাটকের অভিনয় দেখেছেন ও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন কিন্তু কই—কখনো ত' কারো মুখে এমন কথা শোনা যায়নি যে নাট্যকার (অমৃতলাল) বঙ্কিমের ওপর কলম চালিয়েছেন ও সেজন্য তিনি নিন্দার্হ। তবে এ হলো একদিকের কথা, অর্থাৎ মূল পুস্তকে নেই এমন চরিত্র সৃষ্টি করার কথা। আবার তেমনি অনেক ইংরাজী ছবিতে দেখা যায় যে মূল পুস্তকে নেই এমন ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে সেই পুস্তকের চিত্ররূপে। এটাও যেখানে করা হয়েছে সেখানে সাধারণতঃ বলা যায় যে দর্শকের প্রশংসাই লাভ করেছে, তাতে চিত্রের কোন ক্ষতি বা রসভঙ্গ তো হয়ই নি, বরং তা ছবির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছে। এ বিষয়ে সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রথমেই যে কথা বলেছি তার পুনরাবৃত্তি করতে হয়, যথা, বই-এ যা আছে হুবহু সব ঠিক রাখলেই যে ভাল ও হৃদয়গ্রাহী চিত্র হবে এমন কোন কথা নেই। সেটা নির্ভর করে অভিজ্ঞ চিত্রনাট্য-রচয়িতার নৈপুণ্যের ওপর। এরও একটা উদাহরণ দেবো, তবে আধুনিক কোন ছবির কথা না বলে, ১৭ বছর আগেকার একখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজী ছবির দৃষ্টান্ত দেবো। ১৯৩৫ সালে কলকাতায় "লষ্ট্ পেট্রোল" (Lost Patrol) নামে একখানি ছবি দেখানো হয় (পরেও অনেকবার হয়েছিল)। ছবি দেখবার আগে মূল বইখানি আমি পড়েছিলাম, ছবি দেখবার সময় দেখলাম এক স্থানে একটি চমকপ্রদ ছোট ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, যার কোন উল্লেখ মূল বইতে নেই এবং ঘটনাটি জুড়ে দেওয়াতে ছবিখানির আরো উৎকর্ষ তো হয়েছেই এমনকি ছবির পরিণতি (Climax) আরো মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। যদি একালের পাঠকেরা এ ছবির সঙ্গে পরিচিত না থাকেন, সেজন্য খুব সংক্ষেপে কাহিনীটি বলছি। একটি সৈনিকদের 'পেট্রোল' বা পাহারাদারী দল, সংখ্যায় ১০।১৫ জন, ঘটনাচক্রে মরুভূমির মধ্যে মূল দলের থেকে বিচ্ছিন্ন ও পথভ্রান্ত হয়ে পড়ে। চারিদিকে কেবল ধূ ধূ করছে বালি এবং (আরব) শত্রুদলের বিভীষিকা। এই অবস্থায় অতি কষ্টে তারা একটি oasis বা মরূদ্যানে আশ্রয় নেয়। চারিদিকে উঁচু নীচু বালিয়াড়ি, তার আড়াল থেকে আরবেরা সুবিধা পেলেই গুলী করে। একজন সার্জ্জেণ্ট এই সৈনিকদের দলপতি। মরূদ্যানটি যাতে অবরোধ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে ও সৈনিকরা ভগ্নোদ্যম না হয়ে পড়ে, সেই চেষ্টাই সে অনবরত দিনের পর দিন করে যেতে থাকে। শীঘ্রই একদিন তাদের তল্লাসকারী বড় দলটি এসে পড়ে তাদের উদ্ধার করবে, এই আশাই তাদের বাঁচতে ও যুদ্ধ করে যেতে উৎসাহিত করছে, যদিও

আরবদের গুলীতে রোজই ২।৩ জন হতাহত হচ্ছে। এমন অবস্থায় হঠাৎ একদিন একখানি এরোপ্লেন এসে তাদের সামনে নামলো, অবরুদ্ধ সৈনিকদের আনন্দ হলো যে এই এরোপ্লেন-চালক নিশ্চয়ই তাদের সন্ধানে বেরিয়েছে, কিন্তু চালক যখন এরোপ্লেন থেকে নেমে মরূদ্যানের দিকে আসছে, এরা যতই তাকে হাত নেড়ে, চেঁচিয়ে সাবধান করে দিচ্ছে যে চারিদিকে শত্রু লুকিয়ে আছে, চালক কিন্তু হাসিমুখে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দুম্ করে শব্দ হলো, চালক পেটে হাত দিয়ে, বিস্মিত ও হতভম্বভাবে আস্তে আস্তে ধরাশায়ী হলো, তার মুখ থেকে কেবল "I say, you fellows—" এ কথা উচ্চারিত হলো, অর্থাৎ "এ কী করলে তোমরা? আমি যে তোমাদের বন্ধু, আমাকেই মারলে?"—এই ভাব। বেচারী জানলো না যে লুক্কায়িত আরবের গুলীতে তার প্রাণ নাশ হলো। এই ছোট দৃশ্যটি যে কি লোমহর্ষক ও হৃদয়বিদারক, যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের বোঝানো শক্ত। অথচ এ ঘটনাটি মূল পুস্তকে নেই, এটি সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য-রচয়িতার মস্তিষ্কপ্রসূত! তারপর গল্পের পরিণতি আরো হৃদয়গ্রাহী করতে এই ঘটনা কিরকম সাহায্য করেছিল, সে কথা বলি। সার্জেন্ট অতি সন্তর্পণে রাত্রে গিয়ে এরোপ্লেন থেকে মেশিন-গানটি (Machine gun) খুলে নিয়ে এলো। শেষ দৃশ্যে, যখন সকলে মৃত, একমাত্র সার্জেন্ট বেঁচে আছে, আরবেরা দল বেঁধে এগিয়ে আসছে, এইবার তাকেও শেষ করবে বলে, তখন সার্জেন্ট আরবদের গুলী উপেক্ষা করে মেশিন্-গান্ চালাতে আরম্ভ করলে, পিঁপড়ের সারের মত আরবেরা গুলী খেয়ে পড়ছে আর সার্জেন্টের ততো উল্লাস আর হাঃ—হাঃ—হাঃ গগনভেদী অট্টহাসি। সে হাসির ধ্বনি আর কামানের কড় কড় কড় কড় শব্দ মিলিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, তা আজো ভুলি নি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মূল বইতে নেই এমন নূতন চরিত্র সৃষ্টি, বা নূতন ঘটনার অবতারণা করলেই, অথবা ঘটনার কিছু পরিবর্তন ঘটালেই যে দোষের, এমন কথা ঠিক নয়। যদি চিত্রনাট্য-রচয়িতার সূক্ষ্ম দৃষ্টি, মানবচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও কল্পনা-শক্তি থাকে তাহলে পরিবর্তন করা চলে, যদি তাতে চিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হবে বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে কলকাতায় সম্প্রতি প্রদর্শিত একটি চিত্রের কথা বলে শেষ করবো। "মহা-প্রস্থানের পথে" ছবিটির নানারূপ সমালোচনা প্রকাশিত হলেও, মোটের ওপর সকলেই সুখ্যাতি করেছেন। কোন এক সমালোচক এর একটি বিশেষ দৃশ্য নিয়ে সেই পুরানো কথা বলে দোষ ধরেছেন যে "মূল বই-এর সঙ্গে এ ঘটনা মেলে না।" ঘটনাটি এই—পরিব্রাজকের সঙ্গে ভণ্ড ব্রহ্মচারীর ঝগড়া ও ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, তারপর অনেকদিন পরে, ফেরবার পথে পরিব্রাজকের সঙ্গে আবার ব্রহ্মচারীর দেখা হলো। তখন ব্রহ্মচারীর অবস্থা খুব খারাপ, জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা, ছেঁড়া কাপড়, মাছির কামড়ে সর্ব্বাঙ্গে ঘা, সে আকুলভাবে পরিব্রাজকের কাছে সাহায্য ভিক্ষা চাইলো। পরিব্রাজক ঘৃণাভরে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। ব্রহ্মচারী যখন আগেকার ভালবাসার দোহাই দিলো তখন পরিব্রাজক "সে ভালবাসাকে তুমি নিজ হাতে হত্যা করেছো" বলে ছিটকে চলে গেলেন। কিন্তু দূর থেকে নিজের গাত্র-বস্ত্রখানা ছুঁড়ে ব্রহ্মচারীর কাছে ফেলে দিয়ে গেলেন। এক ধুরন্ধর সমালোচক লিখেছেন যে "বইতে এই গাত্র-বস্ত্র দেবার কথা নেই।" বইখানি আমি বহুকাল আগে পড়েছি, গাত্র-বস্ত্র দেওয়ার কথা আছে কি নেই, সে কথা আমার মনে নেই, মনে রাখার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করি না। ছবি হিসাবে বিচার করে আমি বলবো যে, এই গাত্রবস্ত্র দান করাতে পরিব্রাজকের চরিত্র আরো উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটেছে। সে কঠোর হতে পারে, নাস্তিক হতে পারে, ব্রহ্মচারীর পূর্ব্বের ব্যবহারে তার মনে রাগ ও অভিমান থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে আর্ত্ত-আতুর ব্রহ্মচারীকে দেখে তার মনে দয়ার লেশও উদয় হয় নি এমন হতে পারে না। তাই সে রাগ দেখিয়ে চলে গেলেও, যাবার সময় গাত্র-বস্ত্র দিয়ে গেল। এতে দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

তাই এখন এই বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি যে, পরিবর্তন করলেই যে ফল মন্দ হবে এমন কথাও যেমন সত্যি নয়, তেমনই না বুঝে পরিবর্তন করলেও আবার ফল খুব মন্দ হতে পারে।

চলচ্চিত্রশিল্পে মাদ্রাজ

★

বীরেন নাগ

যদিও চিত্রশিল্প বাঙালীর একার নিজস্ব কীর্ত্তি নয়, তবুও ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে বাংলাই একনিষ্ঠ সাধক ও সাফল্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অগ্রদূত। 'চণ্ডীদাস' ও 'মীরাবাঈ'-এ'র যুগে বোম্বাইতে তোলা 'হাণ্টারওয়ালী' বা 'রিক্সাওয়ালী' বাংলা দেশ থেকেও প্রচুর পয়সা নিয়ে গেছে—কিন্তু ইজ্জৎ বিক্রী ক'রে। 'খিড়কী', 'শানাইয়ের' কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি,—'আন' ও 'আওয়ারার' যুগেও 'রত্নদীপ' ও 'যান্ত্রিক' শুধুমাত্র বাংলারই প্রতিনিধিত্ব করেনি—সারা ভারতকে নূতন করে সজাগ করে দিয়েছে। তবুও বোম্বাই-এর সঙ্গে বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের চিরদিনই একটা যোগসূত্র ছিল বা আছে। কিন্তু—

পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচের হিসাব দেখিয়ে যখন সারা ভারতে মাদ্রাজের 'চন্দ্রলেখা' মুক্তিলাভ করে বসলো—তখন বোম্বাই বা বাংলাতে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল বৈকি? দেখা দিল তারপর 'নিশান' বা 'বাহার'। কিন্তু 'চন্দ্রলেখা' বা 'বাহার' তো মাদ্রাজ নয়, মাদ্রাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—তবে কি?

যাত্রা বা থিয়েটার দেখা যেমন কোন একদিন আমাদের দেশেও ছিল একটা হুজুগ, সে হুজুগের নেশাতেই আজও মেতে রয়েছে মাদ্রাজের দর্শক-সম্প্রদায়—এরা Technique-এর বিচার করে না—চিত্র-পরিচালনার মার-প্যাঁচ পছন্দ করে না,—Speed বা Tempo-র বীজ আজও এদের অন্দর মহলে প্রবেশ করে নি। এরা চায় পরিষ্কার স্বচ্ছ ঝকঝকে ছবি, দিন-রাত্রের বালাই নেই, সম্ভব-অসম্ভবের হদিশ নেই,—নাচে গানে ভরপুর সাড়ে তিন ঘণ্টার অফুরন্ত আনন্দের উৎস। পয়সা খরচ করে কেউ কাঁদতে রাজী নয়,—[illegible] এ দেশে [illegible] না, হলেও কি[illegible] [illegible]োগান্ত নাটক এ[illegible]

সারা ভারতের প্রায় তিন ভাগের দু'ভাগ চিত্রগৃহ রয়েছে মাদ্রাজে, কিন্তু আভিজাত্যের কোন গন্ধই নেই,—চাকচিক্যের কোনো রেষারেষি নেই—মাদুর বিছিয়ে ছবি দেখালেও সাধারণ দর্শকের কোন অভিযোগ নেই,—এখানকার বেশীর ভাগ দর্শকই অশিক্ষিত এবং ধর্ম্ম-ভীরু। তাই ধর্ম্মের নামেই ব্যবসা চলেছে এতদিন,—কিন্তু নূতন ক'রে ধর্ম্মগ্রন্থ লিখে নিয়ে ছবি তৈরী করতে হয়ত প্রযোজকেরাও নারাজ, অতএব বর্ত্তমানে সামাজিক গল্পের হিড়িক চলেছে তাও ছকে বাঁধা।

সাহিত্যের বালাই বিশেষ কিছু নেই, থাকলেও ব্যবহার করতে ভরসা পায় না, সুতরাং ধার করতে হয়। ধার করা অপরাধ নয়, এরা করে চুরি। অবশ্য ডাকাতি বললেও বেশী বলা হবে না। যে কোন হিন্দী ছবির বিশেষ কোন ভাল অংশ একমাত্র ভাষা বদল করে ছবিতে ব্যবহার করতে এরা ভয় পায় না বরং চুরি করার বাহাদুরীটা এদের স্বভাব-ধর্ম্ম। বলতে গেলে মাদ্রাজের চিত্রশিল্পের কাছে বোম্বাই-ই হলো একমাত্র আদর্শ। অবশ্য বাংলাকেও এরা শ্রদ্ধা করে, কিন্তু কাছে ঘেঁসতে ভরসা পায় না।

দেড় লাখ টাকার Production-এর কথা শুনলে হাঁ ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ছ'মাসেও কোন ভাল ছবি তোলা যায় বলতে গেলে নিশ্চয়ই Return-ticket কাটতে বলবে। বছরের পর বছর ধ'রে এদেশে ছবির স্যুটিং চলে, পরিচালক বদল হয়, ষ্টুডিও পাল্টে যায়, 'হনুমানের লঙ্কা-দহন' গল্প সুরু ক'রে 'দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ' নামে ছবি বাজারে বেরোলেও আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ থাকে না, এ প্রথাই এদেশে প্রচলিত।

মাদ্রাজের অলিতে-গলিতে হিন্দী ছবির গানের ছড়াছড়ি, সাধারণ পরিচালক বা প্রযোজকরা পছন্দমতো হিন্দী গানের রেকর্ড কেনেন। সঙ্গীত-পরিচালককে এই সুরে সুর বাঁধতে বলেন, সুরের ইজ্জৎ বজায় রাখতে কাহিনীকারকেও কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দিতে হয়। নূতনত্বের কোন প্রেরণা এদেশের মাটিতে নেই, experiment এদেশের চিত্রশিল্পে নীতিবিরুদ্ধ।

ব্যবসার-কেন্দ্রটি অত্যন্ত সুপ্রশস্ত, লাখ লাখ টাকা খরচ করে সুদীর্ঘ তিন, চার বা ততোধিক বছরে গৃহীত ছবি খারাপ হলেও ছবির পিছনে যা খরচ হয় সেই মূলধনের টাকাটা ঘরে ফিরে আসে,—আর ছবি ভাল হলে লাভের অংশ চারগুণ হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যে এদেশের প্রযোজনা ক্ষেত্রে যে কোন ছবিতেই পরিবেশকদের কাছ থেকে অন্ততঃ তিন লাখ টাকা জোগাড় করতে কোন প্রযোজককেই ভাবতে হয় না; আর ভাবতে হয় না বলেই মাদ্রাজের অলিতে-গলিতে চিত্র-প্রতিষ্ঠানের ছড়াছড়ি।

আনুষ্ঠানিক কেতাদুরস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা এদের অত্যন্ত বেশী কিন্তু চিত্র-প্রযোজনার ব্যাপারে সুষ্ঠু পরিকল্পনা বলে কিছু নেই। ছবির স্যুটিং হচ্ছে, ছবির প্রোজেকশানও দেখা হচ্ছে, ভাল না লাগলে আবার রি-টেক হচ্ছে। শোনা যায়, 'চন্দ্রলেখা'র এক 'drum dance'-এর ছবি তুলতে যাট হাজার ফিটেরও ওপর নেগেটিভ্ ফিল্ম এক্সপোজ্ করতে হয়েছিল।

একদিকে যেমন জনকতক প্রযোজক বা পরিচালক বর্ত্তমান চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য সত্যি ভয়ানকভাবে ভাবছেন, অন্যদিকে আবার এমন প্রযোজকও দুর্লভ নন যিনি বা যাঁরা বাজারে নামকরা ছবির সবক'টি সংস্করণের স্বত্ব কেনেন মোটা টাকার বিনিময়ে নিজে বা নিজেদের নামে, নূতন কর্ম্মী ও শিল্পীদের নিয়ে নূতন ব্যবসার ফন্দিতে প্রতিটি শট moviola অর্থাৎ চিত্র-সম্পাদনার যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁতভাবে অনুকরণ ক'রে আবার অন্য ভাষার ছবিতে তা চালিয়ে দেন—জেমিনীর 'সংসার' তার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

ছায়াছবির ব্যবসার হিসেবে তামিল ছবির বাজার অনেক বড়, কিন্তু রুচি বা সংস্কৃতির দিক থেকে তেলেগুরা অনেক বেশী প্রগতিশীল, আচার-ব্যবহারেও বাংলার সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। বাংলা দেশের বেশ কিছু সাহিত্য তেলেগু ভাষায় লেখা হয়েছে, কিন্তু শরৎ-সাহিত্যের আদর এখানে সবচেয়ে বেশী। গত ক'মাসে

কিছু কিছু বাংলা ছবি (পরিবর্ত্তন, জিঘাংসা, সমাপিকা) এখানে দেখানো হয়েছে, পছন্দও হয়েছে বেশ, কিন্তু এদেশে এ ধরণের ছবি চলবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর আসে,—'আমাদের দর্শক আজও এতটা তৈরী হয় নি।'

কাজের ভীড় থাকা সত্ত্বেও এখানকার ষ্টুডিওর আবহাওয়া খুব শান্ত, কারণে অকারণে ক'লকাতার মতো এত discussion-এর হাট বসে যায় না, এমনকি অভিনেতা বা অভিনেত্রীরাও কাজে এসে কেউ কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলেন না, চিত্রগ্রহণের সময় 'সেট'-এ এসে দাঁড়ান বাকি সময়টা 'ফ্লোর'-এ চুপচাপ বসে কাটিয়ে দেন। ডাব বা সোডার প্রচলন এদেশে থাকলেও এদের ডাব খেয়েই সোডা খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। ভোর ছ'টায় স্যুটিং আরম্ভ হওয়ার কথা থাকলে যেমন রাত তিনটের সময় চিত্রের নায়িকা রূপসজ্জা করতে আসার পাঁয়তারা কষেন না, তেমনি 'জনতা'-দৃশ্যের 'এক্সট্রা'রাও রাত বারোটা থেকে মেক-আপ সেরে নিয়ে ষ্টুডিওতে পড়ে পড়েই ঘুমোতে কোনো আপত্তি জানায় না। প্রায় সব ক্ষেত্রেই স্যুটিং-এর একদিন আগে Properties দিয়ে 'সেট' সাজিয়ে রাখা হয়, কেননা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট সময়ও এরা বাজে নষ্ট হতে দেয় না। অবশ্য চিত্রগ্রহণ করার সময় একই দৃশ্য বিভিন্ন কোণ (angle) থেকে এরা ক্যামেরা ব্যবহার করে, একই শটের বহু 'O. K.' Shot ছাড়াও 'Safety Take'-এরও কোন হদিশ থাকে না।

সমগ্র দক্ষিণ ভারতে মোট তেইশটি ষ্টুডিও আছে, এক মাদ্রাজ সহরেই পনেরোটি উন্নতধরণের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত ষ্টুডিও বর্ত্তমান। প্রতিটি ষ্টুডিওতেই তিনটি Shift-এ কাজ করার খুব ভাল ব্যবস্থা রয়েছে,—ভোর ছ'টা থেকে একটা, দুটো থেকে ন'টা এবং রাত সাড়ে ন'টা থেকে পাঁচটা। 'বাহিনী' অবশ্য এখানকার সবচেয়ে well-equipped, well-planned এবং well-organised ষ্টুডিও,—তারপরেই এ ভি এম ষ্টুডিও। জেমিনী ষ্টুডিও হিসেবে মন্দ নয়, তবে উপরোক্ত দুটির তুলনায় এত well-planned নয় এবং একটু সেকেলে ধরণের। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম ও সুন্দর সাজানো-গোছানো ষ্টুডিও এদেশের লোকের একটা বিলাসিতা কিংবা ব্যবসায়ের একটা বিরাট চাল।

কিন্তু যে-দেশের ষ্টুডিওগুলি এত সুন্দর, এত উন্নত সে-দেশের চিত্রগৃহগুলি দেখলে কিন্তু সত্যই হতাশ হতে হয়। ষ্টুডিওর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহেরও যথেষ্ট উন্নতি হওয়াও বাঞ্ছনীয়। নয়তো চলচ্চিত্রের উন্নতির অনেকটা অবমাননা করা হবে। শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে, এত বড় একটা শহরে একটিমাত্র শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত চিত্রগৃহ রয়েছে, তার ওপর সেখানে আবার মোট বসবার আসনের সংখ্যা মাত্র আড়াই-শো'। অবশ্য কলকাতার মতো এত আভিজাত্যপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ শুধু মাদ্রাজ কেন সারা ভারতে আর কোথাও নেই।

এখানে ষ্টুডিও প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নিজস্ব চিত্র-প্রযোজনা ছাড়াও দিনের পর দিন ষ্টুডিওগুলিতে বাইরের প্রযোজকের ভীড়ও বাড়ছে। এমন বহু ষ্টুডিও এখানে রয়েছে যারা দৈনিক হাজার টাকা ভাড়া ও 'সেট'-এর ভাড়া বাবদ পৃথকভাবে টাকা নিয়েও প্রযোজকদের চাহিদামতো তাঁদের পরিকল্পিত দিনগুলিতে ষ্টুডিওকে প্রস্তুত রাখতে পারছেন না। তাইতো ভাবছি,—এত অর্থ, এত সুন্দর যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম, এত নিখুঁতভাবে সুসজ্জিত ষ্টুডিও এবং এত বড় ব্যবসাকেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও মাদ্রাজের চিত্রশিল্প আজও কেন চাতক পাখীর মত হাঁ করে বোম্বাই-এর দিকে তাকিয়ে আছে? অথচ এই স্বাচ্ছন্দ্যের বা সামর্থ্যের কিছুটা অংশও যদি বাংলা দেশের ভাগ্যে জুটতো, তাহলে বাংলার পরিচালক, প্রযোজক বা কর্ম্মীবৃন্দ শুধু ভারতবর্ষ কেন আন্তর্জ্জাতিক ছবির বাজারে ভারতের মর্য্যাদা, শিল্পানুভূতি ও সংস্কৃতিকে সুন্দরভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতো।

আলি আকবর খাঁ

কানপুর শহরে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন চলেছে। সন্ধ্যাবেলার কর্ম্মসূচীতে আছে—সঙ্গীত-অনুষ্ঠান। বলা বাহুল্য সে-অনুষ্ঠানে ভীড়ের অন্ত নেই। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা তো আছেনই; উপরন্তু আছেন কানপুরের অগণিত নরনারী। কার জন্য এতো আগ্রহ, তা বুঝতে পারলাম স্বরোদ-এ সঙ্গীতচর্চার সময়।

তরুণ এক শিল্পী স্বরোদ বাজিয়ে চলেছেন; আর, তার সঙ্গে তবলা সঙ্গৎ করছেন স্থানীয় এক ভদ্রলোক। স্বরোদের সুরে আর তবলার সঙ্গতে সে এক অনির্বচনীয় সঙ্গীতের নির্ঝর বয়ে চলেছে সন্ধ্যাবেলাকার আনন্দ অনুষ্ঠানে। সমস্ত হল-ঘর নিস্তব্ধ। স্বরোদ-বাজিয়ের সঙ্গে তবলচী যেন আর শেষ পর্য্যন্ত পেরে ওঠেন না। উভয়ের মুখেই মৃদু হাসি। স্বরোদের তারে তারে চলে সুরের ঝংকার; তবলার তালে তালে সঙ্গতের সঙ্গতি। তেমন বাজনার পরিচয় পেয়েছিলাম আর একজনের কাছে। তিনি—স্বরোদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। আশ্চর্য্য হলাম—কে, এই তরুণ শিল্পী, যিনি সেই গুণীর প্রায় সমস্ত কারুকার্য ও কলা-কৌশল অদ্ভুতভাবে আয়ত্ত করেছেন? বাজনা থামলে ঘোষকের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—'লক্ষ্ণৌ বেতার কেন্দ্রের স্বরোদ-শিল্পী আলি আকবর খাঁ। সবশেষে আপনাদের আর একটি রাগ বাজিয়ে শোনাবেন।' আলি আকবর? অর্থাৎ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর পুত্র! হ্যাঁ, উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রই বটে।

আলি আকবর খাঁ। ফটো: ভাইচু সান্যাল

ওস্তাদ আলাউদ্দিনের যে পঞ্চশিষ্য স্বরোদ-বাজনায় সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের দু'জনের একজন হলেন—[illegible] আলি আকবর।

তাল ও ছন্দে আলি আকবর অসামান্য দক্ষতা লাভ করেছেন। সতেরোটি তারের সন্নিবেশে স্বরোদের সৃষ্টি। এই কঠিনতম বাদ্যযন্ত্রে দক্ষতা লাভ করা সহজ নয়। কিন্তু সাধকের কাছে কঠিন বস্তুও হয় সহজ, কাঠিন্যেও জাগে সারল্য, মাধুর্য। আলি আকবর শুধু স্বরোদ-শিল্পী ন'ন, স্বরোদ-সাধকও বটে। স্বরোদে পিলু-রাগ বাজিয়ে একবার বোম্বাই বেতার-কেন্দ্রের শ্রোতাদের তিনি যেভাবে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিলেন, আজও তা সঙ্গীত-অনুরাগীদের মানসপটে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে।

পূর্ব বাংলার ত্রিপুরা জেলার অধিবাসী হলেও, আলি আকবর বেশীর ভাগ সময়ই কাটিয়েছেন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে।

১৯২০ সালে আলি আকবর যেদিন জন্মগ্রহণ করলেন, সেদিন মাইহার রাজ্যের দরবারে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-কে সকলেই শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন এই ব'লে যে, পুত্র যেন পিতার মতই যশের অধিকারী হয়। ওস্তাদ আলাউদ্দিন তখন মাইহার দরবারের প্রধান-শিল্পী।

অতি শৈশবেই আলি আকবর পিতার কাছে বাদ্যযন্ত্রের দীক্ষা নেন। প্রথম প্রথম তবলা ও পাখোয়াজ বাজাতেই তাঁর ভালো লাগতো। পাঁচ-বছরের ছেলের সঙ্গীতের প্রতি অদম্য উৎসাহ আর অসীম আগ্রহ দেখে গুণী পিতা পুত্রকে গ'ড়ে তোলবার সমস্ত দায়িত্বই গ্রহণ করেন। কৈশরের দিনগুলি আলি আকবরের কেটেছে গান শিখে। খেয়াল, ধ্রুপদ ও ধামারের পাঠ তিনি ভালোভাবেই গ্রহণ করেছিলেন সে-সময়। আজও তিনি চমৎকার গান গাইতে পারেন; কিন্তু, গানের চেয়ে এখন বাজনার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী। স্বরোদ-ই তাঁর প্রিয় বাদ্যযন্ত্র।

ন'বছর বয়স থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্য্যন্ত আলি আকবর তাঁর পিতার কাছে স্বরোদ শিক্ষা করেন। সুদীর্ঘ বারোটি বছর যে-সাধনায় তিনি লিপ্ত ছিলেন, তা কি কখনও ব্যর্থ হ'তে পারে? বারো ঘণ্টা থেকে আঠারো ঘণ্টা পর্য্যন্ত তিনি রোজ কেবল তান শিক্ষা করতেন। শিক্ষাদানের সময় ওস্তাদ আলাউদ্দিন অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ। তাই দরকার বুঝলে সময় সময় পুত্রকে তিনি ঘরের বাইরে যেতে দিতেন না। ফলে, কঠিন শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে আলি আকবরের দিন কেটেছে।

আলি আকবর সঙ্গীত-যন্ত্রের একজন নিষ্ঠাবান গবেষক। উত্তর-ভারতের সঙ্গীত-যন্ত্রের সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গীত-যন্ত্রের সুরের সমন্বয় কিভাবে ঘটানো যায়, তার গবেষণা ক'রে আলি আকবর নতুন এক সুরের সৃষ্টি করেছেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রচলিত 'ঘরানা'য় যে-সব বিরোধ আছে, তা দূর করে তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ সঙ্গীতকলার সৃষ্টি করতে চান। আলি আকবরের মতে সিনেমার সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীতকলার প্রাচীন ঐতিহ্য ও মর্যাদাকে পদে পদেই ক্ষুণ্ণ করছে। তিনি বলেন যে, সিনেমার মাধ্যমেই ভারতীয় সঙ্গীতকলার প্রচার ও প্রসার হ'তে পারে যদি সেদিকে সঙ্গীত-পরিচালকরা দৃষ্টি দেন। অবিরাম চটুল সঙ্গীতের পরিবেশনা শুধু ক্ষতিকর-ই নয়, অমর্যাদাকর।

ভারতীয় বেতার-কেন্দ্রের সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ ক'রে এক জায়গায় বলা হয়েছে—"বেতারকে কেন্দ্র ক'রে কোনো সঙ্গীতশিল্পী জীবিকা অর্জ্জন করতে পারেন না। কারণ, এদেশে শিল্পীদের

উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না এবং প্রতিভাধর শিল্পীর যোগ্য মর্যাদা দিতেও বেতার কর্তৃপক্ষ কুণ্ঠিত।...সঙ্গীত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তিরাই বেতারে সঙ্গীত কর্তৃপক্ষের পদ গ্রহণ করাতে শিল্পীরা তাঁদের কাছে মর্যাদালাভ করতে পারেন না।"

ভারতের সঙ্গীতশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলি আকবর অত্যন্ত আশা পোষণ করেন। কারণ, সঙ্গীতের সূক্ষ্ম স্বরবিন্যাসের দিক থেকে এদেশের সঙ্গীত-শিল্পীরা যে নতুন নতুন উন্মেষের পরিচয় দিয়েছেন ও দিচ্ছেন, তা এক বিরাট ঐতিহ্য রচনা ক'রে চলেছে। আলি আকবর বলেন যে, আন্তরিক নিষ্ঠা ও আগ্রহ থাকলে সাধারণ সঙ্গীতশিল্পীও একদিন তাঁর সাধনাবলে অসাধারণত্বের পরিচয় দিতে পারেন। সঙ্গীত-বিদ্যায়তনের প্রসারে সঙ্গীতের প্রসার হয় ঠিকই; কিন্তু, উচ্চাংগ-সংগীতের পারদর্শিতা লাভ ক'রতে হ'লে কোনো গুরুর কাছে কঠিন শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে দীর্ঘকাল সাধনার প্রয়োজন—যেমন ক'রে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীরা কোনো অধ্যাপকের অধীনে কোনো একটি বিষয়ে গবেষণার কার্যে নিযুক্ত থাকেন।

মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে ভারতীয় সঙ্গীত-যন্ত্রের ওপর আলি আকবর খাঁর যে দখল জন্মেছে তা সত্যই দুর্লভ। স্বরোদে তাঁর আলাপ ও খেয়াল, ঠুংরী, ধ্রুপদী প্রভৃতি রাগ-রাগিনীর কারুকার্য সম্বন্ধে তাঁর দক্ষতা একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে তেমনি বৈচিত্র্যময়। সম্প্রতি তিনি চিত্রজগতেও যোগ দিয়েছেন এবং 'আঁধিয়া' ছবিতে আবহসঙ্গীতে অপূর্ব্ব মাধুর্য সঞ্চার করেছেন।

তিমিরবরণ

স্বরোদ-সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-র কাছে স্বরোদ শিক্ষা ক'রে যে কয়েকজন গুণী সঙ্গীত-যন্ত্রশিল্পী সারা ভারতবর্ষে খ্যাতিলাভ করেছেন—তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হলেন—তিমিরবরণ। তিমিরবরণের খ্যাতি শুধু ভারতের মাটিতেই সীমাবদ্ধ নয়; ভারত ছাড়িয়ে তা ছড়িয়ে পড়েছে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের দেশে দেশে। তিমিরবরণ শুধু স্বরোদ-শিল্পীই ন'ন। তিনি একজন বিখ্যাত ঐক্যতান পরিচালক। নানা কারণে আজ উদয়শঙ্কর ও

তিমিরবরণের নাম একসঙ্গে জড়িয়ে আছে। এক সময় এই দুই প্রতিভাধর শিল্পীর মিলন সংঘটিত হয়েছিল বলেই বোধ হয় উভয়ের ললাটেই পড়েছে বিশ্ববিজয়টীকা। উদয়শঙ্করের নৃত্য পাশ্চাত্য-দেশবাসীর কাছে যে সমাদর লাভ করেছে, তার কৃতিত্বের অনেকাংশের জন্য দায়ী তিমিরবরণের অর্কেষ্ট্রা পার্টি। আর, উদয়শঙ্করের সম্প্রদায়ে থাকার জন্যই তিমিরবরণেরও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়া

তিমিরবরণ

ফটো : কালীশ মুখোপাধ্যায়

সম্ভব হয়েছিল ইউরোপের দেশগুলিতে। উদয়শঙ্করের নৃত্যের ছন্দ আর তিমিরবরণের সঙ্গীত-যন্ত্রের ঝঙ্কার—একসঙ্গে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি করে, তা শুধু বিস্ময়করই নয়, তা অভূতপূর্ব্ব, তা অনির্ব্বচনীয়।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিমিরবরণের জন্ম। তাঁর পদবী—ভট্টাচার্য্য। ছেলেবেলা থেকেই তিমিরবরণ সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত। তাঁর মায়ের মুখে সেকালের উচ্চাংগ সংগীতগুলি শুনে শুনে—তাঁর মনেও জাগে সঙ্গীত সাধনার আকাঙ্ক্ষা। তাঁর এক মাতামহ ছিলেন বিষ্ণুপুরের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক। তাঁর কাছ থেকেও তিমিরবরণ সঙ্গীতশিক্ষার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে যখন তিনি পড়াশোনা করছেন, তখনই তাঁর গানের কথা ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমশঃ সঙ্গীত-যন্ত্রের ওপর তাঁর নজর পড়ে। বারো বছর বয়সে তিনি বিখ্যাত বংশীবাদক রাজেন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ক্ল্যারিওনেট বাজাতে শেখেন। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে ক্ল্যারিওনেট বাজনার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যগুলি আয়ত্ত করেন।

এরপর তাঁর শিক্ষা শুরু হয় ওস্তাদ আমীর খাঁর কাছে। স্বরোদ-এর প্রথম পাঠ তিনি তাঁর কাছেই নিয়েছিলেন। তারপর ১৯২৫ সালে যান মাইহারে—, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে। এই তরুণশিল্পীর মধ্যে প্রতিভার পরিচয় পেয়ে আলাউদ্দিন তাঁর সমস্ত স্নেহ উজাড় ক'রে দিয়েছিলেন। তিমিরবরণ আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন তাঁর এই গুরুকে। তিনি বলেন—'তাঁর শিষ্যত্বলাভের সুযোগ পেয়েছিলাম বলেই জীবনে, কিছু শিখতে পেরেছি। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি, তা-ই আমার শিল্পী-জীবনের পরম সঞ্চয়। স্বরোদ-বাজনার মধ্যে যে অনন্ত সৌন্দর্য্য লুকিয়ে থাকতে পারে, তা জেনেছি তাঁরই কাছে।'

তিমিরবরণ আজ স্বরোদ বাদ্যের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ভারতীয় রাগ-রাগিনীর অপূর্ব্ব কলাকৌশল আয়ত্ত ক'রে তাকে স্বরোদের সতেরোটি তারের মধ্য দিয়ে তিনি যখন প্রকাশ করেন, তখন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ব'সে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দেশীয় সুরের সঙ্গে বিদেশী সুরের সমন্বয়-সাধনও তাঁর অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁর স্বরোদ বাজনায়

সঙ্গীত লহরীতে মুগ্ধ হয়ে একদিন ইউরোপের বিখ্যাত গীটার-বাদক সিগোভিয়া বলেছিলেন—'তিমিরবরণের একক স্বরোদ-বাজনা যেন একটি পূর্ণাঙ্গ অর্কেস্ট্রা'। এর চেয়ে বড় অভিনন্দন আর কি হ'তে পারে!

উদয়শঙ্করের সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিমিরবরণ যেবার ইউরোপের দেশগুলি পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন, সেবার একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। হল্যাণ্ডে যাবার সময় উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের মোট-ঘাটের বহর দেখে সেখানকার শুল্কবিভাগীয় কর্ম্মচারীরা মোটা শুল্ক দাবী করে বসলেন। তাঁদের সন্দেহ হয়েছিল, সব জিনিষপত্র তাঁদের ব্যবহার্য্য নয়, কিছু হয়তো বিক্রী করবার জিনিষও আছে। যত তাঁদের বোঝানো যায়, তত তাঁদের সন্দেহ বাড়ে। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। হঠাৎ তিমিরবরণের মাথায় এক ফন্দী খেলে গেল। তিনি তাঁর স্বরোদের বাক্সটা খুলে স্বরোদটা তুলে নিলেন। তারপর তারে তারে সুরু হলো অপূর্ব্ব ঝংকার। ঘণ্টাখানেক মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই বাজনা শুনে ওলন্দাজ শুল্ক-কর্ম্মচারীরা খুশিমনে তাঁদের অব্যাহতি দিলেন; যাবার সময় হাত নেড়ে জানালেন আন্তরিক অভিনন্দন।

আর একটি ঘটনা।

প্রাগ শহরের এক বিশিষ্ট দর্শকসমাবেশে উদয়শঙ্করের নৃত্য প্রদর্শন ঠিক হয়েছে কোনো এক সন্ধ্যায়। উদয়-শঙ্করের নেতৃত্বে শিল্পী-সম্প্রদায় অনুষ্ঠানের আগেই এসে পৌছবেন লুক্সেমবুর্গ থেকে। স্বরোদশিল্পী তিমিরবরণ বহু আগেই প্রাগে পৌচেছেন এবং ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না তা দেখছেন। সন্ধ্যা হয়ে এলো, তবু শিল্পীদের দেখা নেই। নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ দর্শকবৃন্দে ভ'রে গেল। তবু শিল্পীরা এসে পৌছলেন না দেখে তিমিরবরণ চিন্তিত, উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। দর্শকবৃন্দের মধ্যেও ঔৎসুক্য ও অধীরতা জাগলো।

তিমিরবরণ তখন স্বরোদখানি হাতে তুলে নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করলেন। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে নিশীথ-রাত্রির নিস্তব্ধতা। তিমিরবরণের হাতে স্বরোদের তারে তারে তখন শুরু হয়েছে অপূর্ব্ব সঙ্গীত। পাষাণের বুক চিরে যেন কলশব্দে উচ্ছল তটিনী-ধারা বয়ে চলেছে তীরবাসীদের চমকিত ক'রে। ত্রু'ঘণ্টা ধ'রে এইভাবে অগণিত দর্শকবৃন্দকে সুরের সুরা পান করিয়ে শান্ত ও তৃপ্ত রাখলেন—তিমিরবরণ। সেই সময় উদয়শঙ্কর তাঁর দলবল নিয়ে পৌছলেন। তাঁদের সাজ-পোশাক ক'রে নেবার জন্য আরও পনেরো মিনিট স্বরোদ বাজিয়ে শোনালেন তিমিরবরণ। অজস্র পুষ্প-স্তবকে অভিনন্দিত হলেন বাংলার এই তরুণ শিল্পী। পাশ্চাত্য দর্শকবৃন্দের মুখে একবাক্যে সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল—হ্যাঁ, বাজিয়ে বটে!

১৯৩০ সালে উদয়শঙ্করের সম্প্রদায়ে তিনি যোগ দেন বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও স্বর্গতঃ হরেন ঘোষের মধ্যস্থতায়। তিমিরবরণ উদয়শঙ্করের নাচ দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে বাজাতে পারলে তাঁর সঙ্গীতযন্ত্রশিল্পের সাধনা সার্থক হবে। এতদিন ধ'রে তিনি যা শিখেছেন—তার প্রকাশের এই তো সুযোগ। তিমিরবরণ নিজের বাড়ীতেই তখন একটি চমৎকার অর্কেস্ট্রা-পার্টি গ'ড়ে তুলেছিলেন। সেই পার্টির বাজনা শুনে উদয়শঙ্করও বিস্মিত হ'য়েছিলেন।

উদয়শঙ্করের দলের সঙ্গীত-পরিচালকরূপে তিমিরবরণ বহুবার ভারতের বাইরে গেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তিমিরবরণ উদয়শঙ্করের মতই প্রশংসা পেয়েছেন—গুণী, জ্ঞানী ও মনীষীবৃন্দের কাছ থেকে। জেনেভাতে তিনি মহামনীষী রোমাঁ রোলাঁকে তাঁর স্বরোদ-বাজনা শুনিয়ে বিশেষভাবে আনন্দ দান করেন। হাইফেজ, কুবেলিক, ক্রাইসলার প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পীদের সঙ্গে আলাপের সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

১৯৩৪ সালে উদয়শঙ্করের দল পরিত্যাগ ক'রে তিমিরবরণ স্বাধীনভাবে সঙ্গীতচর্চার কাজে মন দেন। সে-বছর তিনি যবদ্বীপে যান—রবীন্দ্রনাথের পরিচয়পত্র নিয়ে। সেখানকার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে তিনি পেয়েছেন স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন। যবদ্বীপের সুলতান তাঁর সঙ্গীতবাদ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এরপর তিনি যোগ দেন—নিউ থিয়েটার্সের অন্যতম সঙ্গীত-পরিচালকরূপে। 'বিজয়া', 'দেবদাস' (হিন্দী), 'পূজারিণী,' 'অধিকার', 'মীনাক্ষী' প্রভৃতি ছবিতে তিনি সুরশিল্পী হিসেবে কাজ করেন। মধু বসুর সি, এ, পি-সম্প্রদায়ের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন বহুদিন। তাছাড়া, 'অভিনয়', 'কুমকুম', ও 'রাজনর্ত্তকী' ছবিতেও তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেন।

তিমিরবরণের অর্কেস্ট্রা আজও সারা ভারতে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়। কিছুদিন আগে ক'লকাতা বেতার কেন্দ্রে তিনি যে-ভাবে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত-পাষাণ' গল্পটিকে সঙ্গীতযন্ত্রের মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন, আজও তা অবিস্মরণীয় আছে সঙ্গীতানুরাগীদের কাছে।

রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলেই, শ্রদ্ধার সঙ্গে তিমিরবরণ বলেন—'অমন শ্রোতা আমি দেখিনি। জোড়াসাঁকোর

বাড়ীতে তিনি যেভাবে দু'ঘণ্টা ধরে আমার বাজনা শুনেছিলেন, আমার সঙ্গীত-সাধনার সেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।'

রাধারাণী

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস—একদিন যে রাধাকৃষ্ণ-গীতিকা রচনা করেছিলেন, যুগ যুগ ধ'রেও তা গীত হচ্ছে বাংলার ঘরে ঘরে, ভারতের নগরী ও পল্লীতে। পদাবলী-সংগীতের ধারা আজও অব্যাহত আছে এদেশের সংগীত-শিল্পীদের অনুশীলনে, কীর্তনীয়াদের কণ্ঠে। বাংলার খ্যাতনামা গায়িকা রাধারাণী তাঁদেরই একজন।

কীর্ত্তন-গান বাংলার নিজস্ব সম্পদ। সুর ও তালের অতুল ঐশ্বর্যে কীর্তন-গীতিকা ঐশ্বর্য-ময়ী। উপযুক্ত সাধনা ছাড়া লোকে এই ঐশ্বর্যের সন্ধান পায় না! সাধারণ গ্রাম্য-বৈরাগী বা বোষ্টমদের গাওয়া কীর্ত্তনে এই ঐশ্বর্যের কোন দ্যুতিই ছড়ায় না: কিন্তু কীর্তন-সাধকের ভাবকণ্ঠে তা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। সুধাকণ্ঠী রাধারাণী কীর্ত্তনের সেই ঔজ্জ্বল্যই প্রকাশ করে চলেছেন তাঁর প্রতিটি পদাবলী-গানে। কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে ও আন্তরিকতায় রাধারাণীর প্রতিটি কীর্ত্তন-গান শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে ভাবসমাহিত করে।

বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দশকে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরে রাধারাণীর জন্ম। ভাগ্যের করুণ বিড়ম্বনায় খুব অল্প বয়সে তাঁকে রোজগারে বেরোতে হয় কীর্তন গেয়ে। ছোট্ট মেয়ের ললিত কণ্ঠের কীর্তনগান শুনে বহু লোকের চোখেই জল এসেছে। তাঁরা ভেবেছেন; ভক্তিমূলক সংগীতের এই ভাব ও সুর এত সহজে আয়ত্ত করলো কি ক'রে—নাবালিকা রাধারাণী।

রাধারাণী শুধু যে কীর্তন-গানেই নিপুণা, তা নয়: উচ্চাংগ-সংগীতেও তাঁর পারদর্শিতা বড় কম নয়। এক

রাধারাণী

বৈষ্ণব-সাধকের স্নেহ-ছায়ায় ব'সে রাধারাণী যখন কীর্তন-গানের পাঠ নিচ্ছেন, সেই সময়েই মুর্শিদাবাদের নবাব-পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়ার সুযোগ ঘটে। মুর্শিদাবাদের নবাব-পরিবার চিরদিনই গুণীর সমঝদার। তাঁরা রাধারাণীর গান শুনে এতই মুগ্ধ হন যে, তাঁকে ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের কাছে উচ্চাংগ সংগীত শেখবার ব্যবস্থা ক'রে দেন। ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের কাছে রাধারাণী ঠুংরী ও গজল গান শেখেন। কীর্তনের মতই ঠুংরী ও গজলে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে ভবিষ্যৎ জীবনে।

মুর্শিদাবাদ ছেড়ে রাধারাণী এলেন ক'লকাতায়। এখানে আসায় কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হলো। একসময় তিনি—'রাধারাণী (রেডিও)' এই নামেই সংগীত-শ্রোতাদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

বেতারের মাধ্যমে রাধারাণী সংগীত-শিল্পী হিসাবে যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেন তার তুলনা নেই। একবার বেতার-কর্তৃপক্ষ যখন বেতার শ্রোতাদের কাছ থেকে জানতে চান যে, তাঁরা মহিলা সংগীত-শিল্পীদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন, তখন রাধারাণীর ভাগ্যেই সবচেয়ে বেশী ভোট জুটেছিল।

সংগীতবিদ্যায় রাধারাণী যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার একটা বিশেষত্ব হ'লো এই যে, যে-কোনো শ্রেণীর সংগীতেই তাঁর সমান দক্ষতা। কীর্তন, ঠুংরী, গজল বাদ দিলেও যাঁরা তাঁর ভজন, ভাটিয়ালী, ঝুমুর, পল্লীগীতি এমনকি আধুনিক গান শুনেছেন, তাঁরা নিঃসংশয়ে বলবেন যে—রাধারাণীর কণ্ঠে স্বয়ং বীণাপাণি বাস করেন।

বাংলার বাইরে ভারতের নানা জায়গায় গান গেয়ে রাধারাণী বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছেন। তার প্রধান কারণ, তাঁর কণ্ঠস্বরের ভাবসম্পদ, লালিত্য ও মাধুর্য; সেইসঙ্গে, তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দী ও উর্দ্দু উচ্চারণ।

ভারতবর্ষে গত চারবছরের মধ্যে যেসব নতুন বেতার-কেন্দ্র খোলা হয়েছে, তার কয়েকটি উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে রাধারাণী উদ্বোধন-সংগীত গেয়েছেন। এ সম্মান বড় কম নয়। দিল্লীর বেতার-কেন্দ্র বাঙালী-শিল্পীদের মধ্যে এই গায়িকাকেই সবচেয়ে বেশীবার দিল্লীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। দিলীপ রায়ের একজন অনুরাগী ভক্ত হলেন রাধারাণী। এমনও হয়েছে যে, দিলীপ রায়ের গানের আসরে রাধারাণীকে উপস্থিত হ'তে দেখে, দিলীপকুমার বহুবার তাঁকেই বলেছেন একখানি কীর্তন গেয়ে আসরের উদ্বোধন করতে। রাধারাণীর কণ্ঠে 'কৃষ্ণ কথা কও' গান-খানিই দিলীপকুমারের সবচেয়ে প্রিয়।

রাধারাণী বলেন—'এখনও আমার শিক্ষা সমাপ্ত হয় নি।' আশ্চর্য্য! কিন্তু, সত্যিই তিনি এখনও গান শিখছেন। কীর্তনগানে পরিপূর্ণভাবে পাণ্ডিত্যলাভ করবার জন্ম তিনি শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য নামে এক কীর্তন-বিশারদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। গুরু-শিষ্যা মিলে সম্প্রতি একটি কীর্তন-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও খুলেছেন।

অভিনেত্রী হিসাবেও রাধারাণী যশস্বিনী। রঙ্গমঞ্চের বহু নাটকে এবং ছায়াছবিতেও আমরা তাঁর পরিচয় পেয়েছি।

এ পর্য্যন্ত গত বিশ বছর ধ'রে তিনি গান গেয়েছেন প্রায় আড়াইশো গ্রামোফোন রেকর্ডে। তাঁর গাওয়া প্রথম কীর্ত্তন গানের রেকর্ডের একপিঠে ছিল 'কি মোহিনী জান বঁধু,' অন্যপিঠে ছিল 'ছি ছি মহারাজ'। সঙ্গীত-সম্বলিত ভূমিকায় তিনি নেমেছেন হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষার ছায়াচিত্রে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল—মানময়ী গার্লস্ স্কুল, কণ্ঠহার, কৃষ্ণসুদামা, রাঙা-বৌ, দেবযানী, চানক্য, প্রিয়বান্ধবী, দিক্‌শূল, রামানুজ, এ্যায়সা কেঁও, বাপ, বিচার, পরায়া ধন, পদ্মা প্রমত্তা নদী, মাইকেল মধুসূদন, তপস্যা, কুরুক্ষেত্র, মায়াকানন ইত্যাদি। 'মায়াকানন' ছবিটি পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার অসমাপ্ত ছবি এবং বর্ত্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষায় রয়েছে। ভূমিকাবর্জ্জিত হ'য়ে শুধু গান প্লে-ব্যাক করেছেন প্রথম এবং একমাত্র ছবি নিউ থিয়েটার্সের 'সৌগন্ধ' (হিন্দী)-তে চন্দ্রাবতী অভিনীত চরিত্রটিতে।

আজও তাঁর নতুন ক'রে শিক্ষালাভ ও সাধনার স্পৃহা তেমনি উদগ্র। বর্ত্তমানে তিনি সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে 'বৈতানিক' সঙ্গীত পীঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখছেন। সম্প্রতি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে অনুষ্ঠিত অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় জীবনে প্রথম রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়েছেন তিনি। যে গানখানি গেয়ে শ্রীমতী রাধারাণী এই অনুষ্ঠানে সমবেত রবীন্দ্র-সঙ্গীতানুরাগীদের পরিতৃপ্ত করেন তা' হোলো: 'এই তো ভাল লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়'।

রবিশঙ্কর

দিল্লীতে গণতন্ত্র দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন যে সব শিল্পী তাঁদের প্রত্যেককে মাত্র দশ মিনিট থেকে পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত জনগণের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন সঙ্গীত সম্বন্ধে আনাড়ী। অব্যবস্থার জন্য দু-একজন শিল্পী বেশ বিরক্তি বোধ করছেন এমন সময় এক শিল্পী তাঁর সেতার যন্ত্রটি নিয়ে মঞ্চের ওপর হাজির হলেন। যন্ত্রে দিলেন ঝঙ্কার। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী চুপ ক'রে তাঁর অপূর্ব্ব বাজনা শুনতে লাগলেন।

ইনিই হলেন ভারতবিখ্যাত সেতারী রবিশঙ্কর। আধুনিক কালের উদীয়মান কৃতী সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর বাজানোর মধ্যে শুধু যে গভীর স্নিগ্ধতা আছে তাই নয় তাঁর প্রয়োগ-পদ্ধতিও এত নিখুঁত যে তা কোন সমঝদার শ্রোতার কানই এড়িয়ে যেতে পারে না। উপস্থিত রবিশঙ্কর ঐক্যতানের সুর সৃষ্টির কাজে আত্মস্থ হয়ে আছেন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ঐক্যতান বাজনার সৃষ্টির কাজ বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা, ভারতীয়রা, জীবনের পথে এককভাবেই চলার পক্ষপাতী। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এখানেও একসঙ্গে বাজানোর চেয়ে এককভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করতে সকলেই চান। ঐক্যতান সম্বন্ধে এদেশের কয়েকজন সঙ্গীত-পরিচালক, বিশেষ করে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে, ঐক্যতানের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। অজ্ঞতা কিংবা শুধু ঝঙ্কার ঝঙ্কার খানিকটা দেখিয়ে চমকে দেবার ভাব নিয়েই এমন সব বিভিন্নধর্ম্মী সঙ্গীতকে মিশিয়ে ফেলেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই যা কদাচিৎ মিশে। ছায়াছবির সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন যে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে সঙ্গীতের সঙ্গতি-বর্জ্জিত, এমনকি সঙ্গীত পদবাচ্যই নয়।

যে ক'জন ভারতীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার সঙ্গীতেই সমান জ্ঞানের অধিকারী তাঁদের অন্যতম হলেন রবিশঙ্কর। আর তিনি এ দুইয়ের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করেছেন তাঁর সঙ্গীত সাধনায়।

রবিশঙ্করের জন্ম বারাণসীতে ১৯২০ সালে। প্রবাসে জন্ম হলেও রবিশঙ্কর বাংলাদেশেরই সন্তান। রবিশঙ্করের আদি নিবাস যশোহর জেলার কালিয়া গ্রামে। পিতা শ্যামশঙ্কর নিজে একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। যে-কালে কালাপানি পার ছিল প্রায় অপরাধ সেই সময় তিনি বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টারি পাশ করেন আর তারপর জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট অফ পলিটিক্স ডিগ্রী অর্জন করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য,

থাকেন। ১৯২৯ সালে মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বনামধন্য উদয়-শঙ্করের নৃত্যসঙ্গী হ'য়ে ইউরোপ ভ্রমণকালে প্যারিসে যান এবং এর তিন বছর পরে আমেরিকায় যাবার সুযোগও তিনি লাভ করেন। এই সব ভ্রমণ-অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি প্রথমে তিমিরবরণের আর পরে বিষ্ণুদাস শিরালীর সংস্পর্শে আসেন। এঁদের

রবিশঙ্কর

আর নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। ১৯২৩-২৪ সালে তিনি লণ্ডন সহরে সর্বপ্রথম তাঁর আত্মজ উদয়শঙ্করের নৃত্যানুষ্ঠান করেন। পারিবারিক এই সঙ্গীতানুরাগ সহজাতভাবেই রবিশঙ্করকে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। রবিশঙ্কর ছেলেবেলা থেকেই উদয়-শঙ্করের স্নেহ ও সহানুভূতি লাভ করে আসছেন। বয়োকনিষ্ঠ রবিশঙ্করকে উদয়শঙ্কর নিজের অর্কেস্ট্রাতে সেতার বাজানোর সুযোগ দিয়েছিলেন। শুধু যন্ত্রসঙ্গীত নয় রবি-শঙ্কর তখন থেকেই নৃত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং উদয়শঙ্করের তত্ত্বাবধানে নৃত্য-শিল্পেও স্বীয় দক্ষতার পরিচয় দেন। ছোট বয়সেই তিনি তিরিশ রকমের সঙ্গীত আয়ত্ত করে ফেলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী, দিলরুবা এবং হারমোনিয়াম বাজানোও শিখতে

দু'জনের মধ্যে কেউ না কেউ সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে উদয়শঙ্করের সঙ্গে যেতেন। যদিও রবিশঙ্করের কাজ ছিল অভিনয় এবং নৃত্যে অংশ গ্রহণ করা তবুও অবসর সময়ে সেতার বাজানোতেও তিনি বেশ আনন্দ পেতেন।

প্রতি বছরের মতো উদয়শঙ্কর ১৯৩৫ সালেও বিদেশে নৃত্য প্রদর্শনে গেলেন। সেবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন মাইহার রাজ্যের ভারত-বিখ্যাত স্বরোদশিল্পী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। তাঁর নজরে পড়লেন রবিশঙ্কর। তিনি রবিশঙ্করকে পরামর্শ দিলেন সেতার বাজনায় সাধনা করার জন্য। সেই থেকে রবিশঙ্কর পেলেন প্রচণ্ড উৎসাহ এবং সেতার বাজনাতেই একাগ্রচিত্ত হলেন।

এই একমুখী সাধনায় সিদ্ধিলাভে দুর্জয়সঙ্কল্প রবি-শঙ্কর ১৯৩৮ সালে গেলেন তাঁর পরমারাধ্য গুরু ওস্তাদ

আলাউদ্দিন খাঁর কাছে মুণ্ডিতমস্তকে যজ্ঞোপবীত ধারণ ক'রে। ওস্তাদজী তাঁকে বাহুবেষ্টনীতে আলিঙ্গন জানালেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁকে নৃত্যশিল্পী হিসেবেই দলে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রবিশঙ্কর দাদার সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেও তাঁকে মাসিক বাট টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হতো, আর তাতেই তিনি আহার ও বাসস্থানের খরচ সমাধা ক'রে যাচ্ছিলেন। দীর্ঘ একটানা একনিষ্ঠ সাধনা চলেছে, দিনে এমনকি ষোলঘণ্টা পর্য্যন্ত। সেতার বাজনার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ তখন তাঁকে সম্পূর্ণ পেয়ে বসেছে; তবুও দাদাকে খুশী করার জন্য তিনি গেলেন আলমোড়ার নৃত্যশিক্ষা কেন্দ্রে। সে শুধু দু'তিন মাসের জন্যে—বছর না ঘুরতেই আবার ফিরে এলেন মাইহারে। যন্ত্রশিল্পীর বিরামবিহীন সাধনা আবার শুরু হোলো কঠিন পথে, কঠিনতর ক্লেশস্বীকারে। এই সাধনায় সাড়ে ছ' বছর কাটলো গুরুগৃহে।

সংসারধর্ম্মের আর একটা দিকের সন্ধান তিনি পেলেন গুরুগৃহেই। ওস্তাদজীর কন্যা অন্নপূর্ণাকে তিনি আহ্বান জানালেন তাঁর সহধর্ম্মিণী হবার জন্য। অলক্ষ্যে দুজনেই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। নামে অন্নপূর্ণা হলেও মেয়েটি মুসলমানের কন্যা আর রবিশঙ্কর হিন্দু। 'সিভিল ম্যারেজ' আইন অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু এ-ব্যাপারেও তাঁর গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ স্বাগত জানালেন, বললেন,—'তুমি আমার কন্যাকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে বিবাহ করো। আমার কোনো আপত্তি নেই।' হলোও তাই, আর্য্য সমাজ প্রথানুযায়ী হলো তাঁদের বিবাহ।

এই সময় ওস্তাদজী চাইলেন তাঁর জামাতাবাবাজী যেন মাইহার রাজ্যেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে থেকে যায়—যেমন তিনি নিজে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু রবিশঙ্করের উচ্চাভিলাস সঙ্কীর্ণ স্থানে পোষ-মানা অবস্থায় থাকতে চায় না—তার চাই উন্মুক্ত অবারিত সুযোগ। বছরখানেক ভারত-ভ্রমণের পর ১৯৪৪ সালে তিনি সস্ত্রীক বোম্বাইতে গিয়ে সেখানেই বসবাস সুরু করলেন। সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে তিনি কৃতিত্ব দেখালেন 'আই-পি-টি-এ'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়া ইম্‌মরটাল' নৃত্যনাট্যে। তারপর চলচ্চিত্রজগতেও সঙ্গীত পরিচালনায় তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল—'ধরতী-কে-লাল' এবং 'নীচানগর' ছবি দুটিতে। এর পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 'ডিস্‌কভারী অব্ ইণ্ডিয়া' অবলম্বনে যে নৃত্য-নাট্যানুষ্ঠান হয় তাতেও তিনি সঙ্গীতাংশে সুর যোজনা করেছিলেন। এটি প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয় 'আই-এন্-টি' প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এবং পরের বারে হয় 'ইণ্ডিয়া রেনেসাঁ আর্টিষ্টস্' সম্প্রদায়ের উদ্যোগে। এই সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন তাঁরই দুই ভাই দেবেন্দ্রশঙ্কর এবং রাজেন্দ্রশঙ্কর। এই সম্প্রদায় ভারতের সর্ব্বত্রই বেশ সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে লাগলেন।

বোম্বাই ছেড়ে তিনি এলেন দিল্লীতে। দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে কাজ করতে লাগলেন। এই বেতার কেন্দ্র থেকে বিদেশের উদ্দেশ্যে

যে বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করা হতো সেই অনুষ্ঠানের পরিচালন-ভার নিলেন তিনি। বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি পারিশ্রমিক পান মাসিক এক হাজার টাকা। নিয়মিত স্থায়ী শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বোধ হয় এত মাহিনা পান। ঐক্যতান বাজনায় তাঁকে প্রতি মাসে চারটি ক'রে নতুন সুর দিতে হয়, তাছাড়া কয়েকখানি একক সঙ্গীত পরিবেশনও তাঁকে করতে হয়।

বাংলাদেশে সঙ্গীত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েও রবিশঙ্কর স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে গেছেন। সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি বাজালেন আলাউদ্দিনের সৃষ্ট 'হেমন্ত রাগ'। শুদ্ধ স্বরের এই রাগটিতে তিনি অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সেদিনের বাজনায় বীণ, স্বরোদ ও সেতারের কাজের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছিল। মীড়গমকের চমৎকারিত্বে আর তাললয়ের বৈশিষ্ট্যে তিনি সেদিন সকলের হৃদয় জয় করেছিলেন। এমন চমৎকার সুরেলা হাত ভারতে খুব অল্প শিল্পীরই আছে।

সংমিশ্রিত রাগ-রাগিণীর যে যে সুর আজ পর্য্যন্ত তিনি সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—'মোহনকৌশ'—এটিতে মালকৌশ রাগের কিছু অংশ আছে; 'গুঞ্জী-কানাড়া,' এর মধ্যে মালগুঞ্জী ও কানাড়া বা দরবাড়ীর ছোঁয়াচ পাওয়া যায়--ঠিকমতো বলতে গেলে এই সুরটিকে 'হাঁস-কল্যাণ'ও বলা যায়; আর হলো 'তিলক-শ্যাম,' এর মধ্যে পাওয়া যায় তিলক-কামোদ এবং শ্যাম-কল্যাণ নামক দুটি রাগের সংমিশ্রণ।

তাঁর প্রিয় রাগ-রাগিণী হলো—দরবাড়ী, কাফি, ভৈরবী এবং খাম্বাজ। ওস্তাদ আলাউদ্দিনের বিশেষভাবে সৃষ্টি করা 'জিলা' রাগের ঘরাণাও তাঁর খুব প্রিয় এবং ভক্তিমূলক আবেদনের জন্ত 'মন্দ' রাগেও তাঁর খুব আসক্তি আছে।

তাঁর বাজনার পদ্ধতি অতি আধুনিক এবং শিল্পীমাত্রেরই অনুকরণীয়। তাঁর স্বরবিন্যাসে একঘেয়েমী নেই। আলাপের রীতি সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যময়। তাঁর টিপের রীতিও নিজস্ব। তাঁর বাজনায় কখনো কসরতি বা পালোয়ানী মনোবৃত্তির পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে না। তাঁর জবর গমকে গমকে এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যময় জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি সুরের সাধকই শুধু নন, তিনি সুরের স্রষ্টাও।

কেবলমাত্র ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত-কলাতেই তিনি পারদর্শী নন নৃত্য-সঙ্গীত রচনাতেও তিনি অপূর্ব্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গত তিন বছর ধরে রবিশঙ্কর ভারতীয় রাগপ্রধান, হাল্কা ধরণের ও লোক সঙ্গীতের সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতের উপযোগিতা নিয়ে গবেষণা করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার উপাধি তাঁর সংগ্রহ করা হয়ে ওঠেনি সে শুধু তাঁর ঘুরে বেড়ানো এবং নৃত্য-শিল্পী হয়ে বিভিন্ন মঞ্চে অবতরণ করার জন্যই —আর এটা তিনি গোপনও করতে চান না। কিন্তু কয়েকটি ভাষার ওপর তাঁর বেশ দখল আছে। নিজস্ব মাতৃভাষা ছাড়া ইংরাজী এবং ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা তিনি অনর্গল সমানভাবেই বলে যেতে পারেন। হিন্দী ও উর্দ্দুও ভাল লাগে তাঁর এবং এই দুই ভাষার পুস্তকাদিও পড়তে পারেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও শরৎ-সাহিত্যকে তিনি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করেন।

ভারতীয় ছায়াছবিতে "লোকপ্রিয়তা"র অজুহাতে যে-সব গান চালানো হয়, সে সম্পর্কে রবিশঙ্করের যথেষ্ট আপত্তি বিদ্যমান। তাঁর মতে, অশ্লীল দৃশ্যাদি সম্পর্কে এ-দেশের সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষ যতখানি সজাগ, ভারতীয় চলচ্চিত্রের তথাকথিত "লোকপ্রিয়" সঙ্গীত সম্পর্কেও তাঁদের ঠিক ততখানি সজাগ থাকা উচিত। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গীত ঠিক কি ধরণের হওয়া উচিত, রবিশঙ্কর শুধু থিওরিতে নয়, কয়েকখানি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কাজেও তার সুস্পষ্ট পথ নির্দ্দেশ করেছেন।

বেতার কেন্দ্র থেকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচার সম্বন্ধে এক কথিকায় তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—'সঙ্গীতের মধ্যে সত্যিকার যে প্রাণবস্তু তা' যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। আজকাল সঙ্গীতে এসে পড়ছে সস্তা মাদকতা ও চটুলতা; এর জন্ত কিন্তু শিল্পী ও শ্রোতা উভয় দলই দায়ী—তাঁদেরই দুপক্ষের অনাদর অবহেলার জন্তই এই দুর্গতি সম্ভব হয়েছে।'

অন্তরালের সঙ্গীতশিল্পী

লতা মঙ্গেশকর

মেয়েদের মধ্যে প্লে-ব্যাক আর্টিস্টের নাম করলেই সব আগে নাম করতে হয় লতা'র। লতা দীননাথ মঙ্গেশকর (মঙ্গেশকর বা মুঙ্গেশকর নয়) আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ মহিলা-প্লে-ব্যাক আর্টিস্ট।

লতার বাবা ওস্তাদ দীননাথ মঙ্গেশকর মহারাষ্ট্রের একজন বিখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার ও সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। মহারাষ্ট্রের 'বলবন্ত্ সঙ্গীতমণ্ডলে'র তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। গোয়া-সহরের কাছেই বহু পুরাতন 'মঙ্গেশ'-দেবতার মন্দির। সম্ভবতঃ সেই মন্দিরের কাছাকাছি কোনো গ্রামে ছিল মঙ্গেশকর-পরিবারদের বাস। আসলে কিন্তু এঁরা মহারাষ্ট্রীয়।

লতার বয়স যখন ছয়, তখন তাঁর বাবা স-পরিবারে কোলহাপুরের কাছে সংলি নামে এক জায়গায় উঠে যান। সে ১৯৩১-সালের কথা। তারপর থেকে একাদিক্রমে দশ বছর তাঁরা সেইখানেই বসবাস করেন। এইভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বাস-পরিবর্ত্তনের ফলে লতা ও তাঁর ভাই-বোনদের উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা হয় না। লতা-ই সবার বড়—তাঁর পরে তিন বোন আর এক ভাই। স্কুলের নিয়মিত পাঠের বদলে লতা তাঁর বাবার কাছে সঙ্গীতের নিয়মিত পাঠ নিতে থাকেন। তাছাড়া, তাঁর বাবা যে-সব নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, তাতে বালক বা বালিকার কোনো ভূমিকা থাকলে লতাকে সেই ভূমিকায় অভিনয়ও করতে হ'তো।

লতার কণ্ঠস্বর ছেলেবেলা থেকেই মধুর। সেই কণ্ঠস্বরের নিয়মিত চর্চা হতো তাঁর বাবার কাছে। মিহি-গলায়, তাঁর সেই ছেলেবেলাকার গান শুনে সবাই বিস্মিত হতেন। দীননাথ মঙ্গেশকর ১৯৩৬ সালে যখন রঙ্গমঞ্চের পাট তুলে 'বলবন্ত্ পিকচার্স কর্পোরেশন' গঠন করলেন—লতাও তখন রইলেন সেই দলে। ছোট খাট ভূমিকাতে অভিনয়ও করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর বাবা বেশীদিন আর এভাবে খাটতে পারলেন না—তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হলো। তিনি পুণায় চ'লে এলেন—সেইখানে ১৯৪১-সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

লতার এবার পুরোপুরি কর্মজীবন। বাবা এমন কিছু রেখে যান নি—যাতে খুব স্বচ্ছলভাবে সংসার চলে। উপরন্তু ভাইবোনদের মানুষ ক'রে তোলার দায়িত্ব। তিনি 'নবযুগ পিক্‌চার্সে' চাকুরী নিলেন। এঁদের 'পহেলী মঙ্গলা গৌড়' ছবিতে লতা একটি পার্শ্ব-চরিত্রে নামলেন। সে-অভিনয় ভালই লেগেছিল সবার—বিশেষ ক'রে তাঁর গান।

সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে লতা গেলেন কোলহাপুরে—বাবুরাও বিনায়কের কাছে। বাবুরাও তাঁকে 'প্রফুল্ল পিক্‌চার্সে'র 'মজা বল্' ছবিতে একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দিলেন। তারপর থেকে (১৯৪৩-৪৭) বাবুরাও-এর প্রত্যেক ছবিতে (গজাভৌ, চিমুকুলা, সৌন্সার, সুভদ্রা, জীবনযাত্রা) লতা অভিনয় করেছেন।

প্রত্যেকটি ভূমিকাই ছিল ছোট—আর, তাতে অভিনয়-দক্ষতা প্রকাশের সুযোগও ছিল কম। কিন্তু লতার তাতে দুঃখ ছিল না—কারণ, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সংসার চালানো—উপার্জনের দিকটাই ছিল তাঁর কাছে তখন বড়—নামের কথা চিন্তা করার অবকাশ তখন তাঁর ছিল না।

এই সময়ে ডাক এলো প্লে-ব্যাকের। লতার সুমিষ্ট গানের কথা তখন চিত্রজগতের জল্পনা-কল্পনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে! সঙ্গীত-পরিচালক রামচন্দ্র তাঁকে দিয়ে 'সানাই' ছবিতে প্লে-ব্যাক করালেন। তারপর—দত্ত দাওজেকরের 'আপ কি সেবা মেঁ'।

১৯৪৭-সালে বিনায়ক মারা গেলেন।

লতা তখন অভিনয়ের পথ ছেড়ে দিয়ে গানের পথই ধরলেন। ক্রমে পুরোপুরি 'professional play-back singer'।

বম্বে-টকীজের 'মজবুর' ছবিতে লতার গান-ই এনে দিল বিজয়মালা, ভবিষ্যৎ-জীবনের ভিত্তি হলো দৃঢ়তর।

যে-সব হিন্দী ছবিতে গান ক'রে লতা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন—সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"[illegible]রে",

"জিদ্দী', "আনোখা প্যার", "আন্দাজ", "বরসাত", "পতঙ্গা", "মহল", "নাগিনা", "অমর ভূপালী", "আলবেলা"। একই ছবিতে বিভিন্ন নারীকণ্ঠের হয়েও লতাকে গান গাইতে হয়েছে কয়েকবার।

প্লে-ব্যাকের দিক থেকে মেয়েদের মধ্যে এখন সবচেয়ে বেশী উপার্জ্জন করছেন লতা।

লতার ব্যক্তিত্ববোধ অসাধারণ। কখনও অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করবার প্রবৃত্তি নেই তাঁর। কোন বিষয়ে কখনও কোনো পরিচালকের সঙ্গে তাঁর মতের মিল না হলে—সেখানে তিনি কাজ করেন না—বেশী টাকা দিলেও না।

লতা নিয়মিত দেশী ও বিদেশী ছবি দেখেন। রান্নার দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁক। ভালো রাঁধ্‌তেও পারেন। লতা এখন পাকা গৃহস্থ। অবিশ্যি বিয়ে না করেই। বোম্বাই সহরের নানাচকের কাছে ছোট্ট বাড়িতে ভাই বোনদের নিয়ে তিনি থাকেন। চমৎকার সাজানো-গোছানো সে-বাড়ী। ইতিমধ্যেই তাঁর ছোট বোন আশা আর ভাই হৃদয়নাথ সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করেছে—অবশ্য তাঁরই শিক্ষায়। আশা ও হৃদয়নাথ এখন তাদের দিদির মতই প্লে-ব্যাক আর্টিস্ট হয়ে ছায়াছবিতে গান গাইছে।

লতা মঙ্গেশকর

গীতা রায়

গীতা রায় আর লতা মঙ্গেশকর দু'জনেই খুব নাম করেছেন প্লে-ব্যাকের দিক থেকে। জনপ্রিয়তার কথা তুললে লতার স্থানই প্রথম—কিন্তু, কণ্ঠমাধুর্যের দিক থেকে যেন গীতার সমাদরই বেশী। লতার গানে 'কাজ' বেশি, কিন্তু স্বরধারা যেন অতি তীক্ষ্ণ—ভাবের চেয়ে স্বরের প্রাধান্যই বেশি। আর, গীতার গানে তুলনায় 'কাজ' কম হলেও, স্বরের মধ্যে স্নিগ্ধতা আছে—স্বরের চেয়ে তার ভাবের প্রাধান্যই বেশি।

তেইশ বছর আগে পূর্ব্ববঙ্গের ইদিলপুরে গীতার জন্ম। তাঁরা ন' ভাইবোন—তিনি সপ্তম সন্তান। তাঁর বাবা শ্রীযুত ডি, এন্, রায়—বাংলা দেশ ভাগ হবার পর—বোম্বাইতে গিয়েই বসবাস করছেন। গীতা সেখানেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেবার সুযোগ পান—এবং অল্পদিনের

মধ্যেই সুনাম অর্জ্জন করেন। গীতা অনেকটা তাঁর নিজের চেষ্টা বা সাধনায় এতখানি সুনামের অধিকারিণী হয়েছেন। কারণ সঙ্গীতগুরু বলতে ঠিক যা বোঝায়, কোনদিনই সে-রকম গুরু তাঁর নেই। স্বভাবতঃই তাঁর গান আসে, গানকে তিনি ভালোবাসেন।

১৯৪৫-সালে তাঁদের পরিবারের এক বন্ধু তাঁর গান শোনেন—শুনে তাঁর খুব ভালো লাগে। তিনিই গীতাকে নিয়ে যান সঙ্গীত-পরিচালক হনুমান প্রসাদের কাছে। তিনিও গীতার গান শুনে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে 'বিষ্ণু সিনেটোন'-এর 'প্রহ্লাদ' ছবিতে একটি সমবেত-সঙ্গীতে এক লাইন একক-গানের সুযোগ দেন। প্রথম চেষ্টাতেই সফল হওয়া খুব সহজ নয়। কিন্তু সেই একটি লাইনই সবাইকে মুগ্ধ করে। গীতার প্রথম চেষ্টা সার্থক হয়। এই ভেবে সেদিন বোধ হয় গীতাও মনে মনে খুশি হয়েছিলেন। ছোট্ট এক কলি গানই গীতার পরবর্ত্তী জীবনের আলোক-বর্তিকা হয়ে থাকে।

এর পর, কত ছবিতেই যে গীতা অন্তরালের গায়িকা হয়ে ছায়াছবির দর্শক-শ্রবণকে পরিতৃপ্ত করেছেন তার হিসেব করা কঠিন। তিনি নিজেও তার হিসেব রাখেন না। তবে হাজার ছাপিয়ে গেছে বলেই তাঁর ধারণা। প্লে-ব্যাকে যত গান তিনি গেয়েছেন—তার মধ্যে তাঁর নিজের পছন্দসই গান গেয়েছেন—'দো ভাই', 'শহীদ', 'মজবুর', 'শবনাম', 'যোগন' আর 'বাজী'তে। নিজের বসবার ঘরের তাকে থরে থরে সাজানো থাকে তাঁর রাশি রাশি গানের রেকর্ড—অবসর সময়ে নিজের পুরানো গান বাজিয়ে শোনেন তিনি—যেমন, আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা অবসর সময়ে ফাইল ঘেঁটে নিজের বহু-পুরানো লেখা পড়তে গিয়ে আনন্দ পান।

গানের নেশা এক—পেশা আর এক। পেশাদার গায়িকা হ'তে গিয়ে গীতার কি কম বিড়ম্বনা! রোজ প্রায় গোল ঘণ্টাই কাটে স্টুডিওতে স্টুডিওতে—কোথাও গানের 'রিহার্সেল', কোথাও 'টেক' বা 'রেকর্ডিং', কোথাও বা নতুন ক'রে রেকর্ডিং অর্থাৎ 'রি-টেক'! যদিও উপার্জনের অঙ্কটা সবার জানা নেই—তবু, লোকমুখে শোনা যায় মাসে গীতা কয়েক হাজার টাকা পান পারিশ্রমিক হিসেবে।

গীতা রায়

'প্লে-ব্যাক সিঙ্গার্স এ্যাসোসিয়েশন' ব'লে যে প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি গ'ড়ে উঠেছে গীতা তার সহ-সভানেত্রী। জলসার তালিকায় আজ তাঁর নাম দেখলেই প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে ওঠে। চ্যারিটি-শো'র উদ্যোক্তারা তাঁকে পেলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন—কারণ, তাঁদের টাকা পুরোপুরি উঠে আসে গীতার গানের জোরে।

সুনামের বিড়ম্বনাও বড় কম নয়। ভক্তদের অসংখ্য পত্রাঘাতে গীতা আনন্দিতও হন যতখানি অস্বস্তিও বোধ করেন তার চেয়ে অনেক বেশী। কারণ আজকাল অধিকাংশ চিঠির মধ্যেই এক প্রশ্ন—'কবে নাগাদ বিয়ে করছেন?' ভক্তির এই কি নমুনা! কিছুদিন আগেও প্রশ্ন হতো—'কাকে বিয়ে করছেন?' কিন্তু, সেটা যখন একরকম ঠিক—তখন দিনক্ষণের জন্যেই যেন পত্রলেখকদের কৌতূহল। 'জাল' ও 'বাজী'-র চিত্র-পরিচালক গুরু দত্তের বাগ্‌দত্তা এখন গীতা রায়—শোনা যায়, কোষ্ঠীর ফলাফলের বিচারে তাঁদের বিয়ের দিন পিছিয়ে গেছে—১৯৫৩ সালের আগে তা সম্ভব নয়।

প্রিয় সম্পাদকভায়া,

সেদিন আমার বাঞ্ছারাম আমাকে একেবারে সিদ্ধপুরুষ ক'রে ছেড়েছিল। বাঞ্ছারামকে চিনলে না বুঝি? ও হরি, তাইতো বটে। চিনবে কি ক'রে? আমার নতুন বাহন। খাস শ্বশুর-বাড়ীর দেশের লোক। কোনো কিছু বাঞ্ছা করলেই, সঙ্গে সঙ্গেই বাঞ্ছাপূরণ! জল চাইলে গামছা এনে দেয়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে—জল খেতে গেলেই হুজুরের জামায় জল গড়িয়ে পড়বার একটা অভ্যাস আছে—কাজেই, গামছাটা দিলাম গলায় জড়িয়ে রাখবার জন্য। কাজেই, বুদ্ধির ধারটা একবার ধারণা কর। এ-হেন বাঞ্ছারামকে সেদিন বলেছিলাম —'ওরে, একটু তরিবৎ ক'রে সরবৎ কর দিখিনি—খেয়ে শরীল-টা একটু শেতল করি!' তা হাঁদারাম আমাকে এমন খাট্টাই সরবৎ খাওয়ালে যে, চোখে এখনও কেবল হর্ত্তনের ফোঁটা দেখছি! সিদ্ধি খাইয়ে ব্যাটা আমাকে একেবারে সিদ্ধপুরুষ ক'রে ছেড়েছিল সেদিন। সিদ্ধির জোরে উনপঞ্চাশ মিনিটের মধ্যেই একেবারে নরলোক থেকে ব্রহ্মলোকে!

ভায়া বলব কি ছাই। ব্রহ্মলোকের নন্দনকাননে তখন জৌলুসের ফোয়ারা! বিরাট গেট তৈরী হয়েছে—গেটের মাথায় প্লাষ্টিকের প্রকাণ্ড সাইন বোর্ড—তাতে উঁচু উঁচু অক্ষরে লেখা "NEW HOLY-WOOD FILM PRODUCTION"! মইরেচে মাকুন্দা—স্বগ্‌গে এসেও রেহাই নেই—এখানেও ফিল্ম! গেটের কাছে দরোয়ান-টরোয়ান কেউ নেই—কেবল একটা ষাঁড় ব'সে এক খিঁড়ে পান চিবুচ্ছিল। আমাকে দেখেই ব'লে উঠল—দিব্যি মানুষের গলায়—বাবার পেসাদ পেয়েছ যখন, আসতেই হবে! পেসাদের গুণ দেখ, স্ব-শরীরে স্বগ্‌গ লাভ!

বুঝতে আর বাকি রইলো না যে, ষাঁড়টি মহাদেবের আদি অকৃত্রিম বৃষভরাজ।

ষাঁড়বাবাজীর ল্যাজে একটা পেন্নাম ঠুকে বললাম "আপনি ত্রি-কালজ্ঞ মহাপুরুষ—আপনি ধ'রেছেন ঠিক! বাঞ্ছারামের কৃপায় বাবা ভোলানাথের কিঞ্চিৎ পেসাদ পেয়েছিলাম।"

—"তা বেশ! কিন্তু হাঁ ক'রে দেখছ কি? স্বগ্‌গ আর সে-স্বগ্‌গ নেই! নন্দনকাননে এখন ফিলিম উঠছে—দেখছ না—"New Holy-Wood Film Production"?

—"তা তো দেখছি, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিনা।" ফিক্ ক'রে সেরখানেক পানের পিক ফেলে ষণ্ডরাজ বললেন—"Holy-Wood" বুঝলে না? পবিত্র-কানন! নন্দনকাননের ইংরেজী নাম। ইংরেজী ভাষা হাজার হ'লেও আন্তর্জাতিক ভাষা তো? আমরাও তাই ইংরেজীতে সাইন বোর্ড টাঙিয়েছি। New কথাটি বসাতে হয়েছে—Copy-right-এর ভয়ে। Hollywood আর Holly-Wood-এর অত তফাৎ কে বোঝে বল? কোনদিন আবার মার্কিন-সরকার ধাঁ ক'রে International Court-এ Copy-right-এর মামলা জুড়ে দেয়, সেই ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আমাদের প্রজাতন্ত্রী-স্বর্গের প্রথম রাষ্ট্রপতি বিষ্ণুরাম-বাবু এই মতলব

ঠাউরে দিয়েছেন। আর শেষের দিকটা তো বুঝতেই পারছ হাজার হোক 'চিত্রবাণী'র সম্পাদক তো তোমার বন্ধু, তিনি তো সবই জানেন। Film Production তোমাকে আর কি বোঝাব?

যণ্ডরাজের কথায় সব জলের মত টলটল। স্বর্গরাজ্যও আর মান্ধাতা আমলের স্বর্গধাম নেই এখন প্রজাতন্ত্রী স্বর্গ। স্বয়ং বিষ্ণু প্রেসিডেন্ট। Film industry-র দিকে সবিশেষ জোর দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, ছবির মারফৎ স্বর্গের হালচালটা জগৎকে জানিয়ে দেওয়া, সেইসঙ্গে নরধামের বস্তাকয়েক টাকা তুলে আনা। স্বর্গধামের Revenue নাকি আগের মত ঠিক আদায় হচ্ছে না। তাই, এঁরা Film industry মারফৎ, স্বর্গের Public Exchequer পাকাপোক্ত ক'রে ফেলতে চান।

খবর নিয়ে জানলাম—New Holy-Wood Film Production একটা limited company। মেম্বার-বর্গের মধ্যে আছেন কুবের শেঠ (Financier); ভোলানাথ শূলপাণি (Producer); দৈবকীনন্দন ঘোষ (Director); আর, গণপতি গজানন (Scenerist); টেকনিশিয়ানদের মধ্যে আছেন—চিত্রসেন গন্ধর্ব (Cameraman); মেঘনাদ লঙ্কাসুন্দরম্ (Recordist); (ইনি রাবণনন্দন হ'লেও মরবার পর স্বর্গে এসে আত্মশুদ্ধি ক'রে দৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছেন—অতএব দেবকুলে কলুকে জুটেছে!); বিশ্বকর্ম্মা গড়াই (Set-নির্ম্মাতা!); সত্যনারায়ণ ঠাকুর (Editor) আর শুক্রাচার্য্য ঋষি (Laboratory-in-charge)।

যণ্ডরাজের নির্দ্দেশিত পথে সোজা ষ্টুডিওর মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। ঢুকতেই একজনের সঙ্গে ধাক্কা। ভদ্রলোক সামলে নিয়ে বললেন—"দুঃখিতম্! আপনি?"

সবিনয়ে নিজের ভিজিটিং কার্ডটা এগিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক সসম্মানে একখানি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন—"বসুন বসুন! নরলোক থেকে এসেছেন, আপনি আমাদের গেস্ট! ওরে কে আছিস—বাবুকে এক কাপ গরম [illegible] দিয়ে যা!"

[illegible] নেই (সিদ্ধিতেই এত, না-জানি সোমরসে আবার কোন্ লোকে যেতে হয় সেই ভয়!) আমি এসেছি আপনাদের ছবি তোলা দেখতে!"

ভদ্রলোক বললেন—"তাতো বুঝতেই পারছি। চলুন তা হ'লে দু'নম্বরে। সেখানেই আজকের সুটিং হচ্ছে।

—"ছবিটার নাম?"

—"স্বর্গ থেকে দূরে।"

—"কার লেখা?"

—"মহাকবি কালিদাসের অতিবৃদ্ধ প্র-পৌত্রের। বেড়ে লেখেন।"

—"বিষয়বস্তুটা সংক্ষেপে বলবেন একটু?"

—"কেন বলব না? এ-ছবির প্রচারই তো আমার কাজ। আমি এখানকার Publicity Chief—আমার নাম নারদেন্দ্র বারিন্দির!"

কী সর্ব্বনাশ! স্বয়ং নারদ মুনি! একেবারে চিনতেই পারিনি। চিনব কি ক'রে? 'মহাভারতে'র ছবিতে দেখা সে নারদ তো আর নেই—একেবারে ফিটবাবু। গায়ে হাওয়াইয়ান সার্ট, চোখে কালো চশমা, পরণে ট্রাউজার!

নারদেন্দ্র বারিন্দির মশাই সংক্ষেপে গল্পটা যা বললেন তার সারাংশ হলো—এক দেবকন্যা জনৈক মনুষ্যপুত্রের মহব্বৎ-মে গির পড়ি। কিন্তু মনুষ্যপুত্রকে ভালোবাসতেন এক রাক্ষসসুন্দরী। সেই রাক্ষসসুন্দরীকে আবার কামনা করতেন কস্মিন্ দেবস্য পুত্র। আবার সেই দেবকুমারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন এক নরসুন্দরী!—কাজেই, ব্যাপারটি খুব জটিল! কিন্তু কালিদাসের অতি বৃদ্ধ প্র-পৌত্রের লেখনীর গুণে—কাহিনীটা শেষ পর্য্যন্ত মিলনান্তক-ই হয়েছে। দেবকন্যা, নরকন্যা, রাক্ষসকন্যা, আর দেবকুমার, নরকুমার রাক্ষসকুমার আপোষে স্থির করেছেন—বছরে দুটোমাস ক'রে ওঁরা এক একজনের সঙ্গে বিয়েতে বসবেন। অর্থাৎ—প্রথম দু'মাসে—দেবকন্যা + নরকুমার; নরকন্যা + রাক্ষসকুমার, আর, রাক্ষসকন্যা + দেবকুমার। দ্বিতীয় দু'মাসে—নরকন্যা + নরকুমার;

রাক্ষসকন্যা + রাক্ষসকুমার, আর, দেবকন্যা + দেবকুমার। তৃতীয় দু'মাসে রাক্ষসকন্যা + নরকুমার; দেবকন্যা + রাক্ষসকুমার; আর, নরকন্যা + দেবকুমার—এইভাবে permutation combination ক'রে যাও, ফলাফল সহজেই টের পাবে।

নারদেন্দ্র বারিন্দির হেসে বললেন—"কেমন লাগলো প্লটটা ?"

—"খাসা! এরকম প্লট এ-যাবৎ দেখা যায়নি স্যর! আপনারা আমাদের বোম্বাইকেও টেক্কা মেরে গেলেন।"

—সত্যি বলতে কি, এই কাহিনী দিয়েই আমরা World Market লুটে নিব! দেখে নেবেন আপনি বারিন্দির ঠিক বলেছে কিনা—ছবি release হ'লে মিলিয়ে নেবেন। আমরা এ-ছবি তুলছি সংস্কৃত ভাষায়—কারণ সেটাই এখানকার State language। কিন্তু Heaven-এর জন্য ইংরেজীতে, আর বেহেস্তের জন্য উর্দ্দুতেও তোলা হবে।"

—"কিন্তু নরলোকের জন্য ?"

—"সে ব্যবস্থাও আছে, নরলোকের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় Sub-title জুড়ে দেওয়া হবে। আপনাদের বুঝতে একটুও অসুবিধা হবে না।"

—"দয়া ক'রে যদি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নামটা বলেন স্যর!"—কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করি।

—"নায়িকাদের ভূমিকায় আছেন—শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী; দ্রৌপদীয়া মানবী; আর, প্রমীলা রাক্ষসী। নায়কদের ভূমিকায় আছেন—অর্জ্জুনকুমার, কৃষ্ণবরণ, আর, বৃত্রনাথ। তাছাড়া, বাপ মায়ের পার্টে—চিরকেলে বাপ—জনকদেব আর চিরেকেলে মা জননীদেবীও আছেন।"

—"কিন্তু, নায়ক ও নায়িকা তো আর একটা ক'রে নয়।"

—"তা হোক! আমরা একজোড়া জনক জননী

দিয়েই কাজ সেরে নিয়েছি! বেশী জনক জননী হ'লে নায়ক নায়িকার সংখ্যা যে আরও বেড়ে যাবে মশাই!"

যোক্ষম কথা! এর ওপরে বলবার কিছু নেই!

ছ'নম্বর ষ্টুডিওতে এসে আমরা থামলাম। বিরাট একটা সেটে বিরাট একটা নাচের দৃশ্য তোলা হচ্ছে। প্রচার কুশলী বারিন্দির ঠাকুর বল্লেন—"প্রথম ছ'মাসে যে বিয়ে—তাতে এই নাচটা আছে। নৃত্য-পরিকল্পনা করেছেন নটরাজ দিগম্বর স্বয়ং!"

স্বয়ং উর্ব্বশী নাচছেন সেণ্টারে। তাঁকে ঘিরে মেনকা রম্ভা, অরুণা, বরুণা, মুরলা প্রায় সাড়ে বত্রিশ ডজন Heavenly Dancer! বলব কি ভাই, নাচ দেখে মাথাটা বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরতে লাগলো। পায়ের কি ঠমক, চোখের কি চমক! বুকের কি উচ্ছ্বাস, ঘন ঘন নিঃশ্বাস! মুখের কি হাস্য, গালের কি লাস্য! পরণের সজ্জা—নেই লাজ-লজ্জা!

বারিন্দিরের কানে কানে বল্লাম—"নর্ত্তকীদের Costume-গুলি কিন্তু খাসা! এরকম ডিজাইন পেলেন কোত্থেকে এঁরা?"

—"এটা আমরা বোম্বে থেকে ধার করেছি। বুঝলেন না, Censor আছে তো? তাই আর খোলাখুলি-ভাবে Sex-appeal দেখানো সম্ভব নয়। ওটা পোষাক-আসাক আর অঙ্গভঙ্গীর মধ্য দিয়েই পুষিয়ে নেওয়া হয়েছে। বোম্বে এ জিনিষটা ভালো বোঝে!"

—"তা সত্যি। কিন্তু Censor-এর কথা বললেন—এখানে censor করেন কে?"

—"কেন, স্বয়ং যমরাজ। কাঁচি উঁচিয়েই আছেন। কিন্তু Sex-appeal জিনিষটা এমনই ছোঁয়াচে যে, এক বার চোখে লেগেছে কি মরেছেন। প্রথম উর্ব্বশী এক-খানা স্ফটিকস্বচ্ছ শাড়ি পরেই নাচছিলেন—কিন্তু যমরাজ বাগড়া দিলেন। বললেন—"দেখ বাপু এরকম নাচ pass করলে—আমার আর মান থাকবে না! তার চেয়ে বরং মোটা জিনিষ পরে, শরীরের বাঁধুনিগুলো চোখা চোখা ক'রে যত [illegible] appeal দেখিয়ে যাও—কিছু বলব না!" [illegible] Censor! Sex-appeal যত ইচ্ছে থাকুক ক্ষতি নেই—তবে একটু আড়ালে আবডালে—বুকের শাড়ি বুক থেকে পড়ব পড়ব ক'রবে, কিন্তু পড়তে পাবে না—এই রকম আর কি!"

—"আপনি বিচক্ষণ! ঠিক ধরেছেন।" বারিন্দির উর্ব্বশীর বক্ষ-হিন্দোলের দিকে 'তিরছী নজর'-টা রেখেই আমার কথার জবাব দেন।

আবার প্রশ্ন করি—"তা এ-ছবিটা কোন্ সার্টিফিকেট পাবে? A, না, U? অর্থাৎ Adult, না, Universal?

—"আমাদের এখানে তোলা ছবির একই সার্টিফিকেট। অর্থাৎ UA, মানে Universal Adult-দের জন্য। আসলে ছবি যখন অপ্রাপ্তবয়স্করা দেখবেই, তখন আর শুধু 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য'—এই ছাপ মেরে লাভ কি?"

একটা উপযুক্ত সমাধান! Censor-কর্ণধার যমরাজের দেখছি হেড-অফিসে কিছু বুদ্ধি আছে! কি বল তোমরা?

এর পর একে একে অনেক তথ্যই আবিষ্কার করলাম প্রচার-জেনারেল নারদেন্দ্র ঠাকুরের কাছ থেকে।

'স্বর্গ থেকে দূরে'—ছবিতে এঁরা গান রেখেছেন সবসুদ্ধ সাড়ে তেরোটি। মিলনের সময় কোনো গান নেই—গান আছে—খেতে বসার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে, রোগীর নাভিশ্বাস ওঠবার ঠিক আগে, আর মরবার ঠিক পরেই। এগুলি Solo। আর, Chorus রাখা হয়েছে খেতে খেতে, নাক ডাকতে ডাকতে, আর অঙ্ক কষতে কষতে। সাত-খানি Solo, ছ'খানি Chorus আর দু'মাসের একটি মেয়ের মুখে আধখানা—হাপকাপ চায়ের মতো। স্বয়ং তানপুরাপাণি সরস্বতী একাই সব মেয়ের হয়ে playback করেছেন—আর, ছেলেদের হয়ে playback করেছেন বিদ্যাপতি ঠাকুর (বর্ত্তমানে ইনি প্রথম স্তরের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের দেবতা)! সঙ্গীত পরিচালনা অবিশ্যি একজনের নয়—তাতে এঁরা অনেককে Chance দিয়েছেন। যথা: ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, কমলাবাহিকা পেচকরাজ, বাগ্দেবী-বাহিকা হংসরাজ কেউ বাদ যায় নি। সুরসৃষ্টিতে নাকি এঁদের কারো জুড়ি নেই—দেবদেবীর তাই অভিমত।

বারিন্দির বল্‌লেন—"এ রকম গান ফিলিম-ইতিহাসে এই প্রথম! দেখবেন—এর সব ক'টা গানই হিট্ হয়ে যাবে।"

—"সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই! তবে, 'লারে-লাপ্পা'কে যদি ডিঙিয়ে যেতে পারেন—তবেই যা ভরসা!"

—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমাদের এ-ছবির গান তার চেয়েও কড়া।"

—"কড়া পাকই ভালো—রসিয়ে রসিয়ে মালুম হয়!"

বারিন্দিরের কাছেই শুনলাম—শকুনি. দুর্বাসা, অষ্টাবক্র, আর মন্থরা, এ-ছবির villain-দের ভূমিকায় নেমেছেন। villainy-র গন্ধ একবার গায়ে লেগেছে বাবা, তখন কি আর সহজে যাবে!

ছবিতে হাসির কাতুকুতু দিয়েছে স্বর্গধামের মাণিক-জোড়—নন্দী আর ভৃঙ্গী।

মোটকথা—হেন রস নেই যা এ-ছবিতে নেই। তার ওপর Multicolor-এ তোলা! কোথায় লাগে Technicolor?

বারিন্দিরের কাছেই জানতে পারলেম—খুব শীগ্‌গিরই এঁরা Heaven-এ গিয়ে ছবির প্রথম উদ্বোধন করবেন। এঁদের ধারণা, স্বর্গের চেয়ে Heaven-এর god-goddess-রাই ছবি বোঝেন বেশি! বলাবাহুল্য সে-উদ্বোধনে ছবির পরিচালক তাঁর নায়ক-নায়িকাদের নিয়েই উপস্থিত থাকবেন!

বাঞ্ছারামের সিদ্ধির জোরটা তখন কমে আসছিল—তাই তাড়াতাড়ি করতে চলো। কি-জানি শেষটায় ঘোর কাটলে বেঘোরে পড়ে যাই! অর্থাৎ, স্বর্গেই যদি থেকে যেতে হয় জলজ্যান্ত আমাকে। খুব ভয় হলো! একেই তো অতর্কিতে বাড়ী ছেড়ে এসেছি—শেষটায় সময়মতো ফিরতে না পারলে—একটা পারিবারিক অশান্তি! কাজ-কি-বাপু অত ঝামেলায়, এবারে মানে মানে স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে নরলোকে নামতে পারলেই হলো।

আমি তাই বিদায় নিতে গেলাম—Producer ভোলানাথ শূলপাণির কাছে। নারদেন্দ্র বারিন্দির introduce করিয়ে দিল—'চিত্রবাণী'র হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীমান্ ধুরন্ধর শর্মা—আর, ইনি আমাদের—"

সবিনয়ে বলি—"আর বলতে হবে না, বলতে হবে না—ওঁকে না চেনে কে?"

শূলপাণি একটু মুচকে হাসলেন। বল্‌লেন—"বারিন্দির, তুমি তো ছবির বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করেছ—তা একেই দিয়ে দাও না এক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন 'চিত্রবাণী'র জন্য।"

—"আপনার আজ্ঞা পেলেই—"

—"হাঁ, দিয়ে দাও। একেবারে cover-টাই book ক'রে ফেল। Payment-এর জন্য যেন না ভাবে এরা ছবি release করলেই আমরা টাকা পাঠিয়ে দেব—মারা যাবে না, বুঝলে হে ছোকরা!"

ঘাড় নেড়ে বললাম—"বুঝেছি, আর বলতে হবে না স্যার মানে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য (হয়ত বা চিরকালের জন্যই!) আশা ও ভরসাটাকে বাক্সবন্দী ক'রে রাখতে হবে—এই তো? সে আমাদের খুব অভ্যাস আছে।"

শূলপানি আবার বললেন—"এই সঙ্গে ছবির একটা ছোট রাইট-আপ—দশ বারো পাতার মধ্যে লিখে দাও বারিন্দির—আর খান পঁচিশেক ছবি।

সেই রাইট-আপ আর ছবি, বাঞ্ছারামের হাতে তোমার কাছে পাঠালেন। দেবতাদের যদি না চটাতে চাও বন্ধু তাহলে গাঁটের কড়ি খরচ করে ব্লক করিয়ে ছেপে দাও—রাইট-আপ সুদ্ধু। বিজ্ঞাপনের টাকা পাও আর নাই পাও—স্বর্গে গিয়ে Press-Show দেখবার একটা নেমন্তন্ন নিশ্চয়ই পাবে। পাঁঠার দোকান করার পরামর্শ শোনোনি—এবারে ঠ্যালা সামলাও। ইতি

—ধুরন্ধর

বিংশ শতকের নাট্যধারা

সুবোধকুমার ঘোষ

★

উনিশ শতকের শেষের দিকে আমাদের জাতীয় আন্দোলনে যেমন হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনের ঝোঁক উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, নাট্য-আন্দোলনেই তেমনি হিন্দুধর্ম্মের প্রবণতা ক্রমশঃ বাসা বাঁধতে চাইছিল। নাটক বিবর্ত্তনশীল সমাজেরই সৃষ্টি, সমাজ বিবর্ত্তনের পটভূমিতেই দানা বাঁধে নাট্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা, নাট্য-আন্দোলন সামাজিক আন্দোলনকে তাই উপেক্ষা করতে পারে না। গিরিশচন্দ্র তাঁর অনেকগুলি পৌরাণিক ও ভক্তিরসাশ্রিত নাটক রচনা ক'রেছিলেন উনিশ শতকেরই শেষের দিকে।

ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগত মালিকানায় কয়েকটি সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। বিশ শতকেও তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এইসব নাট্যশালার মধ্যে প্রধান হিসেবে নাম করা যেতে পারে ষ্টার (১৮৮৩), মিনার্ভা (১৮৯৩) ও ক্লাসিকের (১৮৯৭)। ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও মূলতঃ শ্রেষ্ঠ অভিনেতারই প্রাধান্য চলছিল এইসব নাট্যালয়ে। ষ্টার ও মিনার্ভা গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় খোলা হয় বলে জানা যায় আর ক্লাসিক খোলা হয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অধ্যক্ষতায়।

নাট্য-আন্দোলনের তখন শৈশব অবস্থা। সবে সাধারণ নাট্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জাতির তৎকালীন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামকে রূপ দিয়ে তখন নাটকও রচিত এবং অভিনীত হয়েছে। জাতীয় আন্দোলন তখন সামাজিক বিবর্ত্তনের ধারার সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর হ'তে চেয়েছিল, অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবোত্তর উৎপাদন ব্যবস্থার যে ধারাটি এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল শাসকশ্রেণী এদেশের নবজাত বণিকশ্রেণী [illegible] নিয়েছিল আর মেনে নিয়েই সুরু [illegible]। [illegible] এই সময় [illegible]ত্রিক বিবর্ত্তনের ধারার কাছাকাছিই চলতে চেয়েছিল, নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গড়তে চেয়েছিল সমাজকে। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কুসংস্কার, উচ্ছৃঙ্খল ইয়ং বেঙ্গলের অনাচারকে কষাঘাত ক'রে অত্যাচারের সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামে আর জাতীয় স্বাধিকারের প্রেরণা দিয়ে নাট্যধারা অগ্রসর হ'তে চাইছিল তখন। কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্ঘরূপ খর্ব্ব হয়ে, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর জাতীয় নাট্যকার মাইকেল-দীনবন্ধুর মৃত্যুতে (১৮৭৩) শিশু নাট্যশালা অবসন্ন হয়ে পড়ল, গীতিনাট্য, রঙ্গনাট্য ধাঁচের নাট্যাবলী এগিয়ে এল নাট্যধারাকে ঠেকা দিতে। নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্র দেখা দিলেন এই সময়েই (১৮৭৭)। নাট্যশালা ও নাট্যধারা আবার প্রাণ পেল।

কিন্তু জাতীয় আন্দোলন যেমন পা বাড়ালো হিন্দু পুনরুজ্জীবনের পথে, ধর্ম্মভাবও ঠিক তেমনি উপছে পড়ল নাট্যধারায়। সমাজের স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের ধারা থেকে জাতীয় আন্দোলনের ধারা যেমন দূরে সরে গেল, তেমনই দূরে সরে যেতে চাইলো নাট্য-আন্দোলনের ধারাও। প্রধানতঃ মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি এই বাঙ্‌লাদেশে হিন্দুত্বের রঙেই রঞ্জিত হ'ল যেমন জাতীয় আন্দোলন, তেমনই নাট্য-আন্দোলন।

কিন্তু ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধভাবে হ'লেও যখন গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ল, জাতীয় আন্দোলন যখন গণতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ ক'রল তখন হিন্দুত্বের আবরণেও গুণগত পরিবর্ত্তন দেখা দিল জাতীয় আন্দোলনে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রতি যে আপোষ-হীন মনোভাব জাতীয় নেতাদের একাংশকে পরিচালিত ক'রেছিল হিন্দুপুনরুজ্জীবনের দিকে সেই আপোষহীন মনোভাবই সংগঠিত রূপ নিল এই গণবিক্ষোভে, বিদেশী বর্জনে আর কংগ্রেসের (১৯০৬) স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবে, পিছু হটতে বাধ্য করলো সাম্রাজ্যবাদী শাসককে (১৯১১)।

নাট্যশালার কর্ণধাররা, নাট্যকাররা নতুন প্রেরণা পেলেন এই আন্দোলনে। গিরিশচন্দ্র ছাড়া ইতিমধ্যেই

নাট্যকাররূপে দেখা দিয়েছেন অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ। অমরেন্দ্রনাথ দত্তও নাটক লিখতে সুরু করেছেন। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', 'মিরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' (যথাক্রমে ১৯০৫, ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে রচিত), অমৃতলাল বসুর 'সাবাস বাঙ্গালী' (১৯০৫), ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩) 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৬) ও 'নন্দকুমার' (১৯০৭), দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) 'দুর্গাদাস' (১৯০৬) ও 'মেবার পতন' এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'বঙ্গের বাবচ্ছেদ' (১৯০৫) রূপকনাট্য বর্ত্তমান শতকের প্রথম দশকে জাতীয় ভাবের স্বার্থক উদ্দীপনায় জাতীয় আন্দোলনকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছিল নাট্যশালা থেকে। জাতীয়তার উদ্বোধনে সবচেয়ে বেশী সাড়া জাগিয়েছিল বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বে লেখা ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য'। হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদী চরমপন্থী জাতীয় নেতাদের স্বাধিকারের সংগ্রামে 'প্রতাপাদিত্যে'র দান স্বীকৃত হয়েছে শ্রদ্ধার সঙ্গে। 'নাট্যমন্দির' (চৈত্র, ১৩১৮) পত্রিকায় প্রবন্ধকার শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু বলেন,—"ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয়ে প্রথমে জনসাধারণ মাতৃভূমিকে মা বলিয়া চিনিল—স্বদেশকে পূজা করিতে শিখিল।" এরপর বঙ্গভঙ্গের তীব্র গণ-আন্দোলন গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্ম-প্রাণ নাট্যক্ষেত্রেও জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক নাটকের স্থান ক'রে দিল, জাতীয়তাবাদী আবেদনে মৌলিক ঐতিহাসিক নাটক রচিত হ'তে লাগলো একের পর এক, জাতীয় গীতিকবি দ্বিজেন্দ্রলালও হয়ে উঠলেন পুরোপুরি স্বদেশী ভাবোদ্দীপক নাটকের লেখক। সিরাজের মুখে —"হিন্দুমুসলমান এক স্বার্থে বাংলায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিঘ্ন হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীই কার্য্যভার প্রাপ্ত হবে।......কিন্তু স্থির জানবেন, ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার দুশ্‌মন" প্রভৃতি সংলাপ শুনে কে বলবে, ধর্ম্মপ্রাণ গিরিশচন্দ্র শুধু ভক্তিরসেরই বন্যা বইয়ে দিতে চান নাটকে? গিরিশচন্দ্রের উপর্য্যুপরি তিনখানি নাটকের প্রচার ও অভিনয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী ক'রেছিল সাম্রাজ্যবাদী সরকার, নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' আর 'নন্দকুমার'-এর ওপর, পুলিশী সেন্সর চালিয়েছিল 'প্রতাপাদিত্যে'। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনে এদের শক্তিশালী অবদান শত্রুপক্ষও স্বীকার করেছে।

এই সময়কার সামাজিক নাটকেও জাতির দুর্ব্বলতাকে মুছে ফেলে শক্ত সবল জাতি গঠনের নির্দ্দেশ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। জাতীয় জীবনের কদর্য্যতা ও কুসংস্কারকে তীব্র কষাঘাত করে, তাদের নগ্নরূপ তুলে ধ'রে জাতির অগ্রগতির পথে বাধা সরিয়ে ফেলতে আহ্বান জানিয়েছেন নাট্যকাররা। পণপ্রথার কুফল ও সামাজিক গ্লানি বিশ্লে-ষণ ক'রে গিরিশচন্দ্র রচনা করেছেন 'বলিদান' (১৯০৫), আর বিধবা-বিবাহ সমস্যা নিয়ে রচনা ক'রেছেন 'শাস্তি-কি শাস্তি' (১৯০৮)। দ্বিজেন্দ্রলাল ও অমৃতলাল রচনা ক'রেছেন এই ধরণের অনেক নাটক ও প্রহসন। অমৃত-লালের 'খাসদখল' (১৯১২) 'নবযৌবন' (১৯১৩) আর দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) সে-যুগের উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক।

কিন্তু যেমন ঐতিহাসিক নাটকে তেমনই সামাজিক নাটকে এই জাতীয় ও সমাজগঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে এসময়-কার মূল সুর ছিল না। ঐতিহাসিক ও জাতীয়তাবাদীনাট্য রচনার তুলনায় আমরা দেখতে পাই, পৌরাণিক, ভক্তি-রসাত্মক আর কাল্পনিক বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা হয়েছে অধি-কাংশ নাটক, কেবল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের স্বাদেশিকতায় নাট্যসেবী ও নাট্যশালা চুপ করে থাকতে পারে নি তাদের ও তাদের শ্রেণীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্য। নাট্যক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র পুনরুজ্জীবনবাদী পথ বেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন হিন্দী আধ্যাত্মিকতার ভক্তিমার্গে তাঁর 'সৎনাম' (১৯০৪) নাটকের ভক্তিরস স্বদেশপ্রেমের আড়ালে থেকেও অপর সম্প্রদায়কে ক্ষুব্ধ ক'রেছিল। হিন্দুর এই সামন্তযুগীয় আধ্যাত্মিকতা ধনতান্ত্রিক যুগের গণতন্ত্রের বিকাশের পথে এক প্রবল বাধা। তবুও পৌরাণিক [illegible] দুর্বক, [illegible] মানুষ যা[illegible] নাট্যশা[illegible] পরিচি[illegible] যো[illegible]

লেগেছিল। কিন্তু সমাজ বিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্য-বস্তুকে রূপদিয়ে বা জাতীয় আন্দোলনের উন্নত পর্য্যায়ের সন্ধান দিয়ে কোনও নাটক আর রচিত হতে পারে নি। বিশেষ করে হিন্দু সমাজের প্রতি অমৃতলালের রক্ষণশীল মনোভাব ইয়োরোপীয় ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সবকিছুর প্রতিই যেন বিদ্রূপ করে তুলতে চেয়েছিল আমাদের। এমনকি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমি যে প্রেরণা দিয়েছিল নাট্যকারদের, আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতে তা' যেন স্তিমিত হ'য়ে গেল, যেন সাময়িক উত্তেজনার পর অবসাদ এল আমাদের নাট্যজীবনে।

অবশ্য, এসময়কার সব নাট্যকারের আদর্শই অবিকল এক ছিল না। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'পৌরাণিক নাটক' নামক প্রবন্ধে বলেছেন,—'হিন্দুস্থানের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্ম, মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে হইবে।' গিরিশচন্দ্রের নাট্যাদর্শই এই। তাই, তাঁর ঐতিহাসিক নাটকও ভক্তিরস ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়, এমন কি ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত 'বুদ্ধদেবচরিত' (১৮৮৫) সম্পূর্ণ পৌরাণিক নাটকের আঙ্গিকে রচিত। তাঁর ব্যক্তিজীবনের পরিবেশও ছিল ধর্ম্মের পরিবেশ, আধ্যাত্মিকতার পরিবেশ। কিন্তু ইয়োরোপীয় সভ্যতায় শিক্ষিত বিলেত ফেরৎ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস করতেন না। 'মানব বুদ্ধির অতীত যে সকল অতীন্দ্রীয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে সহজাত সংস্কার বা পরিবেশ প্রভাবে, সচরাচর হিন্দু সন্তানের মনে একটা বিশ্বাস ও ধারণা বিদ্যমান দেখা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল তৎ-সমূহে তিলমাত্রও আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেন না'—(দেবকুমার রায় চৌধুরী)। গিরিশচন্দ্রের যুগে নাটক রচনা ক'রেও দ্বিজেন্দ্রলাল যুক্তিবাদ ও বস্তুনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন নাট্য বস্তুতে, তাই তাঁর পৌরাণিক নাটকেও অন্ধ ভক্তিবাদ প্রতিষ্টিত হ'তে পারে নি। বিবর্ত্তনশীল সমাজের ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পটভূমিতে তিনি নতুন মানবীয় রূপ দিতে চেয়েছিলেন পুরাণের চরিত্রগুলিকে। তাই কারও কারও মনে হয়েছে,—'পৌরাণিক চরিত্রকে স্বেচ্ছামত নূতন করিয়া গড়িতে গিয়া তিনি অনেক সময় ঔচিত্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন'—(অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু)। ক্ষীরোদপ্রসাদ ছিলেন এদের মাঝামাঝি। তিনিও বুঝতেন,—'নাট্যকলার উন্নতির সঙ্গে জাতীয়-জীবন যেন অনেকটা জড়িত'—(নাট্যমন্দির, শ্রাবন ১৩২১)। কিন্তু ভক্তিবাদ ও আধ্যাত্মিকতা থেকে তিনি মুক্ত ন'ন। তথাপি অখণ্ড ভক্তি তাঁর নাটকে প্রতিষ্ঠা পায় নি। তাঁর শেষের দিকের (অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের পরে রচিত) পৌরাণিক নাটকগুলিতে যুক্তিবাদও উঁকিঝুঁকি দিয়েছে।

এই নাট্যধারার প্রবাহে নাট্যশালাগুলিরও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। আগেই বলা হয়েছে, নাট্যশালাগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলেও মালিকরা প্রধান অভিনেতাদের ওপরই নির্ভর করতেন। বস্তুতঃ এই সময় প্রধান অভিনেতাদের বেশ একটু সুবিধাজনক অবস্থানই ছিল। গিরিশচন্দ্র একাধারে ছিলেন প্রধান অভিনেতা ও নাট্যকার। প্রধান অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ নাট্যকার হিসেবে শক্তিশালী ছিলেন না, প্রহসনকার অমৃতলাল নাট্যাধ্যক্ষ ছিলেন বটে, অপর নাট্যকারের ওপর নির্ভরশীলতা তাঁর কম ছিল না। তাই, নাট্যশালাগুলিতে নাট্যধারা নিয়ন্ত্রণে গিরিশচন্দ্রের বিশেষ একটা সুবিধা ছিল। গিরিশচন্দ্র নিজে যখন জাতীয়তামূলক নাটক লিখেছেন সে সময় সাধারণভাবে প্রায় সব নাট্যশালাতেই একখানি দুখানি জাতীয়তাবাদী নাটকের অভিনয় হয়েছেই, কিন্তু পরক্ষণেই গিরিশচন্দ্র আবার যখন ধর্ম্মভাবে ডুবে গেলেন, অবসাদ দেখা দিয়েছে নাট্যশালায়। এই সময় জাতীয়তাবাদী নাটক সবচেয়ে বেশী অভিনীত হয় মিনার্ভায়, ১৯০৪ থেকে ১৯০৮ সাল এই পাঁচ বছরই মোটামুটি এখানে জাতীয়তার ধারা একাদিক্রমে প্রবাহিত ছিল বলে ধরা যায়। এই সময়ের মধ্যে এখানে অভিনীত হয়েছে 'সিরাজদ্দৌলা' (গিরিশ) 'মীরকাশিম' (গিরিশ) 'ছত্রপতি শিবাজী' (গিরিশ) 'দুর্গাদাস' (দ্বিজেন্দ্রলাল), 'রাণাপ্রতাপ' (দ্বিজেন্দ্রলাল) আর "মেবারপতন" (দ্বিজেন্দ্রলাল)। ষ্টারে অভিনীত হয়েছে "প্রতাপাদিত্য" (ক্ষীরোদপ্রসাদ), "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত" (ক্ষীরোদ-

এম পি প্রোডাকসন্সের নির্ম্মীয়মান 'আঁধি' চিত্রের একটি
দৃশ্যে রাধামোহন ভট্টাচার্য্য ও দীপ্তি রায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং-এর 'কাজরী' চিত্রের একটি দৃশ্যে
বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও জয়শ্রী সেন

চিত্রবাণী

শারদীয়া

১৩৫৯

প্রসাদ) আর "নন্দকুমার" (ক্ষীরোদপ্রসাদ) এদের অভিনয়কাল মোটামুটি ১৯০৩ থেকে ১৯০৭ সাল। পুনরভিনয়ের তারিখ ও নাট্যশালা এই হিসেবে আমরা ধরছি না। গিরিশচন্দ্রের নাটকই বেশী পুনরভিনীত হয়েছে বিভিন্ন নাট্যশালায়। বস্তুতঃ এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী-যুগ গিরিশচন্দ্রেরই যুগ।

তথাপি, যে যুক্তিবাদ উঁকিঝুঁকি মেরেছে ক্ষীরোদপ্রসাদের মধ্যে, যার প্রতিষ্ঠা দেখেছি দ্বিজেন্দ্রলালে, তা' যে নাট্যধারার পরবর্ত্তী স্তরে পৌছতে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছে আমাদের সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ভক্তিরস ও আধ্যাত্মিকতার মূল ধারা বিবর্ত্তনবাদী সামাজিক দৃষ্টি নিয়ে নাট্যধারাকে এগিয়ে দিতে পারে নি, বরং সমাজের বিবর্ত্তন ধারা থেকে নাট্যধারা একটু দূরেই সরে এসেছে।

১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকদের প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে প্রচণ্ড আঘাত ক'রলো প্রতিঘাতে ভারত রক্ষা আইন, রৌলট আইন ও অন্যান্য কায়দায় দমননীতির রথচক্র নির্ব্বিবাদে পরিচালিত হ'ল সাধারণ মানুষের ওপর। জাতীয় আন্দোলন কিন্তু আরও শক্তিশালী হ'ল এ সময়, দমে গেল না। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী বছরগুলি, স্বতঃস্ফূর্ত্ত বহু শ্রমিক-বিক্ষোভ প্রত্যক্ষ করলো, জন্ম দিল পুরোদস্তুর সারা-ভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের, খিলাফৎ আন্দোলনের সহযোগিতা এল, কংগ্রেস ও লীগের চুক্তি হ'ল যুক্ত ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের, কংগ্রেস হয়ে দাঁড়ালো ব্যাপক এক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা। কিন্তু 'অহিংস' সংগ্রামের স্তোকবাক্যে জাতীয় [illegible]র একাংশ তথা দেশীয় বণিকশ্রেণী গণ আন্দোলন-পথে পরিচালিত করতে চাইলো জাতীয় [illegible]কে।

[illegible]ক্ষেত্রেও নাট্যশালার মালিকশ্রেণী সচেতনভাবেই [illegible]র অচেতনভাবেই হোক, সমাজ-বিবর্ত্তনের ধারা [illegible]রর কথা জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারা থেকেও নাট্যধারাকে দূরেই সরিয়ে রাখতে চাইলো অন্ততঃ এই দূরত্ব সৃষ্টির জন্য তারা মালিকানার অধিকার প্রয়োগ সুরু ক'রলো। ম্যাডান কোম্পানীর সঙ্গে শিশিরকুমারের মতভেদের প্রসঙ্গ এই সম্পর্কে আমরা উল্লেখ ক'রতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী যুগের আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তি-রসের ধারায় নাট্যশালাকে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিলেন গিরিশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্রের যুগ ছিল নাট্যশালার পরিচিতির যুগ। তাই, এক শ্রেণীর দর্শকের সমাজনিরপেক্ষ রুচিকে মূলধন ক'রে স্থায়ী বৃত্তির উত্তেজক সস্তা কাহিনীর বর্ণাঢ্য রূপায়ণে বাজীমাৎ করার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল মালিকদের মধ্যে। তা'ছাড়া, গিরিশযুগের মঞ্চসজ্জা ছিল আড়ম্বরহীন, প্রযোজনা-ব্যবস্থাও ছিল সাধারণ ধরণের। মঞ্চসজ্জা ও প্রযোজনা-ব্যবস্থার উন্নতির কোনও কার্য্যকরী চাহিদা গিরিশোত্তর যুগেও তাই দেখা যাচ্ছিল না।

এমনি সময়ে "শুভক্ষণে শিশিরবাবু প্রমুখ নবযুগের তরুণ অভিনেতার দল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে আজ রঙ্গালয়কে জরার অভিশাপ অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা ক'রেছেন। এ দেশের রঙ্গালয়ে আবার নব যৌবন দেখা দিয়েছে।" (নাচঘর ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) কিন্তু উল্লিখিত দুর্ব্বলতা ছাড়াও এই "নবযৌবন"কে বহু সংগঠিত বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, হ'তে হয়েছে নাট্যামোদীদেরই একাংশের কাছ থেকে। এই যৌবন-শিল্পীরা অবশ্য তাতে নিরস্ত হ'ন নি। প্রাচীন ধারার পাশাপাশিই এই যৌবন ধারাও তার আসর ক'রে নিল, স্বীকৃতিও আদায় ক'রে নিল শিল্পরসিক ও গুণীদের কাছ থেকে।

অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর অধ্যাপনার পেশা ত্যাগ ক'রে যেদিন সাধারণ নাট্যশালায় দেখা দিলেন, যুগের জাতীয় দাবীকে তিনি অস্বীকার করেন নি। হিন্দু-মুস্লিম সমস্যা তখনকার অন্যতম জাতীয় সমস্যা, এই সমস্যা নিয়ে লেখা ক্ষীরোদপ্রসাদের "আলমগীর"-ই (১০ই ডিসেম্বর, ১৯২১) তাঁকে প্রথম পরিচিত করিয়ে দেয় সাধারণ নাট্যশালার শিল্পী [illegible] ক্ষীরোদপ্রসাদের [illegible] হ'য়ে [illegible]

শিশির-যুগের উল্লেখযোগ্য অবদান যৌথ প্রতিষ্ঠানের মারফৎ নাট্যশালা পরিচালনার চেষ্টা। সাধারণ নাট্যশালায় শিশিরকুমারের যোগদানের সঙ্গে আরও বহু শিক্ষিত শিল্পী যোগদান করেন মঞ্চে। এর আগে পর্যান্ত নাট্যশালা অনেক শিক্ষিত লোকের কাছেই হেয় বলে গণ্য হ'ত। এইসব শিক্ষিত শিল্পীদের গণতন্ত্রপ্রিয় শিল্পীমন মালিকদের ব্যবসাবুদ্ধির কাছে বিকিয়ে না দিয়ে গুণী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় উন্নত ধরণের শিল্পনিকেতন গড়ে তুলতে এঁরা চেষ্টা করেন। আর্ট থিয়েটার লিমিটেড এমনি একটি শিল্পনিকেতন (১৯২৩)। শিশিরকুমার নিজে অবশ্য সাংগঠনিকভাবে এসব যৌথ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন না। মনোমোহন থিয়েটার ভাড়া নিয়ে তিনি খোলেন 'মনোমোহন নাট্যমন্দির' (১৯২৪ সালে), তাঁর 'নাট্যমন্দির'ও প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তি প্রচেষ্টায় (১৯২৬)। 'রঙমহল' নাট্যশালারও সুরু হয় (১৯৩১) যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসেবে। এইসব নাট্যশালা এদের প্রতিশ্রুতিমত উচ্চাঙ্গের শিল্পকৌশলের প্রবর্ত্তন হয়তো করেছে, কিন্তু বিবর্ত্তনবাদী দৃষ্টি নিয়ে জাতীয় আন্দোলনের সহযোগী শক্তিশালী কোনও নাটকের সৃষ্টি বোধ হয় করতে পারে নি।

অবশ্য, ১৯৩০ সালের পর থেকে অহিংসবাদী জাতীয় নেতৃত্বের গণ-আন্দোলন বিরোধী নীতি সত্ত্বেও গণআন্দোলন যখন ব্যাপক আকার ধারণ করতে লাগল, নেতৃত্বের অসহযোগ সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদী দেশসেবীদের তীব্র বিক্ষোভ যখন মূর্ত্ত হয়ে উঠতে লাগল আর সাম্রাজ্যবাদী সরকারও দমননীতির তীব্রতা দিলো বাড়িয়ে তার ছোঁয়াচ নাট্যশালাতেও অল্পবিস্তর বোধ হয় লেগেছিল। জাতীয় অন্দোলনের সহযোগী না হলেও জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক নাটকের কিছু কিছু সন্ধান এই সময় থেকে আমরা পাই। গৈরিক পতাকা (শচীন সেনগুপ্ত, ১৯৩০), মারাঠামোগল (সুধীন্দ্রনাথ রাহা, ১৯৩৪), সিরাজদ্দৌলা (শচীন সেনগুপ্ত, ১৯৩৮), মিরকাশিম (মন্মথ রায়), রণজিৎ সিংহ (মহেন্দ্র গুপ্ত, ১৯৪০) প্রভৃতি নাটক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগে রচিত ও অভিনীত হয়।

এছাড়া পথের দাবী (শরৎ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯) পরিণীতা (যোগেশ চৌধুরী, ১৯৪১) ভারতবর্ষ (শচীন সেনগুপ্ত ১৯৪১) কালিন্দী (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৪১) প্রভৃতি এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক। 'পথের দাবী' ও 'ভারতবর্ষে' জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা আছে। পৌরাণিক নাটক 'কারাগারে'ও (মন্মথ রায়, ১৯৩০) আছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইঙ্গিত। তাই নিষিদ্ধ হয়েছিল এ নাটক।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গেল আবার যুদ্ধ শেষ হ'তে না হ'তেই এল মন্বন্তর, মানুষের সৃষ্ট মন্বন্তর। এক দিকে গণআন্দোলন যেমন তীব্রভাবে ফেটে পড়তে চাইল নানাদিকে, নানাখাতে—ফাঁসীবিরোধী আন্দোলনে, আগষ্ট আন্দোলনে, নৌ-বিদ্রোহে, রসিদ আলি দিবসে, ডাক-তার ধর্ম্মঘটে, ২৯শে জুলাই দিবসে আর তে-ভাগা আন্দোলনে। এইসব গণ-বিক্ষোভ ও গণআন্দোলনে জাতীয় নেতাদের এক অংশের আদৌ কোনও সমর্থন ছিল না। জাতীয় নেতাদের মধ্যেও ঐক্যমত ছিল না, ক্রিপস মিশন তাদের কাছে ব্যর্থ হ'ল, দেশাই-লিয়াকৎ চুক্তি কার্য্যকরী হ'ল না, ক্রমশঃ মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদের পথ হ'ল প্রশস্ত। জাতীয় আন্দোলনের এই চিত্র রূপ পেল না নাট্যসাহিত্যে, নাট্যশালায়।

মহেন্দ্র গুপ্তের 'মহারাজ নন্দকুমার' (১৯৪৩), 'টিপু-সুলতান' (১৯৪৪), প্রভৃতি কয়েকখানি মাত্র জাতীয়ভাবাপন্ন নাটক এই সময় মাঝে মাঝে অভিনীত হয়েছে। তাতে জাতীয় আন্দোলনের বর্ত্তমান রূপ বা বিবর্ত্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সৃষ্ট কোনও নাট্যবস্তু স্থান পায় নি। তবুও 'টিপুসুলতান' সম্পর্কে আনন্দ বাজার (১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১) বলেছেন,—"হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সাধনের যে প্রচেষ্টা এই নাটকের সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত বহুধা বিভক্ত নাটকীয় পরিস্থিতির অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহমানা রহিয়াছে, তাহার ফলে নাটকখানি উপভোগ্য হইয়াছে।"

'কিন্তু আমার মনে হয় হিন্দু মুসলমান সমস্যাকে স্বাভাবিকভাবে বিশ্লেষণ ক'রে তার সমাধানের কোনও যুক্তিসম্মত চেষ্টা এর মধ্যে নেই, সমস্যাটি প্রসঙ্গতঃ আনা হয়েছে আর ভাবাবেগবহুল এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে তার আকস্মিক উপস্থাপনা সমস্যা সমাধান তো দূরের কথা, কোনও স্থায়ী দাগ কাটতে পারে না মনে। 'মহারাজ নন্দকুমার' অভিনীত হয় দুর্ভিক্ষের বছরে তাই সেখানেও একটি দৃশ্যে এক ভুখা মিছিলের অনানুপাতিক ও হাস্যকর আবির্ভাবে আমরা ক্ষুব্ধ হই। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ "সন্তান"-রূপে রূপায়িত হয়ে (বাণীকুমার,) এই সময় (১৯৪৫) অভিনীত হয় রঙ্-মহলে। কিন্তু অভিনয়ে প্রাণ সঞ্চারিত হয় নি। অগ্রণী নাট্যকার শ্রীযুত শচীন সেনগুপ্ত এর সঠিক কারণ নির্দ্দেশ করেছেন। আধুনিক জাতীয় সমস্যামূলক নাটকের অভাবও ঐ একই কারণসম্ভূত বলে আমাদের মনে হয়। শ্রীযুত সেনগুপ্ত বলেন,—"আমি বলি আনন্দমঠের মূল রস 'সন্তানে'র অভিনয়ে প্রকাশ পায় নি। আর তা না পাবার কারণ হচ্ছে অভিনেতাদের রাজনৈতিক চেতনার অভাব।… আর পাঁচখানা নাটকের মতো আনন্দমঠও প্যাঁচের কসরৎ দেখিয়ে প্রাণবন্ত করা যাবে না। এর জন্য ভিন্ন ধ্যান-ধারণা চাই।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে চৈত্র, ১৩৫১) বস্তুতঃ নাট্যশালা-সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীরা জাতীয় আন্দোলনের ধ্যান ধারণা ও ধারার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না বলেই জাতীয় ভাবধারা ও সমস্যার নাটক রচিত ও অভিনীত হয় না, জাতীয় জীবন থেকে দূরে সরে যায় নাট্যশালা। তাই বলে শ্রীরঙ্গমে 'দুঃখীর ইমানের' (তুলসী লাহিড়ী) সাফল্যে নাট্যশিল্পীদের রাজনৈতিক চেতনার পরাকাষ্ঠা নির্দ্দেশ করলে ভুল হবে, কেননা শিশিরকুমারের অসামান্য প্রয়োগ-শৈলী রয়েছে "দুঃখীর ইমানের" মূলে। অবশ্য এই সাফল্যে রাজনৈতিক চেতনা কিছুটা প্রমাণিত হয় বৈকি। এটা মূল ধারার ব্যতিক্রম। এই মূল ধারাটি হ'ল জাতীয়তা-বিচ্ছিন্ন ধারা, সস্তা সিদ্ধ রস পরিবেশনের ধারা।

এই যখন অবস্থা সাধারণ নাট্যশালার, জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত একদল যুবক সৌখীন সম্প্রদায়ের মাধ্যমে নতুন ধরণের নাট্যপরিবেশনের ব্রত নিয়ে তখন হাজির হলেন আসরে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত হ'ল এদের প্রথম নাটিকা। সেদিন ক'লকাতার রাস্তায় রাস্তায় ভীড় ক'রেছিল যে সব নিরন্নের দল তাদের নিয়ে নাটিকাটি লিখলেন শ্রীবিজন ভট্টাচার্য্য। সম্ভবতঃ ফ্যাসী-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের উদ্যোগে নাটিকাটির অভিনয় হয় ক'লকাতার কোনও এক সাধারণ নাট্যশালায় (১৯৪৪ জানুয়ারী)। নাটিকাটির নাম "জবানবন্দী", এর পর গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীশম্ভু মিত্রের প্রযোজনায় এই নাট্যকারেরই বৃহত্তর নাটক 'নবান্ন' যখন অভিনীত হল (১৯৪৪) তখন সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে, সাড়া পড়ে গেল ব্যবসায়ী ও সৌখীন নাট্যমহলে। 'নবান্নের'ও পটভূমি মন্বন্তর। শুধু নাট্যবস্তুতে নয়, স্বভাবকুশল অভিনয়-ধারাতে, সহজ সরল ও ইঙ্গিতময় দৃশ্যসজ্জায় নতুনত্বের সন্ধান দিল "নবান্ন"-র অভিনয়। গ্রামের ছিন্নমূল ও শ্লথমূল কৃষক তার নিজের ভাষায় নিজের অভ্যস্ত ও অনভ্যস্ত পরিবেশে প্রকাশ করেছে তার ব্যথা বেদনার কথা। "নীলদর্পণ"-এর পর নাকি এমন ঘনিষ্ঠ পরিবেশে সাধারণ মানুষের ব্যথা বেদনা আর ফুটে ওঠে নি। বিভিন্ন সংবাদপত্র এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো। এর সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের গীতিকাব্য 'মধুবংশীর গলি' ও গীতিনাট্য 'নবজীবনের গান' জাতির ব্যথা বেদনায় জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির সমস্যায় রূপায়িত। সত্যই এক নতুন নাট্যধারার সৃষ্টি হ'ল, নাচে, গানে, নাটকে গণনাট্য সঙ্ঘ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যথা বেদনাকে রূপ দিতে এগিয়ে এল বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। শত শহীদের স্মৃতিবিজড়িত জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ও জাতীয় গণতন্ত্রের আন্দোলন যখন রূপ পেল "শহীদের ডাক" ছায়ানাট্যে, গণনাট্যসঙ্ঘের নাট্যধারা আরও ব্যাপকভাবে তখন পরিচিত হ'ল। ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে সঙ্ঘ কেন্দ্রীয় দলের "ভারতের মর্ম্মবাণী" ও "অমর ভারত" নৃত্য নাট্যও বাঙলা দেশের শিল্পজগতে সাহায্য করলো জাতীয় ভাবধারার প্রতিষ্ঠায়, নির্দ্দেশ জাতীয় আন্দোলনে শিল্পের সহযোগিতায়।

"রেনেসাঁ ক্লাব" এই সময়কার আর একটি সংগঠন। গোর্কীর "লোয়ার ডেপথ্স্"-এর অনুবাদ নিয়ে এদের অভিযান সুরু। কিন্তু আজও নতুন ধারার নাট্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এরা এগিয়ে আসতে পারেন নি।

গণনাট্যসঙ্ঘ নব নাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব পেয়েছিল। কিন্তু ১৮৭৬ সালের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের বলে আর অন্যান্য কৌশলে ব্যাপক পুলিশী হামলা সুরু হ'ল গণনাট্য সঙ্ঘের ওপর। সাংগঠনিক ও নীতিগত বিপর্য্যয়ে গণনাট্য সঙ্ঘের সৃষ্টির স্তরও ক্রমশঃ নেমে গেল। অবশ্য তাতে নাট্য আন্দোলনের পরিধি কমে নি। 'বহুরূপী' 'নাট্যচক্র', 'উত্তর সারথি' 'ক্যালকাটা থিয়েটার' 'অশনিচক্র' প্রভৃতি অনেক প্রগতিশীল নাট্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে, প্রযোজনার দিক দিয়ে, জাতীয় ভাব ও সমস্যার রূপায়নে এঁরা নতুন নাট্যধারাকে এগিয়েই নিয়ে চলেছে। বহুরূপীর "পথিক" (তুলসী লাহিড়ী), "উলু খাগড়া" (সঞ্জীব), "ছেঁড়া তার" (তুলসী লাহিড়ী), "চার অধ্যায়" (রবীন্দ্রনাথ), Enemy of the people (Ibsen), নাট্যচক্রের "নীলদর্পণ" (দীনবন্ধু), 'ক্ষুধিতের অভিযান', (নৃত্যনাট্য), উত্তর সারথির 'নতুন ইহুদী' (সলিল সেন) ও 'অসামাজিক' (ধ্রুব চট্টো—প্রস্তুতির পথে) ক্যালকাটা থিয়েটারের 'কলঙ্ক' 'মরা চাঁদ' (বিজন ভট্ট), অশনিচক্রের 'মশাল' (দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়) আজকের বিভিন্ন জাতীয় সমস্যাকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন ও ক'রছেন। এই নাট্যধারার প্রতি ব্যবসায়ী সাধারণ নাট্যশালার শিল্পীরাও অনেকে আকৃষ্ট হয়েছেন। এদের সকলের সমবেত চেষ্টায়, তাই, এই নতুন ধরণের জাতীয় নাট্যধারা—গণনাট্যধারা—জাতীয় আন্দোলনের বলিষ্ঠ নির্দ্দেশ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবেই আমাদের জীবনে।

মার্লিন ডিয়েট্রিক

সিদ্ধার্থ সান্যাল

★ ★ ★

আনীল আকাশের বুকে কাশ-শুভ্র খণ্ড মেঘ যেন, যেন বিস্তীর্ণমান শ্যামলিমার কোলে ফসলিত জাফরানের ক্ষেত, কিম্বা যেন কোনও রোদ-ঝলকানো সকালে মার্বেল পাহাড়ের সানুতে নিঃসঙ্গ ঝাউয়ের ঘন কুঞ্চিমার ছায়া:—এমনই একটা সৌন্দর্য্যের সমন্বয় জড়িয়ে আছে মেয়েটির তনুলতায়। ওকে দেখলে আর ফেরানো যায় না চোখ, যায় না ঠেকিয়ে রাখা অপ্রতিরোধ্য সেই মধুর আবিলতাকে দৃষ্টির দিগন্ত-হীনতা থেকে যার উদ্ভব। চোখ তলিয়ে যায় ওর দ্যুতিমান সুষমার অতলান্তিক গভীরে, মন ম'ম' ক'রে ওঠে কেমন একটা মসৃণ লুলিত আমেজে। এমন অপূর্ব্ব অনুভূতির অভিজ্ঞতা জীবনে বিরল, কচিৎ কখনও কোন জীবন-শিল্পীর দৃষ্টির সন্নিহিতে হয়তো বা উদয় হয়। ও যেন তাই দা' ভিঞ্চির 'মনালিসা', যেন পিকাসোর আঁকা কোনও সুর-রিয়্যালিষ্ট আর্টের টুকরো প্রতিকৃতি, যেন বাঁধানো কোনও বর্বুক মেঘের কোলে অপ্রকম্প বিদ্যুৎ লেখা।

আবার সেই ফ্রেমে-আঁটা রূপই প্রযুক্ত প্রেক্ষণা আর পরিবেশে নিজের অলক্ষ্যে মুখর হোয়ে ওঠে গতির তীব্রতায়, জাগায় প্রতিস্পন্দন ধমনীর ধাবমান শোণিত-বিন্দুতে। ওকে দেখলে তখন আর চেনাই যায় না ক্ষণপূর্ব্বের সেই চিত্রার্পিতা ব'লে। মনে হয়—এইমাত্র বুঝি ফার্ণ আর ইউক্যালিপটাস্, মাটি আর পাথরের জটিল বন্ধন ছিঁড়ে ছড়িয়ে প'ড়লো উদার উন্মুক্তিতে কোন এক কলস্বনা পাহাড়ী ঝর্ণা। বুঝিবা ঢেউ জাগলো বিচিত্রবর্ণী মরশুমী ফুলের অজস্র কেয়ারিতে, বাঁশী হোয়ে বেজে উঠলো বনানীর পত্র-পুঞ্জ, কিম্বা বুঝি দক্ষিণের দাক্ষিণ্যে আপাত কোন বীত বহ্নির বুকে স্পন্দন উঠলো স্ফুলিঙ্গের।

তবুও কিন্তু মেয়েটি নয় এতটুকুও আত্মসচেতন। সম্পূর্ণ উদাস, নিস্পৃহ,—বোঝেনা কখন আনমনে চঞ্চলিত হোয়ে ওঠে ওর লীলায়িত রূপের বিভাসা, কখন ওর কবোষ্ণ সৌন্দর্যের দীপালীতে নেমে আসে অজস্র পতঙ্গ। বোঝেনা, শুধু ছোটে আর চলে, ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলে অকৃপণ মুঠো ভ'রে প্রাণের প্রাচুর্য চপলা বন-হরিণীর মত; মদালসা মধুপিনীর মত। মার কিন্তু নজর এড়ায় না। ওর বয়োসন্ধির ভরজোচ্ছ্বাস তাঁর কানে পৌঁছোয়, চোখে পড়ে ওর তনুর কৌণিক পরিপূরণ, রৈখিক আন্দোলনের বন্ধুরতা। তাই ওকে বাঁধতে চান শাসনের ডোরে, নিষেধের ছোট-খাটো প্রতিবন্ধকে। এ যেন ভস্মাচ্ছাদনে দাবাগ্নি নির্বাপনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা, উর্ণাজালে বনজ্যোৎস্না বাঁধার বাতুলতা। বিফল বিতৃষ্ণায় মা তাই রেগে বলেন,—'এখন আর তোমার হৈ হৈ সাজে না মেরী!'

নাম ওর মেরী ম্যাগদালিন। অতবড় নামে ডাকলে মর্মে পৌঁছুতে বিলম্ব হয়। ও তাই ছোট ক'রে এনেছে নামটাকে, প্রথম আর শেষটুকু জুড়ে ক'রেছে মার্লিন, যাতে অন্তলীন হয়ে যায় মুহূর্তে। ভারী লাজুক স্বভাবের মেয়ে। ব্রীড়ায় সংকুচিতা হোয়ে থাকে অফোটা রজনী-গন্ধার মত। নমনীয়, অথচ দৃঢ়তায় অটল; আনত, অথচ প্রয়োজনে ঋজু। সেটা ওর বাবার স্বভাবের সংক্রামণ। সমর বিভাগের তিনি অধিনায়ক। মার্লিন পেয়েছে তাঁর সামরিক সময়নিষ্ঠা আর সহনশীলতা-টুকু। উত্তরাধিকারে পাওয়া অত্যাগধর্মী মনের দৌলতে ও তাই হোয়েছে অভঙ্গব্রতী। ভঙ্গিতে নেমেছে তাই একটা নিষ্কম্প ঔদ্ধত্যের উন্নতি। এটা হোল ওর চারিত্রিক উপাদানের ইস্পাতের দিকটা, সরস মৃত্তিকার স্নেহল পেলবতার ক্ষেত্র রচনা ক'রেছেন ওর মা। মনের দিক থেকে ও তাই ওর মার খুব কাছাকাছি। মা-র কাছেই হয় ওর জীবনদীক্ষা কৈশোরের শেষ পর্যায়ে সুদূর এক অতীতের দিনে......

সেটা উনিশ-শো-চোদ্দো। প্রথম মহাযুদ্ধের দিনগুলো আতঙ্কে অস্থির, বোমা আর বারুদে বিধ্বস্ত। মার্লিন তখন বছর দশেকের। ওর বাবা গেছেন যুদ্ধে, কাকা ও আর আর খুড়তুতো ভায়েরাও গেছে। ওকে আর ওর দিদি এলিজাবেথকে নিয়ে মা থাকেন বার্লিনে। সংসারে পুরুষ ব'লতে কেউ নেই, মাকেই পোয়াতে হয় সব হ্যাঙ্গামা। তাঁকে সাহায্য করে মার্লিন। কি নিপুণ ওর কর্মনিষ্ঠা,

কি অমূল্য ওর অনভিজ্ঞ সহায়তা! মা খুশি হন। ও-ও কম খুশি হয় না। সংসার আর দায়িত্ব—নারী জীবনের চরম চাওয়ার বস্তু! তার প্রথম আস্বাদ মার্লিনকে মোহ-ময় ক'রে তোলে। সেদিনের সেই চঞ্চল বনবিহঙ্গ মায়ের মন্ত্রে বাঁধা পড়ে সংসারের শিকলে। যুদ্ধের ধাক্কায় মার্লিনের লীলাজগৎটা হঠাৎ ছিটকে আসে উনুন পাড়ে, বেক্যারীর সোঁদালো গন্ধে আর ক্রকারীর শব্দিত ছন্দে। কি মিষ্টি জীবন—শব্দ আর গন্ধের গলিত অনর্গলতায়!

সামরিক কৃচ্ছ্রতা আর প্রাত্যহিক পরিমিতির ছকে বাঁধা হিসেবী দিনগুলো। তবু কিন্তু মার্লিনের ভালো লাগে, ভালো লাগে আপন হৃদয়ের রঙে রঙীন আর উজ্জ্বল ব'লে। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যা, তারপরও সেই সন্ধ্যা কখন যে মিশে যায় রাত্রের অন্ধকারে—ও টের পায় না। কাজ আর হাসি, নিঃসময় আর অবকাশ—নির-বচ্ছিন্ন চক্রিল আবর্তে ঘুরে ঘুরে ও ভুলে যায় নিজেকেই অনেক সময়। তারপর দিনান্তের কর্ম্মহীন শ্রান্ত তন্দ্রিমায় ফিরে পায় নিজেকে। মন তখন থিতিয়ে পড়ে, মুক্তি পায় সময়ের সজল আবিলতা থেকে। ম্যান্টলপিসের ওপর মোমবাতি জ্বেলে ঘিরে দাঁড়ায় মা আর এলিজাবেথকে নিয়ে। প্রার্থনা করে—পিতার গৃহ প্রত্যাগমনের, জার্ম্মাণীর বিজয় গৌরবের, বিশ্বের চিরশান্তির……

শান্তি অবশ্য আসে একদিন যুদ্ধবিরতির, কিন্তু ম্লান ক'রে দেয় মার্লিনের জগৎ। নেমে আসে অজস্র কালো-বাদুড়ের ডানায় মর্ম্মান্তিক বেদনার সূচীতীব্র তমসা। সংবাদ আসে—পিতার মৃত্যু হোয়েছে রুশ সীমান্তে, মারা গেছেন আর সব আত্মীয়েরা। মুহূর্ত্তে কে যেন শুষে নেয় ওর আকপিল আকাশ থেকে সমস্ত জ্যোৎস্নাটুকু! মলিন মার্লিনের চোখে নামে স্বাতীর সজল পাণ্ডুরতা। মা শয্যা নেন, এলিজাবেথ ভেঙ্গে পড়ে কান্নায়। রুদ্ধ বেদনা-বহ্নির ধূমায়িত অন্তর্দাহে অস্থির মার্লিন আশ্রয় খোঁজে দর্শনের সত্যসমাহিতির মধ্যে। কাব্য আর সঙ্গীতের শাশ্বত সুধার স্বাদে ভুলতে চায় জীবনের ভঙ্গুরতা, বিপর্যয়ের যত কিছু ক্লেদাক্ত তিক্ততা।

ক্ষণিকে কি যেন হোয়ে যায়! নাবিকহীন নৌকো টলে দিকহীন সাগরে। সুখ আর অর্থের প্রাচুর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত হোয়ে আছড়ে পড়ে মার্লিন নির্ম্মম নিঃস্বতায়। একক অট্টালিকার আভিজাত্য থেকে নেমে আসে জনবহুল ব্যারাকের পংকিলতায়। দিনানুদৈনিক দৈন্যের নিষ্পেষণে আর সবাই হাঁপিয়ে উঠলেও মার্লিন কিন্তু অম্লান। সার্ডিন আর স্যালমনের বদলে সস্তা আলু আর গাজরের ষ্টুয়ে চামচ ডোবাতে ওর এতটুকুও সঙ্কোচ জাগে না। পরিতৃপ্তির সশব্দ প্রকাশে বলে—মন্দ কি দশজনের সঙ্গে সমতলে দাঁড়িয়ে জীবনের যে উপভোগ বিচ্ছিন্ন হোলে তা ফিকে হোয়ে আসে। প্রান্তরের আকাশ অনেক বড়, মিনারে উঠলে তা' সংক্ষিপ্ত হোয়ে দাঁড়ায়।

অত পাওয়ার মধ্যে থেকেও না-পাওয়ার এই গ্লানিতে অভ্যস্ত মার্লিনকে দেখে সবাই অবাক হয়। ওর কিন্তু বিস্ময় নেই এতে। দীনতার মালিন্য ও-কে স্পর্শ করে না, ও শুধু মর্ম্ম পীড়া অনুভব করে জার্ম্মাণীর অন্তর্বিপ্লবে।

যুদ্ধের শেষদিকে বিপ্লবের বিভীষিকা আরও বিপর্যস্ত ক'রে তোলে ওদের। গুপ্তচর আর গোয়েন্দা, পিস্তল আর বন্দুকের গুলিতে ভয়াল দিনগুলো দীর্ঘতর হোয়ে ওঠে। আজও মার্লিনের স্পষ্ট মনে পড়ে এমনি এক আতঙ্কিত নিঃস্বতার দিনে ওর জীবনের গতি হয় পরিবর্তিত, ও যেন পেয়ে যায় ওর জীবন-জিজ্ঞাসার পরম উত্তর, অন্তর-কামনার নিভুল প্রতিচ্ছবি। বেশ মনে পড়ে—সেদিনের সন্ধ্যা ছিল নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ, অন্তরের আসঙ্গে মুখর। বাইরে জানলার শার্সিতে তুষারের স্ফটিক নক্সা আর পল্লব-ঘন পপ্‌লারের ফাঁকে ফাঁকে হিমেল হাওয়ার আর্ত্তনাদ। ভেতরে উষ্ণ ঘরের কোণে বাতির নীল ঘেরাটোপের নীচে খোলা কাব্য। ও প'ড়ছে, তন্ময় হোয়ে প'ড়ছে জার্মান কবি হফ্‌ম্যান্‌স্‌থালের কবিতা—'মৃত্যু ও মূঢ়'। কি মিষ্টি কবিতা! সহসা কি যে হয় সুরেলা কণ্ঠে সুরু ক'রে দেয় আবৃত্তি। অম্‌নি যেন বেজে ওঠে শত নক্ষত্রের সঙ্গীত, সুরে সুরে অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিত মার্লিনের তনুতন্ত্রীতে জাগে তার প্রতিধ্বনি। মুহূর্ত্তে শিল্পী জন্ম নেয় ওর মনে। ভাবে—কাব্যের সার্থকতা শুধু আবৃত্তিতে, সার্থকতা দশজনকে শুনিয়ে। তার জন্যে চাই মঞ্চ, চাই শ্রোতা; তাকে হোতে হবে অভিনয়-শিল্পী।

মার কাছে মার্লিন মিনতি জানায়। আবদার করে—ম্যাক্স্‌ রেইন্‌হার্টের স্কুলে সে ভর্ত্তি হবে, শিখবে অভিনয়শিল্প। মার অভিজাত মনের রুচিতে কোথায় যেন বাধে। প্রথমটা তিনি রাজী হ'ননা সম্মতি দিতে। শেষে অভঙ্গব্রতী মার্লিনের দৃঢ়তায় তাঁকে রাজী হোতে হয়। সুরু হয় মার্লিনের শিল্পী-জীবন……

মার্লিন এসে দাঁড়ায় শিল্পের দেউল দেহলী পারে জীবনের এক শুভ লগ্নে, সে এক নতুন প্রভাতের রঙে রঙ্‌-করা নতুন আলোকে। জেলে আনে হৃদয়ের দীপাধারে

মার্লিন ডিয়েট্রিচ

সাধন-ব্রাত্যের অনির্ব্বাণ শিখা। অগোছালো মনটাকে কুড়িয়ে সঞ্চয় করে লক্ষ্যমুখে—যেমন হেমন্তের বিক্ষিপ্ত শিশির-কণা ধীরে ধীরে জমে ওঠে পত্রশীর্ষে বড় একটি ফোঁটায়।

মালিন অন্যমনা। অন্তরে বাইরে ওর বাবধানহীন বিস্তৃতির কাছে কৃত্রিমতার স্থান নেই, নেই ওর শিল্পবোধের অভিধানে অভিনয়ের আভিজাত্যহীন সংজ্ঞা যা'তে মঞ্চকে বিচ্ছিন্ন ক'রেছে ব্যঞ্জনা থেকে। আবেগের আবরণও সইতে পারে না, পারে না অন্তরের ফল্গুকে কবরিত ক'রে বালির স্তূপ রচনা ক'রতে। অথচ সেইটাই সমাজের শিখর-স্তরে ঔজ্জ্বল্য আর শালীনতার [illegible] প্রহরায় থাকে আলাপিতের হৃদয় দ্বারে। চলনে বলনে কোথাও পরিমাপনের পান থেকে চুন খসলে ওর সংঘর্ষ বাধে মার সঙ্গে, ওমনি স্বাভাবিক নিয়মে শাসন নেমে আসে তর্জনী উঁচিয়ে। ক্ষেত্র বিশেষে ভৎর্সনা অনেক সময় শারীরিক সীমাকেও আক্রমণ করে। এমন নজীর মালিনের জীবনে অমিল নয়। রেইনৃহার্টের স্কুলে মহলা চ'লেছে নৃত্যের। ঘর-ভরা লোক—শিক্ষক, সতীর্থ-শিল্পী, আরও অনেকেই আছেন। মালিনকে নাচতে হবে পর পর সবার সঙ্গে। ও তাই নাচেও, পারে না শুধু একজনের সঙ্গে। ছেলেটিকে ও কিছুতেই সইতে পারে না, ওকে সে কেবলই বিকর্ষণ করে। এমন জুড়ির সঙ্গে নৃত্য চলে না, চলে অঙ্গ-ভঙ্গী। মালিন তাই মুখ বেঁকিয়ে গোঁজ হোয়ে বসে থাকে। প্রথমটা মার মৃদু ভৎর্সনা শোনা যায়, তারপর আড়ালটা যখন ভদ্রগোছের হ'য়ে ওঠে, একান্ত মালিনের গালে ঠাস্ ক'রে চড় কষিয়ে দেন তিনি। চিক্-চিক্ ক'রে ওঠে ওর গালে দু' ফোঁটা চোখের জল। মালিন নাচে ছেলেটির সঙ্গে—যে নাচ ম্লান ক'রে দেয় আগের-গুলোকে।

আজও মোছেনি মালিনের মন থেকে মার সেই অশ্রু-লেপা স্মৃতিটুকু। আজও তাই মনে পড়ে আসরে-সম্মেলনে, টেবিলে চায়ের নিমন্ত্রণে। কখন অলক্ষ্যে ওর হাতখানি চলে যায় কপোলে। আঙুলের স্পর্শে অনুভব করে দাগ,—আজও আছে সেই দাগ, স্পষ্ট, অতি স্পষ্ট, আকাশ-আকীর্ণ শতভিষার মত। দাগ আছে, নেই শুধু সেদিনের তিক্ততা, কখন তা মধুময় হোয়ে গেছে বোঝেনি মালিন......

জীবনে আরও দু'-একটি বসন্ত আসে মালিনের। শেষ

হোয়ে আসে শিক্ষার্থী জীবনের। সুরু এবার শিল্পের পথ পরিক্রমণ। তার জন্যে প্রস্তুত মার্লিন। কিন্তু সে পরিক্রমণের প্রারম্ভেই অপেক্ষা ক'রেছিল ওর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ও মধুর বিস্ময়, যে বিস্ময় বসন্তের মতোই রঙীন, প্রয়োজন নেই যার জন্যে কোন প্রস্তুতির, বিনা আভরণেই যাকে বরণ ক'রে নেওয়া যায়। জীবনের অষ্টাদশ বসন্তে আবির্ভাব সেই অভাবনীয়ের।

বার্লিনের এক চিত্রপ্রতিষ্ঠানে কণ্ঠ পরীক্ষা দিতে গেছে মার্লিন। বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি হোয়ে এসেছেন বিখ্যাত সংলাপ-রচয়িতা রুডলফ্ সীবার। সীবারের সঙ্গে পরিচয় নেই মার্লিনের। তবু কিন্তু প্রথম দর্শনেই মনে হয় মার্লিনের সে যেন চির-পরিচিত, যেন তার সন্নিধিতে কাটিয়েছে যুগযুগান্তর। চেনা সুর, চেনা গন্ধ, চেনা কোন পরিবেশের মতোই মার্লিনকে আকর্ষণ করে সীবার। দু'জনে মুখোমুখী—নীরব, নিশ্চল। অকস্মাৎ মহাশূন্যে প্রতিবেশী দু'টি তারা যেন নির্বেগ, নিষ্কম্প, প্রতীক্ষায় উন্মুখস্খলিত সেই মুহূর্তের জন্যে যখন ওরা এক হোয়ে মিশে যাবে একই কক্ষ পথে, একই আয়ন ক্রান্তিতে।

পরীক্ষা দেওয়া আর হয় না। অপলকে চেয়ে থাকে পল্লবঘন আঁখি তুলে, রুদ্ধকণ্ঠ মার্লিন। অন্তর্লীন আসঙ্গলিপ্সা ওর বক্ষের পাষাণ-প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে মরে, উচ্ছ্বলিত হোয়ে ওঠে কামনার ফেনশীর্ষ দুরন্ত ঊর্মিমালা। বাস্তবকে মনে হয় ওর কল্পনার অনুকৃতি ব'লে। এই সেই পুরুষ যার জন্যে ও কাটিয়েছে অশ্রুসিক্ত বহু বিনিদ্র রজনী, তিলে তিলে যার জন্যে ও গ'ড়ে তুলেছে ওর দেহের দেউল, যার অভ্যুদয়ের জন্যে ওর জগতে জেগেছে বসন্ত। আদিম নারীত্বের সমুদ্র গুঞ্জন ধ্বনিত

হয় মার্লিনের কানে কানে। বহুদিন পরে আবার সেই উজুনপাড়ের বেকারীর সোঁদালো গন্ধ আর ক্রকারীর শব্দিত ছন্দের হাতছানি।

ছুটি ধারা এক হোয়ে মিশে যায়—সীবার আর মার্লিন। মোহানার পলিতে জেগে ওঠে সৃষ্টির আশীর্বাদ—ছু'টি বসন্ত পরে। ওদের জীবনে আসে মারিয়া—একমাথা সোনালী কোঁকড়া চুল, মোমের মত নরম তুলতুলে, হাঁসের মত ধবধবে সাদা, নীলাক্ষী মারিয়া। মার্লিনের নয়নের মণি। প্রথম মাতৃত্বের মধুর আস্বাদে ভরা মারিয়া, স্তবকিত বক্ষের রোমাঞ্চে ভরা মারিয়া......।

মারিয়া! মারিয়া! মারিয়া! মার্লিনের অন্ধ-স্নেহ আরণ্যক উচ্ছৃলতায় আবর্তিত হয় মারিয়াকে কেন্দ্র ক'রে। মারিয়াকে ও এত ভালবাসে যে পৃথিবীশুদ্ধ লোকের কাছে তেরো তারিখটা অশুভ হোলেও মার্লিনের কাছে তা' চিরশুভ কারণ সেই তারিখেই মারিয়া জন্মেছে। ভারী পয়মন্ত মেয়ে এই মারিয়া। ওর জন্মের পর থেকেই সুরু হয় মার্লিনের শিল্পীজীবন। ডাক আসে রেইনহার্টের স্কুল সংশ্লিষ্ট সাধারণ মঞ্চ থেকে—'দি টেমিং অব দি শ্রু' নাটকে বিধবার চরিত্রের জন্যে। মার্লিন আর দ্বিধা করে না। শিল্পীর পক্ষে প্রতিভাই বড় কথা, ভূমিকা নয়। সৃজনীক্ষমতা যার আছে বিকাশ তার সম্ভব যে কোন চরিত্রেই। এটা তো যা হোক মন্দের ভালো, পরবর্তী নাটক 'দি সার্কল'-এ ওকে এক লাইন সংলাপের একটি ভূমিকা দেওয়া হয়। তাতেও মার্লিনের উৎসাহ নেভেনি একটুও। ও জানে জীবনের ভিত্তি স্থাপনে ধৈর্যের অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হোতে হয়। তাছাড়া, এলিজাবেথ বার্গনারের মত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর সঙ্গে অভিনয় করা—সে বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

কিন্তু এর চেয়েও বড় সৌভাগ্য প্রতীক্ষা ক'রে ছিল মার্লিনের, আরও ব্যাপক আরও সম্ভাবনায় ভরা। সে এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক রাত্রি মার্লিনের জীবনে, বার্লিনের মঞ্চ ইতিবৃত্তে, জার্ম্মানীর অভিনয়-ঐতিহ্যে।

সেদিন রাত্রে রেইনহার্টের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে এসেছেন জার্ম্মানীর প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক ফন ষ্টার্ণবার্গ। মার্লিনও আছে সেদিনকার শিল্পী-সম্প্রদায়ে। ক্ষুদ্র একটি অংশ, তবুও এমন প্রত্যক্ষানুগামী অভিনয়, এমন আত্মিক স্পর্শবহ ব্যঞ্জনা ষ্টার্ণবার্গ দেখেন'নি ইতিপূর্ব্বে। আকাশ-ছোঁয়া বিস্ময়ে তিনি চেয়ে থাকেন। মনে হয়—দক্ষিণ সমুদ্রের সবুজ কোন দ্বীপ ও তুলে এনেছে মঞ্চে, যেন মরুর মেরু অভিনয়ে ও বয়ে এনেছে বরফের গন্ধ, যেন উদগ্রীব হোয়ে আছে কোনও আগ্নেয়গিরি সূর্যের বিদীর্ণতায় নিজেকে [illegible] অপেক্ষায়।

ষ্টার্ণবার্গ উৎফুল্ল হোয়ে ওঠেন সন্ধিৎসু প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো ঈপ্সিত বস্তুর নাগালে এসে। মার্লিনকে তাঁর চাই। মার্লিনই তাঁর 'ব্লু এঞ্জেল'। ও-কে ছাড়া ছবি তাঁর হবে নিষ্প্রাণ, নীলিমা হয়তো আসবে, আসবে না উর্বশীর সুষমা, ভ'রে তা উঠবেনা স্বর্গের স্বাভাবিকতায়।

অভিনয় শেষে মার্লিন এসে দাঁড়ায় ষ্টার্ণবার্গের সামনে। অভ্রলেহী পাহাড়ের পাদমূলে ব্রততীর বিনম্র আনতি। গুরু আর শিষ্যের প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম প্রস্তুতি মার্লিনের চিত্রদীক্ষার।

উফা ষ্টুডিও। এমিল জেনিংসের নায়িকা হোতে হবে 'দি ব্লু এঞ্জেল'-এ। তবে পথ খুব সোজা নয়, আবার পরীক্ষা। প্রযোজকের তরফের লুসি মান্‌হাইম্‌ ওর প্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকাটির জন্যে। তা হোক, ভয় ওর করেনা, বরং জয় করে বিচারকদের সুরেলা কণ্ঠে। তবু কিন্তু প্রযোজক এরিক পমার পুরো রাজী হোতে পারেন না লুসির প্রতি পক্ষপাতিত্বে। ষ্টার্ণবার্গ সিদ্ধান্তে অটল।

পমারকে জানান—মার্লিন ছাড়া এ ছবি তিনি তুলবেন না। আবার ফিরে যাবেন আমেরিকায়। নিরুপায় পমারকে শেষে রাজী হোতে হয়। পাঁচ হাজার ডলারের চুক্তিতে মার্লিন কাজ করে জার্মান আর ইংরিজি সংস্করণে।

'দি ব্লু এঞ্জেল' সফল, সার্থক—মার্লিনের স্ফুরিত প্রতিভার প্রভায় প্রদীপ্ত। এমন সজীব অভিনয় অমিল, মেলেনা এমন আবেগ-অনুভূতির আন্দোলনে উদ্বেল সমুদ্র-চন্দ্রিকার আস্বাদ। মনে হয় পর্দার ব্যবধান সরিয়ে ও যেন নিয়ে যায় দর্শককে ওর প্রমোদকল্লোলিত সন্নিহিতে—শীতল ময়ূখ-ঝরা মাটির অতীত কোন মাটিতে—শব্দ যার ভেসে আসে তন্দ্রাবিল কানে দূরাগত পাখীর ডাকের মতো, আমেজ যার ভেসে আসে নরম মসৃণ কোন রাত-শেষের জ্যোৎস্নার মতো। মহুয়া-মদির উল্লাসে উৎকীর্ণ দর্শক। অগণিত স্তাবকের স্তুতিগুঞ্জনে কম্পমান দিক-দিগন্ত।

মার্লিনের সার্থকতার আনন্দ নামে অনিবার স্নেহের বন্যায় অজস্র অনাবৃত চুম্বন হোয়ে। মারিয়ার গালে গালে ফুটে ওঠে চুমুর সজল লেখা। সাবারের চা ঢালতে ঢালতে পিরিচে চামচ্‌ বাজিয়ে নেচে ওঠে মার্লিন, নেচে ওঠে সাবারের নীল পরী······

'দি ব্লু এঞ্জেল'-এর সাফল্য মুহূর্তে স্পর্শ করে আমেরিকার তার। চিত্রামোদীর অন্তরে অন্তরে সৃষ্টি করে বহ্নুৎসব মার্লিনের সাগ্নিক শিখা। অসংখ্য তাগিদের জোয়ারে ওর আহ্বান আসে হলিউড থেকে। প্যারামাউণ্টের প্রধান কর্ত্তা স্বয়ং সুল্‌বার্গ মার্লিনের বার্লিন-দ্বারস্থ। কিন্তু?

কিন্তু কি ক'রে ও যায় মারিয়াকে নিয়ে অত দূর দেশে? সুল্‌বার্গও নাছোড়বান্দা। শেষটায় চুক্তিপত্রে আরও একটি সর্তের যোগ হয়: ভালো না লাগলে যেকোন মুহূর্ত্তেই হলিউড ত্যাগের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে মার্লিনের। স্বেচ্ছাধীন সর্ত আর স্ফীত ডলারের এক চুক্তির নিশ্চিন্ত আশ্বাসে ভর ক'রে মার্লিন যাত্রা করে আমেরিকা······

(শেষাংশ ১৬১ পৃষ্ঠায়)

সোভিয়েট রঙ্গজগতে ★ ★

● ● ● নিমাই ঘোষ

সোভিয়েট রঙ্গজগতের বিবৃতি অর্থহীন হবে যদি মস্কো বোলশোই থিয়েটারের কথা না বলা হয়। সোভিয়েট সংস্কৃতির সবচেয়ে গর্ব্বের এবং গৌরবের বস্তু বোলশোই থিয়েটার; বোলশোই তাঁদের রঙ্গদুনিয়ার শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। রঙ্গমঞ্চ হিসাবে এর বিরাটত্বের সমকক্ষতা আর কোন দেশ দাবী করতে পারে কিনা সন্দেহ। অন্যান্য ইউরোপীয় বা মার্কিন রঙ্গমঞ্চ দেখার সুযোগ আমার হয় নি। কিন্তু যাঁরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে থেকেছেন—এমন সঙ্গী আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাঁদের মুখে শুনেছি যে এত বৃহৎ ব্যাপার তাঁরা পূর্ব্বে কখনও দেখেননি।

'অর্ডার অফ্ লেনিন' সম্মানে ভূষিত ষ্টেট একাডেমিক বোলশোই থিয়েটার-এর ইতিহাস, প্রকৃতপক্ষে রুশজাতীয় গীতিনাট্য (opera) ও নৃত্যনাট্যেরই (Ballet) ইতিহাস—যার শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বজনস্বীকৃত।

১৭৬ বছর আগে অর্থাৎ ১৭৭৬ সালের ২৮শে মার্চ্চ মস্কোর তৎকালীন নাট্যজগতের সুবিখ্যাত পি, ভি, উরুশভ মস্কো নগরীতে পাকা থিয়েটার গ'ড়ে তোলার অনুমতি পান এবং সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ নট ও নটী সমন্বয়ে একটি দল গঠন করেন। গোড়ার দিকে ভরনটশভ নামে এক ধনীর গৃহে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছিল; তারপর ১৭৮০ সালে পেট্রোভস্কি ষ্ট্রীটে জমি নিয়ে এই থিয়েটারের জন্যে বিশেষভাবে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করা হয় এবং তার নাম হয় 'পেট্রোভস্কি'। বর্ত্তমানের বোলশোই থিয়েটার এই একই জমির ওপর নির্ম্মিত হয়েছে।

'পেট্রোভস্কি'-তে প্রথম দিকে একই দল গীতিনাট্য এবং নাটক উভয় বিভাগেই কাজ করতেন। তারপর ক্রমশ: উচ্চশ্রেণীর বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয় এবং থিয়েটারের নিজস্ব অর্কেষ্ট্রা-দলও সংগঠিত হয়। এই নাট্যশালা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই 'রাশিয়ান কোর্ট থিয়েটার ট্রাডিশান'-এর বিলুপ্তি ঘটে এবং এই সংগঠন দেখতে দেখতে জাতীয় নাট্যশিল্পের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়।

এই সংগঠনের গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যগুলির ভিত্তি ছিল লোকসঙ্গীত এবং লোকনৃত্যের ওপর। এই কারণেই এঁদের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে রুশবাসীদের জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যেতো এবং ঐ একই কারণে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব এঁদের অভিনয়ের ধারাকেও প্রভাবান্বিত ক'রেছিল। জোরিন রচিত 'রিবার্থ' পেট্রোভস্কিতে প্রথম রুশ অপেরা হিসেবে অভিনীত হয় এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। এরপর রুশ রচয়িতাদের গীতিনাট্য একের পর এক মঞ্চস্থ হ'তে থাকে, এবং 'পেট্রোভস্কি' মস্কোবাসীর কাছে 'অপেরা হাউস' নামে খ্যাতিলাভ করে।

খাঁটি রুশ গীতিনাট্য এবং মঞ্চশিল্পের অগ্রগতির সাহায্যে 'পেট্রোভস্কি' প্রভূত প্রেরণা জুগিয়েছিল। অভিনয়ে অভিনবত্ব সৃষ্টি কর', জনগণের জীবন ধারার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপন করার মূলে ছিল তৎকালীন রচয়িতাদের প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রগাঢ় প্রভাব।

১৮০৫ সালে আগুন লেগে 'পেট্রোভস্কি' ধ্বংস হ'য়ে যায়। পরবর্ত্তী বিশ বছর উক্ত সংগঠন তাঁদের কাজ নিয়মিত চালিয়ে যান বটে, কিন্তু কোন পাকা নাট্যশালা গঠন করা হয় নি।

১৮২৫ সালে প্রফেসর মিখাইলভ্-এর নক্সা অনুযায়ী বোলশোই থিয়েটার নির্ম্মিত হয়। এতবড় থিয়েটার গৃহ তখনকার দিনে আর কোথাও তৈরী হয়নি বলেই সবাই জানতেন। আমি বলি আজও হয়েছে কিনা সন্দেহ। বিখ্যাত "ট্রায়াম্ফ অফ্ মিউজ" দিয়ে বোলশোই থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন হয়। কবি দিমিট্রিয়েভের কাব্যের ওপর ভিত্তি করে 'এ্যালিয়াবিয়েভ' এবং 'ভারটুস্কি' এই বিখ্যাত রচনা করেন। এই 'প্রোলোগ' রুশ জাতীয় অপেরার বনিয়াদ হবার গৌরবই দাবী করে না—রুশ সুরশিল্প ও নাট্যাভিনয় কোন্ পথে যাবে তার দিক্ নির্ণয়ও করেছিল বহুদিন ধ'রে। এর পরেও বহু বিখ্যাত অপেরা মঞ্চস্থ হ'য়েছিল কিন্তু দুনিয়ার দরবারে রুশ গীতিনাট্য 'গ্লিনকোর' আবির্ভাবের পর থেকেই প্রতিষ্ঠা

অভিনীত হওয়ার পর ডাইরেক্টরেট অফ্ ইম্পিরিয়াল থিয়েটার বড়ই বেসামাল হ'য়ে পড়েন এবং জনসাধারণের প্রগতিমুখী রুচি এবং উন্নততর শিল্পের প্রতি আকর্ষণ বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বোলশোই মঞ্চে হাল্কা ও সস্তা তামাসায় উৎসাহ দিতে থাকেন। বিদেশী থিয়েটারের দলের কাছে মঞ্চ ভাড়া দেওয়া হয়। মেরেলীর ইতালীয় অপেরা দল সপ্তাহে ৪।৫টা ক'রে প্রদর্শনীর সুযোগ পেতে থাকে। কিন্তু রুশদেশীয় রচয়িতাদের অপেরা বা ব্যালে বহু চেষ্টা করে মাঝে-মধ্যে অভিনয় করার অনুমতি পায়। ছাই চাপা দিয়ে আগুনের উত্তাপ এবং উজ্জ্বলতা যেমন ঢাকা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়—তেমনি রুশ রচয়িতাদের অতুলনীয় প্রতিভা ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চেপে রাখতে পারেনি। সারা বিশ্ব বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছে—রিম্‌সি করসকভ-এর "দি স্নো মেডেন্", বোরোডিন্-এর—"প্রিন্স আইজোভ" (আমরা এই অপেরাটি দেখেছি), ছাইকভ্‌স্কি অপেরা—"দি কুইন অফ্ স্পেডস্", ইউজিন ওনেজিন-এর ব্যালে—"দি সোয়ান লেক্," (আমরা দেখেছি,—যতক্ষণ রেখেছি মনে হয়েছে একটি মধুর স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে রয়েছি)। এছাড়াও ডারগোমাইজস্কি এবং মুসরগ্‌স্কির শক্তিশালী সৃষ্টিগুলি সারা দুনিয়ার সশ্রদ্ধ দৃষ্টি রুশ মঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

চ্যালিএ্যাপিন এবং সোবিভব-এর মতো প্রতিভাবান গায়ক এবং নেজডানভের মত সুকণ্ঠী গায়িকার আবির্ভাব বোলশোই-এর ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। নৃত্যশিল্পী রোসল্যাভ্‌লেভা, ডাজহরি, গেট্‌সার, টিকমিরভ এবং গোরস্কি-র নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৯০৫ সালের বিফল বিপ্লবের ধাক্কা বোলশোই থিয়েটারেও লেগেছিল। প্রগতিমুখী মঞ্চশিল্প আর একবার বাধা

লাভ করে এবং ক্রমশঃ সমগ্র নাট্যজগতে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করে।

১৮৪২ সালে গ্লিনকোর "আইভ্যান-সুসানিন" প্রথম মঞ্চস্থ হয় এবং তার বছরচারেক পরেই তাঁর বিরাট সৃষ্টি "রুশলান এ্যাণ্ড লুডমিলা" অভিনীত হয়।

প্রসঙ্গতঃ এইখানে একটু ব'লে দিই—আজ ১১০ বছর হ'য়ে গেল এখনও এই দুটি বিখ্যাত অপেরা নিয়মিত অভিনীত হ'য়ে থাকে। আমরাও এই দুটি অপূর্ব্ব অপেরা দেখে এসেছি। 'আইভ্যান্-সুসানিন্'—এক বৃদ্ধ দেশপ্রেমিক কৃষকের পোল্যাণ্ডদেশীয় আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্জ্জয় প্রতিরোধের কাহিনী। "রুশলান এ্যাণ্ড্ লুডমিলা" একটি রূপকথা; একটি নির্ম্মল প্রেমের কাহিনীর মধ্য দিয়ে উঁচুদরের ভাব এত সুন্দরভাবে পরিবেশন করা হ'য়েছে যাতে দর্শকের মনের সৎ প্রবৃত্তিগুলি সতেজ হ'য়ে ওঠে। এই দুটি অপেরা এক শতাব্দী আগে যে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন ক'রেছিল, আজও তা' এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

জার-শাসিত রাষ্ট্র কিন্তু রুশ মঞ্চের এই প্রগতিশীলতায় বড়ই বিচলিত হ'য়ে প'ড়েছিল। বিশেষ ক'রে গ্লিনকো এই প্রগাঢ় সাঙ্গীতিক তাৎপর্যপূর্ণ অপেরা দুটি

পায়। করম্যালিজ্‌ম্‌ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর গভীরতার পরিবর্ত্তে অর্থহীন ব্যক্তিক আড়ম্বর বেশী আদর পায়। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন টেঁকেনি।

এরপর আসে মহান্ "অক্টোবর-বিপ্লব"। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফলতার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই শিল্প ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়ার সমাধি রচিত হয়। অত্যন্ত অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে রুশ মঞ্চশিল্প—আদর্শ এবং কলার দিক থেকে উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্তরে দ্রুত উন্নীত হতে থাকে। দুষ্ট রাজকর্ম্মচারীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গালয় তার প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করে দেয় নতুন দর্শকদের জন্য—তারা মজুর—তারা চাষী—তারা লাল-ফৌজ! এই নতুন দর্শকদের জন্য নতুন ধরণের অপেরাও রচিত হতে থাকে, যার বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় মুলতঃ ঐতিহাসিক এবং বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর মধ্য থেকে।

সোভিয়েট্‌-এ আসলে আজ অবধি বহুবিখ্যাত অপেরা এবং ব্যালে রচিত ও মঞ্চস্থ হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলির জনপ্রিয়তা এতবেশী যে, বোলশোই-এর তালিকায় সেগুলি কায়েমীভাবে জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে। যেমন ব্যালের মধ্যে গ্লিয়ারের—"রেড পপি", এ্যাসফেইভের "ফ্লেমস্‌ অফ্‌ প্যারিস" এবং "দি ফাউণ্টেন অফ্‌ বাখ্‌চিসরাই" ইত্যাদি অপেরার মধ্যে ডেজারজিন্‌স্‌কির "দি সয়েল আপটার্ণড্‌", চিজকোভের "দি আরমারড্‌ ক্রুজার-পোটেমকিন,"—জেলোবিনস্কির "মাদার" এবং গ্লিয়ারের 'দি ব্রোনজ্‌ হর্সম্যান' ইত্যাদি (আমরা এই বিখ্যাত অপেরাটি দেখেছি)।

আমরা "রেড পপি" ব্যালেটি দেখেছি। চীনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অপূর্ব্ব কাহিনী, অতুলনীয় সৃষ্টি—যা কেবল দেখেই উপলব্ধি করা যায়—ব'লে বা লিখে তার চমৎকারিত্ব বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা! নায়িকার ভূমিকায় নেমেছিলেন উলানোভা (একাধিকবার 'ষ্ট্যালিন প্রাইজ' পেয়েছেন)। কেবল নাচের মধ্য দিয়ে এত গূঢ় তাৎপর্য্যপূর্ণ কাহিনী এত প্রাঞ্জলভাবে বলা যে সম্ভব "রেড পপি" দেখার আগে তা' আমাদের ধারণাতীত ছিল।

সোভিয়েট রচয়িতাদের হালফিল রচিত "বোরিস গডনভ" এবং "কেফ্‌ কভ্‌" নামক দুটি বিখ্যাত অপেরা আমরা [illegible] গ্লিয়ার-এর [illegible] ব্রোনজ হর্সম্যান ও

দেখেছি। প্রযোজনার বিরাটত্ব অবর্ণনীয়। ষ্টেজক্র্যাফ্‌ট্‌ যে কোথায় উঠেছে না দেখলে বিশ্বাস করা মুস্কিল। যাঁরা তাঁদের "গ্র্যাণ্ড কনসার্ট ফিল্ম"টি দেখেছেন তাঁরা কিছুটা ধারণা করতে পারেন—কারণ ছবিটি বোলশোই থিয়েটারকেই কেন্দ্র করে তোলা।

১৯৩৭ সালে বোলশোই থিয়েটার "অর্ডার অফ্‌ লেনিন" সম্মানে ভূষিতও হয়েছে। এই থিয়েটারের ১২টি প্রোডাক্‌শন ষ্ট্যালিন প্রাইজ লাভ করেছে এবং ৬৫জন শিল্পী ষ্ট্যালিন প্রাইজ পেয়েছেন।

এই শিল্পীরা বোলশোই মঞ্চেই তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ করেন নি; দেশের জনজীবনের সঙ্গে তাঁদের প্রায় নাড়ীর সম্পর্ক। বোলশোই ছাড়াও বিভিন্ন রিপাব্‌লিক-এর মঞ্চেও তাঁরা অভিনয় করেন—তা'ছাড়া শ্রমিকদের ক্লাবে (হাউস অফ্‌ কালচার) এবং সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠানের ক্লাবসমূহে গিয়ে গান শুনিয়ে এবং নাচ দেখিয়ে কর্ম্মীদের অনুপ্রাণিত করাও তাঁদের কর্ত্তব্যের মধ্যেই পড়ে বলেই তাঁরা মনে করেন।

বোলশোই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে তার ষ্টেজ্‌ এবং টেক্‌নিক্যাল দিকটা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার বলে মনে করি। ষ্টেজ্‌টির ওপনিং ৪৫ মিটার, (১ মিটার = এক গজের সামান্য কম), ডেপ্‌থ্‌ ৪৫ মিটার, এবং হাইট্‌ ৬০ মিটার। ষ্টেজ-এর ফ্লোরটি বহু আকারে এবং ভাগে বিভক্ত এবং তার যে কোন অংশ 'হাইড্রলিক' পদ্ধতিতে ওপরে উঠে যায় বা নীচের দিকে নামিয়ে গর্ত্তের সৃষ্টি করা যায়। সমস্ত ব্যাপারই, সেই পট-পরিবর্ত্তন থেকে সুরু করে ষ্টেজ-এ ষ্টীম্‌ দিয়ে কুয়াশা বা ঝড় ইত্যাদি সৃষ্টি করা, সব-কিছুই যন্ত্রচালিত।

ব্যাক্‌ ড্রপগুলি (সিন্‌ পিছনে যা থাকে) অভিনব। মাছধরার জালের মত জিনিষের ওপরে, কারপেট জাতীয় উপাদানের ওপর ছবি এঁকে, তারপর তার কাট্‌-আউট কেটে ঐ বিরাট জালগুলিতে মানানসই করে আট্‌কে দেওয়া হয়েছে। পর্দ্দাগুলিকে ষ্টেজ-এ যখন একের পর একটি ক'রে ফেলা হয়, জালগুলি প্রায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়—আলোকসম্পাতে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে 'কাটআউট্‌'গুলি—২১৩টি বিভিন্ন প্লেন-এ। বিভিন্ন প্লেন-এ গাছপালা, বাড়ীঘর থাকায় অদ্ভুত ডেপথ্‌-এর সৃষ্টি হয়। এই জালের নীচের দিকে অর্থাৎ যেখানে ষ্টেজ এসে ঠেকেছে, সেখানে বিরাট-বিরাট ছিদ্র কাটা আছে যার ভেতর দিয়ে অভিনেতা অভিনেত্রীরা বিভিন্ন 'ব্যাকড্রপ'-এর সামনে যাতায়াত করেন। ছিদ্রগুলিও চোখে পড়েনা, ফলে ষ্টেজ-এর সমস্ত ডেপথ-টায় তাঁরা এ্যাক্‌শন নিয়ে 'কভার' করতে পারেন। এখানে উইংস্‌-এর ধার থেকে 'প্রম্পট্‌' করা হয় না। ষ্টেজ-এর পাদপ্রদীপের কাছে মাঝামাঝি জায়গায় 'ফ্লোর'-এ খানিকটা কাটা থাকে, 'প্রম্পটার' তার মধ্যে ঢুকে দাঁড়ান—তাঁর মাথাটা ঠিক 'ফ্লোর লেভেল'-এর ওপরে থাকে এবং তাঁকে লুকোবার জন্যে একটি ইস্পাতের ঢাকনা দেওয়া থাকে; বাইরে থেকে দেখলে সেটিকে কচ্ছপের পিঠের মত একটি বস্তু 'ফ্লোর'-এ পড়ে রয়েছে বলে মনে হয়। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই তবে চোখে পড়ে, নাহলে ব্যাপারটা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। 'প্রম্পটার' প্রকৃতপক্ষে অভি-নেতাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'প্রম্পট' করেন এবং বেশ জোরেই বলতে পারেন, কারণ, তাঁর শব্দের 'থ্রো'টা ষ্টেজ-এর ভেতর দিকেই যায়, 'অডি-টোরিয়াম'-এর দিকে মোটেই যায় না।

উইংস-এর পাশে একটি কন্ট্রোল চেম্বার আছে। কন্ট্রোল-বোর্ডটি দেখলে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এর কথা মনে পড়ে—পরিচালক সেখানে বসে বিভিন্ন বোতাম টিপে বিভিন্ন বিভাগে সঙ্কেত করেন এবং যন্ত্রচালিত নানারকম 'এফেক্ট' ও 'স্পেশাল এফেক্ট' সুচারুভাবে নাটকের সঙ্গে তাল রেখে সম্পাদিত হ'তে থাকে। ষ্টেজ-এর সামনে, ঠিক নীচেই, ১২৫ জন যন্ত্রীসমন্বিত অর্কেষ্ট্রা এফেক্ট এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুরসৃষ্টি করতে থাকে। এই সবের যোগফল দর্শকের মধ্যে এক অতুলনীয় অনুভূতির সঞ্চার করে। বোলশোই থিয়েটারে মোট বসবার আসনের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশী।

বোলশোই ছাড়া আমরা মস্কো আর্ট থিয়েটার-এর মলি থিয়েটারে নাটক দেখেছি। লেনিনগ্রাদে পুশকিন থিয়েটার দেখেছি, সোচিতেও অপেরা দেখেছি। 'কিয়েভ'এ থিয়েটার দেখেছি, টাসকেন্ট এ অপেরা দেখেছি—অন্যান্য রঙ্গমঞ্চগুলি বোলশোই-এর তুলনায় আয়তনে অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু ষ্টেজ ক্র্যাফট-এর মূল টেকনিক মোটামুটি সবজায়গাতে একই।

'মলি থিয়েটার' এ আমাদের দুটি নামকরা নাটক দেখার সুযোগ হয়। একটি 'আন্‌ফরগেটেব্‌ল্ ১৯১৯', অপরটি শেকভ্-এর 'আংকল্ ভ্যানিয়া'। প্রথমটি বলা বাহুল্য বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত। দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ হৃদয়-আবেদনবহুল প্রণয়নাট্য। 'আংকল ভ্যানিয়া'র ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন মিঃ অরলোফ। ইনি রুশ নাট্যগুরু ষ্টানিস্লাভস্কির অতি প্রিয় এবং সুদক্ষ সাকরেদ ছিলেন—৬০ এর কোঠায় পা বাড়িয়েছেন। ইনি রাত্তিরে ষ্টেজ-এ অভিনয় করেন আর দিনে 'ষ্টেট্ ইনষ্টিটিউশন্ অফ্ ড্রামাটিক আর্ট'-এ মাষ্টারী করেন। আমরা সেখানে গিয়ে দেখেছি কি অক্লান্ত পরিশ্রমে ছেলেমেয়েদের শেখাচ্ছেন কি ক'রে অভিনয় করতে হয়। ক্লাশরুমের মধ্যে একটি পরিপূর্ণভাবে সজ্জিত মঞ্চও আছে। সঙ্গে একটি চমৎকার 'মেক-আপ' করার ঘর—ছাত্ররা পাকা 'মেক-আপ' ক'রে এবং পোষাক পরিচ্ছদ পরে কোন একটি নাটকের বিশেষ অংশ অভিনয় করে এবং অরলোফ সেটি নিখুঁতভাবে অভিনীত না হওয়া পর্য্যন্ত তালিম দিয়ে যান। সেই নাট্য-শিক্ষা-বিদ্যালয়ে থেকে ৫।৬ বছর অধ্যয়ন ক'রে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর কোন ছাত্র বসে থাকার অবসর পায় না। সোভিয়েট ইউনিয়নের রিপাবলিকের বিভিন্ন মঞ্চে তাদের জন্য কাজ অপেক্ষা করে।

ব্যালে ইনস্টিটিউট-এ গিয়েও দেখেছি কি চমৎকার-ভাবে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে শুনেছি বোল-শোই এর খ্যাতনামা নাচিয়েরা মাষ্টারী করেন এবং এখান-কার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্রাবস্থাতেই মঞ্চে নাচার সুযোগ পায়। এই সব ইনস্টিটিউট থেকে পাশ ক'রে বেরিয়েই তারা সরাসরি সাধা-রণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে। এছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়নের রঙ্গমঞ্চসমূহে শিল্পী সংগ্রহের আর একটি অভিনব উপায় আ[illegible] বোলশোই

থিয়েটারে এবং অন্যান্য রিপাবলিক-এর বড় বড় মঞ্চে একটি ক'রে বাৎসরিক কাউন্সিল হয়। তাতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। যেমন মস্কো ষ্ট্যালিন অটোমোবাইলস্ ফ্যাক্টরীর কর্ম্মীদের একদল, ইন্‌জিভি কালেকটিভ ফার্ম্ম থেকে একদল অর্থাৎ নানা কলকারখানা এবং ক্ষেতখামার থেকে সঙ্গীত ও নৃত্যানুরাগীদের সখের দল এই সব কন্‌সার্ট-এ যোগদান করেন। তাঁরা আবার সঙ্গীত এবং নৃত্যে শিক্ষা লাভ করেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের 'হাউস অফ কালচার' থেকে। পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ শিল্পীরা এইসব জায়গায় মাষ্টারী করেন। এই কন্‌সার্টএর টিকিট বিক্রি ক'রে জনসাধারণের সামনে অনুষ্ঠিত হয় এবং বিচারকদের মধ্যে থাকেন বহু বিচক্ষণ সমালোচক এবং এ্যাকাডেমিসিয়ান। এই সব কনসার্ট-এ যাঁরা কৃতিত্ব দেখান বোলশোই বা যে কোন বড় বড় মঞ্চে যোগদান করার জন্যে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমরা এই ধরণের দু'একটি কন্‌সার্ট-এ উপস্থিত ছিলাম। দাদা (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য) তাঁদের প্রশ্ন করেছিলেন, 'বাপু তোমাদের সখের শিল্পী এবং পেশাদারী শিল্পীদের মধ্যে কি প্রভেদ বল তো? আমি তো কোনো তফাৎ পাচ্ছি না।' উত্তরে তাঁদের একজন বলেন, 'কথাটা আপনি ঠিক-ই বলেছেন। একজন এ্যামেচার আর্টিষ্ট যখন পাবলিক ষ্টেজে এসে কন্‌সার্ট-এ আত্মপ্রকাশ করার পর্য্যায়ে পৌঁছয় তখন কাজে উৎকর্ষের বিচারে তার সঙ্গে একজন পেশাদারী আর্টিষ্ট-এর প্রভেদ বড় একটা পাওয়া যায় না। আমরা পেশাদার আর্টিষ্ট তাঁদেরই বলি যাঁরা নাচ, গান ও নাটক ছাড়া আর কিছু করেন না—এই আর কি!' সত্যিই তাই! আমরা কিয়েভ-এ গত বছরের এই ধরণের একটি কনসার্ট-এ রঙীন ডকুমেন্টরী ছবি দেখি তাতে কোন খামারের এক ট্র্যাকটর চালককে গাইতে দেখি। পরে শুনি ঐ অপূর্ব্ব

গায়কটিকে বোলশোই মঞ্চে যোগদান করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি সলজ্জভাবে সে আহ্বান এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, 'আমার গলা হয়তো ভালো হ'তে পারে কিন্তু আমার চেহারা এমন কিছু ভালো নয় যে আমি বোলশোই-এ নামতে পারি। বোলশোই আমাদের বড় গর্ব্বের জিনিষ, কাজেই আপনারা নিখুঁত শিল্পী খুঁজে নিন।' তারপর সেই ছবিতেই এক চিনির কারখানার একটি মেয়েকে গাইতে দেখি। শুনি তিনি নাকি বর্ত্তমানে বোলশোই থিয়েটার-এ এক খ্যাতনামা গায়িকার পদে প্রতিষ্ঠিতা (প্রাইমা ডোনা)।

এইসব দেখে, এটুকু বুঝেছি যে সোভিয়েট রঙ্গজগৎ এমনই একটি দুনিয়া, যেখানে কোনো প্রতিভাকেই এমন কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় না যে—"চান্স পেলে দেখিয়ে দিতাম—জীবনে চান্স-ই পেলাম না হায়!" একথাও বুঝেছি এখানে চান্স পেতে হ'লে প্রকৃত গুণের প্রয়োজনই হয়। মালিকের সম্বন্ধী বা প্রোডিউসারের রক্ষিতা হ'য়ে বাজীমাৎ করার রাস্তা বন্ধ। প্রকৃত গুণীকে এখানে তাঁবেদারী বা সুপারিশের ওপর ভরসা ক'রে অনিশ্চয়তার ভয় বুকে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে আড়ষ্ট হ'য়ে চেয়ে থাকতে হয় না। পরিষ্কার বুঝেছি, এখানে প্রতিভা কখনও নজর এড়ায় না; যেখানে আমার দেশে, শুধু আমার দেশ বলি কেন, যে কোন ধনতান্ত্রিক দেশে কত প্রতিভা তার যোগ্যতা প্রমাণ করার অনুকূল পরিস্থিতির অভাবে অথবা আত্মসম্মান বজায় রাখার তাগিদে তাঁবেদারী বা তৈলমর্দ্দনের প্রতিযোগিতায় হার মেনে চোখের আড়ালে নিঃশব্দে শেষ হ'য়ে যাচ্ছে। অথচ কত মাকাল-ফল শেষোক্ত অপকৌশলের জোরে রঙ্গজগতে জাল মুদ্রার মতো চালু রয়েছে। সোভিয়েট রঙ্গজগতে আমরা দেখে এসেছি প্রবীণ অভিজ্ঞ অভিনেতা, যাঁদের চুল সাদা হ'য়ে গেছে। সমাজ এবং রাষ্ট্রে তাঁদের স্থান কত উচ্চে, কি নিশ্চিন্ত স্বচ্ছন্দ জীবন তাঁদের। আর এই শ্রেণীর বহু ব্যক্তিদের এখানেও দেখি!—কি করুণ দৃশ্য! শেষ বয়সে সাহায্য রজনীর দিকে চেয়ে থাকতে হয়। বেশীদূর যাবার দরকার কি? মস্কোতে থাকতেই দাদাকে বলতে শুনেছি—"হ্যাঁ হে এ আবুহোসেনী আর কতদিন? দেশে ফিরে সংসার ঠেলার কথা মনে হ'লে যে হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যাচ্ছে।" দাদার মত একজন ক্ষমতাশালী প্রতিভাবান ৬৫ বছরের প্রবীণ অভিনেতার মুখে কেন একথা শুনতে হয়? এই "কেন"র উত্তর খুঁজে বার করবার সময় আজ এসেছে। খুঁজে বার করার কথা বললাম কারণ এই "কেন"র জবাব যে কেবল রঙ্গজগৎ হাঁতড়ালে পাওয়া যাবে না, এ কথা আজ আর বুঝতে কষ্ট হয় না। সঠিক কারণগুলি বুঝিয়ে বলার ভার যোগ্যতর ব্যক্তিদের ওপরেই রইলো—কিন্তু আমার সহজ বুদ্ধিতে মোটা দাগের সাদা কথা যা বুঝেছি তা হ'ল, যেহেতু দাদা সোভিয়েট রঙ্গজগতের মানুষ নয়, তাই আজ ৬৫ বছর বয়সে ৮৫ বছরের বৃদ্ধের মত দৈহিক আকৃতি ও অবস্থা নিয়ে এবং জীবনের সবটুকু নাট্যশিল্পের বেদীতে নিংড়ে দিয়েও আজ কপালের চামড়ার প্রতিটি কোঁচে সংসার ঠেলার এবং আগামীকালের স্থায়ী দুশ্চিন্তা কত ভয়াবহভাবে প্রকট হ'য়ে উঠেছে। আর মিঃ অরলোফ্ আমাদের রঙ্গজগতের মানুষ নয় বলেই ৬০ এর কোঠায় পা বাড়িয়েও ৪৫ বছরের

স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ়ের মত চেহারা নিয়ে জীবনের যা কিছু প্রয়োজনীয় তার প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস ক'রে, নিশ্চিত এবং নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের আওতায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে নাট্য-কলাকে উন্নত হ'তে উন্নততর স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নওজোয়ান শিল্পীদের নেতৃত্ব করার গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে রয়েছেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের পূর্ণ পরিতৃপ্তি তাঁর কথায় বার্ত্তায় এবং চোখে মুখে ফুটে বেরুতে দেখেছি।

যাই হোক্, আবার খেই ধরা যাক্। "সোভিয়েট পাপেট থিয়েটার" সম্বন্ধে না বললে মঞ্চপ্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। থিয়েটার হলটি খুব বড় নয়; তবে বিশেষ ছোটও নয়। থিয়েটারের পরিচালক মিঃ আব্রাশভ্, বয়স হ'য়েছে, তবে দেখতে খুব বুড়োও নয়। অপূর্ব্ব শিল্পী! পুতুল নাচের মধ্য দিয়ে এত হাস্যরস, এত বাস্তব অভিনয় এবং এত নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যায় জানতাম না। 'ষ্টেজ্-ক্র্যাফ্ট্'এর উচ্চ কারিগরি ট্রাডিসন এখানেও নজরে পড়ে। ষ্টেজটির ওপনিং হয়তো ৭।৮ ফিট হবে, উচ্চতা এবং গভীরতা হবে ফিট ৫।৬। পুতুলগুলি ফুটখানেক বা ২।৪ ইঞ্চি বেশী কম হবে কিন্তু ঐ পুতুলগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পারিপার্শ্বিক 'সেট', 'সেটিং' এবং জিনিষপত্রগুলি এত 'সুসমঞ্জস', তার ওপর আলোকসম্পাত এবং অভিনয়-চাতুর্য্য এত চমৎকার যে দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ বাদে ভ্রম হয় যেন প্রমাণ মাপের অভিনেতাদের বাস্তব অভিনয় দেখছি, শুধু মানুষগুলো যেন কার্টুন জগতের বাসিন্দা। আমরা যে অনুষ্ঠানটি দেখতে গিয়েছিলাম সেটি হলিউডের সাম্প্রতিক কীর্ত্তিকলাপের ওপর একটি চমৎকার ব্যঙ্গ।

বোলশোই থিয়েটারের মতো এরও ওপর তলায় একটি যাদুঘর আছে। সেখানে দুনিয়ার সব দেশের 'পুতুলনাচের' পুতুল সংগ্রহ ক'রে রাখা আছে এবং তাদের সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধও সেখানে রাখা আছে। ঐ একটি যাদুঘর থেকে 'পুতুল নাচের' ওপর রিসার্চ ওয়ার্ক করা চলে বলে মনে হোলো। এখানে যেটা আমাদের খুব আকৃষ্ট ক'রেছিল সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের মধ্যপ্রদেশের কোন গ্রামের পুতুলনাচের কতকগুলি পুতুল। রাবণ এবং হনুমানের মূর্ত্তি। মিঃ আব্রাশভ পুতুলনাচ-শিল্পের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। মঞ্চের ভিতরে নিয়ে গিয়ে

আজকে যাঁরা বিস্মৃত ঃ তাঁদের একজন

শ্রীমতী মাধুরী

বোম্বাইয়ে ছায়াচিত্রশিল্পের প্রথম যুগে ইনি ছিলেন
অন্যতমা চিত্তহারিণী যৌবনময়ী চিত্রনটী

বয়স হবে। একটি ঐতিহাসিক উপ

আজকে যাঁরা বিস্মৃত : তাঁদেরই আর একজন
বেবী গার্ব্বো
দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের প্রথম লাস্যময়ী সর্ব্বজনপ্রিয়া নায়িকা

আমাদের অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং ষ্টেজক্রাফট্-এর টেকনিকাল দিকটি আমাদের সমস্ত দেখানো ও বুঝিয়ে দেওয়া হয়। মঞ্চ সম্বন্ধে মোটামুটি বক্তব্য এখানেই শেষ করা যেতে পারে।

সোভিয়েট চিত্রজগতের প্রথম বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যে, এখানে ভুঁইফোড়দের কোনো স্থান নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বিভাগগুলির মধ্যে 'সিনেমাটোগ্রাফী' বিভাগটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিভাগ, আমরা 'ষ্টেজ ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ সিনেমাটোগ্রাফী' এবং 'ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ মোশান পিক্‌চার্স এঞ্জিনিয়ার্স' দুটোই দেখে এসেছি। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানে ক্যামেরাম্যানদের শিক্ষা-কাল হলো পাঁচ বছরের এবং পরিচালক, শিল্পনির্দেশক ও অভিনয় শিল্পীদের জন্য হলো ছ' বছর। দ্বিতীয়টিতে অপারেটার, চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈরী ইত্যাদি এবং শব্দযন্ত্রীর কাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভাগে ঐ রকম ৫ থেকে ৬ বছরের শিক্ষাকালের ব্যবস্থা রয়েছে। হাইস্কুল গ্রাজুয়েশানের পর ছেলেমেয়েরা এখানে ভর্ত্তি হয়। ভর্ত্তি হওয়ার জন্য দরখাস্ত পড়ে বহু কিন্তু সবাইকে তো নেওয়া সম্ভব নয়—কাজেই একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয় এবং তাতে যারা উত্তীর্ণ হয় তারাই এইসব প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে। ক্যামেরাম্যান বা অভিনয়শিল্পী হবার ইচ্ছা বায়োস্কোপ দেখার পর অনেকেরই হয়। কিন্তু ঐসব হতে হলে যেসব বিশেষ গুণ বা মনের গড়ন থাকা দরকার সেগুলি না থাকলে তো আর হবো বললেই হওয়া যায় না। কাজেই এই পরীক্ষার ফলে কর্ত্তৃপক্ষও জানতে পারেন কার ভেতর মোটামুটি কি আছে—এবং পরীক্ষার্থীও বুঝতে পারে তার গলদ কোথায়।

আমরা যখন ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ সিনেমাটোগ্রাফীতে যাই তখন বিখ্যাত পরিচালক গেরাসিমভ অভিনয়ের ক্লাশ নিচ্ছিলেন। একটি ছোট্ট করুণ দৃশ্য অভিনয়ের তালিম দেওয়া হচ্ছিল। আমাদের সামনে সেটি অভিনয় করা হলো—আমরা অভিভূত হয়েছিলাম অভিনয় দেখে। শুনলাম তারা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে।

তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় ইন্‌ষ্টিটিউটের ষ্টুডিওতে। সেখানে স্যুটিং হচ্ছিল। ক্যামেরাম্যান, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, শিল্প-নির্দ্দেশক এবং কয়েকজন অভিনয়শিল্পী—প্রকৃতপক্ষে তাঁরা প্র্যাক্‌টিকাল্ পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো সকলের। পরিচালককে [illegible] ছাত্র বলে মনে হলো। ছেলেদের [illegible] আন্দাজ—২০।২১ বছর বয়স হবে। একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের কোন বিশেষ

একটি অংশ এদের দেওয়া হয়েছে ছবিতে রূপান্তরিত করবার জন্ত। ছবি হয়ে গেলে সেটি বিভিন্ন বিভাগের এ্যাকাডেমিশিয়ানরা দেখবেন এবং তাঁদের বিচারের ওপর এদের পাশ-ফেল নির্ভর করবে। এদের এই কাজটি করতে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়—বলতে লজ্জা হলেও না বলে পারছি না যে আমরা আমাদের পেশাদারী জীবনে এত সুযোগ পাই না। 'ক্যামেরাম্যান'-ছাত্রকে দেখলাম ঝকঝকে-তকতকে নতুন ক্যামেরা নিয়ে কাজ করছে। আলোর সরঞ্জাম যা—তার অনেকগুলিই এখনও আমাদের দেশে আজও এসেছে কিনা সন্দেহ—যথা "আর্ক ল্যাম্প"। আমি তো এখনও চোখে দেখিনি। জানিনা ভারতের 'হলিউড' বোম্বাইতে কোন ভাগ্যবান দেখেছেন কিনা। 'ডাইরেক্টারে'র আহ্লাদের কথা বলি শুনুন। তিনি যদি মনে করেন যে, কোন একটি বিশিষ্ট চরিত্র তাঁর ইন্‌স্টিটিউটের কোন ছাত্র-অভিনেতার দ্বারা হবে না বা উক্ত চরিত্রটির চেহারার বিবরণের সঙ্গে ঠিক টাইপ মিলছেনা; তিনি মস্কোর রঙ্গজগৎ বা চিত্রজগতের যেকোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে দাবী করতে পারেন—তা তিনি যত বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রীই হোন না কেন। অর্থাৎ তিনি অহীন্দ্র চৌধুরীই হোন বা নরেশ মিত্রই হোন, বা চন্দ্রাবতীই হোন! ইন্‌স্টিটিউট তার ব্যবস্থা করবেন। বিনা পারিশ্রমিকে নয়, উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়েই। আমাদের সামনেই দেখলাম মস্কো আর্ট থিয়েটারের একজন নামকরা অভিনেতা 'ছাত্র-পরিচালকে'র হুকুম তামিল করছেন—কোনপ্রকার ওস্তাদী না ক'রে। কারণ তিনি জানেন যে এখানে 'পরিচালকের' ওস্তাদিরই পরীক্ষা চলছে। বলা বাহুল্য ঐ ব্যাপার কোন ধনতান্ত্রিক দেশে সম্ভব হয়নি এখনও।

তারপর ছাত্রদের সম্পর্কে অন্তান্ত প্রশ্নের মধ্যে জিজ্ঞাসা করেছি—"আপনাদের হাই স্কুল অবধি তো সব ফ্রী—এখানেও কি ফ্রী?" উত্তর পাই—"না, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তান্ত বিভাগের মতো আমরা বেতন দিই।"

প্রশ্ন করি—"কত?"

উত্তর—"বছরে প্রতি ছাত্র ৫০০ রুবল দিয়ে থাকে।"

প্রশ্ন—"আপনাদের এখানে কমসে কম লোকের মাইনে ৫০০ রুবল? যে বাপ-মা কম রোজগার করে, তাদের ২।৩ ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে হলে তো—মুস্কিল? নয় কি?"

উত্তর দিচ্ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালিকা—একজন ৬০ বছর বয়স্কা মহিলা। ইনি একজন অতীতের বিখ্যাত অভিনেত্রী। একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলেন—"আপনার প্রশ্ন আর একটু পরিষ্কার করে বলুন, ঠিক বোঝা গেল না।" সত্যই তো ভদ্রমহিলা বুঝবেন কি করে? আমি তো খেয়াল করিনি যে আমার প্রশ্নের কোন ভিত্তিই সে-দেশে নেই। আমি প্রশ্ন করেছি আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। যাই হোক আমি পুনরুক্তি করার পর তিনি উত্তর দেন—"সে কি কথা? ছেলেমেয়ে পড়বে তার টাকা দেবে বাপ-মা—এটা কি রকম কথা?"

প্রশ্ন—"তবে?"

উত্তর—"ছাত্র-ছাত্রীরা বুদ্ধিমত্তানুসারে সরকারের কাছ থেকে পায় ৫০০ থেকে ৭০০ রুবল প্রতি মাসে।"

প্রশ্ন—"তাহলে আপনারা এটাকে ফ্রী বলেন না কেন—এতো 'ফ্রী'র চাইতে বেশী!"

উত্তর—"তা কি করে বলি বলুন? আমরা ছাত্রের কাছ থেকে টাকাও নিই, তার রসিদও দিই……।"

(মনে মনেই বললাম আপনারা ফ্রী বলুন আর না বলুন—ফ্রী বললে আমাদের বুঝতে সুবিধা হতো।)

প্রশ্ন করি—"একটি ছেলে মাসে ৫০০ রুবল পায় আর সে বছরে ৫০০ রুবল করে ইন্‌ষ্টিটিউটে দেয়—তো ঐ বাড়্‌তি রুবলগুলি কি হয়?"

তিনি আবার সবিস্ময়ে চেয়ে থাকেন—আমায় আবার প্রশ্নটি পরিষ্কার করার জন্য দ্বিতীয়বার বল্‌তে হয়।

উত্তরে বলেন—"সে কি কথা? একটা সোমত্ত ছেলে বা মেয়ে ছ' বছর ধ'রে পড়বে—রুটি রোজগার করার কোন সুযোগই পাবে না তো তার ভরণ-পোষণ জোগাবে কে—মানুষ হিসেবে তার কোন খরচ নেই? সে যদি হোটেলে থাকে তো সে হোটেলের টাকা দেবে যদি তার পরিবারের সঙ্গে থাকে তো পরিবারে তার অংশ সে দেবে।"

বললাম—"ভাল!" আর ভাবলাম আমার দেশের ছাত্রদের কথা!

তারপর আমরা যাই মস্কো মণ্ট ফিল্ম ষ্টুডিওতে। সেখানে কার্টুন ছবি তোলা হয়। কার্টুন ছবি তোলার বিচিত্র এবং বিভিন্ন বিভাগগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখি। তাঁদের তোলা সাম্প্রতিক কার্টুনগুলির প্রদর্শন দেখি। আসার সময় আমাদের প্রত্যেককে এক কপি করে বই দেওয়া হয়। তাতে কার্টুন ছবি তোলার বিস্তৃত টেক্‌নিকাল বিবরণ দেওয়া আছে। বইটি রুশ ভাষায় লেখা এই যা মুস্কিল।

অতঃপর মোস-ফিল্ম ষ্টুডিও পরিদর্শন করি। বিরাট ষ্টুডিও—আমাদের দেশের ষ্টুডিওর তিনটি ফ্লোরের সমান তাঁদের একটি ফ্লোর। প্রত্যেক বিভাগেই মেয়ে-পুরুষ সমানভাবে কাজ করছেন দেখলাম। "আনফরগেটেবল্‌ ১৯১৯" ছবির স্যুটিং চলছিল। ছবির পরিচালক হলেন বিখ্যাত "ফল্‌ অব্‌ বার্লিন" ছবির পরিচালক মিঃ চেইনূভেল্লি।

তিনি সেদিন উপস্থিত ছিলেন না—তাঁর প্রধান সহকারী মাদাম এ্যানড্রেপেরিটজা পরিচালনা করছিলেন। এক বিরাট প্যারিসীয় [illegible] সেট্‌—যেখানে বসে প্রতি-বিপ্লবীরা ষড়যন্ত্র করছিল রুশ-বিপ্লব ধ্বংস করার। চিত্রগ্রহণ করছিলেন মিঃ কশিনাট্‌স্‌। ইনিই "ফল্‌ অব বার্লিনে"র চিত্রগ্রহণ করেছিলেন। এটিও হবে রঙীন ছবি। মসফিল্ম ষ্টুডিওতে আর সাদা-কালো ছবি তোলা হয় না—সবই রঙীন ছবি তোলা হয়। তারপর আমাদের একটি হল-ঘরে নিয়ে যাওয়া হোল—মনে হ'ল একটা আর্ট গ্যালারীতে এসে ঢুকলাম—চারটি দেওয়ালই অসংখ্য সুন্দর সুন্দর পেণ্টিং-এ ঢাকা। এখানে বিখ্যাত পরিচালক রমমের সঙ্গে আলাপ হোল। শুনলাম তিনি বাল্টিক সাগরের এক ঐতিহাসিক যুদ্ধের পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে তারই চিত্ররূপ দেওয়ার তোড়জোড় করছেন—ঐ পেণ্টিংগুলি তাঁর চিত্রনাট্যের বিভিন্ন পরিকল্পনার স্থিরচিত্র। এই হোল তাঁর তোড়জোড়ের একটা অংশমাত্র।

মসফিল্ম ষ্টুডিওর মেক-আপ বিভাগে প্লাষ্টিকের সাহায্যে মেক-আপ করার ব্যবস্থা এক অভিনব ব্যাপার। আমরা রুশ ছবি দেখে প্রায়ই বলাবলি করেছি যে এমন অদ্ভুত চমৎকার টাইপ কিভাবে জোগাড় করে। টাইপ যে জোগাড় করে না এমন নয় কিন্তু মেক-আপ বিভাগের ভেল্কিই বেশীটা কাজ করে। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রে মুখকে মুখ স্রেফ ছাঁচে ঢেলে অভিনেতাকে মুখোস পরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। মুখোসের চোখের জায়গায় ফুটো, নাক এবং মুখের জায়গায় ছিদ্র থাকে—মুখোস বেশ বেমালুমভাবে 'ফিট' করার পর অভিনেতার স্বাভাবিক চোখ দুটি অভিনয় করে এবং লিপ্‌-মুভমেণ্টেরও কোন অসুবিধা হয়। মুখোসটি এমন একরকম নরম তুলতুলে স্পঞ্জ রাবারের তৈরী যে অভিনেতার নিজের মুখের সূক্ষ্মতম মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের সঙ্গে

...মুখোশেরও 'ফেস-মাসল্'-এর ওপরে তার ক্রিয়া অতি স্বাভাবিকভাবে হ'তে থাকে—মুখোসও অভিনয় করে। অতুলনীয় টেক্‌নিক্। এই জিনিষটি আবিষ্কার করেছেন 'মস ফিল্ম'-এর মেক্-আপ বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা এবং তিনি একজন ষ্ট্যালিন্-প্রাইজ লরিয়েট্। "ফল্ অফ বার্লিন"-এর চার্চ্চিলের ভূমিকায় অভিনয় তিনিই করেছেন—এইভাবেই করেছেন।

তারপর ল্যাবরেটারী এবং অন্যান্য টেক্‌নিকাল বিভাগ আমরা পরিদর্শন করি। এ সম্বন্ধে নীরস টেক্‌নিক্যাল আলোচনা করে এ প্রবন্ধ বাড়াতে চাই না। লেনিনগ্রাড্-এ 'লেন্‌ফিল্ম ষ্টুডিও'-ও আমরা দেখেছি। এটিও প্রায় মস্‌ফিল্ম-এর মতই বড়। এখানে সাধারণ এবং রঙীন ছবি দুই-ই তোলা হয়। এরপর 'ইউক্রেন্ ষ্টুডিও' দেখেছি এবং জর্জ্জিয়াতে 'টিবলিসি ষ্টুডিও'-ও দেখেছি। 'টিবলিসি ষ্টুডিও'টি মস্‌ফিল্ম-এর মতই বড় ব'লে মনে হয়েছে। আমরা যে সময় 'টিবলিসি যাই সেইসময় সেখানে দেশ জুড়ে হারভেষ্ট্ ফেসটিভ্যাল হচ্ছিল। জর্জ্জিয়ার দূর-দূরান্তর গ্রামাঞ্চল থেকে যৌথ খামারের চাষীরা এসেছিল এক বিরাট জাতীয় কন্‌সার্ট-এ যোগদান করতে। সেইসব শিল্পীদের আমন্ত্রণ ক'রে উক্ত ষ্টুডিওতে একটি রঙীন দলিল-চিত্র তোলা হচ্ছিল দেখলাম। প্রসঙ্গতঃ বলি এঁদের এই জাতীয় কন্‌সার্ট দেখার জন্যে টিবলিসির অপেরা হাউস-এ আমরাও আমন্ত্রিত হ'য়েছিলাম। চমৎকার সঙ্গীত, অপূর্ব্ব নৃত্য। এখানে এসে আমরা অনুভব করেছিলাম যে স্বদেশের কাছাকাছি এসে পড়েছি। এদের সঙ্গীত, নৃত্য এবং বাদ্যযন্ত্রগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের ঐ জিনিষগুলির বেশ মিল আছে। বাদ্যের মধ্যে ঢোলক এবং তবলার মত কতকগুলি যন্ত্র আছে। দোতারা জাতীয় তারের বাজনাও দেখলাম। আর নাচে, তালের সঙ্গে হাতের এবং পায়ের কাজ। পুরুষ এবং মেয়ে একসঙ্গে নাচে বটে কিন্তু কেউ কারো অঙ্গ স্পর্শ করে না। দুজনের মধ্যে যেন তালের প্রতিযোগিতা হয়।

মস্কোর 'সেণ্ট্রাল ষ্টুডিও ফর্ ডকুমেণ্টারী ফিল্মস্' এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। এঁরা কেবল দলিল-চিত্র এবং শিক্ষামূলক ছবি তুলে থাকেন। এঁদের দলিল-চিত্র তোলার জন্যও একজন পরিচালক আছেন। তিনি একদল ক্যামেরাম্যান নিয়ে ঘটনাস্থলে যান এবং ক্যামেরাম্যানদের দিয়ে এবং প্রয়োজন বা সম্ভব হলে (যখন কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের ছবি তোলা হয়) অনুষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের সহকারিতায় প্রোগ্রামের কোন কোন অংশ অল্পবিস্তর নিজের পরিচালনার আয়ত্তাধীনে এনে চিত্রটি যাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তার চেষ্টা করে থাকেন। এই রকম বহু পরিচালকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমাদের হয়—তার মধ্যে একজন ছিলেন স্ত্রীলোক,—যিনি বিখ্যাত "ইউথ্ ফেষ্টিভ্যাল"এর ছবিগুলি পরিচালনা করেছিলেন। আর একজনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হই—তাঁর নাম মিঃ ভারলামোভ। ইনি চীনের মুক্তি সংগ্রামের রঙীন দলিল-চিত্র তুলে "ষ্টালিন প্রাইজ" পেয়েছেন। এঁরই পরিচালনায় তোলা "দি গ্রেট চাইনীজ সার্কাস" মাদ্রাজে দেখানো হয়েছে। সম্প্রতি ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালের সময় তিনি রুশ-চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের একজন হয়ে এখানে এসেছিলেন এবং এঁদের সঙ্গে যে তিনজন চিত্রগ্রহণ করবার জন্য এসেছিলেন তাঁদের নাম মিঃ আইভ্যান্ শোলকোনিকভ, মিঃ এ্যানড্রে-শোলোগুবভ এবং শ্রীমতী গালিনা মনগ্লোভস্কায়া, মিঃ ভারলামোভ এখানে তাঁদের ভারত-ভ্রমণের দলিল-চিত্র তুলেছেন। মাদ্রাজে থাকার সময় এঁদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল।

সেণ্ট্রাল ডকুমেণ্টারী ষ্টুডিওতে তাঁদের তোলা বহু

ছবি দেখি—সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

সোভিয়েট চলচ্চিত্রশিল্প, শিল্পী এবং চিত্রগ্রহণ-পদ্ধতি আমরা একেবারে সামনে থেকেই দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করেছি। স্পষ্টই বুঝেছি সোভিয়েট চলচ্চিত্রের মূলমন্ত্র নির্দ্দোষ আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে জাতি গঠন এবং সমাজের সেবা করা। সোভিয়েট নেতা মার্শাল ষ্টালিন তাঁর এক উক্তিতে বলেছিলেন—Cinematographers are engineers of human mind—সে দেশের শিল্পীরা তাঁদের প্রিয় নেতার উক্তির গুরু-দায়িত্ব বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই বহন করছেন। তাই আজ দেখতে পাই সোভিয়েট চলচ্চিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নির্দ্দোষ আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে জনসাধারণকে সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যে সচেতন করা এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। তা সে যে ছবিই হোক—কি দলিল-চিত্র, কি পূর্ণাঙ্গ সাধারণ ছবি, কি কৌতুকচিত্র বা সঙ্গীত ও নৃত্যপ্রধান ছবি—সবেরই লক্ষ্য এক, মূল সুর একই। তাই দেখি তাঁদের ছবিতে গুণ্ডামির স্থান নেই—অস্বাস্থ্যকর কামনা-উদ্রেককারী মদ ও মেয়েমানুষের অর্থহীন হৈ-হুল্লোড়ের দৃশ্য নেই—মানুষকে খুন করার কারিগরীর দৃশ্য নেই। জাতির প্রতি জাতির বিদ্বেষ সৃষ্টি করার অপকৌশল নেই। ছবি দিয়ে যুদ্ধের অনিবার্য্যতাকে প্রমাণ করার কোন অপচেষ্টা নেই। এঁদের ছবিতে নতুন করে "Crime does not pay" মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না—কারণ ক্রাইম করার মনোবৃত্তিই যাতে না হয়—ছবির মূলতত্ত্ব দিয়ে তারই গোড়া বেঁধে দিয়ে থাকেন। এঁদের ছবিতে দেখি মানুষের প্রতি মানুষের কত দরদ, কি ভালবাসা। তাঁরা ছবি দিয়ে এই প্রচারই করেন যে এইটাই স্বাভাবিক, এর বিপরীতটাই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাঁরা ছবির মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতির সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। ধর্ম্ম বা বর্ণ তাতে বাধ সাধে না। তাঁদের ছবির মধ্যে দেখতে পাই যুদ্ধের প্রতি কি অসীম ঘৃণা। ছবির মাধ্যমে আজ তাঁরা শান্তির প্রতি অটল আসক্তি দেখিয়েই শেষ করেন না—বিশ্বশান্তি রক্ষা করার দৃঢ়

সঙ্কল্প ঘোষণা করে থাকেন। আর দেখেছি সে দেশে শিল্পী কারো কেনা গোলাম নয়। সম্পূর্ণ স্বাধীন। শিল্পী কারো হুকুম [illegible] করে না। কারণ প্রযোজক সেখানে কোনো [illegible] ধনী বা ধনিক-গোষ্ঠী নয়। রাষ্ট্রই হোল প্রযোজক—যে রাষ্ট্রের কোটি কোটি মালিকের মধ্যে শিল্পী নিজেও একজন। তাই সৃষ্টিশীল শিল্পী, সে দেশে, তার সামর্থ্যের সবটুকু জনকল্যাণে নিবেদন করার আনন্দে [illegible]। আর আমাদের দেশে এক-খানি [illegible] ছবি করার বাসনা থাকলেও হবার [illegible] কারণ প্রযোজক ধনী ব্যক্তিবিশেষ

—যে মানুষের হীন প্রবৃত্তি ভাঙিয়ে সুদে-আসলে মূলধন কেরৎ চায় বক্স-অফিস থেকে। তাইতো 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'মাইকেল 'মধুসূদন', 'স্বামিজী', বা 'বিদ্যাসাগর'-এর মত ছবি এক একটি আকস্মিক ঘটনা। ভারতের 'হলিউড' বোম্বাই-এর কাছে হয়তো দুর্ঘটনা—মানুষের সুরুচি জাগ্রত করার ষড়যন্ত্র।

আমাদের অনেকে সশঙ্কচিত্তে প্রশ্ন করেন—"সোভিয়েট চলচ্চিত্রশিল্পীর কি সত্যই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে? রাষ্ট্রের কোন অনুশাসন নেই তার ওপর?"

রাষ্ট্রের অনুশাসন নিশ্চয়ই আছে—রাষ্ট্র তাকে সব করতে দেবে, কিন্তু লক্ষ্যহীন, অর্থহীন, বক্তব্যহীন ছবি করার বদখেয়াল রাষ্ট্র কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। "Art for art's sake" এই সৌখীন বুলি ও-দেশ থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েট জগতে চালু কথা হচ্ছে,

Art for the sake of people,
Art for the sake of society.

স্বনামধন্য অভিনেতা, অভিনেত্রী বা যে কোন খ্যাতনামা চলচ্চিত্রশিল্পীর উপাধি "Honoured Artist of the people"। তাঁদের কাহিনী এবং তার চলচ্চিত্র-রূপ অত্যন্ত বাস্তবধর্ম্মী। তাঁদের 'কালেকটিভ্ ফার্ম্ম'গুলি স্বচক্ষে দেখে না এলে "কুবান কশাক" এবং "কাভালিয়র অব দি গোল্ডেন ষ্টার" তাঁদের বাস্তবের যে কি হুবহু প্রতিচ্ছবি—এতখানি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে পারতাম না।

চলচ্চিত্রশিল্পে ব্যবহার্য্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য

আনুষঙ্গিক আজকাল তাঁরা সমস্ত নিজেদের দেশে প্রস্তুত করেন—একটি স্ক্রু-ও তাঁরা বিদেশ থেকে আমদানী করেন না। যন্ত্রপাতি দেখে মনে হয়েছে মার্কিন বা বিলিতী যন্ত্রপাতিরই মত। এদিক দিয়ে বিশেষ নূতনত্ব কিছু দেখিনি। তবে চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক আবিষ্কার তাঁরা যেটা করেছেন, সেটা "ষ্টিরিও-কিনো"। সোভিয়েট দেশে যাবার কয়েক মাস আগে এই পত্রিকাতেই "ষ্টিরিও-স্কোপ" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম এবং তাতে থ্রী-ডাইমেনশনাল ছবির কথা উল্লেখ করেছিলাম—তখন জানতাম না এই অদ্ভুত আবিষ্কার স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হবে। সত্যই অদ্ভুত! এছাড়া দেখতে কোন বিশেষ চশমার প্রয়োজন হয় না। তবে জিনিষটি যে নিখুঁত হয়েছে এমন কথা বলবো না। যেটুকু খুঁত আছে সেটুকু মার্জ্জনীয়। অর্থাৎ ছবি আরম্ভ হবার আগেই একটি ঘোষণা করা হয় তাতে দর্শকদের সতর্ক করে দেওয়া হয় যে—'থ্রী-ডাইমেনশনাল এফেক্ট' পেলেই তাঁরা মাথা যেন ডানদিকে বা বাঁদিকে না হেলান। মাথা নড়ালেই থ্রী-ডাইমেনশনাল এফেক্ট হারিয়ে যায়—ঠিক জায়গায় মাথা ফিরিয়ে আনলে আবার পাওয়া যায়। অবশ্য এ অসুবিধা আছে—কিন্তু এই অসুবিধাটুকু মেনে নিয়ে যে জিনিষ দেখা যায়, তার তুলনা হয় না। বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। রং আছে গড়ন আছে, শব্দ আছে এবং তার সঙ্গে গতি রয়েছে। এই অসুবিধাটুকুরও বিহিত করার চেষ্টাও তাঁরা করছেন। এর উদ্ভাবক মিঃ আইভ্যানভ্ তাঁর ল্যাবরেটরীতে তিনি আমায় দেখিয়েছেন আরও উন্নততর এক্সপেরিমেণ্ট। এই বিশেষ ব্যাপারে সোভিয়েট চলচ্চিত্রশিল্প অন্যান্য দেশকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

আমাদের দেশে ফিরে আসবার দিনকয়েক আগেই ১৯৫১ সালের ৭ই নভেম্বর রুশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের চতুস্ত্রিংশ বার্ষিকী উৎসব হলো। এই উৎসব স্বচক্ষে দেখবার এবং যোগদান করবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। দিনটা ছিল বেশ ঠাণ্ডা—বাইরে যথেষ্ট তুষারপাত হচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই 'রেড স্কোয়্যার'-এ দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে সেই বিরাট শোভাযাত্রা আমরা দেখলাম। আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক কুচকাওয়াজও হলো দেখলাম কিন্তু সেখানে যখন শান্তি-শোভাযাত্রার দল বেরোলো সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—আমরা মুগ্ধ হলাম—সামরিক কুচকাওয়াজও তার কাছে যেন ম্লান হয়ে গেল।

১০ই নভেম্বর অতি প্রত্যুষে আমরা সোভিয়েট দুনিয়া ছেড়ে চলে আসি। আর এ কথাটাও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই তখন দেশের জন্য আমাদের বেশ মন কেমনও করছিল। মায়ের কোলে শিশু ফিরে গিয়ে যে-আনন্দ অনুভব ক'রে ঠিক সেইরকম একটা চাপা আনন্দ আমরাও অনুভব করলাম। মন কিন্তু ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে, মনে হচ্ছিল যেন কত আপনজনদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তারা যেন কতো ভালবেসে আমাদের কাছে টেনে রেখেছিল। চারিদিকেই ঘোলাটে অন্ধকার—বিমান ঘাঁটির জমির ওপর যতটা দেখা যায় তার সর্ব্বত্রই বরফে ঢাকা। আমাদের সকলের টুপির কানায় আর ওভারকোটের কাঁধে বেশ খানিকটা ক'রে তুষার জমে রয়েছে। সেই বিমানঘাঁটির খোলা প্রাঙ্গণে আর্ক-ল্যাম্পের আলো জেলে সমস্ত স্থানটি আলোকিত করা হয়েছিল। বিমানে ওঠবার ঠিক আগেই বিদায়-সম্ভাষণের পালা সুরু হলো। বিদায়-অভিভাষণ পাঠ করলেন সোভিয়েট সিনেমাটোগ্রাফীর ডেপুটী মন্ত্রী কমরেড সেমিয়োনোভ্। অভিভাষণ-বাণীর উত্তরে দাদা (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য) বললেন—'আমাদের দেশে যে বিদায় দেয় সে বলে "এসো", যে বিদায় নেয় সে বলে "আসি"—আপনারাও বলেন 'Das-Viidania' যার সারার্থ "এসো"—তাই আমরাও বলে যাচ্ছি—প্রিয় বন্ধুগণ, আজ "আসি"।'

বাংলা থিয়েটার উঠে যাচ্ছে কেন?

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ভায়া, আমাকে রীতিমত বিপদে ফেলেছ, প্রশ্ন ক'রে, বাংলা থিয়েটার উঠে যাচ্ছে কেন?

বাংলা থিয়েটার সম্বন্ধে যাঁরা বলবার অধিকারী, তাঁদের যখন এই প্রশ্ন সোজাসুজি করা হয়, তখন দেখেছি তাঁরা তিন রকম উত্তর দিয়ে থাকেন।

প্রথম রকম, একটু মৃদু হেসে অন্য কথার উত্থাপন করেন, অর্থাৎ উত্তর দেন না, নীরব থেকে এড়িয়ে যান।

দ্বিতীয় রকম, উপস্থিত শ্রোতাদের দিকে চেয়ে আগে ভাল করে দেখে নেন, থিয়েটার-সম্পর্কিত কোন্ শ্রেণী বা স্বার্থের লোক সামনে আছেন, তারপর যে-শ্রেণী বা যে-শ্রেণীরা অনুপস্থিত, মোটামুটি তাঁদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে, সর্বশেষে সিদ্ধান্ত স্বরূপ বাংলাদেশের 'জেনারেল' অবনতি-কেই বড় করে দায়ী করেন।

তৃতীয় রকম, এই প্রশ্ন ওঠবার সম্ভাবনা দেখলে, স্থান ত্যাগ করেন।

এই তিন রকম উত্তরদাতাই কম-বেশী বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ লোক। এবং তাঁদের তিন ধরণের উত্তর থেকেই একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেটা হলো, এ প্রশ্নের সত্যি-কারের উত্তর দেওয়া অত্যন্ত বিপদজনক, হয়ত অসুবিধা-জনকও, অতএব, কার গুড়ে মাছি পড়েছে, তাই নিয়ে আমাদের আলোচনা করে কি দরকার দাদা! অতএব চেপে যাও, নীরব হয়ে থাক!

আমি আজ ভায়া, আহম্মকের মত ঠিক করেছি, এ প্রশ্নের উত্তর দেবো।

যদি এক কথায় আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তাহলে আমি কাদের সবচেয়ে বেশী করে দায়ী করবো, জান? যাঁরা এই প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে নীরব হয়ে থাকেন বা আছেন, তাঁরাই হলেন আজ সবচেয়ে বেশী অপরাধী।

প্রত্যেক জাতির জীবনে, প্রত্যেক সমাজের জীবনে, এমন একটা সময় আসে, যখন Romain Rolland-এর অমর ভাষায় বলতে হয়, Silence is action. সেই জাতীয় সঙ্কট লগ্নে বুদ্ধিমানের মতন চুপ করে থেকে, যাঁরা মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, ভাল-মন্দ কোনটাতেই তাঁরা নেই, সেই প্রচণ্ড আত্ম-প্রতারকেরা জানেন না যে, তাঁদের নীরবতার দ্বারা তাঁরা একান্ত সক্রিয়ভাবে মন্দকেই সাহায্য করছেন; যে-চাকা অন্ধকার গর্ত্তের দিকে ছুটে চলেছে, তাঁদের নীরবতার শক্তি দিয়ে তাঁরা সেই অন্ধকার-মুখী চাকার গতিকেই আরো দ্রুত করে চলেছেন। তাঁদের নিজের চামড়া হয়ত আপাততঃ তাতে বাঁচতে পারে, তার জন্যে তাঁরা বুদ্ধিমান বলে আত্মপ্রসাদও লাভ করতে পারেন কিন্তু তাঁদের সেইসঙ্গে জেনে রাখা দরকার, তাঁরা হলেন জগতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর 'coward'…বুদ্ধিমান coward!

বাংলাদেশে আজ বাংলার রঙ্গালয়ের যে সমস্যা, সেটা থিয়েটার মালিকের সমস্যা নয়, সেটা অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমস্যা নয়, সেটা নাট্যকার বা প্রযোজকদের বা দর্শকের সমস্যা নয়, এ সমস্যা হোল বাংলার জাতীয় সমস্যা, বাংলার অন্যতম সবচেয়ে বড় জাতীয় সমস্যা, যার সঙ্গে বাঙালীর জাতিগত মর্য্যাদা ও বাঙালীর অস্তিত্বের সমস্যা একান্ত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। অন্নহীন দুর্ভিক্ষের সমস্যা কাঁটার মতন আমাদের চোখে এসে আপনা থেকে বেঁধে বলে, সেই সমস্যা নিয়ে আমরা সকলে চীৎকার করি, কিন্তু দুর্ভিক্ষের নিদারুণ ছায়া সাধারণ মানুষের মন ও মস্তিষ্কের ওপর সরাসরি প্রতিফলিত হয় না বলে, তাকে অবাস্তব মনে করে আমরা সরিয়ে রাখি; তার জন্যে চীৎকার করাকে, তার জন্যে জনমনকে জাগিয়ে তুলতে আমরা লজ্জা পাই, সঙ্কোচ বোধ করি, মনে করি সেটা একটা intellectual fashion, অবসর সময়ে খবরের কাগজে এক-আধটা প্রবন্ধ লিখলেই যথেষ্ট। অর্থনৈতিক দারিদ্র্য বা দুরবস্থা যে-কোন জাতির পক্ষে একান্ত মারাত্মক কিন্তু তার আসল মার যে কতখানি গভীর আর কোথায়, তা দুর্ভিক্ষে মৃতদের সংখ্যার তালিকার দিকে চেয়ে বোঝা যায় না। দারিদ্র্যের সবচেয়ে বড় মার হলো, সে এমনভাবে মানুষের সমস্ত দৃষ্টিকে পেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ

করে আনে যে, তার আড়ালে সে নিঃশব্দে একটা জাতির চরিত্র ও চেতনাকে চিরকালের মত অথম করে দিতে পারে এবং এমনভাবে সেই মারণ-ক্রিয়া চলে যে মুমূর্ষু ব্যক্তি তা স্বীকার করতে পর্য্যন্ত লজ্জিত হয়। তাই মানুষ অন্নের দুর্ভিক্ষের জন্যে যেভাবে হাহাকার করে, মনের বা মস্তিষ্কের বা চিন্তার দুর্ভিক্ষের জন্যে সেভাবে আত্মজাহির করতে সে কুণ্ঠা বোধ করে। মনের দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে তার প্রতিবাদ প্রাণহীন, ক্ষীণ, সৌখীন কথার বিলাসিতায় পরিণত হয়, তার মধ্যে থাকে না বেঁচে-থাকবার প্রচণ্ড তাগিদ, প্রয়োজনের দাবীর বলিষ্ঠতা, সত্যিকারের প্রাণের উত্তাপ ও উৎসাহ। আজ বাঙালীর জাতীয় জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক কথা হলো, এই দুশো বছর ধরে অন্নহীনতার মধ্যে থেকে থেকে, সে দারিদ্র্যের কাছে আত্মবিক্রয় করেছে, তার জাতীয় চরিত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার কিছুমাত্র চেষ্টা পর্য্যন্ত তার নেই,—তাই যখনই কোন অর্থনৈতিক ধাক্কা আসে, আমাদের দেশে দরিদ্র ব্যক্তি অনায়াসে হয়ে যায় ভিক্ষুক। ভিক্ষুকের দেহ কোনরকমে ভিক্ষার অন্নে, সরকারী বা সামাজিক মুষ্টি-ভিক্ষায় বেঁচে থাকবে, কিন্তু ভিক্ষুকের জাতিকে স্বয়ং ভগবানও বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না। আজ বাংলাদেশে বাহ্যিক আর্থিক দুর্গতির আড়ালে চলেছে বাঙালীর মানস-জীবন বা জাতীয় চরিত্রের নিঃশব্দ মৃত্যু। সে-মৃত্যুকে রোধ করবার, সে-মৃত্যু সম্বন্ধে জাতিকে সচেতন করবার কোন চেষ্টাই কোথাও নেই। যদি থাকতো, তাহলে, আমাদের স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের, স্বাধীন বাংলার নাগরিকদের চেতনা বাংলার রঙ্গালয়ের এই মুমূর্ষুদশার শেষ আক্ষেপ-দুঃখের মর্মান্তিক ট্রাজেডী দেখে, কখনই এমন উদাসীন হয়ে থাকতে পারতো না। মুখে আমরা বড় বড় কথা বলি, কিন্তু আজও মনে মনে বিশ্বাস করি, থিয়েটারটা শুধু থিয়েটারই···সমাজের বাইরের একটা অবসর বিনোদনের জিনিষ···শিক্ষিত নাগরিক কিম্বা আমাদের প্রধান শ্রেণীর সংবাদ-পত্রের কিম্বা আমাদের

রাষ্ট্র এ নিয়ে মাথা ঘামাবে, এমন জিনিষ থিয়েটার নয়।

বাংলা দেশের কালচারের ইতিহাসে, বাংলার রঙ্গালয় আজ দেড়শো বছর ধরে যে বিরাট দায়িত্ব পালন করে এসেছে, যতই তার মধ্যে ত্রুটি থাক্‌, একান্ত দুঃখের বিষয় তার ঐতিহাসিক মূল্য, আমরা আজও উপলব্ধি করি নি। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সত্তা যে গুটীকতক বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশ্ববরেণ্য হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় হলো, নাট্য। গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতা যেমন তার রঙ্গ-মঞ্চকে কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত হয়েছিল, ভারতের প্রাচীন সভ্যতাও তেমনি তার নাট্য-মঞ্চকে কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত হয়েছিল। তাই প্রাচীন হিন্দু যে-দেবতাকে দেবতার দেবতা বলে জানতো, যিনি ছিলেন মহা-দেব, তাঁকে তাঁরা উপাধি দিয়েছিলেন নট-রাজ। দীর্ঘ জীবনের ভাঙ্গনের ফলে সেই ভারত-ঐতিহ্য যখন সপ্ত-স্তর মাটীর তলায় চলে গিয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ যখন রাজনৈতিক ভাঙ্গনের বন্যায় সমস্ত ভারতীয় ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলেছিল, ভারতবর্ষের মানস-জীবনে যখন রাত্রির ঘন অন্ধকার নেমে এসেছিল, সেই সময় আর্য্যধিকৃত আর্য্য-সভ্যতার উত্তরাধিকারী এই বাঙালীই সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একা ভারত-চেতনার প্রদীপকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ভরতের দেশ এই ভারতবর্ষে, ভরত-মুনির দানকে, গত দেড়শো বছর ধরে, বাঁচিয়ে রেখেছিল একমাত্র বাঙালীই। গত দেড়শো বছর ধরে বাংলার রঙ্গালয় ভারতবর্ষের কালচারের ইতিহাসে একটা বিরাট আলোকস্তম্ভের মত জ্বলে ছিল। এই ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আমরা বাঙালী কি সচেতন? একটা জাতির দেড়শো বছরের প্রতিভার অনন্যসাধারণ প্রকাশ এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিল, আজ বাঙালী নিজে পান চিবোতে চিবোতে তাকে মাড়িয়ে চলেছে। রাস্তার ধারে একটা ভিখিরী মেয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থাকলে, যতটুকু উদাসীন কৃপা-দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বাংলার মুমূর্ষু রঙ্গালয় আজকের বাঙালীর চলমান রাজনৈতিক জনতার কাছে তা'র চেয়ে একবিন্দু কৃপা-দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

তাই ভায়া, তোমার কাছে আবেদন করেছিলাম, তোমরা যখন এই শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আসরে নেমেছ, তখন সত্যিকারের crusader-দের মতন, বাংলার মুমূর্ষু মানসিক জীবনের প্রতি বাঙালীর চেতনাকে জাগিয়ে তোল। বাংলাদেশ থেকে যদি রস চলে যায়, বাঙালীর হৃদয়-মন-মস্তিষ্ক থেকে চলে যায় তার সৃজন-উল্লাস, যদি শুকিয়ে যায় বাঙালীর ঐতিহাসিক শিল্প-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য, তাহলে ক্ষতি যে শুধু বাংলার হবে, তা নয়, ক্ষতি হবে ভারতবর্ষের।

আজ বাঙালীর জীবনের প্রত্যেক স্তরে এসেছে ভাঙ্গন। বাঙালীর ঐতিহাসিক সত্তায় আজ পড়েছে আঘাত। তাই আজ মুখ শোঁকাশুকি, পিঠ-চাপড়ানো, ভদ্রবেশী ন্যাকামি আর আপাতমধুর অর্দ্ধ-সত্যের কোন স্থান নেই। আজ নির্লজ্জ বলিষ্ঠতায় বাঙালীকে সত্যের পাবক শিখার আলোয় নিজের ভিতরকে নিজেই করতে হবে বিশ্লেষণ। এই বৈপ্লবিক নীতিতেই বাঙালীকে আজ বিচার করতে হবে,

কেন বাংলার রঙ্গালয় এইভাবে সুনিশ্চিত মরণের দিকে এগিয়ে চলেছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারেন, থিয়েটারের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত তাঁরা, যদি তাঁরা এই বিরাট সমস্যার ঐতিহাসিক দায়িত্ব উপলব্ধি ক'রে, সত্যের আলোকে নির্মমভাবে আত্ম-সমালোচনা করেন।

বাংলা থিয়েটারের বর্তমান মুমূর্ষু অবস্থার জন্যে সাধারণতঃ তিনশ্রেণীর কারণকে দায়ী করা হয়,

(১) অর্থনৈতিক, দেশ-গত, কাল-গত ও ব্যবস্থা-গত

(২) দর্শকদের প্রতিক্রিয়া-গত

(৩) নাট্য-রচনা ও অভিনয়-গত

এই তিন শ্রেণীর কারণ ও তার প্রভাব তো আছেই, কিন্তু তাছাড়া, আর একটী সবিশেষ কারণ আছে, যে-সম্বন্ধে সকলেই ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত নীরবতা পোষণ করেন। সেই সবিশেষ কারণটী, থিয়েটার-পরিচালক ও থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহার, আচরণ, অভ্যাস ও রীতি-নীতি সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক কারণ এবং যুগ-গত বিভিন্ন সমস্যার দরুন বাংলার রঙ্গমঞ্চের দেহ যদি শীর্ণ হয়ে এসে থাকে, বাংলার রঙ্গমঞ্চের প্রাণ সেই শীর্ণ দেহের আড়ালে বহুদিন হলো মরে গিয়েছে, এবং এই প্রাণের অপঘাত মৃত্যুর জন্তে একমাত্র দায়ী বাংলা-রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা সংযুক্ত,তাঁরা, থিয়েটারের পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা ও অভিনেত্রী। একটা বৃহৎ মহীরুহ যখন ভেতর থেকে মরে যায়, তখন তার মৃত্যুর পর বহুদিন পর্য্যন্ত বাইরে শীর্ণপত্র আর শুষ্কপ্রায় শাখা-প্রশাখা বেঁচে-থাকার মরীচিকা সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাংলার রঙ্গালয় আজ ঠিক তেমনিভাবেই মৃত্যুকে গোপন করে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র।

একেবারে ধরাশায়ী নিশ্চিহ্ন হবার আগে, আমি বর্ত্তমান বাংলা রঙ্গমঞ্চের অধিনায়কদের কাছে একটা কাতর [illegible]

(শেষাংশ ১৩৪ পৃষ্ঠায়)

সুরঝংকৃত গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্মকাহিনী

★

শ্রুতিধর

একখানি আট-দশ বা বারো ইঞ্চি রেকর্ড···রং তার কুচকুচে কালো তবু তাকে লোকে এত ভালবাসে কেন? তার বুকে সূক্ষ্ম রেখার অন্তরালে যে সুধার নির্ঝর লুকিয়ে আছে—যার আবেদন 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' মন-প্রাণ সঞ্জীবিত ক'রে তোলে, শুধু তারই জন্য। কিন্তু এই যে তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাধারণ অসাধারণ সকলের চিত্তজয়ী এই আবেদন, এর পেছনে যে বিরাট রহস্য, যে শত শত কর্মীর প্রাণ-ঢালা ঐকান্তিক পরিশ্রম নিহিত আছে—ক'জন তা জানেন, ক'জন তা ভাবতে পারেন?

আজ যে রেকর্ডখানি নতুন ব'লে আপনার হাতে এলো তার জন্যে তিন চার বা ততোধিক মাস বহু চিন্তা-শীল, সুধী ও কর্মী অন্তরের একাগ্রতা দিয়ে যেভাবে পরিশ্রম ক'রেছেন তারই লেখাচিত্র আপনাদের সামনে ধরবার চেষ্টা ক'রবো। কবি গান বাঁধেন, ছড়া কিম্বা নাটক রচনা করেন—বর্তমান বা আগামী কালের প্রয়োজনের সঙ্গে মিল রেখে, অথবা অতীত কালের স্মরণীয়কে সরণী ক'রে, তারপর সেই রচনা উপস্থাপিত করেন প্রয়োগ-প্রতি-নিধির কাছে···তিনি আবার উপ-প্রতিনিধি ও শিল্পী বা পরিচালকের সঙ্গে ঐ রচনার মান নির্ণয় ক'রে মনোনীত রচনাটি পরিচালককে প্রদান ক'রে সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীও নির্দ্ধারণ ক'রে দেন। এবার একখানি গানের বিষয় ধরা যাক্। এর পর সুরশিল্পী কবির সাহচর্যে ঐ গানের ভাষায় দিলেন সুরের রং, যন্ত্রীদল সেই সুরকে আয়ত্ত ক'রে নিলেন—নির্দ্দিষ্ট শিল্পী এলেন কবি ও সুর-শিল্পীর ভাষা ও ভাবকে আত্মস্থ ক'রতে—সুরু হ'য়ে গেল তারই সাধনা।

শিল্পী বাছাই করা—এক বিরাট কর্ত্তব্য। অনেকে মনে করেন "আমি এত ভাল গা[illegible] সুযোগ দেওয়া হয় না বলেই দেশের মনে আসন গ'ড়ে তুলতে পারছি না"। কিন্তু এইখানেই তাঁরা মারাত্মক ভুল করেন—শব্দগ্রহণ যন্ত্র (মাইক) এমনি এক অদ্ভুত জিনিষ যে সকলের স্বর তার উপযোগী নয়। অনেক বিশিষ্ট গুণী বা জ্ঞানী আছেন যাঁদের সংগীতকে ডিস্কে ধ'রে দেখা গিয়েছে তা শ্রুতিকটু ও অশ্রাব্য। এ ক্ষেত্রে তিনি যত বড় গুণীই হোন্ তাঁর রেকর্ড বাজারে প্রচার করা কোন রকমেই সম্ভব হ'তে পারে না। শুধু তাই নয় এমন অনেক খামখেয়ালী শিল্পী আছেন যাঁরা সময়ের মূল্য দিতে চান না—অথচ এই সময়টুকুকে না মানলে রেকর্ডিং সম্পর্কিত কোন কাজই চল্‌তে পারে না। কাজেই শিল্পী বাছাই করার আগে প্রয়োগ-প্রতিনিধি এই দু'বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন এ কথা নবাগত শিল্পীদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। আর কণ্ঠ যদি স্বরগ্রহণ যন্ত্রের উপযোগী না হয় তবে অযথা কাহাকে দোষারোপ না ক'রে স্বর-মাধুর্যের চর্চায় মন দেওয়া উচিত। এইখানে আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে নবাগতদের অবহিত হ'তে হবে—স্পষ্ট ও দোষ—বর্জ্জিত উচ্চারণ হওয়া চাই-ই। এই শিল্পী বাছাই করার ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে যে অনিচ্ছাকৃত ভুল হয় না, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

সুর যখন আত্মগত হ'য়ে গেল, সমস্ত গানটি যখন সময়ের পরিমাপে পূর্ণতর হ'ল, তখন প্রয়োগ-প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে উপ-প্রতিনিধি, সুরশিল্পী বিক্রয়িক-প্রধান ও প্রচার বিভাগীয় প্রতিনিধিগণ একত্রে গানখানি শুনে নিজ নিজ মত জানাবার পর উপযুক্ত বিবেচনায় প্রয়োগ প্রতি-নিধি রেকর্ডিং-এর তারিখ ও সময় নির্দেশ করেন।

শিল্পীর বিশ্রামের ঘর প্রভৃতি বাদ দিয়ে শব্দগ্রহণের জন্য দরকার হয় পরস্পর সংলগ্ন দু'খানা ঘর। এর মধ্যে বড় ঘরখানি, যেখানে মাইকের সামনে শিল্পী গান, আবৃত্তি বা নাটক অভিনয় করেন তাকে বলা হয় 'ষ্টুডিও'। আর অন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঘরখানি, যেখানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে শব্দকে ধারণ ক'রে এ্যাসিটেট্ ডিস্কের ওপর [illegible] হয়, তাকে বলা হয় 'রেকর্ডিং রুম' বা স্বর-সংরক্ষিকা কক্ষ। মাইকের সামনে বেদীর ওপর শিল্পী

উপবেশন করেন—যন্ত্রীদলকে প্রয়োজন মত দূরে বা কাছে সংস্থাপন করেন—স্বরগ্রাহক যন্ত্রী বা রেকর্ডার। এর পরই আরম্ভ হয় সর্বশেষ মহলা—এই মহলাকালে প্রয়োগ-প্রতিনিধি ও স্বরগ্রাহক যন্ত্রী, স্বর সংরক্ষিকা কক্ষে উপস্থিত থেকে গানখানি যন্ত্রের মাধ্যমে শুনে নেন—প্রয়োজনমত স্বর-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও স্বরগ্রাহক যন্ত্রীকেই ক'রতে হয়—অবশ্য যদি শিল্পীর স্বর-নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা না থাকে। এই মহলার পর পরীক্ষামূলক রেকর্ডিং করার ব্যবস্থা বর্তমান। এবার প্রথম সংকেত শব্দের সঙ্গে নীল আলো জ্ব'লে শিল্পী ও যন্ত্রীদলকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দান করে—সঙ্গে সঙ্গে ষ্টুডিও ঘরের সমস্ত বৈদ্যুতিক পাখা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়—প্রতিটি দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, ষ্টুডিও ঘর নিস্তব্ধ হ'য়ে ওঠে···আধ মিনিটের ব্যবধানে জ্বলে ওঠে লাল আলো। এই নীল ও লাল আলো শিল্পী ও যন্ত্রীদের সামনে দেওয়ালের মধ্যস্থলে থাকায় প্রত্যেকেরই দেখার বিশেষ সুবিধা আছে। লাল আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গান সুরু হয়। ঘরের ভেতরে যেমন লাল আলোর সংকেত আছে, ষ্টুডিওর প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেও ঐরূপ আলোর সংকেত থাকায় এ সময়ে ষ্টুডিওতে গমনাগমন নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

গান চলতে থাকে—ষ্টুডিও ও রেকর্ডিং-রুমের মধ্যে দেওয়ালে কাঁচ দিয়ে ঢাকা একটি জানালার ওপারে রেকর্ডিং রুমে প্রয়োগ-প্রতিনিধি সংকেতে শিল্পী ও যন্ত্রীদলকে সুন্দর পরিবেশনে সাহায্য করেন, এ পাশে ষ্টুডিওতে সুরশিল্পী নীরব ইসারায় সমগ্র গানটিকে পরিচালিত করেন। গান শেষ হয় কয়েক সেকেণ্ড পরে, সংকেত শব্দ ক'রে আলো নিভে যায়। যতক্ষণ ষ্টুডিওর লাল আলো নিভে না যায় ততক্ষণ ষ্টুডিওতে অবশ্য সকলকে নিস্তব্ধ থাকতেই হবে।

পরীক্ষামূলক রেকর্ডটি এর পর বাজিয়ে, স্বরবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে ষ্টুডিও ঘরে শোনানো হয়—এবং এর দ্বারাই শিল্পী, যন্ত্রী, পরিচালক সকলেই দোষ-ত্রুটি প্রত্যক্ষে জানতে পেরে সংশোধন ক'রে নিতে সচেষ্ট হন—প্রয়োজন

হ'লে আবার মহলা দেওয়া হয়। অতঃপর পরীক্ষামূলক রেকর্ডিং-এর অনুরূপ উপায়ে এ্যাসিটেট্ ডিস্কে সংগীতের শব্দ-লিপি গ্রহণ করা হয়। এইখানেই একরকম শেষ হ'য়ে যায় সুরশিল্পী, শিল্পী ও যন্ত্রীদলের কর্তব্য। এরপর নমুনা রেকর্ডখানি প্রস্তুত হবার পর প্রয়োগ-প্রতিনিধি ও শিল্পীর অভিমত গ্রহণ করে তবে বাজারে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়···সে এর অনেক পরের ঘটনা। সংগীতের শব্দ-লিপি গ্রহণ করার পরই সত্যকার বিস্ময়কর কর্ম-প্রণালীর মাধ্যমে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের নিয়ন্ত্রণে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রেকর্ডটি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশের পথে অগ্রসর হয়।

—দুই—

নাটক বা সমবেত সংগীতের ক্ষেত্রে একাধিক শব্দগ্রহণ যন্ত্রের (মাইক) ব্যবহার প্রচলিত আছে। এ অবস্থায় পরিচালক ও প্রয়োগ-প্রতিনিধিকে যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন ক'রতে হয় একথা বলাই বাহুল্য। এবার রেকর্ডখানি বাজারে প্রকাশিত হবার আগে কি রকমভাবে, কি কি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ চলতে থাকে তার দিকে নজর রেখে আমাদের কথা বলতে চেষ্টা করবো।

ওয়াক্সের ওপর শব্দগ্রহণ করার পর (এ্যাসিটেট্ ডিস্ক সাধারণতঃ ওয়াক্স নামেই পরিচিত) শব্দ-গ্রাহক বিশেষজ্ঞ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে নেন যে শব্দানুলেখগুলি ঠিক মত এসেছে কিনা। তারপর ঐ ডিস্কখানি ওয়াক্স ফেসিং বিভাগে প্রেরিত হয়—সেখানে ঐ ডিস্কের ওপর এমনভাবে এক পর্দা অনুলেপন দেওয়া হয় যাতে ধুলোবালি বা ধাক্কা লেগে শব্দানুলেখগুলি সহজে বিকৃত হবার সুযোগ না পায়। এরই মধ্যে সহকারী প্রয়োগ-প্রতিনিধি ঐ ওয়াক্সের ক্রমিক সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে গানের প্রথম ছত্রটি লিখে সংরক্ষণ করেন, যাতে ভবিষ্যতে গানটি চিনে নিতে কষ্ট না হয়।

মৌলিক এই সংগীতধারকটি (ডিস্ক) ওয়াক্স ফেসিং বিভাগ থেকে কপার রুমে পাঠানো হয়। এখানে এটি থেকে এইবার একটি তামার চাকতিতে গানখানির অনুলিপি ছেপে নেওয়া হয়। এই চাকতিকে বলা হয় 'মাদার' অর্থাৎ উৎপাদিকা। উৎপাদিকা [illegible] মৌলিক সংগীতধারকটির এবারের [illegible] হ'য়ে যায়—এর পর ঐ ধারকটির ওপরের একপর্দা চেঁচে ফেলে আবার তাকে সংগীতধারকের কাজে ব্যবহার করা হয়।

উৎপাদিকা অর্থাৎ মাদারটি পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হয় 'একজামীন রুমে'। পরীক্ষা-অন্তে এই উৎপাদিকা থেকে একটি ষ্ট্যাম্পার তৈরী করা হয়, এরপর এই ষ্ট্যাম্পারটি রেকর্ড-প্রস্তুত কামরায় পাঠানো হয়, আর উৎপাদিকা অর্থাৎ 'মাদার'টিকে সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়।

রেকর্ড-প্রস্তুত কামরায়, বিভিন্ন দ্রব্যের সংমিশ্রণে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত রেকর্ড-মণ্ড বা কেক্, রেকর্ড-ছাপা যন্ত্রের নীচে ওপরে রক্ষিত দু'খানা ষ্ট্যাম্পারের মধ্যে রেখে, ষ্ট্যাম্পারের সঙ্গে তার লেবেল অর্থাৎ পরিচয়-চাক্তি উল্টো ক'রে লাগিয়ে পরে ঐ কেকটিকে উত্তাপে গলিয়ে নেওয়া হয়। মণ্ডটি উত্তাপে প্রয়োজনমত নরম হ'য়ে যাবার পর, ওপর ও নীচ থেকে দু'খানি ষ্ট্যাম্পারের প্রয়োজনমত চাপ প্রদত্ত হয়—সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডার সংস্পর্শে রেকর্ডটি কঠিন আকার ধারণ করে। এর পর ফিনিসিং রেকর্ডটি সমাপ্তির রূপ লাভ করে। এই সমাপ্তির পথে এগিয়ে আসার পর যন্ত্রগুলি এমন সুশৃংখলে সন্নিবেশিত আছে, যাতে অযথা সময় বা জিনিষের অপচয় না হয়। সমাপ্তির পরে পরীক্ষা-অন্তে রেকর্ডখানি কাগজের খামে ভ'রে সংরক্ষণাগারে পাঠানো হয়। এখান থেকে প্রেরক বিভাগের মাধ্যমে এই রেকর্ড অনুমোদিত বিক্রেতার কাছে অথবা সরাসরি আপনার কাছে নতুন রেকর্ডরূপে উপস্থিত হয়।

বাংলা থিয়েটার উঠে যাচ্ছে কেন ?

(১৩১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নিবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে মঞ্চ-প্রবেশের দ্বার-প্রাচীরে রক্ষিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের মূর্তিটি সরিয়ে ফেলেন, তার পরিবর্তে সেখানে তাঁরা রঙ্গমঞ্চের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাখতে পারেন, হেমেন মজুমদারের একটা ছবি আর একটা বোতল।

দেবতাকে বিস্মৃত হওয়া ভাল, দেবতাকে ক্রোধে উত্তেজিত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শুনেছি, থিয়েটারের পরিচালকেরা বিশেষ বুদ্ধিমান লোক সব, আশা করি আমার প্রস্তাবটা তাঁরা বিবেচনা করে দেখবেন।

মুগ্ধ যাঁদের গান শুনে

[মুগ্ধ যাঁদের গান শুনে—অবশ্য ছবির পর্দায় নয়, গ্রামোফোন রেকর্ডে এবং বেতারে। যাঁদের গান মাতায় প্রাণ অথচ ছবির জগতের সঙ্গে খুব বেশী যোগাযোগ না থাকলেও যাঁদের সম্বন্ধে চিত্রভক্তদের আগ্রহ ও কৌতূহলের শেষ নেই তাঁদের সম্পূর্ণ পরিচিতি সঙ্গীতানুরাগী পাঠকবর্গকে জানানোর জন্যে চৌদ্দটি প্রশ্নের একটি তালিকা পাঠানো হয়েছিল বারো-জন এমনিধারা কৃতবিদ্য শিল্পীকে—তার মধ্যে ছ'জনের কাছ থেকে আমরা উত্তর পেয়েছি, বাকী ছ'জন নিরুত্তর। নিরুত্তর যাঁরা তাঁদের নাম হলো—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য, সুকৃতি সেন, সন্তোষ সেনগুপ্ত, বেচু দত্ত ও ভারতী বসু। এঁদের নীরবতার কারণ অবশ্য আমাদের জানা নেই, তবে নিরুত্তর থেকে তাঁরা তাঁদের অনুরাগী ভক্তদের আগ্রহ ও কৌতূহলের প্রতি কতখানি সুবিচার করেছেন তা হয়তো তাঁরা নিজেদের বুদ্ধিহীনতায় উপলব্ধি করতে পারেন নি, তাই সে বিচার আমরা পাঠক-পাঠিকাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম। —'চিত্রবাণী'-সম্পাদক]

১। জন্ম
২। সংক্ষিপ্ত পরিচয়
৩। সাধারণ শিক্ষা
৪। সঙ্গীতের ঘরওয়ানা (গুরু)
৫। কীভাবে "রেকর্ডে" আসেন ?
৬। কোন্ সঙ্গীত-পরিচালকের অধীনে সর্বপ্রথম "রেকর্ড" করেন ?
৭। কোন্ সুরকার সবচেয়ে প্রিয় ?
৮। কোন্ গীতিকার সবচেয়ে প্রিয় ?
৯। সমসাময়িক কোন্ "রেকর্ড" শিল্পীকে সবচেয়ে ভাল লাগে ?
১০। "রেকর্ড"-শিল্পীদের সম্বন্ধে নিজস্ব অভিমত
১১। কী উপায়ে "রেকর্ড" কর্তৃপক্ষ শিল্পীর মূল্য নির্ধারণ করেন ?
১২। নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ "রেকর্ড" কোনটি ? —জনপ্রিয়তা বা আয় অথবা উভয় দিক থেকেই
১৩। আবহ-সঙ্গীত সম্পর্কে কোন বক্তব্য আছে কিনা ?
১৪। চলচ্চিত্রে প্লে-ব্যাকে গান গেয়েছেন কিনা ? যদি গেয়ে থাকেন তবে প্রথম প্লে-ব্যাকে গাওয়া গান কোন্‌টি এবং কোন্ সালে প্লে-ব্যাক করেন ? যেসব ছবিতে প্লে-ব্যাকে গান গেয়েছেন তার তালিকা এইসঙ্গে দেবেন

বিমলভূষণ (মুখোপাধ্যায়)

১। আমার জন্ম-তারিখটা ১৬ই ভাদ্র, আর সন্‌টা সম্ভবতঃ ১৩২৮। স্থান—ক'লকাতায়—ভবানীপুর, হরিশ মুখার্জ্জি রোডে। সন্‌টা এক-আধ-বছর এদিক-ওদিক যদিও বা হয়—তারিখটা আর স্থান কিন্তু নির্ভুল।

২। পিতৃদেব স্বর্গীয় ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (যিনি "ডক্টর নরেন" নামে সুদূর ইউরোপেও প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন) সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না বটে, তবে একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রসজ্ঞ ছিলেন।

৩। সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণটা মূলতঃ আমার মাতৃকুল থেকে পাওয়া। আমার মাতৃদেবী—স্বর্গীয়া সুশীলাবালা দেবী—অপূর্ব্ব কণ্ঠ-সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ কুলবধূ—যিনি জীবনে কোনদিন ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়ে গান শেখবার অবসর পান নি—তিনি শুধু তাঁর দাদাদের মুখের গান শুনে শ্রুতি-বলে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত সেই গানের সবগুলি পদ; সুর ইত্যাদি মনে রেখে—কি ক'রে যে অত নির্ভুলভাবে গাইতেন—তা আজো আমার কাছে পরম বিস্ময়! তাঁর পূজোর সময়ের সঙ্গীতে

শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদনের তন্ময়ভাব আমার সাধনার বস্তুই রয়ে গেছে এখনো! সঙ্গীতের রূপ-বিকাশের ক্ষেত্রে ভাব যে অপরিহার্য্য সম্পদ—এই মূলমন্ত্র তাঁর কাছ থেকে পাওয়া আমার প্রথম ও প্রধান শিক্ষা।

আমার মাতুল এ্যাড্‌ভোকেট্ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও অবসর সময়ে সঙ্গীত-চর্চ্চা ক'রে থাকেন। অবশ্য এটা তাঁর নেশা, পেশা নয়।

আমাদের ভাইবোনদের সঙ্গীত-শিক্ষার দিকটা অবহেলা তো দূরের কথা—তার উৎকর্ষ-সাধন-প্রচেষ্টায় সাহায্যই ক'রে গেছেন বাবা-মা চিরদিন।

আমার বড়-দা—স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ—যদিও দুর্ভাগ্য-বশতঃ নিতান্ত অল্প-বয়সে লোকান্তরিত হন—কিন্তু মাত্র

বিমলভূষণ

১৬।১৬ বছরের জীবনকালেই তাঁর সুকণ্ঠের-প্রসাদে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন।

বর্ত্তমানে আমরা ছ' ভাই, এক ভগ্নী। দিদিই সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠা। দিদি, বর্ত্তমান বড়-দা, মেজদা, ছোটো তিনটি ভাই ও আমি—প্রত্যেকে গান শেখবার সুযোগ-সুবিধে সমভাবেই পেয়েছি। সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীমান প্রভাতভূষণ সম্প্রতি বেতারে গান গাইছে।

সঙ্গীত-প্রীতির আধিক্যে—সাধারণ শিক্ষার দিকটা অবহেলিত না হয়—সেদিকেও সজাগ-দৃষ্টি ছিল বাবা-মা'র। ভবানীপুর সাউথ সুবার্ব্বন মেন স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই এস্‌প্ল্যানেড-ধর্ম্মতলার মোড়ে চৌরঙ্গী রোডের এক বাড়ীতে উঠে যাই আমরা। অতদূর থেকে স্কুলে যাওয়া-আসা করার বিশেষ অসুবিধে হতে লাগলো। তা ছাড়া বাবা প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপকেই শিক্ষার মাপকাঠি ব'লে ধরেন নি কোনদিন। তাই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ীতেই পড়াবার ব্যবস্থা হ'ল। দিনে ছ' ঘণ্টায় ছ'জন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নিতেন। ছাত্র আমরা ক'টি ভাই। এ ছাড়া বাবা নিজে ইংরাজী পড়াতেন। নিয়ম-কানুন স্কুলের মতই ছিল বটে, তবে ফাঁকির দিকটা নয়। গরমের সময় ভোর-বেলা ক্লাস বস্‌তো। নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ মিশনারী স্কুলের মতই মেনে চ'লেছি আমরা। আমোদ-প্রমোদের সুযোগ-সুবিধেও কম ছিলনা। প্রতি শনিবার-রবিবার গান-বাজনা ছাড়াও স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জ্জিত নাটকাভিনয় হ'ত। আমার সেজদা শ্রীবিজয়ভূষণ ও শ্রীমান প্রমোদভূষণ এই ব্যাপারে পাণ্ডা ছিলেন। আমার সর্ব্বপ্রথম গানে সুর দেওয়াও ঐ নাটকাভিনয় উপলক্ষ্যে। এই সময়েই আমার জ্ঞাতি-কাকা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "মহারাজ সিং" নামে একটি স্ত্রী-ভূমিকাবর্জ্জিত নাটক লিখে স্বয়ং একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে স্বেচ্ছায় রাজী হ'ন।

৪। আমার ভালো ক'রে গান শেখার ইচ্ছাটা যদিও মনে মনে ছিল বরাবরই তবে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে সেটা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞায় রূপান্তরিত হয়। অনেকে আমার গান-বাজনা শেখার ইচ্ছাটা সুনজরে দেখেন নি। এখন যেমন প্রায় ঘরে-ঘরে সঙ্গীত-চর্চ্চা সুরু হ'য়েছে—আমার ছেলেবেলায় এমনটি তো ছিলই না—বরং উল্টোটাই ছিল বলা চলে। অবশ্য সঙ্গীতশিল্পীরা বেশীর ভাগই যে পরিবেশের মধ্যে থাকতেন সে সময়ে—সে সব দেখে-শুনে এই পথে এগিয়ে আসতে নিষেধ করার যে কারণ ছিল না—

এ কথা বলি না। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তাঁদের আপত্তির কারণটা ঠিক এই ভিত্তিতে ছিল না। আমার গান গাওয়ার ওপর তাঁদের কেন যে বিষ-দৃষ্টি প'ড়েছিল—তা আজো বুঝে উঠতে পারি নি। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, গান-বাজনা করার চেষ্টা করা আমার পক্ষে পণ্ডশ্রম মাত্র। আর তাঁদের এই মনোভাব একদিন তাঁরা আমার মুখের ওপরই ব্যক্ত ক'রে দিলেন। আমাদের বাড়ীতে একটু গান-বাজনার আয়োজন হ'য়েছিল। আমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি গান গেয়েছিলাম। দ্বিতীয় গান গাওয়ার সুযোগ আর আমার হয় নি। একে আমার গাওয়ার ওপর তাঁরা ছিলেন বিরূপ—তায় গেয়েছিলাম রবীন্দ্র-সঙ্গীত—যা নাকি তাঁদের মতে সঙ্গীত-জগতে সর্ব্বনাশ সাধন ক'রছিল তখন। তাঁরা আবার গোঁড়া উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ভক্ত ছিলেন কিনা! আমার গান শেষ হ'তে না হতেই তাঁরা কঠোরভাবে নিন্দাবাদ সুরু ক'রলেন, আমার দাদা ও ভাইয়েরা আর উপস্থিত কয়েক-জন বোঝাবার অনেক চেষ্টা ক'রলেন তাঁদের। কিন্তু অবুঝকে বোঝাতে পারা যায় কি সহজে? যাই হোক্ শেষকালে আমি তাঁদের ব'লে দিলাম যে, "আজ আপনারা যত নিন্দেই করুন, আমি একদিন আপনাদের এই ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্ত্তন করাবোই।" এর পর থেকে (১৯৩২ সাল) আমি নিয়মিত উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত সাধনা সুরু করি, আর তা' বজায় রাখতে আজ পর্য্যন্ত সাধ্যমত চেষ্টা ক'রছি।

স্বর্গীয় সঙ্গীত নায়ক গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্যত্ব নেওয়ার বাসনা বহুদিন ছিল। কিন্তু যে-সময়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লাম সে সময়ে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। তবে তাঁরই নির্দ্দেশে তাঁর কৃতী শিষ্য সঙ্গীতাচার্য্য যামিনী-নাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর (যিনি সঙ্গীত শিক্ষাদান ব্যাপারে গিরিজাশঙ্করের দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ ছিলেন) কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণে আমি বিশেষ উপকৃত। এর আগে পণ্ডিত কেশব গণেশ ঢেকণে মহাশয়ের কাছেও কিছুদিন গান শিখেছি। এছাড়া যেসব গুণীজনদের কাছ থেকে এক-আধখানি গান শিখেছি—তাঁদের নামের তালিকা দিতে গেলে এ প্রসঙ্গের আর শেষ হ'বে না, অতএব এই পর্য্যায়ের গান শেখার আলোচনার কথা এই পর্য্যন্ত থাক্!

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গান আমার মনে প্রথম স্থানা-ধিকারী। আমার শৈশবে ইউনাইটেড্ মিশনারী স্কুলে কিণ্ডারগার্টেন ক্লাসে যখন পড়ি তখন সেখানকার সঙ্গীত-শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রথম দিনেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনে এত ভালো লেগেছিল যে ত' বোঝাবার মত ভাষা জানি না। সে-সময়েও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন লোকের যে অভাব ছিল না এ তো আগেই ব'লেছি। কিন্তু আমার বাবা-মা একান্ত-ভাবে রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন। তাই কারো কোনো বিরুদ্ধতাই আমার ক্ষতি ক'রতে পারে নি। তবে মজার কথা এই যে পরবর্ত্তীকালে এইসব বিরুদ্ধ-বাদীদেরই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষ ভক্ত (?) রূপে রূপান্তরিত হ'তেও দেখলাম।

(৫) রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়ন-পদ্ধতির দিক থেকে সুরসাগর পঙ্কজকুমার মল্লিক ও শ্রীমতী কনক দাস (বিশ্বাস)-এর ভঙ্গীটি বেশ ভালো লাগতো। পরে পঙ্কজবাবুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগও ঘটেছিল। তাই তাঁর গায়ন পদ্ধতিটা প্রায় ঘরওয়ানা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল আমার কাছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নীহারবিন্দু সেন মহাশয়ের কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষা ক'রে আমি যথার্থ উপকৃত হ'য়েছি।

১৯৩৭ সালের শেষের দিকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবরা আমায় রেকর্ড-রেডিওতেও গাওয়ার চেষ্টা করার জন্য বল্লেন। নিজেরও যে ইচ্ছে ছিল না তাও নয়, কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে প্রবেশের পথও জানা ছিল না আর সঙ্কোচও ছিল যথেষ্ট। একদিন আমার উৎসাহী বন্ধুদের কয়েকজন স্বর্গীয়-গায়ক হরিপদ রায়কে নিয়ে এসে হাজির হ'লেন। তাঁরা আমায় নিয়ে যান নিউ থিয়েটার্স-হিন্দুস্থান রেকর্ডের টালিগঞ্জ ষ্টুডিওতে। সেখানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হ'লাম। কিন্তু তাঁরা প্রারম্ভিক উদ্যোগ-আয়োজন ক'রতে অতি দীর্ঘ সময় নিলেন। তাতে আমায় সঙ্কোচটাও যেন কিছু বেড়ে গেল।

(৬) এর [illegible] আমার বন্ধুরা "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" [illegible] তে নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে

হঠাৎ একদিন বেড়াতে যাবার নাম ক'রে আমাকে গ্রামোফোন কোম্পানীর চিৎপুর-গরাণহাটার মোড়ের তৎকালীন রিহার্সাল-রুমে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। সেখানে রেকর্ড কোম্পানীর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সোম, সঙ্গীত পরিচালক শ্রীকমল দাশগুপ্ত প্রভৃতি ছিলেন। তাঁরা আমার গান শুনে বিশেষ প্রীত হ'ন এবং তাঁদের অনুরোধে আমায় খানপাঁচেক গান গাইতে হয়। শ্রীযুক্ত সোম তৎক্ষণাৎ আমার রেকর্ড করাবার আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রতে শ্রীকমল দাশগুপ্তকে ভার দিলেন এবং তাঁরই (শ্রীদাশগুপ্তের) পরিচালনাধীনে আমার প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে (এইচ এম ভি-তে) বেরোয়। সেই সময়েই আমি বেতারেও যোগদান করি। ১৯৩৭ সালের ২৭শে অক্টোবর আমি সর্ব্বপ্রথম বেতারে গান করি। ঐ দিনই আমার বর্ত্তমান বড়দা শ্রীযুক্ত রেবতীভূষণও গান করেন বেতারে। বর্ত্তমানে যদিও তিনি সাধারণ আসরে গাইবার অবসর পান না, কিন্তু তাঁর চিকিৎসা ব্যবসার চাপে তাঁর সুকণ্ঠ নষ্ট হয় নি। বেতার-কর্ত্তৃপক্ষ যদিও আমায় সে সময়ে তিনবার "অডিশনে" অকৃতকার্য্যতার ছাপ দিয়ে দেন অকারণে, এবং পরেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মতদ্বৈধ চূড়ান্ত রূপ নেয় একাধিবার—তবে বর্ত্তমানে আমার প্রতি তাঁদের কৃপা-দৃষ্টি আছে ব'লেই তো মনে হয়।

(৭) সুরকারদের সম্বন্ধে ব'লতে গিয়ে একটু বাধো বাধো লাগলেও,—যখন জান্‌তে চেয়েছেন তখন বল্‌তে হবেই।

কুমার শচীন দেব বর্ম্মণের সঙ্গীত-পরিচালনা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখি। যদিও তিনি আজ সুদূর বোম্বাইতে হিন্দী ছবির সুরকাররূপেই সমধিক পরিচিতি লাভ ক'রেছেন, কিন্তু বাংলা দেশে থাকাকালে তিনি যে যথোপযুক্ত সম্মানলাভে বঞ্চিত হ'য়েছিলেন এ নিতান্তই দুঃখের বিষয়। শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমানে বাংলার শ্রেষ্ঠ আবহ-সঙ্গীত পরিচালক হ'লেও শ্রীঅনুপম ঘটকের সুরগুলিই নতুনত্ব প্রকাশে অধিক সচেষ্ট। উদীয়মান শ্রীসলিল চৌধুরীর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(৮) গীতিকার-প্রসঙ্গও সুরকার প্রসঙ্গের প্রভাবমুক্ত নয়। অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হ'বে—তাই একটি গোষ্ঠির কয়েকজনের নাম উল্লেখ না ক'রলে অন্যায় করা হয়। শ্রীমতী অলকা উকিল, সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য, বটকৃষ্ণ দে, প্রবোধভূষণ, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার প্রভৃতির রচনা আমার ভালো লাগে গান হিসেবে।

(৯) সমসাময়িক রেকর্ড-শিল্পীদের মধ্যে যাঁকে আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো তিনি সম্প্রতি লোকান্তরিত শিল্পী সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী। তাঁর অকাল-মৃত্যুতে আমি সত্যিই মর্ম্মাহত হ'য়েছি।

(১০) রেকর্ডের শিল্পীদের মধ্যেই শুধু নয়—বর্ত্তমানে শিল্পীদের প্রায় অনেকেরই মধ্যে যে আগ্রহটা দেখি তাতে আমি বিশেষ ব্যথিত। ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা লেশমাত্র কম নেই আমার। কিন্তু তাঁরা বোম্বাই-মাদ্রাজের ছায়াছবির অনুকরণ ক'রে বাংলা গানকে যে পর্য্যায়ে এনে

দাঁড় করাচ্ছেন তার সমর্থন করতে আমি অক্ষম। ভালোর অনুকরণ করা ভালো, ক্ষেত্র বিশেষে—কিন্তু অন্ধভাবে পুরোপুরি অনুকরণ ক'রে যে ধরণের গান আজকাল চালু হ'য়েছে তার স্থায়িত্বকাল খুব স্বল্প ব'লেই আমার ধারণা, তবু রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ-নজরুলের দেশ বাংলার এই অনুকরণের দৈন্যদশা দেখে লজ্জা হয়। অবশ্য কেউ হয়তো বলবেন যে এটা ব্যবসার দিক থেকে বর্ত্তমানে বিশেষ লাভজনক—তাহোলে কিছু মন্তব্য না করাই ভালো! তবে এর জন্যেও শিল্পীদের চেয়ে রেকর্ড কর্তৃপক্ষকেই দোষী করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁরা তাঁদের ব্যবসার খাতিরে দেশকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিতে নিশ্চয়ই পারেন না—দেশের সংস্কৃতির চিতার ওপর তাঁদের ব্যবসার ভিত্তিকে দৃঢ় হ'তে দেওয়া যেতে পারে না। তাঁরা অবশ্য মনে করেন যে শিল্পীদের মরণ-বাঁচন তাঁদের হাতে যখন তখন তাঁদের মর্জিমত চলতে শিল্পীরা বাধ্য।

(১১) শিল্পীদের সঙ্গে তাঁরা চুক্তিটা বেশ এক তরফাই করে রাখেন, মৌখিক যাই বলা হোক না কেন। মূল্য নির্দ্ধারণ পদ্ধতিটাই ধরা যাক। হয়তো স্থির হ'ল একটি রেকর্ডের বিক্রয়-লব্ধ অর্থের শতকরা সাড়ে সাত টাকা শিল্পীর প্রাপ্য। কার্য্যক্ষেত্রে টাকাটার হিসেব-নিকেশের সময় দেখা গেল ঐ শতকরা সাড়ে সাত টাকা থেকেও বিভিন্ন বিভাগে কেটে-কুটে যৎসামান্যই শিল্পীর হাতে পৌঁছলো। সবচেয়ে আপত্তিকর হ'ল যে তাঁরা তাঁদের খুশীমত হিসেব পাঠাবেন। নিজস্ব হিসাব পরীক্ষক দিয়ে যে পরীক্ষা করাবেন সে সুযোগ শিল্পীর নেই। কোনো শিল্পী যদি আপত্তি করেন তো তাঁকে জব্দ করার অস্ত্রও তো কোম্পানীর হাতে আছেই। কারণ—তাঁরা ইচ্ছে ক'রলে প্রমাণও ক'রে

দিতে পারেন যে শিল্পীর রেকর্ড বিক্রয়-যোগ্যই নয়। এমনকি একবার হিসেব দাখিলের বিক্রয়-তালিকাকে পরবর্ত্তী হিসেব-নিকেশকালে ফেরৎ পাওয়ার পর্য্যায়ে ফেলতেও তো বিশেষ কষ্টকর হবে না তাঁরা ইচ্ছে ক'রলে। কিংবা বিপরীত মতাবলম্বী শিল্পীদের শিক্ষা (?) দিতে তাঁরা পাঠাবেনই না সব দোকানে সেসব শিল্পীর রেকর্ড। এমনকি রেকর্ড ছাপানোই হয় তো বন্ধ ক'রে দিলেন কোনো না কোনো অজুহাত দেখিয়ে—তা সেইসব শিল্পীর বা গানের যত জনপ্রিয়তাই থাক না কেন! বোধ হয় (monopoly business) একচেটে ব্যবসার চরমতম নিদর্শন এইগুলো! কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যতীত প্রায় সকল শিল্পীকেই রেকর্ড কোম্পানীর এই বিষম জালে জড়িয়ে পড়তে হবেই। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে বিদেশী কোম্পানীর বিদেশী কর্ত্তাদের চেয়ে বাঙালী কর্ম্মচারীরাই রয়েছেন এর মূলে। বিদেশী কর্ত্তাদের একজন কিছুকাল আগে—অন্যান্য ভারতীয় রেকর্ড-কোম্পানীগুলিকে ধূলিসাৎ ক'রে দেবার যে অভিপ্রায় সদম্ভে প্রকাশ করেছিলেন—তাকে রূপ দিতে তাঁদের বাঙালী কর্ম্মচারীরাই অধিক আগ্রহশীল—যাঁরা প্রগতিবাদী বলে নিজেদের প্রচার করেন—এও কম লজ্জার নয়। পরাধীন দেশে প্রবর্ত্তিত একচেটে ব্যবসার নিয়মের নামে এই অবিচার আজ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পাঁচ বছরের মধ্যেও তার কোনো সংস্কার সাধন করা গেল না—এও নিতান্ত পরিতাপেরই বিষয়। শিল্পীদের দিয়ে বিনা প্রতিবাদে তাঁদের হুকুম তামিল করানোর এই মনোবৃত্তির প্রতিবাদেই আজ দু' বছর হ'ল আমি রেকর্ড-জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রতে বাধ্য হয়েছি।

(১২) আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রেকর্ড কোন্‌টি? প্রশ্নটি জটিলও নয় মোটেই। কিন্তু আমার পক্ষে বর্ত্তমানে এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সত্যিই শক্ত। কারণ দীর্ঘ-বিরতির পর ১৯৪৬ সালে গ্রামোফোন কোম্পানীর শ্রীযুক্ত অধীরচন্দ্র সেন মহাশয়ের আগ্রহে রেকর্ডিং সম্বন্ধে পুনরায় মনোযোগী হই। তারপর শ্রীযুক্ত সেনের আগ্রহাতিশয্যেই ১৯৫০ সাল [illegible] কোনো [illegible] রেকর্ড [illegible] কলম্বিয়া কোম্পানীতে ঢুকে ছিলাম। কিন্তু প্রথম খান দুই রেকর্ড করার পর থেকেই শিল্পীদের মূল্য নির্দ্ধারণ পদ্ধতি ও অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যার জন্যে শিল্পীদের ক্ষতিই হয় বেশী) ইত্যাদির প্রতিবাদ করার ফলে কর্ত্তাদের সুনজর লাভে বঞ্চিত হই। তাই জনপ্রিয়তার মাপকাঠি অর্থাৎ সাধারণের প্রশংসাধন্য হয়ে যে রেকর্ড বহু দূর দেশেও বাজতে শুনলাম—সেই রেকর্ডেরই মূল্য নির্দ্ধারণকালে কোম্পানীর খুশীমত প্রেরিত অর্থই মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয়েছি। তবে শ্রোতৃবর্গের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে এ কথাটাও আনন্দের সঙ্গেই ব'লব যে, আমার রেকর্ডের কোনো গানই তাঁদের সম্বর্দ্ধনা লাভে বঞ্চিত হয় নি—আর তাই-ই আমাকে রেকর্ড কোম্পানীর সমস্ত অবিচার সহ্য করবার শক্তি দিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে। যাই হোক্, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনীর বিবৃতি দিতে গিয়ে অনেক অপ্রিয় সত্য কথাই এই প্রসঙ্গে ব'লতে হ'ল ব'লে আমি বিশেষ দুঃখিত।

(১৩) আবহ-সঙ্গীতের ব্যাপারে এখানে যে পদ্ধতি প্রচলিত তারও আশু পরিবর্ত্তন অবশ্য প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে ফ্লোরে ব'সে টেকিং-এর কিছু আগে সিচুয়েশনটা জেনে অর্কেষ্ট্রা পার্টিকে দিয়ে আন্দাজের ওপরেই বাজনা বাজিয়ে নিয়ে কাজ সারা হয়। এতেও না হ'ল তো—বিলিতি ছবির আবহ-সঙ্গীতের টুক্‌রো কেটে নিয়ে জুড়ে দিয়ে ঝামেলা মেটানোর সুযোগ তো রয়েছেই। শুধু গানের সুর দিয়েই সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব চুকে যায় না। আবহ-সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি এবং তার জন্যে বিশেষভাবে চিন্তা করারও যে যথেষ্ট প্রয়োজন—একথাটা যেন অনেকেরই অজ্ঞাত মনে হয়। অবশ্য এজন্য প্রযোজক বা পরিচালকের সঙ্গীত-সম্বন্ধে অজ্ঞতা-সূচক তাড়াহুড়োও বহুলাংশে দায়ী।

(১৪) চলচ্চিত্রে প্লে-ব্যাকে আমি গান গেয়েছি মাত্র দু'খানি ছবিতে। প্রথমটি ১৯৪৩ সালে "জজ-সাহেবের-নাতনী" চিত্রে। তারপর স্থির করি যদি নিজের উপযুক্ত কোনো চরিত্রাভিনয়ের সুযোগ ঘটে তো চিত্রে অবতরণ করেই গান গাইবো—প্লে-ব্যাকে আর গাইবো না। দীর্ঘকাল পরে ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ

ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে ম্লানমুখে লেখা
শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যতো
চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে
প্রাণ তার—
তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায়
বংশ বংশ ধরি...

চিত্রভারতীর নিবেদন

ভোর হয়ে এলো

পরিচালনা : সত্যেন বসু

কাহিনী : সলীল সেনগুপ্ত

সংগীত : সলিল চৌধুরী

শ্রেষ্ঠাংশে : [illegible] প্রভৃতি

পরিবেশক : প্রাইমা ফিলমস (১৯৩৮) লিঃ

মিত্র (ছোটাই বাবু) মহাশয় আমাকে তাঁর "হের-ফের" চিত্রে নামানো স্থির করেন এবং ঐ ছবির নায়কের গানগুলিও ফিল্মে রেকর্ডিং করা হয়। কিন্তু আমার মাতৃবিয়োগ ও অন্যান্য কয়েকটি কারণে আমার চিত্রাবতরণ স্থগিত রাখতে হয়। যাই হোক্—প্লে-ব্যাকে গান গাওয়া ঐ আমার দ্বিতীয় এবং বোধ হয় শেষ—আর তার কারণটা তো আগেই ব'লেছি।

আর একটি প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে চাই—যদিও এটা আপনাদের প্রশ্ন-তালিকার বহির্ভূত।

আমি পদবীহীন শুধু "বিমলভূষণ" হ'য়েছি কেন—অনেকেই এ প্রশ্ন করে থাকেন আমায়। এ কিন্তু আমি কোনো বিশেষ খেয়ালবশে করি নি, ক'রেছি বাধ্য হ'য়েই। ১৯৩৮-৩৯ সালে অপর একজন বিমলভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সমবেত সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হ'ত বেতারে। তাঁরা তাঁদের দলের নাম রেখেছিলেন—"কমিউনিটি সিঙ্গিং পার্টি"। 'বেতারজগৎ' পত্রিকায় তার বাংলা অনুবাদ ছাপা হ'ল—"সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত"—পরিচালক বিমলভূষণ মুখোপাধ্যায়। এর পরে ইস্লামিয়া কলেজে এক অনুষ্ঠানে গাইতে ডাকা হয় আমাকে। হঠাৎ আমার এক মুসলমান বাল্য-বন্ধু এসে আমাকে ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে নিষেধ করেন, কারণ সেখানে নাকি বিপদের আশঙ্কা ছিল। 'বেতার জগতে'র সামান্য ভুলে প্রাণ যায় যায়। যাই হোক্ তখন পিতৃদেবের উপদেশানুসারে দুই বিমলভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে নিজে শুধু বিমলভূষণ-এ দাঁড়ালাম। আজ অবশ্য অপর বিমলভূষণ মুখোপাধ্যায়কে বেতার-আসরে দেখি না কিন্তু আমি 'বিমলভূষণ'ই রয়ে গেলাম।

সত্য চৌধুরী

১। ইংরাজী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলা ১৩২৫ সালের ৩১শে ভাদ্র কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীটে আমার জন্ম।

২। পিতামহ ৺[illegible] বিশিষ্ট বা[illegible] মধ্যে অন্যতম [illegible] রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাজসাহীর নিজ বাড়ীতে শত শত ছাত্রকে আপন তত্ত্বাবধানে রেখে প্রচুর অর্থব্যয় করে তাদের ভবিষ্যৎ-জীবন গঠন করতে সাহায্য করেছিলেন। ৺উপেন্দ্রলাল মজুমদার (প্রথম বাঙালী এ্যাকাউন্ট্যান্ট্ জেনারেল এ্যাণ্ড কণ্ট্রোলার অফ কারেন্সী) আমার মাতামহ। আমার পিতা ৺যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট ছিলেন। শিক্ষা এবং সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল।

৩। বংশানুক্রমিক ধারা বজায় রাখতে আমি যথারীতি প্রচলিত শিক্ষার সোপান ধরে ছাত্রজীবন সুরু করেছিলাম। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুর মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউসান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আশুতোষ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হই। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এম, এ,-ল' পড়বার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি। ইচ্ছা ছিল পিতা এবং পিতামহের মত আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। কিন্তু ঘটনাক্রমে তা' আর হোয়ে ওঠে নি।

৪। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর আমার প্রকৃত সঙ্গীত-চর্চ্চা সুরু হয়। পিতা এবং মাতুলের অনুপ্রেরণায় সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের সাধনাও করতে থাকি।

ইণ্টারমিডিয়েট পড়বার সময় শিল্পী শ্রীশচীনদেব বর্ম্মণ মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি এবং পরে ৺ফণীভূষণ গাঙ্গুলীর শিষ্যত্বও গ্রহণ করি। ৺ফণীভূষণ গাঙ্গুলী ছিলেন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের সাধক। প্রিয় শিষ্য হিসেবে সুরজগতের নানান বৈচিত্র্যের সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ৺ফণীভূষণ গাঙ্গুলীর কাছে শিক্ষা শেষ করে তানসেনের বংশধর ওস্তাদ দবীর খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। এই সময়েই আমি গেলাম আমার অন্যতম আত্মীয় পণ্ডিচেরীর শ্রীদিলীপকুমার রায়ের কাছে বাংলা গান এবং ভজন শেখার উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত কীর্ত্তন, প্রভৃতি যথারীতি শিক্ষা এবং অনুশীলন করেছি। কয়েকজন গুণী শিল্পী এবিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে আন্তঃ-কলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সর্ববিষয়ে সাফল্যলাভ করে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীরূপে পুরস্কৃত হয়েছিলাম। 'অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিসান' প্রতিযোগিতায়ও বিশেষ সাফল্যলাভ করতেও সক্ষম হয়েছিলাম এবং সেই সময়ে কনফারেন্সে গাইবার আহ্বানও এসেছিল।

১৯৪৯ সালে 'অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে' বাংলা ধ্রুপদ গান গেয়েও গুণীজনদের প্রশংসা অর্জ্জনে ধন্য হয়েছিলাম।

বাংলা গানের নানা শাখা-প্রশাখা—বাউল, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী, প্রাচীন বাংলা-গীতি, শ্যামাসঙ্গীত, আধুনিক, রবীন্দ্র-গীতি, রাগপ্রধান, তাছাড়া আছে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত—যার প্রচলন বেশী হিন্দী ভাষার ওপর—সবরকম সঙ্গীত পরিবেশন করার উপযোগী শিক্ষা আমি লাভ করেছি।

৫। সুরকার শ্রীঅনুপম ঘটকের সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় আমার পরিচয় হয় এবং তাঁরই ইচ্ছায় হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে যোগদান করি—পরে শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীহেম সোমের আগ্রহাতিশয্যে এইচ, এম, ভি, কোম্পানীতে স্থায়ীভাবে যোগদান করি।

৬। আমার সর্ব্বপ্রথম গানের রেকর্ডের সুর-সংযোজনা এবং পরিচালনা করেছিলেন শ্রীঅনুপম ঘটক।

৭। বিখ্যাত সঙ্গীত-পরিচালক শ্রীকমল দাশগুপ্ত আমার প্রিয় সুরকার।

৮। শ্রীপ্রণব রায় আমার প্রিয় গীতিকার।

৯। শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্যাকেই আমর সবচেয়ে ভালো লাগে।

১০। শিল্পীদের প্রথম জীবনে স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকে রেকর্ডে গান ক'রে নিজের কণ্ঠস্বর শোনা এবং পাঁচজনকে শোনানো। রেকর্ডের গান সাফল্যমণ্ডিত হলে নাম-যশ এবং পরে পেশা হয়ে দাঁড়ায়।

সব ব্যবসার মতই রেকর্ড-জগতেও কয়েকজন কর্ণধার থাকেন। উন্নতি, অবনতি, সংস্কৃতি সবকিছুই নির্ভর করে তাঁদের ওপর অর্থাৎ এই পেশার মান নির্দ্ধারক তাঁরাই হন। দুঃখের বিষয় রেকর্ড-শিল্পীদের জনপ্রিয়তা ও কাজের পরিমাণ ইত্যাদি সবই নিছক স্বর্থলোলুপ স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীদের হাতে থাকায় তাঁরা রেকর্ড কোম্পানীর হাতের পুতুল হয়ে যান। যা করানো হয় তাঁরা তাই করেন এবং তাঁদের ঐ লক্ষ্য ক্রমে অর্থের দিকে চলে যায়। এই একটি কারণে ক্রমে ক্রমে রেকর্ড-সঙ্গীতের অবস্থা এমন একটা অবস্থায় এসে পড়েছে যখন শিল্পীরা যদি অবহিত হয়ে নিজেদের মর্য্যাদা বাড়াবার দিকে দৃষ্টি না

সত্য চৌধুরী

দেন—তাহলে 'রেকর্ড'-শিল্পীর প্রতিভার অপব্যবহার হওয়ারই সামিল হয়ে দাঁড়াবে। রুচিসম্মত সঙ্গীতের চাহিদা সৃষ্টি করার চেষ্টা এবং অর্থের লোভে ক্রীড়নকের মত যথা আজ্ঞা পালন না করে তথাকথিত জনপ্রিয়তার অন্ধমোহ কাটানোর প্রয়াস শিল্পীদেরই করতে হবে একযোগে—নতুবা [illegible] অনুকম্পার পাত্র হয়েই রইবেন। শিল্পীদের [illegible] অনুসন্ধানের অন্য উপায় [illegible] দের [illegible] আরও বেশী উপার্জ্জনের [illegible] মোহ কাটিয়ে নিজেদের এবং দেশের সঙ্গীত

শিল্পের উন্নতি তাঁরা নিশ্চয়ই করতে পারেন জনসাধারণের রুচিসম্মত সঙ্গীত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে হবে তাঁদেরই।

১১। কণ্ঠস্বর রেকর্ড করবার উপযুক্ত হলে সামান্য একটু গান করতে পারলেই রেকর্ড কোম্পানী শিল্পীদের নিয়ে 'এক্সপেরিমেন্ট' করতে প্রয়াস পান। হরবোলার মত মুখস্থ করা গান উগরে যান কোনরকমে নবাগতা শিল্পী,···শুনে সম্ভাবনার কোন ইঙ্গিত পেলে তাঁকে আরও 'চান্স' দেওয়া হয়। তার সম্বন্ধে প্রচার করা হয় আধুনিক প্রচার পদ্ধতিতে। ক্রমে জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয় ঘটে,···অদৃষ্ট প্রসন্ন হ'লে শিল্পী 'তারকা'র আসনেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষার চাইতে কে কতটা নিখুঁতভাবে শিক্ষকের শেখানো কবিতা মিষ্টিসুরে আওড়াতে পারেন সেই চেষ্টাই হয় শিল্পীর একমাত্র সাধনা!

১২। 'পৃথিবী আমারে চায়'—এটির গীতিকার মোহিনী চৌধুরী এবং সুর-সংযোজনা ও পরিচালনা করেছিলেন শ্রীকমল দাশগুপ্ত।

১৩। আবহ-সঙ্গীত সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে নাটক নাটকের রস, নাট্যসঙ্গীত ইত্যাদি অনেক বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা এসে পড়ে। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে অহরহ যে রসসৃষ্টি হচ্ছে নাটক তারই প্রতিরূপ। অভিনয় দিয়েও যেখানে সে রসসৃষ্টি পরিপূর্ণ হচ্ছে না আবহসঙ্গীতের সাহায্য সেখানে অপরিহার্য্য। কিন্তু মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায় এই ব্যাপারে যে, ভারতীয় সঙ্গীত হ'ল 'মেলডি'-প্রধান একক সুরের প্রাধান্যেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এক একটি রাগ-রাগিণী এক একটি সুরের বাহক। বহুকাল থেকে কোন একটি বিশেষ রসসৃষ্টির পরিপূরক হিসেবে বিশেষ কোন সুরের ব্যবহার চলে আসছে। আজ কিন্তু অনেক সময়ই সেটা কাণে পুরনো এবং একঘেয়ে ঠেকে। ছন্দ এবং সঙ্গতিপূর্ণ যে 'হারমনি' ইউরোপীয় সঙ্গীতের প্রাণ এ ক্ষেত্রে তার ব্যবহারের প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। বিদেশী ছবি ও রেডিও তার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। অথচ জানা না থাকায় বিদেশী অর্কেষ্ট্রার ব্যর্থ অনুকরণে যে আবহ-সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের সঙ্গীত-পরিচালকদের আমাদের নিজেদের সুরকেই ছন্দ-বৈচিত্র্যে নতুনভাবে ঢেলে সেজে উপযুক্ত জায়গায় ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। প্রথম প্রথম সাফল্যলাভ না হলেও একদিন সিদ্ধি আসবেই। অপর পক্ষে না জেনে না শিখে ফিরিঙ্গী পাড়ার 'হোটেল-ব্যাণ্ডের' ভাড়া-করা যন্ত্রীদের নিয়ে ও তাদের কাছ থেকে ধার-করা কোন বিলিতী ঐক্যতানের সুরকে অনুকরণ করে বা বিলিতী ঐক্যতানের যেসব স্বরলিপির বই ও রেকর্ড পাওয়া যায় তার অপব্যবহারে সাময়িক অর্থোন্নতি ও সস্তা হাততালি পাওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে এ নিয়ে চলবে ক'দিন?

নিছক ভারতীয় ঐক্যতানের বৈচিত্র্যে আলাউদ্দিন খাঁ, তিমিরবরণ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর বা আলি আকবরের মত কয়েকজন মুষ্টিমেয় শিল্পী ছাড়া কেউ-ই বিশেষ কিছু করেন নি যেটুকুও বা করেছেন তা 'টাইম সার্ভিং'। মনে হয় খুব কম চিত্রেই আজ পর্য্যন্ত সঠিকভাবে আবহ-সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়েছে···যা হয়েছে তা ব্যভিচার—জনসাধারণের অজ্ঞতাও এর জন্য দায়ী বহু পরিমাণে।

১৪। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে হীরেন বসুর পরিচালনায় গৃহীত "কবি জয়দেব" ছবিতে আমি প্রথম প্লে-ব্যাকে গান করি। আজ পর্য্যন্ত যত ছবিতে প্লে-ব্যাকে গান গেয়েছি তার কয়েকটির নাম দিচ্ছি:

বাংলা ছবি 'এইতো জীবন', 'বন্দিতা', 'পাপের পথে', 'অভিযোগ', 'অভিযাত্রী', 'পথের দাবী', 'মন্দির', 'জয়যাত্রা', 'চন্দ্রশেখর', 'বসুমাতা', 'ধাত্রীদেবতা', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন', 'আশাবরী', 'চীনের পুতুল', 'নিবেদতা', 'মালঞ্চ' প্রভৃতি এবং 'কুরুক্ষেত্র', 'রামানুজ', তপস্যা,' চন্দ্রশেখর' 'কাজরী', 'এ্যারেবিয়ান নাইট্‌স', কাশ্মীর হামারা হ্যায়', 'আমিরী', ফুলওয়ারী', 'বিজয় যাত্রা' প্রভৃতি হিন্দী ছবিতে।

দ্বিজেন চৌধুরী

১। ১৯১২ সালে সিরাজগঞ্জে আমার জন্ম হয়।

২। পাঁচমিশালী আবহাওয়ার মধ্যেই আমি মানুষ।

ভারতীয় চিত্রজগতে নবাগতা ও সৌভাগ্যশালিনী অভিনেত্রী
অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

হিন্দী চিত্রজগতের চিত্তহারিণী
চিত্রনটী নার্গিস

আমার বাবা কান্তকবি রজনীকান্তর গান খুব ভাল গাইতেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর গান শুনতাম এবং আপনা থেকেই শেখা হয়ে যেত। মনে পড়ে খুব ছোট-বেলায় মা-র কাছে একটা গান শিখেছিলাম 'সম্মুখে রাজা মেঘ করে খেলা'—এ গানটি কার রচনা তা জানিনা তবে খুবই গাইতাম। যখন আমার বছর পনেরো বয়স তখন একবার বরিশালে গিয়েছিলাম। একটি বন্ধু আমাকে নদীর ধারে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে শুনলাম আমারই সমবয়সী একটি ছেলে গান গাইছে। অপূর্ব লেগেছিল তার গান। পরবর্তী জীবনে সেই ছেলেটিই চলচ্চিত্র-জগতের বিখ্যাত সংগীত পরিচালক অনিল বিশ্বাস নামে পরিচিত হয়েছেন, বরাবরই গান-বাজনার দিকে আমার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল কিন্তু নিয়মিত চর্চা করার সুযোগ হয়নি নানা কারণে।

৩। ভবানীপুর সাউথ সুবার্বান স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে সেন্টজেভিয়ার্সে ভর্তি হই। তখন আমি কাঁসারিপাড়ায় থাকতাম। সেখানে একজন 'বারোয়ারী' পিসেমশাই ছিলেন। ভদ্রলোক তবলা বাজাতে খুব ভাল

বাসতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কেউই তাঁর সংগে গাইতে রাজী হতনা। কিন্তু আমি গাইতাম, কারণ তিনি খুব খাওয়াতেন। খাওয়ার লোভে গাইলেও আমার একটা উপকার হয়েছিল—তাল-জ্ঞানটা পাকা হয়ে গিয়েছিল গোড়া থেকেই।

৪। ১৯৩২ সালের কথা—তখন আমি সেণ্ট-জেভিয়াসে ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। একদিন ক্লাসে পড়াবার

দ্বিজেন চৌধুরী

সময় একজন অধ্যাপক বললেন,—আমাদের কলেজ থেকে স্পোর্টস্‌, ডিবেট ইত্যাদি সব বিভাগেই ছাত্রেরা যোগ দেয়, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত 'ইণ্টার কলেজিয়েট মিউজিক কম্পিটিশানে' কোন ছাত্রই যোগ দেয়নি। কথাটা শোনার পরেই ঠিক করলাম সেই সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগ দেবো। ভয়ে ভয়ে অধ্যাপক মশাইকে জানালাম [illegible] [illegible]। কথাটা জানাজানি হতে দেরী লাগলো না। এবং শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেল যে, আমি গান-বাজনার চর্চাও করে থাকি—ব্যাপারটা যেন অবিশ্বাস্য! যাই হোক বুক ঠুকে না হোক কপাল ঠুকে লেগে গেলাম। কম্পিটিসনে গাইলাম আধুনিক ও বাউল। আধুনিকে প্রথম ও বাউলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম। মনে পড়ে ৺উমাপদ ভট্টাচার্য্য মশাই আমাকে কম্পিটিসনে গাইবার জন্য শিখিয়েছিলেন নজরুলের একটি বিখ্যাত গান 'কত আর এ মন্দির দ্বার হে প্রিয়'।

৫। ১৯৩৩ সালে বি, এস, সি পাশ করার পর গান-বাজনার দিকে বিশেষভাবে ঝোঁক দিলাম। ৺উমাপদবাবু আমাকে নিয়ে গেলেন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে রেকর্ড করার জন্য। কিন্তু সুবিধা হ'লনা। সেনোলাতেও নিয়ে গেলেন। সেখানেও একই অবস্থা—মুস্‌ড়ে পড়লাম। হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে গেল অনুপম ঘটকের সংগে।

৬। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার প্রথম রেকর্ড 'তোমার আমার মাঝখানে' বাজারে বেরোলো হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী থেকে, অনুপম ঘটকের পরিচালনায়। অনুপমবাবুর কাছে আমি এজন্য অত্যন্ত ঋণী। বছরখানেকের মধ্যেই আমি বেতারে যোগদান করার সুযোগ পাই। আমার দ্বিতীয় রেকর্ড 'আজি এ মাধবী রাতে' পাইওনিয়ার রেকর্ড কোম্পানী থেকে—হিমাংশু দত্ত সুরসাগর সুরযোজনা করেছিলেন গানটিতে—এই রেকর্ডের 'অলখ চামেলী' গানটি রচনা করেছিলেন শৈলেন রায়—আমি নিজেই সুর তৈরী ক'রে গেয়েছিলাম। এ গানটিই আমার সবচেয়ে প্রিয় গান, তবে জনপ্রিয়তা ও অর্থাগমের দিক থেকে কমল দাশগুপ্তের পরিচালনায় 'সহধর্ম্মিণী' ছবির গান 'জানিরে জানিরে মোর হৃদয় কারে চায়' সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ ক'রে।

৭। ৺হিমাংশু দত্তের পরিচালনায় শচীন দেব বর্ম্মণের কয়েকটি গান সে-সময় খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলার অধিকাংশ তরুণ শিল্পীই তখন শচীনদেবের গান ও

রাইচাঁদ বড়ালের

এম এল বি প্রোডাকসন্সের

ভুলের শেষে

ভারতী দেবী • কমল মিত্র

রেণুকা • প্রভা • অমর মল্লিক

কানু • তুলসী লাহিড়ী • নীতীশ

শ্যাম লাহা • বীরেন • হরিধন

অমর মল্লিক

রাইচাঁদ বড়াল

প্রাইমা ফিল্মস্ রিলিজ

আমার
বধূজীবনে
চেয়েছিলাম
নারীত্বের সম্মান,
সে কি আমার
ভুল—অপরাধ?
সে কি আমার স্পর্দ্ধা!
তারই জন্যে আজ
আমি বিতাড়িতা,
কেউ করেছে আমার
চরিত্রে সন্দেহ,
কেউ দিয়েছে 'চোর' অপবাদ
কেউ বা এসেছে তার
কামনা আগুনে আমাকে
ধ্বংস করতে—

*এক ভাগ্যহীনার জীবনে
বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত বেদনার
মর্ম্মন্তুদ কাহিনী.........*

রূপবাণী
ভারতী
অরুণা
ও সহরতলীর অন্যান্য
চিত্রগৃহে একযোগে

পূজাবকাশের
পরেই শুভমুক্তি

সুর-সাগরের সুর পছন্দ করতেন। আমিও বিশেষ ভক্ত ছিলাম এঁদের। আর আমার ভালো লাগতো ইন্দুবালার গান ও সায়গলের গাইবার ভঙ্গী। রবীন্দ্র-সংগীতের শিল্পীদের মধ্যে পঙ্কজবাবুই সবচেয়ে প্রিয়।

৮। রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের কথা ও সুরই আমার অত্যন্ত প্রিয়। এঁদের বাদ দিলে আধুনিক সুরকারদের মধ্যে হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের সুরই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে, কারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুরের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে তাঁর রচনায়। তাই তাঁর প্রত্যেকটি রচনাতেই নতুনত্ব পাওয়া যেত।

৯। গীতিকারদের মধ্যে ৺অজয় ভট্টাচার্য্যই আমার বিশেষ প্রিয়।

গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য্য, সুরকার হিমাংশু দত্ত এবং শিল্পী শচীনদেবের যোগাযোগে যে গানের সৃষ্টি হয়েছিল, ভবিষ্যতে তা আর হবে বলে মনে হয় না।

(১০) আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার যদি কোন মূল্য থাকে তাহ'লে এ কথাই বলবো যে বাংলা গানের বর্ত্তমান ধারা বদলানোর একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, এবং যদি না বর্ত্তমান শিল্পী, সুরকার ও গীতিকাররা এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন তাহলে বাংলার সংগীত-জগতে হিন্দী ছায়াচিত্রের গানই চলতে থাকবে ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

(১১) যদিও বর্ত্তমানে শিল্পী ও শিল্পের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়ে থাকে রেকর্ড বিক্রীর ওপর নজর রেখে, কিন্তু এর দ্বারা শিল্পী বা শিল্পের মান নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। আশার কথা এই যে দু'-একজন তরুণ সুরকার ও গীতিকার নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছেন আজকাল। কিন্তু তাঁদেরও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। অচিরেই তাঁদের সৃষ্টি একঘেয়ে বলে মনে হবে।

আরেকটা কথা এ-প্রসংগে বলতে চাই। আবহ-সংগীতও শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের অনুকরণ বা ঐক্যতানের নামান্তর হলে চলবে না। আলাউদ্দিন খাঁ বা সুরেন দাস সম্পূর্ণ ভারতীয় রাগ-রাগিণীর ওপর আবহ-সংগীত রচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় পদ্ধতিতে আবহ-সংগীত রচনা করা অসম্ভব নয়। অবশ্য আমাদের দেশের ছায়াচিত্রে এদিকে অল্পই দৃষ্টি দেওয়া হয়। বোম্বাই বর্ত্তমানে এ-বিষয়ে সজাগ হয়েছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুকরণ দোষে দুষ্ট।

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪০।৪২ সাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশের সংগীতের মান অত্যন্ত উঁচুতে উঠেছিল, কিন্তু আজ সেটা কোথায় নেমে গেছে ও কিভাবে সেটাকে উন্নত করা যায় সেদিকে বাংলার বর্ত্তমান শিল্পী, সুরকার ও গীতিকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১৪। এই সময় আমি প্রথম প্লে-ব্যাকে গান গাই চারু রায় পরিচালিত 'পথিক' চিত্রে—খুব সম্ভবতঃ ১৯৩৭ সালে। এর পর প্লে-ব্যাকে গেয়েছি আমি অনেক ছবিতে—তটিনীর বিচার, অমর গীতি, পাষাণ দেবতা, হিন্দুস্থান হামারা, কয়েদি, মাসুম, চৌরঙ্গী, পরিণীতা, রামানুজ, সহধর্ম্মিণী, মিলন, ছদ্মবেশ, অশোক, কালিদাস, দ্বন্দ্ব, কবীর, যোগাযোগ, গৃহলক্ষ্মী, বিরাজ বৌ, বনফুল, নীলাঙ্গুরীয় প্রভৃতি।

'পাষাণ দেবতা'র গানের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে, তখন খুব অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছি। হঠাৎ রাস্তায় দেখা অনুপম ঘটকের সংগে। তিনি আমাকে তখনই নিয়ে গেলেন 'পাষাণ দেবতা'র গান গাইবার জন্য। হঠাৎ অর্থাগমে যা উপকার হয়েছিল তা ভোলবার নয়।

রবীন্দ্র-সংগীতের প্রতি আমার বরাবরই আকর্ষণ ছিল। ১৯৪০ সালে পাইকপাড়ার রাজবাড়ীতে আমাকে নিয়ে যান অনাদি দস্তিদার মশাই। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সামনে 'এই তো ভাল লেগেছিল আলোর নাচন' গানটি গাইবার সৌভাগ্য আমার হয়। এ-দিনটির কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। অনাদিবাবুই আমাকে নিয়ে আসেন 'গীতবিতানে'। রবীন্দ্র-সংগীতের শিক্ষক হিসাবে আমি যোগদান করি। ইতিপূর্ব্বে 'সংগীত সম্মিলনীতে'ও আমি শিক্ষকতা করেছিলাম। এই সময়

অতুলপ্রসাদের এক নিকট আত্মীয়া শ্রীমতী আচার্য্যের উৎসাহে ও আনুকূল্যে অতুলপ্রসাদের গান শেখবার সৌভাগ্যও আমার হয়। বেতারের বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে উচ্চাঙ্গ-সংগীতও শিখতে আরম্ভ করি। পরবর্তী জীবনে আমি রবীন্দ্র-সংগীত ও অতুলপ্রসাদের গানই বিশেষভাবে গাইতে সুরু করি, সেই কারণে অনাদিবাবু ও শ্রীমতী আচার্য্যের কাছেও বিশেষভাবে ঋণী।

দীর্ঘদিন বাংলাদেশের সংগীত জগতের সংগে আমি জড়িত। ৺উমাপদ ভট্টাচার্য্য, অনুপম ঘটক, অনিল বিশ্বাস ও ৺হিমাংশু দত্তর উৎসাহ ও প্রেরণার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। আমার শিল্পীজীবনে এঁদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

সাবিত্রী ঘোষ

(১) আমার জন্ম হোয়েছে ঢাকায় ১৯২২ সালে।

সাবিত্রী ঘোষ

(২) আমার পিতা হলেন মালখানগড়ের শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর। আমি পিতার একমাত্র কন্যা। যদিও আমার জন্ম ঢাকায় কিন্তু শৈশবেই চলে আসি কলকাতায় এবং আমার বাল্যজীবন কাটে চেতলায়। খুব ছোটবেলা থেকেই আমি মা-র কাছে গান শিখতাম, তিনি বেশ ভাল গান জানতেন। আমার বয়স যখন সাড়ে চার বছর, অর্থাৎ ১৯২৬ সাল, তখন চেতলা স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে প্রথম জনসভায় আমি গান গাই। আমার গানের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়েছিলেন আমার জেঠ্তুত দাদা। ইনি ছোটবেলায় আমায় গান শেখায় খুব উৎসাহ দিতেন।

(৩) মা ছাড়া আমার প্রথম গানের শিক্ষক হলেন শ্রীশচীন বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর কাছে আমি প্রায় তিন বছর গান শিখেছিলাম। তারপর কয়েক বছর নিজে নিজেই গান শিখতাম বাড়ীতে।

(৪) ১৯৩২ সালে 'সঙ্গীত সঙ্ঘে' যোগদান ক'রে বিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে ক্লাসিক এবং বাংলা গান শিখতে আরম্ভ করি। আট মাস শেখার পর ঐ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রেডিও-প্রোগ্রামে প্রথম রেডিওতে রাগ-সঙ্গীত গাই এবং এর পর থেকে নিয়মিতভাবে 'সঙ্গীত সঙ্ঘের' রেডিও-অনুষ্ঠানে যোগদান করি। তখন আমি রেডিওতে রাগ-সঙ্গীত গাইতাম।

(৫) এরপর ইচ্ছা হলো গান "রেকর্ড" করবার। ১৯৩৪ সালে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে গেলাম রেকর্ড করবার জন্য। কিন্তু বাসনা ফলবতী হলো না। আমার গান শুনে অনুপম ঘটক বললেন—গলা অত্যন্ত কচি, রেকর্ড ভাল হবে না আর কিছুদিন যাক্। ফিরে এলাম ভগ্ন আশা নিয়ে। যাক্, কি আর করা যায়। নাই বা হলো রেকর্ড করা, ভাল করে গান শিখি তাহলেই হবে। নতুন আশা এবং উদ্দীপনা নিয়ে সুরু করলাম সঙ্গীত সাধনা। আমার এই সাধনায় অনুপ্রেরণা

দিতেন আমার মা এবং বাবা। ১৯৩৪ সালে সঙ্গীত সজ্যের প্রোগ্রাম ছাড়া রেডিওতে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রোগামে অংশ পেয়েছি।

(৬) ১৯৩৬ সালে প্রথম আমার গানের রেকর্ড হয়। হেম সোম মহাশয় এইচ, এম, ভি প্রতিষ্ঠানে আমার গানের রেকর্ড করান। গান দু'খানি ছিল—"নিশীথে চলে" এবং "বেদনাতে বিজড়িত গান"। গানের সুর দিয়েছিলেন স্বর্গত: হিমাংশু দত্ত সুরসাগর। দ্বিতীয় রেকর্ডটি হয় নজরুল-গীতিকা, এইচ এম ভি-তেই, সে-গানের কথা ছিল 'বিদেশী তরী এলো কোথা হতে'। কথা ও সুর কবি নজরুলের। ১৯৩৯ সালে বেলতলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি এবং ঐ বছরেই আমার বিবাহ হয়। এরপর কিছুদিন সঙ্গীতচর্চ্চা বন্ধ রাখতে হয় টাইফয়েড রোগের জন্যে। রোগমুক্তি হওয়ার পর আবার যথারীতি গান গাওয়া সুরু করি। এই সময় আমি ঢাকা বেতার কেন্দ্রে এবং কলকাতা কেন্দ্র থেকে গান গাইতাম। আমার শ্বশুরবাড়ী ঢাকায় ছিল, সেইজন্যে ঢাকায় থাকতে হোত, এবং ঢাকা কেন্দ্র থেকে গান করবার সুবিধা ছিল।

১৯৪১ সালে আমি হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে যোগদান করি। এখানে আমার প্রথম রেকর্ড হলো "চির বিরহী"—সুর দিয়েছিলেন জ্ঞান ঘোষ। এরপর যেসব রেকর্ড করি সেগুলি হচ্ছে—দুর্গা সেনের সুরযোজনায়—"আমার বসন্ত যে যায়" এবং আর একটি হিন্দী গান। কালিপদ সেনের সুরে—"এই কি আমার সময় হলো গো"। অনুপম ঘটকের সুরে—'বল আঁধার নিবিড়ে'। আমার নিজের দেওয়া সুরে একটি গানের রেকর্ড করি তার কথা হচ্ছে—"মোর সিঁথির সিমন্ত"। ১৯৪৬ সালে হীরেন বসুর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তাঁর দেওয়া কথা ও সুরে একটি রেকর্ড করি, তার কথা হচ্ছে—"ওগো মৌশুমী পাখী গো"। অনুপম ঘটকের সুরে বর্ত্তমানে জনপ্রিয় রেকর্ড "কাঙালের অশ্রুতে" ছাড়া আরও কয়েকখানি গানের রেকর্ড করেছি।

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ভাল করে শেখবার জন্যে ১৯৪৩ সালে সুখেন্দু গোস্বামী এবং গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছে গান শেখা সুরু করেছিলাম। ১৯৪৪ সালে আমি 'গীতশ্রী' উপাধি লাভ করি। এই সময় আমি 'সঙ্গীত ভারতী' এবং 'গীত বিতানে' যোগদান ক'রে গান শেখাতে আরম্ভ করি। আজও এখানে শিক্ষকতা করছি।

(৭) সুর শিল্পীদের মধ্যে আমার প্রিয় হলেন—শচীনদেব বর্ম্মণ, অনুপম ঘটক, দুর্গা সেন, স্বর্গতঃ সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী।

(৮) যে সমস্ত গীতিকারের রচনা আমার ভাল লেগেছে তাঁদের মধ্যে আছেন—স্বর্গতঃ অজয় ভট্টাচার্য্য, হীরেন বসু, শৈলেন রায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার প্রভৃতি।

আমার গান করা পেশা নয়, নেশা বলতে পারেন। অর্থাৎ গান আমার উপজীবিকা নয়, গান গেয়ে আমার জীবনধারণ করতে হয় না। সেইজন্যে গান নিয়ে আমি

ব্যবসাদারী করি না। গান আমার ভাল লাগে তাই গান গাই। শুধু ভাল লাগে বললে ভুল হবে, গান আমার জীবনের সঙ্গী, আমার চলার পথে এনে দেয় অনুপ্রেরণা। পথের কাঁটায় যখন পদতল হয় রক্তাক্ত, অন্তর যখন হয় বেদনার্ত্ত তখন একমাত্র গানই আমায় দেয় সান্ত্বনা, আমার ক্ষতে প্রলেপ। গান আমার সাধনার বস্তু। আজও আমি নিয়মিতভাবে অনুপম ঘটক মহাশয়ের কাছে সুরের সাধনা করি।

(১১) রেকর্ড কোম্পানীর শিল্পীর মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বলতে গেলে [illegible] যে—রেকর্ড কোম্পানীর যে [illegible] সব শিল্পীর বেলায় সমান এবং প্রযোজ্য, তার কোন তারতম্য নেই। রেকর্ড কোম্পানী ছায়াচিত্রের গানের জন্য রয়ালটি বা কমিশন দেন শতকরা পাঁচ টাকা আর অন্যান্য গানের জন্য (ছায়াছবির গান ছাড়া) দেন শতকরা সাড়ে সাত টাকা।

(১২) আমার কোন্ গানটি অথবা কোন্ রেকর্ডটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তা' বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে বলতে গেলে "আমার বসন্ত যে যায়" রেকর্ডটি এবং সাম্প্রতিক 'কাঙালের অশ্রুতে' রেকর্ডটি খুব জনসমাদর লাভ করেছে।

(১৪) আমি ছায়াচিত্রে প্রথম প্লে-ব্যাকে গান গেয়েছি ৺অজয় ভট্টাচার্য্য পরিচালিত "ছদ্মবেশী" ছবিতে। অজয় ভট্টাচার্য্য এবং শচীনদেব বর্ম্মণ-এর আগ্রহেই আমি "ছদ্মবেশী"তে প্লে-ব্যাকে যে গানটি গেয়েছিলাম তার কথা হলো—"আজিকে মধুবনে শ্যামল বধূ সনে"। সুর দিয়েছিলেন শচীনদেব বর্ম্মণ। আমি যে সমস্ত ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছি তার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য। "শ্রীতুলসীদাস", "বনঝারে"—সুর-সংযোজনা করেন অনুপম ঘটক। "মন্ত্রমুগ্ধ"—সুর দেন রাইচাঁদ বড়াল। "সঙ্কল্প"—সুর দুর্গা সেন। আমি প্লে-ব্যাক গান খুব বেশী করিনি। কারণ প্লে-ব্যাক করবার জন্যে কাউকে কোনদিন পেড়াপীড়ি অথবা খোশামোদ করিনি। যখন কোন সঙ্গীত-পরিচালক আমাকে প্লে-ব্যাক গান করতে ডেকেছেন তখনই সেখানে গান করেছি।

হিন্দী চিত্রজগতের একদার জনপ্রিয় তারকা
শ্রীমতী সুরাইয়া ঃ তাঁর অভিনীত অনেকগুলি
চিত্র বর্ত্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষায় আছে

ট এও ফিল্মস্ পরিবেশিত মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'মীমাংসা' চিত্রে
পিন মুখোপাধ্যায় ও প্রমীলা ত্রিবেদী

দিলীপকুমার রায়

১। ১৬ই বৈশাখ, ১৩২৪ (ইং ২৯শে এপ্রিল, ১৯০৭) সালে আমার জন্ম।

২। জন্মস্থান—ভাঙ্গাবাড়ী, পাবনা; দেশ ফরিদপুর। কান্তকবি শ্রীরজনীকান্ত সেনের দৌহিত্র। পিতা শ্রীসত্য রঞ্জন রায় রসায়নবিদ। দি কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ কোং লিঃ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

৩। সায়েন্স গ্রাজুয়েট। মিত্র ইন্সটিটিউসন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই এবং তারপর সেন্ট জেভিয়ার্স ও সিটি কলেজে অধ্যয়ন করি। পেশা—রাসায়নিক; আর নেশা—দেশ ভ্রমণ। সমস্তরকম খেলাধূলাতেই প্রগাঢ় অনুরাগ আছে। ছাত্রজীবনে ভাল খেলোয়াড় এবং ক্রীড়াবিদ ছিলাম।

৪। ছোটবেলায় মায়ের কাছে এবং দাদা শৈলেন্দ্র-নাথ সেন (জাপানী)-র কাছে সঙ্গীতের হাতেখড়ি হয়। শ্রীসুকৃতি সেনের কাছেই বিশেষভাবে শিক্ষাগ্রহণ করি। আমার সমস্ত খ্যাতির অন্তরালে আছে তাঁর শিক্ষা; এছাড়া কাজী নজরুল ইসলাম, ৺হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর), সমরেশ চৌধুরী, বীরেন ভট্টাচার্য্য, শৈলেশ দত্তগুপ্ত প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে আমি বহু গান এবং সঙ্গীতের টেকনিকের শিক্ষাগ্রহণ করেছি। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী।

৫। শ্রীসুকৃতি সেনের সহায়তায় সেনোলা রেকর্ড প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচয় হয়। তারপর অডিশন দিয়ে কর্তৃপক্ষকে খুশী করে আমি রেকর্ড করবার অধিকার লাভ করি।

৬। শ্রীসুকৃতি সেনের পরিচালনায় সর্ব্বপ্রথম রেকর্ড করি।

৭। শ্রীসুকৃতি সেন এবং ৺হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর)।

৮। ৺অজয় ভট্টাচার্য্য।

৯। সন্তোষ সেনগুপ্ত, সমরেশ চৌধুরী ও সুচিত্রা মিত্রকে।

১০। রেকর্ড শিল্পীদের সম্বন্ধে আমার সবচেয়ে বড় কথা এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজস্ব ষ্টাইল বা ভঙ্গী রচনা করেন না। গতানুগতিক ঢং এবং অনেক সময়েই অন্যকারো অনুকরণ প্রবৃত্তিই বেশী প্রকট হয়ে পড়ে। অবশ্য সুরের এবং বাণীর একঘেয়েমিও তার জন্য অনেকাংশেই দায়ী—তবু শিল্পীদের নিশ্চেষ্টতাও কম দায়ী নয়। দ্বিতীয়তঃ মাইক্রোফোনে গান শ্রুতিমধুর শোনানোর জন্য তাঁরা স্বাভাবিক স্বরকে এত মৃদু করে

দিলীপকুমার রায়

আনেন যে অনেকক্ষেত্রে তাঁদের গান বিনা মাইক্রোফোনে মাত্র দু' হাত দূর থেকেও শোনা যায় না, যার ফলে স্বরে ক্রমশঃই বিকৃতি দেখা দিচ্ছে।

১১। কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত একটি নির্দ্ধারিত পারিশ্রমিক শিল্পীদের জুটতো, সে রেকর্ড একখানাই বিক্রি হোক আর একলাখ। টাকা যে [illegible] তা বলাই বাহুল্য বিশেষ করে নতুন শিল্পীদের [illegible] জনপ্রিয় অভিজ্ঞ শিল্পীরা অবশ্য ইচ্ছা করলে শতকরা ৫ টাকা হারে রয়ালটি পেতে পারতেন, তবে আধুনালুপ্ত 'শিল্পী-সমিতির' হস্তক্ষেপে শিল্পীরা এখন ৭-১১২% হিসাবে রয়ালটি দাবী করতে পারেন সে শিল্পী নতুনই হোন ব' পুরনোই হোন।

সাধারণতঃ মিষ্টি গলা, সুরে এবং তালে গাইবার ক্ষমতা থাকা চাই। তবে শিল্পীর নিজস্ব ঢং বা সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তির বিশেষ প্রয়োজন হয়ে থাকে। রেকর্ডে কণ্ঠের শ্রুতিমধুরতা অবশ্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

১২। জনপ্রিয়তা ও আয় উভয়দিক থেকে "তোমায় আমায় দেখা হবে, অশ্রু নদীর তীরে" গানটিই আমার শ্রেষ্ঠ গান।

১৩। চলচ্চিত্রের কথা বলতে পারবো না। কারণ গত দু'বছরের মধ্যে কি দেশী কি বিদেশী কোন ফিল্ম দেখবার সৌভাগ্যই আমার হয় নি। রেকর্ড সম্পর্কে বক্তব্য এই যে—রেকর্ডে আবহ-সঙ্গীত তার স্থান পরিবর্ত্তন করেছে। আগে ছিল গানকে শ্রুতিমধুর করা আবহ-সঙ্গীতের কাজ। এখন আবহ-সঙ্গীতই বড়ো। আসল গানকে পাদপূরণ করে চলেছে। বোধ করি চলচ্চিত্রের প্রভাবেই এমনটি হয়েছে।

১৪। উল্লেখযোগ্য এমন কিছু প্লে-ব্যাক করিনি, কারণ আসলে আমি একজন বেতার ও রেকর্ড শিল্পী এবং এদের সংশ্লিষ্ট পরিবেশই থাকতে বেশী ভালবাসি, তবে বহু পূর্ব্বে দু' চারটি বাংলা ও হিন্দী ছবিতে প্লে-ব্যাকে গেয়েছি, তার মধ্যে—'নিমাই সন্ন্যাস', 'চান্দে-দি-কলি' উল্লেখযোগ্য। সুদূর অতীতে এন্-টির 'প্রতিবাদ' (বাংলা ও হিন্দী) ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছি।

শচীন গুপ্ত

১। ১৯২২ সালের মে মাসে দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে আমার জন্ম হয়।

২। আমার বাবা ডাঃ বিজয়কৃষ্ণ গুপ্ত ভবানীপুর অঞ্চলের একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। জনপ্রিয় অভিনয়-শিল্পী বিপিন গুপ্ত আমার আপন কাকা।

৩। পদ্মপুকুর ইন্‌ষ্টিটিউসন থেকেই আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। পরে অবশ্য লেখাপড়া বেশীদূর

করার সুযোগ ঘটে নি। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতের প্রতি আমার একটা ঝোঁক ছিল। তখন অবশ্য ভাবতেও পারি নি যে ভবিষ্যতে এটাই আমার পেশা হয়ে দাঁড়াবে।

৪। সঙ্গীতশাস্ত্রে আমার হাতে-খড়ি হয় পিতার কাছেই। তিনিই আমাকে প্রথমে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। পরে নগেন দত্ত ও ওস্তাদ ছোটে খাঁর কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখি। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শিখলেও প্রতি রবিবার বেতারে সঙ্গীত শিক্ষার আসরে পঙ্কজবাবু যেসমস্ত আধুনিক গান ও ভজন শেখাতেন তাও আমি শিখতাম। আধুনিক গান আমি কোনো সঙ্গীতজ্ঞের কাছে শিখিনি, নিজের চর্চ্চাতেই হয়েছে। আধুনিক গানে পঙ্কজবাবুকেই আমি 'সঙ্গীতগুরু' বলে মনে করি।

৫। সত্যি কথা বলতে কি, রেকর্ড-জগতে আসার জন্য আমি শিল্পী সত্য চৌধুরীর কাছে ঋণী। তিনিই আমাকে প্রথম রেকর্ড-জগতে নিয়ে আসেন। ১৯৪২ সালে হিজ মাষ্টার্স ভয়েস কোম্পানীতেই আমি প্রথম রেকর্ড করি।

৬। আমার প্রথম রেকর্ড হোল গোপেন মল্লিকের সুরযোজনায় 'তুমি কি উঠেছো চাঁদ' গানটি। এটি রচনা করেন প্রণব রায়।

৭। সুরকারদের মধ্যে যাঁদের সুর আমাকে মুগ্ধ করে তাঁরা হলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, নৌসদ, রবীন চট্টোপাধ্যায়, অনুপম ঘটক ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

৮। গীতিকারদের মধ্যে আমার প্রিয় হলেন—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, শ্যামল গুপ্ত ও শৈলেন রায়।

৯। সমসাময়িক রেকর্ড-শিল্পীদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, উৎপলা সেন ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে আমার ভালো লাগে।

১০। রেকর্ড-শিল্পীদের সম্বন্ধে কিছু না বললে অন্যায় হবে। রেকর্ড-শিল্পীদের মূল্য ছেঁড়া কাগজের মত। সমস্ত অন্যায়-অবিচার নিরুপায় হয়েই তাঁদের সহ্য করতে হয়।

১১। রেকর্ড কর্তৃপক্ষ শিল্পীর মূল্য নির্দ্ধারণ করেন তাঁদের প্রাপ্তিযোগের অঙ্কের কথা বিবেচনা ক'রে। সেখানে সঙ্গীতশিল্প বা কণ্ঠমাধুর্য্য বা কৃতিত্ব নিতান্ত গৌণ। দৈবক্রমে বা ঘটনাচক্রে শিল্পীর রেকর্ড যে কোনও কারণেই হোক বেশী বিক্রী হলেই তিনি সবচেয়ে গুণী শিল্পী তাঁদের চোখে। কাজেই শিল্পীর গুণপনা ওঠে পড়ে। তাঁর বাজার দরের ওঠাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে। ব্যবসা ছাড়া কোম্পানী আর কিছুই বোঝেন না।

১২। আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রেকর্ড কোনটি তা' শ্রোতারাই বলতে পারেন। তবে আয় এবং জনপ্রিয়তা উভয়

দিক থেকেই 'সারা রাত জলে সন্ধ্যা প্রদীপ' গানটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

১৪। আমার প্রথম প্লে-ব্যাক হলো ১৯৪৬ সালে জনপ্রিয় সঙ্গীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'পরভৃতিকা' কথাচিত্রে। এ ছাড়া আজ পর্য্যন্ত আমি যে সমস্ত চিত্রে প্লে-ব্যাক করেছি তার তালিকায় আছে—শৃঙ্খল, এ যুগের মেয়ে, বাঁকা লেখা, যুগদেবতা, অভিমান, দিগভ্রান্ত, মালা (হিন্দী), আজাদীকে বাদ (হিন্দী), ২৫শে জুলাই (হিন্দী), পণ্ডিতমশাই, নষ্টনীড়, বসু পরিবার, তুলসীদাস, অনন্যা, আলাদীন ও আশ্চর্য্য প্রদীপ, দিগন্তের ডাক, প্রতিবাদ, স্বপ্ন ও সমাধি, সাত নম্বর কয়েদী প্রভৃতি।

ভারতী বসু

[ভারতী বসুর উত্তর আমরা অত্যন্ত বিলম্বে পেয়েছি। কাজেই আমরা তাঁর বিরুদ্ধে নিরুত্তরতার যে অভিযোগ গোড়ায় করেছি তা' এখানে প্রত্যাহৃত হচ্ছে]

১। আমার জন্ম ১৯২০ সালের ১৩ই অক্টোবর।

২। আমার পিতার নাম ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ মজুমদার। আমার জ্যেঠামহাশয় শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। ইনি কলিকাতা রেডিওর প্রথমদিকে প্রোগ্রাম-ডাইরেক্টর ছিলেন এবং একজন নামকরা ক্ল্যারিওনেট-বাদক। ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশানে পাঠকালে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়।

৪। সত্যিকারের গুরু আমি কাউকেই বলতে পারি না। আমার জ্যাঠামহাশয় রেডিওতে থাকায় তখনকার দিনের সব সঙ্গীত-পরিচালকই আমাদের মির্জ্জাপুরের বাড়ীতে আসতেন। তাঁদের সকলের কাছেই আমি গান শিখেছি। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন শৈলেশ দত্তগুপ্ত, পঙ্কজবাবু ও রাইবাবু।

৫। আমাদের বাড়ীর সকলেরই গানের প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। গান আমাদের স্বভাবের অঙ্গ ছিল। আমার যখন আট বছর বয়স তখন আমি প্রথম রেডিওতে গান গাই। আমার যখন তেরো বছর বয়স তখন আমি তৎকালীন বিখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষালয় 'বাসন্তী বিদ্যা বীথি'তে ভর্তি হই। সেই সময় থেকেই আমি সঙ্গীত-জগতে পরিচিত হই। ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালে 'নাহার' ও ভুপেন বোসের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কীর্ত্তন, ভজন, ভাটিয়ালি ও বাংলা গানে প্রথম হই। ক্লাসিকাল গান আমার বিশেষ ভালো লাগে না। সেজন্য কিছুদিন বাদেই ক্লাসিকাল গান ছেড়ে দিই। কীর্ত্তনই আমার সব থেকে ভালো লাগে। রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমি প্রথম কীর্ত্তন গান শিক্ষা করি। বিবাহের পর কিছুকাল গান বন্ধ রাখি। পরে ১৯৪৩ সালে বোম্বাই যাওয়ার পর পুনরায় এই লাইনে আসি।

৬। শৈলেশ দত্তগুপ্তর তত্ত্বাবধানে গান রেকর্ড করার ব্যবস্থা হ'লে আমি প্রথম কলম্বিয়ায় চারখানি ভাটিয়ালি ও কীর্ত্তন গান রেকর্ড করি। এই সময়ে আমার বয়স দশ থেকে এগারোর মধ্যে। প্রধানতঃ আমার জ্যেঠামহাশয়ের উৎসাহেই আমি রেকর্ড ও রেডিও-জগতে আসি।

৭। পঙ্কজবাবুকে সুরকার হিসাবে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।

৮। শৈলেন রায়কে গীতিকার হিসাবে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।

৯। সমসাময়িক রেকর্ড শিল্পীদের মধ্যে হেমন্ত

এমেচার ফটোগ্রাফী :

আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক পড়িবে ঢাকা

ফটো : গৌরবরণ ভট্টাচার্য্য

মুখোপাধ্যায় ও সুপ্রভা সরকারকে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।

১০। কল্যাণী মজুমদার, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, গায়ত্রী বোস, সুচিত্রা মিত্র, সুপ্রীতি ঘোষ—এঁদের গানও আমার খুব ভালো লাগে।

১১। শিল্পীর মূল্য নির্দ্ধারণে রেকর্ড কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোনো মানদণ্ড নেই। শিল্পী ইচ্ছানুযায়ী 'রয়াল্টী' অথবা 'ফ্ল্যাট পেমেন্ট' গ্রহণ করতে পারেন।

১২। আমার 'বাস্তুহারা' গানটি জনপ্রিয়তার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ গান। 'অভিনয় নয়' কথাচিত্রের 'অভিনয় নয়' গানটি আয় ও জনপ্রিয়তা উভয় দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ।

১৪। বোম্বাই থাকাকালে আমি প্রথম প্লে-ব্যাক করি বাংলা 'বিচার' ছবিতে। "রূপোর খাটে ঘুমিয়ে ছিলাম", ও "চম্পাবতী" এই দুইখানি আমার প্রথম প্লে-ব্যাকের গান। তার পর থেকে আমি বহু ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছি : (১) বিচার, (২) পরায়া ধন, (৩) সরাফৎ, (৪) ইন্‌কার (৫) কাদম্বরী, (৬) কালিদাস (৭) মীনা, (৮) লেডী ডক্টর, (৯) অভিনয় নয়, (১০) বিশ বছর আগে, (১১) তিলোত্তমা, (১২) রক্তের টান, (১৩) ১০৯ ধারা, (১৪) শ্যামলের স্বপ্ন, (১৫) রূপকথা, (১৬) কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে, (১৭) এ যুগের মেয়ে, (১৮) মহাসম্পদ, (১৯) সহসা, (২০) হানা-বাড়ী, (২১) কৃষ্ণকান্তের উইল, (২২) মাকড়সার জাল, (২৩) তরুণের স্বপ্ন, (২৪) সতী অহল্যা, (২[illegible]) আবু-হোসেন, (২৬) মহারাজা নন্দকুমার, (২৭) [illegible] (২৮) পঞ্চায়েৎ, (২৯) সহযাত্রী, (৩০) সাধারণ মেয়ে, (৩[illegible]) [illegible] জগন্নাথ (উড়িয়া), (৩২) অভিযোগ, (৩৩) সাহসি[illegible] ও আরও অনেক ছবিতে প্লে-ব্যাক করেছি।

ছবির প্রচার ★ ★ ★

● ● ● ভবানী রায়

সাধারণ বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাকে আমরা ইংরাজীতে বলে থাকি 'কমার্সিয়াল এ্যাডভারটাইজিং'—আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও অনেকখানি পিছিয়ে আছেন। বিনা প্রতিবাদেই একথা মেনে নেওয়া যেতে পারে। সিনেমার ক্ষেত্রে একথা আরও ভয়াবহভাবে সত্য। যেদেশে পণ্যদ্রব্য-নির্মাতারা এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা এখনও বিজ্ঞাপনের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে আদৌ সচেতন নন, সে দেশের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা যে এর মূল্য একেবারেই অস্বীকার করবেন, সে বিষয়ে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অথচ আর পাঁচটা পণ্যদ্রব্যের (ইংরাজীতে যাকে আমরা বলে থাকি consumers goods) মতো চলচ্চিত্রও ঠিক একটি পণ্যদ্রব্য এবং চাহিদা ও সরবরাহের প্রাথমিক নিয়মের দ্বারা চলচ্চিত্রের চাহিদা ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পণ্যদ্রব্য অনেক সময় পাইকারীভাবে বিক্রী হয়ে থাকে, কিন্তু ছবির ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কাজেই চলচ্চিত্রে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা কিম্বা এর যথাযথ মূল্যকে স্বীকার না করা মানেই চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ দিককে উপেক্ষা করা। আজকের দিনে আমাদের দেশে এই শিল্পটি যে-স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে একদিকে রয়েছে যেমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে দর্শকরুচিতে আবেদন সৃষ্টি করার অপরিহার্যতা এবং সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত প্রচার-ব্যবস্থা ভিন্ন চলচ্চিত্রকে জনপ্রিয় করে তোলার আর কোনো উপায় নেই। ছবির জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করা মানেই এর চাহিদা বৃদ্ধি করে দেওয়া।

যে-দেশে সাধারণ কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপনই সবে মাত্র তার শৈশবের অপরিণত অবস্থা অতিক্রম করে কিছু ষ্ট্যাণ্ডার্ড [illegible] করেছে সেদেশে সিনেমার বিজ্ঞাপন যে [illegible] ও অবজ্ঞাত হবে তাতে আমি খুব বিস্ময় বোধ [illegible] আমার বিস্ময়ের কারণ সেইখানেই যেখানে দেখি চিত্র-ব্যবসায়ীগণ এই প্রয়োজনীয় বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে একেবারে উদাসীন থাকেন। তাঁদের এই ঔদাসীন্যকে আমি criminal negligence বলতে পারি এবং এরকম কঠিন কথা বলার হেতু এই যে তাঁরা যদি গোড়া থেকে সিনেমার বিজ্ঞাপনের প্রকৃত গুরুত্বকে অবহেলা না করতেন তাহলে ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পটির বিজ্ঞাপনের দিকটা আরও উজ্জ্বল ও সার্থক হতে পারতো। এর মধ্যে অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়, তবে সে ব্যতিক্রম এমনই স্বল্প এবং তার পরিকল্পনার ক্ষেত্র এমনই সংকীর্ণ যে সর্বভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রগতিতে তার প্রতিক্রিয়া আমরা খুব সামান্যই উপলব্ধি করতে পারি। অথচ তাঁরা এ কথাটা ভুলে যান যে যদি বিজ্ঞাপনের দিকটা, প্রচারের দিকটা ঠিকমতো গড়ে উঠতে পারতো তাহলে হয়তো ভারতীয় চিত্রের জন্য বিদেশেও চাহিদা সৃষ্টি করা যেতে পারতো এবং লাভ ও মর্যাদার দিক থেকে সেটা বড় কম কথা নয়। ভারতের ছবি ভারতের বাইরে প্রদর্শিত হবার পক্ষে অন্যান্য বাধার মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা তো এই-খানেই—এই বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থা ও প্রচার-নীতির সংকীর্ণতার মধ্যে। কোনো ভারতীয় প্রযোজকই আজ পর্যন্ত সিনেমার বিজ্ঞাপনকে যথার্থ বিজ্ঞাপন হিসেবে দেখতে চাইলেন না। খণ্ডিত ভারতে ভারতীয় চিত্রের প্রদর্শন তো সীমাবদ্ধ। এমন অবস্থায় ব্রহ্মদেশ, সিংহল, দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনের যে সুযোগ রয়েছে তাকে আরও কার্যকরী করে তুলতে পারে একমাত্র সুপরিকল্পিত প্রচার ব্যবস্থা। প্রদর্শনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে তুলতে না পারলে, ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতি সুদূরপরাহত। হলিউডের দৃষ্টান্তকে আমাদের চোখের সামনে রেখে, সিনেমার বিজ্ঞাপনের এই দিকটা সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করবার দিন আজ এসেছে বলেই আমার মনে হয়।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রচারবিজ্ঞানের অমোঘ শক্তি সর্বত্র স্বীকৃত। দৈনন্দিন জীবনের এমন একটি ক্ষেত্র নেই যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞাপন তার কাজ না করে চলেছে। বিভিন্ন শিল্পের জয়রথ ছুটে চলেছে এই

বিজ্ঞাপনকেই সারথী করে—এ কথা আজ আর আমাদের প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। একদেশের পণ্য অন্য দেশের বাজার দখল করেছে একমাত্র বিজ্ঞাপনের দৌলতেই। এককথায়, বিজ্ঞাপন ভিন্ন আজকের দিনের পৃথিবী অচল, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অচল। কাজেই প্রচার-বিজ্ঞান আজ আর অবহেলার জিনিষ নয়, বাজে খরচ বলে অবজ্ঞাত হবার বিষয় নয়—আজকের দিনের বিজ্ঞাপন এককথায় ইনভেস্টমেন্ট, ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেণ্ট বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রচার-বিজ্ঞানের নানাদিক আছে এবং বর্তমানে তা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছে। যেমন পণ্য-দ্রব্য উৎপাদনের রীতি-নীতির পরিবর্তন ঘটছে, পণ্যদ্রব্য ব্যবহারের রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটছে, তেমনি পরিবর্তন ঘটছে বিজ্ঞাপনের ধারায়, এর ষ্টাইলে ও টেকনিকে। বর্তমানের মানুষের জীবনে যদি কোনো বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে, তবে তা হলো বিজ্ঞাপন। আজকের দিনের মানুষের প্রতিদিনের গতিবিধি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এর দ্বারা — এমনি অমোঘ অথচ অদৃশ্য শক্তিশালী এই প্রচার-বিজ্ঞান।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপনের এই রূপটির সঙ্গে পরিচিত হয়েও একে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। সাধারণ বিজ্ঞাপনদাতাদের কথা আমার আলোচনার বিষয় নয় — সিনেমার বিজ্ঞাপনের কথাই আমার বক্তব্য। এখনকার দিনে আমরা দেখতে পাই যে চিত্র-প্রযোজকরা চিত্র নির্ম্মাণে এত বেশী খরচ করে বসেন যে একটা ছবি থেকে কি পরিমাণ লাভ হবেসেটা জানবার আগেই এই খরচের বোঝা গিয়ে পড়ে চিত্র-পরিবেশকদের ঘাড়ে।

এই অবস্থায় চিত্র-পরিবেশকের সামনে এ[illegible] পথই খোলা থাকে—সে পথ ব্যাপকতম প্রদ[illegible] পথ। এবং এর জন্যে দরকার বৃহত্তম প্রদর্শনের ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্র সকল ছবির পক্ষে হয়ত সুলভ নয়—কিন্তু

চিত্রভারতীর প্রথম নিবেদন 'ভোর হ'য়ে এলো' ছবিতে মধ্যবিত্ত সংসারের লাঞ্ছনাময় জীবন-নাট্যের হৃদয়াবেদনময় রূপায়নে অতি ভট্টাচার্য্য ও প্রণতি ঘোষ

সুপরিকল্পিত প্রচারকার্য্যের সহায়তায় তার অনেকটাই যে সহজলভ্য হতে পারে—একথা পরিবেশকরা যতদিন না ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারছেন, ততদিন প্রযোজকের দায় পরিবেশককে বহন করতেই হবে এবং তার ফল কি দাঁড়াতে পারে, চলচ্চিত্রের বর্তমান দুরবস্থাই তার সাক্ষ্য বহন করছে। ব্যাপকতম ক্ষেত্রে চিত্রের পরিপূর্ণ প্রদর্শন সম্ভব একমাত্র সুষ্ঠু বিজ্ঞাপনের সাহায্যে। এখন এই বিজ্ঞাপনের এই নূতন ধারাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করার মানে ব্যবসার প্রসারকে নষ্ট করে দেওয়া। ছবির নিজস্ব দোষ-গুণ থাকবেই—যেমন সব পণ্যদ্রব্যেরই থাকে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সেই ছবির দোষগুণ কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে—কি উপায়ে ছবিকে দর্শকচিত্তে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দেওয়া যেতে পারে—সেটার ওপরই নির্ভর করছে আজকের দিনের চলচ্চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ। অনেক প্রযোজকের একটা ভুল ধারণা আছে এই যে ছবির বিজ্ঞাপন গতানুগতিকতাবর্জিত হবে না—একই ধাঁচে চলবে। কিন্তু সব ছবির বিষয়বস্তু যেমন এক রকমের নয়, তেমনি সব ছবির বিজ্ঞাপনও একধাঁচের হতে পারেনা এবং হওয়া উচিতও নয়। একই শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমরা লক্ষ্য করি, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করি তাদের বিজ্ঞাপনের ধারার মধ্যে। ছবির বেলাতেও এই নীতি সর্বাংশে প্রযোজ্য।

আসল কথা ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখেই ছায়াছবির প্রচার-ব্যবস্থা সম্পর্কিত নীতি আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং প্রত্যেকটি ছবির বিজ্ঞাপনের ধারাকে উন্নততর করতে হলে সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে একে দাঁড় করাতে হবে। তা নইলে বর্তমানে যে ধারার ছবির বিজ্ঞাপন চলেছে, এই ধারা যদি আর কিছুকাল চলে, তবে ছবির বাজারে ছবির ক্রেতা অর্থাৎ উৎসাহী দর্শক ভবিষ্যতে খুব যে সুলভলভ্য হবে না, এ কথা আমি জোরের সঙ্গেই বলতে পারি। ভারতীয় ছবির মান উন্নত হয়েছে, কিন্তু তার প্রচার ব্যবস্থার মান উন্নত হওয়া দূরে থাক—স্ট্যাণ্ডার্ড বলে কোনও জিনিষই নেই।

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলবার আছে। ছবিকে যখন বলা হয় চলচ্চিত্র অর্থাৎ motion picture তখন বুঝতে হবে এ জিনিষটা অত্যন্ত গতিশীল এবং যে জিনিস গতিধর্মী, তার প্রচার-ব্যবস্থাও গতিধর্মী অথাৎ dynamic হওয়া উচিত। কিন্তু প্রভাতী সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠাব্যাপী সিনেমা-বিজ্ঞাপনগুলি এমনই static মনে হয় যে, দর্শকচিত্তে সেসব প্রচুর ব্যয়বহুল বিজ্ঞাপন না পারে কৌতূহলের সৃষ্টি করতে, না পারে আবেদন জাগাতে। ফলে, বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, এই দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন হয়েই, বর্তমানে সিনেমা বিজ্ঞাপনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন যে একান্ত আবশ্যক, সেকথা আমরা যতশীঘ্র বুঝতে পারি, এই শিল্পের পক্ষে ততই মঙ্গল। চিত্র-নির্মাতারা যে পরিমাণ অর্থ শিল্পীদের জন্য ব্যয় করে থাকেন, সেই অনুপাতে তাঁরা ছবির বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন। শুধু কুণ্ঠিতই নন গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে, প্রচার-বিজ্ঞানের আধুনিক টেকনিকে বিজ্ঞাপন করা সম্পর্কে তাঁরা আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করেন না। অথচ পুরাতন ধারা বর্জন করে নূতন ধারায় ছবির বিজ্ঞাপন করতে পারলে যে লাভ বই লোকসান হয় না, তারও দৃষ্টান্ত দু'-একটি ছবির বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। কাজেই চলচ্চিত্রকে আরও অর্থকরীভাবে সফল করে তুলতে হলে, এর প্রচারের দিকটাকে আরও সবল করে তুলতে হবে।

চতুরঙ্গ

চিত্রজগতের রূপসজ্জার বাইরে বিচিত্র বেশে ও ভঙ্গীতে
বাংলা চিত্রজগতের নবীনা নটীর দল ঃ

নীলিমা দাশ, মঞ্জু দে,
অনুভা গুপ্তা ও দীপ্তি রায়

ফটো : ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারি

দীপ পিকচার্সের প্রাথমিক চিত্র নিবেদন 'প্রতীক্ষা'য়
মতী সিপ্রা দেবী

মার্লিন ডিয়েট্রিক

(১১২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জার্মানী আর আমেরিকা—দু'টি যেন বিভিন্ন জগৎ—দু'টি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। শান্ত সমাহিত জীবনে অভ্যস্ত মার্লিন সহসা ছিটকে এসে পড়ে তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে। তবু তারই ভেতরে বাইরের কলকোলাহিত জগতের বেষ্টন এড়িয়ে ওর শিল্পী-মন রচনা করে সুন্দর একটি পরিবেশের নিভৃতি।

হলিউডে মার্লিনের প্রথম ছবি—'মরক্কো', গ্যারী-কুপারের সঙ্গে, স্টার্নবার্গের পরিচালনায়। আবার গুরু-শিষ্য সম্মেলন। অদ্ভুত দ্রুতির মাঝে কাজ এগিয়ে চলে। অতুল অধ্যবসায় আর চরম পরিশ্রমের ভারে মুক্ত দিন-গুলো। তবু কিন্তু ভালো লাগে মার্লিনের, ভালো লাগে সকাল থেকে রাত অবধি একটানা কাজের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে। আজ তার জীবনের পরম পরীক্ষা। নতুন জগৎ আর অনাপন পারিপার্শ্বিকে সফল ক'রে তুলতে হবে তার শিল্প-সৃষ্টি, অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে গুরুর মহিমা।

আর ও শুধু অক্ষুণ্ণই রাখে না বহুগুণ বর্দ্ধিত ক'রে তোলে পূর্ব্ব-গৌরব, 'মরক্কো'-র মার্লিন আমেরিকার শোণিত কণিকায় জাগায় এক অপূর্ব্ব স্পন্দন। একটি ছবিতে গোটা দেশখানা মুখর হোয়ে ওঠে মার্লিনের স্তুতিতে। আর সে স্তুতি আর প্রশংসার ক্রমবর্দ্ধমান ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে চলে ওর জীবনের শিল্প-সৃষ্টি সার্থকতার তীর্থে—'ডিজঅনার্ড', 'ডিজায়ার', 'ডেষ্ট্রি রাইডস্ এগেন'—চিত্রের সোপানে সোপানে উন্নিতির উচ্চতম শিখরে ওঠে ওর খ্যাতি। অয়ন পরিক্রমায় প্রতিভার সমুজ্জ্বল সূর্য এসে দাঁড়ায় মধ্য গগনে······

মার্লিন! মার্লিন! মার্লিন! সরব গুঞ্জনে ব্যতিব্যস্ত মার্লিন। অনুপরমাণুর মত সংখ্যাহীন গুণ-গ্রাহী ভক্তের ভীড়ে উদ্‌ভ্রান্ত মার্লিন। ভোজ আর পার্টি, নিমন্ত্রণ আর আলাপনের আতিশয্যে রুদ্ধশ্বাস মার্লিন। ও যেন হাঁপিয়ে ওঠে ব্যবহারিক জগতের অজস্র ঝামেলায়। দীর্ঘশ্বাসে আকুল হোয়ে ওঠে ওর শান্তিস্পৃহ গৃহগত প্রাণ সম্মুখ জীবনের এই সৌজন্যরক্ষার বিড়ম্বনায়। অমিতাচার ওর কাছে ঘৃণ্য পরিমিতির মাঝে মনের বিভূতিকেই ও পছন্দ করে—আর এইখানেই ও সাধারণ শিল্পী থেকে ভিন্ন। মার্লিনের বহিরাবরণটাই উর্ব্বশী, অন্তরে ও সাবিত্রী। বহু পুরুষের সংস্পর্শে ও এসেছে, অসংখ্য জনের আসরে ওর কেটেছে বহু রোমাঞ্চক রাত্রি—আজও তবু ওর স্বামীর অনুরক্তি অনুপম। আজও ওর মনের মুকুরে সীবায়ের

কোথায় আনন্দ ! ★ ★ ★

● ● ● ফণীন্দ্র পাল

শ্রাবণের বর্ষণোন্মুখ আকাশ যেন আমার ঘরের জানালার ওপর এসে ঝুঁকে পড়েছে। রাত্রি ক্রমশঃই গভীরতর হয়ে চলেছে।

কত কি যে ভাবছি, হাতে কলম নিয়ে। কলম এক একবার ঝুঁকে পড়ছে কাগজের ওপর, এই বুঝি আমার চিন্তার সূত্র ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে কথার ফোয়ারা ছুটবে কাগজের ওপর! কিন্তু হা হতোস্মি! কোথায় তলিয়ে গেল আমার চিন্তার সূত্র! গত তিন দিন তিন রাত্রি এমনি করেই হাতে কলম নিয়ে কেটে গেছে সময়। বিষয় থেকে বিষয়ে এলোমেলোভাবে ছুটে বেড়িয়েছে মন। বাঙলা সিনেমার কত সমস্যা পোষাকী সাজে সেজে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। 'বাংলা ছবি ও লোকশিক্ষা', 'সিনেমা ও রাষ্ট্র' 'শিল্পী ও শিল্প', 'জনসাধারণ ও আমাদের ছবি' 'বাঙলা ছবির ভবিষ্যৎ'—এমনি সব কত চিন্তা-ভাবনা কাগজের ওপর গুরু গাম্ভীর্য্যে রচিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু মনের দুয়ারে যারা ভীড় করে এসে দাঁড়াল, কলমের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবার আহ্বানে তাদের কাছে থেকে পেলাম না সাড়া। গত তিন রাত্রি এমনি করেই শ্রাবণের কয়েকটি রাত্রির নিদ্রা আমার কে যেন অপহরণ করে নিল। শেষ শ্রাবণের বর্ষণের শব্দে কি যেন এক ব্যাকুলতা, যেন বিংশ শতাব্দীর সকল বিজ্ঞান সকল কাব্যের গতি ছন্দে অভিশাপের কশাঘাত অস্পষ্ট গুঞ্জনে মর্ম্মরিত হয়ে উঠছে।

একটানা সুখের সন্ধান কখনও আমরা পাইনি, অন্নবস্ত্রেরও আরও হরেক রকম অভাব অনটনের সম্মুখে নিত্য স্বচ্ছলতার সান্ত্বনা দিয়ে আশা ও আনন্দে কেউ আমাদের ব্যতিয়ে ভুলতে পারেনি, সংগ্রাম ও আতঙ্কে জর্জ্জরিত হয়ে থেকেছে আমাদের প্রতিদিনের জীবন, অপব্যয় অসংযমে [illegible] বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে আমাদের জীবন [illegible]র প্রতিটি তরঙ্গ তবু এতদিন কঠোর নিষেধ-বাধায় [illegible] নির্ব্বাপিত ঘরের অন্ধকারে বসে সুদূর নক্ষত্রের দিকে চেয়ে দেখেছি আলোর স্বপ্ন, পরাধীনতার শৃঙ্খলশব্দে বাজিয়েছি বিপ্লবের গান—সেদিন তো শেষ শ্রাবণ রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে থেমে যায়নি আমার লেখনী।

কোন্ অভিশাপে পঙ্গু হয়ে গেল আমার লেখনী, কোন্ শূন্য হ'তে এলোমেলো হাওয়া এসে রুদ্ধ করে দিচ্ছে আমার চিন্তা ভাবনার দুয়ার।

হে কমলদলবিহারিণী তুমিই কি আমার কোন অপরাধে ফিরিয়ে নিলে তোমারই দেওয়া শক্তি! না কোন অলক্ষ্য শত্রু রামায়ণ মহাভারত বর্ণিত কোন সম্মোহন-আয়ুধ প্রয়োগ করে অপহরণ করে নিল আমার অতিরিক্ত এই চেতনা!

সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি নানা সমস্যার নগ্ন সঙ্গীনগুলি আমাদের বিদ্ধ করতে এগিয়ে আসছে, কিন্তু প্রতিরোধ করবার চেতনা আমরা হারিয়েছি, প্রতিবাদের ভাষা আমাদের মূক হয়ে গেছে, আলোচনা করবার উৎসাহ পর্য্যন্ত নেই। কেন এই জড়তা, কে ডেকে আনল এই অভিশাপ!

আমার দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দে অন্ধকারের মধ্যেও কার অস্বস্তির সচকিত ভাব আমাকে চমকিত করে তুলল। এই গভীর রাত্রে আমার একা জাগরণের সঙ্গী হ'তে কে আবার এল! কোথায় ছিল সে এতক্ষণ আত্মগোপন করে? সে কি অশরীরী! এমন সময়ে অকস্মাৎ মেঘের ফুটো সামিয়ানার ফাঁক দিয়ে চাঁদের এক টুকরো স্তিমিত আলো ঠিকরে পড়ল আমার ঘরে। সেই সামান্য আলোয় চিনেছি আমার অসামান্য সঙ্গীটিকে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে উপলব্ধি করেছি আমাদের এই বিরাট ব্যর্থতার পিছনের পরিচালকটিকে। আমার নীরব ঘরশত্রুটির বিস্তৃত পরিচয় আপনাদের কাছে দিতেই হবে। আমাদের দেশের লোক সে, বহুরূপী সেজে কখনও মাড়োয়ারী, কখনও মাদ্রাজী, কখনও বাঙ্গালীর সমাজে সে ঘুরে বেড়ায়। আরও অনেক জাতির রূপসজ্জায় বহুবার তার দেখা পেয়েছি জীবনে।

বাইরের শত্রু যখন আমাদের ক্ষতি করে ফাঁকি দেয় তখন প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠা যতখানি সহজ, ঘরের শত্রু

আমাদের বঞ্চিত করলে আমরা ততখানি নিরুপায় হয়ে পড়ি। এই ঘরশত্রুর দলই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিদিনের জীবন থেকে প্রতিদিনকেই কেড়ে নিয়েছে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজন হয় স্বপ্নরচনার উপলক্ষ্য, চাই অনাগত ভবিষ্যতের আশাময় ইসারা, সংগ্রাম-ক্ষত মনের জন্য মাঝে মাঝে সান্ত্বনার প্রলেপ আর আনন্দ আনে প্রাণবন্যা। সে আনন্দ আজ কোথায়!

যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী বাঙ্গলা দেশের সিনেমা-শিল্পকে বাঁচায়, হতাশার অন্ধকারে তারা মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছে। আজ আনন্দ কেনবার মত সঙ্গতি নেই তাদের। তাই দেখতে পাই দোকানী সাজিয়ে রেখেছে নব নব সম্ভার কিন্তু খরিদ্দার নেই, জুয়াড়ীর নেশা ফিকে হয়ে আসছে দিনের পর দিন।

চিত্রভারতীর নির্ম্মীয়মান 'ভোর হ'য়ে এলো' চিত্রের আর একটি প্রণয়সিক্ত দৃশ্যে অভি ভট্টাচার্য্য ও প্রণতি ঘোষ

দীপালোক সজ্জিত হোটেল ও ক্লাবে সুরার বোতলগুলি ছিপিবদ্ধ অবস্থায় গুমরে গুমরে উঠছে, সুরাপাত্রগুলি শুকনো ঠোঁট নিয়ে বসে বসে ভাবছে কোথায় গেল অসংযমীর দল। ঘরে ঘরে কি হঠাৎ বেড়ে গেল কৃপণের সংখ্যা, বেদনা ও ক্লান্তি কি পৃথিবীর রাজ্য থেকে নিল বিদায়। অপব্যয়ের দীক্ষা পেয়েছে যারা, অসংযমের উপবীত ধারণ করেছে যারা, তারা ঋণ করতে ভয় পায়না—তারা এতদিন সমস্ত মাসের মাহিনা এক শনিবারেই রেসের মাঠে রেখে এসেছে, অম্লানবদনে বাড়ী দিয়েছে বন্ধক, সম্পত্তি তুলেছে নীলামে, স্ত্রীর অলঙ্কার করেছে বিক্রয়, কাবলিওলা'র কাছে হ্যাণ্ডনোট কেটে চড়া সুদে করছে ধার। যে মহাজনদের কাছে এই বিপুল সম্পত্তি ও অর্থ গিয়ে জমা পড়ছে তারা যক্ষের মত সতর্ক হয়ে উঠেছে। সেই যক্ষের দলের জন্য এইদেশেই, তারাই আমাদের ঘরশত্রু। তারা প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনগুলি নিয়ে এমন ব্ল্যাকমার্কেটি ফাঁদ পেতেছে যার ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত আজ একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছে।

জুয়া খেলে বা ব্যসন ও বিলাসে এই বিরাট মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ হারায়নি তাদের সহজ জীবন নির্বাহনের রসদ—তবে আজ তাদের জীবনে অভাব-অনটনের প্রচণ্ড ধাক্কা এসে লাগছে কেন? যুদ্ধে শোনা যায় নাকি সকলের উপার্জ্জনের পরিমাণ চতুর্গুণ

হয়ে গিয়েছিল। সেই inflation-এর সময়ে মাথাপিছু প্রতি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে যে বেশী অর্থ এসে পৌঁছেছিল, সে সময়ে জিনিষপত্রের দুর্মূল্যতায় সে অর্থ সেদিনই খরচ হয়ে গেছে, সাধারণ মধ্যবিত্তসমাজ যুদ্ধের বাজারে সঞ্চয় করতে পারেনি বরং সেই বাজারেই সৃষ্টি হয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজকে শোষণ করবার জন্যে নতুন ধরণের ফাঁদ—ব্ল্যাক-মার্কেট।

দেশের শ্রমিকদের জন্যে দেশে ও বিদেশে অনেক সহানুভূতিশীল ও সংগ্রামমুখর ব্যক্তি ও সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছে, ধনীদের কোন বন্ধুর প্রয়োজন হয়না—অর্থই তাদের বন্ধু কিন্তু মধ্যবিত্তের ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জন্য কারও কি এতটুকু মাথাব্যথা আছে ?

আমাদের দেশের যারা শ্রমিক তাদের শ্রমিক রূপে গড়ে তুলতে তাদের ওপর কোনরকম investment নেই। কিন্তু মধ্যবিত্তসমাজে জন্মালে কিছুটা লেখা-পড়া শেখাতেই হয়। তাদের ছেলেদের উপার্জ্জনক্ষম করে তুলতে জনপিছু স্কুল-কলেজের মাহিনা, স্পোর্টসের চাঁদা, জামা-কাপড়-জুতো, ট্রাম-বাস ভাড়া, পরীক্ষার ফিজ্, বই-খাতা-পেন্সিলে প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়। তার পর সেই ছেলে মাসে ষাট টাকার চাকরীও জোটাতে পারেনা। যদি বলেন ব্যবসা করেনা কেন, তাহলে কথা ওঠে মূলধনের। আর সবাই ব্যবসা করতে গেলে পৃথিবীর অন্যান্য লেখাপড়ার কাজগুলো করে কে ? সুতরাং এমনি-ভাবে সংসার ও জীবনসমস্যার চাপে পড়ে মধ্যবিত্তদের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে আসছে। এতদিন তারা মনে করেছিল পরাধীন দেশে তাদের জীবনের এই বিড়ম্বনা ঘুচবেনা। স্বাধীনতা নিশ্চয় তাদের কাছে আনবে নতুন আশা। কিন্তু সেই সম্ভাবনার আলো আজ তাদের চোখের সামনে থেকে নিভে গেছে। তার ওপর ব্ল্যাক-মার্কেটের ফাঁদে এখনও মানুষ অল্পবিস্তর শোষিত হয়ে চলেছে।

এরপরে আছে বাঙলাদেশের জীবনে কঠিনতম সমস্যা, [illegible]নের প্রা ৬৮

নির্ব্বাপিত জ্বরের

আজকের স্বাধীন রাষ্ট্র, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মাঝখানে ক্রমশঃ ম্রিয়মান মধ্যবিত্ত সমাজের মনে আনন্দ কোথায়, আনন্দ কেনবার শক্তি কোথায় !

কেউ কেউ নাক উঁচু করে বলেন, বাঙলা ছবি আবার ছবি। যেমন ছবি তেমনি তার বিক্রী হবে তো ! এঁদের জবাব আমরা বিদেশী প্রতিনিধি যাঁরা গত ফিল্ম ফেষ্টি-ভেলে এসেছিলেন তাঁদের মুখ দিয়ে দিয়েছি। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তোলায় হিন্দী ছবি আমাদের দুলক্ষ টাকায় তোলা হিন্দী ছবির কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। আমাদের তোলা 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'রত্নদীপ', 'কার পাপে', 'জিঘাংসা', '৪২', মাইকেল মধুসূদন', 'হানাবাড়ী', 'মেজ-দিদি', 'বাবলা', 'বরযাত্রী', 'পারবর্ত্তনের' মধ্য দিয়ে ছায়াছবি দেখার আনন্দে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছি। তবু কি বাঙলা ছবিকে দূরছাই করবেন !

তবু বাঙলা ছবির ব্যবসায়ের সামনে একটি বৃহৎ হতাশার বিভীষিকা দুলছে। তার জন্যে বাঙলা ছবির প্রযোজকদের দায়ী করা চলে না। দেখবেন মধ্যবিত্ত মানুষের মনে যেদিন আবার আনন্দ ফিরে আসবে, সেদিন বাঙলা ছবির ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হবে। একথা সুনিশ্চিত, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের মুখে হাসি না ফোটাতে পারলে, দেশের স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে।

সংগ্রাম ছাড়া পৃথিবীতে কিছু পাওয়া যায় না। আজ মধ্যবিত্তসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে তাদের নিতান্ত বাস্তব জীবনের কাহিনী শোনাতে ছায়াছবির মাধ্যমে। ইতিহাসের না-দেখা কাহিনী বই পড়ে জানবো, ছবিতে দেখতে চাইনা ; কোন্ মহাপুরুষ কবে কোনকালে মানব-সমাজের কি কল্যাণ করেছিলেন কি তাঁর জনৈক কোন দেবতা বা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল সে-কাহিনীর ছবি আজ নিতান্তই অবান্তর, কোন্ আন্দোলনে আমরা কি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম করেছিলাম কি হবে তা আর একবার করে ছবিতে দেখবার। আমাদের আজকের জীবনের সমস্যা সকল সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যা কিনা তা ছবি তুলে জানবার ও জানাবার চেষ্টা করার দিন এসেছে।

কমলাকান্তের প্রত্যাবর্ত্তন

সম্পাদক মহাশয়,

একদা ১২৯২ সালে আপনাকে শেষ পত্র লিখিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না, আমার আপনার সঙ্গে বনিল না! আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি এ বাঁশী বাজে? বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে। আবার বাজো দেখি—হৃদয়ের বংশী!

হায়, বাঁশী, তোমার দিন গিয়াছে। আর তোমার বাজিয়া কাজ নাই—ভাঙ্গা বাঁশে মোটা আওয়াজে আর কুকুর-রাগিণী ভাঁজিয়া কাজ নাই। আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

তাই তো বলিতেছি, তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন শারদীয় 'চিত্রবাণী' প্রকাশের কর্ম্মব্যস্ততার সময় শ্রাবণের ধারায় সম্পাদকের মস্তিষ্ক-চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে বিজ্ঞাপন-সংগ্রাহকেরা কাক ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালী ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? সেইজন্যই তো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সাহেব শ্যামল তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া নীরব বিস্ময়ে তাকাইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়েন—Shall I call thee bird! হায় কোকিল, তুমি bird নহ, তুমি bard মাত্র!

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নসীবাবু নাই—অহিফেনের অনটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না, তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। মিল্ক-পাউডার ও সলিল সংযোগে অহিফেনের নেশা আর জমে না।

তবু লাইনে দাঁড়াইয়া আমি তো আফিঙ্গ কিনিয়াছি। খোরাকি বাবদ আপনি যে অর্থ দিয়াছিলেন, তাহার সবটুকু দিয়াই তো আফিঙ্গ কিনিয়াছি। শুধু কিনি নাই, বহুদিনের নেশার জোয়ারে আসিয়া সে আফিঙ্গ একসঙ্গে সেবন করিয়া বুঁদ হইয়াছি।

কিন্তু পূজার সময় কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল। আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম! আমাকে কেন আফিঙ্গ সেবন করাইয়া ফিল্ম-লাইনের দুয়ারে পৌছাইয়া দিলেন? এ কুহকে কেন ঠেলিয়া দিলেন? কেন? কেন?

আপনি তো জানেন, বিগত শতাব্দীতে অহিফেন সেবন করিয়া বিড়ালাদির সহিত বাক্যালাপ চালাইয়াছি, কখনও বেচাল হই নাই; কোকিলকে কোকিল বলিয়াই জানিয়াছি, ভেলায় চড়িয়া অনন্ত কালস্রোতের সহিত সবেগে ভাসিয়া গিয়াও দুর্গ-প্রতিমাকে ঠিকই জানিতে পারিয়াছি। তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে সুবর্ণমণ্ডিতা, মৃন্ময়ী, মৃত্তিকারূপিণী, অনন্ত রত্নভূষিতা

সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমাকে চিনিয়াছি! কিন্তু আজ বিশ্বমাতৃকা 'লারেলাপ্পা' গাহিয়াও যখন 'দাঁও লাগাই'তে অনুরোধ করেন, তখন তো তাঁহাকে চিনিতে পারি না। মা, মা, মাগো, চামুণ্ডে! কমলাকান্তকে তুমি একি করিলে? মাগো একবার স্বরূপ প্রকাশ করো!

হ্যাঁ মা, তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। তুমি মাগো ফিল্ম লাইনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দশভূজা প্রসারিত করিয়া তুমিই দেখাইয়া দিতেছ, ফাঁকি মারিবার দশদিক উজ্জ্বল-করা পথ; তোমার ডানদিকে তোমার কন্যা কুন্দেন্দু, তুষার হার, শ্বেতপদ্মাসনা, শুভ্রবসনাবৃতা বাগদেবী, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী—তিনি জানাইতেছেন এই জগতে বিদ্যার কোনও দাম নাই: তোমার বামপার্শ্বে লক্ষ্মীর ঝাঁপি হস্তে নবীন ধানের মঞ্জরী লইয়া সর্ব্ব-আরাধ্যা লক্ষ্মী—তিনি অর্থই অনর্থ জানাইতেছেন। সিদ্ধিদাতা গণেশ হস্তীমুখশোভিত হইয়া প্রকাশ করিতেছেন 'যেথায় হস্তীমুণ্ড সেখানেই সিদ্ধি', আর কার্ত্তিক জানাইতেছেন—আজ চিত্রশিল্পে কার্ত্তিক (চট্টোপাধ্যায়)-ই বিজয়ী! চারিদিকে অসুর ও সিংহ, ইঁদুর ও ময়ূর।

মাগো! এ কেমন হইল? আজীবন অহিফেন সেবন করিয়াও তোমার একান্ত কমলাকান্ত যে অবস্থায় পৌঁছাইতে পারে নাই, এই কয়দিন ফিল্ম লাইনে থাকিয়া তাহার কেন এ অবস্থা হইল? ফিল্ম লাইনের নামেই নেশা কেন ঘোর হইয়া আসে, কেন অহিফেনের আর প্রয়োজন হয় না? এই কালান্তক ব্যাধি হইতে রক্ষা কেমনে লাভ করিব?

কি বলিলে মা? একটি সিনেমা-পত্রিকা প্রকাশ করিতে বলিতেছ? বলিতেছ সিনেমার পত্রিকা-সম্পাদনা, কিংবা নিদেন পক্ষে বিজ্ঞাপনের বিলের তাগাদায় ঘুরিলে আমার উপকার হইবে? মাগো, একি সত্য? এ যুগ কি এমন যে তোমার আরাধনা না করিয়া চিত্রতারকার আরাধনা করিলেই সমস্ত দুর্দ্দশা দুঃখের নিরসন হয়? মাগো, কবে তোমার এই সংসারের পরিবর্ত্তে কাঠামোর উপরে চিত্র-তারকাদের বসাইয়া অকাল বোধন সুরু হইবে? সে আর কতদূর?

কিন্তু কি যেন বলিতেছিলাম? আফিঙের মাত্রা একটু চড়াইলে কেন আমার মন হারাইয়া যায়? আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার "মনচোর" কাহাকেও পাইলাম না! তবে কে চুরি করিল?

বুঝিয়াছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই, নহিলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতেই মন বাঁধি নাই—এজন্য কিছুতেই মন নাই। তাই কি মা, তুমি একটি সিনেমা-পত্রিকা প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলে?

কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণ তো এই হারানো সূত্রটিকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছিলাম। বলিতেছিলাম, ফিলিম পত্রিকার সম্পাদক অথবা বিলের তাগাদাদার হইয়া বৎসর দুই টিঁকিতে পারিলে (টাঁসিয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশী) আমি তুরীয়ানন্দ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা, মান-অপমান সব জাহান্নমে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত মনে সম্পাদক অথবা বিলের তাগাদাদার হইয়া বসিতে পারিব।

আমিও ত ইহাই চাহিয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি চৌকাঠ পার হইয়া

ভাবিয়াছিলাম, বিদ্যাই যখন অর্জ্জন করিয়াছি তখন আর কেরাণীগিরি করিব না, সম্পাদক বনিব। কেরাণী হইলে সরকারী বইতে কবিতা লিখিতে পারিব না, আপিসের চিঠিপত্রের উপর স্বনামধন্য ফিলিম ষ্টারদের বচন তুলিয়া রাখিতে পারিব না, বিল-বহির পাতায় অনাদায়ী টাকার অঙ্ক লিখিয়া রাখিতে পারিব না। সম্পাদক হইলে এইসব করিতে পারিব। ফিলিম ষ্টারদের জীবনী লিপিবদ্ধ করা অপেক্ষা রোমাঞ্চকর কার্য্য আর পৃথিবীতে কি আছে? সম্পাদক হইবার দুর্ব্বুদ্ধি আমার মস্তিষ্কে কে প্রবেশ করাইয়াছিল, জানি না—কিন্তু ইহা যে সদ্ বুদ্ধি মাতৃ-আদেশের পরও তাহা প্রতীয়মান হইতেছে না। সম্পাদক অদ্যাবধি না হইয়াও সম্পাদকদের দেখিতেছি। দেখিয়া মনে হইতেছে মিথ্যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌবনের শ্রেষ্ঠ কাল অপচয় করিয়াছি। সাহিত্য, দর্শন, সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, মোপাসাঁ, শরৎচন্দ্রকে লইয়া বিনিদ্র রজনী যাপন না করিয়া যদি লোক ঠকাইতে শিখিতাম, তবে আজ আর অর্থ উপার্জ্জনের দুশ্চিন্তায় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হইত না, টিপ সহি দিয়া মাসান্তে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতাম!

নেশাটি কি বেশী হইয়াছে? নচেৎ পৃথিবীকে মাঝে মাঝে চতুষ্কোন মনে হইতেছে কেন? কেন মাঝে মাঝে পৃথিবীকে কমলালেবু মনে করিয়া খোসা ছাড়াইয়া খাইতে ইচ্ছা করিতেছে? স্মরণ হইয়াছে, শুধু তো অহিফেন সেবন করি নাই, অহিফেনের সহিত মৌতাত করিয়া গঞ্জিকা সেবনও যে করিয়াছি!

পাঠক-পাঠিকা! কোনদিন গঞ্জিকা সেবন করিয়াছ? বুঝিতেছি, পাঠিকা, তুমি তোমার দন্ত-কৌমুদী দ্বারা নিম্ন:-ধর চাপিয়া বৃথাই হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছ। সত্য কথা বলিতে কি আমিও ইহার পূর্ব্বে কোনওদিন গঞ্জিকা সেবন বা ভক্ষণ করি নাই।

কিন্তু আজই বা কেন এই দুষ্কার্য্য করিতে গেলাম? কেন এই দুর্ম্মতি হইল? সহসা মনে পড়িল আমি আজ সন্ধ্যাবেলায় 'পল্লীসমাজ' ছবিটি দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়াছি রমার ভূমিকায় সিন্ধের কালো পাড়ের

শাড়ী-পারহিতা সুনন্দা দেবীর অঙ্গুলীতে স্বর্ণাঙ্গুরীয়ের আলোকের ঝলকানি। পাঠক! আমিই কি পাগল? দেখিলাম নির্বীর্য্য বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায় মিনমিনে রমেশকে! আহা! তাহার লাঠিখেলা দেখিয়াই তো পাগল হইয়া গেলাম!

বলি নাই, লাঠি, তোমার দিন গিয়াছে? হায়, লাঠি, বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে তোমার যখন হামানদিস্তার ডাঁটির মত নিগ্রহ হইয়াছিল, তখন কি তোমার পোড়া চক্ষুতে জল আসে নাই? তখনই যে কি হইল বুঝিতে পারিলাম না! মনে হইল আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছি—সুধীর

বন্দ্যোপাধ্যায় যেন রমা সাজিয়াছেন, জহর গঙ্গোপাধ্যায় জ্যাঠাইমা, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় বেণী ঘোষাল, রঞ্জিত—রঞ্জিত, হ্যাঁ রঞ্জিত রায় সাজিয়াছেন যতীন, রমেশ সাজিয়াছেন মলিনা দেবী, যিনি অনেক দেবীর মহিমায় নিজেকে দাসী মনে করিতেই গর্ব্ব অনুভব করেন, রাজলক্ষ্মী সাজিয়াছেন গোবিন্দ গাঙ্গুলী—এইরূপ সব তালগোল পাকাইতে লাগিল !

বাহির হইয়া আসিলাম ! হায় শরৎচন্দ্র, তুমি কি মরিয়াছ ? তোমার রমেশ কি তারকেশ্বরে রমার পিছু ছুটিয়া গিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল : তুমি এখানে ? শরৎচন্দ্র ! তুমি কি কোনদিন তোমার 'পল্লীসমাজ' পড়িয়াছ, না সজনীকান্তের উপর ভাল করিয়া পড়িবার ভার অর্পণ করিয়া নীরবে সরিয়া দাঁড়াইয়াছ ?

চলিতে চলিতে গাঁজার দোকানের সম্মুখে কখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি জানি না। আ-মস্তক ভরিয়া গঞ্জিকা সেবন করিলাম। এইবার সব স্পষ্ট হইল ! মনে হইল আমি যেন এক দীপ্তিময় পরিচালক। এক অভিনেত্রী-প্রযোজিকা আমাকে তাঁহার ছবি করিতে দিয়াছেন। আমি তাঁহাকে এমন ডুবাইয়াছি যে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে তিনি আমাকে তাঁহার গজদন্ত প্রহারে জর্জ্জর করিয়া সকলের সম্মুখে এমন অপদস্থ করলেন যে লজ্জায় ইট-কাঠ পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। অভিমানে আমি এরূপ কয়টি ছবি তুলিলাম যে নিজেই পটল তুলিবার দাখিল। সেই অভিনেত্রী-প্রযোজিকা আরও কয়জন পরিচালকের নিকট ভাল ছবি পাইয়া আবার আমার নিকট ছুটিয়া আসিল। এবার শুধু আমি পরিচালক নই, সঙ্গীত পরিচালকও। একটি ছবি মুক্তিলাভ না করিতেই তাঁহার জন্য আর একটি ছবিও করিতেছি !

কিন্তু কেন এ কল্পনা? ফিলিম-লাইনে সন্ধান করিলে আমার মত অর্বাচীন পরিচালকের মত কি সত্য সত্যই নাই? অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে।

ঘুরিতে ঘুরিতে গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আকাশে দিকে তাকাইলাম। চন্দ্রমা তখন নীল আকাশে হেলান দিয়া তামাকু টানিতেছিল। আমাকে দেখিয়া লজ্জায় তামাকু সরাইয়া একবার হাসিল।

হাসিতে সমস্ত পৃথিবীতে আলো ছড়াইয়া পড়িল। মনে হইল চন্দ্র যেমন ফিলিমের একমাত্র গ্ল্যামার গার্ল, তারকারা সব সুপারের মতো চারিপাশে ঘিরিয়া নাচিতেছে।

চন্দ্র! তুমি হাসিও না। তোমার ভালগার হাসিতে সেন্সর বোর্ড আপত্তি জানাইতে পারে। মেঘের অঞ্চলে তোমার সেক্স-আপীল হাসি ঢাকিয়া ফেল! নীল আকাশের দিকে তাকাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

মধুর স্বপ্ন। ভূত ভবিষ্যৎ একাকার হইয়া গিয়াছে, দুই অমর দত্ত 'এক হইয়া দন্তহীন অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করিতেছেন, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস নব রূপে নতুন খেলা দেখাইতেছেন এবং তাজ্জব বনিয়া বিকাশ রায় প্রণতি ঘোষের কানে কানে কি বলিতেছেন, নার্গিস হঠাৎ রাজকাপুরকে চিনিতে পারিতেছেন না, অশোককুমার নলিনী জয়ন্তের হাতে ভি, ডি (Virendra Desai) দেখিয়া আৎকাইয়া উঠিতেছেন এবং দূর হইতে কার পাপে ঘোষ (K. P.Ghosh) তাহা দেখিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, গ্রেগরী পেক সুরাইয়াকে মদত করিতে ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে সুরাইয়া এবং পরে নানীকে দেখিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, শরৎচন্দ্র সুনন্দা-কাননকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সুনন্দাকে 'চরিত্রহীনে' সাবিত্রী এবং কাননকে 'বিপ্রদাসে' বন্দনা হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন এবং ইহারা নিজ নিজ বয়স বিবেচনা করিয়া তাহা করিতে অসম্মত হইতেছেন। মনে হইল এরূপ মধুর স্বপ্ন বুঝি দেখিনাই, দেখিব না। হঠাৎ দুইটি

এ্যামেচার ফটোগ্রাফী :

আমায় কে নিবি গো কিনে! ফটো: প্রবোধকুমার সেন

বিজাতীয় মূর্ত্তি আমার সন্নিকটস্থ হইতেছে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম। ইঁহাদের কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই ইহাদের মধ্যে একজন রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিলেন: তুমি ফিলিম লাইনের লোক? চমকাইয়া উঠিয়া ভাবিতেছিলাম অস্বীকার করিব কিনা, প্রশ্ন কর্ত্তা আবার খেঁকাইয়া উঠিলেন। বুঝিলাম ভীত হইলে অবস্থার অবনতি হইবে অতএব সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলাম: আপনাদের তো ঠিক চিনিতে পারিলাম না।

'কিন্তু আমি তোমাকে চিনি, তুমি বহুরাত অনর্থক নষ্ট করিয়া আমার পুস্তক পাঠ করিয়া মিথ্যা ভাবিয়াছ যে যথেষ্ট বিদ্যা সঞ্চয় করিয়াছ। কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক। আমার নাম সেক্সপীয়র এবং ইহার নাম হ্যামলেট। জিজ্ঞাসা করি তোমরা হঠাৎ আমাদের পেছনে লাগিলে কেন?'

জিজ্ঞাসু নেত্রে সেক্সপীয়রের পানে তাকাতেই তিনি বলিলেন: তোমাদের কিশোর সাহু হ্যামলেটের কী জানেন'যে তাহাকে 'খুনে না হক্' করিবে বলিয়া শাসাইতেছে?

বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলাম: আমরা যদি রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে 'খুনে না হক্' করিতে পারি তবে সেক্সপীয়রকে করিতে পারিব না কেন?

'তোমরা ভারতীয়, তোমরা সব করিতে পার। আমরা হইলে তোমাদের রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে কখনই 'খুনে না হক' করিতাম না বিবেচনা করিয়া দেখ তোমাদের মনীষীদের আমরাই সম্মান দিয়া জগতের সাথে পরিচয় করাইয়াছি। তোমরা কেন আমাদের সম্মান করিবে না? তোমাদের কিশোর সাহু, যাঁহার 'স্বপ্না' দেখিয়া তোমরাই তাজ্জব বনিয়া গিয়াছ, সে কেন 'হ্যাম্‌লট' করিবার স্পর্দ্ধা রাখে? ইহার দিকে তাকাইয়া দেখ, কিশোর সাহু কী ইহার চরিত্র সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে?

হ্যামলেটের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, বিগত যৌবন, কেশহীন কিশোর সাহু এবং তাহার স্বপ্নার কথাও ছিল। অতএব হঠাৎ জবাব দিতে পারিলাম না। আমাদের অগতির গতি আমার সহায় হইলেন যিনি কিশোর সাহুকে আচার্য্য বানাইয়াছেন শাস্তারামকে বুদ্ধ বানাইবার তালে আছেন, সেই 'ফিলিম ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক বাবুরাও প্যাটেলের ঠিকানা এক টুকরা কাগজে লিখিয়া সেক্সপীয়রের হাতে দিয়া, বোম্বে মেলের সময়, ভাড়া ইত্যাদি বাৎলাইয়া এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

সেক্সপীয়র মিলাইল তবু স্বপ্ন টুটিল না।

অনুগত, স্বগতঃ এবং বিগত
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

চিত্রবাণী প্রেস—৫, হাজরা লেন, কলিকাতা: ২৯ (ফোন: সাউথ ১১১১) হইতে নিতাই চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং চিত্রবাণী কার্য্যালয় হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত

শারদীয়া চিত্রবাণী

১৩৬০

সম্পাদনা ও পরিচালনায় : গৌর চট্টোপাধ্যায় এম এ

সম্পাদনায় সহযোগী : লালচাঁদ দত্ত
কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-সজ্জায় : রামকৃষ্ণ দত্ত ও সনৎ ভট্টাচার্য্য

কর্ম্মাধ্যক্ষ ও বিজ্ঞাপন-সচিব : নিতাই চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপনে সহকারিতায় : গৌরবরণ ভট্টাচার্য্য

আলোকচিত্রগ্রহণে : কে এ রেজা ও নির্ম্মল মল্লিক

সূচীপত্র

আশ্বিন, ১৩৬০

সম্পাদকীয়— ৭

চিত্রতারকার কথা ও কাহিনী—
অশোককুমার ৯

একটি ছবির জন্ম—
সিডনী চ্যাপলিন ১৫

উপসংহার (পূর্ণাঙ্গ নাটক)—
প্রকাশ গুপ্ত ২১

সুরশিল্পী রাইচাঁদ—
লালচাঁদ দত্ত ৬৫

পেশাদার রঙ্গালয়ের রঙ্গ—
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ৭৩

ভারতীয় নাটমঞ্চ—
দিলীপকুমার মিত্র ৭৮

হিন্দী ছায়াছবির নতুন মুখ— ৮২

নৃত্যশিল্পী রামগোপাল—
মনোজিৎ বসু ৮৫

ধুরন্ধরের চিঠি— ৮৯

ঐতিহাসিক চিত্র—
বিপিনবিহারী রায় ৯৫

যবনিকার অন্তরালে—
তরুণ রায় ৯৭

কাণ্ডি নাচের দেশে—
সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৫

ভারতের সঙ্গীত-সাধক—
রত্নবণিক ১১১

ছবির গল্প আর গল্পের ছবি—
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১২৫

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র— ১২৯

উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের কথা—
স্মৃতি চক্রবর্ত্তী ১৩৫

অদৃশ্য নাট্যশালা—
বাণীকুমার ১৪০

তানসেন—
গীতিরসিক ১৪৯

ছবির পাতায়

আর্ট প্লেটে: সুমিত্রা দেবী; মালা সিংহ; 'শেষের কবিতা' চিত্রে সাধনা বসু; অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়; নিগার সুলতানা; বীণা রায়; স্মৃতিরেখা বিশ্বাস; 'শেষের কবিতা' চিত্রের একটি দৃশ্যে নবাগত নির্ম্মলকুমার ও দীপ্তি রায়; মীনাকুমারী; নলিনী জয়ন্ত; 'বিক্রমোর্ব্বশী' ছবিতে উৎপল দত্ত ও চন্দ্রা দেবী; 'শেষের কবিতা' চিত্রে নির্ম্মলকুমার, সাধনা বসু ও বনানী চৌধুরী; 'লেড়কী' চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা ও অঞ্জলি দেবী; 'লেড়কী' চিত্রের নায়িকা বৈজয়ন্তীমালা; 'নিষ্কৃতি' ছবিতে সন্ধ্যারাণী

সাধারণ পৃষ্ঠায়: 'অশোককুমার-পরিবার'; মীনাকুমারী; 'বুট পালিশ' ছবির বহির্দৃশ্যগ্রহণ কালীন দু'টি ছবি; সুমিত্রা দেবী; 'পিতা ও পুত্র'—চার্লি চ্যাপলিন ও সিডনী চ্যাপলিন; নার্গিস; 'মনের ময়ূর' ছবিতে চন্দ্রাবতী ও উত্তমকুমার; বৈজয়ন্তীমালা; নৃত্যশিল্পী রামগোপাল; কাণ্ডি নাচের দুটি ছবি; 'মহাপ্রভু চৈতন্য' ছবিতে ভারতভূষণ ও নবাগতা অমিতা; মাঃ অলক ভট্টাচার্য্য; 'আকাশবাণী' থেকে ঐক্যতান পরিচালনা করছেন ওস্তাদ রবিশঙ্কর; হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; স্বরোদ বাজনায় রত ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ; 'বড়ে লোক' ছবিতে অভী ভট্টাচার্য্য ও মধুবালা

প্রদীপ প্রোডাকশান্স

ছায়া-চিত্রে বাংলার গৌরব অভিযান

প্রদীপ প্রোডাকশান্সের শ্রদ্ধার্ঘ্য

রবীন্দ্রনাথের

শেষের কবিতা

পরিচালনা মধু বসু

চিত্রনাট্য

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও মধু বসু

পরিবেশক ★ প্রভা পিকচার্স

সুমিত্রা দেবী

বাংলা চিত্রজগতে নবাগতাদের অন্যতমা মালা সিংহ

অশোককুমার পরিবার : অশোক, তাঁর স্ত্রী শোভা, দুই কন্যা ভারতী ও রূপা এবং পুত্র অরুণ

চিত্রতারকার কথা ও কাহিনী

★ ★ ★ ★ অশোককুমার ★ ★ ★ ★

মানুষের মন বিচিত্র বিবর্ত্তনের স্তর পার হ'য়ে এসেছে। মানুষ তার পরিবেশের সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করতে শিখেছে অনেক আগে। সুন্দরের প্রতি তার আসক্তি বেড়েছে, সুন্দরের সাধনায় সে বিলিয়ে দেয় নিজেকে। তেমনই ধারা বিবর্ত্তনের স্তর পার হয়ে এসেছে চিত্র-তারকাদের জীবন। আজকের চিত্রশিল্পী আর গোটা-কয়েক বছর আগের চিত্রশিল্পী—কত প্রভেদ! এক একটি বছর গেছে—আর প্রতিটি বছরেই শিল্পী প্রত্যক্ষ করেছে অগ্রগতি। প্রতিটি বছরেই যেন মনে হয়েছে আগেকার বছরের চেয়ে সেই বছরটিই যেন আরও উন্নততর। এমনি ক'রেই সে আজ হয়ে উঠেছে এক-জন কৃতী শিল্পী।

বিভিন্ন ক্ষেত্রেই প্রগতি সম্ভব হয়েছে কিন্তু তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। আমাদের দেশে প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর নিজস্ব একটা ধারা মেনে চলেন, কিন্তু তাঁদের অভিনয়-মানের উন্নতির বিচার একটা বিষয় দিয়েই করা হয়। তা হলো এ দেশের শিল্পীরা কি পরিমাণে বিদেশী শিল্পীদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। রোনাল্ড কোলম্যানের অভিনয়ধারা যাঁদের ভালো লাগলো—তাঁরা কোলম্যানের অভিনয়-পদ্ধতিকে অনুসরণ

চিত্রে অশোককুমারের আজকের দিনের নায়িকা মীনাকুমারী : সম্প্রতি 'পরিণীতা' চিত্রে ইনি অশোককুমারের বিপরীতে আবেগময় অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন

করার চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেকে আবার নিজস্ব এক পদ্ধতি অনুযায়ী অভিনয় করার চেষ্টা করতে লাগলেন। বহুবার এমনও দেখা গেছে যে, ভারতীয়-চিত্রতারকার অভিনয়ের মান বিদেশী চিত্রতারকাদের উচ্চস্তরের অভিনয়ের পর্য্যায়েও পৌঁচেছে। এর ফলে স্বদেশে অন্যান্য অভিনয়-শিল্পীরা সেই অভিনয়ধারাকেই অনুসরণ করার সুযোগ পেলেন।

অতীত দিনের চিত্রতারকাদের অবশ্য আজকের মতো অতটা গ্ল্যামার বলতে ছিল না। তখনকার দিনে চিত্রশিল্পীদের অভিনয় ছিল যেন আরও দুর্দান্তপনায় ভর্ত্তি। মুখভঙ্গী ও ভাবপ্রকাশের ব্যাপার ছিল ভিন্ন ধরণের-সে-অভিনয়, ধারায় যেন ঝড়ের বেগ বয়ে যেতো। এই ধরণের অভিনয় যাঁরাই করতেন তাঁদেরই ভালো অভিনেতা ব'লে ধ'রে নেওয়া হতো। তিনি নিজের বিচারের মানদণ্ডে দর্শকদের যেন ভালই বুঝতেন আর ভাবতেন তিনি বেশ ভালো অভিনয়ই করছেন। আজকের বিচারে কিন্তু মোটেই তাকে ভালো অভিনয় বলা চলে না। এই ধরণের এক শিল্পীর নাম করা যেতে পারে—তিনি হলেন আব্দুল রেহমান কাবুলী তিনি ছিলেন একজন ভাল অভিনয়শিল্পী। তিনি সংলাপ বলতেন শুধু চেঁচিয়ে আর তাতেই দর্শকরা অভিভূত হয়ে পড়তেন। তখনকার দিনে ঐ ধরণের অভিনয়ধারার হয়তো প্রয়োজন ছিল কারণ তখন কলা-কৌশলগত কাজের সাহায্য তাঁরা পেতেন না যা আজকের দিনে বেশ সহজেই পাওয়া যায়। শব্দগ্রহণের কাজ তখন এতই বিশ্রী ছিল যে শিল্পীদের সত্যি-সত্যি চেঁচিয়ে কথা বলতে হতো। শব্দগ্রহণ উন্নততর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পীরাও চীৎকার ক'রে কথা বলার অভ্যাস ছাড়লেন এবং তাঁরা ভাব প্রকাশের দিকেই বেশী ক'রে নজর দিতে লাগলেন। এই স্তরে এসে অভিনয়ধারা মঞ্চঘেঁসা হয়ে পড়লো।

তারপর চিত্র পরিচালনার নৈপুণ্য যত বাড়তে লাগলো শিল্পীরাও আপনা থেকেই ভাবপ্রকাশের দিকে আরও নজর দিতে লাগলেন। তখন তাঁরাও বুঝতে

পারলেন যে ঐ ধরণের ভাবপ্রকাশে বড় বেশী কৃত্রিমতা রয়েছে। অভিনয়ে তাঁরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। আজকের অভিনয়-শিল্পী মনের ভাব এবং উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার জন্য কণ্ঠস্বরকে দোলায়িত করেন। ভবিষ্যতে হয়তো এমন হবে ছায়াছবির শিল্পীরা মুখভঙ্গী ইত্যাদির বদলে কণ্ঠস্বরের তারতম্যের ভিতর দিয়েই অভিনয়ধারার বিকাশ-সাধনে তৎপর হবেন।

এইবার আমি আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করবো চিত্রাভিনয়ের মধ্যে জনপ্রিয় অভিনয় এবং ভাল অভিনয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। এই উভয় ধরণের অভিনয়ের মিশ্রিত ফলাফলের ওপরেই আজকের অভিনয়-ধারার আবেদন দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার কিন্তু মনে হয় জনপ্রিয় অভিনয়-ধারার মধ্য দিয়েই লাভবান হওয়া যায় সবচেয়ে বেশী। আরও উন্নত হওয়ার সাধনায় ব্রতী হ'লে অভিনয়ের মানও নিশ্চয়ই আরও উঁচুতে উঠবে।

ভারতীয় চিত্রজগতে আজ কিশোরকিশোরী শিল্পীর সমাবেশ ছবির আবেদন বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক: তাদের অভিনয়কুশলতার অভিনব চমৎকারিত্ব দর্শকের মনোহরণ করে: ওপরে গাছের ডালে দেখা যাচ্ছে বোম্বাইয়ের কিশোরী অভিনেত্রী নাজকে আর নীচে দাঁড়িয়ে আছে বালব-অভিনেতা রতনকুমার: আর কে ফিল্মস্-এর 'বুট পালিশ' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণে এদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে

বেশ কয়েক বছর আগে চিত্র-পরিচালকরা এমন ধরণের অভিনয়-ধারার ওপর ঝোঁক দিতেন যা দেখে দর্শকরা অভিভূত হতেন এবং সেই ধরণের অভিনয়ই শিল্পীদের শেখাতে তাঁরা সচেষ্ট থাকতেন। তখন উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ দর্শকদের যাতে ভালো লাগে সেই-ধরণের ছবি তৈরী করা, তাঁদের জ্ঞানসঞ্চয়ে সাহায্য করার কোনো ইঙ্গিত তাতে থাকতো না। নতুন ধরনের অভিনয়-রীতির চিন্তা তাঁরা করতেন না—আজও তাঁরা মাঝে মাঝে সেই

প্রাচীন পদ্ধতির অভিনয়ধারারই অনুকরণ করেন। এ-দোষ থেকে অবশ্য বিদেশী চিত্রও মুক্ত নয়। তা সত্ত্বেও সাধারণ দর্শক যতই সূক্ষ্ম বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন, আমাদের চিত্রজগতের অভিনয়শিল্পীরাও ততই উচ্চাঙ্গের অভিনয়ধারা ফোটাবার চেষ্টা করছেন। সত্যিকার ভাল অভিনয় কি তা বুঝিয়ে বলা শক্ত—এটুকু স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠাবোধ করি না, তবে ভাল অভিনয় ফুটে উঠতে পরে বিভিন্ন গুণরাজির সমন্বয়ে। এই গুণরাজির সংমিশ্রণ কিভাবে হতে পারে তা বিভিন্ন অভিনয়শিল্পীর ব্যক্তিগত সত্ত্বার ওপরেই নির্ভর করে। এটা এমন কিছুই নয়—যেমন, ধরুন কতখানি পরিমাণে নুন ব্যঞ্জনে মেশালে তার স্বাদ ঠিকমতো দাঁড়াতে পারে, ঠিক সেই ধরণেরই ব্যাপার আর কি!

ভাল অভিনয়-প্রতিভা প্রকাশ করার ইচ্ছা থাকলে শিল্পীর উচিত নিজের অভিনয়কে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখা। এই মনোভাব নিয়ে চলেছি ব'লেই প্রতি ছবিতে আমার অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিলের ব্যাপার হলো, নিজের দোষ নিজের চোখে ধরা পড়ে না। আমি যখন চলচ্চিত্রে যোগ দিই সে সময় আমাকে অভিনয়-পদ্ধতি শিখিয়ে দেবার মতো কেউ ছিলেন না বা এমন কোনোরকম বাঁধা-ধরা সহজ পদ্ধতিও আমার জানা ছিল না যার সাহায্যে আমি অভিনয়ধারা ভালভাবে শিখে নিতে পারি। নিজের ক্ষমতার ওপর নির্ভর ক'রে আমার অভিনয়-পদ্ধতি সম্বন্ধে নিজেই বিচারক হ'য়ে সমালোচনা করেছি এবং তাকে উন্নততর করার সাধনায় নিজেকে মাতিয়ে রেখেছি।

সাধারণভাবে ব'লতে গেলে বলা যায় যে আজকে আমাদের অভিনয়-পদ্ধতি খুব সূক্ষ্ম স্তরে এসে পৌঁচেছে এবং তার মধ্যে মনস্তত্ত্বমূলক অভিনয়ধারার ছাপও আছে—আর এই ধরণের অভিনয় শিক্ষিতসমাজে বেশ সমাদৃতও

হয়েছে। এই ধরণের অভিনয় বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকের ওপর কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেটা অবশ্য জানা খুবই দরকার।

আরও একটি স্তরের সন্ধান দিতে পারা যায় এবং যাকে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের বিবর্তনের মধ্যে ফেলা যায় তা হলো চিত্রনাট্যে প্রয়োজনানুযায়ী শিল্পীর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অভিনয়কে ফুটিয়ে তোলা। উঁচুদরের শিল্পীরা গোড়ার দিকে চিত্রনাট্যকেই পুরোপুরি অনুসরণ ক'রে চলতেন না। এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁরা মাথা ঘামাতেন না। তাঁর কাছে চিত্রনাট্যের প্রাধান্যের কথা ছিল গৌণ। এর ফলে কাহিনীতে বর্ণিত চরিত্র এবং শিল্পীর অভিনীত ভূমিকার মধ্যে কোন সঙ্গতি থাকতো না। চিত্রগ্রহণের কারসাজি ও উন্নতি যখন প্রকাশ পেতে লাগলো তখনই চিত্রতারকার স্বপ্রণোদিত প্রাধান্য প্রকাশে কিছুটা বাধা দেওয়া সম্ভবপর হতে লাগলো। তারপর পরিচালন-নৈপুণ্য যখন সেই স্থান দখল করলো তখন চিত্রতারকার দাপটও যেন কমতে লাগলো এবং তাঁরাও বুঝতে পারলেন যে তাঁরা হলেন চিত্রনাট্যেরই অন্যতম অংশ। চীৎকার ক'রে সংলাপ বলার সেইখানেই পরিসমাপ্তি হলো এবং শুধুমাত্র চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে যেটুকু কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন করা দরকার সেই অনুযায়ীই তাঁরা অভিনয় করতে লাগলেন।

আজকের দিনে একখানি ছবির সবকিছু নির্ভর করে চিত্রনাট্যের ওপরেই। চিত্রনাট্যের দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে শিল্পীকে প্রাণপণ যত্নে সুঅভিনয় দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হয় অভিনেয় ভূমিকাটি। এটি না করলে তাঁর অভিনয়ের দুর্বলতার কথাই দর্শকদের অন্তরে স্থান পাবে। সুচিন্তিত চিত্রনাট্যের অভাবে আমাকেও অনেক সময় অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। স্বভাবতঃই আমাদের চিত্তও নিশ্চয়ই তখন প্রসন্ন ছিল না। যেখানে চিত্রনাট্যে কৃত্রিমতা ছিল সেখানে অভিনয়ের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ফুটিয়ে তুলতে আমায় যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করতে হয়েছে। চিত্রনাট্য-রচনায় যে উন্নতি আজকাল হয়েছে তার জন্যে আরও নতুন নতুন স্বর্ণের

চিত্রে অশোককুমারের নায়িকা সুমিত্রা দেবী: বোম্বাইয়ে সুমিত্রার প্রথম ছবি 'সমর' এবং 'মশাল' (হিন্দী)-তে তিনি অশোককুমারেব বিপরীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন

কাহিনী আমদানী করার প্রয়োজন হয়েছে এবং তা' সম্ভব হলেই শিল্পীর পক্ষেও আরও উচ্চ স্তরের অভিনয়-মান প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

যেদিন থেকে চিত্রনাটাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে সেদিন থেকে ভারতীয় চিত্রশিল্পে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলো শিল্পীদের পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি। এমন এক সময় ছিল যখন তাঁদের পারিশ্রমিক যা দেওয়া হতো তা' ছিল নিতান্তই নগণ্য। এখন শিল্পীদের প্রাধান্য যতই বাড়ছে তাঁদের পারিশ্রমিকের দাবীও ততই বাড়ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শিল্পীদের প্রাপ্য যতই বাড়ছে সেই অনুপাতে পরিচালকদের প্রাপ্যের পরিমাণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে অনেক কম। কয়েক বছর আগে কিন্তু এরকম অবস্থার কথা ভাবাও যেতো না!

চিত্রশিল্পে আজ যে উন্নতি দেখা যাচ্ছে এর মূলে অবশ্য শিল্পীদের আন্তরিকতাপূর্ণ কাজ করার বাসনাই অনেকখানি সাহায্য করেছে। শিল্পীদের কাজের ঝামেলাও দিনের পর দিন বেড়েই গেছে। সে-দাবী পূরণ করতে শিল্পী কিন্তু পিছিয়ে পড়েনি। আজকের নবাগত অভিনয়শিল্পীরা বিগত যুগের শিল্পীদের চেয়ে ছায়াছবি সম্বন্ধে অনেক বেশী সজাগ।

এমন এক সময় ছিল যখন চিত্রশিল্পীদের সাধারণ সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হতো। আজকাল কিন্তু তাঁরা স্বচ্ছন্দেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পান। আমি যখন চিত্র-শিল্পে যোগ দিয়েছি তখন আমার মা-বাবা আমার এই ধরণের শিল্পী-জীবন বেছে নেওয়ার জন্যে তিরস্কার করেছিলেন। তখন আমার বিয়ের তোড়জোড় চলছিল কিন্তু আমার বিয়ে প্রায় ভেঙে যাবারই উপক্রম হয়েছিল। আমি সমাজ-জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। কিন্তু এই চিত্রশিল্পী হিসেবে আমি যখন বেশ রোজগার করতে সুরু ক'রেছি, আমার বাপ-মা যখন বুঝলেন যে তাঁদের সংসারে আমি বেশ উপকারেই আসবো, তখন আমার প্রতি সকলের বৈরীভাবও যেন নিমেষে কেটে গেল। আমার অভিনয়শিল্পীর জীবন তখন আর কারও কাছেই পীড়াদায়ক হয়ে রইলো না। এমনধারা অভিজ্ঞতা অবশ্য আরও অনেকেরই হয়েছে!

আজকের ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা বিগত দিনের চিত্র-শিল্পীদের কাছে বহুলাংশে ঋণী। তখনকার দিনে অভিনয়শিল্পীদের সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়েছে। আজ আমরা যে স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ঘোরাফেরা করছি তাঁদের কিন্তু সে-পথ অতিক্রম করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। চিত্র-শিল্পের শৈশবাবস্থায় শিল্পীদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু সে তুলনায় তাঁরা পারিশ্রমিক পেয়েছেন খুবই কম, অবশ্য তাঁদের শিল্প-বোধও তখন আজকের মতো এতটা বিস্তৃত ছিল না। আজ আমরা সৌখীন ব্যাপারে গা ভাসিয়ে দিয়েছি, বেশ স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-যাপন করছি আর সেই সঙ্গেই সূক্ষ্ম শিল্পবোধ রয়েছে নখাগ্রে। এই মাঝের কয়েকটি বছরেই শিল্পীদের জীবন এবং শিল্পও আপন প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করে নিয়েছে। তখন অভিনয়শিল্পে যোগ দেবার জন্য চিত্রজগতে যাঁরা আসতেন তাঁদের কাছে এটা পেশার চেয়ে নেশা ছিল বেশী, আর আজ পেশার পর্য্যায়ে উঠে এটা আর এক ধরণের চাকরীর স্থান গ্রহণ করে বহু পরিবার প্রতিপালনে অপরিহার্য্যরূপে সহায়ক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

পিতা ও পুত্র : চার্লি চ্যাপলিন ও সিডনী চ্যাপলিন

একটি ছবির জন্ম

★

সিডনী চ্যাপলিন

১৯৪৮ সালের জুন মাস। তখন আমি কাজ করছি হলিউড থিয়েটারে। হঠাৎ বাবার কাছ থেকে ফোন এলো। 'আমার পরের ছবিটায় তোমার জন্যে একটা পার্ট ঠিক করে ফেলেছি।' আমার পক্ষে উত্তেজিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, তাই জানতে চাইলাম—কি ছবি? সে-সময় থেকে আরও চার বছর আগেকার কথা, সেই সময়েই তাঁর ঐ ছবির কথা শুনেছিলাম, সে ছবি হলো 'লাইমলাইট'।

পরের দিন বেভার্লি হিলস্-এ বাবার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। ইংলণ্ডের বাড়ীগুলির মত দেখতে তাঁর বাড়ীটি ছিল মস্ত বড়। সেখানে তাঁর ছবির কথা শুনলাম। ইংলণ্ডের 'মিউজিক-হল'কে কেন্দ্র ক'রে এক কাহিনীর রূপদান অনেকদিনই তাঁর মনে মনে ছিল আর তাতে এক ভাঁড়ের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করতে চান সেই কথাই তিনি আমায় বললেন। তাঁর মাথায় কিন্তু আরও অনেক রকম মতলব খেলছিল···তিনি কিছুতেই একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছিলেন না। সবগুলি নিয়েই কথাবার্তা হলো, তিনি কিন্তু ঘুরে-ফিরে সেই মিউজিক-হলের কথাই বারবার বলছিলেন। গল্প বলেন তিনি বেশ চমৎকারভাবে। তাঁর কাছে সেসব শুনে অদম্য উৎসাহ নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

বাড়ী ফেরার পর আমার খেয়াল হলো আমায় ভূমিকা নিয়ে তো কোন আলোচনাই করিনি। পুরো একটি বছর কেটে যাওয়ার পর আমরা সেসব কথা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই একটি বছরের মধ্যে বাবা ৭৫০ পাতার একখানা চিত্রনাট্য রচনা করেছেন আর সেই কাহিনীর চরিত্রগুলির প্রত্যেকের পুরো জীবন-

কাহিনী লিখে ফেলেছেন। তখন আমি তাঁর কাছে শুনলাম, তিনি 'খসড়া'টি থেকে পড়ে পড়ে শোনালেন আর জানতেও পারলাম আমার জন্যে ঠিক হ'য়ে আছে এক বুভুক্ষু সঙ্গীতশিল্পীর ভূমিকা। সেই সময় আমার ওজন ছিল আঠারো ষ্টোন আর খাওয়া-দাওয়ার বহরও ছিল প্রচুর, চুলের ছাঁটটি ছিল নৌ-সৈনিকের মতো। বাবা আমাকে পরামর্শ দিলেন মাপ-মতন খাওয়া-দাওয়া করতে আর বলে দিলেন চুল রাখতে।

পূর্ণাঙ্গ ছবির উপযোগী চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলো ১৯৫০ সালের গ্রীষ্মকালে। ছবিতে সেট্-এর নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল ইংলণ্ডে প্রযোজিত ছবিতে যেমন থাকে সেইরকম। বাবার ভূমিকাটি ছাড়া অপর প্রধান ভূমিকাটি ছিল এক যুবতী ইংরাজ ব্যালে নর্ত্তকীর। সমস্যা দেখা দিল কে ঐ ভূমিকায় অভিনয় করবে তাই নিয়ে। কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেওয়া হলো—"চাই : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক শিল্পীর বিপরীতে ছবিতে অভিনয় করার জন্যে একজন কমবয়েসী মেয়ে চাই"। দেখে-শুনে পরীক্ষা করে নিতে বাবার আরও একটি বছর কেটে গেল—যারা আবেদন-পত্র পাঠিয়েছিল তাদের প্রায় প্রত্যেকটি প্রার্থীকেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যেন সেই ভূমিকায় মনোনীত হবার উপযোগী। বাবার সারাজীবনের সেইটিই প্রথম ছবি যাতে তিনি নায়িকার চরিত্রকে তাঁর নিজের ভূমিকার সমান প্রাধান্য দিয়েছেন। স্বভাবতঃই এ-বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত হতে হয়েছিল।

তারপর, বাবার এক বন্ধু,—আর্থার লরেন্টস,—'হোম অব্ দি ব্রেভ্' এঁরই রচিত—সন্ধান দিলেন যে তিনি লণ্ডনে এক নাটকাভিনয়ে একটি মেয়েকে দেখেছেন, তাকে এই ছবির পক্ষে বেশ উপযুক্ত বলেই মনে হয়। মেয়েটির নাম ক্লেয়ার ব্লুম, নাটকটির নাম 'রিং রাউণ্ড দি মুন'। পরীক্ষা করে দেখে নেওয়ার জন্যে বাবা তাকে নিউ ইয়র্কে আসতে বললেন আর এই একটি বছর পরে তিনি সেই ভূমিকার উপযোগী শিল্পীর সন্ধান পেলেন।

সে-ছবিতে লণ্ডনের উপযোগী দৃশ্যসজ্জা ইত্যাদি থাকায় বাবা একবার ভাবলেন ছবিটি লণ্ডনে গিয়ে তুললে কিরকম হয়। কিন্তু বিদেশে গিয়ে ছবি তোলার অন্তরায়ের একমাত্র কারণ হলো হলিউডে বাবার ছিল নিজস্ব ষ্টুডিও আর সারা জীবনভোর যত ছবি তিনি তুলেছেন তার সব ক'টিই সেখানে তোলা হয়েছে। বিশ বছর বা তার চেয়েও বেশী দিন তাঁর সঙ্গে কাজ করছেন এমন কর্ম্মীও সেখানে রয়েছেন—তাঁদের বাদ দিয়ে অন্য কারও সঙ্গে কাজ করার কথাও তিনি ভাবতে পারেন না। সেট্-এ চিত্রগ্রহণের সময় হয়তো তাঁরা বাবাকে 'চার্লি' ব'লে সম্বোধন করেছেন কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে যখনই কথাবার্ত্তা হয়েছে তখনই তাঁরা বাবাকে সবসময় মালিক ও পরিচালকের সম্মান দিয়েই কথাবার্ত্তা বলছেন।

বাবা অবশ্য ক্যামেরা ইত্যাদি দিয়ে একদলকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিলেন লণ্ডনের বিভিন্ন জায়গার দৃশ্যাদি তুলে আনবার জন্যে—যেসব দৃশ্য ছবিতে কাজে লাগবে। আর, আমার বেশ মনে পড়ে, তাঁরা যখন ফিরে আসেন তখন তিনি কতকটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন বিশ বছরের ওপর হয়ে গেছে, তিনি লণ্ডন ছেড়ে চলে এসেছেন লণ্ডনে যেসব জায়গায় তিনি থেকে এসেছেন আর এখনও তাঁর মনে

'কেটি 'সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্রহস্ত—একটু সে বিরোধ সয় না। কর্কশ ব্যবহারে তার কোনো সংকোচ নেই। নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব আছে; যাকে সে মিষ্টিমুখো ভালোমানুষি বলে, বন্ধুদের মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখলে তাকে সে অস্থির ক'রে তোলে। রূঢ়তাকে সে অকপটতা বলে বড়াই করে, এই রূঢ়তার আঘাতে যারা সংকুচিত তারা কোন মতে কেটিকে প্রসন্ন রাখতে পারলে আরাম পায়।' রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র চিত্ররূপে এই কেটির ভূমিকা রূপায়িত করছেন প্রতিভাদীপ্তা অভিনেত্রী সাধনা বসু; দীর্ঘদিন বাদে তাঁকে আবার বাংলা ছবিতে দেখা যাবে

নিউ থিয়েটার্সের আগামী বন্ধু চিত্রের নায়িকা অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

আছে সেসব জায়গা, তার ছবি তিনি তুলে আনতে বলেছিলেন। হায়, ১৯১৪-১৯১৮ সালের বা সেই সময়ের উপযোগী লণ্ডনের দৃশ্যাদি দেখাবার জন্যে তাঁকে ষ্টুডিওতে সেট্ তৈরী করে তুলে নিতে হয়েছিল, কারণ গত বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে লণ্ডনে বহু জায়গার চেহারা একেবারে বদলে গেছে। যে-পরিমাণে রাস্তার আলো বাড়ীঘরের সংখ্যা তিনি আশা করেছিলেন সেই অনুযায়ী না থাকায় তাঁকে সেট্ সেই অনুযায়ী তৈরী করিয়ে নিতে হয়েছিল।

সর্ব্বক্ষণই বাবা কাজ করে চলেছেন পাকাপাকিভাবে চিত্রনাট্য-রচনা আর ছবির গান রচনার কাজে। গান সম্বন্ধে তিনি ভালই বুঝতেন আর গান রচনায় তাঁর বেশ পাকা হাত ছিল, কিন্তু তিনি তো তেমন ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন না, সেইজন্যে সুর-রচনার কাজে তাঁর অনেক সময় লেগে যেতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনও কখনও দিনের পর দিনও তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সুর-সংযোজনার কাজটি সমাধা করতে। ঠিকমতো সফল হওয়ার পর সেটি টেপ-রেকর্ডার যন্ত্রের সাহায্যে একেবারে তুলে রাখতেন। এইরকম যন্ত্র তাঁর দুটি ছিল, কখনও কখনও আমাকে হয়তো নির্দ্দেশ দিতেন পরীক্ষা-কক্ষে গিয়ে দেখে নেওয়ার জন্যে—সঙ্গীতাংশ কিরকম দাঁড়িয়েছে। সেখানে শুনে ফিরে এসে বলতাম যে, বেহালার শব্দটাই যেন বড় বেশী শোনা গেল। বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বলতেন—'বেহালা তো বাজানো হয়নি'। নীচের তলায় গিয়ে খোঁজ-খবর ক'রে দেখা গেল আমি অপর রেকর্ডারটি খুলে শুনেছি আর তাতে বিতোফেনের গৎ বাজানো আছে।

চিত্রনাট্য-রচনা আর সঙ্গীতাংশের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর নাচের ব্যাপারটা ঠিক করতে হয়, সাজ-পোষাক ঠিক করা এবং তারপরে ভূমিকা-নির্ব্বাচনের পালা শেষ হতো। প্রত্যেকটি ব্যাপারের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতেন বাবা নিজেই; তাঁর কাজের স্পৃহা আর উৎসাহ সর্ব্বক্ষণই কিন্তু অটুট থাকতো—আমি জানি, খানিকটা সময় হয়তো তাঁর কাজের কিছু করবার নেই, তখন তিনি বসে গেলেন হয় জুতো তৈরী করতে আর নয়তো জামা সেলাই-এর কাজে।

ক্লেয়ার এসে পৌঁছলো—সে আর তার মা কাছাকাছি ফ্ল্যাটে রইলো—আর তারা আসার পরেই ক্লেয়ারকে নিয়ে রিহার্সালের বন্দোবস্ত হলো। গোড়ার দিকে বাড়ীতেই রিহার্সাল হতো তারপর চ্যাপলিন ষ্টুডিওতে রিহার্সাল চলতে লাগলো। চ্যাপলিন ষ্টুডিওর কক্ষগুলি দেখতে ছিল ঠিক যেন ইংলণ্ডের পুরোনো আমলের সেই ছোট ছোট কুঁড়ে-ঘরের মতো।

রিহার্সালের সময় লক্ষ্য করেছি, বাবা যেন বেশ ব্যথা অনুভব করতেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি দিয়ে অভিনয়ার্থ দৃশ্যের মধ্যে ছবির চরিত্রগুলির মনের ভাব এবং সেই-সঙ্গে সেই দৃশ্যের পরিবেশও বুঝিয়ে দিতেন—দরকার হলে সব ক'টি চরিত্রই তিনি নিজে অভিনয় ক'রে দেখাতেন এবং আমাদের নির্দ্দেশ দিতেন বারবার অনুকরণ করতে আর আমরা সেইরকম করতাম যতক্ষণ না পর্য্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হতেন। এ-ব্যাপারে তাঁর ধৈর্য্য ছিল অসীম।

আমার বেশ মনে পড়ে কত খুশীই না তিনি হতেন ক্লেয়ারের অভিনয় দেখে। তাঁকে এও বলতে শুনেছি—'আমার পরিচালনার নির্দ্দেশ বুঝে নিতে এর ক্ষমতা আর দক্ষতা অদ্ভুত।' একদিন বেশ কড়া রোদ উঠেছে। সেদিনের কথাও আমার বেশ মনে পড়ে। বাগানে আমরা রিহার্সাল-পর্ব্ব নিয়ে মেতে আছি, বাবা বলে উঠলেন, 'আমার মনে হচ্ছে আমরা যেন লণ্ডনে চলে যাই। এই যে রোদ উঠেছে আর আমরা মাঠে অভিনয় করছি, এতে কিন্তু ইংলণ্ডের গ্রীষ্মের দিনের মতো অনুভব করার মনের ভাব আসছে না।'

অবশেষে—সেই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে—প্রকৃতপক্ষে সে-ছবির চিত্রগ্রহণের জন্যে আমরা প্রস্তুত হ'লাম। প্রথম দিনই বাবা আমাকে বললেন, 'দশ হপ্তা শুটিং করার মনস্থ করেছি আর সেটা বজায় রাখাই আমার ইচ্ছে। 'সিটি লাইট্‌স্' তুলতে আমার চার বছর লেগেছিল, কিন্তু আজকের দিনে যা খরচ-পত্তরের ব্যাপার তাতে অতদিন ধরে কাজ করতে গেলে আমরা পেরে উঠবো না।' হ্যাঁ, তিনি সেই প্রোগ্রামই মেনে চলেছেন, তার ফল-স্বরূপ, তিনি কিন্তু নিজেকে প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছিলেন আর কি। বয়েস তাঁর তেষট্টি,—কাজে তাঁর উদ্দীপনা দেখে তাঁর বয়েস তখন ঠিক তার অর্দ্ধেক ব'লে মনে হচ্ছিল; তাঁর পক্ষে যতদূর সম্ভব, সমস্ত কাজ তিনি করে নিচ্ছিলেন নিজের হাতে। এর ফলে, প্রত্যেকের কাছ থেকেই তিনি তাঁদের গুণানুযায়ী সেরা কাজের নিদর্শনই পেয়েছিলেন।

শোবার ঘরের দৃশ্য দিয়েই চিত্রগ্রহণ সুরু হলো—এর জন্যে সময় লেগেছিল তিন সপ্তাহ। তারপর তোলা সুরু হলো রাস্তার দৃশ্যগুলি। এই দৃশ্যগুলি যখন তোলা হচ্ছিল তখন একদিন রাই-সর্ষের রং-এর পোষাক-পরিহিত একজন অভিনেতাকে দেখলাম—সে অবশ্য একস্ট্রা হিসেবেই ছবিতে ছিল, তার সেই অদ্ভুত পোষাকে তাকে কি [illegible] না দেখাচ্ছিল। বাবাকে [illegible] বাবা তো হেসে উঠে [illegible] বললেন,—'অদ্ভু[illegible] সময় আমা[illegible] একটি পো[illegible]'

একস্ট্রার পোষাকটি ভাড়া করে আনা হয়েছিল এক দোকান থেকে—যারা চিত্র-প্রতিষ্ঠানদের পোষাক সরবরাহ করতো—একস্ট্রাটি কিন্তু না জেনেই ভেতরকার পকেটে একটি লেবেল দেখে ফেলে, তাতে লেখা ছিল—'চার্লি চ্যাপলিনের জন্যে তৈরী, ১৯১৮'।

একবার হলো কি, আমি যে জ্যাকেটটি পরেছিলাম সেটা দেখে বাবা আপত্তি করলেন। তিনি বললেন, 'ছাখো তো হাতা দুটো তোমার সার্টের সঙ্গে মিলিয়ে ছাখো। যাও দর্জ্জির কাছে গিয়ে জ্যাকেটের হাতা দুটো আরও বড় করিয়ে আনো।'

সেখান থেকে আমি সরে পড়লাম। শুধু জামার আস্তিন-দু'টো গুটিয়ে আবার ফিরে এলাম। এবার বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, এইবার ঠিক সেইরকমটিই হয়েছে।'

সত্যিই, কি অদ্ভুত তাঁর পরিচালন-ক্ষমতা। প্রত্যেকটি শিল্পীকে কিভাবে আলাদা ক'রে দেখানো যায় সেদিকে তাঁর একটা সহজাত দৃষ্টি ছিল। একজন বৃদ্ধ অভিনেতা ছিলেন—তিনি বাবার সঙ্গে অভিনয় করবার সময় এত ভয় পেতেন যে সংলাপ বলবার সময় তিনি বিড়বিড় করতেন। তাঁর আড়ষ্টভাব কাটাবার জন্যে বাবা তাঁর নিজের সংলাপ নিয়েই খানিকক্ষণ তাঁর সঙ্গে বিড়বিড় করতেন, তাতে সেই বৃদ্ধ অভিনেতার আড়ষ্টভাব কেটে যেতো আর তারপরেই তিনি বেশ সহজভাবেই অভিনয় করে যেতেন।

বাবা ছিলেন সেই ছবির পরিচালক আর সেইসঙ্গে ছিলেন সেই ছবির প্রধান অভিনেতাও। তিনি মুস্কিলে পড়তেন তাঁর নিজের অংশ অভিনয় করার সময়। কারণ, যতক্ষণ না সেই অংশের দৃশ্যগ্রহণ শেষ হচ্ছে ততক্ষণ তো আর সেই অংশটুকু দেখে নিতে পারছেন না; কিন্তু তাঁর কাজের ধারাই ছিল আগে থেকে সব দেখে-শুনে নেওয়া—সেই উদ্দেশ্যে তিনি ক্যামেরার ভেতর দিয়ে দৃশ্যের সেট্ ইত্যাদি দেখে নিতেন। একসময় তাঁকে দেখা গেল ক্যামেরার পেছনে, তার পরেই দেখা [illegible] তিনি ৪০ ফিট ওপরে উঠে গিয়ে ইলেকট্রিসিয়ানকে [illegible] বলে দিচ্ছেন, আবার খানিক পরেই এসে গেছেন

মঞ্চের ওপর, কোনঃ অভিনেতাকে তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে বুঝিয়ে ব'লে দিতে। তিনি তাঁর নিজের ভূমিকাকে উপলক্ষ্য ক'রে একবার মঞ্চের ওপর প্রচুর পরিমাণে গড়াগড়ি খেয়েছেন, কারণ একটি দৃশ্যে বাষ্টার কিটনের সঙ্গে তাঁর ঐরকম একটি অভিনয়-দৃশ্য ছিল—এই দৃশ্যটি ফুটিয়ে তুলতে কিন্তু তাঁদের দু'বার অভিনয় করতে হয়নি।

বাবা যখন প্রায় উন্মাদের মতো দৌড়তেন সে-দৃশ্য দেখে কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কিছুই থাকতো না। সকাল-বেলা তিনিই সবার আগে ষ্টুডিওতে আসতেন এবং রাত্রে ষ্টুডিও ত্যাগ করতেনও সবচেয়ে শেষে। দুপুরবেলা তাঁর স্ত্রী উনা কিছু স্যাণ্ডউইচ আর ফলমূল নিয়ে ষ্টুডিওতে আসতেন। সম্পূর্ণ ক্লান্তদেহে বাড়ী ফিরে রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে বাবা আবার বসে যেতেন পরদিন কি কি কাজ করা হবে তারই খসড়া তৈরী করতে।

আমার একদিনকার শুটিং-এর কথা বেশ মনে পড়ে। বাবা আর ক্লেয়ারের একটি দৃশ্য তোলা হবে—সেটা ছিল একটি আবেগময় দৃশ্য। সেই দৃশ্যের ব্যাপারে তিনি সারাটা দিন কাটিয়ে দিলেন, কিন্তু পর্দায় সেই দৃশ্যের স্থায়িত্বকাল মাত্র তিন মিনিট—তবুও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না. বিশেষ করে, তাঁর নিজের অংশ নিয়েই। পরদিন সেই দৃশ্যের আবার চিত্রগ্রহণ করা হলো, তার পরের দিন আবার সেই দৃশ্যটিই তোলা হলো। শেষ-বার যখন চিত্রগ্রহণ করা হলো সে এক দুর্দান্ত ব্যাপার [illegible] সকলের হাত কাঁপছিল, কিন্তু চিত্রগ্রহণের পর স[illegible] খুশীতে ভরপুর হয়ে উঠলেন। তিনদিন পরে সেই [illegible] বাবার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠলো।

'বুট পালিশ' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণে বেরিয়েছেন সদলবলে রাজকাপুর: ছবিতে দেখা যাচ্ছে রাজ, নার্গিস্, বীরা, পরিচালক প্রকাশ অরোরা এবং আলোকচিত্রশিল্পী তরু দত্তকে

পরের দিন ফিল্মটি ডেভালাপ করা হচ্ছিল, সেই সময় টেলিফোনে বাবার কাছে খবর এলো—প্রোসেসিং করার গোলযোগের দরুন ফিল্মের সেই অংশটি খারাপ হয়ে গেছে। এই কথা শুনে বাবা তো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু ক্লেয়ারকে বলার মতো মনের অবস্থা তাঁর ছিল না। তিনি শুধু বললেন যে, সেই অংশটি তিনি আর একবার [illegible] জন্যে চেষ্টা করে দেখবেন।

[illegible] ভাবেই [illegible] তোলার কাজ চলতে থাকে। [illegible] সময় [illegible] দর্শক উপস্থিত [illegible] তাঁদের মধ্যে [illegible] বাবার [illegible] বনো [illegible] বড়—বায়ু-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে তি[illegible] ক্যালিফোর্ণিয়ায় এসেছিলেন।

সে-ছবি সম্বন্ধে বাইরে নানারকম গুজব রটেছিল, সেসব দূর করার জন্তেই তিনি এসেছিলেন। বহুলোক বলাবলি করছিল, বাবার নিজের জীবন-কাহিনীই সেই ছবিতে রূপায়িত করা হচ্ছে। অনেকে আবার বলতে লাগলেন, 'সিটি লাইট্‌স্' ছবিটিই নতুন ক'রে তোলা হচ্ছে। আবার কারও কারও ধারণা ছিল সিসিল বি ডি মিলির 'গ্রেটেষ্ট শো অন আর্থ' ছবির জনপ্রিয়তাকে ছাড়িয়ে যাবার জন্তেই বাবা যেন এই সার্কাস-মার্কা ছবিটি তুলছেন। কত বিচিত্র রকমের খবরই না কাগজে বেরোচ্ছিল।

ছবি তোলার শেষের দিকে শেষ সপ্তাহে অত পরিশ্রম ক'রে বাবা এমন ভীষণভাবে সর্দ্দিতে আক্রান্ত হলেন যে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু'দিন বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তাঁকে শয্যাগ্রহণ করতে হলো। আমি তো ভাবলেও শিউরে উঠি, যদি এই দুটো দিন বিশ্রাম তিনি না করতেন তাহলে কি যে হতো। কিন্তু আটচল্লিশ ঘণ্টা যেতে না যেতেই তিনি উঠে পড়লেন—নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছবি তাঁকে শেষ করতেই হবে, এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। শেষদিনে ঠিক পাঁচটার সময় তিনি ঘোষণা করলেন—'ছবির শেষ 'শট্‌' এইবার তোলা হচ্ছে।' সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তাঁদের বেশ উৎফুল্লই দেখাচ্ছিল। পানীয় আনা হলো, আমরা সকলকেই বাবার শুভ-কামনা ক'রে তা পান করলাম। সকলেই একটা স্বস্তি অনুভব করলাম আর সেই উদ্দীপনা এবং আত্মীয়তার স্পর্শও যেন আমরা বোধ করলাম। কিন্তু পরের দিন যখন 'রি-টেকে'র জন্যে সবাইকে ডাকা হলো তখন কেউ-ই বিস্মিত হয়েছিলেন ব'লে তো আমার মনে হয় না।

'রি-টেকে'র কাজ চলেছিল তিনদিন। তারপর যখন তিনি ছবির সম্পাদনা করছিলেন তখনও মনে হচ্ছিল আরও দু'-একটি অতিরিক্ত দৃশ্য সংযোগ করার দরকার যেন তিনি মনে করেছিলেন। ছবি শেষ হতেই ক্লেয়ার ইংলণ্ডে ফিরে গেছে আর সেসব দৃশ্য ছিল 'লং-শট' ধরণের অর্থাৎ ছবিতে দেখা যাবে লোকজন রয়েছে অনেক দূরে—ক্লেয়ারের বদলে উনা-ই দাঁড়িয়ে ছিলেন—এর জন্যে অবশ্য বাবা মনে মনে তাঁর সম্বন্ধে কোনরকম [illegible] পোষণ করতেন না।

আমাদের পরিবারের আর যাঁরা এই ছবিতে অংশ নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চার্লি চ্যাপলিন (ছোট)—ইনি অভিনয় করেছেন এক ভাঁড়ের ভূমিকায়। বাবার ভ্রাতৃতুল্য হুইলারও আছেন এ-ছবিতে। বাবার ষ্টুডিওতে বিশ বছর ধ'রে কাজ করছেন ড্রাইডেন—ইনিও এই ছবিতে সেজেছেন একজন ভাঁড়। আর এই ছবিতে আছে উনার ছেলেমেয়েরা—গেরালডিন, মাইকেল এবং জোসেফিন—এদের দেখা যাবে ছবির গোড়ার দিকে রাস্তার দৃশ্যে।

সবশেষের কাজটি হলো, সংগঠনকারীদের নাম দিয়ে ছবির 'টাইটল' তৈরী, যেটি দেখানো হয় ছবির সুরুতেই। বেশীর ভাগ ছবিতেই এই জিনিষটিকে সকলের মনস্তুষ্টির ক্ষেত্র হিসেবে দাঁড় করাতে হয়। পরিচালক চান শিল্পীদের নামের চেয়ে তাঁর নামটিই থাকবে বেশ বড় হরফে। সঙ্গীত-পরিচালক চান তাঁর নামটি যেন শব্দযন্ত্রীর নামের আগে সন্নিবেশিত হয়—তিনিও কিন্তু আবার এটি সহ্য করতে পারেন না। 'লাইমলাইট' ছবির টাইটল তৈরীর সময় সমস্যা দেখা দিল, বাবার নামটি ক'বার দেখানো হবে।

এই ছবির সুরুতেই দেখা যায় "লাইমলাইট' ছবিতে চার্লি চ্যাপলিন ও ক্লেয়ার ব্লুম"। সর্ব্বপ্রথম না হ'লেও বিগত বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম দেখা গেল বাবার নামের সঙ্গে সমান প্রাধান্য পেয়েছে অপর একজন শিল্পীর নাম। এর কারণ, তাঁর বিচারে, ক্লেয়ারের ভূমিকাটিও সারা ছবিতে তাঁরই সমান।

[মূল ইংরাজী রচনা থেকে অনূদিত]

উপসংহার

●

প্রকাশ গুপ্ত

দুই অঙ্কে সমাপ্ত পূর্ণাঙ্গ একখানি নাটক 'উপসংহার'—নামকরা, সাফল্যমণ্ডিত এবং মার্কিন মঞ্চে বহু অভিনীত আর সম্প্রতি সবাক চিত্রে রূপান্তরিত DEATH OF A SALESMAN -এর ছায়া অবলম্বনে রচিত। নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে মধ্যবিত্তের সমস্যাসংকীর্ণ জীবননাট্যের অন্তরঙ্গ ছবি আছে এ নাটকে যা নাট্যরসপিপাসু পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আধুনিকতম মঞ্চকৌশলের নির্দ্দেশ ও প্রয়োগে সমৃদ্ধ স্বল্প সময়ে অভিনয়োপযোগী এই নাটক গতানুগতিকতাবর্জ্জন-প্রয়াসী সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের কাছেও সমান সমাদৃত না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

নাটকে যাঁরা আছেন

সতীনাথ সরকার— সেলসম্যান

কল্যাণী— সতীনাথের স্ত্রী

মন্মথ—
সন্মথ— } সতীনাথের দুই ছেলে

জগদিন্দ্র— সতীনাথের বন্ধু, ব্যবসায়ী

বিনয়— জগদিন্দ্রের ছেলে ও মন্মথর সহপাঠী

রজনীকান্ত— কয়লাখনির মালিক, সতীনাথের দূর সম্পর্কীয় ভাই

ইন্দ্রজিৎ— সতীনাথের মনিব

শীতল— কফি হাউসের পরিচারক

যামিনীনাথ—জগদিন্দ্রের কর্ম্মচারী

সুন্দরী—

কফি হাউসের পরিচারক—

কিশোর মন্মথ—

কিশোর সন্মথ—

যুবতী কল্যাণী—

প্রথম অঙ্ক

বাঁশীর একটা সুশ্রাব্য, সুন্দর সুর ভেসে আসছে। পর্দা উঠে গেল। একটা বাড়ী আমরা দেখতে পেলাম মঞ্চের ওপরে। বাড়ীটি কতকগুলি ঘরে ভাগ করা হলে সমগ্র বাড়ীর কাঠামোটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার উত্তুঙ্গ বুরুজ আর চার-পাশের কোণাকৃতি গঠনে। আকাশের নীল আলো পড়েছে বাড়ীটির ওপর, পড়েছে বাড়ীর বাইরে মঞ্চের সম্মুখভাগেও। মাঝখানে রয়েছে বসার ঘর, ঘরের মাঝখানে পিছনের দেওয়াল ঘেঁসে একখানি চেয়ার আর একখানি টেবিল। এক খানি বেঞ্চ রয়েছে দূরে বাঁদিকে। এই ঘরের পেছন দিকে একটি দরজা দেখা যায়। এর ডানদিকে দু' ফুট উঁচু মঞ্চের ওপর শোবার ঘর, সে-ঘরে খাটের ওপর বিছানা রয়েছে। মঞ্চের পেছন দিকে দেওয়াল ধারে এই ঘরেই একটা সেলফে রয়েছে কতকগুলি খেলার ট্রফি। বসার ঘরের পেছনে সাড়ে ছ' ফুট উঁচুতে আর একটা শোবার ঘর' দুটো বিছানা রয়েছে সেখানে, সেগুলো খুব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই ঘর থেকে সিঁড়ি নেমে এসেছে বসার ঘরে, প্রথম শোবার ঘরের সিঁড়িটা বসার ঘরের পেছনে অদৃশ্য। ছাদের গঠন একতল-মাত্রিক।

ডানদিক থেকে প্রবেশ করে সতীনাথ সরকার। তার হাতে দুটো নমুনা-ব্যাগ। বাঁশী বেজেই চলে, সতীনাথ সে-সম্পর্কে একরকম উদাসীন। মঞ্চের সম্মুখ পার হয়ে বসার ঘরে ঢোকার সময় তাকে খুব ক্লান্ত দেখায়, বয়সও তার ষাটের

ওপর। দরজা তুলে ঘরে প্রবেশ ক'রে, টেবিলের ওপর বোঝাগুলি রাখে হাতের চেটোর অবসাদটা অনুভব করে: এক দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় "ওঃ, বাপ রে"। জিনিষপত্রগুলো পেছনের দরজা দিয়ে পেছনের ঘরটাতে রেখে আসে।

ডান দিকের শোবার ঘরে সতীনাথের স্ত্রী কল্যাণী বসে একটা জামা রিপু করছিল। সে কান পেতে শুনতে থাকে। কিছুপরে সে বেরিয়ে আসে বসার ঘরে।

কল্যাণী। (পাশের ঘরে সতীনাথের আসার শব্দ পেয়ে, কিছুটা ভয়ে ভয়ে)—কে ? তুমি ?

সতীনাথ। হ্যাঁ, আমি। আমি ফিরে এসেছি।

কল্যাণী। কেন? কি হ'ল ? (কিছু সময় ইতস্তত: ক'রে) কিছু ঘটেছে কি ?

সতীনাথ। না, কিছুই ঘটে নি।

কল্যাণী। মানে— তুমি গাড়ীখানা ভেঙে ফেলনি তো ?

সতীনাথ। (একটু রেগে) আমি বলছি, কিছু ঘটেনি। আমার কথা তুমি শুনতে পাওনি ?

কল্যাণী। তোমার শরীর ভাল আছে তো ?

সতীনাথ। আমি খুব ক্লান্ত। (বাঁশীর সুর মিলিয়ে গেছে। চেয়ারটাতে বসে, কল্যাণী পাশে এসে দাঁড়ায়) আমি কিছু বুঝতে পারছিনা, বুঝলে কল্যাণী, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।

কল্যাণী। (অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে ও নম্রভাবে) সারা দিন কোথায় ছিলে ? মানে—তোমাকে কেমন কেমন দেখাচ্ছে—

সতীনাথ। আসানসোল পেরিয়ে কিছুদূর আমি গিয়েছিলাম। এক কাপ কফির জন্য আমি থামলাম। হ'তে পারে, সেই কফিই—

কল্যাণী। কি ?

সতীনাথ। (খানিকক্ষণ ইতস্তত: ক'রে) হঠাৎ গাড়ী আর আমি চালাতে পারলাম না। গাড়ীখানা আপনা থেকেই সোজা ছুটে চললো, বুঝেছো ?

কল্যাণী। (সহানুভূতির সুরে) ... আবার বোধ হয় ... সেই ষ্টিয়ারিং-এর ব্যাপার। অনন্ত ইুডিবেকার সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমার মনে হয় না।

সতীনাথ। না, না। সে জানি আমিই।—হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, ষাট মাইল বেগে আমি চলেছি। শেষ পাঁচ মিনিটের কথা কিছুই আমার মনে পড়ে না। ওদিকে আমি নজর দেবারই অবকাশ পাই নি।

কল্যাণী। এ তোমার ঐ চশমার জন্যে। চশমার পাওয়ারটা তুমি কখনই বদলাবে না!

সতীনাথ। না, আমি সব কিছুই দেখতে পাই। দশ মাইল বেগে আমি ফিরে এসেছি। আসানসোল থেকে আসতে আমার প্রায় চার ঘণ্টা লেগেছে।

কল্যাণী। (প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে) আচ্ছা, বেশ। এখন তোমার বিশ্রাম করা দরকার। এইভাবে আর চলতে পারে না।

সতীনাথ। এই মাত্র আমি ফ্রেস্‌কো থেকে আসছি।

কল্যাণী। কিন্তু তুমি তোমার মনকে বিশ্রাম দাও নি। মনটা আবার তোমার একটু বেশী কাজ করে। মনের ওপরেই কিন্তু সব নির্ভর করে।

সতীনাথ। সকালেই আমি বেরিয়ে পড়বো। সকালে হয়তো আমি ভাল বোধ করতেও পারি। (কল্যাণী সতীনাথের জুতোজোড়া খুলে নিচ্ছে) কপালের শিরগুলো যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়।

কল্যাণী। এ্যাস্‌পিরিন খেয়ে নাও না। এনে দেবো একটা ট্যাবলেট ? সব ঠিক হয়ে যাবে।

সতীনাথ। (বিস্ময়জড়িত চোখে) গাড়ী আমি ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছিলাম, বুঝলে ? আমি ছিলামও বেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও আমি লক্ষ্য ক'রছিলাম। তুমি কল্পনা করতে পার, সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি দেখে চলেছি সেইসব দৃশ্য। কিন্তু সেখানে সেই দৃশ্য কি

সুন্দর, বুঝলে কল্যাণী, ঘন ঘন গাছের সারি আর উত্তপ্ত সূর্য্যের কিরণ। গাড়ীর উইণ্ড-স্ক্রীনটা আমি খুলে দিলাম আর গরম হাওয়া আমাকে স্নান করিয়ে দিয়ে গেল। তখনই হঠাৎ যেন আমি সরে যেতে লাগলাম রাস্তা থেকে। তোমাকে কি ব'লব, আমি একেবারে ভুলে গেলাম গাড়ী চালাতে। সাদা লাইনের ওপর দিয়ে অন্য দিকে যদি আমি যেতাম, কাউ-কে না কাউকে নিশ্চয়ই চাপা দিতাম। তাই, আবার আমি চলতে লাগলাম—আর পাঁচ মিনিট পরে স্বপ্নের ঘোর জড়িয়ে এল আমার চোখে—আমি প্রায়—(দু'আঙুলে চেপে ধরল দুটি চোখ) এমনি অনেক চিন্তা এসেছে আমার মাথায়, অনেক,—অনেক সব অদ্ভুত চিন্তা!

কল্যাণী। দ্যাখো, শোন। তুমি আর একবার তাদের সঙ্গে কথা বল। ক'লকাতায় কেন তুমি কাজ ক'রতে পারবে না, এর কোন যুক্তি নেই।

সতীনাথ। ক'লকাতায় তারা আমাকে চায় না। তারা আমাকে এখানেই চায়।

কল্যাণী। কিন্তু তোমার বয়স ষাট বছর হয়েছে। তারা আশা করতে পারে না যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ তুমি বাইরে বাইরে ঘুরবে।

সতীনাথ। আমাকে একটা তার করতে হবে পাটনায়। কাল সকালে বিপিন ও মোহনের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে, লাইনটা তাদের দেখিয়ে দেব। (বিড় বিড় ক'রে) বিক্রী আমি করতে পারতাম? (জামা পরতে লাগল)

কল্যাণী। (জামাটা সতীনাথের কাছ থেকে নিয়ে) তুমি কালই কেন সেখানে যাও না। হরেনকে বলো যে তুমি ক'লকাতায় কাজ করতে চাও। (একটু ইতস্ততঃ ক'রে) তুমি বড় ···

সতীনাথ। বুড়ো রাসবিহারী বোস যদি বেঁচে থাকতেন, ক'লকাতার ভার এতদিন আমার ওপরেই পড়তো। তিনি ছিলেন রাজা লোক, তাঁর একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। আর তাঁর ছেলে—এই হরেন। কিছুও যদি সে বুঝত! উত্তর অঞ্চলে [illegible] আমি [illegible] যাই, বুঝলে, রাসবিহারী বোস কোম্পানী কি তখন জানতো আসানসোলের এই খনি অঞ্চলের কোন খবর!

কল্যাণী। এই সব কথা তুমি হরেনকে বল না কেন!

সতীনাথ। হ্যাঁ, তাই আমি বলব, নিশ্চয়ই বলব। খাবার কিছু আছে?

কল্যাণী। দু'খানা পরোটা ক'রে দিই।

সতীনাথ। না, না থাক। তুমি ঘুমোও গে। একটু দুধ খেয়ে নিলেই হবে। ছেলেরা বাড়ীতে আছে কি?

কল্যাণী। তারা ঘুমোচ্ছে। দ্যাখো, সন্মথ আজ মন্মথকে নিয়ে গিয়েছিল।

সতীনাথ। (সাগ্রহে) তাই নাকি?

কল্যাণী। ওদের একসঙ্গে কিছু করতে দেখলে কি ভালই না লাগে। দুজন ওরা যখন এক-সঙ্গে বেরিয়ে গেল—

সতীনাথ। আচ্ছা, আজ সকালে আমি চলে যাবার পর মন্মথ কিছু বলেছিল?

কল্যাণী। ওরকম ক'রে তাকে তোমার বকা উচিত হয় নি, তাছাড়া কেবল তখন সে ট্রেন থেকে নেমেছে। ওকে দেখলেই তোমার মেজাজ একেবারে খারাপ হয়ে যায়।

সতীনাথ। মেজাজ আমার আবার খারাপ হ'ল কখন? সে টাকা-পয়সা রোজগার করছে কি না,—এই কথাটাই শুধু আমি জিজ্ঞাসা ক'রে-ছিলাম। এতেই তাকে বকা হয়ে গেল?

কল্যাণী। কিন্তু টাকা-পয়সা সে রোজগার করবে কি ক'রে?

সতীনাথ। (উদ্বিগ্ন উত্তেজনায়) সবসময় ও যেন ভাবের ওপরেই চলে। কেন, সকালে আমি যখন যাই, আমার কাছে তখন দোষটা স্বীকার করতে ওর কি হয়েছিল?

কল্যাণী। সে একেবারে [illegible]উৎসাহ হয়ে পড়েছে। তোমাকে [illegible] কিরকম শ্রদ্ধা ক'রে তা তুমি জান

না। যদি সে নিজে একটু মানিয়ে চলে, তাহলে আমার মনে হয়, তোমরা দুজনেই খুব সুখী হবে; আর তোমাদের মধ্যে ঝগড়া হবে না।

সতীনাথ। আগে আমি ভাবতাম, এখনও সে ছেলে-মানুষ। পাঁচ জায়গায় দেখে-শুনে বেড়াক, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুক। কিন্তু দেখতে দেখতে আজ দশ বছরেরও বেশী হয়ে গেল, আজও সপ্তাহে সাতটি টাকা এনে দেবার ক্ষমতা তার হ'ল না।

কল্যাণী। ক্রমে ক্রমে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টাই সে করছে।

সতীনাথ। হ্যাঁ, এই দশ বছরে ক'টা কারখানায় সে ঢুকেছে একের পর এক? তার হিসেব রাখ কি?

কল্যাণী। তা রাখি। কিন্তু···

সতীনাথ। কোনও কিন্তু নেই। বাইশ বছর বয়েস হল, আজও সে তোমার সঙ্গেই মানিয়ে চলতে পারলো না। মানে—

কল্যাণী। চুপ্।

সতীনাথ। মানে, মন্মথ একটি কুঁড়ের রাজা। তা না হলে—

কল্যাণী। আঃ, চুপ কর না! ও ঘরে ছেলেরা ঘুমুচ্ছে।

সতীনাথ। একটা কারখানাতেও সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলো না!

কল্যাণী। চল, তুমি খাবে চল।

সতীনাথ। ও কেন বাড়ী আসে বলতে পার? কিসের টানে ও বাড়ী আসে?

কল্যাণী। জানি না। আমার মনে হয় কি জান? সে বোধ হয় কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

সতীনাথ। পথ খুঁজে পাচ্ছে না? অমন শক্ত-সমর্থ ছেলে সে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। পরিশ্রমও করতে পারে। তাছাড়া, মন্মথ তো কুঁড়ে নয়।

কল্যাণী। নিশ্চয়ই।

সতীনাথ। (করুণ ও দৃঢ় [illegible] কণ্ঠে) সকালেই তার সঙ্গে আমি [illegible] খুব ভালভাবে তার সঙ্গে আমি আলোচনা ক'রব। একটি কাজ আমি ওকে ঠিক ক'রে দিতে পারবো। ও ঠিক উন্নতি করবে। হায় ভগবান! ভাব দেখি, ও যখন স্কুলে পড়ত, কি ছেলে ছিল ও। সহ-পাঠিরা ওর পেছনে পেছনে ঘুরত, ও হাসলে তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠত; ও যখন রাস্তা দিয়ে চলত··· (অতীত স্মৃতির ঘোরে ডুবে যায়)

কল্যাণী। তুমি খেতে যাবে না? জান, আজ মোগলাই পরোটা তৈরী ক'রেছি?

সতীনাথ। কেন? মোগলাই কেন? জান আমি ও সব খাই না, তবুও—

কল্যাণী। একটু মুখ বদলানো হবে তো!

সতীনাথ। না, মুখ বদলাতে আমি চাই নে। অত খরচ ক'রে কি দরকার মুখ বদলাবার?

কল্যাণী। (হেসে) আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে তাক লাগিয়ে দেব।

সতীনাথ। (একটু উঁচু গলায়) তুমি এই জানলাগুলো খুলে দেবে কি দয়া করে?

কল্যাণী। (ধৈর্য্য সহকারে) জানলাগুলো তো খোলাই আছে।

সতীনাথ। একেবারে যেন গুদামজাত ক'রে রেখেছে আমাদের। কেবল ইট আর জানলা, জানলা আর ইট।

কল্যাণী। রাস্তার ওপাশে ঐ জমিটা আমাদের কিনতে পারলে ভাল হয়।

সতীনাথ: সারাদিন রাস্তাটা গাড়ীতে জাম থাকে। একটু খোলা বাতাস কোথাও পাবার উপায় নেই। ঘাসগুলো পর্য্যন্ত জন্মায় না। এ রকম ঘরের পর ঘর সাজিয়ে বাড়ী তৈরী করার বিরুদ্ধে আইন হওয়া উচিত। তোমার মনে আছে বোধ হয়, ওখানে সুন্দর দুটো দেবদারু গাছ ছিল, এদের মাঝখানে আমি আর মন্মথ দোলনা টাঙিয়েছিলাম।

কল্যাণী। হ্যাঁ, যেন শহর থেকে কতদূরে ছিলে তোমরা।

সতীনাথ। এই সব গাছ কেটে যারা বাড়ী তৈরী ক'রেছে, তাদের গ্রেপ্তার করা উচিত। এই পাড়াটাকেই একেবারে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। (অতীত স্মৃতির ঘোরে) সেই সময়কার কথা কেবলই আমার মনে পড়ে, কল্যাণী। বছরের ঠিক এই সময়টাতে যুঁই আর চাঁপা ফুল ওখানে ফুটত। তারপর হ'ত বেল আর শেফালি ফুলের বাহার। কি সুগন্ধ আসত আমাদের ঘরে, ভাব দেখি!

কল্যাণী। কিন্তু, লোককে এক জায়গায় না এক জায়গায় মাথা গুঁজে থাকতে হবে তো!

সতীনাথ। না, লোক এখন আরও বেশী হয়েছে।

কল্যাণী। আমার তা' মনে হয় না। আমার মনে হয়—

সতীনাথ। লোক আগের চেয়ে বেশী হয়েছেই। তাইতেই তো দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ না, লোকসংখ্যা ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। ঐ পাশের বাড়ী থেকেই এর বীভৎসতার আঁচ করতে পারবে। (কিছুক্ষণ পরে) আচ্ছা মোগলাই পরোটা কি দিয়ে তৈরী হয়? (ছেলেদের ঘরে মন্মথ ও সন্মথ'র ঘুম ভেঙে যায়, সতীনাথের শেষের কথাটির সঙ্গে সঙ্গে তারা বিছানায় উঠে বসে, আর মা ও বাবার কথা শুনতে থাকে)

কল্যাণী। চল না, নীচে গিয়ে সব দেখবে আর নিশ্চিন্ত হবে।

সতীনাথ। (অপরাধীর দৃষ্টিতে কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে) আমার জন্য তোমার খুব দুর্ভোগ ভুগতে হয়, না?

মন্মথ। কি ব্যাপার?

সন্মথ। শুনে যাও।

কল্যাণী। দুর্ভোগের কারণ কি তুমি একটুও সৃষ্টি কর না?

সতীনাথ। তুমিই আমার অবলম্বন, কল্যাণী।

কল্যাণী। একটু সহজ হবার চেষ্টা কর। তুমি একেবারে তিলকে তাল ক'রে বসো।

সতীনাথ। ওর সঙ্গে আর আমি ঝগড়া ক'রব না। সে যদি ঝরিয়ায় যেতে যায় তো যাক না।

কল্যাণী। ও নিজের পথ ক'রে নেবে, তুমি দেখে নিও।

সতীনাথ। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই অনেকে জীবনের অনেক দিন পর্য্যন্ত কিছু করে উঠতে পারে না। যেমন, ওদেশের টমাস এডিসন। (শোবার ঘরের দিকে যেতে থাকে) মন্মথর পেছনে আমি টাকা খরচ ক'রব।

কল্যাণী। দেখ, যদি গরম পড়ে, তাহলে এই রবিবারে গাড়ী ক'রে আমরা কিন্তু গাঁয়ের দিকে বেড়াতে যাব। আর উইণ্ডস্ক্রীন খুলে আমরা খাওয়া দাওয়া ক'রব।

সতীনাথ। না। নোতুন গাড়ীতে উইণ্ডস্ক্রীন খোলা যায় না।

কল্যাণী। কেন, তুমিই তো আজ খুলেছিলে।

সতীনাথ। আমি? না, আমি খুলি নি। (একটু থেমে)

এটা অদ্ভুত নয় কি? এটা কি লক্ষ্য করার মত নয় যে—(দূরে বাঁশীর সুর শোনা গেল। বিস্ময়ে, ভয়ে হঠাৎ থেমে গেল সতীনাথ)

কল্যাণী। কি হ'ল?

সতীনাথ। সেইটেই সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করার বিষয়।

কল্যাণী। কি?

সতীনাথ। আমি শেভি গাড়ীটার কথা ভাবছি। (একটু থেমে) উনিশ শ' আটাশ···যেন লাল শেভিটা আমার ছিল—(হঠাৎ থেমে যায়) সেই গাড়ী, সেই গাড়ীটাই যেন আজ আমি চালাচ্ছিলাম।

কল্যাণী। ও কিছু নয়। কি ক'রে হয়তো পুরোনো কথা তোমার মনে পড়ে গেছে।

সতীনাথ। মনে পড়বার মত। ভেবে ত্যাখ দেখি সেই-সব দিনের কথা। মন্মথ কিভাবে গাড়ীখানাকে চড়ে চড়ে বেড়াত; লোকে বিশ্বাসই করত না এই গাড়ী আশী হাজার মাইল চলেছে। (ঘাড় দুলিয়ে) হেঁ হেঁ। (কল্যাণীর প্রতি) চোখ বোঁজ, দেখবে আমি এবার ঠিক হয়ে যাব। (ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে যায়)

সন্মথ। (মন্মথকে) বোধ হয় এবারও বাবা গাড়ী-খানাকে চুরমার ক'রেছেন।

কল্যাণী। (সতীনাথকে ডেকে) ছাখো, তোমার খাবার মেজেতে ঢাকা দেওয়া রয়েছে। সাবধানে ঢাকনিটা তুলবে—(ফিরে এসে, সতীনাথের জামাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল সতীনাথকে অনু-সরণ ক'রে)

[আলো এবার পড়লো ছেলেদের ঘরে। নেপথ্যে সতীনাথের গলা শোনা গেল,—"আশী হাজার মাইল, হেঁ হেঁ হেঁ···" মন্মথ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সিঁড়ি বেয়ে কিছুদূর নীচে এসে দাঁড়িয়ে যায়, মনোযোগ দিয়ে কি যেন শোনে]

সন্মথ। (বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে) আমার ভয় হচ্ছে, বুঝলি দাদা। বাবা বোধ হয় এবার লাইসেন্সটা হারাবে।

মন্মথ। ওর চোখ খারাপ হয়ে গেছে।

সন্মথ। না। ওর সঙ্গে আমি গাড়ীতে চলেছি। ওর চোখ ঠিকই আছে। উনি মন দিয়ে গাড়ী চালান না সব সময়। গত হপ্তায় ওর সঙ্গে

আমি সহরে গেছলাম। নীল বাতি দেখে উনি গাড়ী থামালেন। বাতি যখন লাল হ'ল তখন উনি গাড়ী ছেড়ে দিলেন। (হাস্য)

মন্মথ। হ'তে পারে, উনি রং-কাণা।

সন্মথ। কেন, ব্যবসায়ে কিন্তু উনি খুব ভাল রঙ্ চিনতে পারেন। তুমি তো তা জান।

মন্মথ। (বিছানার ওপর বসে পড়ে) আমি এখন ঘুমোতে যাচ্ছি।

সন্মথ। আচ্ছা, তুই কি এখন বাবার ওপর রেগে আছিস?

মন্মথ। আমার মনে হয় উনি ঠিকই আছেন। ...... তুই সিগারেট খাচ্ছিস্?

সন্মথ। (একটা প্যাকেট তুলে ধরে) খাবে নাকি একটা?

মন্মথ। (একটা সিগারেট নিয়ে) সিগারেটের গন্ধ পেলে আমি আর ঘুমোতে পারি না।

সন্মথ। (আবেগভরে) একটা মজার ব্যাপার জানিস্, দাদা? আমরা এখানে আবার সেই পুরোনো বিছানাতেই ঘুমোচ্ছি। (কোমল ভাবে বিছানা চাপড়ায়) সারা জীবনটা আমাদের কেটে গেল এখানেই।

মন্মথ। আচ্ছা, বীণা রায় না মীনা রায় সেই মেয়েটিকে তোর মনে পড়ে? সেই যে সেই—

সন্মথ। (চুলের ওপর ছোট চিরুণীখানা টেনে নিয়ে) সেই কুকুরওলা বাড়ীর মেয়ে?

মন্মথ। সে তো একটা। সেখানেও বুঝি তোকে আমি নিয়ে গেছলাম।

সন্মথ। হ্যাঁ, সেই তো আমার প্রথম। (হাসে) মেয়েদের সম্বন্ধে তুই তো যা-কিছু আমাকে শিখিয়েছিস্।

মন্মথ। মনে ক'রে ছাখ দেখি, কি রকম লাজুক ছিলি তুই! বিশেষতঃ মেয়েদের সম্পর্কে।

সন্মথ। এখনও আমি সেই রকম।

মন্মথ। চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও,—তা হলে—

সন্মথ। আমি এটাকে ঠিক আয়ত্বে আনি, এই যা। আমার মনে হয়, তুই-ই তো আমার চেয়ে বেশী সলজ্জ ভাব দেখাস্। এই কি হ'ল? দাদা? কি হ'ল রে? (মন্মথ'র হাঁটু ধরে নাড়া দেয়। মন্মথ উঠে দাঁড়ায় আর পায়চারি করতে থাকে অস্থির ভাবে) হ'ল কি?

মন্মথ। বাবা সব সময় আমাকে টিট্‌কিরী দেয় কেন?

সন্মথ। তিনি তোকে টিটকিরী দেবেন কেন? মানে,—তিনি—

মন্মথ। যা' কিছুই আমি বলি না কেন, তার মুখে সব সময় ফুটে ওঠে একটা টিটকিরীর ভাব। আমি, আমি তার কাছেও যেতে পারি নে।

সন্মথ। না রে। তিনি চান, তুই ভাল হ', ব্যস্। তোর সম্পর্কে আমি বাবার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম, বুঝলি? কি যেন একটা তাঁর

রমা ছায়াচিত্রের 'মনের ময়ূর' চিত্রে চন্দ্রাবতী ও উত্তমকুমার

হয়েছে, নিজে নিজেই তিনি কথা বলতে লাগলেন।

মন্মথ। আজ সকালে আমি তা' করেছি। ও, দেখি কেবলই বিড়বিড় করছে।

সন্মথ। ওটা ততো লক্ষ্য করবার নয়। তবে যা অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল, আমি তাকে Fresco-তে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আর, বুঝলি, সব সময় কেমন তোর কথাই বলছিলেন।

মন্মথ। আমার সম্বন্ধে সে কি বলে?

সন্মথ। আমি বুঝতে পারি নে।

মন্মথ। আমি জানতে চাই, কি সে বলে আমার সম্বন্ধে।

সন্মথ। বোধ হয় এই কথাই... তুই এখনও পাকা ... করতে পারছিস না, ঘুরে ঘুরে ...

মন্মথ। তার হতাশার কারণ আরও দু'একটা আছে এ ছাড়া। কি বলিস্?

সন্মথ। মানে, তুই কি বলতে চাস্।

মন্মথ। যাকগে মরুকগে শুধু সব কিছুই আমার ওপর চাপিয়ে দিও না, এইটুকুই চাই।

সন্মথ। তুই যদি কোনও একটা কিছু করতে পারতিস্—মানে—আমি বলছিলাম কি,—ওখানে তোর কোনও ভবিষ্যৎ আছে কি?

মন্মথ। আমি তোকে বলে দিচ্ছি সন্মথ, ভবিষ্যৎ-টবিষ্যৎ আমি বুঝিনে। কি আমি চাই, কি আমার চাওয়া উচিত কিছুই আমি বুঝিনে।

সন্মথ। কি বলতে চাস্ তুই?

মন্মথ। ছ' সাত বছর আমি হাই স্কুলে কাটিয়েছি, নিজেকে তৈরী করে নেবার চেষ্টা করেছি। শিপিং ক্লার্ক, সেলস্‌ম্যান, একটা না একটা কাজ ক'রে দেখেছি। গরমে রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াও, সারাজীবন ধরে শুধু ষ্টক রেখে যাও, টেলিফোন এ্যাটেণ্ড ক'র বা কেনা-বেচা করেই যাও, দু'হপ্তার ছুটির জন্যে পঞ্চাশটা হপ্তা কষ্ট ভোগ ক'র। আর সব সময় তোমার প্রতিবেশীর চেয়ে আগে যেতে চেষ্টা ক'র। এই তো তোমাদের ভবিষ্যৎ? অমন ভবিষ্যৎ আমি চাইনে।

সন্মথ। আচ্ছা এখন যেখানে তুই আছিস, সেখানে তুই সুখে আছিস তো?

মন্মথ। দ্যাখো। জীবনে এ পর্য্যন্ত আমি কুড়ি-পঁচিশ রকমের কাজ পেয়েছি। সবগুলিই প্রায় একই রকম দাঁড়িয়েছে। সেইজন্যেই তো আমি বাড়ীতে এসেছি। যে ফার্মে আমি কাজ করি, তাদের পনেরোটি নতুন ঘোড়ার বাচ্চা আছে। নতুন ঘোড়ার বাচ্চা আর মাদী ঘোড়া ছাড়া সেখানে কিছুই চোখে পড়বে না। সেখানে এখন খুব শীত কিন্তু এখন বসন্তকাল। বসন্তকাল যখন আসে যেখানেই থাকি না কেন,

আমার মনে হয়, হা ভগবান, আমি কোথাও কিছু করতে পারছি না! ঘোড়া নিয়ে খেলা ক'রে আর হপ্তায় দশ টাকা ক'রে পেয়েই কি আমার ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে? ছুটে আমি বাড়ী চলে এলাম। কি করব, এখন, কিছুই জানিনে। (একটু থেমে) জীবন যাতে নষ্ট না হয় তার চেষ্টা আমি বরাবরই করেছি, কিন্তু যখনই এখানে আসি, আমি জানতে পারি যা' কিছু আমি ক'রেছি, তা' আমার জীবনকে নষ্ট করেছে।

সন্মথ। তুই কবি, তুই-ই সে-সব জানিস্। তুই—তুই একজন আদর্শবাদী।

মন্মথ। না, না। আমি খুব খারাপ হয়ে পড়েছি। হয়তো, এতদিন আমার বিয়ে করা উচিত ছিল। হয়তো, কোন একটা কাজে আমার লেগে থাকা উচিত ছিল। হয়তো, হয়তো এইটেই আমার অস্বস্তির মূল। কিন্তু তুই কি সুখী, সন্মথ? তুই কি সফল হয়েছিস জীবনে? বল?

সন্মথ। কখনই না।

মন্মথ। কেন? তুই তো টাকা আয় ক'রে আনছিস্, আনছিস্ নে?

সন্মথ। (পায়চারি ক'রে) আমাকে এখন কি করতে হবে জানিস? এই ম্যানেজারটা মরা পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তাহলে যদি আমি কোনও দিন ম্যানেজার হ'তে পারি! অবশ্য আমার সঙ্গে সে ভাল ব্যবহারই করে। বিরাট এক সম্পত্তি কিনেছিল লক্ষ্ণৌ সহরে, তা' কি করলে জানিস? বেচে দিলে। এখন আর একটা সম্পত্তি সে সে কিনেছে। সম্পত্তি সে ভোগ করে না বুঝলি? আমিও হয়তো এইরকম করতাম। কিসের জন্যে আমি কাজ করে যাচ্ছি জানিনে। একা একা বসে মাঝে মাঝে আমি ভাবি, কি আমি চাই? নিজের বাড়ী? গাড়ী? মেয়েছেলে? বোধ হয় এই সবই আমি চাই। তবুও আমি একা।

মন্মথ। (সাগ্রহে) এক কাজ করলে হয়না? তুই চল না আমার সঙ্গে পাটনার দিকে?

সন্মথ। তুই আর আমি? হেঁ হেঁ!

মন্মথ। নিশ্চয়ই। আমরা হয়তো একটা খামার কিনে ফেলতে পারি। তারপর সেখানে গতর খাটিয়ে পশুপালন ক'রে কারবার সুরু করতে পারি। শরীর আমাদের খুব খারাপ নয়।

সন্মথ। (ব্যগ্রভাবে) দি সরকার ব্রাদার্স লিমিটেড, না?

মন্মথ। (সস্নেহে) নিশ্চয়ই। সহরের মহল্লায় মহল্লায় আমাদের নাম ছড়িয়ে পড়বে।

সন্মথ। (মু[illegible] ভঙ্গীতে) এই সব কথা আমিও ভাবি, [illegible] মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে করে, আমি [illegible] ধরি চেপে [illegible] খালে আমি যে কোনও লো[illegible] দিতে

পারি আর এই সব শুয়োরের বাচ্চাদের হুকুম আমাকে তামিল করতে হয় !

মন্মথ। শোন ভাই, তুই যদি আমার সঙ্গে থাকিস তাহলে আমি খুব সুখী হব।

সন্মথ। বুঝলি, আশপাশের লোকেরা এত অসৎ যে আমার আদর্শ ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে।

মন্মথ। শোন, আমরা দু'জনে দু'জনের পাশে দাঁড়াব। আমাদের দুজনেরই চাই এমন কাউকে যাকে দুজনেই বিশ্বাস করতে পারি।

সন্মথ। আমি যদি তোর পাশে থাকতাম—

মন্মথ। দ্যাখ্, টাকার জন্যে যে কোন কাজ করতে আমাদের জন্ম হয় নি। সে রকম কাজ করতে আমি জানিই না।

সন্মথ। আমিও না।

মন্মথ। তাহলে কাজ সুরু ক'রে দেওয়া যাক।

সন্মথ। একটা কথা। কি করা সেখানে সম্ভব হতে পারে ?

মন্মথ। তোর ম্যানেজারের কথা ভেবে দ্যাখ। সম্পত্তি কেনে কিন্তু ভোগ করার মত মনের শান্তি নেই।

সন্মথ। কিন্তু সে যখন ষ্টোরের মধ্যে ঢোকে তখন নিশান ওড়ে তার সামনে। তা'র মত ক'রে ষ্টোরের মধ্যে আমি ঢুকে যেতে চাই, বুঝলি ? আমরা এক সঙ্গেই থাকব। কিন্তু দাদা, ঐ ছুটোকে সঙ্গে নিস্।

মন্মথ। ও ছুটোকে কি নেবে। আমি একটা মেয়ে খুঁজছি, ধীর, শান্ত আর যথেষ্ট বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে।

সন্মথ। না, না সব কিছু মাথা পেতে মেনে নেয় এমন মেয়ে ভাল নয়। এমন মেয়ে চাই যার মনের দৃঢ়তা আছে আর প্রতিরোধ করার শক্তি আছে।

মন্মথ। সে ঠিক হবে'খন। এখন ঘুমোনো যাক।

সন্মথ। কিন্তু কিছুই তো ঠিক হ'ল না।

মন্মথ। ঠিক হয়ে যাবে। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে, বুঝলি ?

সন্মথ। কি ?

মন্মথ। আমি একবার অলিভার সাহেবের কাছে যাব।

সন্মথ। তা' যা না। সাহেব তো তোর পুরোনো মনিব। কিন্তু তার কাছেই আবার কাজ করবি নাকি ?

মন্মথ। না রে। সেবার যখন ছেড়ে আসি সাহেব আমাকে ডেকে বলেছিল,—সরকার, আমার সাহায্যের যদি কোন সময় দরকার হয় এসো, সঙ্কোচ ক'রো না।

সন্মথ। তুই এখন তার কাছ থেকে কি সাহায্য নিবি ?

মন্মথ। যদি কিছু টাকা পাওয়া যায়।

সন্মথ। তা' পাওয়া গেলেও পাওয়া যেতে পারে। সাহেব তো তোকে খুবই ভালবাসত।

মন্মথ। অন্ততঃ সাত-আট হাজার টাকা—

সতীনাথ। (ছেলেদের ঘরের নীচে অন্ধকারের মধ্যে) মন্মথ, তুমি ইঞ্জিনটা পরিস্কার করো।

সন্মথ। (মন্মথর প্রতি ইঙ্গিতে) চুপ।

[মন্মথ সন্মথর দিকে তাকায়, সন্মথ নীচের দিকে তাকিয়ে শুনতে থাকে, সতীনাথ বিড়বিড়্ ক'রে চলে]

সন্মথ। শুনছিস্ ? (তারা দুজনে শোনে। সতীনাথ হেসে ওঠে)

মন্মথ। (রাগতভাবে) সে কি জানে এই সব শুনতে পারে ?

সতীনাথ। তোমার জার্সিটা ময়লা ক'রো না, মন্মথ। (বেদনার ছায়াপাত হয় মন্মথর চোখে মুখে)

সন্মথ। সেই মারাত্মক ব্যাপার সুরু হ'ল আবার। তোর এখানেই থাকা উচিত। অন্য কোথাও তোর আর যাওয়া হবে না। দেখ'ছিস না—

সন্মথ। মা এই সব শুনতে পাচ্ছে ?

সতীনাথ। না বাবা মন্মথ, তুমি এবার দিন পেয়েছ।

মন্মথ। এখন ঘুমোনো যাক। তুই বরং সকালে বাবার সঙ্গে একবার দেখা করিস্। (মন্মথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিছানা নিল। সন্মথও শুয়ে পড়ল। তাদের ঘরের ওপর থেকে আলো সরে গিয়ে ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল)

মন্মথ। (বিরক্তিভরে) কি কথা বলব ওর সঙ্গে ?

সন্মথ। চুপ.।

[ছেলেদের ঘর অন্ধকার হয়ে যায়। তাদের কথা শেষ হবার আগেই নীচের বসবার ঘরে অস্পষ্টভাবে সতীনাথকে দেখা গেল অন্ধকারে। আবহসঙ্গীতের মাঝে সতীনাথ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে]

সতীনাথ। তোমাকে মেয়েদের সম্পর্কে সাবধান হ'তে হবে, মন্মথ। আর কিছু আমি চাই না। কোনো প্রতিশ্রুতি দেবে না। তুমি যা বলবে তাতেই তারা বিশ্বাস করবে। তোমার বয়েস অল্প,—

তোমাকে সাবধানে থাকতে হবে।

[বসবার ঘরের বাইরে মঞ্চের সম্মুখভাগ আলোকিত হ'ল। আধো আলো আধো অন্ধকারে দেখা গেল সতীনাথ চেয়ারটা পিছনে রেখে টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। শূন্য দৃষ্টিতে কাকে যেন সম্বোধন করে কথা বলছে কণ্ঠস্বর তার স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক উচ্চ]

সতীনাথ। তুমি কি সুন্দর গাড়ী পালিশ করো। সন্মথ, জানালার ওপর না হয় খবরের কাগজ লাগিয়ে দাও। মন্মথ, ওকে দেখিয়ে দাও, বাবা, কি ক'রে লাগাতে হয়।···হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, ঠিক এই রকম। (মাথা নাড়ে। পরে ওপরের দিকে চেয়ে নেয়) মন্মথ, অশ্বথ গাছের ডালটা ছাখো, ছাতে এসে পড়েছে, সময় পেলে ওটাকে কেটে দিও।···ছাখো গাড়ীটা শেষ হয়ে গেলে তোমরা আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। তোমাদের আমি একটা জিনিস দেব।

কিশোর মন্মথ। (নেপথ্যে) কি জিনিস বাবা ?

সতীনাথ। আগে কাজ শেষ কর। শেষ না ক'রে কোনও কাজ কোনও দিন ফেলে রাখবে না।··· আসছে বার ঐ বাগানটা আমি কিনবো। দেবদারু গাছ দুটোতে একটা দোলনা করে দেব ছেলে দুটোর জন্মে। মন্মথ—

[কিশোর মন্মথ ও কিশোর সন্মথ প্রবেশ করে। যে দিকে মুখ ফিরিয়ে সতীনাথ কথা বলছিল, সেই দিক দিয়েই তারা ঢোকে। মন্মথর গায়ে একটি জার্সি]

কিশোর মন্মথ। কি বাবা ?

সতীনাথ। গাড়ীটা পরিষ্কার হয়ে গেছে ?

কিশোর মন্মথ। হ্যাঁ।

কিশোর সন্মথ। কি দেবে বলেছিলে বাবা।

সতীনাথ। গাড়ীর পেছনের সীটে আছে। (সন্মথ ছুটে যায়)

কিশোর মন্মথ। কি রে সন্মথ ?

কিশোর সন্মথ। (নেপথ্যে) ফুটবল।

কিশোর মন্মথ। বাবা তুমি কি করে জানলে আমাদের ফুটবল ছিঁড়ে গেছে ? (সন্মথ বল নিয়ে ঢোকে)

সতীনাথ। কেমন সুন্দর বল, বল্ দেখি ?

মন্মথ ও সন্মথ। খুব ভাল। যুবতী কল্যাণী প্রবেশ করে রিবনে চুল বাঁধা, হাতে তার এক ঝুড়ি) ময়লা কাপড়)

যুবতী কল্যাণী। ছেলেদের নিয়ে বুঝি খুব আদর হচ্ছে ?

সতীনাথ। হবেই তো। কেন হবে না ? তুমি কোথায় যাচ্ছ ? ও। এই, তোমরা এবার তোমাদের মায়ের কাজে সাহায্য করো। এই ঝুড়িটা পৌঁছে দিয়ে এস ছুটোছুটি।

কিশোর মন্মথ। (মন্মথর প্রতি) এই, ধর।

কিশোর মন্মথ। কোথায় নিয়ে যেতে হবে, মা ?

যুবতী কল্যাণী। তোমাদের কোথাও নিয়ে যেতে হবে না। তোমরা বরং নীচে যাও, ছেলেদের সঙ্গে খেলা করো গে। আমাদের ওখানটাতে স্যাখোগে অনেক ছেলে এসেছে। তারা খেলতে পারছে না।

সতীনাথ। (হেসে) তুমিও বরং যাও, গিয়ে ওদের দেখিয়ে দাও কি করে খেলতে হবে।

মন্মথ। আমরা বরং মাঠটা ঝাঁট দিয়ে নিই গে। তার পর বল খেলা যাবে।

সতীনাথ। হ্যাঁ, যাও খুব ভাল কাজ।

মন্মথ। (দেয়াল ঘেঁসে ঘরের অন্যকোণে যায়। নীচে তাকায়) এই, তোমরা সব মাঠটা ঝাঁট দাও, আমরা আসছি। (নেপথ্যে সাড়া পাওয়া যায়) —এই মন্মথ। ঝুড়িটা ধর (দুজনে ঝুড়িটা নিয়ে বসবার ঘরের দেয়াল ঘেঁসে সতীনাথের পেছন দিয়ে বেরিয়ে যায়)

যুবতী কল্যাণী। ওরা তোমাকে বেশ মান্য করতে শিখেছে।

সতীনাথ। এটা হ'ল শিক্ষা। এইভাবেই ছেলেদের শিক্ষা দিতে হয়।

যুবতী কল্যাণী। আচ্ছা, গাড়ীটা কি রকম চলছে ?

সতীনাথ। শেভ্রলে হলো সবচেয়ে ভাল গাড়ী। এর চেয়ে ভাল গাড়ী আর তৈরী হয় নি। কিরকম চলছে মানে ?

যুবতী কল্যাণী। বিক্রী-সিক্রী কেমন হচ্ছে ?

সতীনাথ। সেই কথা তোমাকে বলবো ভাবছিলাম। হ্যাঁ, বিক্রী তো হচ্ছে টাকাও আসছে।

যুবতী কল্যাণী। কি রকম ?

সতীনাথ। এই ধর গিয়ে সেদিন যে ফিরলাম চারদিন পরে, তাতে এসেছিল।

যুবতী কল্যাণী। দাঁড়াও [illegible] পেন্সিলটা [illegible] (পেন্সিল ও [illegible] আনে)

সতীনাথ। তাতে এসেছিল প্রায় তিনশ', তারপর···

যুবতী কল্যাণী। পাঁচশ'। (কাগজে টুক নেয়) তাহলে···

সতীনাথ। মুস্কিল হচ্ছে কি জান দু-তিনটে বড় বড় ষ্টোরই ছিল বন্ধ। তা নাহলে আমি আরও অনেক টাকা পেতাম। তারপর কাল এনেছি দু'শ'। আচ্ছা, কত টাকা দেনা আছে বলো তো ?

যুবতী কল্যাণী। গত মাসে সেলাই-এর কলটা ভেঙে গেল তখন ধার করতে হয়েছিল তিরিশ টাকা। তারপর, এ মাসে বাড়ীটা চুণকাম করে নিতে হলো তাতেও লেগেছে প্রায় কুড়ি টাকা।

সতীনাথ। বাড়ীওলা চুণকাম করে দিল না তাহলে। টাকাটা ভাড়া থেকে কেটে নিতে হবে। আর কি আছে ?

যুবতী কল্যাণী। অনেকদিন থেকেই তো একটা বড় দেনা পড়ে আছে। সেই যে আমার গয়না-গুলো বন্ধক দিয়ে মন্মথর সেবার অসুখ হলে বিশ্বনাথ মাড়োয়ারীর কাছ থেকে তিনশ' টাকা এনেছিলে।

সতীনাথ। এখানেই তো সাড়ে তিনশ'। নাঃ, কি করব কিছুই তো বুঝতে পারছিনে :

যুবতী কল্যাণী। সামনের হপ্তায় হয়তো আরও বেশী আয় হ'তে পারে।

সতীনাথ। হ্যাঁ, সামনের হপ্তায় আরও টাকা আমার চাই, আরও টাকা···(দু'জনে আস্তে আস্তে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে দাঁড়ায়। মঞ্চের আলো কমে আসে)।

যুবতী কল্যাণী। ওরকম ভাবে তুমি কথা বলো না, আমার ভয় করে। (দ্রুত প্রবেশ করে বিনয়)

বিনয়। কাকা, মন্মথ কোথায় ? সে যদি নাই পড়ে ?

সতীনাথ। (বিনয়ের দিকে একটু এগিয়ে উত্তেজনা ভরে) পরীক্ষায় তুমিই তাকে উত্তর বলে দেবে ?

বিনয়। দিয়ে তো থাকি। কিন্তু এ তো আর স্কুলের পরীক্ষা নয়। আমি এক্সপেল্ড হয়ে যেতে পারি।

স্মৃতিরেখা বিশ্বাস

অমিত মৃদুস্বরে বললে, 'অপরাধ করেছি।' মেয়েটি হেসে বললে, 'অপরাধ নয়, ভুল। সেই ভুলের শুরু আমার থেকেই।' প্রদীপ প্রোডাকসন্সের অনন্য চিত্রপ্রচেষ্টা 'শেষের কবিতা'র এই নাটকীয় মুহূর্ত্তে অমিত ও লাবণ্য: নির্ম্মলকুমার ও দীপ্তি রায়: পরিচালনা: মধু বসু

সতীনাথ। কোথায় সে? তাকে আমি চাবুক মারব।

যুবতী কল্যাণী। তুমি তার কাছ থেকে ফুটবলটা বরং চেয়ে নাও। এ সময় ওটা ঠিক ভাল হয় নি।

সতীনাথ। চাবুক মেরে তাকে আমি সোজা করব।

বিনয়। বিনা লাইসেন্সে সে গাড়ী চালিয়ে বেড়াচ্ছে।

সতীনাথ। চুপ কর।

বিনয়। মাষ্টারমশাই বলছিলেন—

সতীনাথ। তুমি এখন যাও বিনয়।

বিনয়। যদি এখনও উঠে পড়ে না লাগে তাহলে অঙ্কে সে নিশ্চয়ই ফেল করবে। (দ্রুত প্রস্থান)

যুবতী কল্যাণী। বিনয় ঠিক কথাই বলেছে। তোমার একটু দেখা দরকার।

সতীনাথ। (রেগে গিয়ে) তুমি কি চাও? মন্মথ ঐ বিনয়ের মত একটা কৃমিকীটে পরিণত হোক। না তা হবে না। তার তেজ আছে, ব্যক্তিত্ব আছে।

(কল্যাণীর চোখ জলে ভরে গেল। সে প্রস্থান করল তার শোবার ঘরে। বসবার ঘরে সতীনাথ একাই থাকল। আস্তে আস্তে বসার ঘরের দিকে সে পা বাড়ায়, আধো আলো আধো ছায়ার মধ্যে চেয়ারে বসে পড়ে। কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার উঠে দাঁড়ায় শূন্য দৃষ্টিতে)

সতীনাথ। একজন লোক ছিল, সে জীবন সুরু ক'রেছিল পিঠে ক'রে কাপড় ফিরি করতে করতে, আজ সে কয়লা-খনির মালিক…এর পেছনে কি রহস্য ছিল জান? সে জানত কি সে চায়, বেরিয়ে পড়ল আর পেয়েও গেল।… (আস্তে আস্তে বসে পড়ে চেয়ারে। সতীনাথ বসে পড়বার আগেই প্রবেশ করে রজনীকান্ত। ষাটের কাছাকাছি তার বয়েস। হাতে তার ব্যাগ ও ছাতা। মঞ্চের দক্ষিণ কোণ দিয়ে সে প্রবেশ করে। মঞ্চের চারিদিক ভাল ক'রে কিছু সময় ধরে লক্ষ্য করে। হাত-ঘড়িটা দেখে। দৃঢ় অথচ ধীর গতিতে সতীনাথের বাঁ পাশে টেবিল ঘেঁসে দাঁড়ায়। সতীনাথ অবশ্য ততক্ষণে বসে পড়েছে। রজনীকান্ত যেতেই সতীনাথ উঠে দাঁড়ায়)

রজনীকান্ত। তুমিই তাহলে সতীনাথ?

সতীনাথ। এই যে রজনীকান্ত, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। অনেকদিন ধরেই ভাবছি; কি ক'রে তোমার ভাগ্য ফিরল, বল ত'?

রজনীকান্ত। সে এক কাহিনী।

সতীনাথ। কি ক'রে তুমি সুরু কর?

রজনীকান্ত। অনেক উদ্যম, অনেক কাজের মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে। তার সব হিসেব আমি রাখি নি।

সতীনাথ। তোমার বাবার খোঁজে তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলে এইটুকু আমার মনে আছে।

রজনীকান্ত। হঁ্যা, বাবার খোঁজে বেরিয়ে ভুল পথে গিয়েছিলাম। ভূগোলের জ্ঞান তো তখন ভাল ছিল না।...আমাকে যেতে হবে বর্দ্ধমান, আমি গিয়ে পড়লাম ঝরিয়ায়। বয়েস তখন আমার সতেরো।

সতীনাথ। বাংলা ছেড়ে একেবারে বেহারে?

রজনীকান্ত। হঁ্যা। এই অঞ্চলটা কয়লা খনিরই অঞ্চল।

সতীনাথ। কয়লা খনি? আচ্ছা দাঁড়াও, ছেলেদের ডাকি, তারা শুন্থক।

রজনীকান্ত। না ছাখ, (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) আমার সময় নেই, আমার আর এক জায়গায় যাবার কথা আছে। ছেলেদের তুমিই বলো।

সতীনাথ। আচ্ছা বলো।

রজনীকান্ত। সতেরো বছর বয়সে সেই অচেনা অজানা জায়গার বিষয় আমি পড়েছিলাম, আর সেখান থেকে বেরিয়েছি একুশ বছর বয়সে। (হেসে) ভগবানের দয়ায় আজ আমি ধনী। (আস্তে খুব খুশীর স্থরে বাঁশী বাজতে থাকে)

সতীনাথ। আমার ছেলেরা আমার জন্যেই রসাতলে যাবে। তাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারছিনে।

রজনীকান্ত। কেন এত ভয় কিসের? তোমার ছেলেরা নিশ্চয়ই দুর্ব্বলস্বাস্থ্য নয়? (ঘড়ি দেখে ও মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে)

সতীনাথ। না তা নয়। ঠিক শিক্ষা বোধ হয় আমি তাদের দিতে পারছিনে। কি ক'রে আমি তাদের শিক্ষা দিই বল দেখি। (বাঁশীর স্থর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে)

রজনীকান্ত। (প্রতিটি কথার ওপর জোর দিয়ে ও উচ্চকণ্ঠে) দুর্গম দেশে আমি যখন প্রবেশ করি, আমার বয়স ছিল সতেরো। যখন আমি বেরিয়ে আসি তখন আমার বয়স একুশ। ঈশ্বরের কৃপাতেই আমি ধনী হয়েছিলাম। (আস্তে আস্তে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায় মঞ্চের দক্ষিণ কোণে)

সতীনাথ। ...ধনী হয়েছিলাম। এই শক্তিতেই আমি ওদের উদ্বুদ্ধ করতে চাই। দুর্গম প্রদেশ। ঠিক আছে, ঠিক আছে।

[রজনীকান্ত চলে গেছে। সতীনাথ একা একা বিড়বিড় করতে থাকে। বসার ঘরে চেয়ারখানাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায় এমনভাবে জ্বলে ওঠে আলো। শোবার ঘর থেকে প্রবেশ করে প্রবীণা কল্যাণী। চারি দিকে সন্ধান করে সতীনাথের। বাহিরে সতীনাথকে দেখে তার বাঁ পাশে এসে দাঁড়ায় কল্যাণী। সতীনাথ কল্যাণীর দিকে তাকায়]

কল্যাণী। কি হয়েছে? এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

সতীনাথ। ঠিক আছে।

কল্যাণী। কি ঠিক আছে? (সতীনাথ জবাব দেয় না) চল, অনেক রাত্তির হয়ে গেল, শোবে চল।

সতীনাথ। সেই সোনার ঘড়িটা কি হয়েছে বলতে পার? রজনীকান্ত প্রথম যেবার বিহার থেকে এখানে আসে, সে আমাকে দিয়েছিল ঘড়িটা।

কল্যাণী। সে তো বারো-তেরো বছর আগের কথা। সে-ঘড়ি তো তুমি বন্ধক দিয়েছিলে, মন্মথ যখন রেডিও সম্বন্ধে পড়তে যায়, তখন।

সতীনাথ। ঘড়িটা খুব ভাল ছিল।...আমি এখন একটু বাইরে বেড়াব।

কল্যাণী। সে কি? এত রাত্তিরে?

সতীনাথ। (প্রস্থানোদ্যত হয়ে মঞ্চের অপর কোণে এসে) ঠিক আছে। (মাথা নাড়তে নাড়তে অর্দ্ধস্বগতভাবে) কি মানুষ ছিল। একটা কথা বলার মত মানুষ ছিল সে।...ঠিক আছে।

কল্যাণী। শোন, ছাখো। এত রাত্রে কোথায় যাবে?

[সতীনাথ প্রায় চলে গেছে। মন্মথ তার শোবার ঘর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বসার ঘরে। পরণে তার পায়জামা। কল্যাণীকে দেখে]

মন্মথ। কি করছেন কি উনি এখানে?

কল্যাণী। (ইসারায়) চুপ।

মন্মথ। কতক্ষণ ধরে উনি ওরকম করছেন?

কল্যাণী। চুপ কর বাবা, উনি শুনতে পাবেন।

মন্মথ। ওর হয়েছে কি?

কল্যাণী। সব সকালে ঠিক হয়ে যাবে।

মন্মথ। আমাদের কিছু করতে হবে।

কল্যাণী। অনেক কিছুই তোমাদের করতে হবে বাবা, কিন্তু এখন কিছুই করার নেই। তোমরা শোও গে যাও।

[মন্মথ সিঁড়ি দিয়ে কিছুদূর নেমে এসে সিঁড়ির একটা ধাপে বসে। তারও পরণে পায়জামা]

মন্মথ। আমি ওঁকে এত চীৎকার ক'রে কথা বলতে কখনও শুনিনি, মা।

কল্যাণী। একটু যদি কাছে কাছে থাকো, তাহলে সব বুঝতে পারবে।

চেয়ারে গিয়ে বসে। সতীনাথের জামাটা নিয়ে রিপু করতে থাকে]

মন্মথ। তুমি এ সব কথা একদিনও আমাকে লেখনি কেন?

কল্যাণী। কোথায় লিখব। তিন মাস ধরে তুমি তো কোন ঠিকানাই দাও নি।

মন্মথ। এ তিন মাস এক জায়গায় আমি ছিলাম না। কিন্তু আমি যেখানেই থাকি তোমাদের কথা আমি সব সময় ভেবেছি।

কল্যাণী। সে আমি জানি বাবা। কিন্তু উনি চান তোমাদের চিঠি।

মন্মথ। আচ্ছা, মা, বাবা কি আজকাল সব সময়েই এই রকম থাকেন?

কল্যাণী। না। তুমি যখন বাড়ী আসো ওর অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে যায়।

মন্মথ। আমি যখন বাড়ী আসি?

কল্যাণী। হ্যাঁ বাবা। তোমার চিঠি পেলে খুবই আনন্দিত হয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক কথা বলে। কিন্তু তোমার বাড়ী আসার দিন যত কাছে আসে ততই ওর অবস্থা খারাপ হ'তে থাকে, সবেতেই

ও কেমন রেগে যেতে থাকে। আচ্ছা বাবা, তোমরা পরস্পরকে কি খুবই ঘৃণা কর? কেন এমন হল?

মন্মথ। আমি ঘৃণা করি না, মা।

কল্যাণী। কিন্তু বাড়ী আসতে না আসতেই ওর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসে থাকো।

মন্মথ। জানি না, কেন এমন হয়। নিজেকে শোধ-রাতে আমি চেষ্টা করি মা। পারি না।

কল্যাণী। বাড়ীতে তুমি কি জন্যে আসো?

মন্মথ। তোমাকে দেখতে মা।

কল্যাণী। আমার প্রতি কোনও টান কি তোমার আছে?

মন্মথ। নিশ্চয়ই।

কল্যাণী। তা' যদি থাকত, তুমি ওকে অসম্মান করতে [illegible] (সতীনাথের গলা শোনা [illegible] রে—মন্মথ—তারপর হাসি)

মন্মথ। [illegible] কি [illegible] দেখতে হবে (সতীনাথের ক[illegible]

শ্রীমতী নার্গিস : লণ্ডনে পৌছেই গ্রীণউইচ মান টাইমে ঘড়ির সময় বদলাচ্ছেন ফটো : কে এ রেজা

অনুসরণ করে প্রস্থানোদ্যত। সন্মথ বাধা দেয়, যেতে দেয় না)

কল্যাণী। ওর কাছে তুমি এখন যেয়ো না।

মন্মথ। ওর হয়ে এত কেন বলতে চাইছ মা, উনি তোমাকেও সম্মান করেন না।

সন্মথ। কেন উনি তো সব সময়েই সম্মান ক'রেন—

মন্মথ। তুই এসবের কি জানিস্ রে?

সন্মথ। ওকে তুমি মাথা খারাপ বলতে পারো না।

মন্মথ। ওর চরিত্রের কোন দৃঢ়তা নেই।

কল্যাণী। (রূঢ়ভাবে) মন্মথ, ওর অন্তরে কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তার খবর তোমরা কেউ রাখ না। কি দ্বন্দ্ব চলছে তার মধ্যে, তোমাদেরই কেন্দ্র ক'রে? আমি এভাবে অসহায়ের মত মৃত্যুপথযাত্রী তাকে হ'তে দেব না। তুমি তাকে মাথা খারাপ বলতে পার, কল্যাণী তোমারে বলতে পার—

মন্মথ। [illegible] নি [illegible]

কল্যাণী। না। অনেকে মনে করে সে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু তুমি একবারও ভেবে দেখেছ কি তার কি কষ্ট? মানুষটা একেবারে শেষ হয়ে গেল!

সন্মথ। নিশ্চয়ই।

কল্যাণী। আসছে মাসে তার চাকরী ষোল বছর পূর্ণ হবে। কিন্তু আজ তার এই বুড়ো বয়সে কোম্পানী তার মাইনে কেটে নিয়েছে।

সন্মথ। (বিক্ষোভ সহকারে) কই, মা, আমি তো এখবর জানতাম না।

কল্যাণী। তুমি কোনও দিন জিগেস ক'রেছ, বাবা? তোমাদের নিজের খরচের টাকা এখন তোমরা নিজেরাই সংগ্রহ করতে পার, ওর কথা এখন আর ভেবে লাভ কি?

সন্মথ। কিন্তু মা, আমি তো তোমাকে টাকা দিয়েছিলাম গত—

কল্যাণী। পুজোর সময়। পঞ্চাশ টাকা। আমার খরচ হয়েছিল নব্বই টাকা। তার ওপর পাঁচ হপ্তা ধরে ওকে শুধু কমিশনের ওপরে কাজ করতে হয়েছে, যেমন নতুন লোকদের করতে হয়।

মন্মথ। শূয়োরের বাচ্চারা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ।

কল্যাণী। ওর ছেলেদের চেয়ে তারা কি খুব বেশী খারাপ! কোম্পানীকে উনি যখন বেশী কাজ দিতে পারতেন, উনি তখন জওয়ান ছিলেন, খুব খুশী ছিল তারা।...আজ ওর পুরোনো খদ্দেররা অনেকেই আর বেঁচে নেই। সাতশ' মাইল গাড়ী চালিয়েও আজ সে এক কপর্দকও আয় করতে পারে না। মনে মনে বিড়বিড় করে বকবেন নাই বা কেন? চন্দ্রশেখর চৌধুরীর কাছে তার হাত পাততে হয়, আমাকে সে-কথা বলতে পারে না। বলে,—এ তার মাইনের টাকা। এমনি ক'রে কতদিন আর চলতে পারে? কতদিন? মানুষটা তোমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে দেবার জন্যে জীবনটা নিঃশেষ ক'রে

দিয়েছে। কি তার পুরস্কার? তেষট্টী বছর আজ ওর বয়েস। যে ছেলেদের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবেসেছে তাদের একটি লম্পটের শিরোমণি আর—

মন্মথ। মা!

কল্যাণী। হ্যাঁ বাবা, তোরা তাই। (মন্মথর প্রতি) কোথায় গেল তোর সেই পিতৃভক্তি? ওর কাছছাড়া তুই একদিনও হ'তে পারতিস নে। তুই—

মন্মথ। বেশ! আমি এখানেই থাকবো আর যে ক'রে হোক এখানেই কাজ জুটিয়ে নেব। ওর থেকে দূরে দূরে থাকব, বাস্।

কল্যাণী। না, রাতদিন ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তুমি এখানে থাকতে পারবে না।

মন্মথ। মনে থাকে যেন, ও-ই আমাকে এ বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়েছিলেন।

কল্যাণী। কেন দিয়েছিল।

মন্মথ। কারণ, সত্যি সত্যিই উনি আমাকে দেখতে পারতেন না।

কল্যাণী। কিসে বুঝলে যে দেখতে পারত না।

মন্মথ। সব দোষ আমার ওপর চাপিয়ে দিও না, মা। বেশ, এখন থেকে আমি তাঁর উপযুক্ত ছেলে হবার চেষ্টা ক'রব। যা' আমি আয় ক'রব তার অর্দ্ধেক আমি তাঁকে দেব। তাহলে তিনি ঠিক হয়ে যাবেন। যাই শুইগে এখন। (সিঁড়িতে উঠতে যায়)

কল্যাণী। সে আর ঠিক হবে না।

মন্মথ। (সিঁড়ির দু-এক ধাপ উঠে ফিরে দাঁড়ায়) এই শহরকে ঘৃণা করি, তবুও এখানে থাকছি, আর কি চাও তুমি?

কল্যাণী। ওর মাথার ওপর খুব বিপদ, মন্মথ।

[মন্মথ তাড়াতাড়ি কল্যাণীর দিকে ঘুরে দাঁড়ায়]

মন্মথ। (একটু ইতস্ততঃ করে) বিপদ কেন, মা?

কল্যাণী। মনে আছে গত কার্ত্তিক মাসে একটা গাড়ী ও ভেঙে ফেলেছিল। তোমাকে বোধ হয় আমি লিখেছিলাম।

মন্মথ। হ্যাঁ, হাঁ।

কল্যাণী। ইনসিওরেন্সের ইন্‌স্‌পেকটর এসেছিল। তিনি বলে গেলেন, তাঁর কাছে প্রমাণ আছে। ওটা নাকি এ্যাক্সিডেণ্ট নয়। শুধু তাই নয়, গত বছরে যে [illegible]বার গাড়ীর ক্ষতি হয়েছে, তার [illegible] নাকি এ্যাক্সিডেণ্ট নয়।

মন্মথ। [illegible]

মন্মথ। [illegible] ষড়যন্ত্র [illegible]

কল্যাণী। ভগবান জানেন। এই সময়ে তোমরা যদি একটু—

মন্মথ। ঠিক আছে। আর আমি বাইরে যাব না। আমি এখানেই থাকব। কিন্তু মা, ব্যবসা ঠিক আমার পোষায় না। তবুও আমি চেষ্টা ক'রব, নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। (সতীনাথ প্রবেশ করে মঞ্চের বাঁ দিক দিয়ে)

সতীনাথ। নিশ্চয়ই ক'রবে। কেন করবে না।

কল্যাণী। দেখ মন্মথ বলছিল—

সতীনাথ। আমি শুনেছি, কি বলছিল! (একটু থেমে) ওরা আমাকে অবজ্ঞা করে, কল্যাণী! চলে যাও লক্ষ্ণৌ, চলে যাও কাণপুরে, মাদ্রাজে, বোম্বাই, সতীনাথ সরকারের নাম কর গিয়ে সেলসম্যানদের মধ্যে—কি অবস্থা হয়, দেখবে। তুমি সব সময় আমাকে অপমান কর কেন বল দেখি।

মন্মথ। আমি তো একটা কথাও বলিনি।

কল্যাণী। ও তো একটা কথাও বলে নি।

সতীনাথ। বেশ, তবে এখন এসো।

কল্যাণী। মন্মথ ঠিক করেছে—

মন্মথ। কাল আমি যাব ভাবছি—

সন্মথ। অলিভার সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে।

সতীনাথ। (সাগ্রহে) অলিভার? কেন?

মন্মথ। সাহেব সব সময় বলতেন, তিনি আমাকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত ক'রবেন। ব্যবসাই আমি করতে চাই। তাকে হয় তো পেতে পারি এ ব্যাপারে।

সতীনাথ। খেলার জিনিসপত্রের ব্যবসা?

মন্মথ। বোধ হয়। এর আমিও কিছুটা জানি আর—

সতীনাথ। সেও কিছুটা জানে। সে কত দিচ্ছে?

মন্মথ। তা' জানি নে। তার সঙ্গে এখনও আমি দেখা করিনি।

সতীনাথ। তবে কি সব [illegible]

মন্মথ। (রাগতভাবে) [illegible] দেখা করতে যাচ্চি, এই তো আমি বলেছি।

সতীনাথ। ওঃ, আবার তুমি কালনেমির লঙ্কা ভাগ করছ?

মন্মথ। হা, ভগবান। আমি শুতে যাচ্ছি।

সতীনাথ। এই বাড়ীতে বসে শাপ শাপান্ত করবে না।

মন্মথ। (ফিরে তাকিয়ে) এত নিষ্পাপ কবে থেকে হলেন?

কল্যাণী। আঃ, মন্মথ।

সন্মথ। শোন্, দাদা। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। [মন্মথ ফিরে আসে]
তুই আর আমি, আমাদের একটা সিসটেম আছে। সেটা হ'ল সরকার সিসটেম। দু-তিন হপ্তা ট্রেণিং দিয়ে আমরা একটা-দুটো দেখাতে পারি।

সতীনাথ। এটা একটা কথা বটে।

সন্মথ। আমরা দুটো বাস্কেট বলের টিম গড়ে তুলব, দুটো ওয়াটার পোলো টিম নিজেদের মধ্যে আমরা খেলব। লক্ষ টাকার প্রচার হয়ে যাবে এতে। খেলার জিনিষ-পত্তর বিক্রী করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না এই কায়দায়।

সতীনাথ। এ তো লক্ষ টাকার প্ল্যান।

কল্যাণী। কিন্তু বেশ সুন্দর।

সন্মথ। মজা হ'ল এটা ঠিক ব্যবসার মত হবে; ছেলেবেলার মতই যেন আমরা খেলা করতে থাকব।

সন্মথ। (উৎসাহিত) হ্যাঁ, তা' ঠিক।

সতীনাথ। লক্ষ টাকা।

সন্মথ। তোমার কোনও বিরক্তি আসবেনা এতে। ফ্যামিলির মধ্যেই আছি এই রকম মনে হবে। যদি কিছুদিনের জন্যে তুমি কাজ থেকে ছুটি নিতে যাও, নিয়ে যাবে। তাতে তোমাকে অসম্মান করার কেউ থাকবে না।

সতীনাথ। দুনিয়া জয় কর। দু ভায়ে একহয়ে ইচ্ছা করলে তোমরা এই সভ্য জগৎকে কাঁপিয়ে দিতে পারতে।

মন্মথ। আমি কালই অলিভার সাহেবের সঙ্গে দেখা করব। তুই প্ল্যানটা ঠিক করে রাখ।

কল্যাণী। এমনও হ'তে পারে যে প্রথমে—

সতীনাথ। (উদ্ভ্রান্ত আগ্রহে) তুমি থাম। (মন্মথকে) কিন্তু আসি পরে যেন যেও না অলিভারের কাছে।

মন্মথ। না।

সতীনাথ। স্যুট পরবে। আর কথা যতদূর সম্ভব কম বলবে।

সতীনাথ। সাহেব আমাকে খুব ভালবাসে।

কল্যাণী। সাহেব তোমাকে ভালবাসে?

সতীনাথ। তুমি থামবে কি? (মন্মথকে) খুব গম্ভীর ভাবে ঘরে ঢুকবে। মনে রাখবে, তু'মি চাকরীর উমেদারী করতে যাচ্ছ না।

সন্মথ। আমি কিছু চেষ্টা করি, বুঝলি দাদা? আমার মনে হয় আমি পারব।

সতীনাথ। তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি। তোমা'দের কষ্টের দিন শেষ হয়ে গেছে। মনে রেখ, বড় থেকে সুরু করলেই বড়-তে শেষ করতে পারবে। কত টাকা চাইবে অলিভারের কাছে? পনেরো হাজার?

মন্মথ। ঠিক করি নি কিছু। দশ হাজার হলেই চলবে।

সতীনাথ। চাহিদা অত পরিমিত করবে না। সব সময় খুব নীচু থেকেই তুমি সুরু করেছ। যাক, মনে রাখবে, কি তুমি বলবে, সেটা বড় কথা নয়, কি ভাবে বলবে, সেটাই বড় কথা। ব্যক্তিত্বই সাফল্য এনে দেয়।

কল্যাণী। মন্মথর সম্বন্ধে অলিভারের বোধ হয় খুব উঁচু ধারণা।

সতীনাথ। আমাকে তুমি কথা বলতে দেবে কিনা।

মন্মথ। মাকে ওরকম ভাবে চেঁচিয়ে থামিয়ে দেবেন না।

সতীনাথ। (বিরক্ত হয়ে) আমি কথা বলছিলাম কি না?

মন্মথ। সব সময় আপনি মাকে খেঁকিয়ে উঠবেন, এটা আমি পছন্দ করি না। এই আপনাকে সাফ কথা আমি বলে দিলাম।

সতীনাথ। তুমি কি বলতে চাও?

কল্যাণী। ছেড়ে দাও। তুমি চুপ কর।

সতীনাথ। সব সময় ওর পক্ষ তুমি নেবে না।

মন্মথ। (চেঁচিয়ে) খেঁকানো বন্ধ করুন।

সতীনাথ। (হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে) অলিভারকে আমার শুভেচ্ছা জানিও, সে আমাকে চিনলেও চিনতে পারে। (শোবার ঘরে চলে গেল)

কল্যাণী। তোমরা এসো। ওভাবে ওকে যেতে দিও না।

সন্মথ। আর, দাদা। ওঁকে আমাদের খুসী করাই উচিত।

কল্যাণী। কালই চলে যাচ্ছ, শুধু এই কথাটাই বলে এস। এতেই উনি খুসী হবেন। (শোবার ঘরে চলে [illegible]

সন্মথ। [illegible]

মন্মথ। বাবা [illegible] নে পাচ্ছেন [illegible] শুধু ক[illegible]

সন্মথ। আয়, আয়। বাবার মনে এভাবে কষ্ট দেওয়া ঠিক হবে না। (উভয়ে শোবার ঘরের দিকে প্রস্থান করে। এদিকে আলো জ্বলে উঠল কল্যাণীর শোবার ঘরে। দেখা গেল সতীনাথ বসে আছে বিছানার ওপরে। কল্যাণী প্রবেশ করে)

কল্যাণী। তোমার কি মনে হয় অলিভার ওকে চিনতে পারবে?

সতীনাথ। তোমার কি হয়েছে? মাথা খারাপ হয়েছে? সে যদি আজ অলিভারের সঙ্গে থাকত তাহলে অনেক, অনেক বড় হয়ে যেত আজ।

[মন্মথ ও সন্মথ প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করে]

সতীনাথ। শুনে খুব খুশী হলাম, বাবা।

সন্মথ। দাদা আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছে, বাবা।

সতীনাথ। কি বলতে চাও তুমি আমাকে?

মন্মথ। সহজ ভাবে নিন ব্যাপারটাকে। আমি আসছি। (ফিরে দাঁড়ায়)

সতীনাথ। টেবিল থেকে যদি কোনও কাগজ-পত্তর পড়ে যায়, তুমি সে-সব কুড়িয়ে তুলতে যাবে। তার জন্যে ওদের বেয়ারা আছে। ... তাকে বলবে, পশ্চিমে ব্যবসার তুমি কিছু কিছু করেছ।

মন্মথ। আচ্ছা।

কল্যাণী। আমার মনে হয়

সতীনাথ। (কল্যাণীর ক[illegible]কে [illegible]) কম দামে নিজেকে কখনও বিকিয়ে দেবে না। পনেরো। হাজারের কম নয়।

মন্মথ। ঠিক আছে। আসি। আসি, মা। (প্রস্থানোদ্যত)

সতীনাথ। তোমার মধ্যে মহত্ত্ব আছে, তাকে তুমি ভুলবে না।

[ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে। মন্মথ ও সন্মথ বসার ঘরের দিকে চলে যায়। আলো নিভে আসে। সতীনাথের মাথার কাছে গিয়ে কল্যাণী বসে। একটা নীল আলো পড়ে তাদের ওপর। মন্মথ অন্ধকার শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায়। আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে আসে মঞ্চের সন্মুখ ভাগে। তীব্র এক সোনালী আলো পড়ে তার ওপর। সে সিগারেট টানতে থাকে। মায়ের শোবার ঘরের দিকে একবার চায়। প্রস্থান করার জন্ত মন্মথ বাঁ দিকে মোড় ফেরে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঞ্চ হয়ে যায় অন্ধকার]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[আনন্দসূচক আবহসঙ্গীত চলছিল। সঙ্গীত মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্দা উঠে গেল। বাইরে যাওয়ার পোষাকে টেবিলের পাশে বসে রয়েছে সতীনাথ। কল্যাণী কফি ঢেলে দিচ্ছে, সতীনাথ খেয়ে চলেছে।]

সতীনাথ। কফিটা খুব সুন্দর হয়েছে। পেট ভরে গেল।

কল্যাণী। তুমি যদি একটু ব'সে দু'খানা পরোটা তৈরী ক'রে দি।

সতীনাথ। না, থাক। তুমি এখন বিশ্রাম নাও গে।

কল্যাণী। তোমাকে আজ একটু নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে।

সতীনাথ। কাল রাত্তিরে মরা মানুষের মত ঘুমিয়েছি। ক'মাসের মধ্যে এই প্রথম ঘুমোলাম। ছেলেরা কি বেরিয়েছে?

কল্যাণী। হাঁা, ওরা ঠিক আটটায় বেরিয়েছে।

সতীনাথ। বেশ।

কল্যাণী। ওদের এক সঙ্গে বেরোতে দেখলে বেশ ভাল লাগে।

সতীনাথ। (মৃদুহাস্তে) হুঁ।

কল্যাণী। আজ সকাল বেলা দেখলাম মন্মথ একেবারে বদলে গেছে। তাকে দেখে আমার আশা হ'ল। অলিভার সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্তে সে খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে।

সতীনাথ। পরিবর্ত্তনের পথে সে পা বাড়িয়েছে। ব্যাপার কি জান? কারও কারও একটু দেরী হয় কিছু ক'রে উঠতে। আচ্ছা, কি পোষাক পরে সে বেরিয়েছে?

কল্যাণী। নীল রং-এর স্যুটটা পরে গেছে। ওকে বেশ মানিয়েছে কিন্তু ঐ পোষাকে।

[সতীনাথ উঠে দাঁড়ায়। কল্যাণী তার জামাটা তুলে ধরে]

সতীনাথ। আর কোনও কথা নয়। আজই ফেরার পথে আমি কিছু বীজ নিয়ে আসবো।

কল্যাণী। (হেসে) সে তো খুব ভাল হয়। কিন্তু ঐ জায়গায় তো বেশী রোদ্দুর যায় না। ওখানে কিছুই জন্মাবে না।

সতীনাথ। আচ্ছা, তুমি দেখো। এই সব ব্যাপার মিটে গেলে দেশের দিকে একটু জমি কিনব। সেখানে তরি-তরকারী লাগাতে হবে, দু'একটা গরু পুষতে হবে—

কল্যাণী। এখনও তুমি এই সব করবে?

[সতীনাথ এগিয়ে চলে জামা না নিয়েই। তার পেছনে পেছনে যায় কল্যাণী]

সতীনাথ। তারপর ছেলেদের বিয়ে দেব। ওরা এখানে থাকবে। আমি আসবো এক-হপ্তা, দু'হপ্তা অন্তর। আচ্ছা অলিভার সাহেবের কাছে ও কত টাকা চাইবে কিছু বলে গেছে?

কল্যাণী। (সতীনাথকে জামাটা পরাতে পরাতে) সে-সব তো কিছু বলে যায় নি। তবে মনে হয়, দশ-পনেরো হাজার নিশ্চয়ই চাইবে।

তুমি আজ ইন্দ্রজিতের কাছে যাচ্ছো তো ?

সতীনাথ। হ্যাঁ। আমি সোজাসুজি-ই তাকে ব'লবো। রাস্তায় রাস্তায় আর আমি ঘুরবো না।

কল্যাণী। কিন্তু, কিছু আগাম চেয়ে আনতে ভুলো না। আবার, লাইফ ইন্‌সিওরের তারিখ তো চলে গেছে—

সতীনাথ। সে তো একশ' আট টাকা ?

কল্যাণী। হ্যাঁ, আর সেলাই-এর কলটার জন্যেও কিছু দেনা আছে।

সতীনাথ। ওটা কি আবার ভেঙে গেছলো ?

কল্যাণী। একেবারে পুরোনো জিনিস তো।

সতীনাথ। কেনার সময় যদি একটু দেখে-শুনে নিতে ···· এই তো ওই একই সঙ্গে বীরেনদের বাড়ীতেও একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মেসিন কিনেছিল? তাদের তো এ সব কিছুই শুনি না।

কল্যাণী। সে তো মানে—

সতীনাথ। একেবারেই ডুবে গেছি। উঠবো কি করে ? আর উঠতে হবে না।

কল্যাণী। মোট ছশো' টাকা হলে মর্টগেজের শেষ দেনাটাও মিটে যায়। তার এই বাড়ী আবার আমাদেরই হবে।

সতীনাথ। সে আজ পঁচিশ বছর আগেকার কথা।

কল্যাণী। হ্যাঁ, মন্মথর বয়স তখন ন' বছর।

সতীনাথ। এটা একটা বড় কাজ হ'বে। পঁচিশ বছরের মর্টগেজের দেনা শোধ করা—

কল্যাণী। এটা সত্যিই একটা বড় কাজ।

সতীনাথ। আমার সমস্ত টাকাটাই আমি ঢেলেছিলাম এই বাড়ীর পেছনে।

কল্যাণী। তোমার সব কিছু ঢালা তো সার্থক হয়েছে।

সতীনাথ। কি সার্থক হ'ল ? বাইরের লোক এসে ঢুকবে আমার এই ঘরে, এই তো হ'ল ?··· হ্যাঁ, তবে মন্মথ যদি পারে বাড়ীটাকে উদ্ধার করতে। (আবার চলতে থাকে) আচ্ছা চলি, আমার আবার দেরী হ'য়ে গেল।

কল্যাণী। তোমার চশমা নিয়েছ ?

সতীনাথ। (মঞ্চের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পকেট হাতড়ায় ও ফিরে আসে) হ্যাঁ, নিয়েছি।

কল্যাণী। রুমালখানা নাও। (রুমাল নেয় ও চলে যায়)

[কল্যাণী আস্তে আস্তে ফিরে আসে বসার ঘরে কফির কাপ ইত্যাদি নিয়ে চলে যায় রান্নাঘরে। তার অদৃশ্য হওয়ার আগেই আলো সরে যায় তার ওপর থেকে আর চাকা-ওলা একটা টাইপ রাইটার ঠেলে নিয়ে বাঁ দিক থেকে মঞ্চের সম্মুখভাগে প্রবেশ করে ইন্দ্রজিত্। তার টেবিলের ওপরস্থিত অভিনব আকৃতির শব্দধারক যন্ত্রটি সে ঠিক ক'রে লাগাতে থাকে। উজ্জল আলো ফেলা হয় তার উপর। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলেই সে সামনে দেখতে পায় সতীনাথকে।]

ইন্দ্রজিত। এই যে সতীনাথবাবু, আসুন।

সতীনাথ। তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, ইন্দ্র।

ইন্দ্রজিত। একটু অপেক্ষা করতে হবে। এক মিনিটেই

আমার হয়ে যাবে।

সতীনাথ। ওটা কি ইন্দ্র?

ইন্দ্রজিত। এ-সব আপনি কোনোদিন দেখেন নি? এটা হলো ওয়্যার-রেকর্ডার।

সতীনাথ। ও. আচ্ছা, এখন এক মিনিট তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে?

ইন্দ্রজিত। সব কিছুই এতে রেকর্ড করা যায়। কালই ডেলিভারী নিয়েছি। সারা রাত্তি এটাকে নিয়ে আমি কাটিয়েছি।

সতীনাথ। ওটা দিয়ে তুমি কি কর?

ইন্দ্রজিত। এটা কিনেছিলাম আমি ডিক্টেশান্‌-এর জন্যে। কিন্তু এটা দিয়ে এখন অনেক কিছু করা যায়। আচ্ছা, শুনুন একবার। দেখুন এটা দিয়ে আমি রেকর্ড ক'রেছি। প্রথম হচ্ছে আমার মেয়ে। (সুইচটি খুলে দেয়, ছোট্ট একটি মেয়ে সুর ভাঁজছে, শোনা যায়) শুনুন, মেয়ে আমার সুর ভাঁজছে।

সতীনাথ। একেবারে ঠিক...মানে, খুব আশ্চর্য্য তো।

ইন্দ্রজিত। মেয়ের মাত্র সাত বছর বয়েস। গলার স্বরটা লক্ষ্য করুন।

সতীনাথ। তোমার কাছে আমি একটা কথা বলবো বলে--(গানের সুর বন্ধ হয়ে যায়। এবার মেয়ের কথা শোনা যায়)

মেয়ে। এবার তুমি, বাবা।

ইন্দ্রজিত। আমার জন্যে মেয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। (একই গানের সুর আবার শোনা যেতে লাগল)

সতীনাথ। বেশ, তো!

(আবার সুর বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বিরতি চললো। ইন্দ্রজিত যন্ত্রটি ঠিক ক'রে নিয়ে চালিয়ে দিল)

ইন্দ্রজিত। এইবার শুনুন, আমার ছেলে।

কিশোর কণ্ঠস্বর। ভারতবর্ষের রাজধানী নয়াদিল্লী, পাকিস্তানের রাজধানী করাচী, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা, পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী···

ইন্দ্রজিত। (হাতের পাঁচটি আঙুল দেখিয়ে) পাঁচ বছর বয়েস, বুঝলেন, পাঁচ বছর!

সতীনাথ। ভবিষ্যতে এ একজন ভাল বেতার-ঘোষক হবে।

কিশোর কণ্ঠস্বর। (চলতে থাকে) উত্তর প্রদেশের রাজধানী···

ইন্দ্রজিত। উহুঁ। একদিক দিয়ে সুরু কর। (হঠাৎ যন্ত্রটি বন্ধ হয়ে যায়) এক মিনিট। কেউ বোধ হয়—

সতীনাথ। এ নিশ্চয়ই···

ইন্দ্রজিত। একটু দাঁড়ান।

কিশোর কণ্ঠস্বর। এখন নটা বেজেছে। এখন আমি ঘুমোতে যাব।

সতীনাথ। সত্যিই এটা···

ইন্দ্রজিত। এক মিনিট। এবার আমার স্ত্রী। (কিছু সময় সব চুপচাপ)

(ওয়্যার রেকর্ডারে কণ্ঠস্বর) বল তুমি কিছু।

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর। আমি কিছু ভাবতে পারছি না। কিছু একটা বলে দাও না।

স্ত্রী। আচ্ছা বলছি (বিরতি) আমি কিছু বলতে পারব না।

ইন্দ্রজিত। এই আমার স্ত্রী।

সতীনাথ। কি অদ্ভুত যন্ত্র। আমরাও এই রকম···

ইন্দ্রজিত। নিশ্চয়ই। দাম মাত্র দেড়শো' ডলার, এ্যামেরিকায় তৈরী। আচ্ছা আপনার গাড়ীতে রেডিও আছে না?

সতীনাথ। আছে। সে আর খোলা হয় না।

ইন্দ্রজিত। আপনি তো এখন আসানসোলে আছেন?

সতীনাথ। সেই সম্পর্কেই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। এক মিনিট তোমার সময় হবে কি? (পার্শ্বপটের আড়াল থেকে একটা চেয়ার টেনে এনে বসে)

ইন্দ্রজিত। কি, ব্যাপার কি?

সতীনাথ। ব্যাপার হচ্ছে—

ইন্দ্রজিত। গাড়ীখানা আবার ভেঙে ফেলেন নি তো?

সতীনাথ। না, না।

ইন্দ্রজিত। তাহলে গোলমালটা কি হয়েছে?

সতীনাথ। সত্যি কথা বলতে কি, বাবা, আমি ঠিক করেছি, আমি আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবো না।

ইন্দ্রজিত। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবেন না! কি ক'রবেন ঠিক ক'রেছেন?

সতীনাথ। মনে ক'রে দ্যাখো, সেই পুজোর সময়কার কথা। তুমি বলেছিলে, এখানে ক'লকাতাতেই তুমি আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবে।

ইন্দ্রজিত। এখানে? আমাদের সঙ্গে?

সতীনাথ। হ্যাঁ, বাবা।

ইন্দ্রজিত। হ্যাঁ, হো, এইবার মনে পড়েছে। কিন্তু আপনার জন্যে কিছুই তো আমি এখনও ভেবে উঠতে পারি নি।

সতীনাথ। একটা কথা তোমাকে বলি, ইন্দ্র। ছেলেরা এখন সব বড় হয়েছে। বেশী কিছু আমি চাই না। হপ্তায় যদি ত্রিশটা ক'রে টাকা বাড়ীতে দিতে পারি তাহলেই হবে।

ইন্দ্রজিত। কিন্তু সতীনাথবাবু—

সতীনাথ। কেন? খোলা মনে বলতে গেলে বলতে হয়, আমি এখন ক্লান্ত। তা' কি তুমি বুঝতে পারছ না?

ইন্দ্রজিত। বুঝতে আমি ঠিকই পেরেছি। আপনি এক-জন রাস্তার লোক, রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করাই আমাদের ব্যবসা। এখানে শো'-রুমে মাত্র ছ'জন সেল্‌স্‌ম্যান আমাদের আছে।

সতীনাথ। আমি কোনও অনুগ্রহ চাইছি না। তুমি যখন খুবই ছোট তখন থেকেই এই ফার্মে আমি কাজ করছি।

ইন্দ্রজিত। আমি সে-কথা জানি, সতীনাথবাবু।

সতীনাথ। যে-দিন তুমি ভূমিষ্ঠ হও, তোমার বাবা আমার কাছে গিয়েছিলেন। তোমার ইন্দ্রজিত নামটি আমিই রেখেছিলাম।

ইন্দ্রজিত। সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু আপনার জন্যে কোনও জায়গা এখানে নেই। জায়গা যদি খালি থাকত, আমি আপনাকে নিয়ে নিতাম এখানে। (সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাই খোঁজে, সতীনাথ সেটা তুলে নিয়ে ওর হাতে দেয়। কিছু সময় কেউ কোনও কথা বলে না)

সতীনাথ। (ঈষৎ উত্তেজনায়) শোন ইন্দ্র, হপ্তায় মাত্র তিরিশ টাকা হ'লে আমার চলে যাবে।

ইন্দ্রজিত। কিন্তু আপনাকে কোথায় আমি বসাব?

সতীনাথ। আমি মাল বিক্রী করতে পারি কি না পারি, সেই কথাই কি তুমি তুলতে চাও?

ইন্দ্রজিত। না। কিন্তু ব্যবসা ব্যবসাই। নিজের ওজন বুঝে আমাকে চলতে হবে তো ?

সতীনাথ। (অসহিষ্ণু হয়ে) একটা ঘটনা তোমাকে বলি, শোন।

ইন্দ্রজিত। নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করছেন না যে ব্যবসা ব্যবসাই।

সতীনাথ। (রেগে গিয়ে) ব্যবসা তো নিশ্চয়ই ব্যবসা। কিন্তু এক মিনিট তুমি আমার কথা শোন। তুমি হয়তো এ-সব বুঝবে না যখন আঠারো-উনিশ বছর আমাদের বয়েস, তখনই আমি রাস্তায় বেরিয়েছি ; এই বিক্রীর কাজে কোনও ভবিষ্যৎ আছে কিনা, আমার মনে প্রশ্ন জেগে-ছিল। কিন্তু—

ইন্দ্রজিত। ওসব কথা এখন আর বলে কি হ'বে ?

সতীনাথ। এক বুড়ো সেল্‌স্‌ম্যান-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। নাম তার বিপদবারণ রায়। তিনিই আমাকে পথ দেখালেন। বড় ভায়ের ব্যবসায় যোগ দেব ভেবেছিলাম। তা' আর হ'ল না। আশী বছরের বুড়ো একা ছ'টি প্রদেশে মাল ফিরি করছেন ক'লকাতায় তাঁর অফিস ঘরে বসে, সহায় শুধু তাঁর টেলিফোন। বুড়োর জীবিকা বেশ স্বচ্ছন্দেই চলে যাচ্ছিল এতে। তাঁর খদ্দেররা তাঁকে কত ভালবাসত ভাব দেখি। তাঁর যখন মৃত্যু হয়, বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা যোগ দিয়েছিল তাঁর শোক-যাত্রায়। (উঠে দাঁড়ায়, ইন্দ্রজিতের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই) সেল্‌স্‌ম্যানের কাজে সে-সময় সম্মান ছিল, সহযোগিতা ছিল, কৃতজ্ঞতা ছিল। আজ তার কিছুই নেই। কি আমি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ ? আমাকে তারা আজ আর চেনে না।

ইন্দ্রজিত। (ডান দিকে সরে গিয়ে) সেইটেই তো ভাববার কথা সতীনাথবাবু।

সতীনাথ। পঁচিশ টাকা হপ্তায় হলেও আমার চলতে পারে।

ইন্দ্রজিত। পাথর থেকে আমি তো আর রক্ত বার করতে পারি নে।

সতীনাথ। (অনেকখানি হতাশ হয়ে)......, যে বছর শ্যামাপদ মনোনয়ন পায়, তোমার বাবা আমার কাছে গেছিলেন।

ইন্দ্রজিত। আমার আবার আর ক'জন লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

(প্রস্থানোদ্যত)

সতীনাথ। (থামিয়ে) তোমার বাবার কথা বলছি। এই টেবিলে বসে তিনি আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে-ছিলেন। তিরিশ বছর এক ফার্মে আমি কাজ করছি আর আজ আমি ইন্‌সিওরেন্স-এর প্রিমি-য়াম দিতে পারি না। কমলালেবুটি খেয়ে আজ তোমরা খোসাটি আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে পার না। মানুষের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার তুমি ক'রো না। (কিছুক্ষণ পরে) ১৯২৮ সালের কথা শোন, তোমার বাবা তখনও বেঁচে,— হপ্তায় গড়ে দেড়শো-দুশো' টাকা আমি তুলে দিয়েছি ফার্মকে।

ইন্দ্রজিত। (অসহিষ্ণু হয়ে) না', কখনও আপনি দেন নি—

সতীনাথ। (টেবিলে চড় মেরে) নিশ্চয়ই দিয়েছিলাম। এই টেবিল, হাঁ। এই টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রেখেছিলেন তোমার বাবা—

ইন্দ্রজিত। মাপ করুন। অন্য লোকদের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে, তারা অপেক্ষা করছে। (বাইরে গিয়ে) মাপ করবেন।

(ইন্দ্রজিতের প্রস্থানের পর তার চেয়ারের ওপর তীব্র ও অদ্ভুত ধরণের আলো পড়ে)

সতীনাথ। ওকে কি বলছিলাম আমি এতক্ষণ? হা ভগবান, এতক্ষণ ওর কাছে কি ভিক্ষে চাইছিলাম আমি? কেমন ক'রে—

[ইন্দ্রজিতের চেয়ারের ওপর অদ্ভুত আলো দেখে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তার কথা, ঐদিকে তাকিয়ে চেয়ারের দিকে এগোতে থাকে, কিন্তু টেবিলের কাছে এসে থেমে যায়) মনোরঞ্জন, তোমার মনে আছে কি, তুমি আমাকে কি বলেছিলে? কেমন ক'রে, কেমন ক'রে তুমি আমার কাঁধে হাত রেখেছিলে? (টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে, মৃত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করতে করতে হঠাৎ তার হাত লেগে ওয়্যার রেকর্ডারের সুইচ খুলে যায়)

কিশোর কণ্ঠস্বর। ক'লকাতার পশ্চিমে গঙ্গা নদী। হাওড়ার উত্তরে—

সতীনাথ। (ভয়ে লাফিয়ে উঠে উচ্চৈঃস্বরে) ইন্দ্র! ইন্দ্র!—

ইন্দ্রজিত। কি হয়েছে?

সতীনাথ। (ওয়্যার রেকর্ডারটি দেখিয়ে) ওটা বন্ধ ক'রে দাও। বন্ধ ক'রে দাও।

ইন্দ্রজিত। (বন্ধ ক'রে) দেখুন সতীনাথবাবু—

সতীনাথ। ([illegible] চোখ চেপে ধ'রে) আমি যাই, আমি যাই।

[সতীনাথ প্রস্থানোদ্যত, হ'লে ইন্দ্রজিত তাকে [illegible]]

ইন্দ্রজিত। শুনুন—

সতীনাথ। আমি আসানসোলে যাব।

ইন্দ্রজিত। আমাদের জন্যে আর আপনাকে আসানসোলে যেতে হবে না।

সতীনাথ। কেন?

ইন্দ্রজিত। আপনি আমাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, এটা আমি চাই নে। অনেক দিন তো এই কাজ করলেন—

সতীনাথ। মানে? আমাকে তুমি বরখাস্ত করছ?

ইন্দ্রজিত। আমার মনে হয়, সতীনাথবাবু, আপনার এখন দীর্ঘ বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

সতীনাথ। ইন্দ্র—

ইন্দ্রজিত। আবার যখন ভাল বোধ করবেন, আসবেন। চেষ্টা ক'রে দেখব, যদি আপনাকে কোনও কাজ দিতে পারি।

সতীনাথ। কিন্তু, ইন্দ্র, টাকা রোজগার আমাকে করতেই হ'বে। কোনও ক্রমেই—

ইন্দ্রজিত। আপনার ছেলেরা কোথায়? আপনার ছেলেরা আপনাকে সাহায্য করে না কেন?

সতীনাথ। একটা বড় কারবারে তারা কাজ করছে।

ইন্দ্রজিত। বৃথা অভিমানের সময় এটা নয়, সতীনাথবাবু। ছেলেদের কাছে যান, বলুন যে আপনি এখন ক্লান্ত, বিশ্রাম চান।

সতীনাথ। (কিছু সময় চুপ করে থেকে) জানলে ইন্দ্র, আমি কাল আসানসোলেই যাচ্ছি।

ইন্দ্রজিত। না, না।

সতীনাথ। দেখ বাবা, ছেলেদের গলগ্রহ আমি হ'তে পারব না। আমি অক্ষম নই।

ইন্দ্রজিত। দেখুন, এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি।

সতীনাথ। (ইন্দ্রর হাত ধ'রে) ইন্দ্র, বাবা, আমাকে তোমার আসানসোলে পাঠাতেই হ'বে।

ইন্দ্রজিত। (অটল হয়ে) অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। আপনি বরং বসুন। পাঁচ মিনিট বিশ্রাম ক'রে তারপর

না হয় বাড়ী যাবেন। (প্রস্থানোদ্যত হয় কিন্তু ওয়্যার-য়েবর্ড রটির কথা মনে পড়তেই টেবিলটা ঠেলতে সুরু করে।) যখনই সুস্থ বোধ করবেন, তখনই আসবেন। এখন তৈরী হয়ে নিন, বাইরে আবার অনেক লোক অপেক্ষা করছে।

(ইন্দ্র টেবিল নিয়ে মঞ্চের বাঁদিকে প্রস্থান করে। সতীনাথ শূন্যে তাকিয়ে থাকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে। দূর থেকে একটু সুর ভেসে আসে, ক্রমেই নিকটে আসতে থাকে সুরটি। হঠাৎ কাকে যেন দেখে সতীনাথ চমকে ওঠে, বলে,—"কে, কে," আর পিছিয়ে যায় দু'পা। বাঁদিক থেকে মঞ্চে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে। সতীনাথ তাকে চিনতে পেরে এক পা এগিয়ে যায়। আগন্তুকের হাতে একটি ব্যাগ ও ছাতা।)

সতীনাথ। এই যে রজনীকান্ত, ওটার কি করলে? ঝরিয়ার কারবার কি গুটিয়ে দিয়েছ?

রজনীকান্ত। তুমি কি করছ, বল দেখি। চল না একটা বিজনেস-ট্রিপ দিয়ে আসি।

সতীনাথ। কোথায়? আমার যে কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

রজনীকান্ত। (হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে নিল) তার সময় হবে না।

সতীনাথ। (রজনীকান্তের কাছে গিয়ে) দেখ আমি কিছুই করছি না এখন। কি করব ভেবে পাচ্ছি না।

রজনীকান্ত। তাহলে শোন। ঐ অঞ্চলেই একটা শাল গাছের বন আমি কিনেছি। আমার এখন দেখাশোনা করার একজন লোক চাই।

সতীনাথ। এ্যাঁ, তাহলে তো ভাল হয়। আমি আর ছেলেরা—

রজনীকান্ত। হ্যাঁ,—নতুন দুনিয়া তোমার সামনে। এই সব শহরের মায়া ছেড়ে দাও। চল আমার সঙ্গে। কারবার করতে পারো যদি সৌভাগ্য তুমি জয় করে নিতে পারবে।

সতীনাথ। (বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়) ঠিক, ঠিক। (স্বগতোক্তি) কল্যাণী, কল্যাণী, শোন।

(যুবতী কল্যাণী প্রবেশ করে। কাঁখে তার কাচা কাপড়ের ঝুড়ি) শোন, রজনীকান্ত কি বলছে। বলছে বিহারে সে একটি শাল বন কিনেছে—

যুবতী কল্যাণী। বুঝেছি। কিন্তু তোমার তো এখানে ...(রজনীকান্তের প্রতি) ওঁর তো এখানে বেশ ভাল কাজই আছে।

সতীনাথ। কিন্তু বিহারে গেলে, আমি...

যুবতী কল্যাণী। এখানে তোমার অসুবিধা কিছু হচ্ছে কি?

রজনীকান্ত। (কল্যাণীর প্রতি) সুবিধাটাই বা কিসের?

যুবতী কল্যাণী। (রজনীকান্তের ওপর রেগে গিয়ে) ওঁর কাছে এ-সব বলবেন না। বেশ ভালই আছে এখানে। (সতীনাথের প্রতি, রজনীকান্ত হাসতে থাকে) সবাইকেই দুনিয়া জয় করতে হবে, তার কি মানে আছে? এখানে সবাই তোমাকে ভালবাসে, তাছাড়া একদিন হয়তো —(রজনীকান্তের প্রতি) বুড়ো মনোরঞ্জন শিকদার তো বলেছিল, ওঁকে অংশীদার করে নেবে।

সতীনাথ। সে তো বলেছিলই। এই ফার্মে একটা কিছু আমি গড়ে তুলছি।

রজনীকান্ত। কি গড়ে তুলছ? তোমার হাত রাখো তো তার ওপর। কোথায় সেটা?

সতীনাথ। (ইতস্ততঃ ক'রে) সে-কথা তো ঠিক, কল্যাণী। কিছুই তো নেই।

যুবতী কল্যাণী। কেন? (রজনীকান্তের দিকে তাকিয়ে) সেই চুরাশি বছরের বুড়োর কথা মনে ক'রে দ্যাখ।

সতীনাথ। সত্যি রজনীকান্ত, সে-কথাও ঠিক। সেই বুড়োর কথা যখন আমি ভাবি তখন মনে হয়, আমার আর ভাবনার কি আছে।

রজনীকান্ত। বেশ মজার ব্যাপার তো! আমি চলি— (ব্যাগটা তুলে নেয়)

সতীনাথ। সহরে সে শুধু বসে থাকে [illegible] ঘরে, ফোনটি তুলে নেয় [illegible]দেরদের সঙ্গে [illegible], এই তার কাজ আর এতেই তার জীবিকা চলছে,

কেমন ক'রে বল দেখি। (রজনীকান্ত অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে)

রজনীকান্ত। আমাকে যেতেই হ'ল। (প্রস্থান)

সতীনাথ। রজনীকান্ত···, রজনী···, শোন—

[পেছনে পেছনে যায়, অন্ধকার হয়ে যায় মঞ্চ আর সেই অন্ধকারের ঢাকায় আত্মগোপন করে যুবতী কল্যাণী। কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্মুখ মঞ্চের ডান দিকটা আস্তে আস্তে আলোকিত হয়ে উঠল, দেখা গেল টেবিলের ওপর পা ছড়িয়ে বসে সুম ভাঁজছে বিনয়। মেজেতে এক জোড়া টেনিস র‍্যাকেট ও একটি ব্যাগ। নেপথ্যে যানবাহন চলাচলের শব্দ হচ্ছে আর সতীনাথের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে মঞ্চের ডান দিক থেকে। টেবিল থেকে পা নামিয়ে বিনয় শুনতে চেষ্টা করে সতীনাথের বক্তব্য।)

সতীনাথ। (নেপথ্যে) তুমি চলে যাচ্ছ কেন? চলে যেও না। তোমার যদি কিছু বলার থাকে, আমার মুখের ওপরেই বল। জানি, আমার পেছনে তুমি আমাকে ব্যঙ্গ কর। এই খেলার পর তোমাকে আর ব্যঙ্গ করতে হবে না। তুমি দেখে নিও। আশী হাজার লোক।··· ঠিক গোলপোষ্টের মাঝখানে। (যামিনীনাথ প্রবেশ করে। মুখে চোখে তার অস্বস্তি)

বিনয়। গোলমাল কিসের? লোকটা কে?

যামিনী। সতীনাথবাবু।

বিনয়। (উঠে দাঁড়িয়ে) কার সঙ্গে তিনি ঝগড়া করছেন?

যামিনী। কারও সঙ্গে নয়। আমি ওকে এখন দেখতে পারছি না। এদিকে উনি যখন আসেন, আপনার বাবা তখনই খুব বিব্রত বোধ করেন। আমার এখন আবার অনেকগুলি টাইপ করতে হবে। অফিসে আপনার বাবা বসে আছেন এগুলি সই করার জন্যে। আপনি একটু [illegible] দেখবেন?

সতীনাথ। (প্রবেশ করে) [illegible] দেখে নিও, দেখে নিও—([illegible]কে দেখতে পেয়ে) এই যামিনীনাথ, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হ'ল। কেমন আছ হে? কাজ করছ?

যামিনী। ভালই আছি। আপনি কেমন আছেন?

সতীনাথ। বিশেষ আর ভাল কোথায়, ভাল আর থাকি কি ক'রে, বুঝলে—(হঠাৎ র‍্যাকেটগুলি দেখে বিস্মিত হয়)

বিনয়। কেমন আছেন, কাকাবাবু?

সতীনাথ। (একটু ধাক্কা খেয়ে) বিনয়, আরে তোমাকে আমি দেখতেই পাই নি। (বিনয় কাছে এসে দাঁড়ায়) তুমি এখানে কি করছ?

বিনয়। একটু বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছি আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি দিল্লী রওনা হচ্ছি।

সতীনাথ। ভেতরে আছে নাকি জগদিন্দ্র?

বিনয়। হ্যাঁ, অফিস ঘরে বসে এ্যাকাউণ্টেণ্টের সঙ্গে কাজ করছেন।

সতীনাথ। (বসে) তুমি দিল্লী যাচ্ছ কেন?

বিনয়। একটা কেস আছে সুপ্রিম কোর্ট-এ!

সতীনাথ। তা' ভাল। (র‍্যাকেট জোড়া দেখিয়ে) টেনিসও খেলবে?

বিনয়। এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে উঠব, তার একটি কোর্ট আছে।

সতীনাথ। তোমার বন্ধুর নিজের টেনিস কোর্ট। তাহলে তারা খুব ভাল লোক বলতে হবে।

বিনয়। খুব ভাল। আচ্ছা কাকাবাবু, বাবা বলছিলেন মন্মথ নাকি এখানে আছে?

সতীনাথ। (হেসে) হ্যাঁ, আছে। বিরাট এক কারবারের মধ্যে কাজ করছে।

বিনয়। কি কারবার? কি কাজ সে করছে?

সতীনাথ। পশ্চিমেও সে ভাল কাজ করছিল। কিন্তু সে এখানেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত করেছে। খুব বড় কারবার। আচ্ছা তোমার স্ত্রী মানে বৌমার নাকি ছেলে হয়েছে?

বিনয়। হ্যাঁ, আমাদের দ্বিতীয় ছেলে।

সতীনাথ। দুই ছেলে ?

বিনয়। মন্মথ কি কারবার করছে, বললেন না তো।

সতীনাথ। সে তো স্পোর্টিং গুডস্‌-এর ব্যবসাদার—বিল অলিভার-এর নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। অলিভার সাহেবের ডাক পেয়েই তো সে পশ্চিম থেকে আসে।...আচ্ছা তোমার বন্ধুদের কি নিজেদেরই প্রাইভেট টেনিস কোর্ট আছে ?

বিনয়। আপনি কি এখনও সেই পুরোনো ফার্ম্মেই কাজ করছেন ?

সতীনাথ। (কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থেকে।) আমি খুব আনন্দিত হ'লাম। যে-ভাবে তুমি নিজের পোজিশান ক'রে নিয়েছো তা দেখে সত্যিই আমি খুব, খুব আনন্দিত হয়েছি। এরকম একজন যুবককে প্রতিষ্ঠিত দেখা সত্যিই খুব আশার কথা। মন্মথ'র কাছেও খুব আশার—মন্মথ—(গলা ধরে যায়) বিনয় (আবেগে ভেঙে পড়ে)

বিনয়। কি হ'ল, কাকাবাবু ?

সতীনাথ। (জনান্তিকে নিম্নস্বরে)—ভেতরের রহস্যটা কি ?

বিনয়। ভেতরের রহস্য ?

সতীনাথ। হাঁ্যা, বাবা। প্রতিষ্ঠার সূত্র তুমি কোথায় পেলে ?

বিনয়। তা' আমি জানি না কাকাবাবু।

সতীনাথ। (একান্ত নিম্নস্বরে) ছেলেবেলায় তুমি তার বন্ধু ছিলে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক আমি বুঝতে পারছিনে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হ'ল কি করে ? সতেরো বছর বয়সে সেই যে মহারাজ ট্রফীর খেলায় খেলেছিল, তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারল না ?

বিনয়। সে কোনও কিছু শিখতেই চায় নি, কোনওদিন।

সতীনাথ। কেন চাইবে না। হাই স্কুলের পড়া ছেড়ে সে তো রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং আর কতো কি পড়লে, ভগবানই জানেন, কেন কিছুতেই সে উন্নতি করতে পারল না।

বিনয়। [চশমা-জোড়া খুলে] আপনি সরল মনে আলোচনা করতে চান, কাকাবাবু ?

সতীনাথ। [উঠে দাঁড়িয়ে বিনয়ের মুখোমুখি হয়] আমি তোমাকে খুব ভাল ছেলে বলে জানি। তোমার এ্যাড্‌ভাইসের আমি খুব মূল্য দিই।

বিনয়। চুলোয় যাক এ্যাডভাইস্‌। এ্যাডভাইস্‌ আপনাকে আমি দিতে চাইনে। একটা কথা আমি আপনাকে জিগ্যেস্‌ করতে চাই, স্কুলের শেষ পরীক্ষা যেবার দেওয়ার কথা, অঙ্কের মাষ্টার মশাই ওকে ডেকে—

সতীনাথ। ঐ শূয়োরের বাচ্চাই তো ওর জীবনটা নষ্ট ক'রে দিল।

বিনয়। কেন, যে-বিষয়ে ও কাঁচা ছিল, স্কুলে গিয়ে সেটা ওর ভালো ক'রে তৈরী করে নেবার চেষ্টা করা উচিত ছিল না কি ?

সতীনাথ। নিশ্চয়ই উচিত ছিল, একশ'বার উচিত ছিল।

বিনয়। তাহলে আপনি তাকে একবারও বলেছেন স্কুলে যাবার জন্যে?

সতীনাথ। বলেছি বাবা। অনেক বলেছি।

বিনয়। তবে সে যায়নি কেন?

সতীনাথ। কেন? কেন? এই প্রশ্নটিই ভূতের মত আমার ঘাড়ে চেপে রয়েছে গত পনেরো বছর ধরে। বুঝলে বাবা, পনেরো বছর ধরে এর উত্তর আমি পাই নি।

বিনয়। যাক গে। সহজভাবে নিন ব্যাপারটাকে।

সতীনাথ। তোমাকে একটা কথা আমি জিগেস করি, বাবা। এটা কি আমার দোষ? এই চিন্তাই আমার মাথায় ঘুরছে। হতে পারে তার জন্যে আমি কিছুই করিনি।

বিনয়। এ রকমভাবে ব্যাপারটাকে দেখবেন না, কাকাবাবু।

সতীনাথ। তুমি তার বন্ধু। তুমিই বল বাবা, কেন সে এমন করল।

বিনয়। আমার বেশ মনে আছে, তখন জুন মাস। আমাদের পরীক্ষার ফল বেরোলো। মন্মথ ফেল করল, ফেল করল অঙ্কেই।

সতীনাথ। আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান?

বিনয়। তবে, হ্যাঁ, এতে সে দমে নি। আবার সে স্কুলে ভর্তি হবে বলেছিল?

সতীনাথ। (বিস্মিত হয়ে) বলেছিল?

বিনয়। কিন্তু হঠাৎ কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল, তার কোনও পাত্তাই পাওয়া গেল না। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, সে আসানসোলেই গেছে। আপনার সঙ্গে তখন কোন কথা হয়েছিল কি? (সতীনাথ কথা বলে না, আড়চোখে শুধু তাকায়) কাকাবাবু!

সতীনাথ। [বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে সে আসানসোলে গেছল, তাতে হয়েছে কি?]

বিনয়। সে যখন ফিরে এলক'মাস পরে, তখনই আমরা তা' জেনেছিলাম। কিন্তু আসানসোলে কিছু ঘটেছিল কি? [সতীনাথ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়] আপনি জিগ্যেস ক'রেছিলেন বলেই আমি এ-সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি।

সতীনাথ। [সক্রোধে] কিচ্ছু না। "কি ঘটেছিল" বলতে তুমি কি বলতে চাও। আমার প্রশ্নের সঙ্গে সে-বিষয়ের কি সম্পর্ক?

বিনয়। আপনি যদি ব্যথা পান, কাকাবাবু—

সতীনাথ। না। তুমি কি চাইছ, আমাকে দায়ী করতে চাও? একটা ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, সে কি আমার দোষ?

বিনয়। রাগ করবেন না—

সতীনাথ। ও ভাবে তুমি আমার সঙ্গে কথা ব'লো না। "কি ঘটেছিল" কথাটার অর্থ কি?

[জগদিন্দ্র প্রবেশ করে। অফিস-কর্তার উপযুক্ত পোষাক তার গায়ে।]

জগদিন্দ্র। তুমি ট্রেণ ফেল করবে, বিনয়—। বিনয়। এই যে, আমি যাচ্চি, বাবা। [ব্যাগটি ও র‍্যাকেট-জোড়া তুলে নেয়] আচ্ছা, আসি কাকাবাবু। দেখুন, প্রথম প্রথম সফল না হলেও—

সতীনাথ। হ্যাঁ, সে ঠিক, ঐ পদ্ধতিতে আমিও বিশ্বাস করি।

বিনয়। আসি বাবা। [প্রস্থান]

জগদিন্দ্র। এস।

সতীনাথ। [কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর জগদিন্দ্র যেমন তার টাকার থলিটি টেবিলের ওপর রেখে বসল] সুপ্রীম কোর্ট! অথচ আগে একবারও একথা শুনিনি যে বিনয় সুপ্রীম কোর্টেও প্র্যাকটিস ক'রছে।

জগদিন্দ্র। (টেবিলের ওপরে টাকা গুনতে গুনতে)এই কাজই ওকে করতে হবে না।

সতীনাথ। অথচ তুমি তাকে কখনও বল নি, কি করতে হবে? তার জন্যে কোনও ইণ্টারেষ্টই তুমি নাও নি।

জগদিন্দ্র। কোনও ব্যাপারেই খুব বেশী ইণ্টারেষ্ট আমি নিই না। কিছু টাকা আছে—শ' পাঁচেক। এ্যাকাউণ্টেণ্ট আবার বসে আছে ভেতরে। (উঠে দাঁড়ায়)

সতীনাথ। দ্যাখ জগো, মানে—(অতিকষ্টে) আমার একটা ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে হবে, তুমি যদি একটু চালিয়ে নিতে পার—একশ' দশ টাকা হলেই হবে। (জগদিন্দ্র কথা বলে না, ভেতরেও চলে যায় না)

সতীনাথ। আমি ব্যাঙ্ক থেকেই টাকাটা তুলতাম, কিন্তু আমার স্ত্রী জানবে আর আমি—

জগদিন্দ্র। বসো।

সতীনাথ। (চেয়ারের দিকে এগিয়ে) সব কিছুরই আমি পুরো হিসেব রাখছি. বুঝলে? প্রতিটি পাই আমি শোধ ক'রে দেব। (বসে)

জগদিন্দ্র। এখন একটা কথা আমি তোমাকে জিগেস্য করি, সতীনাথ।

সতীনাথ। হ্যাঁ, কর। (সাগ্রহে অপেক্ষা করে)

জগদিন্দ্র। আজকাল তুমি কি ক'রছ? তোমার মাথার মধ্যেই বা কি ঘুরছে। (টেবিলের ওপর বসে)

সতীনাথ। কেন? আমি তো শুধু—

জগদিন্দ্র। আমি তোমাকে একটা কাজ দিতে চেয়েছিলাম। পঞ্চাশ টাকা করে সপ্তাহে তুমি পেতে আর আমি তোমাকে রাস্তায়ও পাঠাতাম না।

সতীনাথ। কাজ তো আমার একটা আছে।

জগদিন্দ্র। বিনা বেতনের কাজ? মজুরী না পেলে সে কাজ কিসের কাজ? (উঠে দাঁড়ায়) শোন, নেবু নিঙড়োলে তেতো হয়। বেশী কিছু বলে কোনও লাভও নেই। একটা কথা তুমি জেনে রাখ, আমি একটা বিরাট প্রতিভা নই, কিন্তু অপমানিত হলে বেশ বুঝতে পারি।

সতীনাথ। অপমানিত!

জগদিন্দ্র। তুমি আমার এখানে কাজ করতে অস্বীকার করলে কেন?

সতীনাথ। তোমার কি হয়েছে বল দেখি? আমার কাজ তো একটা আছে!

জগদিন্দ্র। তাহলে প্রতি সপ্তাহে কিসের জন্য তুমি এখানে আসো?

সতীনাথ। (উঠে দাঁড়িয়ে) বেশ, এখানে আসি তা' যদি তুমি না চাও—

জগদিন্দ্র। আমি তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি।

সতীনাথ। তোমার কাজের আমার দরকার নেই।

জগদিন্দ্র। কবে তোমার বয়েস হবে ব'লতে পার?

সতীনাথ। (ভীষণ রেগে গিয়ে) আহম্মকের মত কথা ব'লো না। ফের যদি ঐ সব কথা তুমি আমায় বলবে, আমি দেখে নেব। যত বড়ই হও না, আমি গ্রাহ্য করিনে। (আস্তিন গোটাতে থাকে)

[কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। জগদিন্দ্র আস্তে আস্তে সতীনাথের কাছে যায়, দৃষ্টিতে তার করুণা, কণ্ঠস্বর কোমল]

জগদিন্দ্র। কতটাকা তোমার চাই, সতীনাথ?

সতীনাথ। আমি বড় ধাক্কা খেয়েছি, জানলে জগো, আমি বড় ধাক্কা খেয়েছি। কি ক'রব বুঝতে পারছি নে। জানো, আমি বরখাস্ত হয়েছি।

জগদিন্দ্র। ইন্দ্রজিত তোমাকে বরখাস্ত করলে?

সতীনাথ। ভাবো দিকিনি? আমি তার নাম রেখেছিলাম, আমিই তার নাম রেখেছিলাম ইন্দ্রজিত।

জগদিন্দ্র। এর কোন মূল্য নেই, সতীনাথ। তুমি তার নাম রেখেছ, কিন্তু তুমি তা বিক্রী করতে পার না। তুমি যা' বিক্রী করতে পার, এ জগতে সেইটেই শুধু তোমার। তুমি নিজে সেলস্‌ম্যান হয়ে এই কথাটা বোঝ না। মজার ব্যপার তো এখানেই।

সতীনাথ। সব সময়েই আমি ভাবতে চেষ্টা ক'রেছি। কেবলই আমি ভেবেছি, যদি একটু গম্ভীর প্রকৃতির হওয়া যায়, সবাই যদি ভালোবাসে—

জগদিন্দ্র। সবাই তোমাকে ভালবাসবে কেন? কিরিট রায়কে কে না ভালোবাসে? সে কি গম্ভীর প্রকৃতির? ও সব ভাবনা ছেড়ে দাও। শোন। আমি জানি তুমি আমাকে দেখতে পারোনা আর কেউ বলবে না আমিও তোমাকে অন্তরঙ্গ বলে মনে করি। তবুও একটা কাজ আমি আবার তোমাকে দিচ্ছি। তুমি করবে কি সে কাজ?

সতীনাথ। না জগদিন্দ্র। তোমার কাজ আমি ক'রব না।

জগদিন্দ্র। আমাকে তুমি ঈর্ষা কর?

সতীনাথ। সে-সব কিছু আমায় জিগ্যেস করো না। তোমার কাজ আমি করতে পারছি নে, ব্যস।

জগদিন্দ্র। (রেগে যায় টাকা বার করে) সারা জীবন ধরে তুমি আমায় হিংসে করে আসছো। নাও, তোমার ইন্‌সিওরেন্সের দেনা মিটিয়ে দাও গে। (সতীনাথের হাতে টাকা গুঁজে দেয়)

সতীনাথ। আমি খুব খুঁটিনাটি হিসেব রাখছি। (মঞ্চের ডান দিকে সরে যায়।)

জগদিন্দ্র। আমার কাজ আছে। টাকা নিয়ে সাবধানে যাবে আর ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ামটা ঠিক ঠিক মিটিয়ে দিও। (সতীনাথ দাঁড়িয়ে থাকে) আমি কি বললাম শুনেছ? (সতীনাথ যেন দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখে) সতীনাথ!

সতীনাথ। বিনয়কে ব'লো, সে যেন কিছু মনে না করে। তার সঙ্গে ঝগড়া করার আমার ইচ্ছে ছিল না। সে খুব ভাল ছেলে, ওরা সবাই খুব ভাল। একদিন একসঙ্গে ওরা টেনিস খেলবে। তুমি আমাকে শুভেচ্ছা জানাও জগো। জানো, মন্মথ অলিভার সাহেবের সঙ্গে আজ দেখা ক'রেছিল?

জগদিন্দ্র। তোমার ভাল হোক।

সতীনাথ। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) জগো,ভাই তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু, জানলে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। (প্রস্থান)

জগদিন্দ্র। বেচারা।

[জগদিন্দ্র আড়দৃষ্টিতে সতীনাথের গতিপথ লক্ষ্য করে। পরে আস্তে আস্তে সেই দিকেই চলতে থাকে। সমস্ত মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। হঠাৎ শোনা যায় কর্কশ সুরের আবহ সঙ্গীত। মঞ্চের ডানদিকে সুতীব্র লাল আলো এসে পড়ে পর্দার পেছন থেকে। কফি হাউসের পরিচারক শীতল একটা টেবিল নিয়ে ঢোকে, পেছন পেছন আসে মন্মথ, হাতে দুখানা চেয়ার]

শীতল। (টেবিল রেখে) এখানেই থাক, কি বলেন মন্মথবাবু? (ফিরে এসে মন্মথর কাছ থেকে চেয়ার দুখানি নেয় ও টেবিলের পাশে বসিয়ে দেয়)

মন্মথ। (চারিদিকে চেয়ে) হ্যাঁ, এই ভাল। (বসে) তারপর, কেমন চলছে, শেতল?

শীতল। আর বলবেন না। এ কাজ, এ তো কুকুরের কাজ।

মন্মথ। থাকগে। শোন। আমার দাদা এসেছে।

শীতল। তিনি তো পশ্চিমে থাকেন?

মন্মথ। হ্যাঁ, শোন। দাদা এখনেই আসবে। বাবাও আসতে পারেন।

শীতল। তিনিও ক'লকাতায় এসেছেন নাকি? ব্যাপার কি?

মন্মথ। ব্যাপার আছে। দাদা একজন বেশ বড় মহাজন পেয়েছে, তার কাছে তো সে গেছে। (একটু চুপ করে থেকে) দু জনে মিলে আমরা এবার হয়তো একটা কারবার সুরু ক'রতে পারব।

শীতল। সে আপনার পক্ষে খুব ভাল। পরিবারের মধ্যেই থাকলো—সে খুব ভাল। পারিবারিক কারবার—বুঝতে পেরেছেন তো, কি আমি বলতে চাইছি?

মন্মথ। (ইসারায়) চুপ।

শীতল। কেন?

মন্মথ। তুমি লক্ষ্য ক'রছ, আমি ডাইনে বা বাঁযে কোনও দিকেই চাইছি না?

শীতল। এঁ্যা,—হ্যাঁ।

মন্মথ। আর দেখছ, আমার চোখ বন্ধ?

শীতল। তাই তো জিজ্ঞেস করছি—

মন্মথ। আসছে।

শীতল। (চারিদিকে চেয়ে) কোথায়, আমি তো কাউকে—

[সুসজ্জিতা এক সুন্দরীকে প্রবেশ করতে দেখে হঠাৎ তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। সুন্দরী পাশের টেবিলে বসে। মন্মথ ও শীতল তাকে ভাল ক'রে লক্ষ্য করে।]

শীতল। (জনান্তিকে) চেনেন নাকি?

সন্মথ। না তুমি ছাখ, কি চায়।

শীতল। (সুন্দরীর টেবিলে গিয়ে) কি দেব আপনাকে?

সুন্দরী। একজনের জন্ম আমার এখানে অপেক্ষা করার কথা, কিন্তু আমি—

সন্মথ। দাও না এক কাপ কফি—(সুন্দরী আড়চোখে সন্মথর দিকে তাকায়। শীতল ভেতরে চলে যায়। সন্মথ উঠে আসে সুন্দরীর টেবিলে) যদি কিছু মনে না করেন—একটা কথা জিগ্যেস করব।

সুন্দরী। না, না, মনে ক'রবার কি আছে। বলুন।

সন্মথ। কোন একটা ম্যাগাজিনে আপনার যেন ছবি দেখেছি।

সুন্দরী। হ্যাঁ, তা দেখে থাকবেন, ২।১ খানা ম্যাগাজিনে আমার ছবি বেরিয়েছে।

সন্মথ। মাত্র ক'দিন আগে দেখছিলাম—বোধ হয় 'ফোটোগ্রাফী' পত্রিকায়—

সুন্দরী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সেদিন যে সংখ্যাটা বেরিয়েছে তাতেই আছে। আমি যে ওদের মডেল। (শীতল কফি নিয়ে আসে ও সুন্দরীর টেবিলে দেয়)

সন্মথ। ওঃ। এই কৌতূহলের জন্যে মনে কিছু ক'রবেন না। নমস্কার।

সুন্দরী। না, না। (প্রতিনমস্কার করে। সন্মথ ফিরে যায় তার টেবিলে। সিগারেট টানতে সুরু ক'রে শূন্যদৃষ্টিতে। সুন্দরী কফি খেতে থাকে। প্রবেশ করে মন্মথ)

মন্মথ। সন্মথ!

সন্মথ। এঁ্যা, তুমি এসেছ?

মন্মথ। আমার একটু দেরী হয়ে গেল। (সন্মথর পাশের চেয়ারে বসে)

সন্মথ। শীতল, এই আমার দাদা, খুব বড় ফুটবল প্লেয়ার।

শীতল। ইনি আপনার দাদা?

সুন্দরী। (এতক্ষণে কফি খাওয়া শেষ হয়েছে) কোন্ টিমে খেলেন? (মন্মথ ও সন্মথ উভয়েই সুন্দরীর দিকে তাকায়)

সন্মথ। ফুটবল খেলার খোঁজ-খবর আপনি রাখেন দেখি?

সুন্দরী। ঠিক তেমন নয়, তবে—

সন্মথ। ওঃ। ইনি নাগপুর জায়াণ্টস্-এর হাফ্-ব্যাকে খেলেন।

সুন্দরী। ওঃ। (ইতিমধ্যে শীতল বিল ও মশলাসহ প্লেট এনে দেয় সুন্দরীর টেবিলে। দাম মিটিয়ে দিয়ে সুন্দরী উঠে পড়ে) আচ্ছা নমস্কার।

সন্মথ। নমস্কার। (সুন্দরী প্রস্থান করে। মন্মথ ও সন্মথ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার গতিপথে। শীতল সুন্দরীকে অনুসরণ ক'রে কিছু দূর যায়, তারপর অর্থপূর্ণভাবে মাথা নাড়তে থাকে)

মন্মথ। কে এই মেয়েটি?

সন্মথ। তাই, ভাবছি। এমন সুন্দরী অথচ—

মন্মথ। ওঃ শোন্, আমি যা' বলি।

সন্মথ। ঠিক, ও শিকারে বেরিয়েছে, বুঝলি দাদা।

মন্মথ। (ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে) রেখে দে এখন ও সব।

সন্মথ। কেন? শীতল কফি লাগাও এবার। (শীতল চলে যায়) এ-সব কথা এখন আর ভাল লাগছে না?

মন্মথ। খুব দরকারী কথা আছে এখন তোর সঙ্গে।

সন্মথ। কি কথা? অলিভার সাহেবের ওখানেগিয়েছিলি?

মন্মথ। হ্যাঁ। বাবা তো সাংঘাতিক বিগড়ে গেছেন আমার ওপর।

সন্মথ। কোথায় বাবা? এখানে আসবেন না?

মন্মথ। তিনি আসছিলেন এখানেই। আমার কাছে সব শুনে ফিরে গেলেন বিড়বিড় ক'রে বকতে বকতে।

সন্মথ। কেন?

মন্মথ। আমাকে তিনি কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না। খালি বলতে লাগলেন—'আমি বরখাস্ত হয়েছি, সে এক মর্মান্তিক দুঃসংবাদ। ভেবে-

ছিলাম এবার একটা সুখবর তোর মাকে দেব, তাও তুই হ'তে দিলি নে।" কিন্তু আমি কি চেষ্টার কোনও ত্রুটি ক'রেছি? (শীতল কফি এনে দিয়ে "একটু আসছি" বলে চলে যায়)

সম্মথ। কেন, কি হয়েছে? অলিভারের সঙ্গে তোর দেখা হয় নি?

মন্মথ। ঝাড়া ছ'টি ঘণ্টা আমি তার জন্যে অপেক্ষা করেছি। সারা দিন। অবিরাম স্লিপ পাঠিয়েছি, তার সেক্রেটারীকেও ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

সম্মথ। কারণ, আগেকার সেই আত্মবিশ্বাস তোর আর নেই, সাহেব তো তোকে ভাল ক'রেই চিনতো!

মন্মথ। (হাতের ইঙ্গিতে মন্মথকে চুপ করিয়ে) শেষে প্রায় পাঁচটার সময় সে বেরিয়ে এল। আমি কে, কোথায় আমার সঙ্গে পরিচয় কিছুই সে মনে ক'রতে পারল না। আমি এত বোকা বনে গেলাম যে তোকে কি বলব!

সম্মথ। সে কি?

মন্মথ। সে চলে গেল। এক মিনিট আমি তাকে তাকিয়ে দেখলাম। মাথায় আমার যেন খুন চেপে গেল। ওর ওখানে আমি যে একদিন সেলস্‌ম্যান ছিলাম, সে-কথা আমিও যেন আর মনে করতে পারছিলাম না।

সম্মথ। তুই কি করলি?

মন্মথ। কি আর ক'রবো। সারা জীবনটাই আমার মিথ্যে বলে মনে হতে লাগল। (কিছু পরে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে) সে চলে গেল, তার সেক্রেটারীও চলে গেল। ওয়েটিং-রুমে আমি একা। আমার কি হ'ল তখন আমি ঠিক বলতে পারি নে। কখন যে অফিসের মধ্যে চলে গেছি, কিছুই আমি বলতে পারিনে।...তারপর, এই, এই তার কলম নিয়ে চলে এসেছি।

সম্মথ। তোকে তারা ধরে নি?

মন্মথ। আমি দৌড়ে এসেছি, পালিয়ে এসেছি।

সম্মথ। কেন, তুই এসব করতে গেলি?

মন্মথ। জানি নে। আমি শুধু ভেবেছিলাম, কিছু একটা করতে হবে। আর কিছু আমি জানি। তুই বল কি ক'রব?

সম্মথ। একথা বাবাকে বলেছিস?

মন্মথ। না। অলিভার আমাকে চিনতে পারে নি, এই কথাই তো তিনি বিশ্বাস করেন নি। তার সঙ্গে আমার কোনও কথা হয় নি শুনেই তো তিনি খেপে গেলেন।

সম্মথ। এ সব কথা আর তাঁকে বলে কাজ নেই।

সম্মথ। কি বলব?

সম্মথ। বলবি, অলিভারের সঙ্গে আসছে শনিবারেই তোর আবার দেখা করবার কথা আছে।

মন্মথ। শনিবারে কি ক'রব?

সম্মথ। বলবি অলিভার এ সম্পর্কে ভাবছে। আর তুই চলে যাবি বাড়ী থেকে। কয়েক হপ্তা এই ভাবে কেটে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মন্মথ। না। সারা জীবন তাহলে এইভাবে চলবে। বাবাকে আমি সব কথা বলব। তাঁর ধারণা আমি তাকে ঘৃণা করি, আর এই ধারণাই তাঁকে খেয়ে ফেলছে। আজ আমি তোকে জানিয়ে দিতে চাই, আমি তাঁর তেমন ছেলে নই, যাকে বিশ্বাস ক'রে লোকে টাকা ধার দেবে। (মঞ্চের আলো নিষ্প্রভ হয়ে আসে) মাঝখান দিয়ে শীতল ও ডান দিকের কোণ থেকে আর একজন পরিচারক এসে দাঁড়ায়)

সম্মথ। তার ফলও ভাল হবে না। বাবা আশাবাদী। আশার কথা ছাড়া তিনি বিশ্বাসই করতে চান না—হতাশার কথা বললেই তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়। (শীতল মশলার প্লেট এগিয়ে দেয় সম্মথর টেবিলে। মন্মথ শূন্য দৃষ্টিতে দর্শকদের দিকে চেয়ে আছে, দেখা যায়)

শীতল (অন্য পরিচারকদের প্রতি) কি দেখছিস্ দাঁড়িয়ে?

শ্রীমতী মীনাকুমারী ঃ সম্প্রতি 'বাইজু বাওরা' 'পরিণীতা' প্রভৃতি চিত্রে অনন্যসাধারণ অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন

নলিনী জয়ন্ত

এস বি পিক্‌চার্সের 'বিক্রমোর্ব্বশী' চিত্রে উৎপল দত্ত ও ছন্দা দেবী

(পরিচারকটি টেবিল ও চেয়ার নিয়ে যেতে থাকে)

সন্মথ। চল, দাদা। (মন্মথ সজাগ হয়। দুভায়ে আস্তে আস্তে বেড়িয়ে পড়ে কফি হাউস থেকে) চলি, শেতল।

শীতল। আচ্ছা।

[অস্ত টেবিল ও চেয়ার সরাতে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘন অন্ধকারে ঢেকে যায় মঞ্চ। টেবিল ও চেয়ার সরানো হয়ে গেলে, শোনা যেতে লাগল বাঁশীর সুর। আস্তে আস্তে সতীনাথ সরকারের বসবার ঘরটি আলোকিত হয়, দেখা যায় ঘর জনমানবশূন্য। প্রবেশ করে সন্মথ ও তার পেছু পেছু মন্মথ। প্রথমে দরজার কাছে দাঁড়ায়, তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে তারা ঘরে ঢোকে]

সন্মথ। (জনান্তিকে) মাকেও তো দেখছিনে। (প্রকাশ্যে) মা, মা।

কল্যাণী। (নেপথ্যে) কে, তোমরা এসেছ? মন্মথ এসেছে?

সন্মথ। হ্যাঁ, মা। (পেছনের দরজা দিয়ে প্রস্থান করে ও কিছুপরে সন্ত্রস্ত পদক্ষেপে আবার ফিরে আসে। কল্যাণীকে তখনও সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না। সে ভেতরের ঘরে আছে। মন্মথ বসবার ঘরেই দাঁড়িয়ে থাকে) কি ক'রছ মা? (কিছুক্ষণ পরে) বাবা কোথায়? তিনি কি ঘুমোচ্ছেন? (কল্যাণী উঠে এসে বসবার ঘরের ভেতরকার দরজায় দাঁড়ায়। দর্শকরা তাকে এবার পুরোপুরি দেখতে পাবেন।)

কল্যাণী। তোমরা কোথায় ছিলে? (আড় চোখে মন্মথর দিকে তাকায়)

সন্মথ। (হাসতে চেষ্টা করে) দাদা তো গেছল অফি-ভার সাহেবের—

কল্যাণী। শুনেছি সে-সব। কেউ মরুক আর বাঁচুক তাতে তোমাদের কিছুই আসে যায় না, না ?

সন্মথ। (সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে) আয় দাদা।

মন্মথ। (বিরক্ত হয়ে) তুই যা। (কল্যাণী) কে মরবে বা বাঁচবে, মা।

কল্যাণী। যাও আমার সামনে থেকে।

মন্মথ। বাবাকে দেখছি নে।

কল্যাণী। তার কাছে তোমরা তো কেউ যেতেই চাও না।

মন্মথ। কোথায় তিনি ? (পেছনের দরজা দিয়ে প্রস্থান করে কল্যাণী তাকে অনুসরণ করে)।

কল্যাণী। (মন্মথকে উদ্দেশ ক'রে) তোমরা তাকে ক'লকাতার রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে বেশ ফুর্তি-টুর্তি ক'রে এখন বাড়ী ফিরলে ?

সন্মথ। কেন, দাদার সঙ্গে ওঁর তো দেখা হ'ল। উনিই তো ওর সঙ্গে এলেন না।

কল্যাণী। আমার চোখের সামনে থেকে যা।

সন্মথ। শোনো। (মন্মথ ফিরে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে)

কল্যাণী। তোমরা হচ্ছ পশু, বুঝলে একজোড়া পশু। অন্য কোনও লোকে ওকে ঐ ভাবে ছেড়ে দিয়ে কফি হাউসে গিয়ে ফুর্তি করতে পারত না।

মন্মথ। (কল্যাণীর দিকে না চেয়েই) এই কথাই কি বাবা বলেছেন ?

কল্যাণী। না, তাকে কিছু বলতে হবে না। তিনি এত অপমানিত বোধ করছেন যে বাড়ী যখন আসেন তখন তিনি প্রায়—

সন্মথ। কিন্তু মা, উনি ইচ্ছে করেই—

কল্যাণী। চুপ ক'রে থাক। (দ্বিরুক্তি না করে সন্মথ ওপরে চলে যায়)

উনি ভাল আছে কিনা, একবার দেখারও তোমরা প্রয়োজন বোধ কর না।

[ভেতরের দরজায় তখনও মন্মথ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার কল্যাণীর প্রায় মুখোমুখি]

মন্মথ। না, করি নে। তুমিও বা তা' আশা কর কি ক'রে ? উনি যদি খালি প্রলাপই বকে চলেন আর—

কল্যাণী। চুপ কর হতভাগা—

মন্মথ। এখন আমার ওপর ঝাল ঝাড়লে কি হবে ?

কল্যাণী। দূর হ' এখান থেকে।

মন্মথ। না। ওকে কতকগুলো কথা বলার আছে, বলে তার পরে—

[বাড়ীর বাইরে থেকে হাতুড়ীর শব্দ শোনা যায়, মঞ্চের ডান দিক থেকে শব্দটা ভেসে আসে। মন্মথ হঠাৎ কথা বন্ধ করে সে দিকে কান দেয়]

কল্যাণী। (হঠাৎ কোমল সুরে) তোমরা ওকে একটু একা থাকতে দাও।

মন্মথ। কি ক'রছেন উনি ওখানে ?

কল্যাণী। বাগানে গাছ লাগাচ্ছেন, বীজ ছড়াচ্ছেন—

মন্মথ। (শান্তভাবে) এখন ? হা ভগবান।

[মন্মথ বাইরে যায়। তাকে অনুসরণ করে কল্যাণী। তাদের ওপর আলো সরে যায়। মঞ্চের সম্মুখভাগের মধ্যস্থলে আলো পড়ে, সেখানে দেখা যায় সতীনাথকে। তার হাতে একখানি কোদালি ও কয়েকটি বীজের প্যাকেট। কোদালির আছারটা মাটিতে ঠুকে শক্ত ক'রে লাগিয়ে নেয় ও বাঁদিকে চলতে থাকে। জমির পরিমাণ মেপে নেয় পা দিয়ে]

সতীনাথ। এককুট ক'রে সারি বসালেই হবে (মেপে দেখে) এককুট (একটা প্যাকেট মাটিতে রাখে ও জমিটা মেপে দেখে) এখানে বীট দেওয়া যাবে (একটা প্যাকেট রাখে ও জমি মাপে) এখানে দেওয়া যাবে কাঁকুড় (একটা প্যাকেট ভাল ক'রে দেখে নামিয়ে রাখে) এক ফুট (রজনীকান্ত তার দিকে আস্তে আস্তে আসছে দেখে হঠাৎ থেমে যায়) কি বিরাট পরিকল্পনা। বুঝলে রজনী, তোমার বৌঠান বড় কষ্ট ভোগ করছে। বুঝতে পারছ না ? মানুষ যে পথ দিয়ে এসেছে, সে-পথ দিয়েই বেরিয়ে যেতে পারে না, নতুন কিছু তাকে করতে হবেই (রজনীকান্ত আরও এগিয়ে আসে সতীনাথের

দিকে) তুমি বিবেচনা ক'রে দ্যাখ। তাড়াতাড়ি আমি তোমার জবাব চাই না। মনে ক'র এটা একটা কুড়ি হাজার টাকার পরিকল্পনা। সব কিছু ভেবে-চিন্তে তুমি জবাব দেবে।

রজনীকান্ত। কিন্তু পরিকল্পনাটা কি ?

সতীনাথ। পিপে, পিপের মাথার পরিকল্পনা। বুঝলে, গ্যারান্টি দেওয়া মাথা ?

রজনীকান্ত। সতীনাথ, নিজেকে বোকা বানিয়ে লাভ কি ? কোম্পানী এ পরিকল্পনা পছন্দ করবে না।

সতীনাথ। কেন ? সবার চোখের সামনেই সারা জীবন কুলির মত খেটে আমি প্রিমিয়াম দিয়ে আসি নি ?

রজনীকান্ত। ইন্‌সিওরেন্সের টাকার জন্যে এইভাবে আত্মহত্যা করা কাপুরুষের মত কাজ হবে না কি ?

সতীনাথ। কিসে ? এই অবস্থায় বাকী জীবন কিছু না ক'রে কাটিয়ে দেবার মধ্যে কি পৌরুষ আছে, বলতে পার ?

রজনীকান্ত। তা' ঠিক। (পায়চারি করে) আর কুড়ি হাজার, সেও তো অনেক টাকা।

সতীনাথ। আর সেইখানেই তো এর মজা। ও মনে করে আমি কিছু নই, ও আমাকে ঘৃণা করে। বুঝলে রজনী, ও দেখুক আমি কে। ও দেখুক কত লোকে আমাকে চেনে, কত লোকে আমাকে জানে।

রজনীকান্ত। ও তোমাকে কাপুরুষ মনে করবে।

সতীনাথ। (হঠাৎ ভয় পেয়ে) না, না। সে খুব সাংঘাতিক হবে।

রজনীকান্ত। ও তোমাকে ঘৃণা করবে !

[ছেলেদের আনন্দসূচক আবহ-সঙ্গীত শোনা যায়]

সতীনাথ। কেন, কেন ? সে কি আমাকে ঘৃণা না ক'রে পারে না ? আমি তাকে কিছুই কি দিতে পারি না এ থেকে ?

রজনীকান্ত। (ঘড়ি দেখে) ভেবে দেখি। পরিকল্পনাটা ভাল। কিন্তু দ্যাখ, নিজেকে যেন বোকা বানিও না।

[রজনীকান্ত প্রস্থান করে। বাঁ দিক থেকে নেমে আসে মন্মথ। হঠাৎ মন্মথকে দেখতে পেয়ে সতীনাথ তার দিকে তাকিয়েই বীজের প্যাকেট-গুলো তুলতে আরম্ভ করে]

সতীনাথ। সেই প্যাকেটটা গেল কোথায় ? (রেগে) তুমি কিছুই এখানে দেখতে পাচ্ছ না ?

মন্মথ। বাবা, তোমার চারপাশে লোক রয়েছে, বুঝতে পারছ না ?

সতীনাথ। আমি কাজ করছি, আমাকে বিরক্ত ক'র না।

মন্মথ। (সতীনাথের হাত থেকে কোদালিখানা নিয়ে) আমি চলে যাচ্ছি বাবা, আর আসব না।

সতীনাথ। অলিভারের কাছে আর যাচ্ছ না ?

মন্মথ। না তার সঙ্গে আমার আর দ্যাখা ক'রবার কোনও কথা নেই তো।

সতীনাথ। সে তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল আর তুমি বলছ দেখা করার কথা নেই ?

মন্মথ। ওসব কথা ছেড়ে দিন। প্রত্যেকবার আমি যখন বাড়ী থেকে যাই, আপনার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে যেতে হয়। এবার আমি আর তা' করব না। নিজের সম্পর্কে কতকগুলি বিষয় আমি বুঝতে পেরেছি। সেই সব আজ আমি ব'লব। (সতীনাথ কথা বলে না। মন্মথ সতীনাথের হাত ধরে) বাবা, এস, মার কাছে গিয়ে বলব। (আস্তে আস্তে সতীনাথকে টেনে নেয়)

সতীনাথ। (অনড়, অচল, কণ্ঠে অপরাধীর সুর) না তার কাছে আমি যাব না।

মন্মথ। এসো—না। (আবার টানে, সতীনাথ সরে যেতে চেষ্টা করে)

সতীনাথ। না, না-তার কাছে আমি যেতে পারবো না।

মন্মথ। (সতীনাথের মুখের দিকে চায়) কেন, মার কাছে তুমি যেতে চাইছো না কেন ?

সতীনাথ। যাও বিরক্ত ক'র না আমাকে।

মন্মথ। কি বলতে চাও তুমি। যার সঙ্গে তুমি দেখা করতে চাও না। চল, ভেতরে চল। (মন্মথর হাত ছাড়িয়ে সতীনাথ নিজেই বাড়ীর ভেতর চলে যায়। মন্মথ তার অনুসরণ করে। কল্যাণী একটা কাজে ব্যস্ত ছিল বসবার ঘরের এক কোণে)

কল্যাণী। বাগান করা হয়ে গেল ?

মন্মথ। (বসার ঘরের বাইরের দরজা থেকে) আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, আর চিঠিপত্তরও লিখব না।

কল্যাণী। (সতীনাথের কাছে এসে) সেই ভাল, কি বল ? (সতীনাথ জবাব দেয় না)

মন্মথ। লোকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় আমি থাকি, আর কি কি কাজ আমি করি। তুমি তা জান না, জানতে চাও না। বেশ। এইবার তো সব ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। (সতীনাথের কাছে গিয়ে) তাহলে আমি চলি বাবা।

কল্যাণী। তুমি ওকে বিদায় দাও।

সতীনাথ। (কল্যাণীর দিকে ফিরে) কলমটার কথা আর বলার দরকার নেই।

মন্মথ। (নম্রভাবে) আমার আর তো কোন দেখা করার দরকার নেই, বাবা।

সতীনাথ। (রুক্ষভাবে) সে তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল—

মন্মথ। বাবা, তুমি আমাকে মোটেই বুঝতে চাইছ না। তর্ক ক'রে কি লাভ আছে ? যদি জীবনে কিছু করতে পারি তাহলে আমার আয়ের অংশ এ বাড়ীতেও আসবে। আর এর মধ্যে ভুলে যেও যে আমি বেঁচে আছি।

সতীনাথ। (কল্যাণীকে) দ্যাখো দ্যাখো কথা শোন।

মন্মথ। এইভাবে এবার যাব, তা ভাবিনি।

সতীনাথ। কিন্তু এই ভাবেই তো তুমি যাচ্ছ।

[মন্মথ মুহূর্তের জন্য সতীনাথের দিকে তাকায়, তারপর দ্রুত ফিরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে]

সতীনাথ। (মন্মথকে থামিয়ে) এই বাড়ী ছেড়ে তুমি যদি কোথাও যাও, তাহলে তুমি রসাতলে যাবে।

মন্মথ। (ফিরে) তাই তো তুমি চাও।

সতীনাথ। আমাকে ঘৃণা . আর অবহেলা ক'রে ক'রে জীবন তুমি নষ্ট ক'রে দিলে—এইটিই আজ তোমার জানা দরকার।

মন্মথ। না, না।

সতীনাথ। আমাকে, আমাকে এর জন্যে দায়ী করতে পারবে না।

[সন্মথ ওপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে আর নীচের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছে]

মন্মথ। আমিও তাই তোমাকে বলতে চাইছিলাম।

সতীনাথ। (একটা চেয়ারে বসে পড়ল) আমার বুকে তুমি ছুরি বসাতে চাইছ। ভেবোনা, ভেবোনা যে আমি তা বুঝতে পারি না।

মন্মথ। বেশ! আমরা এক লাইনেই তাহলে দাঁড়াই। (পকেট থেকে একটা রবারের নল ক'রে টেবিলের ওপর রাখে)

সন্মথ। কি করছিস কি দাদা ?

কল্যাণী। মন্মথ! (নলটি তুলে নেবার জন্য এগিয়ে যায়, মন্মথ তার হাত ধরে ফেলে)

মন্মথ। ওটা ওখানেই থাক, ওতে হাত দিও না।

সতীনাথ। (সে দিকে না তাকিয়েই) কি ওটা ?

মন্মথ। তুমি তা ভাল ক'রেই জান।

সতীনাথ। (অপরাধীর মত সরে পড়তে চায়) আমি তো ওটা কখনও দেখিনি।

মন্মথ। তাহলে বোধ হয় ইঁদুরে ওটা 'সেলার'-এর মধ্যে এনে রেখেছে ?

সতীনাথ। আমি এ রকম কথা শুনিই নি।

মন্মথ। কেউ তোমাকে করুণা করবে না, বুঝলে ?

সতীনাথ। (কল্যাণীকে) ছাখ, ছাখ তুমি।

মন্মথ। না, সত্যি কথাই তুমি শুনছ,—তুমি কি আর আমি কি,—এইটিই তুমি শুনছ।

কল্যাণী। থাম না, মন্মথ।

সতীনাথ। এই নিদারুণ অবহেলা—

মন্মথ। (মন্মথর কাছে এসে) এখন তুই এ-সব ছেড়ে দে না।

মন্মথ। কেন রে? ওর জানা দরকার, আমরা কে। (সতীনাথকে) এই বাড়ীতে দশ মিনিটের জন্যেও আমরা কেউ সত্যি কথা বলিনি।

মন্মথ। সব সময়েই আমরা সত্যি কথা বলেছি।

মন্মথ। তুই থাম।

মন্মথ। কেন, কার্য্যতঃ আমি—

মন্মথ। (সতীনাথকে) শোন, বাবা, এই আমি দাঁড়িয়ে আছি।

সতীনাথ। আমি তা' জানি।

মন্মথ। তুমি জান কি, তিনমাস আমার কোনও ঠিকানা ছিল না কেন? কাণপুরে আমি একটা সুটকেশ চুরি ক'রেছিলাম, তার জন্যে জেলে যেতে হয়েছিল। (কল্যাণী ফোঁপাচ্ছিল) কেঁদো না, কেঁদো না, এই-ই আমার স্বভাব।
(কল্যাণী দু'হাতে মুখ ঢেকে সরে দাঁড়ায়)

সতীনাথ। এ বোধহয় আমার দোষ!

মন্মথ। হাইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই এই রকম স্বভাব আমার গড়ে উঠেছে।

সতীনাথ। এটা কার দোষ?

মন্মথ। কখনও আমি কারও কাছে যেতে পারি নি। তুমি এত গরম ক'রে দিতে আমাকে যে আমি কোথাও গিয়ে অর্ডার নেবার জন্য দাঁড়াতে পারি নি। এটা কার দোষ কে জানে।

সতীনাথ। তারপর?

কল্যাণী। এ সব বলে কি হবে মন্মথ?

সতীনাথ। এখনই ওর এই সব শোনা দরকার। ওর জানা দরকার এইটেই আমার স্বভাব।

সতীনাথ। তা হলে গোল্লায় যাও গে।

মন্মথ। কেউ গোল্লায় যাবে না, বাবা। কাল আমি কলম চুরি ক'রে পালিয়েছি। কিন্তু একেবারে আমি পালিয়ে আসি নি। ওদের অফিস বাড়ীর মাঝে হঠাৎ আমি থেমে যাই। ওপরের দিকে চেয়ে দেখি—নীল আকাশ। জগতের যে-সব জিনিষ আমি ভালবাসি, তার সব কিছুই আমি দেখলাম। কলমটার দিকে একবার তাকালাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, যা' সত্যিই আমি হতে চাই না, তার জন্যে চেষ্টা ক'রে কি হবে? পালিয়ে এলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করতে পারলাম না আমি কি? কেন পারলাম না, বলুন তো?
(সতীনাথের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু সতীনাথ সরে দাঁড়ায় বাঁ দিকে)

সতীনাথ। (কড়া স্বরে) তোমার সোজা রাস্তা খোলা রয়েছে, মন্মথ।

মন্মথ। তা আমি জানি।
(সতীনাথের দিকে এগিয়ে যায়, মন্মথ তার আর সতীনাথের মাঝে দাঁড়ায়। মন্মথ যে সতীনাথকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল, এবার তা' বেশ বোঝা যায় তার হাব-ভাবে)

মন্মথ। মহাপুরুষ আমিও নই, তুমিও নও। টাক পিটেছ আর প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রেছ, কিন্তু কিছুই করতে পার নি, শুধু ছাইগাদায় রত্নের সন্ধান করেছ। আমিও সাত-সাতটি প্রদেশ ঘুরেছি, তবুও একটাকার বেশী রেট ওঠাতে পারলাম না। বুঝতে পারছ, এর অর্থ?

সতীনাথ। (মন্মথকে) তুমি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাও?
(মন্মথর বাধা অতিক্রম ক'রে এগিয়ে যায় মন্মথ। সতীনাথ ভয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। মন্মথ তাকে ধরে ফেলে)

মন্মথ। (প্রবল উত্তেজনায়) আমি কিছুই নই, আমার মধ্যে কিছুই নেই তা' কি তুমি বুঝতে পার না? তোমার ওপর কোন ঘৃণা কোন অবহেলা আমার নেই, তা' কি তুমি বুঝতে পারছ না?
(মন্মথর উত্তেজনা ফুরিয়ে আসে, সে কেঁদে ফেলে। সতীনাথ অন্ধভাবে হাতড়াতে থাকে, সে হাত দিতে চায় মন্মথর মুখে)

সতীনাথ। (বিস্ময়ে) এ কি হ'ল? করছ কি? (কল্যাণীকে) কাঁদছে কেন ও?

মন্মথ। আমাকে তুমি যেতে দাও, বাবা, আমি চলে যাই। এখনও কি তুমি স্বপ্ন দেখবে আর কোন একটা কিছু না ঘটা পর্য্যন্ত বয়ে নিয়ে চলবে সেই স্বপ্ন? (আত্মসম্বরণ করার জন্য সরে দাঁড়ায় ও সিঁড়িতে ওঠে) কাল সকালে আমি যাব, তুমি ওকে শুইয়ে দাও মা। (ক্লান্ত পদক্ষেপে ওপরে চলে যায় তার ঘরে)

সতীনাথ। (খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, বিস্মিত অথচ উৎসাহিত হয়ে) কি অদ্ভুত ব্যাপার! মন্মথ, মন্মথ আমাকে পছন্দ ক'রে, শ্রদ্ধা করে!

কল্যাণী। সে তোমাকে ভালবাসে।

মন্মথ। ও সব সময় তোমাকে ভালবাসত।

সতীনাথ। মন্মথ! (চারিদিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে) ও কাঁদল, আমার কাছে ও কাঁদল। (কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, কিন্তু চীৎকার ক'রে বলে ওঠে) এই ছেলেটি, এই ছেলেটি আমার মহান, সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠেছে।

কল্যাণী। চল এখন শোবে চল, সব তো এখন মীমাংসা হয়ে গেল।

সতীনাথ। হ্যাঁ, আমরা ঘুমোব, এইবার আমরা ঘুমোব। চল মন্মথ, চল।

মন্মথ। আমিও নিজেকে একেবারে বদলে ফেলব। আমার জন্যেও আর তোমাদের দুঃখ পেতে হবে না, মা।

(সতীনাথ মুগ্ধ দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে থাকে মন্মথর দিকে)

কল্যাণী। তাই কর বাবা। তোমরা দুটিই খুব ভালো ছেলে, ভাল হও বাবা।

মন্মথ। যাই, শুইগে এবার।

(সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে যায়। সতীনাথ চেয়ে থাকে, মন্মথ অদৃশ্য হয়ে গেলে তার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে দীর্ঘনিঃশ্বাস)

কল্যাণী। এইবার চল।

সতীনাথ। (আস্তে আস্তে দরজার দিকে যায়) আমি পাকাপাকি ব্যবস্থা একটা ক'রে ফেলতে চাই, বুঝলে কল্যাণী। (অনুনয়ের সুরে) আমাকে একটু একা থাকতে দেবে?

কল্যাণী। (ঈষৎ ভীত কণ্ঠে) না। তুমি ওপরে চল।

সতীনাথ। (সস্নেহে) ক'মিনিটের মধ্যেই আমি আসছি। ঠিক এখনই আমার ঘুম আসছে না। তুমি যাও, তোমাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি এলাম ব'লে।

কল্যাণী। শীগ্‌গীরই এস কিন্তু।

সতীনাথ। দু'মিনিটের মধ্যেই আসছি।

(কল্যাণী পেছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় ও মুহূর্তে তাকে দেখা যায় তার শোবার ঘরে)

সতীনাথ। আমাকে ভালবাসে। (দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে) সব সময়ই আমাকে ভালবাসত?

(রক্তাভ আলোকরশ্মি নতুন দীপ্তিতে ভরে দেয় সতীনাথের মুখচোখ। আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে আসে মঞ্চের সম্মুখ ভাগে)

কি অদ্ভুত! ও আমাকে শ্রদ্ধাও করে?

কল্যাণী। কই, এস!

সতীনাথ। এঁ্যা। যাচ্ছি। —উঃ, কী ক'রে যাই, কী ক'রে ঘুমোই—

(যেন কল্যাণী দেখতে না পায় এমন সতর্ক পদক্ষেপে মঞ্চের বাঁদিকে চলে যায় সতীনাথ। সেখান থেকে সমস্ত বাড়ীটাকে সে একবার পর্য্যবেক্ষণ করে নেয়। তারপর করুণ সুরে যেন শেষ উপদেশ দিতে থাকে)

এবার যখন খেলতে নাববে, বুঝেছ বাছা, তখন সোজা চলে যাবে মাঠের মাঝখানে। সট মারবে খুব নীচু ক'রে আর জোর ক'রে। এইটেই সবচেয়ে বেশী দরকার। (ফিরে দাঁড়ায় দর্শকদের মুখোমুখি হয়ে) অনেক লোক আসে এই আড্ডাখানায়, তাই, তোমার

প্রথম কাজ হচ্ছে—(হঠাৎ মনে হয় একাই বলছে, এদিক ওদিক কাকে যেন খোঁজে কল্যাণী আবার ডাকে,—'কই, এলেনা এখনও?' ভয় পেয়ে যায় সতীনাথ। অস্পষ্ট ভয়সূচক ধ্বনি ক'রে সে ইসারায় যেন কল্যাণীকে চুপ করিয়ে দিতে চায়। পরক্ষণেই সে খোঁজ করে পালিয়ে যাবার পথ। এমন সময়, যেন তার আশ-পাশে সমবেত হয়েছে বহু মানুষ, তাদের কোলাহলে সোরগোলে যেন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে সতীনাথ, যেন বানচাল হয়ে যায় তার মতলব। ইসারায় তাদের থামাতে গিয়ে সে চীৎকার ক'রে ওঠে,—'স্‌স্‌স্‌'। সহসা আবহ সঙ্গীত সুরু হয় ধীরে ও উদাত্ত সুরে, থামিয়ে দেয় তার চীৎকার। সুরের তীব্রতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, শেষ পর্য্যন্ত উচ্চতম পর্দায় উঠে যেন অস্বাভাবিক রুক্ষতার সৃষ্টি করে। সতীনাথ একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে যায়, শেষ পর্য্যন্ত দ্রুত বেরিয়ে যায় মঞ্চ থেকে, মুখে তার "স্‌স্‌স্‌—"ধ্বনি)

কল্যাণী। কোথায় গেলে?

(কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। কল্যাণী তার শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। মন্মথ তার ঘরে উঠে দাঁড়ায় বিছানা ছেড়ে, কাণ পেতে সে শুনতে থাকে। সন্মথও উঠে বসে তার বিছানায়)

কল্যাণী। (একটু ভয় পেয়ে) মন্মথ, সে কোথায় গেলো দ্যাখ তো? (নেপথ্যে মোটর গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়ার শব্দ হয়, শোনা যায় পূর্ণবেগে গাড়ীটা ছেড়ে গেল)

কল্যাণী। এখন আবার কোথায় যাচ্ছ?

(দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায় পেছনের দরজা দিয়ে)

মন্মথ। (দ্রুত নেমে আসে সিঁড়ি বেয়ে) বাবা!

(গাড়ীখানা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবহসঙ্গীত ভেঙে পড়ে তীব্র বেসুরো ধ্বনির উন্মাদ রুক্ষতায় তারপর একটিমাত্র তারের কোমল সুর ভেসে আসে। গাড়ী ছাড়ার পর থেকে আবহসঙ্গীত ভেঙে পড়া পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে নানা রঙের আলোর খেলাও চোখ ঝলসে দেয় দর্শকদের। তারপর কোমল আবহসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামেশানো স্থির আলো ছড়িয়ে পড়ে সারা মঞ্চে। মন্মথ আস্তে আস্তে ফিরে যায় তার ঘরে। জামা খুলে ফেলে চাদর গায়ে দেয় দু'ভাই। ইতিমধ্যে শবযাত্রার সুর জাগিয়ে তুলছে আবহসঙ্গীত। মন্মথ ও সন্মথ আস্তে আস্তে নেমে আসে সিঁড়ি বেয়ে, কল্যাণীও আসে পেছনের দরজা দিয়ে, অঙ্গ তার অলঙ্কারহীন, চুল বিস্রস্ত আর চোখে তার গম্ভীর শোকের বার্ত্তা। দুই ছেলেকে দুই পাশে নিয়ে কল্যাণী সোজা এগিয়ে চলে দর্শকদের দিকে, মঞ্চের প্রান্তে এসে প্রায় ভেঙে পড়তে চায় কল্যাণী অস্ফুট আর্ত্তনাদে)

(ছেলেরা তাকে সোজা করে দাঁড় করায়। ক্লান্ত দেহে শূন্য দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে। ছেলেরা তাকে বসিয়ে দেয়)

কল্যাণী। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে। কেন উনি এমন ক'রলেন?

মন্মথ। যে-জীবনের স্বপ্ন উনি দেখেছিলেন আজ তা' ব্যর্থ হতে চলেছে বলেই—

সন্মথ। (উত্তেজিত হয়ে) ও সব কথা তুই আর বলতে পাবি নে, দাদা।

কল্যাণী। ওরে, আজও তোরা ঝগড়া করবি? ওরে—(ভেঙে পড়ে)

মন্মথ। (কোমল সুরে) না, মা।

কল্যাণী। ওরে, আমি কাঁদতে পারছি নে আমি যে এ কোন রকমেই বিশ্বাস করতে পারছি না। কলকাতা থেকে আনা টাকায় আজকেই যে ওর এ-বাড়ীর বন্ধকী দেনা আমি শোধ করেছি তুমি তা জানতে, জানতে সে-কথা। এ-বাড়ী যে আজ সম্পূর্ণ তোমার, তোমার—(বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ভেঙে পড়ে)

[বাঁশী বাজতে থাকে করুণ সুরে। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসে মঞ্চ আলোকরশ্মি শুধু কল্যাণীর মুখখানাই আলোকিত করে মুখ থেকে সরে গিয়ে আরো তীব্র ছটায় আলোকিত করে বাড়ীখানার ওপরের অংশকে অথচ সমস্ত সুরগুলি সমেত সমগ্র মঞ্চ আচ্ছন্ন হয় গভীর অন্ধকারে]

[দ্রুত নেমে আসে যবনিকা]

সুরশিল্পী রাইচাঁদ

★ ★ ★ লালচাঁদ দত্ত

সঙ্গীতের সাধনায় নিজেকে বিলীন ক'রে দিয়ে ছায়াছবির মাধ্যমে সাধনালব্ধ সঙ্গীতবিদ্যাকে দর্শকের মর্মের মণিকোঠায় পৌঁছে দিয়ে বাংলা সবাকছবির বিশ বছরের ইতিহাসে পরীক্ষামূলক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে যিনি স্বনামধন্য হয়ে উঠেছেন তিনি হলেন রাইচাঁদ বড়াল। সাধনায় সিদ্ধিলাভের বাসনা যার মনে বাসা বাঁধে পার্থিব কোনো বাধাই তার পথরোধ করতে পারে না। এর ওপর সহায় হয়েছিল রাইচাঁদের পারিবারিক পরিবেশটি। ছোটবেলায় যদিও বাড়ীতে অভিভাবকদের কোনোরকম সক্রিয় সমর্থন তিনি পাননি কিন্তু উত্তরকালে গৃহের এই সঙ্গীতচর্চ্চাময় আবহাওয়াই তাঁকে সঙ্গীত সাধনায় জুগিয়েছে প্রেরণা, তাঁর সাধনাকে চালিত করেছে নিত্যবিচিত্র সার্থকতার পথে।

১৯০৪ সালের ১৯শে অক্টোবর মধ্য-কলকাতার বিখ্যাত বড়াল পরিবারে রাইচাঁদের জন্ম। এঁর পিতা পরলোকগত লালচাঁদ বড়াল তখনকার দিনে কলকাতার একজন স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। তাঁর কণ্ঠসঙ্গীতে পরিতৃপ্ত জনগণের প্রশংসামুখর অভিনন্দন আজও বহু শ্রোতার স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে আছে। যাঁরা নিজের কানে তাঁর গান শুনেছেন তাঁরাই একথার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দেবেন। লালচাঁদ বড়াল নিজের কণ্ঠসঙ্গীতের সাধনায় মগ্ন থেকেই ক্ষান্ত থাকেন নি। তাঁর গৃহে নিয়মিত সমাবেশ ঘটেছে সারা ভারতের সেরা সঙ্গীতশিল্পীদের। কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীতে যাঁরা ছিলেন বিশেষ পারদর্শী তাঁদের পদার্পণে সে-গৃহ হয়ে উঠেছিল সঙ্গীত সাধনার পীঠ-স্থান। সঙ্গীতের যোগ্য সমাদর করা যেখানে সবার উচ্চে, সঙ্গীতে ভাবপ্রবণতা প্রকাশের কোন স্থান সেখানে ছিল না। বংশানুধারায় রাইচাঁদও যে সঙ্গীত-চর্চ্চার প্রতি আকৃষ্ট হবেন তাতে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও তাঁর এই সঙ্গীতচর্চ্চা যে অত অল্প বয়সে অভিভাবকরা সমর্থন করবেন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল বৈকি! রাইচাঁদ তখন সবেমাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র। কিন্তু সেই বয়সেই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা তাঁর অন্তর জয় করে নিয়েছিল পাঠ্য-তালিকার আকর্ষণকে দূরে ঠেলে দিয়ে। তাঁদের বাড়ীতে যে-ঘরে জলসা বসতো সেই রুদ্ধ-কক্ষের বাইরে একদিন শোনা গেল তবলার অপূর্ব্ব সুরমূর্চ্ছনা। কৌতূহলী শ্রোতা দ্বার ঠেলে ভেতরে গেলেন। যে-দৃশ্য তিনি দেখলেন তাতে বিস্ময়ে হতবাক হলেন। অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে বালক রাইচাঁদ সমানে তবলা বাজিয়ে চলেছে আর সেই হাতের স্পর্শে যে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে তা যেন প্রকৃত কোন কৃতী শিল্পীরই অনুরূপ। শ্রোতার দিকে দৃষ্টি যেতেই বাদকের হাত থেমে যায়। সচকিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে বাদকের অন্তরাত্মা। প্রশ্ন হয়—কে বাজাতে শেখালে? উত্তর আসে—কেউ নয়, নিজে নিজেই শিখেছি। সন্দেহাকুল প্রশ্নকর্ত্তা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—এ নিজে শেখা যায়, চালাকি হ'চ্চে! তেমনি ভয়চকিত বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে উত্তর আসে—আমি নিজেই শিখেছি। বিস্ময়াবিষ্ট প্রশ্নকর্ত্তা আবার বলেন—এ যে বড় শক্ত বোল, ওস্তাদজী তো সবে দিনকয়েক আগে বাজিয়েছেন—তুই কোথা থেকে শিখলি? আগের মতোই আস্তে আস্তে সেই কিশোর শিল্পীর জবাব আসে,—শুনে শুনে—যখন আসর বসে আমি লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, তারপর সবাই যখন চলে যায় তখন আমি চুপি চুপি সাধি। প্রশ্নকর্ত্তার বিস্ময় আরও বাড়তে থাকে—প্রশ্নকর্ত্তা আর কেউ নন, তিনি হলেন রাইচাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ঐ অতটুকু বয়সে তবলা-বাজনার চর্চ্চা করা কেই বা সমর্থন করতে পারে—কারণ পড়াশোনার ব্যাঘাত তো হবেই। অভিভাবকরা যতই নিষেধ করেন রাইচাঁদের গান-বাজনার প্রতি আকর্ষণ ততই বেড়ে ওঠে। রাইচাঁদ তো উৎসাহের আতিশয্যে মায়ের পিঠেই তবলার [illegible] চেষ্টা করেন—সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চপেটাঘাতও [illegible]রতে হয়। রাইচাঁদের পড়াশোনা সত্যিই বেশীদূর [illegible] না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশি[illegible]

পল্লীকান্তেই লেখা-পড়া শেখার পালা তাঁর শেষ হয়ে যায়।

সঙ্গীতচর্চ্চার প্রতি রাইচাঁদের আকর্ষণ, সঙ্গীত সাধনার জন্য উদগ্র বাসনা একদিন তাঁর গুরুজনদের সমর্থন লাভ করলো। তাঁরা রাইচাঁদের সঙ্গীতচর্চ্চার সুযোগ করে দিলেন বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে। অত অল্প বয়সে অত নিখুঁত সুর এবং তাল-লয় জ্ঞান ওস্তাদদেরও বিস্মিত আর চমৎকৃত করলো। পরম উৎসাহে রাইচাঁদকে সঙ্গীত-বিশারদ করে তোলার ভার তাঁরা নিলেন। তাঁদের সাধনা সফল হলো। রাইচাঁদ বড়াল একদিন ভারত-জোড়া নাম কিনলেন সঙ্গীত-পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। তাঁর সঙ্গীত-গুরু ব'লতে নির্দ্দিষ্ট কারও নাম করা না গেলেও তবলার গুরু হিসেবে প্রোফেসার মজিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের পর রাইচাঁদ জনসমাজে কৃতিত্বের পরিচয় দেবার প্রথম সুযোগ পেলেন কলকাতার বেতার প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে। কলকাতায় সেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় বেতার-প্রতিষ্ঠান। ক'লকাতার বেতার প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রতিষ্ঠা-দিবসে যাঁরা উৎসাহী হয়ে এখানে সমবেত হয়েছিলেন এবং বেতার-প্রিয় শ্রোতাদের সঙ্গীত পরিবেশন ক'রে তাঁদের তৃপ্তিদানে ধন্যবাদভাজন হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। সেদিন আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে—তৎকালীন ক'লকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের পরিচালকস্বরূপ স্বর্গত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, আঙ্গুরবালা প্রভৃতির। রাইচাঁদের সঙ্গে বেতার প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ছিল আরও নিবিড় আরও ঘনিষ্ঠ। বেতার-শ্রোতা তথা দেশবাসীর হৃদয়ে বেতারের আবেদনকে দৃঢ়তর করতে, বেতারের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তাঁর কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় ফুটে উঠতো বেতারের একজন পরম হিতৈষী বন্ধুর আন্তরিকতা। একক ভাবে যখন তিনি বাজনা বাজিয়েছেন তখন তাঁকে পিয়ানো বাজাতেই শোনা গেছে। পিয়ানো যন্ত্রের ওপর তাঁর অঙ্গুলিসঞ্চালন কত-যে আবেদনমধুর ছিল তা সেদিন যাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের হয়তো তা' আজও স্মরণে আছে। নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাঁশী বাজানোর সঙ্গে তাঁর তবলা-সঙ্গতও শ্রোতার কানে যে ঝঙ্কারের সৃষ্টি করতো তাও অবিস্মরণীয়। তখনকার দিনে আরও একটি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান ক'লকাতা বেতার মারফৎ মাঝে মাঝে প্রচারিত হতো তা হলো নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও থেকে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত রীলে ক'রে শোনানো। সে-অনুষ্ঠানেও রাইচাঁদের সঙ্গীত-প্রযোজনার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। খেলার মাঠ থেকে যখন ফুটবল খেলার বিবরণী রীলে ক'রে প্রচার করা হতো সেখানেও তাঁর উৎসাহের অভাব দেখা যায় নি—আর এ-ব্যাপারে তাঁর দোসর জুটতেন বেতারের নাট্য-বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। চিত্রজগতের সঙ্গে রাইচাঁদের পরিচয় এবং পরে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যতই বাড়তে লাগলো বেতার প্রতিষ্ঠানের

সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ততই ক্ষীণ হতে লাগলো।

চিত্রজগতের যে মায়ার বাঁধনে তিনি বাঁধা পড়েছেন তা কিন্তু এক-দিনেই তাঁর বেতারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সক্ষম হয়নি। বেতারের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং চলচ্চিত্র-জগতের প্রতি তাঁর বিমুখতা কত প্রবল ছিল তারই এক ছোট্ট কাহিনী আপনাদের শোনাই। রাইচাঁদের পিতামহ এ্যাটর্নি নিমাই বড়ালের সঙ্গে নিউ থিয়ে-টার্সের তৎকালীন ষ্টুডিও-সচিব অমর মল্লিকের পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সেইসূত্রে রাইচাঁদ ও অমর মল্লিকের মধ্যেও বন্ধুত্বের দুর্নিবার আকর্ষণ গভীরতা লাভ করেছিল। বন্ধুত্বের দাবী নিয়েই অমর মল্লিক একদিন প্রস্তাব করলেন—রাই, তোমাকে আমাদের নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গীত-পরিচালক হতে হবে—তোমার রেডিওর চেয়ে ঢের বেশী বড় ব্যাপার। রাইচাঁদ কিন্তু ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠেন, জবাব দেন—কি! তোমার নিউ থিয়েটার্স রেডিও'র চেয়ে বড় ব্যাপার? এ হলো গভর্ণ-মেণ্টের আর ওটা হলো বি এন সরকারের,—কিসে আর কিসে! কি যে বল! আর তাছাড়া, আমি কি কন্সার্ট পার্টির বাজনাদার নাকি যে তোমার নিউ থিয়েটার্সে কন্সার্ট বাজাতে যাবো? অমর মল্লিক দুঃখিত হ'ন কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দিলেন না।

অমর মল্লিককে বিমুখ করলেও ছায়াজগতের মায়া রাইচাঁদকে অলক্ষ্যে হাতছানি দিয়ে আহ্বান করছিল তা তিনি নিজেও জানতেন না। ছায়াচিত্র জগতে যোগ দেওয়ার বাসনা তার মনেও স্থান পায়নি। কিন্তু সেই

বাংলা চিত্রজগতের সর্ব্বজনপ্রিয় সুরকার রাইবাবু

ছায়াচিত্র জগতের আকর্ষণের প্রথম ইন্ধন জুগিয়েছিলেন অমর মল্লিক। রাইচাঁদ গিয়ে হাজির হলেন নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে। সঙ্গীত-পরিচালকের পদ অলঙ্কৃত করার সুযোগ তিনি অবলীলাক্রমে লাভ করলেন।

নতুন কাজের প্রেরণায় আর উন্মাদনায় রাইচাঁদ মেতে ওঠেন। প্রথমেই [illegible] ছবিতে সুর-সংযোজনার ভার তিনি পেলেন [illegible] 'দেনা পাওনা'। সেই সময় প্রথম যে হিন্দী ছবিটিতে সুর দেন তা হলো 'মহ[illegible]-

মোশান পিকচার এ্যাসোসিয়েশান অব আমেরিকার উদ্যোগে প্যারামাউন্ট ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ-এর সম্বর্দ্ধনা-সভায় দেখা যাচ্ছে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ এবং ফ্রাঙ্ক কাপরা সেসিল বি ডি মিলি প্রভৃতি চিত্র-কর্ম্মীদের

কা-আঁসু'। রাইচাঁদ যেসময় নিউ থিয়েটার্সে সঙ্গীত-পরিচালকের পদে যোগ দিয়েছেন সে-সময় ছিল ষ্টুডিওটি পত্তনের প্রথম অবস্থা। প্রয়োজনমত বাদ্যযন্ত্রাদি যা কিছু সবই এঁকে নিজের হাতে জোগাড় ক'রে নিতে হয়েছে। কোথায় কোন্‌টি কেমনভাবে ব্যবস্থা ক'রলে সব পরিপাটিমতো হ'তে পারে সে-বিষয়ে রাইচাঁদের আগ্রহও যেমন ছিল অফুরন্ত, যত্নেরও তেমনি ছিল না কোনওরকম কার্পণ্য। সেখানে তখন 'চণ্ডীদাস' ছবি তোলার পর্ব্ব চলছে। রাইচাঁদ নিজের হাতে সব জোগাড় করতে লাগলেন আর এ-বিষয়ে নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকারও সব ব্যবস্থার সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্যে সকল রকম সহযোগিতা করেছেন। এই 'চণ্ডীদাস' ছবির সময়েই বাংলা চিত্রশিল্পের [illegible] একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। তা হলো [illegible] ছবিতে আবহ-সঙ্গীত বা ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের ব্যবহার। এ-বিষয়ে রাইচাঁদকে এই কৃতিত্বের দাবীদার হিসাবে উল্লেখ করতে হয়। সে-সময় আরও এক ত্রুটী ছিল, তা হলো মাইকের উপযোগী কণ্ঠস্বর গায়ক বা গায়িকাদের মধ্যে পাওয়া যেতো না। যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতে লাগলো তাও পরীক্ষামূলক ভাবে। এই ছবিতে তিনি সর্ব্বপ্রথম 'শ্রীখোল' বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করলেন। তাঁর সুর-সংযোজিত নিউ থিয়েটার্সের আদি যুগের উপরোক্ত তিনখানি সবাক ছবি সঙ্গীত পরিচালনার দিক থেকে তাঁর যশ ও খ্যাতির ভাণ্ডার ভরিয়ে দিল।

এর পর নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানে একের পর এক সুর-সংযোজনার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন রাইচাঁদ। সেই সময় থেকে যতদিন নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল—এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রায় ৬০।৬৫ খানি ছবিতে সুর দিয়েছেন। তিনি যেসব ছবিতে সঙ্গীত-পরিচালক

হিসাবে কাজ করেছেন সুর-সংযোজনার দিক থেকে তার কোনটিই ব্যর্থ হয় নি। বহু ছবিতে তাঁর দেওয়া সুরের গান সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'চণ্ডীদাস,' 'ভাগ্যচক্র', 'দিদি', 'দেবদাস', 'বিদ্যাপতি', 'সাথী' এবং পরবর্তী যুগের 'উদয়ের পথে', 'অঞ্জনগড়' প্রভৃতি ছবির গান এবং আবহ-সঙ্গীত বেশ তৃপ্তিদায়ক হয়। এদের মধ্যে 'ভাগ্যচক্র' ছবির প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপারের কথা বলতে হয়। এ-ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করার সময় রাইচাঁদ চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আরও এক নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। এটি হলো 'প্ল-ব্যাক' পদ্ধতিতে চিত্রের সঙ্গীত গ্রহণ। এতে একদিকে বহু শিল্পীর অভিনয়ে যোগ দিতে গান গাইতে না-জানাটা যেমন প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়ায় না তেমনি শুধুমাত্র প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসেবে গানে কণ্ঠস্বর দান ক'রে খ্যাতি ও অর্থ দুই-ই লাভের সুযোগ পেয়েছেন বহু গায়ক-গায়িকা। রাইচাঁদের শিক্ষাধীনে বা প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসেবে গান গেয়ে যেসব শিল্পী সার্থকতা লাভ করেছেন তাঁরা হলেন স্বর্গত কুন্দনলাল সায়গল, অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজকুমার মল্লিক, অনুপম ঘটক, কানন দেবী, সুপ্রভা সরকার, সুপ্রীতি ঘোষ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, স্বর্গতা শৈল দেবী, রাম গাঙ্গুলী, পান্না ঘোষ, রশিদ আৎরা, আলী হাসান। প্লে-ব্যাক সম্বন্ধে তাঁর একটি মত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তা হলো প্লে-ব্যাকের ব্যাপারে একই শিল্পীকে দিয়ে দুটি ভিন্ন চরিত্রের গান গাইয়ে নেওয়াকে তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সময় এই বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু বোম্বাই চিত্রজগতে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। মিউজিক্যাল ছবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন এই ধরণের ছবি বাংলা দেশে তোলা অসম্ভব ব্যয়সাপেক্ষ ব'লে তা সম্ভব হবে কিনা সেইটাই লক্ষ্যণীয়।

স্বাক্ষর বিনিময়: অটোগ্রাফ সন্ধানীদের মতই উৎসাহ এঁদের: পরস্পরের অটোগ্রাফ সংগ্রহে ব্যস্ত ব্রিটিশ চিত্রনটী জিন সিমন্স ও বাঙ্গালী চিত্রাভিনেত্রী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

একদিন ষ্টুডিওতে গানের সুর দেওয়ার সময় ভারী মজার এক ঘটনা ঘটে। তিনি তখন 'দেবদাস' ছবির সুর দেওয়ার কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ একদিন রাইচাঁদ বেঁকে বসেছেন, গানের সুর তিনি দেবেন না। সে-গানটি গাইবার কথা ছিল সায়গলের। ষ্টুডিও-মালিকের কাছে খবর গেল। অমর মল্লিক [illegible]—কি ব্যাপার, রাই? সুর দেবে না কেন? ক্রোধোন্মত্ত রাইচাঁদের মুখে তখন প্রায় কোন

পদ্মা দেবী : চারু চিত্রকলার 'সতী বেহুলা' চিত্রে নবতর চরিত্ররূপায়ণে দেখা যাবে তাঁকে

কথাই সরছিল না। তবুও সামলে নিয়ে উত্তর দেন—কি বলো মল্লিক, আমি বেশ্যাবাড়ীর গানের সুর দেব? লোকে বলবে কি! আমার বাড়ীতেই বা বলবে কি! অমর মল্লিক অনেক কষ্টে বোঝালেন: রাইচাঁদও শেষে রাজী হলেন। তাঁর দেওয়া সেই গানের সুর 'গোলাপ হ'য়ে উঠুক ফুটে' আজও শ্রোতার কানে মধু বর্ষণ করে।

সাম্প্রতিককালের এদেশীয় ছায়াছবির সঙ্গীতাংশ সম্বন্ধে তাঁর উঁচু ধারণাই রয়েছে। তবে তিনি বলেন যে,—বিশেষ করে কণ্ঠসঙ্গীতের দিকটা যতটা উন্নত হয়েছে সেই পরিমাণে অর্কেষ্ট্রার দিকে ততটা উন্নতি লাভ করতে পারে নি। এ-ব্যাপারে বাংলাদেশ বা বোম্বাই-এর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এই যে ত্রুটি রয়েছে এর জন্যে অবশ্য তিনি ষ্টুডিওর সাজ-সরঞ্জামের অপ্রতুলতাকেই দায়ী করেছেন। এ সম্বন্ধে অবহিত হলেই সঙ্গীত কেন সমগ্র ছবির দিকটাই উন্নত হতে পারবে এবং বাংলা ছবির মানও বিদেশী ছবির পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে ব'লে আশা করা যায়। ইদানীংকালে কতক ক্ষেত্রে বোম্বাই ছবির সুর অধিকতর জনপ্রিয় হওয়ার মূলে হিন্দী ছবির গানের দোলাকেই তিনি একমাত্র কারণ ব'লে মনে করেন। এর জন্যে বিদেশী সুরের প্রাধান্য এবং অনুকরণ এসে পড়েছে। এজন্যে অবশ্য ব্যক্তিগত-ভাবে তিনি বিশেষ দুঃখিত। কারণ স্থানকালপাত্র বিচার না ক'রেই যেমন-তেমন ক'রে বিদেশী সুর চালিয়ে দেওয়াটা খুবই অশোভন এবং অসঙ্গত।

ছবিতে সুর-সংযোজনার ব্যাপারে তিনি প্রয়োজন অনুযায়ীই সুর দেওয়ার পক্ষপাতী। আনন্দোচ্ছল বা

★

শ্রীমতী নূতন সমর্থ : শোভনা সমর্থের কন্যা নূতন আজ মায়ের মতই জনপ্রিয়তার অধিকারিণী

★

করুণ সুর দেওয়ার যখন যেরকম প্রয়োজন হয় সেইরকম সুর দেওয়া আর এ-বিষয়ে ছবির পরিচালক বা কাহিনী-কারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত ব'লে তিনি মনে করেন। নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠানে তিনি এইভাবেই কাজ করেছেন। গান রচনার আগে সুর রচিত হয়ে গেছে এমন দৃষ্টান্তও তিনি দেখিয়েছেন হিন্দী 'চণ্ডীদাস' ছবিতে। চিত্র-সঙ্গীতের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতের বেলায় তিনি এদেশীয় সুর মেনে চলার পক্ষপাতী—যাতে ভারতীয় সঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 'মেলডি' জিনিষটি ফুটে উঠতে পারে, তবে অর্কেষ্ট্রা সম্বন্ধে বিদেশী সুরের প্রভাবের অপরিহার্য্যতা সব সময় তিনি অস্বীকার করেন না। তাঁর মতে 'অর্কেষ্ট্রা' জিনিষটিই হলো বিদেশীয়—সেইজন্যেই ছবিতে পাশ্চাত্যঘেঁসা 'অর্কেষ্ট্রা' যদিই বা থাকে তাতে দোষের কিছু দেখা যায় না। আমাদের দেশের ইতিহাসে ভরতমুনির নাট্য-শাস্ত্রে ঐক্যতান বাদনের উল্লেখের ব্যাপারে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের নাম আছে ব'লে তিনি জানান, কিন্তু সেসব বাদ্যযন্ত্র এখন দুষ্প্রাপ্য আর এই ঐক্যতানের পরিবর্ত্তে এই নামগুলি

ব্যবহার করা হতো—যেমন 'ঐক্যতান', 'বাদ্যভাণ্ড', 'ঐক্যবাদন'। কিন্তু অধুনা অর্কেষ্ট্রা নাম দিয়ে অনেক সময় যে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়, বিশেষ করে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে তা একেবারে অসহ্য। এই প্রসঙ্গে বহুদিন আগে তিনি যে ঐক্যতান বাজনার প্রবর্ত্তনা করেন তার কথা উল্লেখ ক'রে বলেন, সেই ঐক্যতান হয়েছিল বেশ উপভোগ্য আর প্রশংসনীয়। ১৯২৫ সালে লক্ষ্ণৌতে নিখিল-ভারত সঙ্গীত অধিবেশনে 'মাহিয়ার ষ্টেট ব্যাণ্ড সম্প্রদায়ের' ঐক্যতান বাজনার কথাই তাঁর মনে হয়েছিল। চিত্রজগতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি যে ঐক্যতান-সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন তার নাম ছিল 'এক্স অর্কেষ্ট্রা'। গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর বাজনা ধরে রাখা হয়েছে। চিত্রজগতে যোগ দেওয়ার পরে তাঁর অধীনে ঐক্যতান-বাজনার বহু রেকর্ড 'নিউ থিয়েটার্স অর্কেষ্ট্রা' নামে পরিচিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ তিনি চিত্র-সঙ্গীতগুলির রেকর্ড করানো সম্বন্ধে বলেন যে, আগে চলচ্চিত্রের গান রেকর্ড করা হতো দেখে-শুনে। কিন্তু আজকাল নিতান্তই ব্যবসাদারী মনোভাব নিয়েই যেন ছবির গানের রেকর্ড করা হয়। তার ফলে অনেক সময় ছবির মুক্তির বহু পূর্ব্বেই সেই ছবির গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়ে যায়।

আজ পর্য্যন্ত যত ছবিতে রাইচাঁদ সুর দিয়েছেন তার তালিকা বেশ দীর্ঘ। এইগুলির মধ্যে বহু ছবির 'টাইটল্-মিউজিক' বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ছবির এই সঙ্গীতাংশ, তাঁর মতে, ছবির প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ করার পক্ষে অনেকখানি সহায়তা করে। চিত্রজগতের সংস্পর্শে এসে যেসব সঙ্গীত-রচয়িতার সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে বাণীকুমার, স্বর্গত অজয় ভট্টাচার্য্য, আর্জ্জু সাহেব, আগা-হশর-কাশ্মিরী, মুন্সী, জাকির হোসেন, পণ্ডিত মাধোকজী এবং হসরৎ জয়পুরীর নাম তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি নিজে ব্রিটিশ [illegible] চেয়ে মার্কিন ছবি দেখারই বেশী পক্ষপাতী। তিনি অনেক সময় সাধারণ [illegible] প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে নিজের সুর-দেওয়া ছবি দেখেন এবং দর্শকদের প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। সাধারণ দর্শক এবং সমালোচকদের মতামতকে তিনি সব সময়ই তাঁর কাজের পথ-প্রদর্শক হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টির সার্থকতার আনন্দও তিনি মনে মনে অনুভব করেছেন।

সঙ্গীত পরিচালক হতে গেলে রসজ্ঞান থাকাটাই সব-চেয়ে বাঞ্ছনীয় ব'লে তিনি মনে করেন। বিশেষ করে, ছায়াছবির সঙ্গীত পরিচালক হতে গেলে চিত্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিচারশীল হতে হবে এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ এবং সজাগ জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় ব'লে তিনি মনে করেন। এজন্য তিনি কণ্ঠ-সঙ্গীত এবং যন্ত্র-সঙ্গীত দুটি বিভাগে দু'জন ভিন্ন সঙ্গীত পরিচালক নিয়োগেরও পক্ষপাতী যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ বিভাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপযোগী হবেন।

বাংলা দেশে সম্পূর্ণ সঙ্গীত-প্রধান যাকে মিউজিক্যাল ছবি বলা চলে সে-জাতীয় ছবি তোলারও তিনি পক্ষপাতী এবং সুযোগ পেলে তিনি নিজেই এ-জাতীয় ছবি সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে পরিচালনা করতে প্রস্তুত আছেন আর সেক্ষেত্রে সাধারণ পরিচালকের অধীনে কাজ করারও তিনি বিরোধী।

১৯৫১ সালে রাইচাঁদ বড়াল বোম্বাই থেকে আহ্বান পেয়ে নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠান ছেড়ে বোম্বাই চলে যান এবং সেখানে কয়েকটি চিত্রের সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন। নিউ থিয়েটার্সের বাইরে এম এল বি প্রোডাকসন্সের হ'য়ে 'ভুলের শেষে' ছবিতেও এঁর সঙ্গীতপরিচালনা উল্লেখযোগ্য এবং এই ছবির তিনি অন্যতম প্রযোজকও ছিলেন। বোম্বাইতে নীতিন বসু প্রযোজিত 'দর্দ-এ-দিল' ছবিতে তিনি সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন। বর্ত্তমানে তিনি বিজয় ভট্ট পরিচালিত 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' ছবিতে সুর দিচ্ছেন। বাংলা দেশ থেকে গিয়ে বহু শিল্পীই বোম্বাই চিত্রশিল্পে নিজেদের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সঙ্গীত-পরিচালকদের অগ্রগণ্য রাইচাঁদ বড়ালও তাঁর প্রতিভাগুণে বোম্বাইয়ের চিত্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারে বাঙালীর প্রাণ সৃষ্টি করুন এই শুভকামনাই আমরা জানাই তাঁকে।

পেশাদার রঙ্গালয়ের রঙ্গ

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

সৌখিনদলের থিয়েটারে কত রঙ্গই না ঘটে এবং এক-এক সময় সেই রঙ্গের ফলে বড় বড় জমাট্‌ ট্রাজেডী যে কি রকম প্রহসনে রূপান্তরিত হয় তার পরিচয় আমি পত্রান্তরে প্রকাশ করেছি। কিন্তু পেশাদারী রঙ্গমঞ্চেও সময় সময় কম মজার ব্যাপার ঘটেনা এবং কোন কোন সময় ট্রাজেডী প্রহসনে এবং প্রহসন ট্রাজেডীতে কিভাবে পরিণত হয় তার কিছু পরিচয় আজ আপনাদের দেব। অভিনয় করতে করতে আর একটা অভিনয়ও সময় সময় দর্শকদের অজ্ঞাতে চলে যা দর্শকরা টের পান না কিন্তু রঙ্গমঞ্চের ওপর অবস্থিত বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীর সে-সময় অভিনয় করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সব ক্ষেত্রে নাম করা চলবে না কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে নাম করলে আপনারাও কৌতুকটা কম উপভোগ করবেন না।

কাশীতে বিজয়ার দিন কোন একটি পৌরাণিক নাটক অভিনীত হচ্ছে। অভিনয় করছেন এখানকারই কোন পেশাদার দল। বিজয়ার দিন প্রতিমা নিরঞ্জনের পরে পুরুষ-অভিনেতারা প্রায় সকলেই সিদ্ধিপান করে বসে আছেন কিন্তু মেয়েরা খাননি। পৌরাণিক নাটক, দিব্যি অভিনয় হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ প্রধান অভিনেতার মনে হল তিনি বোধ হয় ভুল পার্ট বলে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর ভূমিকা ছিল শ্রীরামচন্দ্রের, তিনি ভাবলেন তিনি কোন মোগল সম্রাটের অভিনয় করতে নেমেছেন। মাঝে মাঝে তাই দুটো ভূমিকারই কিছু কিছু অংশ বলে ক্রমাগত তিনি ব্যালেন্স রাখবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু কাঁহাতক এরকম সন্দেহ-দোলায় দুলে পার্ট করা যায়, তাই উইংসের পাশে এসে প্রম্পটারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁহে আমি কি সেজেছি? মোগল সম্রাট না রাম?

প্রম্পটারও সিদ্ধি খেয়ে ভোঁ হয়ে আছেন, কি যে বলছেন তার ঠিক নেই, হঠাৎ কর্তার প্রশ্নে তাঁর চমক ভাঙলো, তাই ত' কি অভিনয় হচ্ছে সেটা তো তিনিও বুঝতে পাচ্ছেন না, তিনি তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "একটু দাঁড়ান স্যার, মেয়েদের জিগ্যেস করে আসি, কারণ আমিও ঠিক ঠাওর করতে পারছিনা।"

কথাটা বোধহয় সামনের শ্রেণীর কোন এক রসিক দর্শকের কানে পৌঁছলো। অধিকাংশ দর্শকও সিদ্ধি খেয়ে ভোঁ হয়ে আছেন, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, কোন ভাবনা নেই যা খুসী বলে যাও দাদা, আমরাও যা খেয়েছি তাতে পৌরাণিক আর মোগল পিরিয়ড একই মনে হচ্ছে।

এরপরে সেদিনের অভিনয় যে কি হয়েছিল তা কাশীর লোকেরাও ঠিক বলতে পারেন না, ওখানকার মহিলা দর্শকরা হয়তো বলতে পারেন।

দানিবাবু চাণক্য অভিনয় করছেন। জনৈক বিশিষ্ট অভিনেতা কাত্যায়ণের ভূমিকায় তাঁর সঙ্গে অভিনয় করে চলেছেন। কাত্যায়ণ ও চাণক্যের একটি দৃশ্যে অতি সান্নিধ্যে অভিনয় করা প্রয়োজন। কন্যার বিরহে কাতর হয়ে চাণক্য অধীর—কাত্যায়ণ দিচ্ছেন তাঁকে সান্ত্বনা, অশান্ত চাণক্যকে বোঝাবার জন্যে বন্ধু কাত্যায়ণের গায়ে হাত দেওয়াটা অন্যায় নয়, কিন্তু দানিবাবু কারুর গায়ে হাত দেওয়াটা পছন্দ করতেন না। জোর অভিনয় চলছে, চাণক্য ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছেন, কাত্যায়ণ কাছে এসে তাঁর বাহু ধরতে যাবেন, চাণক্য দিলেন কনুয়ের এক গুঁতো, অর্থাৎ তিনি যে এটা অপছন্দ করেন এইটে জানালেন কিন্তু কাত্যায়ণ তাঁর ধাত না বুঝে আবার কাছে এগোতেই ফের এক ধাক্কা। দানিবাবু আরও চটেছেন ও অভিনয়ও আরও জমাট হচ্ছে কিন্তু কাত্যায়ণ বুঝতে পাচ্ছেন না তিনি কাছে গেলেই চাণক্য কনুয়ের গুঁতো মারেন কেন? অবশেষে কোনক্রমে দৃশ্যটি শেষ হতে দানিবাবু ও কাত্যায়ণ প্রস্থান করলেন। উইংসের আড়ালে ঢুকেই দানিবাবু ও কাত্যায়ণে হাতাহাতি হবার উপক্রম।

দানিবাবু চীৎকার [illegible] বলে উঠলেন, আপনি কি

রকম ভদ্দরলোক মশাই, বার বার আমার গা খাব্লা-চ্ছিলেন—খবরদার ওরকম করবেন না।

কাত্যায়ণ বললেন, সেকি মশাই, কাত্যায়ণ চাণক্যের বন্ধু, সে তাকে সান্ত্বনা দিতে গায়ে হাত বুলুবে না?

দানিবাবু বলে উঠলেন, আলবৎ না। প্লে করতে এসেছেন প্লে করুন ও সব গায়ে হাত-টাত দেওয়া আমি কখনও বরদাস্ত করতে পারিনা। জানেন, ঐ জন্যে জন্মে আমি প্রেমের পার্ট করি নি?

এর ওপর আর কথা কি? কাত্যায়ণ চুপ!

ষ্টার থিয়েটারে 'বন্দিনী' অভিনয় হচ্ছে। অহীন্দ্র চৌধুরী মশাইয়ের একটি বড় ভূমিকা আছে। প্রথম দৃশ্যে রাজসভা। খুব জমাটিভাবে 'বন্দিনী'র আরম্ভ। সেইখানে অহীন্দ্রবাবুর একটি নাটকীয় মুহূর্ত্তে সেনাপতি না রাজার ভূমিকায় প্রবেশ করার কথা। চমৎকার রূপসজ্জা তিনি করেন, একটি সুশোভন গুম্ফ তিনি মুখে লাগান, কিন্তু একদিন তাঁর আসতে বিলম্ব হওয়াতে যা কাণ্ড হয়েছিল তা স্মরণীয়।

ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার তখন অপরেশবাবু—তাঁর কড়া হুকুম যে নির্দ্ধারিত সময়ে যবনিকা তোলা চাই-ই। ষ্টার থিয়েটারের পরিচালকবৃন্দও সব বাঘা বাঘা। সেদিন তাঁরাও এসেছেন, প্রেক্ষাগৃহও পরিপূর্ণ। অপরেশবাবু ডিরেক্টরদের সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে বসেছেন, ঠিক সময়ে ড্রপ উঠে গেল, অহীন্দ্রবাবুর তখন সাজ হয়ে গেলেও রূপসজ্জা শেষ হয়নি—একধারের গোঁফটি আঁটা হয়েছে আর একধারে আটা লাগানো হচ্ছে, ঠিক এমনি সময়ে রঙ্গমঞ্চে সেই নাটকীয় মুহূর্ত্ত এসে উপস্থিত। অহীন্দ্রবাবু দর্শকদের দিকে আধা-গোঁফ নিয়েই নাটকীয়ভাবে এসে উপস্থিত হলেন। অন্য দিকটা ষ্টেজের অভিনেতৃবর্গের চোখের সামনে রইল কিন্তু অভিনয় তখন এত জোর হচ্ছে যে তাঁর মুখের দিকে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কেউই তাকান নি, কিন্তু অহীন্দ্রবাবু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির হলেও খুবই সুরসিক ব্যক্তি, তিনি তাঁর [illegible] শেষ করেই বিড়বিড় করে [illegible]তে আরম্ভ ক[illegible], ওরে [illegible] খুব অভিনয় কর[illegible]আমার মুখের দিকটা দেখ্ না[illegible]

আড়চোখে সবাই তাঁর মুখ দেখে স্তম্ভিত—একি! একধারে গোঁফ আঁটা আর অন্যদিকে খালি! প্রবল হাসি চাপতে গিয়ে সবাই বেফাঁস বকতে সুরু করলে, পার্ট-কার্ট ঘুলিয়ে একাকার। অপরেশবাবু চটে লাল। দৃশ্যটি শেষ হতেই ভেতরে গিয়ে সকলকে যাচ্ছেতাই সুরু করলেন, সব ইয়ারকি পেয়েছো? ষ্টেজটা ইয়ার্কির জায়গা? কি হয়েছিল বলো?

তখন বাধ্য হয়ে একজন বলে উঠলো, স্যার অহীন-বাবুই তো সব ঘুলিয়ে দিলেন। ওঁর যে একধারে গোঁফ ছিল না। অপরেশবাবু তাতে আরও ক্ষেপে গেলেন।

গোঁফ ছিল না? আমরা সব কাণা, কেউ কিছু দেখিনি? কে বললে গোঁফ ছিল না?

শেষে প্রত্যেকের যখন ফাইন্ হবার উপক্রম সেই সময় অহীনবাবুই গম্ভীরভাবে এসে বলে ফেললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, তাড়াতাড়িতে আর একদিকের গোঁফটা আমি আঁটতে পারি নি—কোনরকমে ম্যানেজ করে নিয়েছি কিন্তু ওদেরও অভিনয় করতে নেমে হাসাটা ঠিক হয়নি, এসব সিরিয়াস্ জিনিষ বোঝে না, ইত্যাদি।

অপরেশবাবু বুঝলেন যে নাটের গুরুই এই কীর্ত্তি করেছেন তাই কোনমতে রাগ চেপে সেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

আর একদিনের ঘটনা। নাট্যভারতীতে শচীন সেন-গুপ্ত মশাই-এর 'সংগ্রাম ও শান্তি' অভিনয় হচ্ছে। প্রথম দৃশ্যটি খুব জমাটি। সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, জহর গাঙ্গুলী সবাই অভিনয় করছেন। কোন একটি মেয়ে জমিদার বাড়ীতে এসেছে, তাকে কেউ দেখতে পারে না কিন্তু গৃহকর্ত্তা চৌধুরী-মশাই শিকার থেকে না ফেরা পর্য্যন্ত তাকে কেউ চলে যাবার নির্দ্দেশ দিতেও পারছে না। সকলের ভাব অত্যন্ত রাগান্বিত—এই সময়ে অহীন্দ্রবাবু শিকার থেকে বন্দুক হাতে অপরূপ রূপসজ্জা করে ফিরলেন।

অহীন্দ্রবাবুর স্ত্রী সেজেছেন রাজলক্ষ্মী, কন্যা সাবিত্রী ও বধু-জামাতার ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী। বেশ কথা [illegible]কাটি চলছে, দর্শকরা স্তব্ধ হয়ে শুনছে। সেদিন রবিবার, প্রেক্ষাগৃহে লোক ভর্ত্তি—এমন সময় আমি

প্রেক্ষাগৃহে কোথাও জায়গা থাকলে বসবো ভেবে ঢুকছি—হঠাৎ অহীন্দ্রবাবু তাঁর বক্তৃতার শেষে যাতে দর্শকরা না বুঝতে পারেন অথচ আমরা বুঝতে পারি এমনভাবে বলে উঠলেন, আমি জমিদার আমার কথা অমান্য করবে এমন সাহস তার? আচ্ছা আমি দেখছি বলে বন্দুকটা টেবিলের ওপর স্থাপন করতে গিয়েই বলে উঠলেন, ঐ দেখ, বীরেনবাবু আবার কাদের আমদানি করে এখানে ঢোকাচ্ছেন।

শেষের কথাটা আমার কানে ও তাঁর সঙ্গে অভিনয়রত অন্যান্য সকলের কানেই গেছে কিন্তু দর্শকরা সেটা কিছুই ধরতে পারেন নি। কথাটা যাদের লক্ষ্য করে বলা তারা সকলেই হঠাৎ আমার দিকে চেয়েছে। আমি পেছন ফিরে দেখি চারজন ভিন্ন প্রদেশবাসী মহিলা বিপুলাকায় উদর নিয়ে আমার পিছু পিছু আসছেন, সত্যি তাঁদের দেখে হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য। আমি তো সেখান থেকে একেবারে হলের বাইরে ছুট, কিন্তু অহর, সাবিত্রী ও রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না।

প্রায় এক মিনিট সবাই কথা না বলে নানারকম অঙ্গ-ভঙ্গী করে নিজেদের সামলাতে লাগলো তারপর কোনক্রমে ভূমিকা আওড়ে রেহাই পায়।

গ্রীণ-রুমে যেতে সবাই একেবারে হেসে ফেটে পড়ছে। কিন্তু অহীন্দ্রবাবুর ভাব, যেন কিছুই ঘটেনি। সকলকে হাতযোড় করে শেষে বলতে হল 'দোহাই আপনার, ও-রকম করবেন না।'

অহীন্দ্রবাবুর একটা মজা দেখেছি লোককে হাসিয়ে দিয়েও নিজে কিছুতেই হাসবেন না।

স্বর্গীয় নির্মলেন্দু লাহিড়ী মশাই কিন্তু হাসি চাপতে পারতেন না। অপরকে হাসাতে গিয়ে নিজেই হেসে অপ্রস্তুত হয়েছেন বহুবার। একবার 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় হচ্ছে। নির্মলেন্দুবাবু 'চাণক্য' সেজেছেন। চাণক্যের প্রথম দৃশ্যে আছে "ঐ বদ্ধজলার ওপারে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে, পচা পাঁকের দুর্গন্ধে বাতাসের যেন নিজেরই নিঃশ্বাস আটকে আসছে, হে সুন্দরী বীভৎসতা তুমি ... সুন্দর!" ইত্যাদি।

নির্মলেন্দুবাবু গ্রীণরুমে হঠাৎ হাসতে হাসতে বললেন, আচ্ছা ধরো চাণক্যের ঐ বক্তৃতা বলতে বলতে যদি কেউ পচা পাঁকের জায়গায় পকা পাঁচ বলে ফেলে, তাহলে কি হয়? সকলে হো হো করে হেসে উঠলো। কেউ কেউ বললে, অভিনয়ের তাহলে ঐখানেই খতম হয়ে গেল। নির্মলেন্দুবাবু হাসি-ঠাট্টা করছেন এমন সময় প্রম্পটার এসে খবর দিলে আপনার সিন্ এসেছে স্যার!

নির্মলেন্দুবাবু হেসে বলে উঠলেন, সেই পকা পাঁচের সিন্? সে হেসে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ!

আশ্চর্য্য যেটা নিয়ে এতক্ষণ হাসি-ঠাট্টা হচ্ছিল নির্মলেন্দুবাবু কি ঠিক ষ্টেজেও দর্শকের সামনেই সেই ভুলটা করে বসলেন? হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল —পকা পাঁচের দুর্গন্ধে বাতাসের যেন নিজেরই নিঃশ্বাস আটকে আসছে।

যেই বলা আর সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে বোমার মত সশব্দে হাসির আওয়াজ ফেটে পড়লো। অভিনয় করাই দুঃসাধ্য। যাই হোক কোনক্রমে অভিনয় চলতে চলতে শেষ দৃশ্যে যখন চাণক্য তাঁর বক্তব্য বলে বেরিয়ে যাবেন হঠাৎ এক পেছনের দর্শক চীৎকার করে বলে উঠলো—'পকা পাঁচ!'

আবার সেই দুর্দান্ত হাসি। সৌভাগ্যের বিষয় সেটি শেষ দৃশ্য তাই যবনিকা পড়ায় অভিনেতারা নিষ্কৃতি লাভ করলে। এরপর বছরখানেক আর নির্মলেন্দুবাবু চাণক্য অভিনয় করতে নামেন নি।

রঙমহলে দুর্গাদাস 'স্বামী-স্ত্রী'তে ললিতের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। অমন অপরূপ অভিনয় খুব কমই দেখেছি। একটি জায়গা আছে ললিতের শ্বশুর শাশুড়ী এসেছেন তার বাড়ীতে—আগে তাঁদের মেয়ে লিলির সঙ্গে ললিতের অত ভাব ছিল না পরে ভাব হয়েছে। শ্বশুর শাশুড়ী সেটি লক্ষ্য করে ভারী খুশী হয়েছেন, জিজ্ঞাসা করছেন, তারপর বাবা ললিত, তোমাদের এত মিল কি করে হলো বলতো শুনি?

ললিত তার [illegible] অতি চমৎকার ভাবে। [illegible] ধীরে জেগে উঠলো তাদের মনে [illegible] বলে যান দুর্গাদাস আর [illegible] বিমুগ্ধভাবে

শোনে। তিনি যখন এই জায়গাটা একদিন বলতে যাবেন সেই সময় পাশে নাট্যনিকেতনে একটি ঐতিহাসিক নাটক হচ্ছিল। তারা কামান দাগার আওয়াজ সুরু করে। আওয়াজটা রঙমহলেও এসে পৌঁচচ্ছিল। দুর্গাদাস যতবারই কবিত্ব করে এটা বলতে যান ততবারই পেছন থেকে আওয়াজ আসে···কিন্তু বন্ধ করার উপায় তো নেই, বাধ্য হয়ে তিনি নানারকম আঙ্গিক কৌশল দেখিয়ে একটু দেরী করতে লাগলেন। প্রেক্ষাগৃহ ভর্ত্তি। ঠিক এমনি সময় আমি সামনে একটি হাল্কা চেয়ার নিয়ে গিয়ে বসেছি। আর দুর্গাদাস আমাকে ষ্টেজের ওপর থেকে দেখেই বলে উঠলেন, বীরেন, কামান দেগে এ-অভিনয়ের পশ্চাদ্ভাগটি উড়িয়ে দিলে। বলেই দ্রুত নিজের কক্তব্য বলতে সুরু করলেন।

দর্শকরা কেউ বুঝতেই পারলে না যে কি অবান্তর কথা তিনি বলে গেলেন, কারণ তারপরেই এমন অভিনয় করে গেলেন যে সবাই মুগ্ধ—আমি কিন্তু সেখান থেকে একেবারে বাইরে, আর তাঁর সহ-অভিনেতৃদের অবস্থা শোচনীয়। তাঁরা হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝতে পারেন না। অতি কষ্টে দম বন্ধ করে তাঁদের সেখানে থাকতে হল।

মিনার্ভা থিয়েটারে শচীনদা'র একটি অপেরা অভিনয় হচ্ছে। খুব একটি করুণ জায়গায় ঘাতক এসে একটি বিষয় বর্ণনা করবেন। যিনি ঘাতক সেজেছেন তাঁর রূপসজ্জা হয়েছে চমৎকার। সকলে স্তব্ধ হয়ে জায়গাটা শুনছে, হঠাৎ সেই সময় ঘাতকের গোঁফের আঠা খুলে গেল এবং বর্ণনার মধ্যে যতটুকু করুণরস জমেছিল ধীরে ধীরে গোঁফটি খুলে যেতে দর্শকদের মধ্যে যে কী বিপুল হাস্যরোল উঠলো তা বলা যায় না। বেচারী সেদিন অন্য দৃশ্যে ভালভাবে বেরোলেও লোকে হাসে···অভিনয় একেবারে মাটি!

অবশ্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীরও অভিনয় করতে করতে কয়েকবার এইরকম মাথার চুল বা গোঁফ খুলে গিয়েছে কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ আপন ব্যক্তিত্ববলে ও অভিনয়-কৌশলে সামলে নিয়েছেন।

মিনার্ভা থিয়েটারে 'সীতারাম' নাটকের অভিনয় তখন খুব জোর চলছে। সীতারাম সেজেছেন কমল মিত্র, কাজী সেজেছেন কুঞ্জ সেন। কাজীর বিচার দৃশ্যে সীতারাম পালিয়ে যেতেই তাঁর দুর্গ আক্রান্ত হ'ল। বাইরে ভীষণ গোলমাল, কামানের আওয়াজ হচ্ছে, অবস্থা ক্রমশঃ যে গুরুতর সেই খবর দিয়ে যাচ্ছে এক একটি সৈনিক। সৈনিকরা খুব জোর বর্ণনা না দিলে দৃশ্যটি জমাটি হয় না। কিন্তু সেই দৃশ্যে একদিন একটি এ্যাপ্রেন্টিস্ নেমেছে এক সৈন্যের ভূমিকায়। কাজীর কাছে এসে সে বলবে, হুজুর সর্ব্বনাশ হয়েছে, হাজার হাজার লাঠিয়াল এসে আমাদের আক্রমণ করেছে, আপনি শীঘ্র এ-স্থান পরিত্যাগ করুন।

কাজী ছটফট করছেন। ষ্টেজে এক একটি সৈন্য এসে খবরের পর খবর দিয়ে আরও উত্তেজনা বাড়াবে কিন্তু নবাগত সৈন্যটি ঢুকেই, 'হুজুর, ইয়ে হয়েছে' ব'লে ঢোক

দক্ষিণ ভারতের চিত্তহারিণী চিত্রনটী বৈজয়ন্তীমালা

গিলতে লাগলো আর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে সুরু করলে।

কুঞ্জবাবু দেখলেন, সর্ব্বনাশ, এ যে সীনের দফা-রফা করে দেবে···আর কথা বলতে পারছেনা যে। তিনি চীৎকার করে বলতে সুরু করলেন, বল্‌না কি বলবি? কিসের ভয়?

আর ভয়? সে হুজুর বলেই ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে সুরু করলে। কুঞ্জবাবু তাড়াতাড়ি এসে সামলাবার জন্যে বলতে সুরু করলেন, বুঝছি সীতারামের কাটিয়াল সব আক্রমণ করেছে, আর তোরা বাঁদরের মত চারধারে পালাচ্ছিস, আমিও তাকে দেখে নেব আর তোদের মতন গর্দ্দভদের আজই এখান থেকে যদি বিদেয় না করতে পারি তাহলে কাজীগিরী আর করবো না। বলে গলাধাক্কা দিয়ে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে নিয়ে গেলেন। এপ্রেন্টিস্ সেইদিনই পালালো, কুঞ্জবাবুরও কথা রক্ষে হল।

ছবি বিশ্বাসের আরসোলা-ভীতি ভয়ানক। মৃত হয়ে ষ্টেজে পড়ে থাকার অভিনয় করতে করতেও যদি আরসোলা বেরোয়- তাহলেই তিনি উঠে দৌড় দেন। একবার 'দেবদাসে' ঐরকম ঘটনা ঘটেছিল। তবে সৌভাগ্য[illegible]দের মৃত্যুর শক্ত যবনিকা পড়ে [illegible]র নজর পড়েছিল তা নাহলে অভিন[illegible] সময়ই অঘটন ঘটে যেতে পার[illegible]। বোধ হয় এক[illegible]নটের জন্তে কেলেঙ্কারীটা বেঁচে [illegible]

ভারতীয় নাটমঞ্চ

★

দিলীপকুমার মিত্র

ভারতীয় নাটমঞ্চের ইতিহাস সুপ্রাচীন। কালিদাস ভবভূতির যুগ ছেড়ে দিলেও এদেশে বহুকাল থেকেই নাট্যাভিনয় চ'লে আসছে। বাংলাদেশের 'যাত্রা', মহারাষ্ট্রের 'তামাসা' এবং দক্ষিণভারতের 'বুড়া কথা' ইত্যাদির মধ্যে সেই নাট্যাভিনয়ের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে রঙ্গমঞ্চ তৈরি ক'রে নাট্যাভিনয়ের যে প্রথম অয়োজন সুরু হলো, তা এই বাংলাদেশেই। মাইকেল মধুসূদন-ই হলেন সার্থকনামা প্রথম নাট্যকার। অবশ্য, তাঁর আগেও আরও কয়েকখানা ভালো নাটকের অস্তিত্ব ছিলো। কিন্তু সেকালের নাটকে পৌরাণিক-যুগের প্রভাব বড় বেশী। মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্র সামাজিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র ক'রেও নাটক লিখলেন। এ-দিক থেকে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ইতিহাস রচনা ক'রে গিয়েছে।

ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই সামান্যভাবে নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টা যেমন আগেও ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু এদিক থেকে বাংলা ও মহারাষ্ট্র আদর্শ স্থাপন করেছে। বাংলা ও মহারাষ্ট্রে প্রতিভাশালী বহু অভিনেতার জন্ম হয়েছে। এই দু'ই জায়গাতেই দেখা দিয়েছে নতুন নতুন নাটক। সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে শক্তিশালী নাট্যকারগণ আমাদের উপভোগ্য বহু নাটক উপহার দিয়েছেন। ভারতীয় নাটমঞ্চ ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে প্রগতি ও উন্নতির পথে। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা, উদয়শঙ্করের [illegible] বা নাট্যমঞ্চ-কলাকুশলতা এবং কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ-মূলক নাট্যরচনার প্রচেষ্টা—অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ক্রমবিবর্তনে।

ইবসেনীয়-প্রভাব এতকাল ধ'রে ভারতীয়-নাটকে যে-ভাবে বিস্তৃত ছিল—বিংশ শতাব্দীর নাটকগুলি যেন ক্রমশঃ তা থেকে মুক্তি লাভ করেছে। ইণ্ডিয়ান পিপল্‌স্ থিয়েটারের "নবান্ন" ভারতীয় নাটকের ইতিহাসে বিশেষ একটা পরিবর্তন এনে দিল। এই বস্তুমূলক বাংলা নাটকখানিতে দুঃখ দুর্দশা ও মনুষ্যত্বের যে পরিচয় আমরা পাই, এমন-কি বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষকালীন কৃষক সমাজের যে বলিষ্ঠতার বিকাশ দেখা গেছে নিঃসন্দেহে তা' নাটকীয় বস্তুচেতনার নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। কলকাতা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এই নাটকখানি যে-ভাবে আলোড়ন তুলেছিল—তা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সাদা-মাটা হলেও তাতে যদি মনে দাগ কাটবার মতো বিষয়বস্তু ও নাটকীয় রস থাকে তাহ'লে দর্শকসাধারণ তা সানন্দেই গ্রহণ করে।

'নবান্নের' এই সাফল্যের পর আই-পি-টি-এ আধুনিক যুগের সমস্যা নিয়ে আরও কয়েকখানি বাস্তবধর্মী ও লোকগাথামূলক নাটক উপহার দিয়েছেন। এ-বিষয়ে 'বহুরূপী'-নাট্যসম্প্রদায়ের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। এঁদের 'ছেঁড়াতার' এখনও সাফল্যের সঙ্গে বাংলাদেশের বহু জায়গায় অভিনীত হয়ে থাকে। আই-পি-টি-এ'র আদর্শে ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় সৌখিন নাট্যসম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেছে। তাদের সকলের মধ্যেই এমন একটা ভাব দেখা দিয়েছে, কি ক'রে নতুন আঙ্গিকে ও নতুন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে নাট্যাভিনয় করা যায়। এদের মধ্যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল থিয়েটারের কলাকুশলীদের উদ্যম প্রশংসার্হ।

স্থায়ী পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব কেবল বাংলাদেশেই—তাও একমাত্র ক'লকাতায়। এখানকার, শ্রীরঙ্গম, ষ্টার মিনার্ভা, আর রঙমহল এই চারটি থিয়েটারেই নিয়মিত-ভাবে যা নাটক অভিনীত হয়ে থাকে। নটগুরু শিশির-কুমার ভাদুড়ী এখনও রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়ে সেকালের বহু সাফল্যমণ্ডিত 'আলমগীর', 'রঘুবীর', 'সাজাহান', 'ষোড়শী' প্রভৃতি নাটক উপহার দেন। আগেকার মতো এসব নাটক তিনি আর জমাতে না পারলেও পুরোনো দিনের দু'একটা অভিনয়-স্ফুলিঙ্গ তাঁর অভিনয়ে ধরা পড়ে।

তাঁর হাতে প'ড়ে শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' ও 'বিন্দুর ছেলে' শ্রীরঙ্গম্ নাট্যমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়েছে। তাঁর পরিচালনায় ও শিক্ষায় বহু অখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীও যে প্রথমশ্রেণীর অভিনয়গোষ্ঠীতে ছাড়পত্র পেয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। শিশিরকুমার সত্যিই'নটগুরু'।

বাংলাদেশের পেশাদারী নাট্যমঞ্চে একটা কোনো বিশিষ্ট ধারা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। একই সময়ে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন ধারায় নাটক অভিনীত হয়। ফলে, 'যুগাবতার,' 'কিন্নরী,' 'সিরাজদ্দৌলা,' 'বিন্দুর ছেলে,' 'ঝিন্দের বন্দী,' 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'—সব নাটকই সমানভাবে দর্শক আকর্ষণ করে! এসব খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, বাংলাদেশের দর্শক নাট্যরসপিপাসু, অন্যদিকে বাংলাদেশে ভালো অভিনেতারও অভাব নেই। এদুটো জিনিসের অভাব হলেই বাংলাদেশের সবগুলি রঙ্গমঞ্চেই যে তালা পড়বে, তাতে আর সন্দেহ কি!

বর্ত্তমানে সিনেমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে থিয়েটারকে চলতে হচ্ছে। অথচ, সিনেমা যেমন ধাপে ধাপে এগিয়ে চলছে, এদেশের নাটক তেমনি ধাপে ধাপে নেমে আসছে। এর কারণ কি? মোটামুটিভাবে বলা যায়—নতুন নাটকের অভাব; নাটক রচিত হলেও বিষয়বৈচিত্র্যের অভাব; রঙ্গমঞ্চ-মালিকদের ঔদাসীন্য এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার দৈন্য। এ-বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, রঙ্গমঞ্চের মালিকগণ ও দেশীয়-সরকার যদি সহানুভূতির পরিচয় দেন—তবেই পেশাদারী নাট্যমঞ্চ টিকে থাকতে পারে।

ক'লকাতার পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ছাড়াও, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় আরও কয়েকটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ আছে। সেখানে নিয়মিতভাবে নাটক অভিনীত না হ'লেও, সৌখিন নাট্য-সম্প্রদায় মাঝে মাঝে অভিনয় করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে টিকিট বিক্রী ক'রেও এই সব নাটকের অভিনয় হয়। স্থানবিশেষে অনেকের মধ্যে বিস্ময়কর অভিনয়-প্রতিভার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তবে ক'লকাতাই হ'লো বাংলা-নাটকের পীঠস্থান। অভিনয়শিক্ষার ভালো-ব্যবস্থা ক'লকাতাতেই হয়। তথাপি, ব'লতে বাধা নেই, উপযুক্ত "নাট্যাভিনয় শিক্ষানিকেতন" এখনও এদেশে গ'ড়ে ওঠেনি। কিন্তু, গ'ড়ে ওঠবার উপযুক্ত স্থান-ই হ'লো কলকাতা। নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার, নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নটঋষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নটশেখর নরেশ মিত্র, নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, মন্মথ রায় ও বিজন ভট্টাচার্য্য তরুণ অভিনেতা শম্ভু মিত্র, বেতার-নাট্য পরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রভৃতির কাছ থেকে ভবিষ্যতের অভিনেতারা অনেক কিছুই শিখতে পারেন।

মহারাষ্ট্রেও ঐ একই অবস্থা। সেখানেও সিনেমার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে থিয়েটার যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। মহারাষ্ট্রের প্রবীণ অভিনেতা বোডা ও বালগন্ধর্ব অবসর গ্রহণ করেছেন। অপেক্ষাকৃত নবীনদের মধ্যে নাট্য-নিকেতনের নাট্যকার-প্রযোজক এম্, জি, রঙ্গনেকার মহারাষ্ট্রভাষী এলাকায় তাঁর নাট্য সম্প্রদায় নিয়ে অভিনয় ক'রে বেড়াচ্ছেন। রঙ্গনেকারের অধিকাংশ নাটকই হ'লো ইবসেনধর্ম্মী সামাজিক-নাটক। বোম্বাই ও পুনা শহরে সাম্প্রতিককালে যে নাট্যমহোৎসব হয় তাতে মহারাষ্ট্রীয়-নাটকের জনপ্রিয়তা বিশেষ ক'রে বোঝা যায়। সহস্র সহস্র দর্শক কয়েকদিন ধ'রেই মহারাষ্ট্রীয়-নাটকের অভিনয় দেখেছেন। অথচ, এর বেশিরভাগ নাটকই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। 'ওথেলো'-নাটকখানিকে

মারাঠীভাষায় অনূদিত ক'রে যেবার একটি মারাঠী লাইব্রেরীর স্বর্ণজয়ন্তীতে অভিনয় করা হয়, সেবারও অসংখ্য দর্শক সমাগম হয়। এ-থেকেই মহারাষ্ট্রীয়গণের নাট্যরসপিপাসার কিছু পরিচয় মেলে বৈ কি! নাটক তা পৌরাণিক-ই হোক, ঐতিহাসিক-ই হোক, সামাজিক-ই হোক বা অনূদিত-ই হোক, যদি নাট্যরসসমৃদ্ধ ও সুঅভিনীত হয়, তাহ'লে দর্শকের অভাব কোন সময়ই হয় না। মারাঠী-ভাষায় বর্ত্তমানকালে যে নাটকখানি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে, তা হ'লো এম্, কে, সিন্ধের "আন্দোলন"। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে'র পটভূমিকায় রচিত এই নাটকখানি আই-পি-টি-এ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়েছে বোম্বাই, পুনা ও অন্য কয়েকটি মারাঠী এলাকায়। অনন্ত কানেকারের "ফাঁস" নাটকটির কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি অষ্ট্রীয়ান নাটকের ছায়া-অবলম্বনে কেবলমাত্র দু'টি-চরিত্র-সমন্বিত এই নাটকখানি বিষয়বৈচিত্র্যে ও নাটকীয়-তায় বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়।

গুজরাটী-সাহিত্যে শ্রীকে, এম্, মুন্সীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকায় তিনি কয়েকখানি ভালো নাটক রচনা করেছেন। সি, সি, মেহতার "আগগারী"-ও উল্লেখযোগ্য আধুনিক নাটক। কিন্তু, পেশাদারী বা স্থায়ী কোনো নাট্যসম্প্রদায়ের অভাবেই এইসব নাটকের বিশেষ প্রচার হচ্ছে না। গুজরাটী নাটকের অভিনয় সীমাবদ্ধ।

আধুনিককালে সামাজিক বিষয়বস্তু অবলম্বন ক'রে কিছু কিছু তামিল নাটকও রচিত হয়েছে। এ-বিষয়ে মাদ্রাজের 'সুগুণাবিলাস সভা"-র প্রচেষ্টা অনেকখানি। শ্রী সি, সম্বন্দ মুদালিয়র এই সভার সদস্য। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ। তাঁর রচিত কয়েকখানি সামাজিক তামিল-নাটক সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চে আধুনিক-ধারার প্রবর্ত্তনেও তাঁর প্রচেষ্টা নেহাৎ কম নয়। কিন্তু, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ এখানেও ভালোভাবে গ'ড়ে উঠতে পারেনি। "সুগুণাবিলাস সভা"র সদস্যরূপে যাঁরা নাটক অভিনয় ক'রেন—তাঁদের বেশীরভাগই হলেন ডাক্তার, উকীল, জজ বা ব্যবসায়ীশ্রেণীর লোক। ফলে, অভিনয়কে কেউই তাঁরা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু এঁদের উৎসাহ বড় কম নয়। ভ্রাম্যমাণ-দল গঠন ক'রে এঁরা মফঃস্বলে গিয়েও নাটক অভিনয় ক'রে আসেন। বারকয়েক এঁরা সিংহলে গিয়েও অভিনয় করে এসেছেন। সৌখিন নাট্যসম্প্রদায় হিসেবে মাদ্রাজের "সেক্রেটারিয়েট ড্রামাটিক ক্লাব"-এর নামও উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া, সাম্প্রতিককালে মাদুরাতেও একটি সৌখিন নাট্যসম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেছে। এটা গড়েছেন সেখানকার "বার এ্যাসোসিয়েশন"। 'কুম্ভোকনমে বালমনি কোম্পানী' নামে মেয়েদের একটি নাটুকেদল আছে। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, এর সব কাজই করেন মেয়েরা। নাটকও কেবল মেয়েরাই অভিনয় করেন। এছাড়া আছে,—"আলানথুর কোম্পানী", "টি নারায়ণস্বামী পিল্লাই কোম্পানী" আর, "চুন্নিযা ড্রামাটিক ট্রুপ"। এরা কতকটা পেশাদারী নাট্যসম্প্রদায়। এর মধ্যে শেষোক্ত দলটির নাম-ই বেশী। এদের 'দাস বাথার" নাটকটি মাদ্রাজের বিভিন্ন জায়গায় বহুবার অভিনীত হয়েছে। জনপ্রিয়তার দিক থেকেও এই নাটকটির নাম আছে। তামিল-রঙ্গমঞ্চের সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে অভিনেতা এস্, জি, কিট্টাপ্পার অকালমৃত্যুতে। তিনি একাধারে ছিলেন—অভিনেতা, সঙ্গীতকার ও নৃত্য-শিল্পী। কিট্টাপ্পা ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। তাঁর গ্রেমোফোন-রেকর্ডের গানগুলি এখনও দক্ষিণভারতে বিশেষ সমাদৃত।

তামিল-রঙ্গমঞ্চের বর্ত্তমান অবস্থা খুব আশাপ্রদ না হ'লেও, আগের চেয়ে যে অনেক এগিয়ে গেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিছুদিন আগেও এখানে নাটকের মহিলা-ভূমিকাগুলি পুরুষদের দ্বারাই অভিনীত হতো। আজকাল, অভিজাত-ঘরের মেয়েরাই এগিয়ে আসছেন মেয়েদের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করতে। সেকেলে-সাজপোশাক ও দৃশ্যপটও এখন আর নেই। অনাবশ্যক গানও কমেছে। আধুনিককালের নামকরা তামিল-নাটক হিসেবে অনেক-কেই "রক্তপাশম্"-এর উল্লেখ করতে দেখা যায়।

বাংলাদেশের অনেক অভিনেতা, যেমন, অহীন্দ্র

নিগার সুলতানা

বীণা রায়

চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র প্রভৃতি (স্বর্গতা প্রভা দেবীও), একই সঙ্গে থিয়েটারে ও সিনেমায় অভিনয় করেন, মহারাষ্ট্রের চিত্রশিল্পী স্নেহপ্রভা, লীলা চিৎনীশ, বনমালা, বাবুরাও পেন্ধরকার সাম্প্রতিককালে থিয়েটারেও নামতে স্থরু করেছেন। ক'লকাতাতেও আজকাল অনেক চিত্রশিল্পী যেমন, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, গুরুদাস বন্দ্যো, সিপ্রা দেবী, মলিনা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নাটমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে অবতীর্ণ হচ্ছেন। এ-থেকে থিয়েটারের দিকে অভিনেতাদের স্বাভাবিক প্রবণতার কথাই প্রমাণিত হয়। যাঁরা সত্যকারের অভিনয়শিল্পী তাঁরা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রে যে-আনন্দ পান, ষ্টুডিয়োর আর্ক-ল্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী ও কথার মধ্যে অভিনয় করতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠেন। দর্শকেরাও অভিনেতাদের চোখের সামনে দেখতে পেয়ে আরও খুশি হয়। নাটক সত্যিই জমে ওঠে থিয়েটারে—সিনেমার নাটকীয়-আনন্দ থেকে তা পৃথক।

ভারতীয় নাটমঞ্চের ইতিহাসে বিখ্যাত পাঞ্জাবী অভিনেতা পৃথ্বিরাজ কাপুরের নামও উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। যে পৃথ্বিরাজ একদিন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হিসেবেই সমাদৃত হতেন, সিনেমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় চুকে গেছে। তিনি নিজে "পৃথ্বী-থিয়েটার" নাম দিয়ে যে নাট্যসম্প্রদায় গ'ড়ে তুলেছেন—ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁরা অভিনয় ক'রে বেড়াচ্ছেন। এই সম্প্রদায়ের নাটকগুলি হিন্দীভাষায় রচিত হওয়ায়—এইসব নাটক দেখার জন্যে সবসময়ই সর্বভারতীয় ভিড় দেখা গেছে। 'পৃথ্বী-থিয়েটারে'র "আহুতি", "পাঠান", "দীওআর" আর "গদ্দার" বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পৃথ্বীরাজের নাট্য-পরিচালনা, অভিনয়-শিক্ষাদান ও অভিনয়—সবকিছুতেই যেমন বৈচিত্র্য, তেমনি বাস্তবতা ও আন্তরিকতা। পৃথ্বী-থিয়েটারের সর্ব্বশেষ নাটক "কলাকার"।

কাজেই, দেখা যায়, ক'লকাতার পেশাদারী কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ, মহারাষ্ট্রের 'নাট্যনিকেতন' আর পৃথ্বীরাজের 'পৃথ্বী-থিয়েটার' ছাড়া নিয়মিত অভিনয় ব্যবস্থার বিশেষ কোনো পরিচয় ভারতের আর কোথাও নেই। উড়িষ্যায় একটি প্রাচীন নাট্যসম্প্রদায় আছে। কটকের পেশাদারী 'অন্নপূর্ণা থিয়েটারে এই নাট্যসম্প্রদায় নিয়মিত অভিনয়ও ক'রে থাকেন। কিন্তু, ষ্ট্যাণ্ডার্ডের দিক থেকে এঁরা এখনও বহু পেছনে প'ড়ে আছেন।

পশ্চিম বাংলার রাজধানী ক'লকাতা শহরে যদি সরকারী ও বেসরকারী নাট্যরসিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি স্থায়ী-রঙ্গমঞ্চ গ'ড়ে উঠতে পারে, তাহ'লে ভরসা হয়, সেখানে একাধারে শিশির-অহীন্দ্র সম্প্রদায়, আই-পি-টি-এ ও বহুরূপী-গোষ্ঠী, সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের নাট্যাভিনেতাগণ, এমনকি শান্তিনিকেতন-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন-ধারার নাট্যাভিনয়ের রস গ্রহণ করার নিয়মিত সুযোগ আমরা একদিন পাব।

হিন্দী-ছায়াছবির নতুন মুখ

[ছায়াছবিতে আজ যাঁরা তারকা-রূপে জ্বলজ্বল্ করছেন কালপ্রবাহে একদিন তাঁদের দীপ্তি ম্লান হয়ে আসবে। তাঁদের জায়গায় দেখা দেবে নতুন দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল নতুন নতুন তারকা। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো প্রথম আবির্তাবেই আসর মাত করবেন—কেউ কেউ হয়তো অনেক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেন। ভবিষ্যৎ-তারকারূপে আবির্ভূত হবার বাসনা নিয়ে আজ যে-সব নতুন নতুন শিল্পী হিন্দী-চিত্রজগতে দেখা দিয়েছেন, এখানে আমরা তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করছি।]

চিত্রা : নিগার সুলতানার ভাইঝি এই মেয়েটি ১৯৫০ সালে 'মমতা'-চিত্রে একটি প্রধান-চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। চিত্রার বাড়ী হায়দ্রাবাদে। ইতিমধ্যেই চিত্রা তাঁর অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বর্ত্তমানে ইনি ফিল্মকারের 'গান' ও লীলা চিৎনীশ প্রডাক্সন্সের 'আজ-কি-বাত' ছবিতে অভিনয় করছেন। বাড়ীতেই ইনি অনেক বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। উর্দ্দুতে এঁর বেশ দখল আছে। এঁর আসল নাম—আসর্ জাহান।

মাধুরী : ইনি নতুন যুগের নতুন মাধুরী। এঁর বড় বোন মীনাকুমারী ইতিমধ্যেই চিত্রজগতে নায়িকা-পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। মীনার মতই মাধুরী সর্ব্বপ্রথম শিশু-চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর প্রথম অভিনীত-চরিত্র ছিল হিন্দ্-পিকচার্সের 'সন্দেশ'-ছবিতে। এর পর 'বিশ্বাস' প্রভৃতি আরো গুটিকয়েক ছবিতে তাঁকে দেখা যায়। মাধুরীর বর্ত্তমান বয়েস মাত্র আঠারো। সম্প্রতি ইনি বোম্বাইয়ের নৃত্য-পরিচালক মমতাজ আলীর পুত্রের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

বিজয়বালা : জয়পুরের এই নতুন শিল্পী ইতিমধ্যেই 'গাওয়াইয়া', 'ঠোকর', 'ধরমপত্নী' প্রভৃতি ছবিতে উল্লেখ-যোগ্য অভিনয় করেছেন। বর্ত্তমানে ইনি 'হমসায়া' ছবিতে অভিনয় করছেন। এঁর আসল নাম মমতাজ। এঁর বড় বোন মুবারক বেগম একজন বিখ্যাত প্লে-ব্যাক-গায়িকা। বোনের মত বিজয়বালাও সুকণ্ঠের অধিকারিনী। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ও গজলেই এঁর আগ্রহ বেশী। নাচে ও ছবি আঁকাতেও এঁর কিছুটা দখল আছে।

পীস্ কানওয়াল : 'কারদার-কলিনস' প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ ক'রে পীস্ কানওয়াল চিত্রজগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পান। 'দীল-এ-নাদান' ছবিতে প্রধান-ভূমিকায় অভিনয় ক'রে শ্রীমতী পীস্ ইতিমধ্যেই সুনাম অর্জ্জন করেছেন। লাহোরে এঁর জন্ম। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করবার পর এঁর ইচ্ছা ছিল বাবার মত ডাক্তারী-লাইনে যাবেন। কিন্তু ভাগ্যদেবতা এনে ফেল্লেন চিত্রজগতে। মণিপুরী, ভরতনাট্যম্ ও কথক নাচে শ্রীমতী পীসের বেশ দখল আছে। ইনি সেতার বাজাতেও অভ্যস্ত।

রূপমালা : ইনিও আর এক মমতাজ। রূপমালা এঁর ছায়াছবির নাম। চার বছর বয়সেই ইনি নাচে কৃতিত্ব দেখিয়ে সবাইকে অবাক ক'রে দেন। হায়দ্রাবাদে এঁর জন্ম। বছর তিনেক আগে ইনি চিত্রজগতে প্রবেশ করেছেন। 'চম্‌কি', 'অউরৎ' 'বহুরাণী' ছবির পার্শ্ব-চরিত্রে এঁর অভিনয় হয়েছে প্রশংসনীয়। বর্ত্তমানে ইনি 'নাগ্‌মা' ও 'দঙ্গীরা' ছবিতে দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন।

রমা শর্ম্মা : 'নৌবাহার' ছবিতে এঁর প্রথম আত্ম-প্রকাশ। ভূমিকাটি ছোট্ট হলেও রমা শর্ম্মা ঐ ছবিতে দর্শকের মনে রেখাপাত করতে পেরেছেন তাঁর সৌন্দর্য্যে। ইনি দিল্লীর বাসিন্দা। অভিজাত-পরিবারের এই শিল্পী একদিকে যেমন সুশিক্ষিতা অন্যদিকে তেমনি নৃত্যপটীয়সী।

সুধা বালী : ইনি অভিনেত্রী গীতা বালীর বৌদি। এঁর স্বামীর নাম দিগ্‌বিজয়। বাইশ বছরের এই তন্বী-শিল্পী গত বছর তাঁর স্বামীর ছবি 'রাগ রঙ্গে' প্রথম অভিনয় করেন। আশা করা যায় ভবিষ্যতের অনেক ছবিতেই এঁকে দেখা যাবে।

নয়না : 'লাজবন্তী' ছবির নায়িকা নয়না বোম্বাই-চিত্রজগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার বিনোদকুমার এই চতুর্দ্দশী-অভিনেত্রীর পিতা। 'কথকনৃত্যে'

নয়না পারদর্শিনী। ইনি 'তন্‌খা'-চিত্রে নায়ক অজিতের বিপরীত-ভূমিকাতেও সু-অভিনয় করেছেন।

মধু মিন: চিত্রজগতের মক্ষীরাণী মধুবালার বড় বোন দু'বছর আগে ছায়াছবির অন্দরমহলে প্রবেশ করেছেন। এঁর পারিবারিক নাম—আল্‌তাফ। 'খাজানা'-ছবিতে রাণীর ভূমিকাতেই এঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। 'রেল-কা-ডিব্বা' ছবিতেও ইনি এক পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন।

বিন্দু ব্রার: অভিনয়-প্রতিভার সম্ভাবনা নিয়ে যে সব নতুন শিল্পী চিত্রজগতে প্রবেশ করেছেন মেজর ডি. এস্. ব্রারের সহধর্ম্মিনী বিংশ-বর্ষীয়া বিন্দু ব্রার তাঁদের অন্যতমা। বিন্দুর জন্ম পেশোয়ারে—এক চিকিৎসক-পরিবারে। বি এস্ সি পাশ ক'রে বিন্দু কিছুদিন আইনও পড়েছিলেন। 'আঁসু' চিত্রে এঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। এ-বিষয়ে তাঁর বন্ধু কামিনী কৌশল বিশেষ সাহায্য করেন।

অচলা সচ্‌দেব: কাশ্মীরে যখন হানাদারদের আক্রমণ চলছিল তখন আমাদের সৈন্যবাহিনীর মনোরঞ্জনের জন্যে সরকার থেকে যে-সব সঙ্গীত ও অভিনয়-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, অচলা সচ্‌দেব তাতে যোগ দিয়েছিলেন নির্ভয়চিত্তে। এ-বিষয়ে মহিলাদের মধ্যে তিনিই অগ্রণী। ১৯২৬ সালে লায়ালপুরে এঁর জন্ম। লাহোরে ইনি নামকরা বেতার-অভিনেত্রী ও লেখিকারূপে প'রিচিতা। দেশবিভাগের পর ইনি দিল্লীতে এসে নাট্য-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। আই-পি-টি-এ'র অনেক নাটকেই ইনি অভিনয় করেছেন। থিয়েটারে অভিনয় করাতেই এঁর সমধিক আগ্রহ। ছায়াছবিতে অংশগ্রহণ করলেও এঁকে মাঝে মাঝে বোম্বাই-এর নাট্যানুষ্ঠানে অভিনয় করতে দেখা যায়। রাজেন্দ্র জৌহ'র 'কাশ্মীর' ছবিতেই এঁর প্রথম অভিনয়। 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' ছবিতে ইনি একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

শাম্মী: 'সাওন আয়া রে' ছবির উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে কিশোর শাহ এই বিংশ-বর্ষীয়া তরুণীকে আবিষ্কার করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষায় 'ছবির ভাল মুখ নয়' ব'লে শ্রীশাহ এঁকে বাতিল ক'রে দেন। কিন্তু, ভাগ্যচক্রে ছবিতে নামা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না—'ওস্তাদ পেড্রো' ছবিতে শাম্মী একটি প্রধান পার্শ্ব-চরিত্রেই অবতীর্ণা হলেন।

পুনম্: স্বর্ণকুমারী দেওয়ান কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেননি যে তিনি চিত্রাভিনেত্রী হবেন। কিন্তু, শেষ-পর্য্যন্ত 'পুনম্' এই ছদ্মনামে তাঁকে ছায়াছবিতে নামতে হয়েছে। তাঁর এই চিত্রাবতরণের ব্যাপারে প্রযোজিকা-পরিচালিকা প্রতিমা দাসগুপ্তার আগ্রহ ছিল বেশি। প্রযোজক-পরিচালক জাগীরদার পুনম্‌কে প্রথম সুযোগ দেন 'ভৈরবী' চিত্রে। তারপরেই এঁকে দেখা যায় 'ফারার' ছ'বিতে। পুনমের জন্ম ডেরাইস্মাইলখানে। তিনি শ্রীনগরেও বেশ কিছুকাল কাটিয়েছেন।

শাকিলা: 'ভগৎ সিং' ছবিতে শাকিলা নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এই ছবির নায়ক শাম্মী কাপুর। শাকিলা'র মধ্যে চিত্রতারকা হবার অনেক গুণই আছে! 'দস্তান' ছবিতে সর্ব্বপ্রথম অভিনয় করবার পর ইনি ক্রমে 'ঝান্সী-কী-রাণী', 'আগোশ', ও 'মদমস্ত' ছবিতেও অভিনয় করেন। চিত্রজগতের এই পার্শী অভিনেত্রী তন্বী ও গৌরাঙ্গী।

কাটে শেঠী: কৃষ্ণকুন্তলা, পিঙ্গলাক্ষী এই অভিনেত্রীর জন্ম ওয়েলশ-এ। ইংলণ্ডের অভিনেত্রী-জীবন ত্যাগ ক'রে ইনি এক ভারতীয়কে বিবাহ ক'রে এদেশ চ'লে আসেন। 'আনন্দ ভুবন' ছবিতে এদেশে ইনি প্রথম অভিনয় করলেন। 'রাহী' ছবিতে এর দ্বিতীয় অভিনয়। ইনি 'হিন্দুস্থানী' ভাষা বেশ ভালই পড়তে, লিখতে ও বলতে পারেন।

মোহনা: নবাগতা না হলেও মোহনা এখনও ঠিক 'তারকা' পর্য্যায়ে উন্নীত হননি। হালকা ভূমিকাতে অভিনয় করতেই ইনি অভ্যস্ত। এঁর পারিবারিক নাম মিসেস মারিয়া ত্রক্রেট্স্। ... দিক থেকে ইনি গোয়ানীজ্। চিত্রজগতে প্রবেশের [illegible] মোহনা [illegible] টেলিফোন-বিভাগে কাজ করেছিলেন। [illegible]

ইনি প্রশংসনীয় অভিনয় করেন। বর্ত্তমানে ইনি 'শারদ' ছবিতে কাজ করছেন।

রূপ বর্মা: লাহোরে ছাত্রী অবস্থায় কলেজের নাট্যানুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই তরুণী শিল্পীর একদিন মনে হয়েছিল—তিনি চিত্রজগতে প্রবেশ করতে পারলে যশের অধিকারিণী হবেন। ১৯৫০ সালে তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হয়। পারিবারিক-বন্ধু চেতন আনন্দ তাঁকে 'বাজী' ছবিতে অভিনয় করবার সুযোগ ক'রে দেন। সেই তাঁর চিত্র-জগতে প্রথম অভিনয়। এর পরেই 'তিতলী' ছবিতে নায়িকার অংশে অভিনয় করবার সুযোগও এলো। নৃত্য-গীত-পটীয়সী এই শিল্পী এখন 'মালিকা সালোমী' ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন। নাইরবি শহরে এঁর জন্ম। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইনি ভারতবর্ষে আসেন এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ পাশ করেন। ইনি দুই সন্তানের জননী। এঁর গাহর্স্থ্য-নাম—'সুদর্শন'।

শীলা রমানী: 'মিস্ মুসৌরী, ১৯৪৮' ও 'মিস্ সিমলা ১৯৫০' গৌরব যে তরুণীকে তাঁর সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত করেছিল, তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন বোম্বাই চিত্র-জগতের ভবিষ্যৎ-নায়িকা শীলা রমানী। 'বদনাম' ছবিতে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ—তাই ব'লে, অভিনয়ে তাঁর কোনো বদনাম হয়নি। 'আনন্দমঠ' ছবিতে তাঁকে দেখা যায় এক নর্ত্তকীর ভূমিকায়। শান্তারামের 'তিন বাত্তী চার রাস্তা' ছবিতে শীলা রমানী অন্যতমা পুত্রবধূর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বাইশ বছরের এই সিন্ধু সুন্দরী ১৯৩১ সালের ২রা এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। খেলাধুলায় এঁর খুব ঝোঁক—এমনকি ফুটবল খেলাতেও।

বনজা: দক্ষিণ ভারতের এই নৃত্যপটীয়সী তরুণী ইতিমধ্যেই চিত্রজগতে সুনাম অর্জ্জন করেছেন। সাত বছর বয়সেই ইনি নৃত্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। কিশোর বয়েস থেকে ইনি ছায়াছবির শিশু-চরিত্রে অভিনয় করে আসছেন। ১৯৫০ সাল থেকে ইনি জেমিনী-ষ্টুডিওতে কাজ করছেন। 'সংসার' ছবিতে অভিনয় ক'রে ইনি আজ সকলের কাছেই পরিচিত।

সন্ধ্যা: শান্তারামের 'অমর-ভূপালী' ছবিতে অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে শ্রীমতী সন্ধ্যা আজ চিত্রজগতে পরিচিতা। তাঁর দ্বিতীয় অভিনয় শান্তারামের 'পরছাঁই' ছবিতে। মারাঠী এই নবাগতা অভিনেত্রীর বয়েস এখন উনিশ বছর। শান্তারাম মনে করেন, ভবিষ্যতে সন্ধ্যা ভারতীয় চিত্রজগতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসেবে অভিনন্দিত হবেন।

কল্পনা কার্ত্তিক: ১৯৫১ সালে এই তরুণী অভিনেত্রী 'বাজী' ছবিতে একটি পার্শ্বচরিত্রে চমৎকার অভিনয় ক'রে নাম কিনে নিয়েছেন। সেই তাঁর প্রথম অভিনয় ছায়া-ছবিতে। গত বছর 'আঁধিয়া' ছবিতেও তাঁর চিত্রাভিনয় দর্শকসাধারণকে খুশি করেছে। একুশ বছরের কল্পনা কার্ত্তিক নবকেতনের 'হামসফর' ছবিতেও অভিনয় করেছেন। তাঁর আসল নাম—মোনা সিংহ।

শীলা নায়েক: মাত্র দশ বছর বয়সেই মহারাষ্ট্রের এই কিশোরী তারকা পুনার শালিমার ষ্টুডিওতে যোগ দেন। সেটা ছিলো ১৯৪৫ সাল। তারপর কেটে গেছে আরও আটটি বছর। বর্ত্তমানে শীলা অষ্টাদশ-বর্ষীয়া তরুণী চিত্রাভিনেত্রী হিসেবেই পরিচিতা হয়েছেন। বাবুরাও পেন্টারের পৌরাণিক চিত্র 'বিশ্বামিত্রে'ই এঁর অভিনয়ের প্রথম সুযোগ ঘটে। তারপর থেকে অনেকগুলি জনপ্রিয় চিত্রে ইনি অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'মহল' ও 'আন'।

নূর: ষোড়শবর্ষীয়া সুন্দরী নূর সম্প্রতি প্রদর্শিত 'দো বিঘা জমিন' চিত্রে অভিনয়ের প্রথম সুযোগ পান। এঁকে আবিষ্কারের মূলে রয়েছেন প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়। তিনিই নূরকে 'দো বিঘা জমিন' চিত্রে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় নির্ব্বাচিত করেন তাঁর অভিনয়-প্রতিভার স্ফুরণ দেখে।

চাঁদ ওসমানী: সাম্প্রতিককালের বোম্বাইয়ের উদীয়মানা চিত্রনটীদের মধ্যে চাঁদ ওসমানীর নাম উল্লেখ-যোগ্য। 'কারদার-কলিনস' সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় ইনি দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন এবং কারদার প্রযোজিত 'জীবন জ্যোতি' চিত্রেই নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের প্রথম সুযোগ পান। এই চিত্রে ইনি বিস্ময়কর অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে চিত্ররসিকদের অন্তর জয় করেছেন।

নৃত্যশিল্পী রামগোপাল

মনোজিৎ বসু

ভারতীয় নৃত্যকলার ঐশ্বর্য্য পুনরুদ্ধারে উদয়শঙ্কর ও রামগোপালের নাম ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় উদয়শঙ্কর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। কিন্তু রামগোপালের নৃত্যকলা বিষয়ের আলোচনা সংক্ষিপ্ত।

রামগোপালের নৃত্যকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর অঙ্গ-সৌষ্ঠব—সেইসঙ্গে, বিভিন্ন অবয়বের ছন্দিত স্পন্দন। যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তাঁরা বলেন রাজস্থানী পিতার ও বর্মী মাতার সন্তান ব'লে রামগোপাল উপরোক্ত গুণের অধিকারী।

রামগোপাল যখন যুবক, তাঁর সেইসময়কার নাচ দেখে—ফরাসী নৃত্যশিল্পী লা মেরী

নৃত্যশিল্পী রামগোপাল

রামগোপালের মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ আবিষ্কার করেন। তিনি রামগোপালকে তৎক্ষণাৎ সঙ্গে নিয়ে চ'লে যান নিজের দেশে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করেন নৃত্যকুশলী রামগোপাল। সেই সময় পাশ্চাত্ত্যের বিখ্যাত কলা-রসিক আলেকজান্দার জনটার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁরই প্রত্যক্ষ পরিচালনায় থেকে রামগোপাল নৃত্যকলা বিষয়ে বহু জ্ঞানের অধিকারী হন।

কি করে রামগোপাল রাতারাতি পাশ্চাত্ত্যের নৃত্যকলা-রসিক-চিত্ত জয় করলেন? তার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, ভারতীয়-নৃত্য সম্পর্কে সকলের মনেই একটা শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্যের ভাব আছে। দ্বিতীয়তঃ, রামগোপালের সহজাত-অঙ্গসৌষ্টব ও বিভিন্ন অবয়বের ছন্দঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। তৃতীয়তঃ, রামগোপালের বৈচিত্র্যপূর্ণ নৃত্য-রচনা। এর ফলে, তাঁর প্রতিটি অনুষ্ঠানে প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের স্থান থাকতো না। সহস্র সহস্র উচ্ছ্বসিত করতালির মধ্য দিয়ে সে-সময়ে ইউরোপবাসী ভারতের এই নৃত্যশিল্পীকে অভিনন্দিত করতো। রামগোপাল তখন যেন সাধনায় নিমগ্ন। কি করে, কত ভালোভাবে ভারতের নৃত্যসম্ভার বিদেশীদের রসপিপাসু চোখের সামনে তুলে ধরা যায় এই চিন্তায় সর্ব্বক্ষণ তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন।

ভারতের নৃত্যকলা এখন ক্লাসিক-পর্য্যায়ভুক্ত। কয়েক শতাব্দীর নিয়মিত অনুশীলনে যে-নৃত্য সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাকে তো আর সাধারণভাবে প্রকাশ করা চলে না। বিশেষতঃ, রামগোপালের আগে উদয়শঙ্কর ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে ভারতীয়-নৃত্যকলার যে ঐশ্বর্য্যময় পরিচয় দিয়ে এসেছেন—তাতে ওদেশের কলারসিকমাত্রই ভারতীয় নৃত্যের শিল্পচাতুর্য্য সম্বন্ধে সচেতন।

রামগোপালের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি পুরোপুরি ভারতীয়। ভারতীয়-নৃত্যে কোনরকম বিদেশী-ভাব সংমিশ্রণের তিনি ঘোরতর বিরোধী। ভারতীয় নৃত্যশাস্ত্রের প্রতিটি নিয়ম ও আঙ্গিক অনুসরণ করাই তাঁর স্বভাবধর্ম। তাই ব'লে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাতেও তিনি নিশ্চেষ্ট নন। শাস্ত্রসম্মত নৃত্যপদ্ধতির মধ্যেই তিনি নতুন নতুন বিষয়-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি ক'রে চলেছেন। তাঁর নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষের যে ব্যক্তিত্ব, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য, আন্তরিকতা, উচ্ছ্বাস, আনন্দ ও উদ্দীপনার বিকাশ ঘটে—তাতেই প্রমাণিত হয় তিনি একজন জাতশিল্পী।

সাধারণতঃ একটা ধারণা আছে, যিনি কোনো একটি বিশেষ নৃত্যবিদ্যার অধিকারী তাঁর পক্ষে অন্য নৃত্যবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করা সহজ নয়। ভারতীয়-নৃত্যবিদ্যা চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: কথক, ভরতনাট্যম্, কথাকলি আর মণিপুরী। কথক-নৃত্যবিদ্যার অধিকারী ভরতনাট্যমেও পারদর্শিতা লাভ করতে পারেন। অনেকেই সহজে এটা বিশ্বাস করতে চান না। মণিপুরী নৃত্যবিদের পক্ষে কথাকলি নৃত্যে দক্ষতা লাভ করা যে সহজ নয়, অনেকের তাই বিশ্বাস। রামগোপাল কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ পালটে দিয়েছেন। তিনি একাধারে এই চারটি নৃত্যবিদ্যায় সমান পারদর্শী। প্রত্যেকটি নৃত্যবিদ্যাই তিনি আলাদা আলাদা ভাবে সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে প্রদর্শন ক'রে বহুবার অভিনন্দিত হয়েছেন।

রামগোপালই প্রথম মালাবারের কুঞ্জু কুরুপ এবং তাঞ্জোরের মিনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লাইকে জনসমক্ষে পরিচিত করান। এঁরা দু'জনেই কথাকলি নৃত্যের সুদক্ষ শিল্পী। একদিন এই-জাতীয় নৃত্যকলা ও নৃত্যকুশলীর অনুসন্ধান ক'রে ফিরছিলেন ইউরোপীয় ব্যালের নামকরা শিল্পী পাভলোভা ও নিজিনস্কী। কুঞ্জু কুরুপ ও মিনাক্ষী-সুন্দরমের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে থেকে রামগোপাল কথাকলি নৃত্যবিদ্যাকে আজ যেন জীবন্ত করেই তুলেছেন।

ভারতবর্ষে, বিভিন্ন ধর্মস্থান থেকে নৃত্যশিল্পীরা তাঁদের নৃত্যের বহু বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন। এবিষয়ে দক্ষিণ ভারতের মন্দির গাত্রের চিত্রাবলী ও ভাস্কর্য বিশেষ উল্লেখ্য। ভারতের পুরাণবর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিসত্তা এই সব প্রস্তর আলেখ্যে পরিস্ফুট। ভাস্করের নৈষ্ঠিক শিল্পচাতুর্যে প্রেম, বিরহ, রাগ, অনুরাগ, উচ্ছ্বাস, অবসাদ, হাস্য, লাস্য, বীরত্ব ইত্যাদি যে-সব ভাব রূপায়িত হয়েছে, রামগোপাল বহুদিনের সাধনায় সেগুলিকে নৃত্যায়ত্ত করেছেন। পুরাণকল্পিত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের রূপটিকে তিনি তাঁর বিখ্যাত শিবনৃত্যের মধ্য দিয়ে যেভাবে ফুটিয়ে

তুলেছেন তার যেন তুলনা নেই। কৈলাসের ধ্যানমগ্ন শিব ও তাঁর বিভিন্ন অবস্থা রামগোপালের নৃত্যে যেন কাব্যময় হয়ে উঠেছে। তাঁর আর একটি সুবিখ্যাত নাচ —'অস্তোন্মুখ দিবাকর'। এই নৃত্যের পরিকল্পনাও তিনি করেছেন ধর্মস্থানে—সিংহলের এক দশম শতাব্দীর মন্দিরগাত্রের রেখাঙ্কিত মূর্তি থেকে।

রামগোপালের আর একটি জনপ্রিয় নৃত্যরচনা হ'লো —'গোকুলকৃষ্ণ'। কিশোর কৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর এই নৃত্যে কৈশোরের লীলা-চাপল্য অপরূপ হয়ে উঠেছে। নিজিনস্কী তাঁর বিখ্যাত 'নীলদেবতা-নৃত্যে'র উপকরণ পেয়েছেন এই একই কাহিনীতে। মণিপুরী পদ্ধতিতে রচিত 'রাসলীলা' ও 'হোলী'-নৃত্যেও রামগোপাল ও তাঁর সম্প্রদায়ের নৃত্যপটুতা অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে।

রামগোপাল 'ভরতনাট্যম্' নৃত্যকলার একজন একনিষ্ঠ রূপকার। এই নৃত্যে প্রতিটি অঙ্গের সঞ্চালনে যে দক্ষতার প্রয়োজন, রামগোপাল তার সম্পূর্ণ অধিকারী। পেশী-সঞ্চালন, মুদ্রারচনা ও বিভিন্ন ভাবের রূপায়নই 'ভরতনাট্যমে'র বিশেষত্ব। রামগোপাল এই সকল বিষয়ে একজন সুদক্ষ অনুকারী।

কথাকলি-পদ্ধতিতে রচিত তাঁর 'বিষধর অজগর-নৃত্যে' তিনি যে-ভাবে 'পৌরুষ' ও 'লাস্যে'র রূপদান করেন তা বিস্ময়কর। একই সঙ্গে 'বীর্যবন্ত পৌরুষে'র ও 'সুকোমল নারীত্বে'-র যে প্রকাশ তাঁর কথাকলি-নৃত্য রচনায় দেখতে পাওয়া যায়—তাতে রামগোপালের প্রতিভাকে অভিনন্দিত না করে পারা যায় না। 'গরুড়-নৃত্যে' রামগোপালের মস্তক, চক্ষু ও কণ্ঠের সঞ্চালনা তাঁর নৃত্য-সাধনায় একনিষ্ঠতার কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এতকাল ধ'রে ভারতীয়-নৃত্যের যে গৌরবময় ঐশ্বর্য কয়েকজন স্বল্প-পরিচিত নৃত্যগুরুর কাছেই সীমাবদ্ধ ছিল, উদয়শঙ্কর ও রামগোপাল জনসমক্ষে তার প্রচার ক'রে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন। দু'হাজার বছর পরে রামগোপাল আবার মন্দিরে মন্দিরে নৃত্যানুষ্ঠান ক'রে ভারতীয় নৃত্য-ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনলেন। মহীশূরের বেলুড়-মন্দির নির্মাণ করেন বিষ্ণুবর্ধন। তিনিই প্রথম মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করেন দেবতার সম্মুখে নৃত্য ক'রে। বহুদিন পরে নৃত্যশিল্পী রামগোপাল আবার এই বেলুড়-মন্দিরেই তাঁর নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নটরাজ শিবের বন্দনা করেন।

ইউরোপ, আমেরিকা ও দূর প্রাচ্যের বহু জায়গায় ভারতীয় নৃত্যের অনুষ্ঠান ক'রে রামগোপাল নিজে যেমন বিশ্ববন্দিত হয়েছেন, ভারতবর্ষের সুনাম ও কলা ঐতিহ্যের সম্মানও তেমনি বৃদ্ধি করেছেন। ভারতীয় নৃত্যকলার ঐশ্বর্য-বাহক ও সৌন্দর্য-ধারক রামগোপাল আমাদের গৌরব।

প্রিয় সম্পাদকভায়া,

রিষড়ের লটবরকে মনে আছে তো? তার ছেলে লবকেষ্ট 'ভারতীয় চলচ্চিত্র' সম্পর্কে হঠাৎ একখানি প্রবন্ধ রচনা ক'রে ফেলেছে। শুনছি, শীগ্‌গিরই সে নাকি 'চলচ্চিত্র কঠোপনিষদ' নামে দেড় হাজার পাতার এক-খানি থিসিস পুস্তকাকারে প্রকাশ করছে। মূল থিসিস ইংরেজিতে লেখা। ইতিমধ্যেই তা লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। লবকেষ্টর 'ভারতীয় চলচ্চিত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ তার সেই থিসিসেরই মুখবন্ধ। প্রবন্ধটিতে বহু জায়গায় টীকা, টিপ্পনী ও ফুটনোট ছিল। চিঠি বড় হয়ে যাবে মনে ক'রে আমি সেগুলি যথাসম্ভব বাদ দিয়ে তার মোদ্দা বক্তব্যটি লিখে পাঠাচ্ছি। লব-কেষ্ট লিখছে :—

"চলৎরূপ চিত্র-কেই আমরা চলচ্চিত্র বলিয়া থাকি। অর্থাৎ, যে-চিত্র নিশ্চল নয়, পুঁটিমাছের মত যে-চিত্র সদাচঞ্চল তাহাই চলচ্চিত্র। পূর্ব্বে আমরা নির্ব্বাক চল-চ্চিত্র দেখিয়াছি, এখন সবাক চিত্র দেখিতেছি। অর্থাৎ, 'টকী'-র যুগে আমাদের বাস। এই 'টকী' শব্দটি কোথা হইতে আসিয়াছে সে-সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কেহ গবেষণা করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি গবেষণা করিয়া দেখিয়াছি, 'টকী' শব্দটি 'নাটক' শব্দের অপভ্রংশ। নাটক —না=টক (+ঈ)=টকী। সিনেমা শব্দটির আসল অর্থও কোনো অভিধানে নাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পণ্ডিত একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে 'sin'-এর 'মা' cinema—ইহাই নাকি সিনেমা শব্দের মূল অর্থ। সৃষ্টিতত্ত্বের মূলকথাই 'Sin'। আদম ও ঈভ্‌ 'Sin' করিল বলিয়াই না আজ মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব আছে। সেইরকম 'Sin mother'-ই নাকি একদিন cinema-র সৃষ্টি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই চলচ্চিত্র-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এবিষয়ে সকলের আগে যাইতেছেন মার্কিনী চাচারা, তাহার পরেই ভারতীয় ভাইপোরা। চলচ্চিত্র-শিল্পে আমরা যে-ভাবে আগাইয়া চলিতেছি তাহাতে অদূর-ভবিষ্যতে ভাইপোরা যে চাচাদের পিছনে ফেলিয়া যাইবেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

চলচ্চিত্রের কর্ণধারী হইলেন প্রযোজক। প্রগল্‌ভতার সহিত যোজনা করিতে পারেন বলিয়াই চলচ্চিত্র-শাস্ত্রে ইঁহাদের প্রযোজক বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষে বহু প্রোথিতযশা প্রযোজক আছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কুলীন তাঁহারাই এদেশের চলচ্চিত্র-শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। বাংলাদেশেও অনেক কুলীন প্রযোজক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার সম্প্রতি বোম্বাই-মার্কা অভিনেত্রীর সহিত পার্টনারশিপে প্রযোজনা শুরু করিয়াছেন। ইহাকে শুভলক্ষণ বলিতে হয় বৈ-কি! কারণ, বোম্বাই-অভিনেত্রীর জৌলুস ও ঐশ্বর্য্য এবং বাংলার পুং-প্রযোজকের 'গুডউইল'—এই দুইয়ে মিলিয়া প্রযোজনার ভিত্তি আরও পাকা হইবে —এই প্রকার যুগ্ম-প্রযোজনায় বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের যে 'অব-দান' আমরা পাইব —তাহা নিশ্চয়ই পূর্বের রেকর্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই তিন জায়গা হইল ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের কেন্দ্র। এত-কাল প্রযোজনা পুংরাজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু, অধুনা ইহা স্ত্রী ও শিশু-রাজ্যেও সংক্রমিত হইয়াছে। বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে —তিন জায়গাতেই

প্রযোজিকারা আবির্ভূতা হইয়াছেন। সম্প্রতি বোম্বাইতে শিশু প্রযোজকও দেখা দিয়াছে। এরকম দৃষ্টান্ত আর কোন্ দেশে আছে?

আমাদের দেশে অনেক রকমের প্রযোজক আছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কৌলীন্য বজায় রাখিয়া চলেন—তাঁহারা সর্বদাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ভালোমানুষ ইঁহারা—স্বভাবে ও বচনে। ফলে, ইঁহাদের মাথায় অনেকেই কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইয়া যায়—ইঁহারা প্রথমে তাহা টের পান না, হুঁস যখন হয়, তখন দেখেন কাঁঠালের কোয়া নাই ভুতিটা কেবল পড়িয়া আছে। আর এক শ্রেণীর প্রযোজক আছেন—তাঁহাদের বলা যায় 'ভঙ্গকুলীন', কেহ কেহ 'ভালেবর' কুলীনও বলেন। ইঁহাদের রসনা আছে, কিন্তু রস নাই। বিলের তাগাদা দিতে গেলে ইঁহাদের রসনা লক্‌লক্ করিয়া উঠে এবং যে সকল শব্দ বাহির হয়, তাহার অধিকাংশ কাগজে-কলমে লেখা যায় না, কান পাতিয়া কর্ণধঃকরণ করিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিলবাবুরা ইঁহাদের খুরে দণ্ডবৎ করিয়া পালাইয়া আসেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার চাতুরালীতে পি এইচ্ ডি! বলেন—'বড়ই লজ্জার কথা —বাবু, বিলের জন্যে আমার কাছে আপনাকে তাগাদায় আসতে হলো! ছবিটা সবে খুলেছে—এখনও কালেকশন সব আসেনি—এলেই আপনার টাকা পাঠিয়ে দেব।' বিলবাবু অগত্যা কাটিয়া পড়েন। কিন্তু, পনেরো দিন কোনো 'টঁ্যা-ফুঁ' না দেখিয়া আবার গিয়া হাজির হন ভঙ্গকুলীন প্রযোজকের দরজায়। ভঙ্গকুলীন সবিনয়ে তখন বলেন—'দেখতেই তো পাচ্ছেন ছবিটা দু'হপ্তা না যেতেই উঠে গেল—এখন কি ক'রে আপনার বিল শোধ করি। আমাদের পরের ছবিটা শীগ্‌গিরই বেরুচ্ছে, সে সময়ে আসবেন, তখন…।' যথাসময়ে বিলবাবু খাতা বগলে হাজির হন আবার। কিন্তু প্রযোজক আর নীচে নামেন না; বেয়ারা আসিয়া বলে—'সাহেবের আজ সাতদিন জ্বর'। ক্রমে এই জ্বর নিউমোনিয়ায় দাঁড়ায়, শেষে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য ভঙ্গকুলীনকে সিমলা-মুসৌরী ছুটিতে হয়। পনেরো টাকা সাড়ে পাঁচ আনা আদায়কারী বিলবাবুও অবশেষে রণে ভঙ্গ দেন। এই ভঙ্গকুলীন প্রযোজকদের দাপটই আজ বেশি।

আর এক শ্রেণীর প্রযোজক আছেন, তাঁহারা হইলেন নৈকষ্য-কুলীন বা 'শেঠিয়া-কুলীন'। স্যাকৃরা যেমন নিকষ-পাথরে আঁচড় কাটিয়া দেখে সোনা সাচ্চা না ঝুটা, এই নৈকষ্যকুলীন জাতীয় প্রযোজকেরাও তেমনি পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, টেকনিশিয়ান সকলকেই পরীক্ষার নিকষ-পাথরে ভালোভাবে পরখ করিয়া লন। ইঁহারা পাকা ব্যবসায়ী। 'লাভ' জিনিসটা ইঁহারা ভালো বোঝেন। এই জাতীয় প্রযোজক অভিনেতা নির্বাচনের সময় নির্বিকার, কিন্তু অভিনেত্রী নির্বাচনে ইঁহাদের মতামতের উপরে কেহ কথা বলিতে সাহস করে না। ইঁহারা অভিনেত্রী নির্বাচনে সুদক্ষ। কনট্রাক্ট হইল 'ঢাই লাখ'—কিন্তু তাহাতে সর্তও থাকে অনেক। এক কথায় প্রযোজকের কথাতেই অভিনেত্রীকে ওঠ্‌বোস্ করিতে হয়। অভিনেত্রী যদি 'পিক্‌নিক্', 'নৌ বিহার', 'মোটর বিহার', 'বাগানবাড়ীর সৌন্দর্য্য বর্ধন'—ইত্যাদি অনুল্লিখিত শর্তে রাজী না হন, তাহা হইলে কনট্রাক্টের 'ঢাই লাখ' হুস করিয়া 'ঢাই হাজারে' নামিয়া আসে! এই নৈকষ্য-কুলীন প্রযোজকেরা পরিচালকদের উপরেও ছড়ি ঘুরাইতে অভ্যস্ত। কারণ হিসাবে বলেন—'হামি রুপেয়া ঢালছে আর ডিরেক্‌শনের বেপারে হামি কোথা বলতে পারব না, ই বাত তো বহুৎ বুঢ়ী আছে!' আখের নষ্ট হইবার আশঙ্কায় পরিচালক আর বাধা দেন না, প্রযোজকের নির্দেশ মতো বিয়োগান্ত কাহিনীকে মিলনান্ত করিয়া দেন, পৌরাণিক চরিত্রাভিনেত্রীকে জর্জেট শাড়ী পড়াইয়া ছাড়েন, হৃৎপিণ্ডে তিন তিনটা গুলী-খাওয়া নায়ককেও বাঁচাইয়া তোলেন, জননীর কণ্ঠেও 'লারে লাপ্পা' জাতীয় গান জুড়িয়া ছবির পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করেন।

এই তো গেল প্রযোজকের কথা। এবারে, পরিচালকদের হিম্মৎ শুনাই। পরিচালনার ব্যাপারে আমাদের দেশীয় পরিচালকগণ বহুগুণসম্পন্ন। ইঁহাদেরও শ্রেণীভেদ আছে। এক জাতের পরিচালক আছেন তাঁহারা 'সব্য-সাচী'। ইঁহারা দশ আঙুলে দশ রকম কাজ করিতে

পারেন। এক আঙুলে পরিচালনার ইঙ্গিত দেন, অন্যান্য আঙুলে কাহিনী রচনা, গান লেখা, চিত্রনাট্য রচনা, ক্যামেরা ঘোরানো, ছবির সম্পাদনা ইত্যাদি সর্ববিধ কাজ করেন। 'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' হইবে আশঙ্কায় 'সব্যসাচী'-জাতীয় পরিচালকরা সব কাজ একা করিতেই অভ্যস্ত। বাংলা দেশে আর এক শ্রেণীর পরিচালক আছেন, আমরা তাহাদিগকে 'ঐতিহ্যধারী' বলিতে পারি। Tradition বজায় রাখিতে ইঁহারা বিশেষ পটু। মহীন্দ্র চৌধুরী কোন ছবিতে একবার বৃদ্ধ পিতার ভূমিকায় অভিনয় করিয়া কেল্লাপ পাইয়াছেন—অতএব 'ঐতিহ্যধারী' পরিচালকদের তিনি 'বুড়োবাবা' হইয়া বসিয়া থাকিবেন। তাঁহাকে দিয়া অন্য ভূমিকা অভিনয় করাইতে বলিলে এই জাতীয় পরিচালকেরা বলিবেন—'কিছু বোঝে না, ফ্যাচ্ফ্যাচ্ ক'রো না। আর্টিষ্টের talent utilise না করা মুখ্খুমি, বুঝলে?' ইঁহাদের পাল্লায় পড়িয়া অমল মিত্র পার্মানেন্ট 'ভিলেন', পাহু বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙাল কমেডিয়ান', লোভা সেন 'বিধবা', তমুকা রায় 'ঝগড়ুটে দিদি, মাসী বা জা'! বোম্বাইতেও এই দশা। সেখানে আবার 'জোড়'-এর উপর গুরুত্ব বেশি। ফলে,— 'বাগিস-তাজকাপুর', 'জিলিপকুমার-শিম্মি', 'অসুখকুমার-মলিনী', 'সুরানন্দ-সীতাবালী' ইত্যাদি।

আমাদের দেশের পরিচালকদের অনেক গুণ। অনেকে আছেন, ছবির কোনো আর্টিষ্টকে পূর্ব হইতে তাহার ভূমিকা-বর্ণিত সংলাপ জানিতে দেন না। যে-দিন যতটুকু সংলাপের প্রয়োজন তাহাই তোতাপাখীর মত শুনাইয়া মুখস্ত করাইয়া লন। ইহার কারণ আছে। পরিচালকেরা মনে করেন পূর্ব হইতে সমস্ত সংলাপ শুনাইয়া দিলে, যাহার সংলাপ কম, সে আর অভিনয় করিতে উৎসাহ পাইবে না। কিন্তু যাহার সংলাপ বেশি, তিনিও যে কতখানি উৎসাহ পাইবেন তাহা বলা শক্ত। একজাতীয় পরিচালক আছেন, তাঁহারা 'মহাবিদ্যাপারদর্শী'—আপনারা ইঁহাদের নাম দিতে পারেন 'মহাবিদ্যাধরী'। ইংরাজী-ছবির পরিচালন-কারচুপি অম্লানবদনে হজম করিতে ইঁহারা অভ্যস্ত। আমাদের দেশে তাই ইঁহাদের নাম বেশি। কারণ, দর্শকেরা ঠকিলেও, ইঁহাদের চাতুরালী ধরিতে পারে না। অভিনয় শিক্ষা দেওয়া পরিচালকদের অন্যতম কর্তব্য। সে-বিষয়ে এদেশের ছোটবড় সব পরিচালকই ছোটবড় সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীর উপর মাস্টারী করেন। কেহ কেহ সুযোগ বুঝিয়া নবাগতা অভিনেত্রীদের নিকট হইতে মূল্যবান দক্ষিণাও আদায় করিয়া লন।

আজকাল আবার অভিনেত্রীরাও পরিচালিকা হইতেছেন। ইঁহাদের হাতে অভিনেতাদের কি অবস্থা ঘটিবে তাহা বাবা ভাগীরথীই জানেন!

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কারণ, এদেশের চলচ্চিত্রে সর্বরকম এক্সপেরিমেন্ট শুরু হইয়া গিয়াছে। গাঁটের কড়ি খরচা করিয়া যদি প্রাণের সাধ মিটাইয়া কাঁদিতে চান তো বাংলা ছবি দেখুন, মদনানন্দ-মোদক সেবনে যে-রকম স্নায়বিক উত্তেজনা হওয়ার কথা সর্বজনবিদিত—সেইরকম উত্তেজনা লাভ করিতে চান তো বোম্বাই ছবি দেখুন—আর, নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড়, হাসি-কান্না, রাজা-ফকির, তলোয়া'রের খেল, ম্যাজিক, সার্কাস প্রভৃতি সর্বরসায়ন-বটিকা সেবনের সুখ যদি পাইতে চান তো মাদ্রাজী ছবি দেখুন।

চলচ্চিত্র আমাদের দেশের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই আমাদের স্বল্প-গোঁফ ওঠা তরুণেরা কিঞ্চিৎ বড় বড় খুকীদের সঙ্গে প্রেম করিতে শিখিয়াছে—সিনেমার কায়দায় তাহারা ডায়মণ্ডহারবার রোড বা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া সান্ধ্যবিহারে বাহির হইতেছে এবং সুযোগ সুবিধা মত Y-মার্কা গাছের দু'পাশে দাঁড়াইয়া প্রেমসঙ্গীতরূপ উদুনে ফুঁ দিতেছে। মা-বাপরাও একালের নওজোয়ানদের চেনেন। কাজেই, কবে তাহারা বগলে আসিয়া টিপ্ করিয়া পেন্নামের ভঙ্গীতে বিবাহের প্রস্তাব জানাইবে সেই নিশ্চিন্ত-মুহূর্তের জন্য বসিয়া থাকেন। সমাজের এইরকম একটা মহাসমস্যার সমাধানে চলচ্চিত্রের দান অপরিসীম।

চলচ্চিত্রের দৌলতে ছেলেমেয়েরা ফ্যাশান শিখিয়াছে। দীলিপকুমারের চুলের careless beauty নার্গিসী-খোঁপা, সুরাইয়ার অক্ষি-সুর্মা, বিকাশী-ঢঙে কথা বলা —এইসব আজ ঘরে ঘরে রপ্ত হইতেছে। শাড়ীর ডিজাইন, ব্লাউজের ছাঁট, গহনার নক্সা—সবই হইতেছে ফিল্ম আর্টিষ্টের আদর্শে। 'মানে-না-মানা'-শাড়ী, 'আওয়ারা'-ছাওয়াই সার্ট, 'মহাপ্রস্থানের পথে'-ঘি, 'গোপালভাঁড়'-পেন্টুলুন, 'লারেলাপ্পা'-ব্লাউজ, 'যা-হয়-না'-সাবান, 'কারপাপে'-রাজভোগ—ইত্যাদি বহু জিনিসেরই আমদানী হইয়াছে চলচ্চিত্রের দৌলতে।

এই চলচ্চিত্র ছিল বলিয়াই সিনেমা-কাগজ বাহির হইয়াছে। অনেক সিনেমা-কাগজের মালিক রাতারাতি ফুলিয়া ঢোল হইয়াছেন। কাগজ চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আবার সংশ্লিষ্ট নানারকম ব্যবসাও শুরু করিয়াছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফিক-ডিপার্টমেণ্টও চালু হইয়াছে। ঐ ডিপার্টমেণ্টাল ডার্করুমে কত ঝানু ও হবু-অভিনেত্রীই যে কত ভঙ্গীর কত ছবি তুলিয়া আসিলেন—তাহার সংখ্যা নাই। কাগজে সেই সব ছবি ছাপাইয়া অভিনেত্রীদের নিকট হইতে দক্ষিণাও লাভ করিলেন এই জাতীয় কাগজের মালিকেরা। কোনো কোনো সিনেমা-কাগজ আবার ক্ষোভে-অভিমানে চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন-সংগ্রহ ছাড়িয়া দিলেন একেবারে। কিন্তু, তাই বলিয়া সিনেমা-রোগ ছাড়াইতে পারিলেন না, নিজেদের পয়সায় কভারে অভিনেত্রীদের ছবি ছাপিতে লাগিলেন!

অনাবশ্যকবোধে প্রবন্ধটির শেষাংশ আর পাঠালেম না। আমার তো মনে হয় লটবরের ব্যাটা লবকেষ্ট ডক্টরেট না নিয়ে ছাড়বে না। ভাইরে, কেবল তোমার, আমার আর নরাধমের-ই কিছু হলো না! ইতি—

ধুরন্ধর

ঐতিহাসিক চিত্র

★

বিপিনবিহারী রায়

তোমাদের বাংলাদেশে এ কী হচ্ছে বলতো? পরপর ছবির পর ছবি বেরোচ্ছে, কোনটা একহপ্তা, কোনটা বড় জোর দুহপ্তা চলেই উঠে যাচ্ছে। কী টাকা নষ্ট হচ্ছে, উঃ—বাস্তব, চিরন্তনী, লাখটাকা, চিকিৎসা সঙ্কট, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, ঝকমারী—ক'টার নাম বলবো?

বিরুদা' (আমাদের প্রাচীন বন্ধু শ্রীবিরোচন শর্ম্মা) এসে ধপাস্ করে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ে কথাগুলি বললেন।

নির্ম্মল বললে, তা ত' দেখছি বিরুদা', লোকের যদি পয়সা সস্তা হয়ে থাকে—

পয়সা সস্তাই বটে, ঝেঁকে উঠলেন বিরুদা' বলে লোকে খেতে পাচ্ছে না পেট ভরে, চারিদিকে বেকার সমস্যা, হাহাকার, আমার মনে হয় আইন করে এরকম পয়সা নষ্ট বন্ধ করা উচিত।

আইন করে কি এ সব জিনিষ—বলতে গেল অরুণ—

কেন হবে না? ইলেক্‌সনে যারা দাঁড়ায় তাদের বেলা আইন আছে যে ভোট সংখ্যা একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম যদি কোন ভোট-প্রার্থী পায় তাহলে তার আমানতি টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এখানেও সেই-রকম করা যেতে পারে। গভর্ণমেণ্টের কাছে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা জমা রেখে তবে ছবি দেখাবার অনুমতি পাবে। যে ছবি অন্ততঃ একমাস না চলবে তার জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হবে। যাক্, মরুক্‌গে, কতকগুলো আনাড়ী লোক, হাতে পয়সা বেশী হয়েছে—তা যে করেই হোক্—তারা ফিল্মের "ফ" বোঝেনা, নেমে পড়লো ফিলিম্ করতে, আরে, এ কি ছেলের হাতের মোয়া নাকি? কত্তোরকম সূক্ষ্ম টেক্‌নিকাল্ ব্যাপার জড়িত রয়েছে ফিল্ম তৈরীর সঙ্গে, এরা তার কিছুই বোঝেনা। আর ধরো, বোঝেনা শুধু বললে কম বলা হবে, বোঝাতে চেষ্টা করলেও শোনে না। সামান্য বিষয়ে একটা গল্প বলি শোন। কিছুকাল আগে একটি চিত্রপ্রতিষ্ঠান ঘোষণা করলেন যে তাঁরা বাংলার কোন এক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী নিয়ে চিত্র করছেন। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু, চিরজীবন তিনি লেখাপড়া, বিশেষ করে ইতিহাস নিয়ে চর্চ্চা করেছেন, তিনি হঠাৎ খেয়ালবশে ওই প্রতিষ্ঠানকে এক চিঠি লিখে বসলেন: যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবন নিয়ে চিত্র করার ঘোষণা হয়েছে, তাঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য, অনেক নাটকীয় ঘটনা তিনি জোগাতে পারবেন, যাতে ছবিতে সেই মহান্ ব্যক্তির চরিত্র খুব ভাল করে ফোটানো যায়, ইত্যাদি। একটা জবাব পেলেন: "আপনি যদি সত্যিই কিছু তথ্য দিতে পারেন ত' আমাদের আপিসে এসে অনুগ্রহ করে দেখা করবেন।" ভাল কথা, তাতে আমার বন্ধু আবার লিখলেন যে তিনি বৃদ্ধ, অনেক বই খাতা নিয়ে যেতে হবে, ট্রামে-বাসে অতদূর যাওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য, যদি প্রতিষ্ঠান তাঁর যাতায়াতের ট্যাক্সিভাড়া দিতে প্রস্তুত থাকেন ত' তিনি যাবেন। এটাও সেইসঙ্গে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে বড় জোর দুদিন এক ঘণ্টা ক'রে সময় লাগবে। ব্যস্, তারপরে আর উত্তর নেই। মশাই, দুদিনে না হয় ২০৷২৫ টাকা ট্যাক্সি খরচ হতো, তা দিতে কর্ত্তারা রাজী নয় আর কি! অথচ ছবিখানা যখন বেরোলো, দেখা গেল তাতে সাজ-পোষাক সেট দৃশ্যাদির যেরকম প্রাচুর্য্য, অন্ততঃ লাখখানেক টাকা তাতে খরচ হয়েছে। হলে কি হবে, ছবি হলো তৃতীয় শ্রেণীর, যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী ও যাঁর নামে ছবির নামকরণ হয়েছে তাঁকে প্রায় ছবির মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেলনা বললেও চলে। অর্থাৎ কেবল পার্শ্বচরিত্রের ভীড় আর ঐতিহাসিক পটভূমিকা রচনা করতে করতেই ছবি শেষ হয়ে গেলো। সে ব্যক্তিকে একটা অস্পষ্ট ছায়া-মূর্ত্তির মতো মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া গেল, চরিত্র ত' একবারেই ফুটলোনা। এই ত' তোমাদের চিত্র-নির্ম্মাতাদের মনোভাব।

অরুণ বললে, বিরুদা' এরকম তারা কেন করলে? আপনার সাহিত্যিক বন্ধু অযাচিত সাহায্য করতে চাইলেন,

তাতে কি তাদের মনে কোন সন্দেহ জাগলো যে কোনরকম "মতলব" অর্থাৎ দুরভিসন্ধি তাঁর মনে আছে?

হয়তো সেইরকম কিছু হবে, অরুণ, কিন্তু এর ভেতর দুরভিসন্ধির স্থান কোথায় ভেবে পাই না। তবে আসল কথা হচ্ছে কি, আমার মনে হয় বেশীরভাগ এইসব ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে-ওঠা চিত্রপ্রতিষ্ঠানে সত্যিকারের শিক্ষিত লোকের একান্ত অভাব। মনগড়া কথা বলছিনা, অবশ্য আমি জীবনে কখনো কোনও চিত্রপ্রতিষ্ঠানের ভেতর প্রবেশ করি নি, কিরকম লোক কাজ করে তাও দেখিনি, কিন্তু "ফলেন পরিচীয়তে" অর্থাৎ ছবির বিজ্ঞাপনগুলো যখন সংবাদপত্রে পড়ি, দেখি যে দু'লাইন পরপর ইংরাজী ঠিক করে লিখতে পারে এমন লোকও কি একটা তাদের মধ্যে থাকেনা? সম্প্রতি যেসব ইংরাজীর নমুনা পেয়েছি দু-একটা বলি, এক চিত্র-প্রতিষ্ঠান তাদের নতুন ছবি সম্বন্ধে লিখছে:

A story yet untold in the screen with full of fun

আর একটা লিখছে:

Why the innocent youngsters are drifted towards crime these days?

তৃতীয় এক প্রতিষ্ঠান বলছে:

Shockingly true story of a mislead youngster.

এ সব দেখে কি মনে হয় বলো? সবচেয়ে হাস্যকর সম্প্রতি একটা ছবির বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম এইরকম গোছের—তিনটে বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে: Magnificent, Revolting, thrilling! ছবিটার বিষয়বস্তু ছিল অত্যাচার প্রপীড়িত প্রজাদের অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিপ্লব বা বিদ্রোহ করা, অর্থাৎ হয়তো "Revolutionary" বলতে চেয়েছিলেন যার বদলে বলে বসলেন 'Revolting', অর্থাৎ ঘৃণ্য, জঘন্য!

যাক্ এখন যা বলছিলুম,' বলে চললেন বিরুদা', ঐতিহাসিক ছবির কথা বলি। বাংলাদেশে অবশ্য ঐতিহাসিক ছবি খুব কমই হয়েছে, তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, যে কোন ঐতিহাসিক চরিত্রকে নিয়ে—যেমন সম্রাট অশোক বা আকবর—ছবি করলেই সেটা ঐতিহাসিক চিত্র হবে এমন কোন কথা নেই।

ও আবার আপনি কি বলছেন বিরুদা', নির্ম্মল বললে, ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে ছবি করলে তাকে আপনি ঐতিহাসিক চিত্র আখ্যা দেবেন না?

বিরুদা' উত্তর দিলেন, বঙ্কিমবাবুর "রাজসিংহ" উপন্যাস পড়েছ? তাকে "ঐতিহাসিক উপন্যাস" বলে বর্ণনা করে আবার বঙ্কিমবাবু লিখেছেন:—

'ইতিহাস লিখিবার পক্ষে অনেক বিঘ্ন। প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য...উপন্যাসলেখক সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত, অভিষ্টসিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে সবস্থানে উপন্যাস ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না...উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।'

উপন্যাসের বিষয় বঙ্কিমবাবু যা বলে গেছেন, চলচ্চিত্র সম্বন্ধেও সেটা খাটে, কারণ চলচ্চিত্র তৈরী হয় উপন্যাস বা গল্পকে অবলম্বন ক'রে। তাহলেই, ঐতিহাসিক চিত্রে যে একবারে কল্পনার স্থান থাকবে না, এমন নয়। কেবল লক্ষ্য রেখে যেতে হবে যে মোটের ওপর সেই সময়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, আর যেসব প্রধান চরিত্র নিয়ে ছবি হচ্ছে, তাতে কোন চরিত্রের বিকৃত রূপদান বা অবমাননা করা না হয়। জনসাধারণের কাছে প্রচলিত ইতিহাস থেকে পাওয়া যে পরিচিত রূপ আছে, সেটা বিকৃত না হয়।

আচ্ছা, বললে নির্ম্মল, ধরুন আমি জাহাঙ্গীরকে মদ্যপায়ী দেখাতে পারি, কারণ তার যথেষ্ট প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

ঠিক কথা, উত্তর দিলেন বিরুদা', তবে ওই পর্য্যন্তই, তাই বলে জাহাঙ্গীর মদ খেয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচছেন তা' দেখাতে পারো না। আমি কিন্তু ঠিক ওভাবে কথাটা বলছিনা, আর একটু পরিষ্কার করে বোঝাতে চেষ্টা করছি। প্রথমেই বলে রাখি, আমি কোন 'বোম্বাইয়া' ঐতিহাসিক ছবি যথা: 'পুকার', 'সেকেন্দর,' বা এমনকি বিখ্যাত 'ঝান্সী কী রাণী' ছবিও দেখিনি, সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবো না।

এঁ্যা, বলেন কি, 'ঝান্সী কি রাণী' পর্য্যন্ত দেখেন নি? বলে উঠলো নির্ম্মল।

না দেখিনি, উত্তর দিলেন বিরুদা', কেন জানো? ও সব বিশ চল্লিশ পঞ্চাশ লাখের ছবি দেখে ত' বাংলার চিত্র-শিল্পের কোন উপকার হবে না। এখানকার দৌড় বড় জোর লাখ-দেড় লাখ পর্য্যন্ত। আমি যে মাঝে মাঝে তোমাদের কাছে এসে বক্‌বক্ করি, আমার উদ্দেশ্য বাংলা ছবির কিসে ও কিভাবে উন্নতি করা যেতে পারে, তাই নিয়েই আমি আলোচনা করি। সেই কারণেই মার্কিন ঐতিহাসিক ছবির কথাও তুলবো না। 'কুয়ো ভ্যাডিস্' বা 'সাইন অফ্ দি ক্রস্' প্রভৃতি ছবিতে তারা কোটী কোটী টাকা খরচ করে, ফলে আমরা পাই প্রাচীনকালের রোমের এমন সব দৃশ্য যাতে সেকালের বাড়ী-ঘর, আসবাব-পত্র, অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-পোষাক ইত্যাদি সব জিনিষেই একটা বাস্তবতার ছাপ থাকে। ওসব 'মিলিয়ন ডলার' ছবির আলোচনা ক'রে আমাদের কোন লাভ নেই। এবারে যে ক'খানি বাংলা ঐতিহাসিক ছবি হয়েছে তাদের কথাই ধরা যাক্। আমাদের 'ইতিহাস' বলতে কতটুকু আছে? যেটুকু আছে, অর্থাৎ প্রচলিত স্কুলপাঠ্য পুস্তকে বা বেশীর-ভাগই ইংরেজ লিখিত বড় ইতিহাস বইতে, তা থেকে একটা মোটামুটি আদল ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে। বঙ্কিমবাবুর কথা তো আগেই বলেছি, তিনি বলেছেন: 'প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা কি, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য'। তারপর নির্ভর করতে হয় প্রচলিত গল্প বা কিংবদন্তীর ওপর, সবশেষে কাহিনীকার বা চিত্রনাট্য-লেখকের কল্পনা—এই তিনের সংমিশ্রণে আমাদের বাংলা ঐতিহাসিক ছবি গড়ে ওঠে। তাতে ক্ষতি কি? এই তিনরকম মশলা নিয়েই বেশ হৃদয়গ্রাহী ছবি হতে পারে, কিন্তু ভায়া, পড়তে হবে। যে সময়ের বা শতাব্দীর এবং যে চরিত্রকে কেন্দ্র ক'রে ছবি হবে, সেসব বিষয়ে গভীরভাবে জানতে হবে, জেনে তবে চিত্রনাট্য লেখা হবে। ক'টা প্রতিষ্ঠান এই প্রণালীতে ছবি করেছে বলো ত'? তাদের ভেতরে শুধু শিক্ষিত লোকের যে অভাব তা' নয়, মনোবৃত্তিরও অভাব, ওই ত' আগেই বলেছি, একজন শিক্ষিত ইতিহাসবেত্তা অযাচিত সাহায্য করতে চাইলেন, তাঁর সাহায্য নিলেনা। এ রোগের ঔষধ কি?

তা দাদা,—বললে অরুণ, আমরা ত' শুনতে পাই যে অমুক চিত্রপ্রতিষ্ঠান অমুক ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনী নিয়ে ছবি করবেন, একবছর ধরে তাঁরা নানা বই পত্র থেকে সে সম্বন্ধে রিসার্চ্চ করছেন—

রিসার্চ্চ করছেন আমার মাথা আর মুণ্ড, ঝেঁকে উঠলেন বিরুদা', কি করছেন জানো? বড় জোর বাজারে সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্বন্ধে যা দু-একখানা প্রচলিত বই পাওয়া যায়, কিনে এনে সেগুলো পড়ে নিলেন, এর বেশী কি করবেন?

তাছাড়া আর কোথায় কি পাবে বলুন? বললে নির্ম্মল, আমাদের কি তেমন ইতিহাস আছে?

কেন, জাতীয় পুস্তকাগার রয়েছে, বললেন বিরুদা', মহারথী সব ইতিহাসবেত্তা ইতিহাস-লেখক রয়েছেন, সেসবের সাহায্য নিতে হবে। ডুবে যেতে হবে, সেই চরিত্র ও সেই সময়ের ঘটনা সম্বন্ধে যা কিছু পাওয়া যায় গভীরভাবে চর্চ্চা করতে হবে, খাটতে হবে, খরচা করতে হবে। তা নাহলে যেমন সব ঐতিহাসিক চিত্র হচ্ছে তাই হতে থাকবে। আর একটা পুরোনো গল্প বলে শেষ করি। ১৯৩১ সালে ম্যাডান কোম্পানীর তৈরী নির্ব্বাক 'দেবী চৌধুরাণী' ছবি দেখেছিলুম। তাতে, যেখানে দেবীরাণী বজরার ছাতে বসে দূরবীণ দিয়ে দূরে শত্রুর নৌকা আসছে দেখছেন, তাঁর হাতে ছিল ফীল্ড গ্লাস (field glasses) অর্থাৎ দু-চোঙা দূরবীণ। আর একটি দৃশ্যে, যেখানে হরবল্লভ লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রেনানের নৌকোয় আনীত হয়েছে, ব্রেনানের হাতে ছিল রিভলভার। যে যুগের কাহিনী, সে যুগে দুচোঙা দূরবীণও ছিলনা, রিভলভারও ছিলনা,—ছিল একচোঙা টেলেস্‌কোপ, আর পিস্তল। এসব হয়ত তোমরা বলবে তুচ্ছ খুঁটিনাটি, কিন্তু তা ব'লে উড়িয়ে দিলে চলবে না।

ওঃ দাদা, সাধারণ দর্শক কি অতো খুঁটিয়ে ছবি দেখে? বললে নির্ম্মল।

দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষিত ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি থাকেন, যাঁদের চোখে এরকম ভুল-ভ্রান্তি পীড়াদায়ক হয়, বললেন বিরুদা'। সেইজন্যেই ত' বলছি, সত্যিকার রিসার্চ্চ করতে হলে, এসব তুচ্ছ খুঁটিনাটিও জানতে হবে, চাই অধ্যবসায়, চাই গভীর জ্ঞান-পিপাসা। আজ উঠি, এই পর্য্যন্ত থাক্।

ব'লে বিরুদা' ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন।

যবনিকার অন্তরালে

তরুণ রায়

জানিনা কোন সখের নাট্যসংঘের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে বলবো নির্ম্মল আনন্দরসে আপনি বঞ্চিত। মনে করবেন না আমি নাট্য পরিষদের সভ্য বাড়াবার জন্যে প্রবন্ধ লিখতে বসেছি। বিভিন্ন নাট্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এতদিন যুক্ত থাকায় যেসব মজার ঘটনা চোখে পড়েছে তাই পরিবেশন করার চেষ্টা করছি মাত্র।

সখের নাট্য সংঘ গড়ে ওঠে খুব সহজে। মনে করুন রমেশদের বাড়ীতে বিয়ে, ওর কাকা মামারা ঠিক করলেন 'বৌভাতে' একটা থিয়েটার করতে হবে। এ-ব্যাপারে প্রধান উৎসাহী ধরুন রমেশের কাকা। ভদ্রলোক কলেজে পড়ার সময় অভিনয় করে মেডেল পেয়েছিলেন,—তাই অনেকদিন বাদে এই সুযোগ পেয়ে তিনি মেতে উঠেছেন, ঘনঘন চাণক্যের পার্ট আউড়ে রমেশ ও তার বন্ধুদের একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েছেন।

'বৌভাতে'র অভিনয় হয়ে যাবার পর নাটুকে ভূত চেপে বসল রমেশের ঘাড়ে। রমেশ কলেজের অভিনয়ে পুরুষ চরিত্র না পেয়ে 'ফিমেল' পার্টই করতে সুরু করে। সরস্বতী পূজোয় পাড়ায় মঞ্চ বেঁধে ঐতিহাসিক নাটক করে। এহেন রমেশ যদি পাড়ার লোক ও আত্মীয়স্বজনের কাছে উৎসাহ পায় তাহলে চাকুরীতে ঢোকবার পরও অভিনয় করার নেশা তার কাটবে কি? ফলে বেশ ঘটা করেই পাড়ায় নাট্য পরিষদ গড়ে ওঠে। রমেশ হলো সেক্রেটারী, ওর কাকা পরিচালকমণ্ডলীর একজন, নামজাদা কেউ প্রেসিডেন্ট—যাঁকে ডাকলেই পাওয়া যায়। পাড়ার মধ্যে যিনি অবস্থাপন্ন তিনি 'ট্রেজারার', কারণ দরকারে-অদরকারে তাঁর কাছে টাকা চাওয়া যায়, রমেশের বন্ধুরা হলো সাধারণ সভ্য—তারা অভিনয় করে এবং তা' লোক ধরে এনে দেখায়।

নাটক চয়ন ঃ

ধরুন এই পরিষদ ঠিক করেছে পূজোর আগে কোন নাটক মঞ্চস্থ করবে। কিন্তু কি নাটক করবে তাই হলো বড় প্রশ্ন। রমেশের কাকা বললেন—"নাটক করতে হয় তো 'আলমগীর' কিংবা 'সাজাহান'। কি দরদ দিয়েই না লেখা! আজকালকার নাটকে আছে কি? না আছে ক্লাইম্যাক্স না আছে এ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স—আর তেমনি ডায়ালগ, সিন পড়লেও হাততালি পড়ে না!" রমেশের দল এতে সায় দেয় না, তারা বলে, "ও সব হলো যাত্রা, নাটক করতে হয় তো বিধায়ক কিংবা শচীন সেনগুপ্ত!" প্রমোদ ইংরাজী অনার্সের ছাত্র—সে বলে "ইবসেনের নাটক বাংলায় অনুবাদ করে অভিনয় করা যাক!"

এই নাটক বাছাই করতে গিয়েই পরিষদের মধ্যে প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়। অনেকসময় এই অবস্থাতেই পরিষদ পাল-চাপা পড়ে যায়। ধরুন রমেশরা বুদ্ধিমান, শেষ পর্য্যন্ত তারা ঠিক করলে শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' অভিনয় করবে।

শিল্পী চয়ন ঃ

নাটক যদিও বা বাছাই করা গেল, অভিনেতা বেছে নেওয়া আরও শক্ত ব্যাপার। রমেশের কাকা বয়স্ক ও খুবই উৎসাহী। কাজেই তিনি যে রাসবিহারীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন তাতে আর সন্দেহ কি? রমেশ নিজে সেক্রেটারী, সে মুখে পার্ট করতে না চাইলেও অন্য সভ্যেরা বোঝে রমেশ নিজে অভিনয় না করলে ওর উৎসাহ যাবে কমে, তাই রমেশ হলো 'বিলাস'। আর যে ছেলেটি সত্যিই ভালো অভিনয় করতে পারে তাকে সাজানো হলো 'দয়াল,' কারণ তার আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়। 'নরেনে'র পার্ট সে করছে যে হয় টাকা দিয়ে না হয় টিকিট বিক্রী করে কিংবা বাড়ীতে রিহার্সালের [illegible] দিয়ে পরিষদকে সাহায্য করেছে। তাছাড়া

ছোটখাটো যা পার্ট থাকে তা' অবশ্য চুলচিরে বিচার করে দেওয়া হয়, কার কতটা অভিনয় করার শক্তি তাই দেখে।

এ তো গেলো পুরুষ-চরিত্রের কথা, তারপর রয়েছে নারী-চরিত্র! মনে করুন রমেশরা অতি-আধুনিক—তাই ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে অভিনয় করাতে নারাজ। অথচ অভিনয় করার মতো মেয়ে পাওয়াও সহজ নয়। রমেশরা পাড়ার মিসেস অমুকের কাছে গেলো, তিনি প্রায়ই 'চ্যারিটী' শো করিয়ে থাকেন, তিনি বললেন, "নাচের মেয়ে চাও এনে দিতে পারি, কিন্তু 'এ্যাক্টিং' করতে তো কেউ চাইবে না।" সুরু হলো চেনা-অচেনা, ষ্টেজে-নামা, না-নামা মেয়েদের অনুরোধ করার পালা। মিশনারী কলেজে পড়া কুমারী অমুক বললেন—"অভিনয় আমি করতে পারি যদি গাড়ী করে আনানো ও পৌঁছোনোর ভার নেন।" বলাই বাহুল্য রিহার্সাল যদি শ্যামবাজারে হয় তো তাঁর বাড়ী বালিগঞ্জে। রমেশদের বরাৎ ভালো দিশী কলেজে থার্ডইয়ারে পড়া একটি মেয়েকে পেয়েছে—যে রিহার্সালে রোজ আসে এবং অভিনয় শেখারও চেষ্টা করে। অগত্যা তাকেই বিজয়া সাজানো হয়। কিন্তু তার চলা-ফেরা, চেহারা এবং সবকিছুই 'বিজয়া'র মত নয় 'পরাজিতা'র মত। কিন্তু কোন উপায়ই নেই। মিশনারী কলেজে পড়া যে মেয়েটিকে হয়ত 'বিজয়া'র পার্টে মানাতো, তাকেই দিতে হয় 'নলিনী'র ভূমিকা, কারণ সে কম আসে,—যদিও নলিনী চরিত্রে সে সম্পূর্ণ বেমানান। আরও বিপদ হলো 'দয়াল'-এর স্ত্রীকে নিয়ে। রমেশের বন্ধুর মা যেচে এই পার্ট করতে রাজী হয়েছেন, এসব বিষয়ে তিনি খুব উৎসাহী, ফলে তাঁর বদলে অন্য কাউকে নেওয়া গেল না, যদিও সমস্ত গম্ভীর পার্টটা তিনি হাস্যমুখর করে তুললেন। ধরুন এমন করেও 'রিহার্সাল' চললো!

পরিচালনা ঃ

এবার পরিচালনার পালা। অনেক পরিষদে পরিচালকের বালাই নেই। অভিনেতারা স্ব-স্ব প্রধান। যিনি নায়ক-ভূমিকায় পার্ট করছেন তিনি হয়ত শিশির ঢং-এ অভিনয় করেন। আরেকজন আগাগোড়া অহীন-বাবুর নকল করে গেলেন। যে যার ইচ্ছামত গলা কাঁপিয়ে এবং অঙ্গভঙ্গী করে নাটকটি মাটি করে দেন। কিন্তু রমেশরা বুদ্ধিমান, তার কাকাই এই পরিষদের পরিচালক। ফলে 'রাসবিহারী' থেকে সুরু করে 'নলিনী', 'পরেশ' পর্য্যন্ত একই ধরণের পার্ট করে গেল কারণ রমেশের কাকা পুরোনো যুগের ঐ একটি ধরণের অভিনয়ের সঙ্গেই পরিচিত। সুযোগ পেলেই 'বিজয়া' গলা চড়ায়—সংগে সংগেই নরেন গলা চাড়ায়। 'পরেশ'ও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়—আর এক পর্দ্দা গলা চড়িয়েই সে বলে—"যাঠান, সেই বাবুকে তো পালাম না!"

যে পরিষদ আরও বুদ্ধিমান তারা দু'চারজন পরিচালক আনে ভিন্ন ভিন্ন দিনে, ফলে অভিনেতারা কেউ থেই পায় না কার নির্দ্দেশ মেনে চলবে। সুতরাং মঞ্চে তারা অভিনয়ের খিচুড়ি তৈরী করে দর্শকদের উপহার দেয়।

মহড়া ঃ

রিহার্সাল যেদিন সাতটায় সুরু হবার কথা, সেদিন সুরু হয় আটটার পর, যেদিন নরেন আসে না, সেদিন বিজয়া এসে উপস্থিত হন ঠিক সময়েই। যেদিন নলিনীকে না হলে চলবে না সেদিন তাঁর বান্ধবীর বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ থাকে। যেদিন পরিচালক মশাই না এলেই সুবিধা, সেদিন তিনি নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই এসে হাঁকডাক সুরু করেন। যেদিন নরেন কথা দেয় গাড়ী করে নলিনী ও বিজয়াকে তুলে আনবে, সেদিন রিহার্সাল সুরু হবার পনেরো মিনিট আগে সে জানায় গাড়ী পাঠাতে সে পারবে না। পরিচালকমশাই রাগতে সুরু করেন,—রমেশ তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি করেই তাদের আনতে ছোটে; কিন্তু গাড়ী আসতে দেরী দেখে 'বিজয়া' গেছেন ছবি দেখতে এবং নলিনী বেরিয়ে এসে সাজানো ছুতোয় মাপ চাইলেন—তাঁর বাড়ীতে অতিথি এসেছেন। যেদিন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে বলে খাবার আনানো হয় না সেদিনই 'রিহার্সাল' চলে সবচেয়ে বেশীক্ষণ। উপদেষ্টামণ্ডলীরও দু'একজন

অযাচিতভাবে এসে বেশ বিজ্ঞের মত উপদেশ দিয়ে যান—"এতক্ষণ রিহার্সাল চললে খাবার ব্যবস্থা করা উচিত।" আর যেদিন খাবারের সুচারু বন্দোবস্ত থাকে,—সেদিন 'সিনেমা' দেখতে যাওয়ার তাড়ায় কিংবা কাজের অজুহাতে বেশীরভাগ সদস্যই চলে যান। পড়ে থাকেন তাঁরা—যাঁদের জন্যে খাবার-ব্যবস্থা না করলেও চল'ত—অর্থাৎ রিহার্সাল হলে যাঁরা ভীড় বাড়াতেই শুধু আসেন!

যন্ত্র-সংগীত ঃ

ভাগ্যিস রমেশরা 'বিজয়া' নাটকের অভিনয় করছে, এর বদলে কোন সঙ্গীত-মুখর নাটক হলে অনেক অসুবিধা ছিল। রমেশ হয়ত একদল সখের বাজিয়ে ধরে আনতে পারতো যাঁরা টাকা নেবেন না,—কিন্তু 'রিহার্সালে' তাঁরা একদিনও একসঙ্গে আসতেন না। ফলে নাচগান চলতো একদিকে, বাদ্যযন্ত্র আরেকদিকে। অথচ, সে কথার উল্লেখ করলেই অভিমান। কারণ তাঁরা তো পেশাদার নন!

মনে করুন, রমেশের কাকা যদি এতে সন্তুষ্ট না হয়ে, রীতিমতো টাকা দিয়ে একদল বাজিয়ে নিয়ে আসতেন, তাতেও মুস্কিল আসান হতো না। তাঁরা নিজেদের সুবিধেমতো বাঁধা ঘণ্টা ধরে রিহার্সাল দিয়ে যাবেন, কিন্তু ঐ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে নৃত্যশিল্পী এবং শিক্ষকদের পাওয়া একরকম দুরূহ ব্যাপার। এই যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য যন্ত্র-সঙ্গীতের ব্যবস্থা করেও তা' মনের মতন হয় না। দর্শকরা বলে: মিলছে নারে নাচ আর 'মিউজিক'—দু'মুখো চলেছে।

তাছাড়া এফেক্ট মিউজিক সবসময়ে দেরীতে চলে। ষ্টেজে যখন ঝড় সুরু হয়েছে, তখনও বাদকরা করুণ 'পূরবী' রাগে আলাপ করেন, তারপর হঠাৎ আলো কাঁপছে দেখে ঝড়ের বাজনা বাজাতে সুরু করেন। বলা বাহুল্য ষ্টেজে তখন ঝড় থেমে গেছে। নাচের মেয়েরা ঢোকার আগেই নাচের বাজনা বেজে ওঠে, আবার এমনও হয় মেয়েরা ষ্টেজে দাঁড়িয়ে আছে অথচ কোন বাজনা নেই। এসব গোলমাল হয় কম রিহার্সালের জন্যেই। সংগীত পরিচালককে সে কথা জানালে বলেন, "কিছু ভাববেন না

মশাই, 'শো'র দিন ষ্টেজে ঠিক মেরে দেবো। 'রিহার্সালে' কি আসবার সময় পাই? ফিল্ম-এর স্যুটিং আছে, রেকর্ডের 'টেক' আছে, তাছাড়া খুচরো বায়না।"

ষ্টেজ রিহার্সাল ঃ

এই দিন হয় সবচেয়ে মজা। কারণ রমেশের কাকা এতদিন অনেকগুলো ব্যাপার তুলে রেখেছিলেন, ষ্টেজ রিহার্সালে দেখিয়ে দেবেন বলে। অথচ ষ্টেজ-রিহার্সালের জন্যে মঞ্চ একদিনের বেশী পাওয়া যায় না। অতএব কি কি দেখা হবে, মাইক ফিট করছে কিনা, সময় মত আলো জ্বলছে কিনা, যন্ত্র-সংগীত মিলছে কিনা, অভিনেতারা ঠিক সময়ে ঢুকছে ও বেরোচ্ছে কিনা, সেটিং ঠিক সময়ে বদলাচ্ছে কিনা, সবকিছু দেখার সময় থাকেনা। সেই কারণেই সাধারণ রিহার্সালের থেকে ষ্টেজ রিহার্সাল বরাবরই খারাপ হয়। উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্য থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের সকলেরই মন খারাপ হয়ে যায়,—বলেন: "নাঃ, লোক হাসবে দেখছি!"

প্রচার ঃ

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবকিছুই রমেশকে করতে হয়। কারণ এইসব দলে আর যাঁরা থাকেন, তাঁরা নড়তে বললে নড়েন কিন্তু নিজে থেকে নড়ে বসেন না। তাই রমেশকেই পোষ্টার ছাপিয়ে চারদিকে মারার ব্যবস্থা করতে হয়, কাগজে 'চ্যারিটী শো'র দোহাই দিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপাতে হয় এবং অভিনয়ের পর কাগজে প্রশংসার জন্তে তদ্বির করতেও হয়। রমেশের স্কুলের এক সহপাঠী বুঝি কোন্ এক পত্রিকার রিপোর্টার। রমেশ অতিকষ্টে তাকে খুঁজে বার করেছে, এতদিন বাদে পুরোনো সৌহার্দ্য ফিরিয়ে এনেছে, হামেশা চা-বিস্কুট খাইয়েছে—অতএব ওর বন্ধুর পত্রিকায় ওর যে সুখ্যাতি বেরোবে তাতে আর বিচিত্র কি? রমেশ কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত হয় নি, কোন এক নামজাদা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককে অভিনয় রজনীর সভাপতি করেছে, অতএব তাঁর দৌলতে যে কাগজের প্রেস ফোটোগ্রাফার আসবে তা' সুনিশ্চিত। আর পরের দিন কাগজে এই অভিনয়ের বিবরণ পড়ে লোকে বলবে, "বেশ ভালো নাটক হয়েছিলো। তা না হলে কাগজে এতখানি লেখে?"

টিকিট বিক্রী ঃ

সকলের চেয়ে বড়ো চিন্তা এই টিকিট বিক্রীর। রমেশকে রিহার্সালের সময়টুকু ছাড়া সবসময়েই দৌড়াদৌড়ি করতে হয় টিকিট কেনার এবং টিকিট বিক্রীর লোক খুঁজতে। ইনসিওরেন্সের দালালের চেয়েও ভয়াবহ এই টিকিট বিক্রেতা। লোকে দেখলেই পালিয়ে যায়, গোড়াতেই নানান কাজের বায়না ধরে। যাঁরা নতুন জামাই, কিংবা ভাগনের মামা, কিংবা যাঁরা জামাই খুঁজছেন, কিংবা যাঁদের অনেক টাকা, (বলা বাহুল্য তাঁরা নাটক বোঝেন না) তাঁরাই শুধু হাসিমুখে টিকিট কেনেন এবং বিক্রী করে দেবারও প্রতিশ্রুতি দেন। তবে পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে এ্যাটর্নী ব্যারিষ্টারের সংখ্যা বেশী হলে তাঁদের মক্কেলরা অনেকেই টিকিট কেনেন,—নাটকের উন্নতির জন্তে নয়, মামলায় তাঁদের কাছ থেকে সু-পরামর্শ লাভের আশায়। নামজাদা কোন ডাক্তার দলে থাকলে তাঁর রোগীরা অনেকেই টিকিট কেনেন। অবশ্য রমেশের মতে এই ব্যাপারে 'ইনকাম ট্যাক্স' অফিসারকে দিয়েই কাজ পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশী। পনেরো-কুড়ি টাকার টিকিট পর্য্যন্ত তাঁরা সহজেই গছিয়ে দিতে পারেন। রমেশ বলে, "মুস্কিল হলো কম দামের টিকিট নিয়েই। দু'তিন টাকার টিকিট তো আর 'পুশ-সেল' করা যায় না।" সেজন্য রমেশ প্রত্যেকবার নীচু-দামের সীটে 'কমপ্লিমেন্টারী' টিকিট দিয়েই ভরিয়ে দেয়। 'বক্স-অফিসের' যে ক'টা টিকিট থাকে তা' রমেশকেই নিজের লোক পাঠিয়ে কিনে আনতে হয় হাউসের কাছে প্রেসটিজ রাখার জন্তে। সবকিছু বুঝেও রমেশ বেশ গর্ব্ব করেই বলে, "কটা নাট্য-প্রতিষ্ঠান 'হাউস ফুল' করতে পারে? আমাদের এই 'শো'-র সত্যকার পাবলিক ডিমাণ্ড আছে, তাই না এত ভীড়!"

প্রোগ্রাম ঃ

রমেশরা অবশ্য প্রোগ্রামের বই অল্প করেই ছাপায়। কিন্তু যাঁদের আরও বেশী 'সোর্স' (source) রয়েছে, তাঁরা হাজার দু'হাজার টাকার বিজ্ঞাপন জোগাড় করেন, —তাই থেকেই ছাপার খরচাটা পুরো উঠে আসে। বিজ্ঞাপনদাতাদের বলা হয় যে দু'হাজার কপি ছাপানো হবে, আসলে অবশ্য ছাপানো হয় পাঁচশো। 'শো'-র দিন নাটক আরম্ভ হয়ে যাবার বেশ কিছুক্ষণ পরে খানকতক প্রোগ্রাম এসে পৌঁছয়। কালি তার তখনও শুকোয়নি, হাত দিলেই ধেবড়ে যায়। ইণ্টারভ্যালে 'শ'-খানেক বিক্রী হয়,—কিছু দেওয়া হয় শিল্পীদের, বাকী পড়ে থাকে সংঘের অফিসে, আর কিছু থাকে প্রেসে,—যা শেষ পর্য্যন্ত আসে না এবং পরে সের দরে বিক্রী হয়ে চানাচুরওয়ালার হাতে এসে পড়ে। প্রোগ্রামে রমেশ কিংবা রমেশের কাকার নাম ছাপানো হয় বারছয়েক। অথচ যিনি আলোক-সম্পাত করছেন বা সেটিং করছেন, তাঁদের নামের উল্লেখই থাকে না। অবশ্য তাঁরা মুখে বলেন, "তাতে কি হয়েছে, তাতে কি হয়েছে!" কিন্তু পরের বারে আর আসেন না! আর সারা প্রোগ্রামে এত বানান ভুল থাকে যে পড়ার আর ইচ্ছেই হয় না! যাঁর ওপর প্রোগ্রাম ছাপাবার ভার থাকে, তিনি বলেন: "কি করবো এত তাড়াতাড়িতে!" ভাবটা: যা হয়েছে তা' যথেষ্টই হয়েছে।

অভিনয় রজনী ঃ

যাদের সম্বন্ধে রমেশের কাকা এতদিন ভাববার সুযোগ পান নি, আজ তাদের নিয়েই পড়তে হয়।

(১) আলোকসম্পাত ঃ

তিনি প্রদ্যোৎকে ধরে-করে আলো ফেলাতে রাজী করেছেন। বেচারা লাইটের রিহার্সাল কোনোদিন পুরো দেখেনি! কিন্তু রমেশের কাকা ছাড়বার পাত্রই নন। বেশ করে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। হাতে একটা স্ক্রিপ্টও ধরিয়েও দিয়েছেন। পাশে জায়গায় জায়গায় লেখা: লাল, নীল, হলদে, সবুজ। প্রদ্যোৎ ভরসা করে আলো ফেলতে সুরু করে। যেখানে রাত্রির অন্ধকার সেখানে দিনের মতো আলো ফুটে ওঠে। রমেশের কাকা চীৎকার করে ওঠেন "আলো নেভাও, আলো নেভাও"। প্রদ্যোৎ ভড়কে গিয়ে সবই 'ব্ল্যাক-আউট' করে দেয়। আবার চীৎকার ওঠে "স্পট্, স্পট্"। প্রদ্যোৎ স্পট্ ফেলে কিন্তু ষ্টেজে কাউকেই খুঁজে পায় না। ষ্টেজে আলো ঘুরতে থাকে। বিজয়ার স্পটের সঙ্গেই ষ্টেজে ঢোকার কথা। সে বেচারী আলো না পেয়ে ষ্টেজে ঢুকতে পারে না। রমেশের কাকা তাকে একরকম ঠেলেই ষ্টেজে ঢুকিয়ে দেন —"ঢুকে পড়ো বেশ ভালই হচ্ছে"। বিজয়া বুদ্ধিমতী, আলোর পেছনে অল্প ঘুরেই সে চেয়ারে বসে পড়ে। প্রদ্যোৎ লোক খুঁজে পেয়ে আলো আর নেভায় না! বেচারী নরেনেরও ঐ একই দুর্গতি! অন্ধকারের মধ্যেই ঢুকতে হয়। তার এতদিনের রিহার্সাল-দেওয়া এক্সপ্রেসন দর্শকদের দেখাতে না পেরে তার মন খিঁচড়ে যায়, ফলে যেখানে আস্তে কথা বলার প্রয়োজন সেখানে সে জোরে চেঁচিয়ে কথা বলে, যেখানে জোরে বলার দরকার সেখানে এত আস্তে সংলাপ বলে যে তা' দুরধিগম্য হ'য়ে ওঠে। বিজয়া কিন্তু এতে এতটুকু ঘাবড়ে না গিয়ে ঠিক যেমনটি বলার প্রয়োজন তেমনই বলে। দর্শকরা বলেন "বিজয়ার অভিনয় নরেনের চাইতে ঢের ভালো।" বেচারী নরেন! —স্রেফ্ লাইটিং এফেক্টেই যে প্রদ্যোৎ তার পার্ট একেবারে মাটি করে দিয়েছে তা' কে বিশ্বাস করবে!

(২) সেটিং

রমেশের ইচ্ছে ছিলো এবার নিজেরাই সেটিং তৈরী করবে। কিন্তু তার কাকা বিচক্ষণ লোক, হিসেব করে দেখিয়ে দিলেন যে এতে প্রায় ৫০০৲ টাকা খরচ, তার-ওপর উপদেষ্টামণ্ডলীর বিধুবাবু শান্তিনিকেতনফেরৎ, বললেন: সেটিং-এর কোন দরকার নেই। অভিনয় ভালো হলে শুধু কালো পর্দার সামনে করলেও কিছু যায় আসে না। অগত্যা রমেশ রূপসজ্জার দোকান থেকে সেট ভাড়া করে আনে। ফলে বিজয়ার আধুনিক ঘরে মুঘল আমলের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন দেখা যায়। কারণ

এই সেটটি কোন ঐতিহাসিক নাটকের জন্তেই তৈরী হয়েছিলো এখন সেটি সামাজিক নাটকেই লেগে যায়। এতেও রক্ষে নেই, বৃদ্ধ দয়াল হলেন প্রাচীনপন্থী কিন্তু তাঁর বাড়ী কলকাতার সৌখীন সম্প্রদায়ের মতই দেখায়। রমেশের কাকা কিন্তু এতেও অবিচলিত। বলেন তিনি : 'এখন তো আর সেট বদলানো যায় না, যা হয়েছে এই যথেষ্ট।'

(৩) মেক-আপ :

কার যে কিরকম মেক-আপ হবে তা' ভাববার সময় আর এতদিন ছিল কোথায়? নরেনের অনেকদিনের যত্নের গোঁফ-জোড়া তো আর সে এক রাত্তিরের সখের থিয়েটারের জন্তে কামাতে পারে না। বিজয়াকে কালো রঙ-এর শাড়ী পড়লে খুব ভালো মানায়। কাজেই অন্য শাড়ী সে পড়বে কেন? আবার দয়ালের গোঁফ্ আর দাড়ি লাগালেই কেমন যেন সুড়সুড় করে ও হাসি পায়। অথচ তা' না লাগিয়েও উপায় নেই!

পেশাদার 'মেক-আপ ম্যান' আসতে দেরী করে ফেলেছে। তার ওপর মাটির সরা, তেল-জল, সেপটিপিন, তখনও সব জোগাড় হয় নি। ফলে তাকে হাত চালাতে হয় খুব তাড়াতাড়ি। কে বুড়ো, কে যুবা, কে প্রৌঢ়, কে ভৃত্য তা জেনে নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে চটপট রঙ লাগিয়ে দেয়। বলাই বাহুল্য নাটকের চরিত্রের সঙ্গে তাদের কোনই মিল থাকে না। শুধুমাত্র রাসবিহারী আর দয়াল ছাড়া, কেননা তাঁদের 'মেক-আপ' সাদা গোঁফ্-দাড়িতেই মানিয়ে যায়।

(৪) প্রম্পটিং :

রমেশের কাকা এতদিন পর্য্যন্ত কোন প্রম্পটার নিয়োগ করতে পারেন নি। রিহার্সালের সময় যখন যার কোন পার্ট থাকতো না সেই তখন প্রম্পট্ করতো। নাটকাভিনয়ের দিনে অবশ্য তিনি তাঁর এক বন্ধুকে ধরে আনেন। ছোটবেলায় তিনিও নাকি ভালো অভিনয় করতেন। অভিনয় সুরু হোল। অভিনয়ের সুবিধের জন্তে নাটকের অনেক অংশই বাদ দেওয়া হয়েছিলো। নতুন প্রম্পটার তা' বুঝতে না পেরে আগাগোড়াই পড়ে গেলেন। নরেন প্রথমটা একটু থমকে গিয়েছিলো। পরে অবশ্য বানিয়ে দুদার সংলাপ বলে গেল। এদিকে বিজয়া ঘামতে সুরু করে। এমন সময় রাসবিহারী ঢুকে পড়ে কোনরকমে বাঁচিয়ে দেন সে দৃশ্য। যেখানে থেমে থেমে প্রম্পট্ করার কথা ভদ্রলোক সেখানে এত দ্রুত বলতে থাকেন যা অনুসরণ করা খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে, আর যেখানে দ্রুত বলার প্রয়োজন সেখানে এত দেরীতে বলেন যে অভিনেতার সংলাপ মাঝপথে থেমেই যায়! মাঝে মাঝে আবার এত জোড়ে প্রম্পট্ করতে থাকেন যে সম্মুখভাগের সিট থেকে দর্শকরা চেঁচিয়ে ওঠেন : 'আস্তে প্রম্পট্'।

এইভাবে প্রম্পট্ করেই নাটকের সমাপ্তি ঘটে। অভিনয়ের পর মৃদু হেসে রমেশের কাকাকে প্রম্পটার জিগ্যেস করেন : 'কেমন হোল?' ভাবটা : নাটক যদি ভালো হয়ে থাকে তো সে শুধু তাঁরই জন্তে।

(৫) ষ্টেজ-ম্যানেজমেণ্ট :

ষ্টেজ-ম্যানেজারের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তা' বুঝতে পেরেও রমেশ কাউকেই রাজী করাতে পারে না।

এ, ভি, এম-এর 'লেড়কী' চিত্রে নৃত্যপটীয়সী অভিনেত্রী বৈজয়ন্তীমালা

শেষকালে অনেক খোশামোদ করে দরকার হলে বকেও রাজী করানো হলো দয়ালের পার্ট যিনি করছেন তাঁকে। সাদা গোঁফ-দাড়ি লাগানো দয়াল চেয়ার-টেবিল নিয়ে ছোটাছুটি করছেন। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে যে দু'জন ছোকরা ছিলো তাদের মধ্যে একজন তার গেষ্ট আসবে বলে গেটের কাছে চলে গেছে। আর একজনের কোন্ সিনে কি দরকার আছে না আছে কিছুই জানা নেই। তাই 'লক্ষ্মণের ফল ধরার মতো' হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়েই সে দাঁড়িয়ে থাকে। যখন বিজয়ার খাবার থালা নিয়ে ঢোকার কথা তখন খোঁজাখুঁজি করেও খাবার থালা পাওয়া যায় না। এদিকে রমেশের কাকা চেঁচাতে থাকেন। 'দয়াল' বেগতিক দেখে 'মেক-আপ-ম্যানের' মাটির থালাতেই খানকয়েক জিলিপি আর সন্দেশ এনে (যা অভিনয়ের পর বিভিন্ন শিল্পীদের খাবার জন্যে আনানো হয়েছিলো) বিজয়ার হাতে দেন। বিজয়ার কিন্তু সংলাপ মুখস্ত। সে পোজ ক'রে দরদ দেখিয়ে নরেনকে বলে: 'আপনাকে এই সামান্য ফলটুকু খেয়ে যেতেই হবে।' দোতলার দর্শকদের মধ্যে হাসির গুঞ্জন-ধ্বনি ওঠে। নরেন ভড়কে যায়। তারও ফলের ওপরই সংলাপ ছিলো। কাজেই কোন্ কথাটা বাদ দিয়ে কি-ভাবে সুরু করবে ভেবে পায় না। প্রম্পটার কিন্তু একটি লাইনও বাদ দিচ্ছেন না। বরং না বলা হলে একই লাইন দু'বার করে আবৃত্তি করছেন।

কয়েকটি দৃশ্যের পর আরও মুশকিল হয়। মঞ্চে অভিনয় করতে করতে দয়ালের মনে পড়ে যে নলিনীর বই আর নরেনের চিঠি টেবিল-এর ওপর রাখা হয় নি। তাই অনেকক্ষণ উসখুস করে শেষকালে তিনি তাঁর স্ত্রীকেই বলে ফেলেন যে 'দ্যাখো নলিনীর বই কাগজগুলো দেখছি না, ভেতর থেকে নিয়ে এসো তো!' স্ত্রী মেধাবী, ব্যাপার বুঝে ভেতরে চলে যান। কিন্তু দয়াল বই আর কাগজ-গুলো কোথায় যে গুছিয়ে রেখে গেছেন তা' কেউই বলতে পারে না। তাই স্ত্রী মঞ্চে ফিরে এসে দয়ালকে বললেন: 'আমি তো পেলাম না, তা' এবার তুমিই একবার দ্যাখো।'

এবার দয়াল ভেতরে গেলেন। দর্শকরা ভেবে পান না এমনকি এক দরকারী ব্যাপার যার জন্যে ষ্টেজে হুলু-স্থূল পড়ে গেছে। অবশ্য অভিনয় শেষে সকলেই দয়ালকে বাহবা দিয়ে বললেন: 'খুব ষ্টেজ ম্যানেজ করেছেন স্যার। এতটুকু ভুলচুক হয় নি।' দয়াল অম্লান-বদনে একটু মুচকি হেসে জবাব দেন: 'হেঁ, হেঁ, একাই সব দিক দেখা, যাহোক কোন রকমে…'

বাহবা ঃ

নাটক শেষ হবার পর কাকারা, মামারা, মাসীরা, বন্ধু-বান্ধবীরা একগাল হেসে বাহবা দিয়ে গেলেন। শিল্পীরা তা' আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। রমেশের কাকা একটু গর্বিত হলেন, মনে মনে ভাবটা এই: এ আর এমন কি! এর চেয়ে অনেক ভালোই তিনি করতে পারতেন। তবে না হয়েছে—বেশ হয়েছে।

দর্শকদের মধ্যে যাঁরা আত্মীয় শ্রেণীভুক্ত নন, তাঁরা মুখ বেঁকালেন: মিছিমিছি সময় নষ্ট, কি সব যা-তা ক'রে করে!

এদিকে প্রেসিডেন্টের কাগজে 'শো' রিপিট করার জন্য অনুরোধ করেছে। লেখা অবশ্য রমেশেরই। রমেশের বন্ধু এদিকে তাঁর কাগজে নাটক না দেখেই লিখেছেন:

'…ইতিপূর্ব্বে সৌখিন সম্প্রদায়ে এই-রূপ চিত্তাকর্ষক নাটক আর অভিনীত হয় নাই।'

—পাড়ায় পুজোর সময় এ নাটকটি পুনরভিনয়ও করতে বলায় রমেশ মৃদু হাসে। ভাবটা এই: এসব নাটক কি পাড়ার সাধারণ লোকদের জন্যে? বড় থিয়েটার-হলে সাধারণের জন্যেই করা একমাত্র সম্ভব—সেই সাধারণ যারা সত্যিকারের নাটক বোঝে।

কাণ্ডি-নাচের দেশে

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

মাদ্রাজ থেকে বিমানে চলেছি সিংহলে। সে দেশটার কত রঙিন স্বপ্নই না মনে জাগছে। ভৌগলিক বিশেষত্বের কথা ছেড়ে দিয়ে সেখানকার সংস্কৃতিগত সম্পদের কথাই ভেবে চলেছি। রামায়ণের সেই লঙ্কা, রাবণের দুর্মতি দিয়ে যার পরিচয়, তার কথা মনে স্থান পেলেও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তার কোনও সুস্পষ্ট লক্ষণ এখন দেখতে পাবো কিনা তাই নিয়ে মনে সন্দেহ জাগছে। চিন্তার বিরাম নেই। নীচে সমুদ্রের ঘন কৃষ্ণ জলরাশি এবং তারই পাশে ভারতের ধূসর সীমারেখা একটানা চলেছে। দেখতে দেখতে মন ঝিমিয়ে আসে। খানিকটা যাওয়ার পর দেখলাম ধূসর সীমারেখার আর কোন চিহ্ন নেই। চারিদিকে কেবল জল আর জল। বুঝলাম বিমানখানি এখন সাগর পাড়ি দিচ্ছে। একটু পরেই দেখা গেলো সিংহলের সূচ্যগ্র স্থলভাগ। ফালির মতো নানা আকারে সমুদ্রের জল স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করেছে, যেন তুলিতে আঁকা নীলের রেখা!

একটু পরেই গিয়ে নামলাম সিংহলের প্রথম বিমানঘাঁটিতে, নাম তার জাফ্‌না। চারিদিকে দেখি সবুজের এক অদ্ভুত সমারোহ। বেশিরভাগই নারকেল গাছ। সবুজের চেতনায় যেন তারা ভরপুর। দেশটার প্রতি আগ্রহ প্রথম দর্শনেই অনুভব করলাম, যদিও তখন পর্যন্ত সিংহলীদের সঙ্গে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য পরিচয় ঘটেনি। বিমানে তেলগ্রহণের কাজ সমাধা হলে আবার উড়লাম আকাশে। এইবার এল শেষ গন্তব্যস্থল —কলম্বো!

শহর থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে এই বিমানঘাঁটি। বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নিয়ে বিমান কোম্পানীর গাড়ীতেই রওনা হলাম শহরে। সোজা রাস্তা, সমুদ্রের ধার বরাবর চলেছে। দেখার আগ্রহে কোন কৃত্রিমতা প্রকাশ পেয়েছিল কিনা জানিনা। সহযাত্রীদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথায় যাবো। কলম্বোতে আগমনের উদ্দেশ্য এবং অবস্থানের সঠিক বিবরণ সংক্ষেপে বলে আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম রাস্তার দিকে। একটু পরেই বিমান কোম্পানীর গাড়ি ত্যাগ করে কলম্বোর পথে পা বাড়ালাম। আগাম ব্যবস্থা অনুযায়ী আস্তানা সংগ্রহের ব্যাপারটা সমাধা করে লোকজনদের সঙ্গে আলাপ জমাবার কাজে লেগে গেলাম।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে স্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টি দিয়ে সিংহলের দৈনন্দিন জীবন বুঝতে গেলে ভুল হবে। কারণ, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্য্যায়ের মাঝখান দিয়ে এই ক্ষুদ্র দ্বীপটির যে-সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠেছে তাতে ভারতের ছোঁয়াচ পুরোমাত্রায় আছে বলে পণ্ডিতমহলে সমর্থিতও হয়েছে। সংস্কৃতির অভিব্যক্তি হিসেবে সঙ্গীত ও নৃত্যের কাঠামোতেও এই যোগসূত্রের সন্ধান তাঁরাই দিয়েছেন। কিন্তু সিংহলীরা এবিষয়ের প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না এবং সেইজন্যেই মনে হয় ভারত ও সিংহলের মধ্যে একটা শিথিল মনোভাব গড়ে উঠেছে। এই বিষয় নিয়ে কলম্বোর অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি। তাঁরা সকলেই সিংহলের একক সত্তার প্রতি এতই আস্থাবান যে সঙ্গীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার পক্ষেই মত পোষণ করেন। কিন্তু ইতিহাসের দপ্তর খুঁজলে দেখা যায় যে বৌদ্ধযুগে এবং দাক্ষিণাত্যের চোলারাজ্যের অভ্যুত্থানের পর ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে সিংহলীদের যোগাযোগ বেশ কায়েমি আকারেই চলছে। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের নৃত্যপদ্ধতি যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিংহলকেও উদ্বুদ্ধ করে তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়।

একাদশ শতাব্দীতে যে সিংহল দক্ষিণ ভারতের চোলারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেকথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। অবশ্য এ-পরাধীনতার গ্লানি তাকে বেশিদিন সহ্য করতে হয়নি। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সিংহল আবার স্বাধীনতা ফিরে পায়। কিন্তু তার পরও বহুবার দক্ষিণ ভারতের তামিলবাসীদের আক্রমণে সিংহলী

সিংহল বিজয়ে সমর্থ হলেও তার গণ্ডি সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জাতীয় সংস্কৃতির ভিত তখন যেসব এলাকার বাইরে অধিকতর দুর্গম, পার্ব্বত্য অঞ্চলে রচিত হয়। কাণ্ডি সেই ধরণেরই একটি প্রদেশ, যেখানে সিংহলী রাজারা ভারতীয় পরাক্রমের চাপে ক্রমশঃ পিছনে হটে এসে শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়ার সুযোগ পান। কাণ্ডিই ছিল তখনকার দিনের রাজনীতি ও সংস্কৃতিগত জীবনের কেন্দ্রভূমি। যে নৃত্যের কথা ওপরে উল্লেখ করেছি তার সঙ্গে এ-স্থানটির নামের সাদৃশ্য আছে বলেই সিংহলীদের বিশ্বাস যে, 'কাণ্ডি নৃত্যে' ভারতীয় প্রেরণার কোনও স্থান নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নৃত্যের মধ্যে এ-কথার সমর্থন পাওয়া যায় না। কারণ আমার মনে হয় রামায়ণ প্রমুখ ভারতীয় মহাকাব্য এবং বীর রসাত্মক অপরাপর কাহিনীর আশ্রয় নিয়েই 'কাণ্ডি নৃত্যে'র বিষয়বস্তু রচিত হয়েছে।

কাণ্ডি নৃত্যের সাজপরিহিত দু'জন বিশিষ্ট শিল্পী ফটো : লেখক

রাজাদের বিব্রত হতে হয়েছে। এইভাবে ক্রমবর্দ্ধমান যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তাঁদের ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত এমন অবস্থা এসে পড়ে যে ভারতীয় তামিলীয়দের কাছে পরাভূত হয়ে দক্ষিণপ্রান্তের অনেক এলাকা ছেড়ে দিতে হয়। এইসব ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের উপপাদ্য বিষয়গুলির সঙ্গে সিংহলের পরিচয় বহুদিন থেকেই আছে। কলম্বোতে গিয়ে কাণ্ডি নৃত্য দেখে এই কথাই বারবার মনে হয়েছে। কিন্তু ওখানকার ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা অন্যরূপ। তাঁরা বলেন, ভারত বহুবার

যে-ঘটনার তাগিদে আমার কলম্বোতে যাওয়া, তার সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন না থাকলেও এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সেই সময়ে এক আন্তর্জ্জাতিক অনুষ্ঠান বাবদ বহু দেশের বহু লোক সেখানে জমায়েৎ হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সিংহল সরকারের আমন্ত্রণেই

তাঁরা উক্ত বিশ্বসমাবেশে যোগ দেন। আমন্ত্রিতদের চিত্তবিনোদনের জন্যে সরকারের পক্ষ থেকে যেসব ব্যবস্থা করা হয় তার মধ্যে ছিল 'কাণ্ডি নৃত্য'।

একবার নয়, বহুবার এই নৃত্যের আসরে দর্শক হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং পর্য্যায়ক্রমে বহু-বার নাচ দেখে তা হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগও আমার হয়েছে। অবসর সময়ে ওখানকার অনুরাগী মহলের সঙ্গে আলোচনাও করেছি বহুবার। তাঁরা বলেন, সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সিংহলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক হচ্ছে 'লো-কান্ট্রি'—মানে, সমুদ্রের উপকূলবর্তী এলাকা এবং অপরটি হচ্ছে "আপ-কান্ট্রি"—মানে, অপেক্ষাকৃত ভেতরের পাহাড়ী অঞ্চল। 'কাণ্ডি নাচ'কে তাঁরা আপ্-কান্ট্রির দান হিসেবেই ধরেন। লো-কান্ট্রি থেকেও বহু নাচের উদ্ভব হয়েছে বটে কিন্তু তাঁদের মতে সেসব নাচ তেমন উঁচু দরের নয়। পদমর্য্যাদা হিসেবে সেসব নাচ 'কাণ্ডি নাচে'র সমকক্ষ হওয়ার স্পর্দ্ধা রাখে না। পার্থক্যটা হৃদয়ঙ্গম করার আগে নাচ দেখা প্রয়োজন মনে করলাম।

নাচের আসর। স্থান—কলম্বোর বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া পার্ক। চারিদিকে ঘন সবুজ গাছের সারি। মাঝখানে উঁচু, প্রশস্ত বেদী। পেছনে অর্দ্ধভগ্ন আকারের ইষ্টকগাঁথুনি। বেশ বোঝা যায় যে, ইচ্ছে করেই এই ধরণের পশ্চাদ্ভাগ তৈরী করা হয়েছে—সম্ভবতঃ প্রাচীন আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াস নিয়ে। মাঝখানে একটিমাত্র দরজা এবং তার ভেতর দিয়ে এসে শিল্পীরা মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন। তখনও বেশ দিনের আলো রয়েছে। সামনে একটা আসন সংগ্রহ করে বসলাম। আশেপাশে বক্র-দৃষ্টি দিতেই দেখি এক কোণে ইংলণ্ডের বিখ্যাত স্থাপত্য-শিল্পী মিশা ব্ল্যাক, খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে আছেন। বুঝলাম, নাচের স্কেচ্ আঁকবার বাসনা তাঁর মনে জেগেছে।

নাচ সুরু হলো। মাইক্রোফোনের সামনে সঙ্গীত-শিল্পীরা এসে দাঁড়ালেন। তার মধ্যে একজন কণ্ঠশিল্পী,

একজন মৃদঙ্গবাদক এবং আর একজন খঞ্জিয়ার তাল রক্ষা করেন। একটু পরেই নৃত্যশিল্পীর আবির্ভাব। মাথায় মুকুটের মতো অজস্র খোদাইয়ের কাজসম্বলিত শিরভূষণ। বস্তুটি বিরাট আকারের এবং বোঝা গেল তা পরিধান করার ব্যাপারে শিল্পীকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। বক্ষ জুড়ে পুঁতির কাজ করা নেকলেস। হাতে বালা এবং কটিতে মেখলা। বাহ্যিকদৃষ্টিতে শিরভূষণ, বালা ও মেখলা সোনার মনে হলো। কিন্তু স্বর্ণ-লঙ্কার স্বর্ণসম্পদের প্রসিদ্ধি যাই থাকুক না কেন, সেগুলো যে সোনার নয় তা তাদের আয়তন দেখেই বোঝা গেলো। খুব সম্ভব পেতলকে মেঝে-ঘষে সোনার মতো করা হয়েছে, কিম্বা হয়তো গিল্টিকরা বস্তু। সে যাই হোক, আভরণের দিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। শিল্পীরা সব ক্ষেত্রেই খালি গা। কেবল পরিধানে গুচ্ছাকারে বিলম্বিত শুভ্র বস্ত্র।

সঙ্গীতশিল্পীদের এক-একবার গানের পর খণ্ডাকারে নৃত্যের অবতারণাই দেখলাম কাণ্ডি নাচের রীতি। একথা অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, গানের ভাবধারার সঙ্গে সংশ্রব রেখেই নৃত্যের প্রবর্ত্তন করা হয়। নাচে এ-ধরণের সাঙ্গিতিক প্রয়োগ ভারতের কথাকলি নাচেও দেখা যায়। মালাবারের এই নৃত্যপদ্ধতিতেও শ্রুতি-ধরের মতো একজন গান গেয়ে যান এবং নৃত্যশিল্পী তারই নৃত্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন আঙ্গিক ও মুদ্রার সহায়তায়। কাণ্ডি নৃত্যেও এই ধারার সমর্থন লক্ষ্য করে মনে মনে আশ্বস্ত হলাম। গানের তাৎপর্য্য অবশ্য বুঝতে পারলাম না, কারণ সেগুলি সবই সিংহলী ভাষায় রচিত। কিন্তু নাচের মাধ্যমে যতটা প্রকাশ পেলো তাতে বুঝতে বাকি রইলো না যে রাক্ষস-বিষয়ক কোনও কাহিনীর অবতারণা করা হচ্ছে। বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং তদনুরূপ অঙ্গসঞ্চালন মৃদঙ্গের বোলের সঙ্গে যেন কাহিনীকে স্বচ্ছ করে তুলেছে।

কাণ্ডি নাচ মূলতঃ পুরুষেরই নাচ। নারী-চরিত্রের রূপায়ণ পুরুষেরাই করে থাকেন। খানিকটা দেখার পর মনে মনে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে, আঙ্গিকের ব্যাপারে কাণ্ডি নাচ বলিষ্ঠ ধারারই পক্ষপাতী। নৃত্যকালীন ঋজু দেহ হস্ত ও পদক্ষেপের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রেখে চলে যে, পূর্ব্বোক্ত বীররসাত্মক চরিত্রের রূপায়ণে তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। একথা বললে ভুল হবে না যে বীরত্ব ব্যঞ্জনাই কাণ্ডি নাচের মৌলিক বিশেষত্ব।

ভারতীয় ধারার সঙ্গে সংশ্রবের প্রসঙ্গে একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে ভারতীয় নাট্যে যেমন বর্ণই হচ্ছে নৃত্যের প্রাণ, সেইরূপ কাণ্ডি নাচে ভান্নাম্ হচ্ছে নৃত্যের প্রধান সংস্থা। নৃত্যের মৌলিক বিশেষত্বকে এইভাবে একই পর্য্যায়ে টেনে আনার উদ্দেশ্য হলো উভয় দেশে যে এই বিশেষত্ব এক সে কথার সমর্থন বর্ণ ও ভান্নাম্ থেকে পাওয়া যায়। মোট ১৮ প্রকার ভান্নামের কথা শুনলাম। প্রত্যেক ভান্নামের ছন্দ, মন্ত্র ও জাতি বিধিবদ্ধ আছে। ভান্নামগুলির পার্থক্য গানের বিষয়বস্তুর ওপর গড়া এবং তাতে পৌরাণিক যুগের ছাপ পাওয়া যায়। যেমন গণপতি ভান্না হচ্ছে গণেশ-বিষয়ক বিবরণ; সুরপতি ভান্না হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রের সীতাকে ফিরে পাওয়ার পর উচ্ছ্বাসের প্রাণবন্ত রূপ। পৌরাণিক কাহিনী ছাড়া উন্মুক্ত ধরণেরও বহু ভান্নাম প্রচলিত আছে, কিন্তু সেগুলির সম্ভবদ্ধ আলোচনা একটি প্রবন্ধে সম্ভব নয়। হস্ত, পদ ও অঙ্গের প্রয়োগ ব্যাপারেও বহু বিধিবদ্ধ ধারার প্রচলন কাণ্ডি নাচে লক্ষ্য করলাম এবং সেইজন্যই এই নৃত্য-পদ্ধতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে কোনও সংশয় নেই।

কাণ্ডির সকল শ্রেণীর নাচই যে পুরুষ-প্রকৃতির সেকথা বলা চলে না। কারণ সেখানকার এক শ্রেণীর নাচ আছে, যার নাম 'পেরাহারা' এবং যা আগস্ট মাসের এক বিশেষ উৎসবের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মহিলারা অংশ গ্রহণ করেন। প্রথমে এই নাচ সিংহলের গজবাহু নামে এক রাজা কর্ত্তৃক ভারতীয় চোলাদের আক্রমণ পর্য্যুদস্ত হওয়ার ব্যাপারে আনন্দোল্লাস হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বর্ত্তমানে মন্দির নৃত্যের আকারে সিংহলের প্রধান বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে তার ব্যবহার দেখা যায়।

কাণ্ডি নৃত্য প্রভাবিত "লো কান্ট্রি"র জাগলার নাচের একটি দৃশ্য। এই নাচে থালা ঘূর্ণায়মান অবস্থায় শিল্পীরা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচে প্রবৃত্ত হন। ফটো : লেখক

'পেরাহারা' উৎসবের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রার সঙ্গে থাকে নর্ত্তকীর দল। কক্ষে শূন্য কলসী নিয়ে তাদের লীলায়িত সরস গতি মনোমুগ্ধকর।

কিন্তু কাণ্ডি নাচের আদি ও অকৃত্রিম ধারার মধ্যে এ-নাচের স্থান বিশেষ আছে বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক বিপ্লবসূচক অবস্থার মধ্যে যেসব আর্টের জন্ম হয়, তার নিয়মতান্ত্রিক ধারায় খানিকটা উদার মনোভাবের প্রয়োগ দেখা যায়। এ-ব্যাপার যে শুধু সিংহলেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। প্রায় সকল দেশেই তার কিছু না কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কাণ্ডি নাচের আদি রূপ ভারতীয় ধারার মতোই নিয়মতান্ত্রিক এবং তা শিক্ষা করার জন্য যথেষ্ট সংযমের ও সময়ের প্রয়োজন হয়। কাণ্ডি নাচের খোলা আবহাওয়ায় পরিবেশনের রীতি দাক্ষিণাত্যের অনেক নাচে প্রচলিত আছে। এবিষয়ে তামিল প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও ভেবে দেখা উচিত যে উক্ত তামিল প্রভাব ধারণ করেও যে পার্থক্য কাণ্ডি নাচে গড়ে উঠেছে তা বড় কম কথা নয়।

ভারতে এ-নাচ খুব কমই সংঘটিত হয়। অথচ কলম্বোতে দেখলাম আমাদের দক্ষিণ ভারতীয় ভারত-নাট্যমের যথেষ্ট প্রচলন আছে। পার্শ্ববর্ত্তী দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় অনেক ক্ষেত্রে বন্ধুর মতো কাজ করে। একাজে অগ্রণী হয়ে এখন আমাদের উচিত দুই দেশের সংস্কৃতিগত সম্পদের ক্ষেত্রে একটা পারস্পরিক সমন্বয় সৃষ্টি করা। নৃত্যশিল্পীরা এবিষয়ে অবহিত হলে সুফলের আশা আছে।

ভারতের সঙ্গীত-সাধক

রত্নবণিক

★

ভারতবর্ষ সঙ্গীত-সাধনার দেশ। এ-দেশের সঙ্গীত-ক্ষেত্রে বহু গুণী ও জ্ঞানীর সমাবেশ হয়েছে। কোনো প্রদেশ-বিশেষে এই সঙ্গীত-সাধনা সীমাবদ্ধ নয়,—এ-সঙ্গীত পরিব্যাপ্ত সারা ভারতবর্ষে। আমরা এখানে বর্তমান-কালের কয়েকজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-শিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করছি, পাঠক-সাধারণের কৌতূহল মেটাতে।

ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন

উত্তর-প্রদেশের রামপুরে ওস্তাদ মুস্তাক হোসেনের জন্ম। তাঁর বয়স এখন প্রায় ৭২ বছর। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের পুরোধা হিসেবে গতবছর তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। মুস্তাক হোসেন সেহাশ্বানের স্বর্গত ওস্তাদ ইনায়েৎ হোসেন খানের কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা করেন। ইনায়েৎ খানের সঙ্গীত-গুরু ছিলেন সুবিখ্যাত সঙ্গীত-সাধক ওস্তাদ হড্ডু খান। গোয়ালিয়র-ঘরানা ও খেয়াল গানের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী মুস্তাক হোসেন। তিনি 'টপ্পা' ও 'তারানা'-ও গেয়ে থাকেন। এ-সব ছাড়া, তিনি নিজেই বহু সঙ্গীত-পদ্ধতির সৃষ্টি করেছেন।

চেম্বাই বৈদ্যনাথ ভাগবতার

কর্ণাটিক-সঙ্গীত-সাধকগণের মধ্যে যাঁরা বর্তমান, চেম্বাই বৈদ্যনাথ ভাগবতার তাঁদের অগ্রণী। এক সঙ্গীত-সাধক-পরিবারে বৈদ্যনাথের জন্ম। তাঁর এক পূর্বপুরুষ, গণচক্রতনা সুবিবয়ার ছিলেন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী। বৈদ্যনাথের পিতা চেম্বাই অনন্ত আয়ারও ছিলেন একজন বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ও বেহালা-বাদক। পূর্বপুরুষদের সঙ্গীত-সাধনার বহু সুকৃতি লাভ করেছেন বৈদ্যনাথ। দশবছর বয়সেই তিনি একজন সুকণ্ঠ-গায়ক। তেরো-বছর বয়সে তিনি যখন প্রথম সঙ্গীতের আসরে নামেন তখনই বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন। ষোলবছর বয়সে তিনি 'সঙ্গীত-বিদ্বান' উপাধিতে ভূষিত হন এবং বার্ষিক ত্যাগরাজ-উৎসবে যোগ দেন। বৈদ্যনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ সুস্বর। বর্তমানে ছাপান্ন-বছর বয়সে পদার্পণ ক'রেও তিনি সেই একই স্বরের অধিকারী। স্বর-নিক্ষেপে তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চেম্বাই বৈদ্যনাথ মাদ্রাজ সঙ্গীত-মহাবিদ্যালয়ের একজন 'সঙ্গীত-কলানিধি'।

পণ্ডিত কৃষ্ণরাও শঙ্কর পণ্ডিত

ষাট বছর আগে গোয়ালিয়রে পণ্ডিত কৃষ্ণরাও শঙ্করের জন্ম। তিনি সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-সাধক গায়নাচার্য পণ্ডিত শঙ্কররাও পণ্ডিতের পুত্র। শঙ্কররাও ছিলেন ওস্তাদ নিসার হোসেন খান, ওস্তাদ হড্ডু খান ও ওস্তাদ নাথু খানের ছাত্র। কৃষ্ণরাও তাঁর পিতা শঙ্কররাও-এর কাছেই সঙ্গীতানুশীলন করেন। ফলে, বিখ্যাত গোয়ালিয়র 'ঘরানা'র তিনি একজন শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। 'খেয়াল' গানের একজন বিখ্যাত শিল্পী হিসেবে তিনি গোয়ালিয়র দরবারের অন্যতম সভা-সঙ্গীতকার নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি গোয়ালিয়রের 'শঙ্কর গান্ধর্ব বিদ্যালয়ে'র অধ্যক্ষ।

ওস্তাদ সাদিক আলি খান

বংশ-পরম্পরায় বীণা-বাদনে বিশেষ অভিজ্ঞ এক পরিবারে ওস্তাদ সাদিক আলী খানের জন্ম। খাণ্ডররাণী ধ্রুপদ সঙ্গীতে এই পরিবারের ছিল ঘরানা বৈশিষ্ট্য। সাদিক আলীর পিতা ওস্তাদ মুশারফ আলী 'বীণা-বিশারদ' এই বংশের অন্যতম প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী ছিলেন। দশবছর বয়সেই সাদিক আলী তাঁর পিতার কাছে নিয়মিতভাবে বীণাবাদন ও ধ্রুপদ গানের শিক্ষা আরম্ভ করেন। পনেরো

বছর ধ'রে চলে তাঁর সঙ্গীত সাধনা। ওস্তাদ সাদিক কাথিয়াবাড়ে, মালব ও আলোয়ার রাজ্যে রাজ-বীণকার ছিলেন; পরে, তিনি জামনগর সঙ্গীত-মহাবিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ সাল থেকে তিনি রামপুরের নবাব সাহেবের রাজবীণকারের পদে নিযুক্ত আছেন।

অধ্যাপক দ্বারম্ ভেংকটস্বামী নাইডু

১৮৯৩ সালে বাঙ্গালোরে অধ্যাপক দ্বারম্ ভেংকটস্বামী নাইডুর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে একজন অফিসার ছিলেন। দ্বারম্ একজন প্রখ্যাতনামা বেহালাবাদক। পিতা ও ভ্রাতার বেহালাবাদনের কৃতিত্ব দেখে তাঁরও বাসনা জাগে বেহালা শেখবার। ভাইয়ের কাছেই তাঁর বেহালা বাদনে হাতেখড়ি। ক্রমশঃ তিনি একজন সুদক্ষ বেহালা-বাদকরূপে জনসমক্ষে পরিচিত হন। দ্বারম্ ভেংকটস্বামী ১৯১৯ সালে ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজার সঙ্গীত-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ সালে তিনি ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদেও উন্নীত হয়েছিলেন। ভেংকটস্বামীর সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। কর্ণাটিক-সঙ্গীতে তাঁর বিশেষ বিশেষ অবদান ছাড়াও, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সুগভীর। পাশ্চাত্য-সঙ্গীতেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ আছে। ভারতীয় সঙ্গীতের রূপায়ণে বেহালা কতদূর সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হ'তে পারে অধ্যাপক দ্বারম্ ভেংকটস্বামীর বেহালাবাদন—তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সত্যযুক্ত 'নিষ্কৃতি' চিত্রে মলিনা দেবী

হীরাবাঈ বরোদেকার

ভারতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতবিদ্যায় যে সকল মহিলা-শিল্পী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন হীরাবাঈ বরোদেকার তাঁদের অন্যতমা। অতি শৈশবে বোম্বাইতে হীরাবাঈয়ের সঙ্গীত-চর্চ্চা শুরু হয়। স্বর্গত ওস্তাদ আব্‌দুল ওআহিদ্ খাঁ ছিলেন তাঁর সঙ্গীত-গুরু। 'কিরাণা ঘরানা' পদ্ধতিতে হীরাবাঈকে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা দেন। রাগ বিস্তারের বিশিষ্ট ভঙ্গী এবং বিলম্বিত খেয়ালের রূপায়ণের জন্য এই ঘরানা বিখ্যাত। এছাড়া, তারানা, ঠুংরী ও লঘু-মারাঠী ইত্যাদি বিভিন্ন সঙ্গীত প্রণালীতেও হীরাবাঈ বিশেষ পারদর্শিনী।

ওস্তাদ নিসার হোসেন

স্বর্গত ওস্তাদ ফিদা হোসেনের পুত্র ওস্তাদ নিসার হোসেন। পিতার কাছেই পুত্রের সঙ্গীত-চর্চা শুরু হয়। ফিদা হোসেন ছিলেন রামপুর দরবারের রাজ-সঙ্গীতকার। বিশিষ্ট সঙ্গীত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ওস্তাদ নিসার হোসেনের সঙ্গীত-সংগ্রহে প্রাচীন সঙ্গীত-মনীষীদের কয়েকটি অপ্রচলিত রাগ অন্তর্ভুক্ত। নিসার হোসেন একজন প্রখ্যাতনামা খেয়াল-গায়ক। তাঁর 'গমক', 'বোলতান' ও 'সর্‌গম্'-এর রূপায়ণ-সাবলীলতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য, তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব 'তারানা'-য়। দ্রুত লয়ে 'তারানা'-র অভিব্যক্তিতে নিসার হোসেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী একথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।

মুসিরি সুব্রহ্মণ্য আয়ার

মুসিরি সুব্রহ্মণ্য আয়ার বর্তমানে মাদ্রাজের কেন্দ্রীয় কর্ণাটিক সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। প্রথম জীবনে তিনি মাদ্রাজ সরকারের মহাকরণে নিযুক্ত ছিলেন।

কিন্তু, নাটকীয়-পরিস্থিতিতে তিনি একদিন সরকারী কাজে ইস্তি ক'রে সঙ্গীত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। মুসিরি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ ক'রে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতকে জনপ্রিয় ক'রে তোলার কাজে বিশেষভাবে ব্রতী হন। যাঁরা কর্ণাটিক-সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত নন তাঁদের মধ্যে ব'সেও তিনি দক্ষিণ-ভারতের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের প্রচার ক'রে এসেছেন। মুসিরির কণ্ঠস্বরই তাঁর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। তাঁর কণ্ঠস্বরে সানুনাসিক আভাসও মাধুর্যমণ্ডিত। তাঁর সঙ্গীতের যে শ্রুতি সাধারণতঃ খুব অল্প গায়কেরই তা আছে। এই দুই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি সঙ্গীতানুষ্ঠানে চমৎকারিতা সৃষ্টি করতে সক্ষম।

ওস্তাদ বিলায়েত হোসেন খাঁ

আগ্রা-ঘরানার অন্তর্ভুক্ত এক প্রতিভাসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ওস্তাদ বিলায়েত হোসেন খাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা বিখ্যাত ওস্তাদ নাথান খাঁ ছিলেন স্বর্গত ভাস্কর বুয়ার শিক্ষাগুরু। বিলায়েত হোসেনের দুই ভাইও—মহম্মদ খাঁ ও আবদুল্লা খাঁ—প্রতিভাবান সঙ্গীত-শিল্পী। তাছাড়া, আগ্রা-ঘরানার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁও তাঁর নিকট-আত্মীয় ছিলেন। ওস্তাদ বিলায়েত হোসেন তাঁর 'বোলতান' রূপায়ণের বৈশিষ্ট্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আমাদের দেশে যে কয়েকজন খেয়াল-গায়ক সাবলীল উৎকর্ষে আলাপ, ধ্রুপদ ও ধামার গেয়ে থাকেন তিনি তাঁদের অন্যতম। ওস্তাদ বিলায়েত হোসেন লক্ষ্ণৌ বরোদা ও ক'লকাতার কয়েকটি সঙ্গীত-সম্মেলনে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। বেনারস সঙ্গীত-সম্মেলনে তাঁকে 'সঙ্গীত-রত্নাকর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ

ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত শিব-পুর গ্রামে এঁর জন্ম। সঙ্গীতচর্চা তাঁর সুরু হয়েছিল মাত্র আট বছর বয়সে ঢাকার চন্দ্রকান্ত আচার্য্যের যাত্রাদলের হ'য়ে বেহালা-বাদক হিসেবে। সেই সামান্য কাজে তৃপ্তি

লাভ করতে না পেরে তিনি চলে আসেন ক'লকাতায়। নানান্ জায়গায় সঙ্গীত শেখার সুযোগ লাভে অসমর্থ হ'য়ে শেষ পর্য্যন্ত জুটলেন ষ্টার থিয়েটারে—পদ তাঁর সেই বেহালা-বাদকেরই। তাঁর বয়েসও তখন ১৫।১৬ বছর। এই সময় মুক্তাগাছার জমিদার জগৎকিশোরবাবুর দৃষ্টি পড়লো এঁর ওপর। জমিদারের যাত্রাদলে আরও বেশী পারিশ্রমিক পেয়ে আলাউদ্দিন খাঁ সযত্নে কাজ করতে লাগলেন। জগৎকিশোরবাবুর বাঁধা বাজিয়ে ছিলেন আহম্মদ আলি খাঁ। ইনি আলাউদ্দিনের বাজনা শুনে হাতের বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করলেন। আলাউদ্দিন একদিন ওস্তাদজীর ছ'ঘন্টা ধরে স্বরোদে 'টোড়ী'র আলাপ শুনে মুগ্ধ হলেন। সঙ্গে সঙ্গেই থিয়েটার ছেড়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। সেই যে সঙ্গীত-সাধনা সুরু হ'ল ভবিষ্যতে তা থেকে যে 'ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জন্ম হলো সারা ভারতে স্বরোদ-বাজিয়ে হিসেবে তার তুলনা মেলা ভার। পরে লক্ষ্ণৌ-এর রাজা হোসেন খাঁ'র রাজদরবারের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রশিল্পী ওস্তাদ উজীর খাঁ'র শিষ্যত্ব নিয়ে স্বরোদ শিখলেন। বাজনায় হাত পাকিয়ে চল্লিশ বছর বয়সে ক'লকাতার 'ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে স্বরোদ বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন আর সেইসঙ্গে আকৃষ্ট হলেন মাইহারের রাজা বাহাদুর শ্রীব্রজনাথ সিং। তিনি আলাউদ্দীনকে রাজদরবারের সঙ্গীতশিল্পী নিযুক্ত করলেন। এর পর ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনি যেসব উপাধি পেয়েছিলেন তার তালিকা এই—সঙ্গীত সম্রাট, সেতার-ই-হিন্দ; উপদেবতা, সঙ্গীত নায়ক; সঙ্গীতাচারী; ডক্টর অব্ মিউজিক এবং ওস্তাদ।

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর

কাঠিয়াওয়াড়ে এঁর জন্ম। এঁর পিতা পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর পূজা-অর্চনা নিয়েই থাকতেন। ছোটবেলা থেকেই ওঙ্কারনাথের মনেও সেই ধার্ম্মিক ভাবের বীজ উপ্ত হয়েছিল। তারই প্রকাশ দেখা যায় তাঁর ভজন-সঙ্গীতের সাধনার মধ্য দিয়ে। মাত্র বারো বছর যখন তাঁর বয়েস সেই সময় পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো ঐ বালকের সঙ্গীতচর্চার প্রতি, অবিচল নিষ্ঠা এবং কণ্ঠমাধুর্য দেখে। বেশ কয়েক বছর তাঁর কাছে সঙ্গীত-সাধনা চললো। মাত্র বিশ বছর বয়সেই ওঙ্কারনাথ লাহোরের গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেছিলেন। ধর্ম্মভাব এবং ভক্তিরসই তাঁর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি সাধারণতঃ ভজন আর খেয়াল গানই গেয়ে থাকেন। তাঁর গাওয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল গলার কাজে—স্বরের উত্থান-পতনে। তাঁর সঙ্গীত-পরিবেশনের সঙ্গে বহু সাধারণ শ্রোতাও পরিচিত আছেন—বেতার এবং গ্রামোফোন রেকর্ড মারফৎ। তাঁর গাওয়া কয়েকটি গান যেমন 'যোগী মৎ যা', 'ম্যয় নহি মাখন খায়ো' শ্রোতাদের কাছে বিশেষ পরিচিত। সম্প্রতি তিনি আফগানিস্থানের রাজার কাছ থেকে পুরস্কৃতও হয়েছেন।

প্রফেসার শান্তাপ্রসাদ

তবলা-বাজনায় ঐতিহ্যধারী বারাণসীর বিখ্যাত মিশ্র-বংশে শান্তাপ্রসাদের জন্ম। এমন একটি বংশের ছেলে যে তবলা-বাজনার প্রতি আকৃষ্ট হবেন এ আর নতুন কিছু নয়। মাত্র সাত বছর বয়েস থেকেই বাজনার চর্চা শুরু করে দিলেন। প্রফেসর শান্তাপ্রসাদের অপর নাম গোদাই মহারাজ। শান্তাপ্রসাদ যখন চর্চা করতেন তখন দৈনিক চৌদ্দ ঘণ্টা ক'রে তবলা বাজাতেন। যতরকম তাল আছে তার অধিকাংশই ইনি আয়ত্ত করে নিয়েছেন এবং তাঁর বাজনার গুণে তা বেশ সুমিষ্টই হয়। গান বা যন্ত্রসঙ্গীত ছাড়াও নৃত্যের সঙ্গেও তিনি তবলা সঙ্গৎ করেন এবং তা সমান শ্রুতিমধুর হয়। শুধু তবলাই নয় বাঁয়ার কাজের দিকেও তাঁর সমান দৃষ্টি থাকে।

পণ্ডিত গোবিন্দরাও দেশরাও বুরহানপুরকার

পণ্ডিত গোবিন্দরাও ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজ-বাদক। তাঁর বয়স এখন প্রায় ৭৪। মাত্র আট বছর বয়সের সময় তিনি সঙ্গীত-শিক্ষা শুরু করেন। বারো বছরের ওপর তিনি বিখ্যাত পাখোয়াজবিদ্ নানা-সাহেব পাঁসের শিষ্য পণ্ডিত সখারামজীর কাছে পাখোয়াজ বাজনার অনুশীলন করেন। গত ৫০ বছর ধ'রে এই বিখ্যাত পাখোয়াজ-বাদক আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পীদের গানে সঙ্গৎ ক'রে আসছেন। একক বাদক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তাঁর পাখোয়াজ-বাদন অপূর্ব।

সিদ্ধেশ্বরী দেবী

বেনারসের বিখ্যাত এক সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর জন্ম। শৈশবকাল থেকেই তিনি বড় বড় ওস্তাদের সান্নিধ্যে এসেছেন। ফলে, সঙ্গীতের প্রতি তাঁর একটা সহজাত প্রবণতা দেখা যায়। শিবাজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি সঙ্গীতের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। পরে, বেনারসের বড়ে রামদাসজী মহারাজ তাঁকে খেয়াল, তরানা, টপ্পা, ঠুংরী, দাদ্‌রা শেখান। ঠুংরীতেই সিদ্ধেশ্বরী দেবী সবচেয়ে বেশি পারদর্শিতা লাভ করেছেন। লোক-সঙ্গীতেও তাঁর বিশেষ দখল আছে।

রসুলা বাঈ

বেনারসের রসুলা বাঈ বর্তমানে আমাদের দেশের ঠুংরী গায়িকাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা। ঠুংরীর 'পূরব অঙ্গ' রূপায়ণে তাঁর যেন তুলনা নেই। অনুভূতি ও অভিব্যক্তির সমৃদ্ধি হলো তাঁর ভঙ্গীর বিশেষত্ব। ঠুংরীর 'বোল্‌তানে'ও তিনি অনন্যা। ঠুংরী ছাড়া, রসুলা বাঈ টপ্পা ও পূরবী-দাদ্‌রাও গেয়ে থাকেন। তাঁর লোকসঙ্গীতের রূপায়ণও চিত্তাকর্ষক।

ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতবিদ্যায় যে-সকল তরুণ-শিল্পী ইতিমধ্যেই বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ তাঁদের একজন। ১৯২২ সালে তাঁর জন্ম হয়। বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর পিতা। মাত্র তিনবছর বয়সেই আলী আকবর তাঁর পিতার কাছে সঙ্গীত-চর্চা শুরু করেন। শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে তিনি বাল্যকাল থেকেই তাঁর পিতার সঙ্গে কনসার্টে স্বরোদ সঙ্গৎ

করতেন। সতেরো বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত আলী আকবর সাধারণ্যে একক অনুষ্ঠান পরিবেশনের অনুমতি পাননি। আলী আকবর আজ একজন প্রতিষ্ঠাবান স্বরোদ-শিল্পী। আলাপ, জোড়, ঝালা ও গৎ—তিনি সমান দক্ষতায় রূপায়িত ক'রে থাকেন।

ডি, ভি, পালুস্কার

স্বনামধন্য পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পালুস্কারের পুত্র ডি, ভি, পালুসকার। অতি শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। তখন তিনি পিতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র পণ্ডিত বিনায়ক রাও পট্টবর্ধনের কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা করেন। আমাদের দেশের যে-কয়েকজন তরুণ শিল্পী উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন পালুসকার তাঁদেরই একজন। তাঁর বিশেষত্ব হ'লো খেয়াল-শ্রেণীর গানে। ভজন-গানের রূপায়ণেও তিনি বিশেষ দক্ষ।

ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ

ওস্তাদ হাফিজ আলী গোয়ালিয়রের এক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওস্তাদ নান্নে খাঁ ও পিতামহ ওস্তাদ গোলাম আলী খাঁ দু'জনেই বিখ্যাত স্বরোদ-বাদক ছিলেন। ছেলেবেলায় কিছুদিন বাড়ীতে শিক্ষালাভের পর হাফিজ আলী খাঁ প্রথমে বড়ে মহম্মদ হোসেনের কাছে এবং পরে রামপুরের বিখ্যাত ওস্তাদ ওআজীর খাঁর কাছে সঙ্গীতের পাঠ নেন। সঙ্গীত-শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্যে তিনি স্বর্গত ভাইয়া গণপৎ রাও-এর কাছে ঠুংরী পদ্ধতি শিক্ষা করেন। ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ বহুদিন যাবৎ গোয়ালিয়র রাজদরবারে সভা-সঙ্গীত-কাররূপে নিযুক্ত আছেন। সঙ্গীত-পরিবেশনে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গী অনন্যসাধারণ। স্বরোদের মধ্য দিয়ে তিনি যেসব রাগ-রাগিণী প্রকাশ করেন তার আবেদন বিশেষ প্রশংসনীয়।

ওস্তাদ আমীর খাঁ

কলকাতাতে ওস্তাদ আমীর খাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন ইন্দোর রাজদরবারের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার ওস্তাদ শামীর খাঁ। পিতার কাছেই পুত্রের সঙ্গীতশিক্ষা। খেয়াল-গানে ওস্তাদ আমীর খাঁ বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী। রাগ-রাগিণীর ব্যাপক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপায়ণেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

পাল্লাদাম্ সঞ্জীব রাও

কর্ণাটিক-সঙ্গীতের একজন সুদক্ষ বংশীবাদক হলেন পাল্লাদাম্ সঞ্জীব রাও। ভারতীয় বংশীবাদকদের মধ্যে সঞ্জীব রাও একজন প্রথম পর্যায়ের শিল্পী। বংশীবাদনের মধ্য দিয়ে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের রূপায়ণে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর সঙ্গীত-পরিবেশনে কখনও একঘেয়েমির প্রশ্রয় নেই। সত্তর বছর বয়সেও তাঁর সঙ্গীত-পরিবেশন তরুণ-শিল্পীর রূপায়ণের মতই মাধুর্যমণ্ডিত।

ওস্তাদ রহিমউদ্দিন খাঁ

স্বর্গত ওস্তাদ আল্লাবন্দে খাঁ-এর পুত্র এবং স্বর্গত ওস্তাদ জাকিরউদ্দিন খাঁ-এর ভাইপো ওস্তাদ রহিম খাঁ ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত ধ্রুপদ-গায়ক। রহিম খাঁ-এর এক ভাই হলেন সুবিখ্যাত নাসিরউদ্দিন খাঁ। ওস্তাদ রহিমউদ্দিন তাঁর বংশের ঐতিহ্য রক্ষা করেছেন পুরোপুরি ভাবেই। তাঁর রাগ-রূপায়ণ, ঘরানা-বিস্তার ও শ্রুতির দখল বিশেষ প্রশংসনীয়।

ভি. ডোরেস্বামী আয়েঙ্গার

১৯২০-সালে মহীশূরের এক সুপরিচিত সঙ্গীতজ্ঞ-পরিবারে ডোরেস্বামীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার মহীশূর রাজদরবারের বিখ্যাত বীণা-বাদক ছিলেন। পিতার কাছেই ডোরেস্বামী বীণা-বাদনের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তিনি মহীশূরের স্বর্গত ভেঙ্কটগিরি আপ্পার শিক্ষার্থীনেও ছিলেন। ডোরেস্বামী আয়েঙ্গার বর্তমানে মহীশূর রাজদরবারে 'বীণা-বিদ্বান'-রূপে নিযুক্ত আছেন।

ইলিয়াস খাঁ

ওস্তাদ শকাওআৎ খাঁর পুত্র ইলিয়াস খাঁ বর্তমান ভারতের অন্যতম সুদক্ষ সেতার-বাদক। ইলিয়াস খাঁ প্রথম জীবনে তাঁর পিতার শিক্ষাধীনে সঙ্গীতচর্চা সুরু করেন। পরে. তিনি লক্ষ্ণৌ-এর ওস্তাদ ইউসুফ আলী খাঁর কাছে সেতার-শিক্ষার পাঠ নেন। তিনি 'মসিতখানি' ও 'রাজা-খানি' উভয় পদ্ধতিতেই সেতার বাজিয়ে থাকেন। প্রচুর সম্ভাবনা-সম্পন্ন তরুণ ইলিয়াস খাঁ 'গৎকারী'তে বিশেষত্ব লাভ করেছেন।

পণ্ডিত এস্, এন্, রতনঝঙ্কার

পণ্ডিত রতনঝঙ্কার বর্তমানে লক্ষ্ণৌ-এর "মরিস কলেজ অব মিউজিক"-এর অধ্যক্ষ। ইনি একাধারে একজন বিশিষ্ট কণ্ঠসঙ্গীতসাধক ও সঙ্গীত-অধ্যাপক। পণ্ডিত ভি, এন্, ভাতখাণ্ডে ও ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গে সঙ্গীতচর্চা ক'রে তিনি ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

নারায়ণরাও ব্যাস্

১৯০২-সালে কোল্হাপুর রাজ্যে নারায়ণরাও ব্যাস্ জন্মগ্রহণ করেন। দশবছর বয়সেই তিনি স্বর্গত পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পালুসকারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘ বারো বছর পালুসকারের কাছে তাঁকে সঙ্গীতানুশীলন করতে হয়। নারায়ণরাওয়ের সঙ্গীত গোয়ালিয়রের ঘরানা-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। খেয়াল-গায়কীতে তিনি একজন বিশিষ্ট শিল্পী। এছাড়া, তিনি ভজন, হোরী, টপ্পা ও মারাঠী পদ-ও দক্ষতার সঙ্গেই গেয়ে থাকেন।

ওস্তাদ ইউসুফ আলী খাঁ

১৮৭৭-সালে লক্ষ্ণৌতে ওস্তাদ ইউসুফ আলী খাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা স্বর্গত বাহাদুর আলী কলপ্‌পী-ঘরানার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেতার-শিল্পকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করার পূর্বে তিনি আবদুল গনি খাঁ ও মুরওঅৎ খাঁ সাহেব কলপ্‌পীওয়ালের শিক্ষাধীনে প্রায় তেরোবছর সঙ্গীতচর্চা করেন। ওস্তাদ ইউসুফ আলী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের

যন্ত্র-সঙ্গীত-পরীক্ষার পরীক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। আগ্রা, এলাহাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও সীতাপুরের বিভিন্ন সঙ্গীত-সম্মেলনেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন।

দেবকোট্টাই নারায়ণ আয়েঙ্গার

— দক্ষিণ-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীণাবাদক নারায়ণ আয়েঙ্গার যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন—সে-পরিবারের অধিকাংশই ছিলেন সঙ্গীতকার। সর্বপ্রথম তিনি তাঁর জ্যাঠামশায়ের কাছে বীণাবাদনের প্রাথমিক পাঠগুলি নিতে থাকেন, পরে করাইকুড়ি ভাতৃদ্বয়ের কাছেও তিনি সঙ্গীতবিদ্যা অনুশীলন করেন। বর্তমানে নারায়ণ আয়েঙ্গার "সেণ্ট্রাল কলেজ অব কর্ণাটিক মিউজিকে"র অন্যতম অধ্যাপক।

আহমদ্ রেজা খাঁ

সুপ্রসিদ্ধ "বিচিত্রবীণা"-বাদক আহমদ্ রেজা খাঁ দিল্লী বেতারকেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পীবৃন্দের অন্যতম। তাঁর পিতা স্বর্গত ওস্তাদ হাজজু খাঁ (মোরাদাবাদ) সুরবাহার-বাদনে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। আহমদ্ খাঁর শিক্ষাগুরু হলেন পাতিয়ালার সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদ আবদুল আজিজ খাঁ। আহমদ্ খাঁ "বিচিত্রবীণা"-বাদনে আলাপ ও ঠুংরী রীতি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই রূপায়িত ক'রে থাকেন।

ডি, কে, পট্টম্মল

কর্ণাটিক-সঙ্গীতে যে সকল মহিলা-শিল্পী খ্যাতি অর্জন করেছেন শ্রীমতী পট্টম্মল তাঁদের অগ্রগণ্যা। পল্লব শিল্প ও সংস্কৃতির জন্মভূমি কাঞ্চীপুরমে ১৯১৯-সালে পট্টম্মলের জন্ম হয়। পট্টম্মল উত্তরাধিকারসূত্রে সঙ্গীত-চর্চার কোনো সুযোগ-সুবিধাই পাননি। সবই হয়েছে তাঁর নিজের ঐকান্তিক একাগ্রতায় ও নিষ্ঠায়। সমকালীন সঙ্গীতবিদ্দের গান শুনে শুনে তার প্রতিটি রীতি যেন তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছেন। অসাধারণ অধ্যবসায়

ছাড়া এভাবে কারও পক্ষে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করা সহজসাধ্য নয়। পট্টম্মল সুকণ্ঠের অধিকারিণী —তাঁর স্বরমাধুর্য ও ধ্বনিচাতুর্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। সবচেয়ে বড় কথা পট্টম্মলের সঙ্গীতে মুদ্রাদোষ বা কণ্ঠের খামোকা-কসরৎ নেই।

সুমতি মুতাৎকার

১৯১৬-সালে বালঘাটে সুমতি মুতাৎকারের জন্ম। তিনি সঙ্গীতাচার্য পণ্ডিত রতনঝঙ্কারের ছাত্রী। ১৯৪৯-সালে সুমতি দেবী লক্ষ্ণৌ-এর "মরিস কলেজ অব মিউজিক" থেকে সঙ্গীতবিদ্যায় "ডক্টরেট" লাভ করেন। দিল্লী বেতারকেন্দ্রের নিজস্ব শিল্পীবৃন্দের অন্যতমা এই গায়িকা অনন্যসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে আলাপ, ধ্রুপদ ও ধামার গেয়ে থাকেন। তাঁর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'লো-কণ্ঠস্বরের সহজ-স্বচ্ছন্দ গতি।

অধ্যাপক বিষ্ণুগোবিন্দ যোগ

১৯২২-সালে সাঁতারা জেলায় এই তরুণ সঙ্গীত-শিল্পীর জন্ম। সাত বছর বয়সে তিনি পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বরের শিষ্য শ্রীআতাওয়ালের কাছে 'রেওয়াজ' শুরু করেন—তারপর তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা হয় গণপৎ বুয়ার কাছে। বারো বছর বয়সে তিনি কৃষ্ণম্ ভাটের ছাত্র পণ্ডিত ভি, শাস্ত্রীর শিক্ষাধীনে একনিষ্ঠভাবে বেহালাবাদন শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সঙ্গীত-সাধনা সুরু হয় লক্ষ্ণৌ-এর 'মরিস কলেজ অব মিউজিক"-এ। সেখানে শিক্ষকতা করতে গিয়ে তিনি অধ্যক্ষ রতন-ঝঙ্কারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেন। বিষ্ণুগোবিন্দের একক বেহালাবাদন ছাড়াও তিনি বর্তমানকালের সঙ্গীতবিদ্-দের অনেকের সঙ্গেই বেহালা সঙ্গত করেছেন। "বেহালা শিক্ষক" নামে তাঁর একখানি বইও আছে। আলাপ-চারী খেয়াল অঙ্গ ও তদন্তকারী রূপায়ণেই বিষ্ণু-গোবিন্দের আকর্ষণ বেশি। খেয়াল অঙ্গ ও গৎকারীতেও তিনি বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছেন।

বেগম আখতার

এই মহিলা-শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য হ'লো তাঁর ঠুংরী, দাদ্রা ও গজল গানে। সঙ্গীত-পরিবেশনায় 'কান' ও 'মুরকী'র ব্যবহারে তাঁর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। 'পূরব' ও 'পঞ্জাব-অঙ্গ' এই দু'ধরণের সঙ্গীতেই তিনি পারদর্শিনী। তাঁর ঠুংরী এইজন্যই অধিকতর বৈচিত্র্যময়। কিন্তু তাঁর সব-চেয়ে নাম—গজলে। গজল-এর মাধুর্য তাঁর কণ্ঠে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর ব্যাখ্যামূলক অভিব্যঞ্জনায়।

বিসমিল্লা খাঁ

বেনারসের এই শিল্পী ও তাঁর সম্প্রদায় ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সানাই-বাদ্যকার। আলাপ-রচনায় ও মালকোশ রাগিনীর রূপায়ণে বিসমিল্লা খাঁর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। তাছাড়া, তাঁর ঠুংরী রাগ, দেশ, পূর্বী, দাদ্রা ও লোকগীতির সুরে ধুন রূপায়ণও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মান্নারগুডি কে সাবিত্রী আম্মল

দক্ষিণ ভারতের জটিল সঙ্গীতযন্ত্র গোট্টুবাদ্যমে যে কয়জন মহিলা-শিল্পী সুনাম অর্জন করেছেন শ্রীমতী

কেটি বললে, 'অমিট, তুমি জান, এই হীরের আংটি যদি হারি জগতে আমার সান্ত্বনা থাকবে না। এ আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। একমুহূর্ত হাত থেকে খুলিনি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হ'য়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলঙ্‌ পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোয়াতে হবে।'
সিসি বললে, 'বাজি রাখতে গেলে কেন ভাই।'

'শেষের কবিতা' ছবিতে অমিত, কেটি ও সিসিরূপে নবাগত নির্ম্মলকুমার, সাধনা বসু ও বনানী চৌধুরী

এ ভি এম প্রোডাকসন্স-এর অবিলম্বে মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'লেড়কী'
চিত্রে শ্রীমতী বৈজয়ন্তীমালা ও অঞ্জলি দেবী

আম্মল তাঁদের অন্যতমা। তিনি মান্নারগুডির কান্নাকেল বৈথ্যলিঙ্গম্ পিল্লাইয়ের ছাত্রী। তাঁর সঙ্গীত ব্যঞ্জনার একটি অপূর্ব আকর্ষণ হলো—বাজনার সঙ্গে তাঁর নিজের কণ্ঠে সঙ্গীতের সঙ্গৎ-পদ্ধতি।

থিরুবিদামারুদুর সি, এস্, বীরুস্বামী পিল্লাই

ত্রিবাঙ্কুরের এই সঙ্গীতশিল্পী প্রথম জীবনে তাঁর পিতা সুন্দর নয়নাক্কারার-এর কাছে সঙ্গীতাভ্যাস করেন। তিরুচি গোবিন্দস্বামী পিল্লাইয়ের কাছে তিনি শেখেন বেহালা-বাদন। এই গোবিন্দস্বামীই পরে বীরুস্বামীকে নাগস্বরম্ বাজাতে শেখান—প্রায় বছর ছাব্বিশ আগে। 'নাগস্বরম্'-বাদক হিসাবে বীরুস্বামী আজ গুরুর উপযুক্ত শিষ্যত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। 'সানাই'-এর মতই 'নাগস্বরম্'-এর মধ্য দিয়ে বীরুস্বামী যে-ভাবে বিভিন্ন রাগ-রাগিনীকে মূর্ত ক'রে তোলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

রাধিকামোহন মৈত্র

বাংলাদেশের এই স্বরোদশিল্পী আজ সারা ভারতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন—বেতার-মাধ্যমে। এঁদের আদিবাস রাজসাহীতে। ১৯২৯ সালের শেষ দিকে ইনি সঙ্গীত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তাঁর গুরু ছিলেন ওস্তাদ আমীর খাঁ। তারপর তিনি ওস্তাদ দবীর খাঁ-এর কাছে প্রায় ১৪ বছর সঙ্গীতচর্চা করেন। এখনও তিনি দবীর খাঁ-এর সংস্পর্শে আছেন। রাধিকামোহন প্রধানতঃ স্বরোদ শিক্ষা করেন ওস্তাদ

আমীর খাঁ-এর কাছে—আর দবীর খাঁ তাঁকে শিক্ষা দেন ধ্রুপদ, ধামার ও আলাপ। স্বরোদে সাবলীল গতিছন্দ বিস্তারেই রাধিকামোহনের অধিক কৃতিত্ব। কয়েকটি সঙ্গীতসম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি তাঁর স্বরোদ বাদ্যদক্ষতা বিশেষভাবে প্রমাণিত করেছেন।

শ্রীধর পারসেকার

১৯১৯ সালে গোয়া শহরে শ্রীধর পারসেকারের জন্ম হয়। ইনি বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ সঙ্গীতকার। পরশুরাম বুয়া পারসেকার, নাথন খাঁ, লতাফৎ হোসেন প্রভৃতি বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞের কাছে এঁর সঙ্গীতশিক্ষা। বেহালা-বাদক হিসাবেই শ্রীধর সমধিক পরিচিত। শ্রীগজানন যোশীর কাছে ইনি বেহালা শিক্ষা করেন। বেহালার সূক্ষ্মতন্ত্রীতে শ্রীধরের আলাপ ও গৎ বাজনা অনবদ্য।

মুদিকোণ্ডন ভেঙ্কটরমা আয়ার

১৮৯৭ সালে এই সঙ্গীতকারের জন্ম। এঁর পিতা ছিলেন মুদিকোণ্ডন চক্রপাণি আয়ার, বেদরজিয়ম স্বামীনাথ আয়ার, কোনেরিরাজপুরম্ বৈদ্যনাথ আয়ার, তিরুভিঝান্দুর কন্নুস্বামী পিল্লাই এবং সিম্মিঝি সুন্দরম্ আয়ার ছিলেন ভেঙ্কটরমার সঙ্গীতশিক্ষক। কর্ণাটিক-সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী মুদিকোণ্ডন ভেঙ্কটরমা ১৯৫০ সালে মাদ্রাজ সঙ্গীত-মহাবিদ্যালয় কর্তৃক "সঙ্গীত কলানিধি"-উপাধিতে ভূষিত হন। বর্তমানে ইনি মাদ্রাজের "টিচার্স কলেজ অব মিউজিক"-এর উপাধ্যক্ষ।

কৃষ্ণা উদয়ভারকার

তরুণ সঙ্গীতশিল্পীদের অন্যতমা এই মহিলা সঙ্গীতকার খেয়াল ও ঠুংরী গানে বিশেষ পারদর্শিনী। লক্ষ্ণৌ-এর "মরিস কলেজ অব মিউজিক" থেকে তিনি গ্রাজুয়েট হয়েছেন এবং ভারতের বহু সঙ্গীতসম্মেলনে যোগ দিয়ে নিজের সঙ্গীতবিদ্যার প্রকাশ করেছেন। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ-এর ভাইপো ওস্তাদ খাদিম হোসেন, পণ্ডিত মহাদেও

প্রসাদ, পণ্ডিত জগন্নাথ প্রসাদ প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞের কাছেই শ্রীমতী কৃষ্ণার উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিক্ষা।

গজাননরাও যোশী

গুজরাটের এই সঙ্গীতকার গোয়ালিয়র ঘরানার এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী। এঁর পিতা ছিলেন অনন্ত মনোহর যোশী। গজানন রাও এক'দিকে যেমন খ্যাতনামা কণ্ঠসঙ্গীতকার অন্যদিকে তেমনি প্রসিদ্ধ বেহালা-বাদক। প্রথম জীবনে গজানন রাও তাঁর পিতার কাছেই সঙ্গীতশিক্ষার পাঠ নেন; পরে, বিখ্যাত ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ-এর পুত্র ভুর্জী খাঁ-এর কাছে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হয়।

বাসবরাজ রাজগুরু

১৯২০ সালে বাসবরাজের জন্ম। অতি শৈশবেই এঁর সঙ্গীতশিক্ষা শুরু হয়। পিতার মৃত্যুর পর ইনি পঞ্চকৃশারী বুয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বারো বছর তাঁর কাছে ইনি হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটিক সঙ্গীতের চর্চা ক'রে আজ উচ্চপর্যায়ের সঙ্গীতশিল্পীতে পরিণত হয়েছেন। বাসবরাজ পরে সুরেশবাবু মানে, মুবারক আলী, সবাই গান্ধর্ব প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞের কাছেও সঙ্গীতের পাঠ নেন। খেয়াল, ঠুংরী, ভজন ও বচন সঙ্গীতেই বাসবরাজের কৃতিত্ব বেশি।

চিত্তোর সুব্রামানিয়া পিল্লাই

কর্ণাটিক সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক সুব্রামানিয়া পিল্লাই সুবিখ্যাত কাঞ্চীপুরম নয়না পিল্লাই-এর ছাত্র। অপ্রচলিত রাগে "কৃত্তি" ও কম-প্রচলিত তালে জটিল "পল্লবী"র প্রকাশেই সুব্রামানিয়া পিল্লাইয়ের কৃতিত্ব সমধিক। বর্তমানে ইনি আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত "মিউজিক কলেজে"র সঙ্গীত-অধ্যাপক।

প্রকাশ পিকচার্সের ভক্তি ও সঙ্গীতমূলক হিন্দী চিত্রার্ঘ্য 'মহাপ্রভু চৈতন্য'র একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যে শ্রীচৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়া-রূপে ভারতভূষণ ও নবাগতা অমিতা

গণেশ রামচন্দ্র বেহেরে

'বেহেরেবুআ' নামে সমধিক পরিচিত এই প্রবীণ সঙ্গীতকার রত্নগিরি জেলার খুরদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে এঁর বয়স প্রায় ছেষট্টি। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত-রসিক পিতার কাছেই গণেশ রামচন্দ্র সঙ্গীতচর্চার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। প্রথমে ইনি "নাট্যকলা প্রবর্ধক" নাট্যসম্প্রদায়ে যোগ দেন। এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘুরতে [illegible] রামচন্দ্র একদিন শোলাপুরের ওস্তা[illegible] করিম খাঁর গান শোনেন। তারপর, নাট্যসম্প্র[illegible] ক'রে ইনি আব[illegible] করিম খাঁর

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চার বছর করিম খাঁর কাছে এবং আরও কয়েক বছর ওস্তাদ রজব আলী খাঁ ও পণ্ডিত ভাস্করবুয়া ভাকালের কাছে গণেশ রামচন্দ্র উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের সাধনায় রত ছিলেন। খেয়াল-গানেই এঁর সমধিক প্রসিদ্ধি।

রবিশঙ্কর

১৯২০ সালে বারাণসীতে রবিশঙ্করের জন্ম। এঁর আদি নিবাস যশোহর জেলার কালিয়া গ্রামে। এঁর পিতা শ্যামশঙ্করও একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উদয়শঙ্করের কাছে নৃত্যের পাঠ নেওয়াও এঁর বাদ যায়নি। উদয়শঙ্করের সম্প্রদায়ে পরে ইনি ঐক্যতান-সম্প্রদায়ে সেতারও বাজাতেন। অতি ছোট বয়সেই তিনি প্রায় তিরিশ রকমের সঙ্গীত আয়ত্ত করে ফেলেন। সেতার-বাজনা তাঁর প্রধান সঙ্গী হলেও বাঁশী, দিলরুবা এবং হারমোনিয়াম বাজানোতেও তাঁর বেশ পাকা হাত আছে। পরে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র কাছেও বাজনা শিখতে লাগলেন। সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে ইনি কৃতিত্ব প্রকাশের বহু সুযোগ পেয়েছেন। আই-পি-টি-এ'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়া ইম্মরটাল' নৃত্যনাট্য, শ্রীজওহরলাল নেহ্‌রু রচিত 'ডিস্‌কভারী অব্ ইণ্ডিয়া' অবলম্বনে যে নৃত্যনাট্যানুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানে এবং চলচ্চিত্রজগতের সংস্পর্শে এসে 'ধরতী-কে-লাল' এবং 'নীচা নগর' ছবিতে সঙ্গীত-পরিচালক হয়ে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। দিল্লীতে এসে অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র সঙ্গীত পরিচালকের পদেও ইনি কাজ করেছেন। সুরের সাধনা ছাড়া সুরের সৃষ্টিতেও তাঁর দক্ষতা প্রশংসনীয়।*

* এই নিবন্ধ পাঠ ক'রলেই দেখা যাবে ভারতবর্ষের, বিশেষ ক'রে বাংলা দেশের আরও অনেক উচ্চাংগ-সঙ্গীত-শিল্পীর পরিচয় নেই। বারান্তরে আমরা এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা ক'রব—চিত্রবাণী-সম্পাদক)

ছবির গল্প
আর
গল্পের ছবি

★

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

উপরের নামকরণটা শুধু শব্দালঙ্কার নয়—ওর মধ্যে একটা বিশেষ বক্তব্য আছে। সেই বক্তব্যটা বিশদ করবার আগে একটুখানি সংলাপ শুনে নেওয়া যাক। একেবারে কাল্পনিক নয়।

ডিরেক্টার বললেন, একটা গল্প চাই। সিনেমার গল্প। পারবেন ?

—এ আর শক্ত কী ? চেষ্টা করলেই দাঁড় করানো যাবে একটা—লেখক বললেন। ভাবলেন, গল্প লেখাই যার পেশা, তার হাতে একটা সিনেমার কাহিনী তৈরী হয়ে উঠতে কতক্ষণ ?

ডিরেক্টার জুড়ে দিলেন : চরিত্র চাই, সিচুয়েশন চাই আর চাই একটা নতুন আইডিয়া। একটা সোশ্যাল গল্পই ধরুন—বেশ এ যুগের একটা সমস্যা নিয়ে। দেখিয়ে দিন মধ্যবিত্ত পরিবার কেমন করে নেমে যাচ্ছে ভাঙনের মুখে, কী করে বদলে যাচ্ছে এতদিনের পারিবারিক জীবন—দেখা দিচ্ছে বিশৃঙ্খলা, তারপর নতুন আশাবাদ এসে—

ইত্যাদি ইত্যাদি।

লেখক বললেন, হয়ে যাবে, কিছু ভাববেন না। তিনদিনের মধ্যেই গল্পটা এনে পৌঁছে দেব।

তারপর বাড়ী ফিরে সিনেমার গল্প লিখতে বসলেন লেখক। কিন্তু বলবার সময় যে কাজটা এত সহজ মনে হচ্ছিল—লেখবার সময় তা যে এমন দুরূহ আর দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে কে ভাবতে পেরেছিল সে কথা ? দাঁতের দাগে ক্ষত-বিক্ষত হল ফাউন্টেন পেন, কাগজে যতটা লেখা হল—এলোমেলো আঁচড় পড়ল তার চেয়ে ঢের বেশি এবং অনেক ঘর্মাক্ত প্রহর-যাপনের ফলে যা দাঁড়াল, তা দেখে ডিরেক্টার ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

—হয়েছে একরকম। তবে কী জানেন—কথা হল —গল্পটায় যেন প্রাণ নেই।

—কেন ? প্রাণের অভাবটা কোথায় দেখলেন ?

—ঠিক বোঝাতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে কেমন যেন ফর্মুলা মাফিক—কেমন যেন একটা—ভদ্রতার খাতিরে ডিরেক্টার থামলেন।

কিন্তু যা বলবার ; তা বলা হয়ে গেছে এর মধ্যেই। প্রাণহীন—ফর্মুলা মাফিক। হতেই হবে—গত্যন্তর নেই। ফরমায়েশী গল্প সব সময়েই যে অচল হয় তা বলছি না—সমালোচনার অযোগ্য অধিকাংশ বোম্বাই ছবির কথাও এখানে ধর্তব্য নয়—কিন্তু বাংলা গল্পে প্রায়শই এ ধরণের ফরমায়েসী গল্প যে কী নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে তার ঝুড়ি ঝুড়ি প্রমাণ আছে। আর সিনেমার মুখ চেয়ে যা লেখা হয়নি—যা লেখকের সৃষ্টির আনন্দে আপনা থেকেই উৎসারিত হয়েছে —তুলনামূলকভাবে তারাই যে জনসমাদৃতির বরমাল্য পেয়েছে ঢের বেশি, এক শরৎচন্দ্রের গল্পই তার নিদর্শন, তার প্রমাণ অতি-সাম্প্রতিক কালের 'মহাপ্রস্থানের পথে'।

অতএব ছবির গল্পের চাইতে গল্পের ছবিই—

মাষ্টার অলক ভট্টাচার্য্য : 'বাঁশের কেল্লা' ছবিতে এই কিশোর শিল্পীর অভিনয়ে যাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন তাঁরা আজ প্রোডাকসন্সের আগামী ছবি 'বিল্বমঙ্গল'-এ এর অভিনয় দেখার জন্য উদগ্রীব প্রতীক্ষা নিয়ে থাকবেন নিশ্চয়ই

অন্তত: বাংলা ফিল্মে তো নিশ্চয়ই—ঢের বেশি কৃতকার্য হয়েছে। কেন ?

উল্লিখিত লেখককেই অনুসরণ করা যাক। ছবির জন্যে তিনি গল্প ভাবতে বসেছেন। অতএব প্রথমেই তাঁর চিন্তা বাঁধা পড়েছে একটা রূপালী পর্দার ফ্রেমের ভেতর, যেখান থেকে তাঁর দৃষ্টি পরিক্রমা করছে করতালি-মুখরিত একটি মুগ্ধ জনতার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবচেতন মনে একটি নিঃশব্দ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। একটা অবধারিত প্রলোভন সঞ্চারিত হচ্ছে তাঁর অজ্ঞাতেই।

ইতিপূর্বে অনেক ক'টি ছবিই দেখেছেন তিনি—বহু হিট্ গল্প দেখবার সুযোগ তাঁর হয়েছে। তাদের সকলের কাছ থেকে তিল তিল করে চয়ন করেছেন তিনি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুনরাবৃত্তি করছেন পুরোনো সিচুয়েশনের—যে ধরণের চরিত্র দেখে দর্শক একদা খুশি হয়েছিল, একটু অদল-বদল করে তাদেরই সাজিয়ে দিচ্ছেন। অতএব লেখাটি সিনেম্যাটিক হচ্ছে ঠিকই, গল্প হচ্ছে না। যে লেখক ভাবের ঘরে চুরি করেন না, তিনি স্পষ্টই অনুভব করছেন—এই গল্পের ভেতরে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটছে না—অন্য বহুবিধ ব্যক্তিত্বের অন্তরালে তিনি বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। ফরমায়েসে গল্প লিখে আজ পর্যন্ত ক'জন লেখক খুশি হয়েছেন—সে তথ্য আমার ভালো করে জানা নেই।

এ ধরণের গল্প লেখার চেষ্টার অর্থই হল—প্রথমেই নিজের চারদিকে একটা প্রাচীর গড়ে তোলা। তার মধ্যে মনের মুক্তি নেই, চিন্তার স্বাচ্ছন্দ্য নেই। একটি প্রেক্ষাগৃহের পর্দা আর দেওয়ালের মাঝখানেই তিনি ঘুরে মরছেন। সৃষ্টিশীল লেখক আর নিজের মধ্যে আবিষ্কার করছেন না—তিনি অন্যকে অনুসরণ তথা অনুকরণ করছেন। এ ট্রাজিডির বিস্তৃত ব্যাখ্যা বাহুল্য।

অথচ, চলচ্চিত্রের ব্যাপারে যাঁরা গুণী, তাঁরা বলবেন, সিনেমার জন্যে গল্প ভাববার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই; যে-কোন ভালো উপন্যাস—যে কোন ভালো গল্প থেকেই চমৎকার ছায়াছবির কাহিনী হতে পারে। তবে বলার রীতিটা নিশ্চয় আলাদা। ইরিডিয়াম পয়েন্ট কলম আর প্রক্ষেপিত-আলোর কলম দুরকমভাবে গল্প বলে; কাজেই লেখার গল্পকে ছবির গল্পে রূপান্তরিত করার জন্যে রীতির পার্থক্য অবলম্বন করতেই হবে। উপন্যাস আর চিত্রনাট্যে তফাৎ থাকবে—থাকতে বাধ্য। কিন্তু রূপান্তর করতে হলেই যে গোত্রান্তর ঘটাতে হবে এ যুক্তি গ্রাহ্য নয়। উপন্যাসকে সিনেমা করতে হবে এর

চাইতে ঢের বড় কথা হল—সিনেমাকে উপন্যাস করে তোলা দরকার।

কিছুদিন আগেই বিখ্যাত মার্কিনী লেখক হেমিংওয়ের একটি গল্প কলকাতায় প্রদর্শিত হয়েছে। একজন লেখকের আত্মকাহিনী—আফ্রিকার অরণ্যে তাঁবুর মধ্যে আহত অবস্থায় কাটাতে কাটাতে তার স্মৃতি-রোমন্থন। ছবিটি দেখতে দেখতে একবারও সিনেমার কথা মনে হবে না—একটি জীবন উপন্যাসের সমস্ত বর্ণ, গন্ধ, মাধুর্য-বেদনা নিয়ে পর পর কয়েকটি পরমাশ্চর্য অধ্যায়কে উদ্ঘাটন করে চলবে। সিনেমার প্রয়োজনে হয়তো স্প্যানিশ্ সিভিল্ ওয়ারের দৃশ্যগুলোকে রোমাঞ্চকভাবে দেখানো হয়েছে, হয়তো দর্শকের ক্লান্তি আসতে পারে মনে করে ফল্স্ ক্লাইম্যাক্সও সৃষ্টি করা হয়েছে কোথাও কোথাও—তবু সমগ্রভাবে এর আবেদন একটি ভাবগভীর উপন্যাসের ফলশ্রুতিতে সার্থক হয়েছে। যাঁরা মমের 'ফোর কোয়ার্টেট' দেখেছেন, তাঁরাও স্বীকার করবেন —ওই চারটি গল্প গল্প হিসেবেই পাঠকদের তৃপ্তি দিয়েছে—ছবি হিসেবে নয়।

কথাটা তাহলে এই দাঁড়ায় যে প্রয়োগ-পদ্ধতি পৃথক হলেও প্রয়োগ ফল উপন্যাস এবং ছবির ক্ষেত্রে এক হতে বাধা নেই। এবং এই ঐক্য যত বেশি ঘটবে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ ততই উজ্জ্বল। উপন্যাসের মধ্যে লেখক একেশ্বর—সমগ্র জীবন, সমস্ত দেশ তাঁর পায়ের কাছে পড়ে আছে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের মতো। সেখানে তিনি নিজের আনন্দ এবং শৈল্পিক প্রেরণায় তাঁর কাহিনী রচনা করবেন, তাঁর মন আবিষ্কারের আনন্দে আত্মবিকাশ করবে। আসবে নতুন সত্য, নতুনতর চরিত্র কল্পনা, নতুনতম জীবনভাষ্য।

যে কোনো রসজ্ঞ চিত্রপ্রযোজক জানেন যে কোন ভালো বই পাঠকের ভালো লাগার পেছনে নিশ্চয় লেখকের এই সত্য এবং ভাষ্যের প্রভাব রয়েছে। যোগ্য প্রযোজক-পরিচালক যদি সন্ধানী দৃষ্টি মেলে রাখেন, তাহলে উপন্যাসের সমস্ত বিস্তৃতির অন্তরাল থেকে এই ভালোলাগাটুকু ছেঁকে নেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়।

তারপরে আসবে চিত্রনাট্যকারের পালা। যা ইঙ্গিতে আছে, তাকে তিনি সঞ্চারিত করবেন সংলাপে, যা বিবৃতিতে আছে, তাকে তিনি বিস্তৃত করবেন ঘটনায়, যা বিলম্বিত-লয়ে বাঁধা আছে, তাকে তিনি চলচ্চিত্রের উপযোগী দ্রুতলয়ে গতিবান করে তুলবেন। এই কাজ যদি রসবোদ্ধা চিত্রনাট্যকার দায়িত্বের সঙ্গে করে উঠতে পারেন তা'হলে দেখা যাবে, চমৎকার ছবি হয়েছে এবং উপন্যাসও পরোধর্মের মধ্যে গিয়ে বিনষ্টি লাভ করেনি। লাভের মধ্যে এই হবে—ঔপন্যাসিকের স্বচ্ছন্দ অবাধ মন যে নতুন সত্যকে আবিষ্কার করেছে, ছায়াচিত্রের দর্শক পর্দায় সেই নতুনের সন্ধান পাবে : পুরোনো ছবির নতুন গল্প দেখবে না, নতুন গল্পের নতুন ছবি দেখবে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি একথা নিশ্চিত বিশ্বাস করি যে, যে-কোনো ভালোলাগা উপন্যাস থেকে ভালো-লাগা ছবি তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু ওই 'ভালো-লাগা'-টুকুকে খুঁজে বের করা আর আলোর কলম দিয়ে ছবির পর্দায় তাকে নতুন করে লেখা—এইটেই হল আসল কাজ। এ কাজ করার মতো সুযোগ্য মানুষ যদি থাকেন, তবে কথাসাহিত্যে অসামান্য সমৃদ্ধ বাংলা দেশে ছবির গল্পের অভাব কখনোই ঘটবেনা।

কিন্তু আসল কথা হল : ছবির জন্যে গল্প নয়—গল্পের জন্যেই ছবি। গল্পের প্রশ্নটা আগে—ছবির কথা আসবে তারপর। উল্টোটা হলেই বিপদ ঘটবে। তখনই পরিচালক মাথা নেড়ে বলবেন, কথাটা কী জানেন, কেমন নিষ্প্রাণ ঠেকছে, কেমন যেন ফর্মূলা মাফিক, কেমন যেন—

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র

★

ভারতবর্ষ কাব্য ও সঙ্গীতের দেশ। ভারতীয় কাব্যে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা আর এদেশের সঙ্গীতে কাব্যের অর্চনা দেখে বিশ্বের কলারসিকরা বারবার মুগ্ধ হয়েছেন। বর্ত্তমান নিবন্ধে কাব্যের আলোচনা করবো না, করবো সঙ্গীতের। ভারতীয় সঙ্গীত-রাজ্যে যন্ত্রসঙ্গীত একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সেই যন্ত্রসঙ্গীতই হ'লো এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র : তাম্বুরা, সেতার, এসরাজ, সারেঙ্গী, বেহালা, স্বরোদ, মৃদঙ্গ ও তবলা

ধ্বনিগত ঐশ্বর্য্যের ওপরেই ভারতীয় সঙ্গীতের ভিত্তি। এদিক থেকে ভারতীয় সঙ্গীত পাশ্চাত্যের 'সমন্বয় প্রথা' (Harmonic System) বা চীনের 'চক্রবৎ প্রথা' (Cyclic System) থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতীয় সঙ্গীত উপভোগ করতে হ'লে পাশ্চাত্য সঙ্গীত-ধারার সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনা বাদ দিতে হবে—গ্রহণ করতে হবে এদেশের সঙ্গীতের নিজস্ব ভাবটিকে।

প্রাচীন গ্রীক-সঙ্গীত এবং এখনকার তুরস্কে, পারস্যে এবং মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশগুলিতে যে ধ্বন্যাত্মক সঙ্গীত-ধারার প্রচলন আছে—ভারতীয় সঙ্গীতও সেই ধরণের। ভারতীয় সঙ্গীতে বাণী ও ধ্বনির সম্পর্ক ওতোপ্রোত। একটা চিরস্থায়ী ধ্বনি-বিস্তারের মধ্য দিয়েই যেন এদেশের সঙ্গীতের প্রকাশ।

ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী—কথায় বলে, এরাই সঙ্গীতের উৎস। ভারতীয় সঙ্গীত-ধারায় রাগ-রাগিণীই মুখ্য কথা। এক একটি ভাব যখন এক একটি রাগের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তখনই হয় সঙ্গীতের সৃষ্টি। এই সঙ্গীতের প্রকাশ যেমন কণ্ঠে, তেমনি যন্ত্রে। ভারতের সঙ্গীত-সাধকরা কণ্ঠে বা যন্ত্রে অপূর্ব্ব দক্ষতায় সঙ্গীতের মোহজাল বিস্তারের অধিকারী।

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের প্রথম প্রকাশ হয় 'আলাপ'-এ। ভাব-প্রকাশের পরিবেশ সৃষ্টিতে এই 'আলাপ'-এর মূল্য অনেক: সঙ্গীতের প্রকাশ এখানে মন্থর ও গম্ভীর। জটিল কোনো তান এখানে নেই। আলাপের পর ক্রমশ: দেখা দেয় জটিল তান ও গৎ। নির্দ্দিষ্ট রাগের নির্দ্দিষ্ট গৎ—সম্পূর্ণ সঙ্গীত-বিজ্ঞান সম্মত। সামান্য পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে গতের হয় পুনরাবৃত্তি। যন্ত্রসঙ্গীতে এই নিয়ম মেনে চলাই খাঁটি ভারতীয় যন্ত্র-সঙ্গীত-সাধকের আদর্শ।

তান ও গতের পরই তাল—সঙ্গীতের মুখ্য বিষয়। এই তালের ওপরেই সঙ্গীতের সাফল্য। অনেক রকমের তাল আছে—এক একটি তাল-গোষ্ঠী সাধারণত: চারমাত্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ভারতীয় যন্ত্র-সঙ্গীতে তারবাদ্য (string instruments) একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে।

আকাশবাণী, নয়া দিল্লী কেন্দ্র থেকে ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতে ঐক্যতান পরিচালনা করছেন ওস্তাদ রবিশঙ্কর

বীণা, সেতার, স্বরোদ, গোট্টুবাদ্যম্, সুরবাহার, সুরসপ্তক, তানপুরা, একতারা, দোতারা, সারেঙ্গী, এসরাজ, দিলরুবা, সারিন্দা, বেহালা, প্রভৃতি অনেক রকম তারবাদ্য এদেশে প্রচলিত।

বীণা

ভারতীয় তারবাদ্যের মধ্যে বীণাই সম্ভবতঃ সবচেয়ে প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় শতকের বহু পূর্ব্ব থেকেই যে এ-দেশে বীণার বিশেষ প্রচলন ছিল, বহু পুঁথি-পত্রে তার প্রমাণ আছে। উত্তর-ভারতের ও দক্ষিণ-ভারতের বীণা-যন্ত্র কিছুটা পৃথক। উত্তর-ভারতের বীণা সাধারণতঃ 'বীণ্' নামেই পরিচিত। ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের মূল বাদ্যযন্ত্র এই 'বীণ্'। বাঁশ ও দুটো কুমড়োর খোল দিয়ে এই বাদ্যযন্ত্র তৈরি। ধাতুনির্ম্মিত সাতটি তার থাকে এই যন্ত্রে—আর, বাইশ বা তারও বেশি ঘাটে বাজানো চলে। এর প্রধান চারটি তার থাকে সুরসৃষ্টির জন্য, আর, বাকী তিনটি তার সঙ্গতের কাজ যায়। 'বীণ্' কেউ বাজান শুধু আঙ্গুলে, কেউ বা আঙ্গুলে জড়ানো ধাতু-নির্ম্মিত নখ দিয়ে। আকারে দক্ষিণ-ভারতের বীণা উত্তর-ভারতের বীণার চেয়ে যেমন বড়, এর সুরসৃষ্টির ক্ষমতাও তেমনি বেশি। দক্ষিণ-ভারতে বর্ত্তমানে যে-ধরণের বীণা প্রচলিত আছে—১৭শ শতকেই সেইরূপের সৃষ্টি হয়। নীচেকার খোলটা বড় এবং কাঠের। তারওপরে একটা ঢাকনা—সেই ঢাকনায় তারের সমাবেশ। বীণার ঘাটগুলি যাতে বাঁধা সেটাও কাঠের তৈরি। এধরণের বীণাতেও সাতটি তার। কিন্তু, ঘাট চব্বিশটি।

বিচিত্রবীণা

উত্তর-ভারতে আর এক রকমের বীণা প্রচলিত আছে—তার নাম, বিচিত্রবীণা। এর বৈশিষ্ট্য এতে কোনো ঘাট নেই; আর, তারের ওপরে এক টুকরো স্ফটিক ঘ'সে ঘ'সে একে বাজানো যায়। অনেকটা, দক্ষিণ-ভারতের গোট্টুবাদ্যমের মত।

গোট্টুবাদ্যম

দক্ষিণ-ভারতের বীণাজাতীয় এই বাদ্যযন্ত্রটিতে বিচিত্রবীণার মতই কোনো ঘাট নেই। এক টুক্‌রো ছোট্ট কাঠ চেপে চেপে একে বাজানো হয়। স্বরসৃষ্টিতে গোট্টুবাদ্যম বিচিত্রবীণারই সমগোত্রীয়।

অন্যতম ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়ম সহযোগে কণ্ঠসঙ্গীতে রত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সেতার

সেতার বা সিতার উত্তরভারতের একটি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন সঙ্গীতযন্ত্র। শোনা যায় ১৩-শ শতাব্দীতে প্রখ্যাত সঙ্গীতকার আমীর খস্‌রু এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন। দেখতে অনেকটা দক্ষিণ-ভারতীয় বীণাযন্ত্রের মতই—কিন্তু, তুলনায় বেশ হাল্‌কা আর এর ঘাটগুলি বাজাবার আগে ইচ্ছামত ঠিক ক'রে নেওয়া যায়। ধাতুনির্ম্মিত নখ আঙুলে জড়িয়ে সেতার বাজানো হয়। সাধারণতঃ এর প্রধান চারটি তার থাকে। কিন্তু, সঙ্গৎ-সহায়ক হিসাবে, আধুনিক সেতারীরা, প্রয়োজনমত আরও কয়েকটা তার লাগিয়ে নেন।

স্বরোদ

আধুনিককালের এই সঙ্গীত-যন্ত্রটি ইতিমধ্যেই ভারতীয় সুরসভায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। আকারে ছোট এবং তলাকার কুমড়োর খোলটি চামড়া দিয়ে ঢাকা। তারই ওপরে তারের সমাবেশ—কয়েকটি কানে সেগুলি বাঁধা। ধাতুনির্ম্মিত এক টুক্‌রো জিনিষ (plectrum) দিয়ে স্বরোদ বাজানো হয়। এর ধ্বনি জলদ্‌-গম্ভীর—সুরসৃষ্টিতেও যেন নতুনরকমের মাদকতা—তাই বোধকরি স্বরোদ আজ সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠ্‌ছে।

সুরবাহার

সাধারণ-সেতারে প্রধান চারটি তার থাকে। সুরবাহারও একজাতীয় সেতার। কিন্তু, এতে তার থাকে বেশি। সুরবাহারের শব্দ সেতারের চেয়ে মোলায়েম এবং ভাবও গভীর।

সুরসপ্তক

সেতারজাতীয় আর একটি সঙ্গীতযন্ত্রের নাম—সুরসপ্তক। আকারে সেতারের চেয়ে সামান্য বড় এবং পার্থক্যের মধ্যে এতে প্রধান তার থাকে সাতটি।

তানপুরা

প্রাচীন তাম্বুরু বা বীণার সমগোত্রীয় এই তানপুরা। সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন এই তারযন্ত্র। আকারে লম্বা আর নীচেকার গোলাকার খোলটিও বেশ বড়। চারটি

বাংলা নববর্ষ অনুষ্ঠানে স্বরোদে সুরের মায়াজাল রচনা করে চলেছেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ

তারে এর স্বর(tone) সৃষ্টিই প্রধান কাজ। এর ঘাটগুলিও বেশ বড় এবং হাতীর দাঁতে তৈরি। এতে বিচিত্র স্বরসৃষ্টিতে চমৎকার সঙ্গৎ-এর কাজ করে।

একতারা

"বাউল বাজায় একতারা। শুনে পরাণ হলো হারা॥" লোকসঙ্গীতে এই এক-তারা-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রটির বিশেষ প্রয়োজন। আকারে অনেক ছোট—এবং প্রদেশভেদে এর রূপও বিচিত্র। কিন্তু তার সর্ব্বত্রই একটি। আঙুল দিয়েই বাজানো চলে।

দোতারা

দোতারা বা দোতরা—একতারার সমগোত্রীয় দুই তার-বিশিষ্ট সঙ্গীতযন্ত্র। ভাটিয়ালী, বাউল প্রভৃতি লোকসঙ্গীতে দোতারার সঙ্গৎ অপরিহার্য্য বললেই চলে।

সারেঙ্গী

সম্ভবতঃ সারঙ্গ-বীণা কথা থেকেই সারেঙ্গীর উৎপত্তি। একখণ্ড কাঠ কুঁদে তৈরী এই সঙ্গীতযন্ত্রের ওপরকার অংশটি পার্চমেন্ট কাগজে মোড়া। এরও প্রধান তার আছে চারটি—সেইসঙ্গে সঙ্গৎ-সহায়ক আরও গুটি-কয়েক তার। এই তারগুলি চামড়ার। ছোট্ট একরকমের ধনুক দিয়ে সারেঙ্গীতে ধ্বনি তোলা হয়। সারেঙ্গীর প্রধান কাজই হলো কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গৎ করা। এ-বিষয়ে বোধকরি এর জুড়ি নেই। সুক্ষ্মভাব সৃষ্টিতে সারেঙ্গীর স্থান অপরিহার্য্য।

এস্রাজ

প্রধানতঃ বাংলাদেশেই এই সঙ্গীতযন্ত্রের প্রচলন—এখন অনেকটা ক'মে এসেছেও বলা যায়। ১৫-শ শতাব্দীতে এই তারযন্ত্রটির প্রচলন হয় ব'লে পুঁথিপত্রে উল্লেখ আছে। ইস্পাত ও পেতলের চারটি প্রধান তার ছাড়াও এতে সঙ্গৎ-সহায়ক আরও অনেকগুলি তার থাকে। আকারে লম্বা ও সরু। লোমের ছড় দিয়ে এস্রাজ বাজে।

দিলরুবা

এস্রাজের সগোত্রীয় আর একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম দিলরুবা। কিন্তু এর নীচেকার অংশটি চতুষ্কোণ এবং দেখতেও এস্রাজের চেয়ে বড়। সারেঙ্গীর মতো এতে ন' থেকে দশটি পর্য্যন্ত তার থাকে।

সরিন্দা

সারেঙ্গীর মতই এই বাদ্যযন্ত্রটিতে অপূর্ব্ব সুর তোলা যায়। সারেঙ্গীর সঙ্গে এর আর কোনো পার্থক্য নেই, এক তার ছাড়া। সারেঙ্গীর তার চামড়ার গুণ দিয়ে তৈরি, কিন্তু সরিন্দার তার ধাতুনির্ম্মিত।

বেহালা

এটি যদিও এদেশের সঙ্গীত-যন্ত্র নয়—কিন্তু প্রায় একশ বছরের প্রচলনে ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। দক্ষিণ-ভারতে বেহালার প্রচলন খুব বেশি। কিন্তু উত্তরভারতে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের সঙ্গৎ-সহায়করূপে বেহালাকে এখনও পর্য্যন্ত ছাড়পত্র দেওয়া

হয়নি। একক সঙ্গীতযন্ত্র হিসাবে বেহালা কিছুটা কদর এখনও পায়।

এতো গেল তারযন্ত্রের পরিচয়। এবারে আসা যাক্ বায়ব-সঙ্গীতযন্ত্রের ক্ষেত্রে। যে সঙ্গীতযন্ত্র প্রধানতঃ বায়ু বা বাতাসের ওপরেই নির্ভর করে—তাকে বলা হয়েছে বায়ব-সঙ্গীতযন্ত্র (Wind Instruments)। শিঙে-জাতীয় বায়ব-সঙ্গীতযন্ত্রকে আমরা এক্ষেত্রে ধরিনি।

বাঁশী (ফ্লুট, বাঁশ্রী)

নানাজাতের ও নানাশ্রেণীর বাঁশী আমাদের দেশে চলিত আছে। কোনোটা বাঁশের তৈরি, কোনটা হাতীর দাঁতের, আবার কোনো কোনোটা চন্দন কাঠের, ইবনয়েট, লোহার, রুপোর বা সোনার। কোনো বাঁশী সোজা, কোনোটা বা বাঁকা। ফ্লুট-জাতীয় বাঁশী আজকাল ভারতীয়-সঙ্গীতের সঙ্গত-সহায়করূপে বড় একটা ব্যবহৃত হয় না। যদিও একক বাদ্যযন্ত্র হিসেবে এর কদর এখনও আছে। এই জাতীয় বাঁশীতে কত ঘাট —সুরসৃষ্টির ক্ষমতাও এর বেশি। কিন্তু স্বর খুব মোলায়েম নয়। বাঁশের বাঁশী-ই বোধ করি বাঁশীর সেরা। এর স্বর ও সুর দুই-ই মোলায়েম ও ভাবদ্যোতক।

সানাই

বাঁশীর সমগোত্রীয় সানাই ভারতের এক নিজস্ব সম্পদ। এর একটামাত্র রীডে সুরসৃষ্টির কি অপূর্ব্ব ক্ষমতা। বিভিন্ন রাগ-রাগিণী যখন সানাইয়ের মধ্য দিয়ে সঙ্গীত হয়ে প্রকাশিত হয়—তখন ভাবের ও সুরের যে ব্যঞ্জনা কানে লেগে থাকে তার যেন তুলনা নেই। সানাই বাজানোতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। অভিজ্ঞ সানাই-বাদক বিচিত্র সুরজালের বিস্তার করতে পারেন এই ছোট্ট বায়ব-সঙ্গীত-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে।

নাগস্বরম্

সানাই-জাতীয় একটি বাদ্যযন্ত্র। দক্ষিণ-ভারতেই এর প্রচলন। সানাই সম্পর্কে ওপরে যা' যা' লেখা হয়েছে নাগস্বরমের ক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য। তফাতের মধ্যে

সানাই উত্তর-ভারতের আর নাগস্বরম্ দক্ষিণ-ভারতের—আকারেও কিছুটা তফাৎ।

হারমোনিয়ম্

একশো বছরও হয়নি এই বাদ্যযন্ত্রটির ভারতবর্ষে আমদানী। তিন স্কেল-ওয়ালা এই সঙ্গীতযন্ত্রটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। সঙ্গীতের সঙ্গৎ-সহায়ক হিসেবে এমন সহজ যন্ত্র-বাদ্য আর নেই। গানের রেওয়াজ এই হারমোনিয়মের কল্যাণেই যে একদিন বেড়েছিল তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের দরবারে আজ এই হারমোনিয়ম 'অচ্ছুৎকন্যা'র মতই অবহেলিত!

এর পর আসে চামড়া-জাতীয় বাদ্য। যেমন—ঢাক, ঢোল, ডুগী, তবলা, বাঁয়া, খোল, মৃদঙ্গ (পাখোয়াজ) ইত্যাদি।

এই-জাতীয় বাদ্যের সবগুলিই প্রধানতঃ সঙ্গীত-সহায়করূপে প্রচলিত। এর মধ্যে বাঁয়া-তব্লার স্থান সবার ওপরে। বাঁয়া-তব্লা ছাড়া সঙ্গীতের তালরক্ষা হয় না। অভিজ্ঞ তবল্চীরা আবার একাই অপূর্ব্ব তব্লা-লহরার সৃষ্টি করেন—যা সঙ্গীতেরই আর এক রকমের বিকাশ।

মৃদঙ্গ (পাখোয়াজ)

বহুপ্রাচীন এই সঙ্গীতবাদ্যটি আজও এদেশে প্রচলিত। শুধু যে ভজন বা কীর্ত্তনেই এর চল, তা নয়; উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও ঐক্যতানবাদনেও মৃদঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন। মৃদঙ্গের দু'পাশে চামড়ার ঢাকনা—তার মাঝখানে আবার ভাতের শুকনো মণ্ড লাগানো। এতে এর শব্দ-বিন্যাসের মাধুর্য্য সৃষ্টি হয়। মৃদঙ্গবাদ্যে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি আছে—চলতিভাষায় যার নাম 'বোল্'।

খোল

মৃদঙ্গ-জাতীয় এই বাদ্যটি প্রধানতঃ বাংলাদেশের ভজন-কীর্ত্তনের আসরেই চলিত। লোকসঙ্গীতেও খোলের ব্যবহার আছে।

তবিল

ঢোল-জাতীয় ছোট বাদ্যযন্ত্র। দক্ষিণ-ভারতের নাগস্বরম্ সঙ্গীত-যন্ত্রের সঙ্গৎ-সহায়করূপে এটি ব্যবহৃত হয়।

ডুগী

ডুগী বা ডুগ্‌গী সানাইয়ের সঙ্গৎ-সহায়করূপে বাজানো হয়। আকারে বেশ ছোট।

এসব ছাড়া আরও কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র আকারে ক্ষুদ্র হলেও আমাদের সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যের আসরে প্রায়ই কাজে লাগে। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য—করতাল, জগঝম্প, খঞ্জনী, মঞ্জিরা বা ঘুংরু, ঝাঁঝ, নূপুর প্রভৃতি।

গীটার, ব্যাঞ্জো, ম্যাণ্ডোলিন, পিয়ানো, অর্গ্যান ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ভারতীয় সঙ্গীতের আসরে বিদেশী ব'লেই পরিচিত এবং উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের দরবারে সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। চলচ্চিত্রের কল্যাণে এবং আমাদের দেশের সঙ্গীত পরিচালকদের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সঙ্গীত-সৃষ্টির অহেতুক আগ্রহের ফলে এই সঙ্গীতযন্ত্রগুলিও ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যতই জনপ্রিয় হোক, এদের মধ্যে ঘরের ডাক নেই, দূরের হাতছানি শুধু আছে!

উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের কথা

স্মৃতি চক্রবর্তী

[গতবার বিদেশ-ভ্রমণে গিয়ে দিগ্বিজয় করে এলেন উদয়শঙ্কর। প্রাচ্যের সংস্কৃতি-দূত বলে পাশ্চাত্যের সর্বত্র তিনি লাভ করলেন রাজ-সমাদর। এই সাংস্কৃতিক বিশ্ববিজয়ে ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শনে উদয়শঙ্কর বিস্ময়বিমুগ্ধ করেছিলেন অগণিত দর্শককে, সেই নৃত্য সম্প্রদায়ে ছিলেন স্মৃতি চক্রবর্তী। বিদেশের সেরা রঙ্গমঞ্চে তাঁর 'উর্বশী' একক-নৃত্য দর্শক-সাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে।]

শোভাবাজারে—বাজারের খুব কাছে আমাদের বাড়ী। সুতরাং হাটের হট্টগোলটাই সেখানে প্রধান। ছোটবেলা থেকেই নাচের প্রতি অনুরাগ ছিল। পারিবারিক বাধা সত্ত্বেও নাচের চর্চা একরকম এগিয়ে চলছিল। তবে কোনদিন যে তা সাধারণ্যে পরিবেশন করতে হবে—তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু স্বপ্ন একদিন সত্য হয়ে উঠলো। পণ্য কেনা-বেচার অঞ্চলে এলো প্রাণের ছন্দ—হাটের হট্টগোল ছাপিয়ে একদিন এলো আনন্দলোকের সংকেত। বিশ্বাস হলো না—তবু সে সংকেতে সাড়া দিলাম।

টালিগঞ্জে শ্বশুরালয়ে বসে আছেন উদয়শঙ্কর। এতবড় শিল্পী তিনি—জগৎজোড়া যাঁর নাম—কিন্তু কেমন সাদা-সিধে, হাসিখুসি—প্রসন্ন, উদার। গায়ে একটি আটপৌরে গেঞ্জী। প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো।

জিগ্যেস করলেন "এর আগে আর কোথায় কোথায় নাচ শিখেছো?"

"কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের 'অভ্যুদয়' আর 'সুবর্ণভূমিতে'—তা ছাড়া এর আগেও অনেক অনুষ্ঠানে নেচেছি। তবে তা তেমন বলবার মত কিছু নয়।"

একখানা নাচ দেখাতে বললেন শঙ্কর। ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালাম। নাচ সুরু হলো। তারপর একখানা নয়—পর পর কয়েকখানা নাচই দেখলেন শঙ্কর। তাঁর পছন্দ হয়েছে। বিদেশ ভ্রমণের জন্তে আমি আর আমার সেজ্‌দি (প্রীতি চক্রবর্তী) নির্বাচিত হলাম। কথাবার্তা সেদিনই পাকা হয়ে গেলো। মাদ্রাজে মাস-ছয়েক রিহার্সাল দেবার পর বিদেশ ভ্রমণে বেরোলেন উদয়শঙ্কর। তাঁর সম্প্রদায়ে আমরা মোট চোদ্দজন শিল্পী ছিলাম।

১৭ই নভেম্বর (১৯৪৯) আমরা লণ্ডনের পথে পা বাড়ালাম। ৬ই ডিসেম্বর পিকাডেলী থিয়েটারে আমাদের প্রথম 'শো' আরম্ভ হয়। তারপর দীর্ঘ পাঁচমাস ধরে লণ্ডন থেকে নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, চিকাগো, কানাডা—আমেরিকার বড় বড় শহরে আমাদের নৃত্যপ্রদর্শনী হয়। শঙ্করের প্রশংসায় সারা পাশ্চাত্ত্য দেশ শতমুখ হয়ে ওঠে। প্রাচ্যের সংস্কৃতি-দূতরূপে তিনি আমেরিকার সর্বত্র অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছেন।

উদয়শঙ্করের নৃত্যকলা এবং তাঁর সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয় সম্পর্কে দেশী ও বিদেশী সমালোচকরা বিভিন্ন কাগজে বহু রচনা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং সে সম্পর্কে আর কিছু লেখা বাহুল্যমাত্র। উদয়শঙ্করের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে যে পরিচয় আমি পেয়েছি সে সম্পর্কে কিছু বলব।

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ১৯৫১ সালে ভারতের বিভিন্ন শহরে নৃত্য প্রদর্শনে বেরিয়েছেন উদয়শঙ্কর। তার প্রথম পালা নিউ এম্পায়ারে। মণিপুরী নৃত্য সুরু হয়েছে—আমরা সবে নাচের ভঙ্গী-বিস্তার করেছি মাত্র—এমন সময় ফুট্‌ লাইটের বাল্‌ব্‌ ভেঙে কুচি-কুচি হয়ে মঞ্চের মাঝখানে ছড়িয়ে পড়লো। আর কোন সম্প্রদায় হলে তক্ষুণি হৈ-চৈ পড়ে যেতো—'কার্টেন''কার্টেন' বলে ম্যানেজার চেঁচাতেন। অন্ততঃ তখনকার মত সেই নাচ আর চলতো না। কিন্তু উদয়শঙ্করের শৃঙ্খলাবোধ এবং দর্শক-সচেতনতা এত বেশি যে—কোন অপরিহার্য কারণ দেখা না দিলে 'শো' বন্ধ রাখার নির্দেশ ছিল না। প্রতি কাজেই অল্প-বিস্তর বাধা আসবে—কিন্তু মানুষকে অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর নিপুণ সংগঠন-কৌশলে সে বাধাকে জয় করতে হবে। উদয়শঙ্কর এই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছিলেন। তাই হলো। নাচের ছন্দপতন হলো না, একটি মেয়েও বিহ্বল হলো না—কাঁচের টুকরো সমাকীর্ণ জায়গা ছেড়ে দিয়ে এক ধারে সরে এসে নাচ সম্পূর্ণ করা হলো।

ঘষছে—কেউ হাতে বাজু বাঁধছে—তখন নিজেরা নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গীতেও দাঁড়াইনি—এমনি জটলা করছি। হঠাৎ সিফ্‌টার পর্দা টেনে দিয়েছে। ব্যস্—আমরা মুহূর্ত্তের জন্য থতমত খেয়ে গেলাম। অমলা নেই,—নাচের আরম্ভই যে নেই! কিন্তু সে শুধু ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্যে। আমাদের এই ভড়্কে যাওয়াকে একটা 'পোজে' ফেলে সম্পূর্ণ অন্য ভঙ্গীতে ও মুদ্রা-বিস্তার করে প্রবেশ করলেন অমলা। আমরাও নাচের 'মুড' পেয়ে গেলাম। দর্শক ভাবলো—পর্দা ওঠার পর ঐ থতমত ভাবটাই বুঝি নাচের একটা ভাবস্বরূপ! নাচ খুব জমে গেল। আমরা অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। অবশ্য পর্দা পড়ার পর আমাদের মধ্যে হাসির সে কি ধুম!

স্মৃতি চক্রবর্ত্তী

প্রথম দু'এক সারির দর্শক ছাড়া আর কেউ বুঝতেই পারেনি যে—কোন অঘটন ঘটেছে।

এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল লক্ষ্ণৌতে। পর্দা ওঠার দশ মিনিট আগে মঞ্চে এসে দাঁড়ানোই ছিল আমাদের রীতি। আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। ড্রপ-সিন্ ওঠার আর দশ মিনিট বাকি। দিদির (অমলাশঙ্কর) তখনো ঘুঙুর পরা হয় নি। আমরাও পুরোপুরি তৈরী হই নি। কেউ হাতে লাল

'ছায়া' চিত্রগৃহে কিন্তু বৈদ্যুতিক গোলযোগ আমাদের একেবার বেশ কাবু করেছিল। দাদার (শঙ্করের) 'গজাসুর বধ' নৃত্য খুব জমে উঠেছে—এমন সময় হঠাৎ সব আলো নিভে গেলো। বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিন্ন হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহে চীৎকার সুরু হয়েছে। উদয়শঙ্কর ষ্টেজে এসে কারণ বর্ণনা করলেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে! শেষে বিদ্যুৎ পুনঃসংযোগ হলো। আবার নাচ

শুরু হলো। তন্ময় হয়ে দেখছেন দর্শকরা। একটু আগে সুর কেটে যাওয়ার দুঃখ তাঁরা ভুলে গেছেন। উদয়শঙ্করের পক্ষেই শুধু প্রেক্ষাগৃহের বিক্ষুব্ধ দর্শককে অনুকূল স্তরে টেনে এনে অনুরক্ত করে তোলা সম্ভব!

এ-ছাড়াও নেপথ্যে যে কত মজাদার ঘটনা ঘটে—ভুল হয়—বাইরের লোক তা জানতেও পারে না। একবার জয়পুরে এমনি ভুল হয়েছিল। দিদির (অমলাশঙ্কর) 'শাশ্বত জীবন ছন্দ' নাচ—অথচ তিনি মেক্-আপ আর পোষাক পরেছেন 'অস্ত্র-পূজা'র—ভুল দেখিয়ে দিতেই তিনি তৎপর হলেন ভোল্ বদলাতে। তাঁর মাথায় 'অস্ত্র-পূজা' ঘুরছিল কিনা!

বোম্বাই-এর এক্সেলসিওর থিয়েটারে এমনিধারা ভুল করতে যাচ্ছিলেন দাদা। 'শাশ্বত জীবন ছন্দে' দাদার (শঙ্করের) ঘুঙুর ছাড়া নাচ। অথচ দাদা ঘুঙুর পরে বেরোতে যাচ্ছেন। আমি বল্লাম "একি দাদা! 'শাশ্বত জীবন ছন্দে' আপনার পায়ে ঘুঙুর?"

দাদা তাড়াতাড়ি ঘুঙুর খুলে ফেললেন।

আমেদাবাদের একটি ঘটনা বলি। 'গ্রাস কাটার্স' নাচের শেষে আমাকে একটি দীর্ঘায়িত, বঙ্কিম ভঙ্গী নিয়ে মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হতো। আমেদাবাদে হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন গীতুকে (গীতা নন্দী) এই অংশে অবতীর্ণ হতে হয়। কিন্তু সে অঙ্গভঙ্গী ঠিক রাখতে না পেরে মঞ্চে শুয়ে পড়ে। দর্শক ভাবলে—চমৎকার 'পোজ'। হাততালির ধুম পড়লো মঞ্চের বাইরে। আর নেপথ্যে—নিশ্চয়ই হাসির ধুম!

কিন্তু এইসব ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি আর ভুলচুক্ 'ইণ্ডিয়া টুরে'ই হয়েছে। বিদেশ ভ্রমণের সময় একদিনও কোনো বিচ্যুতি ঘটেনি আমাদের অনুষ্ঠানে। অবশ্য এর জন্যে শঙ্করের ইম্প্রেসারিও মিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ (লণ্ডন) এবং মিঃ এস হারোকের (আমেরিকা) কৃতিত্বও কম নয়। এঁদের সংগঠন-কৌশল ও পরিকল্পনা-নৈপুণ্য দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। গোটা প্রোগ্রামটাই যেন মেশিনের মত চলছে—একটু ফাঁক নেই, একটু খুঁত

নেই—'শো-ম্যান্‌সিপে'র চরম উৎকর্ষ দেখেছি এঁদের ক্ষেত্রে।

লণ্ডনে এবং আমেরিকার বিভিন্ন শহরে—নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন্, সিকাগো, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, লস্ এঞ্জেলস্, মন্‌ট্রিল ও কুইবেকে—দাদার (শঙ্করের) একক নৃত্য 'ইন্দ্র', 'গান্ধর্ব,' দিদির (অমলাশঙ্করের) 'রাজপুত বধূ', 'কৃষাণী' এবং সমষ্টি-নৃত্যের মধ্যে 'অস্ত্র-পূজা', 'বিদায়', 'মণিপুরী রাস', 'গ্রাস কাটার্স', 'নৃত্য-দ্বন্দ্ব'—বিশিষ্ট সমালোচক থেকে সাধারণ মানুষ পর্য্যন্ত—সকলেরই অজস্র প্রশংসা কুড়িয়েছিল। শঙ্করের নৃত্যানুষ্ঠান ডলার-উপাসকের দেশেও কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল—তার একটি ঘটনার কথা বলছি। 'ডোরিয়ান গ্রে' ছবির তারকা হ্যাট্‌ফিল্ডের নাম জানেন না—এমন চিত্রামোদী খুব কমই আছেন। তিনি শঙ্করের নাচ দেখে এত মুগ্ধ হলেন যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সানফ্রান্সিস্‌কো, স্যাক্রামেটো ও সান্টা বারবারাতে ঘুরতে লাগলেন। তন্ময় হয়ে আছেন তিনি শঙ্করের নৃত্য-ছন্দে। শুটিং-এ উপস্থিত থাকবার জন্যে হলিউড থেকে জরুরী আহ্বান আসছে—'তারে'র পর 'তার'। সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। চিত্রতারকা মগ্ন হয়ে আছেন নৃত্য-রসের উচ্ছল সাগরে। শেষ পর্য্যন্ত ষ্টুডিও থেকে যখন আইনানুগ ব্যবস্থা-বলম্বনের ভয় দেখানো হলো—তখনই তিনি বাধ্য হয়ে হলিউডে ফিরে গেলেন। শুধুমাত্র বর্ণাঢ্য আর বিলাসোজ্জ্বল নৃত্যানুষ্ঠানই কোন মানুষের মনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। শঙ্করের নাচে এমন কোন রূপাতীতের ইঙ্গিত আছে—যা স্বর্ণসন্ধানী মার্কিনীদের মনেও অমরলোকের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে।

আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ওয়াশিংটনে 'শো'-এর শেষে দাদার এক বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। একসময় এই বন্ধু দাদাকে লণ্ডনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু অর্থ এবং প্রাচুর্য্যের পিচ্ছিল পথে তাঁর নৈতিক পতন হয়েছে। দাদার (শঙ্করের) তা অজানা ছিল না। তাই তিনি দেখা করতে চাইলেননা। দিদি দেখা করবার জন্য খুব পেড়াপীড়ি করলেন। দাদা জবাব দিলেন 'ও হয়তো যা-তা বলে চেঁচাবে। আর ওর এই অধঃপতনের পর সামনা-সামনি ওকে দেখলে আমিও নিজেকে সামলাতে পারবো না। তার চেয়ে দেখা না করা দু'জনের পক্ষেই ভাল।'

দাদা দেখা করলেন না। 'শো'-এর শেষে রেস্তোরাঁয় খেতে এসে মুখ ভার করে রইলেন দাদা। কিছুই খেতে চাইলেন না। শুধু ছোট্ট একটি আক্ষেপোক্তি মুখ দিয়ে তাঁর বেরিয়ে এলো—'দেখা করলেই হতো! হয়তো কত দুঃখ পাবে।'

শঙ্করের হৃদয়বেত্তা আর সৃষ্টিকর্ত্তার নির্ম্মমতা—এদুটো রূপের এমন যুগপৎ প্রকাশ এর আগে আমার চোখে পড়ে নি। সৃষ্টিকর্ত্তাকে—শিল্পের খাতিরে, সৌন্দর্য্যের খাতিরে—নির্ম্মম হতে হয়—শক্ত হতে হয়--পাছে তাঁর স্বপ্ন ভেঙে যায়। আর ভেতরের মানুষটিও এই নিয়ম-শৃঙ্খলার চাপে গুমরে কেঁদে মরে। মানুষের মন তো আর সবসময় যুক্তির শাসন মেনে চলে না।

শিল্পী শঙ্করকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন দুনিয়ার দর্শকসমাজ। নৃত্যের জগতে—শিল্পের জগতে—নতুন নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি করছেন তিনি। আর মানুষ শঙ্করকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি আমরা—যারা তাঁর খুব নিকট সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর ব্যক্তিত্বের চমকে, তাঁর স্বভাবের মাধুর্য্যে অবাক হওয়ার পালা আজও আমাদের শেষ হয় নি। শিল্পের জগতে তিনি যাদুকর—হৃদয়াবেদনের ক্ষেত্রে তিনি চিত্তচমৎকারী।

ভারতীয় সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার থেকে নৃত্যকলার যে সম্পদ তিনি আহরণ করেছেন—আমেরিকার চোখে তা অপরূপ রহস্যের অঞ্জন বুলিয়ে দিল। মুগ্ধ হলো, বিস্মিত হলো—ভারতীয় নৃত্য-যাদুকরের এই অতুলনীয় ইন্দ্রজাল থেকে প্রশস্তিতে মুখর হয়ে উঠলো জড়বাদী আমেরিকা, ভারতীয় সংস্কৃতিকে নৃত্যের মধ্য দিয়ে মার্কিনীদের মর্ম্মে পৌঁছে দিলেন উদয়শঙ্কর—হলিউডের দেশে, বস্তু গ্রাহ্য রূপের দেশে তিনি সৃষ্টি করলেন রূপাতীত বিস্ময়। নীলরক্ত-গর্ব্বিত অভিজাত মহল থেকে নীচতলার বাসিন্দারা পর্য্যন্ত শঙ্করের নৃত্য রসের ধারা-স্নানে প্রসন্ন হয়ে উঠলো। সার্থক হলো তাঁর দেহ-কাব্যের উপচার নিবেদন সফল হলো তাঁর আজীবনের স্বপ্ন। কুবেরের দেশে কীর্তির জয়-স্তম্ভ স্থাপনা করে বিজয়ীর বেশে দেশে ফিরে এলেন কলা-লক্ষ্মীর বরপুত্র উদয়শঙ্কর। তাঁর নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে বিদেশীর চোখে প্রাচীন ভারত আবার নতুন ক'রে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিলো আপন মহিমায়—পশ্চিমের চোখে স্বাধীন ভারত সত্য সত্যই স্ব-প্রধান হয়ে দেখা দিলো।

অদৃশ্য নাট্যশালা

বাণীকুমার

বেতারে নাটক ও নাট্য বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে হ'লে—প্রথমেই নাটকের ধর্মটা কী, তা' অল্প-স্বল্প বলা দরকার। প্রত্যেক নাটকেই একটা 'নীতি' থাকে, এই নীতি নাটকের প্রধান ভাব। নাটকে যে কোনো ভাববাদ অনুসৃত হ'তে পারে, কিন্তু তার মূল সুর বা নিয়ামকচিন্তা হবে একটা নীতি। অন্য কথায় বক্তব্যটা এই যে, কোনো দেউল বা ইমারতের শীর্ষদেশ দেখলেই গঠন-উদ্দেশ্য যেমন বোঝা যায়, সেই রকম নাটকের গঠন এরূপ হওয়া উচিত—যার দ্বারা তার বস্তু-ব্যঞ্জনার তাৎপর্য বা মূল অর্থটা যেন সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। সকল মানুষেরই জীবনে এবং চরিত্রে তাদের সংস্কারজাত ও প্রকৃতিগত নীতি আছে; নাট্যকারের কাজ হচ্ছে—এই লোকশ্রেণীকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে, যাতে সেই অন্তর্নিহিত নীতি উগ্র দিনের আলোয় পরিস্ফুট হ'য়ে দেখা দেয়। এই রকম নীতির প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায় আগেকার বিশ্ববিশ্রুত নাটকে। কিন্তু বর্তমান নাট্যসৃষ্টির মধ্যে উক্ত নীতির সন্ধান পাওয়া যায় না। এখন রচনা-শৈলীর পরিবর্তন ঘটেছে, দৃষ্টিভঙ্গীও হয়েছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সাধারণতঃ আজকালকার নাটকের নীতি হয়েছে—একটা অনুমিত প্রত্যক্ষ আচার-নৈতিক অহিত বা দুর্ভাগ্যের ওপর একটা মনঃকল্পিত সদ্যঃ স্পৃহনীয় বস্তু-আদর্শের বিজয়-সমারোহ, এই জয়ের জন্যে যদি অশেষ মূল্য দিতে হয়—তবুও।

নিপুণ নাট্যকারের হাতে সবল চরিত্রসৃষ্টি ও অনিবার্য ঘটনা-সংহারের গুণে—নাটকের উৎকর্ষই সম্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু এ-স্থলে নিজেদের সত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞ কয়েকজন অনুকারী এই ধরণের নাটক লিখতে গিয়ে—কেউ কেউ হ'য়ে উঠেছেন একদর্শী, কেউ বা শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়েছেন। এর একমাত্র কারণ—অনুকরণে পরিকল্পনা ও পল্লবগ্রাহী ভাবাদর্শ. এর ফলে নীতি [illegible] বিকৃত-নীতির হয় উদ্ভব। জীবনের সত্যটার ঘটে অপমৃত্যু, অনুমান-লালিত বস্তুকে খাড়া করবার একটা কসরত চলে। আর যাঁদের লেখনী দুর্বল, তাঁদের লেখা নাটকের চরিত্র-গুলি রক্ত-মাংসের মানুষ নয়—এক একটা প্রাণহীন বিকৃতাঙ্গ পুতুল। জীবন-চিত্রের পরিবর্তে দাঁড় করানো হয় জীবনে ব্যঙ্গ। এই জাতীয় নাটক লোকের মন থেকে জলবিম্বের মতোই মিলিয়ে যায়, এদের পরিণাম—বিস্মৃতি, আর বিস্মৃতিতেই গর্বান্ধতা। নাট্যশালার চেয়ে চিত্রলোকে এই নাম-গোত্রহীন নাট্য-বস্তুর অনেক বেশী দর্শন মিলেছে। কিন্তু এই প্রকার নাট্য-প্রয়োগের অক্ষমতা জনসাধারণের কাছে অনাদরই পেয়েছে, তাই বোধ করি—আজকে চিত্রে পুরাণ নিয়ে সস্তা-প্যাঁচের ব্যবসাদারি খেলা শুরু হয়েছে এবং সেগুলির আদর্শহীনতা, অপকর্ষ ও দৌর্বল্যের জন্যে অপঘাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

যাই হোক্, এ-কথা আজকে স্বীকার করতেই হবে যে, নাট্যপ্রয়োগ ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটেছে। নাট্যপীঠ অতিক্রম ক'রে অখণ্ডরূপে নাটক আপন রূপ-প্রকাশের ক্ষেত্র পেয়েছে মুখর-চিত্রে ও বেতারে। এস্থলে উল্লেখ করা দরকার—নাটকের মূলগত ধর্ম এক হ'লেও—ক্ষেত্র বিভেদে এর প্রকাশ হয় বিভিন্ন। তিনটি ক্ষেত্রেই—নাটক গ'ড়ে তুলতে হ'লে আখ্যানভাগ, সংলাপ, চরিত্র কার্য ও রস—এই পাঁচটির সমন্বয় আবশ্যক। এ ছাড়াও নাট্যালয় ও মুখর-চিত্রে বেশ-ভূষা, দৃশ্য প্রভৃতি অপরিহার্য। কিন্তু বেতারের নাটক শ্রব্যরূপ ব্যঞ্জক, সেজন্যে পূর্বোক্ত পাঁচটি বিষয় নিয়েই তার গঠন ও পরিপূর্ণতা, এই শ্রেণীর নাটকে বেশভূষা ও দৃশ্যের কোনো স্থান নেই। রঙ্গালয়, মুখর-চিত্র ও বেতার—এই তিন ক্ষেত্রেই নাটকের মুখ্য ধর্ম ও উদ্দেশ্য সমজাতীয়, কিন্তু তিনটিরই রচনা-শৈলী সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

এখানে বেতার নাট্য-শৈলী আমার আলোচ্য বিষয়। এই আলোচনার প্রথম কথা বেতার-উপযোগী নাটকরচনা নিয়ে। অবশ্য এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে—বেতার-নাটক রচনা করতে হলে নিতান্ত আবশ্যক—নাটক-রচনা-বিষয়ে জ্ঞান এবং সংলাপ-রচনায় সংযম ও পারদর্শিতা।

এ-সমস্ত গুণ থাকলেও বেতারের জন্যে নাটক রচনা করতে গেলে বেতারের কয়েকটি মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা থাকা প্রয়োজন, নইলে এখানকার আভ্যন্তর-বৈশিষ্ট্য রচয়িতার অজানাই থেকে যাবে। বেতার-নাটককে কয়েকটি রীতি মেনে চলতে হয়। একারণে—বেতারের 'নেপথ্য'-সম্বন্ধে অজ্ঞ লেখকের পক্ষে তাঁর রচনাকে এই মাধ্যমের বিশেষ সীমা-বন্ধনের মধ্যে বাধ্য করা কঠিন হ'য়ে ওঠে। এর প্রমাণ যা' পাওয়া গেছে—তা' বিরল নয়। বেতার-নাটক ও রঙ্গমঞ্চের নাটক—এই দুই-এর সম্যক পার্থক্য-বোধ না থাকলে বেতার-নাটক রচনা করতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। বেতার-নাটকের যতটুকু প্রাপ্য—তা' থেকে তাকে বঞ্চিত করলে, যে নাট্যরূপের উৎপত্তি হয়—সেটি বেতার-ক্ষেত্রে 'রেফিউজি' (refugee) ব'লেই গণ্য। এইরকম 'রেফিউজি-নাটক' বেতারে এসে ভিড় জমিয়ে তোলে সবচেয়ে বেশী, সেগুলির আদর্শ হ'চ্ছে থিয়েটারী নাটক, প্রকৃত প্রস্তাবে শতকরা একটিও বেতারের মূল সূত্র অনুসারে লিখিত হয় না। এখানে যে শুধু শ্রবণেন্দ্রিয় নিয়েই কাজ, এই সত্যটুকু অনেকেই ভুলে যান। বেতারের চাহিদা মেটাবার জন্যে এই সমস্ত নাটকের মধ্যে অভিনয়-যোগ্য বিবেচনায় কয়েকখানি নির্বাচন করতে হয়, এবং প্রযোজক এই জাতীয় নাটককে নুইয়ে বেঁকিয়ে যতটা সম্ভবপর সঙ্গতি রক্ষা ক'রে বেতারের উপযোগী ক'রে নিতে বাধ্য হন। অন্যান্য ক্ষেত্রের নামী বা অল্পনামী লেখক তাঁদের রচনায় বেতার-প্রকৃতির যথার্থ মান রাখতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। অনেকের নামের পোড়েন চাপিয়ে বেতার-বিজাতীয় বস্তু চালিয়ে দেওয়া হ'য়ে থাকে। নামকরা কোনো কালির আধারে ভেজাল দিয়েও যেমন বাজারে সেটি লেবেলের জোরে চড়া দামে বিক্রী হয়, এও অনেকটা সেই রকম।

মঞ্চ-নাটক যে বেতারে অভিনয় করা যুক্তিযুক্ত নয়, তা' জোর ক'রে বলা যায় না। এমন জনপ্রিয় সুলিখিত মঞ্চ-নাটক আছে—যেগুলির প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। সেজন্যে এই প্রকার নাটকাভিনয়ের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এর 'দৃশ্য'-রূপকে 'শ্রব্য'-রূপে পরিণত করা দরকার, তবেই এ-নাটক চোখে না দেখেও সকলের বোধগম্য হ'য়ে উঠবে। মঞ্চ-নাট্যে বা চিত্র-নাট্যে যা' দর্শনে ভাব-বস্তু উপলব্ধি করা যায়, তা' বেতারে অব্যক্তই থাকে, এই অব্যক্তটাই হ'চ্ছে ফাঁক—আর এই ফাঁকটা পুরিয়ে না দিলে বস্তু বা ঘটনা স্থানে স্থানে সামঞ্জস্যহীন হ'য়ে পড়ে। মঞ্চ-নাট্য রূপারোপ ব্যতিরেকে বেতারে অনুষ্ঠিত হওয়া কোনোক্রমেই বিধেয় নয়। কারণ—মঞ্চনাট্য ও বেতার-নাট্যের শৈলী-ক্ষেত্রে মোটেই সৌসাদৃশ্য নেই। এদের মিলনের কেবল একটি

ক্ষেত্র আছে…মঞ্চ ও বেতারের একই দাবী—নাট্যকারের রচনা-শক্তি ও বক্তব্য-বিষয় পরিস্ফুট করার কৌশল।

ক্ষেত্র-বিভেদে সংলাপের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। কেননা সংলাপই চরিত্রসৃষ্টির প্রধান বাহন। উপন্যাস, ছোট গল্প, মঞ্চ-নাটক, চিত্র ও বেতার-নাটকের জন্য লিখিত সংলাপের মধ্যে যে প্রভেদ বর্তমান সে বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। উপন্যাসের সংলাপ সাধারণতঃ সাহিত্যের ভাষা-ভারে একটু ভারী হয়ে ওঠে, কেননা ঔপন্যাসিকের পক্ষে তাঁর রচনার সাহিত্য-ধর্ম ও বর্ণনাত্মক রীতিকে কথ্য ভাষায় ফলিয়ে তোলা দুরূহ ব'লে প্রতীত হয়। সেজন্যে বহু উপন্যাসে সংলাপ হয় ভারাক্রান্ত, এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আড়ষ্ট। ঔপন্যাসিকের সংলাপ প্রায়শঃ পড়তে ভালো এবং চমৎকার চরিত্র-বিশ্লেষক, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মঞ্চ, চিত্র বা বেতার সংলাপ আর উপন্যাসের সংলাপ ঠিক সম-প্রকৃতির নয়। এছাড়াও [illegible] একটি বিশেষ কথা এই যে নীরব-পাঠের উপযোগী ক'রে উপন্যাস রচিত হয়, সাধারণ্যে বাগ্‌জাল-বিস্তারে মুখর ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে নয়। তদুপরি স্থান বা কালের সীমার মধ্যে ঔপন্যাসিক আবদ্ধ থাকেন না। তাঁর মুক্ত-গতি একপ্রকার অতি দীর্ঘ—ইচ্ছামত ছেদ টেনে দেবার স্বাধীনতা তাঁর আছে, কিন্তু নাট্যকারের সে স্বাতন্ত্র্য নেই—তাঁকে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যবনিকা-পাত করতেই হবে, চিত্রনাট্য-প্রণেতাকে তাঁর রচনা শেষ করতে হবে প্রায় একশো' মিনিটের মধ্যে। ছোটগল্পে উপন্যাসের তুলনায় সাধু-ভাষার বাহুল্য থাকে না এবং সংলাপও হয় অপেক্ষাকৃত অল্প বাক্য-বহুল। ছোটগল্প লেখকের হাতে সময় কম, তাই তাঁকে সংলাপ লিখ্‌তে হয় ওজন ক'রে, সাবধানে, মিতাচারে। প্রমাণতঃ উপন্যাসের চেয়ে গল্পে বাস্তবের রঙ একমাত্রা বেশী ফলিত হ'য়ে ওঠে। চিত্রনাট্যের সংলাপ রচনা করতে হয় সম্পূর্ণ প্রাকৃতভাষায়, এ-স্থলে সাহিত্য প্রকাশের সামান্য লোভ সুফলের পরিবর্তে বিপর্যয়ই এনে দেয়। নাট্য-সংলাপের তুলনায় চিত্র-সংলাপ অনেক সহজ, অনেক প্রাঞ্জল হওয়া দরকার। বেতার-নাট্যকারকে প্রধানতঃ নির্ভর করতে হয় সংলাপের ওপর। মঞ্চ-নাট্যকার বা চিত্রনাট্য-লেখকের ন্যায় তাঁর কোনো দৃশ্য-সহায় নেই। দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়—এই দু'টির সহায়তায় মঞ্চ ও চিত্র-রচয়িতার পক্ষে তাঁদের রস-বস্তু দর্শকসাধারণের চিত্তে পৌঁছে দেওয়া বেতার-লেখকের চেয়ে অনেক সহজ হ'য়ে ওঠে। তাই বেতার-নাট্যকার সংলাপ রচনায় সুদক্ষ না হ'লে শ্রোতৃগণের মানসপটে অলখ নাট্যের বাণীচিত্র (audible drama) সার্থকরূপে

প্রতিফলিত হ'তে পারে না। এইটুকু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে যে—বেতার-সংলাপ হওয়া উচিত সহজ-বোধগম্য, এর প্রকৃতি হবে অতি-স্বল্প, দ্রুত ভাবপ্রকাশক, শব্দবহুল অথচ সুস্পষ্ট। তবে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে—বিষয়বস্তুর গুরুত্বের ওপর প্রকাশভঙ্গী নির্ভর করে এবং তদনুপাতে ভাষার গুরুত্ব নির্ধারিত হয়।

এই হলো বেতার-নাটকের মূল কথা, এ-ছাড়াও আরো খুঁটিনাটি অনেক বিষয় আছে—যা' বেতার-নাটকের অবিচ্ছেদ্য গুণ। বেতার-নাটক রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা যেতে পারে, আর কী ধরণের নাটক সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে—তা'ও প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু এস্থলে এই বক্তব্য পরিমিত না করলে—প্রবর্তনা ও অভিনয় সম্পর্কে মোটামুটি কয়েকটি অতি-প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করার সুযোগ ঘটবে না।

অতঃপর আলোচ্য বিষয়—প্রবর্তয়িতা বা পরিচালক। বেতার-নাট্যের পরিচালক বা প্রযোজকের এমন কয়েকটি গুণ থাকা দরকার, যেগুলি আবশ্যিক ব'লেই গৃহীত। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ হ'চ্ছে—নাট্যকলা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, যে-জ্ঞানের ভিত্তি হবে অভিজ্ঞতার ওপর। এই অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি বিশেষজ্ঞ হ'য়ে উঠতে পারেন, যা'র পরিণতি—তাঁর চরিত্র-বোধশক্তি। শুধু তাই নয়—এই অনুভূতি তিনি শ্রোতৃগণের কাছে পৌঁছে দেবার নৈপুণ্য অর্জন করেন। ঘটনা, চরিত্র প্রভৃতি বিশ্লেষণে তাঁকে প্রতিনিয়তই অভিনেতাদের দীক্ষিত ক'রে তুলতে হয়, সুতরাং পূর্বোক্ত ক্ষমতা তাঁর আয়ত্বাধীন থাকা অবশ্যই দরকার। পরিচালক বা প্রযোজকের কর্তব্য—কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে নাটকের পাতাগুলিকে একটা সজীব ভাব-দানে প্রাণমূর্ত ক'রে তোলা। নাটকীয় সংঘর্ষ, চরিত্র-চিত্রণ, গতি-নিয়মন ও প্রবৃত্তি-জনন এবং নাট্যশৈলী-ব্যাপারে তিনিই চূড়ান্ত বিচারক। তাঁকে সাজতে হবে যুগপৎ সমালোচক ও শ্রোতা-রূপে। নাটকের ভাবভঙ্গী ধারণা করবার শক্তি ও যথার্থ অনুভব করবার যোগ্যতা প্রবর্তকের বিশেষ গুণ,

ফলতঃ নাটকীয় উদ্দেশ্য, ভাব ও কার্য বজায় রেখে লেখ্যের (স্ক্রীপ্ট্) কোনো কোনো অংশ আবশ্যক-মতো কাটছাঁট ও সম্পাদনা ক'রে মাইক্রোফোনের সামনে তুলে ধরবার মতো সৎসাহস বা ক্ষমতার অভাব ঘটে না। প্রযোজকের আর একটি প্রধান গুণ হ'চ্ছে—অভিনেতাদের অনুপ্রেরিত করা। যাঁর এ-শক্তি নেই, তাঁকে বাধ্য হ'য়ে প্রতি বিষয়ে ফল-প্রাপ্তির জন্যে অভ্যাস-সিদ্ধ বৈচিত্র্যহীন যন্ত্র-কৌশলের ওপর নির্ভর করতে হয়। এর কিন্তু বিশেষ কোনো মূল্য নেই, আর সুপরিচালিত সুষ্ঠু অনুষ্ঠানও সব সময়ে আশা করা যায় না। দ্বিতীয় কথা হ'চ্ছে—শিক্ষা দেবার শক্তি একটা মস্ত বড় গুণ। ভূমিকা গ্রহীতাগণকে বেতার-শৈলী শেখাবার উপযুক্ত বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামর্থ্য বেতার প্রযোজকের না থাকাটাই তাঁর অযোগ্যতা প্রমাণ করে। মঞ্চ-অভিনেতা বা চিত্র-অভিনেতাকে বেতার চরিত্রাভিনয়ে দীক্ষিত ক'রে তোলা তাঁর কর্তব্য।

মঞ্চনাট্য বা মুখরচিত্র পরিচালনা করতে পারলেই যে বেতার নাট্য প্রবর্তনায় সাফল্য লাভ করা যায়, তা ভ্রান্ত ধারণা। এই মন্তব্যের প্রমাণ করে—এখানকার বেতার কেন্দ্রে নাট্য প্রযোজনায় কয়েকজন পরিচালকের অকৃতকার্যতা। বেতার-শৈলী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে—অন্য ক্ষেত্রের যত বড় সুকৌশলী পরিচালক হোন না কেন—তিনি বেতার প্রয়োগের যথাযথ মর্যাদা রাখতে সমর্থ হবেন কিনা সন্দেহ।

এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, বেতার-নাটক নির্বাচন অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে করা দরকার। নির্বাচনের গলদই সমস্ত নষ্টের মূলে। উপরন্তু—অভিনেয় চরিত্র-নির্দেশও বিশেষ মনোযোগের বস্তু। নাট্য-প্রয়োগে ভাবীসম্ভাব্য চরিত্রাভিনেতৃবর্গের সম্বন্ধে প্রযোজকের অবগতি এড়িয়ে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার কাজ। প্রযোজকের ওপর অযোগ্য বা অনুচিত ওস্তাদি বা অপরিণত বুদ্ধির অন্যায় কর্তৃত্ব বহুক্ষেত্রে কুফলই প্রসব করে থাকে। এ দৃষ্টান্ত, বোধ করি, বিরল নয়। অভিনেতার কণ্ঠস্বর প্রভৃতি আনুষঙ্গিক গুণাগুণ বিচার ক'রে ভূমিকা নির্বাচন করাই যথার্থ বিধি, এই নির্বাচন অনেক সময়ে ব্যক্তিগত পক্ষপাতদোষদুষ্ট হ'য়ে উঠতে দেখা যায়। এই ক্ষতিকর প্রবৃত্তিকে দূরে রেখে—অভিনেতৃ-নির্বাচনে ভাবতে হবে অনুষ্ঠানের সাফল্যের বিষয়। এর প্রতিকূল বৃত্তি নাট্য-ব্যাপারে অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। শ্রোতৃসাধারণের সঙ্গে নাট্য-প্রযোজকের প্রত্যক্ষ-যোগ বর্তমান, এই কারণে—তাঁর দায়িত্ব অনেকখানি। সেজন্যে প্রযোজক ভিন্ন তৃতীয় ব্যক্তির অভিনেতৃ-নির্বাচন অযৌক্তিক শুধু নয়—গ্রাহ্যই হ'তে পারে না। দুর্বল নট-নটী নির্বাচনের ফলে—বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে সুলিখিত নাটকের অপমৃত্যু, কখনো আবার সুনির্বাচিত কণ্ঠ নিয়ে দুর্বল নাট্য-বস্তুকে তারণ করাও সম্ভবপর হয়েছে।

প্রযোজকের প্রথম কাজ—পাণ্ডুলেখ্য-পাঠে নাটকের পরিচয়-গ্রহণ। তারপর আবশ্যক-মতো পরিবর্তন-সাধন ও

এ ভি এম প্রোডাকসন্সের নৃত্যগীতবহুল চিত্র
'লেড়কী'র নায়িকা বৈজয়ন্তীমালা

সত্তমুক্ত 'নিষ্কৃতি' ছবিতে সন্ধ্যারাণী

নানাপ্রকার নির্দেশ লিখে নাট্যরচনাটিকে প্রয়োগ-যোগ্য ক'রে তোলা। এর পরে নাটকটি পড়ে মহলায়। প্রাথমিক মহলায়—প্রযোজক অভিনেতৃগণের সঙ্গে নাটকের পরিচয় করিয়ে দেন, তারপরে প্রত্যেকটি চরিত্রের বিশ্লেষণ করে তিনি চরিত্রানুযায়ী প্রথম পাঠ প্রতি-জনের শ্রুতিগোচরে আনেন। পরে আবার প্রয়োজন-বোধে মহলা চলতে থাকে। প্রযোজক চরিত্র-ব্যঞ্জনার দোষ-ত্রুটী, উচ্চারণ, কথনভঙ্গীর জড়তা প্রভৃতি শুধরে দেন। অনন্তর সজীব-মাইক্রোফোনের সামনে পুরো-দস্তুর মহলা দেওয়াই রীতি। সর্বশেষে মহলা যা' হবে —তা' প্রকৃত অনুষ্ঠানের ন্যায় সঙ্গীত, শব্দ প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়-সহযোগে পরিচালিত হওয়া উচিত। এই মহলায় প্রযোজক নাট্যের সময় বেঁধে নেবার জন্যে—যা' করণীয় তা' তিনি সম্পূর্ণ করেন।

মহলার কম-বেশী বহুলাংশে নির্ভর করে—রকমফের নাটকের ওপর ও অভিনেতৃদের সামর্থ্যের তারতম্যের ওপর, সর্বোপরি স্বয়ং প্রযোজকের কৃতিত্বের ওপর। মোটামুটি এইটুকুই বলা গেল।

এর পরের বক্তব্য বেতার-অভিনেতা সম্বন্ধে।······ মঞ্চ-নাটকের সাফল্য বা অসাফল্য নির্ভর করে প্রধানতঃ নাট্যকারের হাতে। উৎকৃষ্ট মুখর-চিত্রের জন্যে দায়ী পরিচালকের বহুসন্ধানী চোখ। অভিনেতার বাচিক অভিব্যক্তি বেতার-নাটকের প্রতিষ্ঠা করে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, বেতারে দীক্ষিত অভিনেতৃগণ সম্প্রচারিত নাটককে তা'র যান্ত্রিক সন্নিবেশ থেকে তুলে বাস্তবের কোঠায় পৌঁছে দিতে পারেন। এটা মঞ্চের বা চিত্রের অভিনেতৃবর্গের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না। এ-বিষয়ে একাধিকবার এঁদের অকৃতকার্যতা সবিশেষ প্রমাণিত হয়েছে এখানকার বেতার-প্রতিষ্ঠানে। এ-রকমও ঘটেছে—চিত্র-পরিচালকের প্রযোজনায় চিত্রাভিনেতৃগণের অভিনয় কেবল রস-ব্যত্যয়ের কারণ হ'য়ে ওঠেনি, শ্রোতৃসাধারণের কাছে একঘেয়ে, বিরক্তিকর ও ব্যঙ্গের ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে। এর ত্রুটীর তালিকার মধ্যে কয়েকটি প্রধান কথা এই যে, অভিনেয় নাটকটিকে বেতারের উপযোগী ক'রে তোলায় ও বেতারনাট্য-প্রযোজনায় চিত্র-পরিচালক হঠাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ হ'য়ে উঠতে পারেন না, তদুপরি চিত্রাভিনেতৃবৃন্দের কথনভঙ্গীর আড়ষ্টতা, একঘেয়েমি ও দুষ্ট উচ্চারণ এবং চরিত্র-চিত্রণে ও ভাব-বিন্যাসে অপটুতা। চিত্রের অভিনেতাদের চেয়ে অধিকাংশ অভিনেত্রী বেতার-নাট্যে আনাড়ী —এরূপ প্রত্যক্ষ করা গেছে, কেননা বেশীরভাগই যোগ্য শিক্ষার অভাবে অভিনয়-জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না বলেই মনে হয়। দর্শনদারি, রূপসজ্জা ও আঙ্গিক ভঙ্গিমা—এই থাকলেই তথাবাচ্য পরিচালক সন্তুষ্ট, আর এরই জোরে চিত্রে অনেকে চ'লে যাচ্ছেন অভিনয়-জ্ঞান থাক্, না-থাক্। কিন্তু বেতারে ওগুলোর কোন মূল্য নেই, এ-স্থলে কণ্ঠস্বর ও অভিনয়-কৌশলই মস্ত বড় কথা।

সুষ্ঠু কথনের মূল নীতি হ'চ্ছে—প্রত্যক্ষ কথোপকথনের ভঙ্গী অনুসরণ করা। নীরব আকার-ইঙ্গিত অভিনয়ের সময় যদি সহায়ক বলে মনে হয়—তা'হলে তা' ব্যবহার করা উচিত। অদৃশ্য শ্রোতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা বা হাত-নাড়া দোষের নয়। বেতারে ঈষৎ হাসি পর্যন্ত শোনা যায়, কেননা এই হাসি কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন আনে। হাজার মাইল দূর-স্থিত শ্রোতার কানে গিয়ে বাজবে সামান্য ভ্রূকুঞ্চন। কিন্তু এমন কোনো হাব-ভাব বা ভঙ্গী পরিবর্তন করা কর্তব্য নয়, যা'র দ্বারা বাহ্য শব্দের উৎপত্তি হ'তে পারে। পাণ্ডুলিপি বা লেখা-কাগজ যে হাতে ধরা থাকে সেটিকে নিশ্চল রাখতে হবে। মাইক্রোফোনের সামনে দাড়ি-ঘসা, কাসি, হাঁচি, দু'ঠোঁট ফাঁক ক'রে কোনো আওয়াজ করা বা আঙুল মটকানো—একেবারেই চলে না। ভুল ক'রেও জোরে নিঃশ্বাস ফেলার ইচ্ছা যেন না হয়। কারণ এ-সকল অবাঞ্ছিত শব্দ দূর-স্থিত শ্রোতার কাছে অর্থহীন ব'লে বোধ হবে

মহাকবি শেক্সপীয়ার 'হ্যামলেট'-এ যে উক্তি ক' গেছেন সেই উৎকৃষ্ট উপদেশ-বাণীটি অভিনেতৃগণে অবগতির জন্যে উদ্ধৃত করছি!

"Speak the speech, I pray you, as pronounce it to you," trippingly, on th tongue : for if you mouth it, as many of yo players do, I had as if the town-cryers spak my lines···the purpose of playing, at the fir and now, was and is, to hold, as it wer the mirror upto nature.

মহাকবির এই নির্দেশমতো—অভিনয়ে বক্ত কথাগুলির সুস্পষ্ট উচ্চারণ, সুসমঞ্জসভাবে বাক্যের মাত্র ভাগ, এবং অকৃত্রিমরূপে কথনভঙ্গী সুবক্তা বা সু-অভি নেতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। আ কয়েকটি অপরিহার্য বিষয় এস্থ বিবেচনার যোগ্য। বেতারভাষ এক একটি বিচ্ছিন্ন পদ অপে পদসমগুলী অনেক বেশী কার্যকর শ্রোতা ভাব-ব্যঞ্জক পদ সমষ্টি উদ্দেশ্য-বিধেয়-যুক্ত বাক্যাংশই সহ গ্রহণ ক'রে থাকে। সদ্বিবে ও সুনিপুণ বেতার-অভিনে সাধারণ বিরাম-চিহ্নের ও

নির্ভর না ক'রে, পাণ্ডুলেখ্য প'ড়ে পদ-সমষ্টি ভাগ ক'রে নেন্—সেগুলি সম্মিলিত হ'য়ে তাঁর ভাবধারা প্রকাশ করে। একটানা সুর এড়াবার জন্যে এই সমস্ত পদ-সমষ্টির দৈর্ঘ্যের তারতম্য হওয়া উচিত, কিন্তু এর মধ্যে কোনোটাই বেশী বড় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—কেননা তা'তে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা জাগ্‌তে পারে। মাইক্রোফোনের সামনে নাসারন্ধ্র দিয়ে কিংবা জিবের ওপর দিয়ে খুব আস্তে সতর্ক হ'য়ে শ্বাস-গ্রহণ করতে হয়। মাইক্রোফোনের ঠিক সোজা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেল্‌লে অনেকটা ঝ'ড়ো বাতাসের মতো শোনায়। ঋজুভাবে, উন্নতবক্ষে, মাথা উঁচু ক'রে, পায়ের পাতা মেঝের ওপর সমান ফেলে মাইক্রোফোনের সাম্‌নে দাঁড়ানোই রীতি। এখন প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে—মাইক্রোফোন্ থেকে কতটুকু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলা উচিত। এ-সম্বন্ধে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। একটা নির্দিষ্ট নিয়ম সর্বক্ষেত্রে খাটে না। এটি বিশেষ আলোচনার বিষয় হ'লেও এ-ক্ষেত্রে বেশী কথা বল্‌বার সুযোগ ধর্‌তে চাই না। তবে এইটুকু মনে রাখতে হবে যে, মাইক্রোফোনের কোনো বিবেচনা নেই—যে-রকমটি তা'র কাছে পৌঁছবে, ঠিক সেইরূপেই তা'র দ্বারা অভিব্যঞ্জিত হবে। সেজন্যে মাইক্রোফোনের থেকে কতখানি দূরত্ব রক্ষা ক'রে বচন-প্রয়োগ করা উচিত সে-সম্বন্ধে প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রী যদি না জেনে নিতে চেষ্টা করেন, তা' হ'লে যা' ফল হয়—তা' মোটেই রুচিকর বলা যায় না।

চরমোৎকর্ষসাধনই যে বেতার নাট্যানুষ্ঠানের মূল সর্ত—তা' ঠিক বলা যায় না, কিন্তু শিল্পীর আন্তরিকতা, ক্ষিপ্রগ্রাহিতা বা বুদ্ধিমত্তা ও ধারণা-শক্তি এমন একটি বস্তুর সৃষ্টি করবে—যা' মনের মধ্যে এঁকে দেবে বাস্তব-রূপ।

বেতার-অভিনেতার সংলাপ-কথনে সবচেয়ে

নির্মীয়মান হিন্দী চিত্র 'বড় লোক'-এর একটি দৃশ্যে অভি ভট্টাচার্য্য ও মধুবালা

দরকার স্বতঃস্ফূর্ততা অর্থাৎ স্বচ্ছন্দতা, নইলে কৃত্রিম বাক্য-বিন্যাস বিশেষভাবে শ্রোতার কানে গিয়ে বাজে।

মঞ্চাভিনয় অপেক্ষা বেতার-অভিনয়ে ইঙ্গিত-সূত্র ধর্‌বার জন্যে অভিনেতাকে অধিকতর ক্ষিপ্র হ'তে হবে, কারণ—শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো সাম্‌নে

কোনো বস্তুই থাকে না। কিন্তু বেতারেওইঙ্গিত ধ'রে নেবার গতির ব্যতিক্রম থাকে। ইঙ্গিত-ধারার এই যে পরিবর্তন-মাত্রা এবং সেইসঙ্গে বাচন-বৈষম্য—গতি-বেগ সম্পর্কিত ব্যাপার। গতি-ভঙ্গী বা গতি-বেগ (pace) বেতার-নাট্যশিল্পে একটি অতিপ্রয়োজনীয় তত্ত্ব।

অভিনেতাকে তাঁর স্বর-মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে—তাঁর মনোভাব, তাঁর চরিত্র-ব্যঞ্জনা এবং তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এই কণ্ঠের রঙ্‌ ফলিয়ে তোলার কৃতিত্ব যাঁর যে-রকম আছে, তিনি তদনুপাতেই শ্রোতার মনে রঙ্‌ ধরাতে পারেন। কণ্ঠস্বরের সংযম ও চাতুর্য না থাকলে—অভিনেতার সমস্ত কসরৎ বাষ্পের মতো উড়ে যায়।

অধিকাংশ বেতার-অভিনয়ে অনেকেরই কণ্ঠস্বরের কৃত্রিমতা পরিস্ফুট হ'তে দেখা যায়, এবং থিয়েটারীভঙ্গী নির্দয় মাইক্রোফোন বর্ধিততররূপে প্রকট ক'রে তোলে। বেতার-অভিনেতার লক্ষ্য হবে—তাঁর স্বর-পরিমাণের নিয়ন্ত্রণ, তথাপি উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী ভাব-ব্যঞ্জক স্বর-প্রকাশে সামান্য কার্পণ্যও অমার্জনীয়। তাঁর বাগ্‌-বিন্যাস-প্রণালী হবে সুনিয়মিত ও স্বাভাবিক। তিলমাত্র থিয়েটারী আড়ম্বর সমগ্র বিষয়টিকে নষ্ট করে, এবং তা' হ'য়ে ওঠে কৃত্রিম ও শ্রুতিকটু। স্বাভাবিক বাগ্‌রীতি আয়ত্ত করা একেবারেই সহজ নয়; প্রকৃতপক্ষে—বাগ্‌বিন্যাস যে স্বাভাবিক হ'চ্চে না—এই বিষয়টি সম্বন্ধে অনেক শিল্পীর মনে দৃঢ়প্রত্যয় এনে দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু বেতার কৃত্রিমতা কোনোক্রমেই সইতে পারে না। কৃত্রিম কথন বেতার-ক্ষেত্রে দৌরাত্ম্য ভিন্ন আর কিছুই নয়।

"Naturalness is at a premium on the air as nowhere else"………

বিশেষজ্ঞের এই স্বতঃসিদ্ধ উক্তি অভিনেতৃগণের মনে রাখা উচিত।

মাইক্রোফোনের সামনে অভিনয়কালে অভিনেতৃগণকে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে। চরিত্র চিত্রণের প্রতি অত্যন্ত একাগ্রতা থাকা সত্ত্বেও—তাঁকে পাণ্ডুলেখ্য মনে মনে প'ড়ে যেতে হবে, মাইক্রোফোন থেকে সঠিক দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলতে হবে, প্রযোজক বা পরিচালকের সঙ্কেতের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বাচন-গতি ও সমতা সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে, আর নাটকীয় কার্য-সম্পর্কে প্রাথমিক শব্দ ও সঙ্গীত প্রয়োগের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। কিন্তু গোড়ার কথা ও শেষ কথা এই যে—বেতার নাট্য-প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব প্রবর্তয়িতার। তাঁরই নির্দেশে সমস্তই পরিচালিত হ'য়ে থাকে, সাফল্য-অসাফল্যের জন্যে তিনিই একমাত্র দায়ী। তবে গোড়ায় যদি হয় গলদ্‌ অর্থাৎ যে-বস্তুর নাট সেই নাটকই যদি হয় অপাংক্তেয়—তা'হলে শ্রোতৃবর্গে সেট্‌ বন্ধ করা ভিন্ন উপায় কি!

তানসেন

গীতিরসিক

★

"পাঞ্জাবের তানসেন গুলি নিতে ভুলো না, দাদা, নিতে ভুলো না।" রেলের কামরায়, গাঁয়ের মেলায়, বাংলায়, বাংলার বাইরে বহু দূর দূর স্থানে সাধারণ ফেরিওয়ালার মুখে এই সুরেলা ছড়া আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনেছি। যারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোন সন্ধান রাখেনা তেমন দেহাতী কিষাণ মজুরদের মধ্যেও তানসেন নামটা একটা অপূর্ব যাদুর কাজ করে। আর যাঁরা গানবাজনার খোঁজখবর রাখেন, গানবাজনা ভালোবাসেন তাঁদের কাছে তানসেন নামটা স্বতঃই শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। যারা দরবারি কানাড়া, দরবারি তোড়ি, মিয়া কি মল্লার, মিয়া কি সারং প্রভৃতি রাগের ভক্ত তাঁদের কাছে তানসেন একজন সাধারণ মানুষ মাত্র নন, তিনি যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ।

কেবল গানে নয়, বাজনায়—রবাবী ও বীণকার এই দুই পর্যায়ের বহু খ্যাতনামা গুণী ওস্তাদ তানসেনের বংশোদ্ভূত বলে পরিচিত। তানসেন স্বয়ং রুদ্রবীণা বা রবাব যন্ত্রের আবিষ্কারক। বীণা এবং রুদ্রবীণা বাদনেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং অনেক নতুন গৎ সৃষ্টি করেছিলেন।

ভারতের সঙ্গীত জগতে গোপাল নায়ক, বৈজুবাওরা এবং আমির খসরুর পরেই তানসেনের স্থান—সেটা তাঁর আবির্ভাবের কালক্রম অনুসারে। বস্তুতঃ তানসেনই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জনক। তাঁর অবিনশ্বর সৃষ্টির মধ্যেই তানসেন বেঁচে আছেন, কিছু কিছু কিম্বদন্তীও লোকমুখে প্রচারিত আছে যাতে তানসেনের সঙ্গীত প্রতিভার অনেক অলৌকিক কাহিনী জানা যায়, কিন্তু এই লোকোত্তর প্রতিভার ঐতিহাসিক জীবনী সমধিক পরিচিত নয়। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে তানসেনের অনেক প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। "পাদশাশমা", "তুহফতুল হিন্দ", "কণীজুল আফাদত", "খুলাসতুল এশ" "নূরুল হদায়ক", "ফিলঙ্কহ মৌসিকী" প্রভৃতি গ্রন্থেও তানসেনের বিষয় জানা যায়। কিন্তু এইসব গ্রন্থ সুপ্রাপ্য ও সহজপাঠ্য নয়, পরন্তু দেশীয় ভাষায় এই সব পুস্তকের অনুবাদ না হওয়ায় তানসেনের জীবনী কিম্বদন্তীর মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে। বছর কয়েক আগে কুন্দনলাল সায়গল অভিনীত 'তানসেন' চিত্রে তানসেনের যে জীবনী দেখা গিয়েছিল তাতেও ঐতিহাসিক সত্য বিকৃত করা হয়েছিল, যদিও সে চিত্রে তানসেনের মহান প্রতিভার পরিচয় যথেষ্ট স্পষ্টভাবেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক গবেষকদের উচিত বৈজু বাওরা, তানসেন প্রভৃতি সঙ্গীত-সাধকদের জীবনী জনপ্রিয় করে তুলতে বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত সকল প্রকার জীবনী রচনা করা। এ বিষয়ে সঙ্গীতাচার্য শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় পথিকৃতের কাজ করেছেন। তানসেনের জীবনী খুব সংক্ষেপেই উল্লেখ করছি।

১৫০৬ খৃষ্টাব্দে বারণসীতে তানসেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুকুন্দরাম (বা মকরন্দ) পাঁড়ে। তানসেনের মাতা মৃতবৎসা ছিলেন, তাঁর বহু সন্তান নষ্ট হয়েছিল, তাই মুকুন্দরাম গোয়ালিয়রের সিদ্ধপীর মহম্মদ গওসের শরণাপন্ন হন। পীরসাহেব একটি কবচ দিয়ে বলেন, সে বার সন্তান জন্মগ্রহণ করা মাত্র সেই কবচটি তাকে পরিয়ে দিতে, তাতে সে সন্তান কেবল দীর্ঘজীবী হবে তাই নয়, পরন্তু মহামনীষাসম্পন্ন হবে। সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার নাম রাখা হয় রামতনু। এই রামতনু পাঁড়েই উত্তরকালে তানসেন নামে বিখ্যাত হন।

রামতনু শৈশবে বড় দুরন্ত ছিল। বালক-বয়সে তার কণ্ঠে অপরূপ সুরলালিত্য শুনে সকলেই মুগ্ধ হত। তিনি জীবজন্তুর ডাক শুনে অবিকল নকল করতে পারতেন। এই হরবোলা বৃত্তি তাঁকে স্বামী হরিদাসের আশ্রয়ে টেনে নিয়ে যায়। বৃন্দাবনে নিধুবননিবাসী সিদ্ধপুরুষ স্বামী হরিদাস মার্গসঙ্গীতের জনক ছিলেন। তিনি একবার সশিষ্য বারাণসীধামে আসেন। যখন তিনি লোকালয় থেকে দূরে নির্জনে বিশ্রাম করছিলেন তখন রামতনু কৌতুক পরবশে সিংহগর্জন করে তাঁদের ভয় দেখাতে থাকেন। শিষ্যেরা ভয় পেলেও স্বামী হরিদাস সন্দেহাকুল চিত্তে

সিংহের সন্ধান করতে গিয়ে বৃক্ষান্তরাল থেকে বারো বছরের বালক রামতনুকে ধরে আনেন। বালকের প্রতিভাদীপ্ত চেহারায় ও আলাপে মুগ্ধ হয়ে তিনি তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে নিজের কাছে বৃন্দাবনে নিয়ে যেতে চাইলেন। মকরন্দ রাজী হলেন। রামতনু স্বামী হরিদাসের সঙ্গে বৃন্দাবনে তাঁর আশ্রমে গেলেন এবং সেখানে একাদিক্রমে দশ বছর দিব্য সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এইবার মকরন্দের মৃত্যুকাল উপস্থিত হল। রামতনু পিতার মৃত্যুশয্যার কাছে ছিলেন। সেই সময় মকরন্দ পুত্রকে গোয়ালিয়রে হজরত মহম্মদ গওসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উপদেশ দেন। পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর মাতারও মৃত্যু হয়। রামতনু স্বামী হরিদাসের আশ্রমে ফিরে যান এবং পিতার শেষ ইচ্ছার কথা জানালে স্বামিজী তাঁকে মহম্মদ গওসের কাছে পাঠান।

এখানে রামতনুর জীবনের আর এক অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। মহম্মদ গওস রামতনুকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন এবং নিজের যাবতীয় বিষয়-আশয় দান করে তাকে সংসারী করতে চাইলেন।

রামতনু শুনেছিলেন গোয়ালিয়রের মৃত মহারাজ মানসিংহের বিধবা মহিষী মৃগনয়নী সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী। মহম্মদ গওসের অনুগ্রহে রামতনু মহারাণীর গান শুনতে পেলেন এবং নিজেও তাঁকে গান শোনালেন। মহারাণী এই তরুণ যুবকের কণ্ঠসঙ্গীতে তুষ্ট হয়ে তাকে প্রত্যহ সঙ্গীত মন্দিরে আসবার আমন্ত্রণ জানালেন। এখানেই রামতনুর সঙ্গে পরিচয় হল হোসেনি ব্রাহ্মণী নামে এক মুসলমান ললনার। হোসেনি ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা মুসলমান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করায় তিনিও মুসলমান হন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল প্রেমকুমারী; তাঁদের উভয়ের গভীর ভালোবাসার কথা জানতে পেয়ে মহারাণী মৃগনয়নী মহম্মদ গওসের কাছে এই বিবাহের প্রস্তাব করলেন। মহাসমারোহে বিবাহ হল। মহম্মদ গওস ও মহারাণী মৃগনয়নী উভয়েই প্রচুর উপঢৌকন নবদম্পতিকে দিলেন। বিবাহের পর রামতনুর নাম হল—মহম্মদ আতা আলী খাঁ। বিবাহের পর আতা আলী সস্ত্রীক স্বামী হরিদাসের আশ্রমে ফিরে গেলেন। স্বামী হরিদাস উভয়কে বুকে টেনে নিলেন এবং পরম সমাদরে তাদের সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে ফকীর মহম্মদ গওসের মৃত্যুকাল আসন্ন জেনে তিনি আতা আলীকে গোয়ালিয়রে ডেকে পাঠালেন। স্বামী হরিদাসের অনুমতি নিয়ে আতা আলী সস্ত্রীক গোয়ালিয়রে ফিরে গেলেন এবং ফকির সাহেবের মৃত্যুর পর সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন। তবে তাঁর যোগসাধনা অব্যাহত চলতে লাগল এবং বৃন্দাবনেও তিনি ঘন ঘন যেতেন।

রেওয়ার মহারাজা রাজারাম বৃন্দাবন থেকেই আতা আলীকে তাঁর দরবারে নিয়ে যান। আতা আলী রাজারামের নামে অনেকগুলি গান রচনা করেন। রেওয়ায় তিনি যখন দরবারে গায়ক সেই সময় সম্রাট আকবর একবার রেওয়ায় আসেন এবং মহারাজের অতিথিরূপে রাজপ্রাসাদে অধিষ্ঠান করেন। তখন আতা আলীর স্বর্গীয় গানে আকবর মুগ্ধ হন এবং তাঁকে পরম সমাদরে দিল্লী দরবারে নিয়ে যেতে চান। রাজারাম সানন্দে স্বীকৃত হন। এইভাবে আকবর বাদশার দরবারে রামতনু

★

'হৃদয় মোর মেঘের মতো
আকাশমাঝে ভাসিতে চায়;
ধরার পানে মেলিয়ে আঁখি
ঊষার মতো হাসিতে চায়

★

আলোকচিত্রগ্রহণ :
প্রফুল্লবাস্তি ঘোষ

পাঁড়ে ওরফে মহম্মদ আতা আলী খাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়—উত্তরকালে যিনি 'তানসেন' নামে ভুবন বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। এ হ'ল ১৫৫৬ সালের কথা, তখন তানসেনের বয়স ৫০ বছর।

সম্রাট আকবর আতা আলীর গান অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। প্রত্যহ প্রাতে তিনি আতা আলীর গান শুনে দিন আরম্ভ করতেন। রাত্রেও শয়নের পূর্ব্বে গান শুনে তবে ঘুমোতেন। আতা আলী এই দুই সময় সম্রাটকে যে সব রাগরাগিনী শোনাতেন সেগুলি বিশেষ ধরণের সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয় ছিল। সম্রাট তাই তার নামকরণ করেছিলেন 'মিঞা কি রাগ'। দরবারে যে সব গান গাইতেন তাকে বলা হত দরবারি রাগ। এইভাবে দরবারি কানাড়া দরবারি তোড়ি প্রভৃতি বিখ্যাত রাগ সৃষ্ট হয়। একদিন সম্রাট আকবর সিংহাসনে বসে আছেন, এর জীবন্ত বর্ণনা আতা আলী খাঁ এমন অপূর্বভাবে সঙ্গীতে মূর্ত করে তুললেন যাতে বাদশাহ গায়ককে নিজের গলার মণিহার উপহার দিলেন এবং তাকে উপাধি দিলেন—'তানসেন'। বাদশাহের দেওয়া এই উপাধির অর্থ—যিনি গানের 'তান' দিয়ে 'সৈন' বা হৃদয় দ্রবীভূত করতে পারেন। অতঃপর আতা আলীর পরিবর্তে 'তানসেন' নামটাই সর্বত্র চালু হয়ে গেল।

তানসেন বাদশাহের দরবারে মাসিক ২০০০৲ টাকা বৃত্তি পেতেন। যখন তিনি চার পুত্রকে স্বকর্মে বহাল করে নিজে অবসর নিয়েছিলেন তখন তাঁকে মাসিক ১০০০৲ টাকা অবসর-ভাতা বা পেনসেন দেওয়া হত। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁকে এই ভাতা বাদশাহের দরবার থেকেই দেওয়া হত।

তানসেনের চার পুত্র সুরত সেন, শরৎ সেন, তরঙ্গ সেন এবং বিলাস খাঁ। কন্যা একটি, নাম সরস্বতী। এই সরস্বতীই মেঘ রাগ গেয়ে মুষলধারায় বৃষ্টি নামিয়ে দীপক রাগের প্রবল তাপ হতে তানসেনের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। তানসেনের দীপক রাগে গান গাওয়ার কাহিনী কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। তানসেনের জামাতা মিশ্রী সিংজী (নবাৎ খাঁ) শ্রেষ্ঠ বীণকার ছিলেন।

তানসেন কেবল সুরস্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন সিদ্ধ যোগী। সঙ্গীতের অনেক অলৌকি

ঘটনা তাঁর জীবনে বহুবার ঘটেছে। কিন্তু তিনি তা নিয়ে আদৌ গর্ব বোধ করতেন না। প্রকৃত শিল্পীর মতো কেবল সুরসাধনাতেই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে (৯৯২ সনের ফাল্গুন) ৮০ বছর বয়সে তানসেন দেহরক্ষা করেন। তাঁর মৃত্যু-শয্যার পাশে ভারত সম্রাট আকবর উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর মৃতদেহ গোয়ালিয়রে নীত হয় এবং মহম্মদ গওসের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়। সম্রাট আকবর তানসেনের সমাধির উপর একটি সুন্দর চন্দ্রাতপ তৈরী করে দেন। সেই চন্দ্রাতপ আজও আছে। আজও সেখানে ভারতের সব প্রদেশের জ্ঞানী-গুণী গীতিরসিকেরা তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে আসেন।

তানসেন যে কেবল গায়ক ছিলেন তাই নয়, তিনি রুদ্রবীণা বা রবাব নামে একটি বাদ্যযন্ত্রও তৈরী করেন ও তাঁর বাদনকৌশল পুত্র ও শিষ্যদের শিক্ষা দেন। বীণাবাদন তাঁর আর একটি ধারার শিক্ষা। তানসেনের প্রিয় শিষ্য ও তাঁদের বংশাবলী সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত। তাঁর দুই বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন তানতরঙ্গ আর মানতরঙ্গ। তানসেনের পুত্র ও কন্যা পক্ষে বংশধারায় গীত ও বাদ্যের সাধনা অবিচ্ছিন্নভাবে আজ পর্যন্ত চলছে। তাঁদের এক পংক্তি কণ্ঠসঙ্গীত সাধনা করেন আর বাদকদের মধ্যে তানসেনপন্থীরা দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। একদলকে বলে রবাবী বা রবাবীয়া অর্থাৎ যাঁরা রবাব বা রুদ্রবীণা বাজান আর একদল বীণকার—যাঁরা বীণা বাজান।

আজো ভারতের ঘরে ঘরে তানসেনের নাম অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। যতদিন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অস্তিত্ব থাকবে, মনে হয় বুঝি যতদিন মানুষের মনে গান-বাজনার প্রতি আসক্তি থাকবে ততদিন পর্যন্ত—সেই সুদীর্ঘ অনাগত ভবিষ্যত কালের মানুষ পর্যন্ত তানসেনকে স্মরণ করবে।

চিত্রবাণী প্রেস—১৮, হাজরা লেন, [illegible] সাউথ ৩২৭৩) হইতে নিতাই চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং চিত্রবাণী কার্য্যালয় হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

শারদীয়া চিত্রবাণী

★ ১৩৬১ ★

সম্পাদনা ও পরিচালনায় : গৌর চট্টোপাধ্যায় এম এ

সম্পাদনায় সহযোগী : লালচাঁদ দত্ত

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

শিল্প-সজ্জায় : রামকৃষ্ণ দত্ত ও সনৎ ভট্টাচার্য্য

কর্ম্মাধ্যক্ষ ও বিজ্ঞাপন-সচিব : নিতাই চট্টোপাধ্যায়

আলোকচিত্রগ্রহণে : কে এ রেজা, নির্ম্মল মল্লিক ও শ্রীশম্ভু

সূচীপত্র

আশ্বিন, ১৩৬১

সম্পাদকীয়— ৭

আশা ও আশঙ্কা—
শচীন সেনগুপ্ত ৯

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-সংবাদ
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ১৭

সিনেমা-প্রশস্তি—(কবিতা)
কবিশেখর কালিদাস রায় ২৩

চলচ্চিত্র : কথা বনাম ছবি—
(কবিতা)
গোপাল ভৌমিক ২৫

হায় ছবি ! তুমি শুধু ছবি !!
(রসরচনা)—
নীরোদ রায়
রেখাচিত্র : শৈল-চক্রবর্ত্তী ২৬

মীরাবাঈ—
(ত্রয়াঙ্ক নাটক)—
মন্মথ রায় ৩৫

কাহিনী ও তার রূপায়ণ—
বিমল রায় ৭৩

সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার— ৭৭

ফিল্ম্-ফ্যানের চিঠি— ৮০

ধুরন্ধরের চিঠি— ৮৫

সঙ্গীত ও শিল্পী—
সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৯

সে যুগের দর্শক—
বিপিনবিহারী রায় ৯৪

রূপালী প্রেম (রসরচনা)—
দেবেশ দাশ ৯৭

বাংলার নাট্যপত্রিকা—
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৩

মেরিন ড্রাইভ থেকে— ১২০

সাজঘর (একাঙ্ক নাটিকা)—
অখিল নিয়োগী ১২৫

চলচ্চিত্র ও জনসমাজ—
ভবানী রায় ১৩৩

শেষ খেয়া—
অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৭

নতুন নাটক—
'দুরভাষিণী' ১৪৫

আমার উত্তর—
শোভা সেন ১৪৯

আমার কথা—
ভারতভূষণ ১৫৩

কাজের মানুষ রাজ—
এস কে ভাটিয়া ১৫৬

সুমিত্রা দেবী যা বলেন— ১৫৯

ছ বি র পা তা য়

আর্ট প্লেটে : অরোরার 'জয়দেব' ছবিতে অসিতবরণ ও দেবযানি ; 'বিরাজ বহু' চিত্রে কামিনী কৌশল ; 'পরিশোধ' ছবিতে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ও অনুভা গুপ্তা ; 'ষোড়শী' চিত্রে দীপ্তি রায় ; মধুবালা ; অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ; সন্ধ্যারাণী ; সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ; হিন্দী 'কবি' চিত্রে গীতা বালী ; 'জয়দেব' চিত্রে বিমলার ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা ; সুমিত্রা দেবী ; সুচিত্রা সেন ; 'যদুভট্ট' ছবিতে অনুভা গুপ্তা ও বসন্ত চৌধুরী ; 'গৃহপ্রবেশ' ছবির সেট-এ মঞ্জু দে, মলিনা দেবী, সুচিত্রা সেন, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, বিকাশ রায় ও উত্তমকুমার

সাধারণ পৃষ্ঠায় : বিমল রায় ; 'অগ্নি-পরীক্ষা' ছবির শিল্পীরা ; 'গৃহপ্রবেশ' ছবির দুটি ভিন্ন দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার এবং মলিনা দেবী ও মঞ্জু দে ; 'জয়দেব' ছবিতে দেবযানি ; 'বিরাজ বহু' চিত্রে কামিনী কৌশল ও অভি ভট্টাচার্য্য ; 'শিবশক্তি' ছবিতে দীপ্তি রায় ; বিকাশ রায় প্রোডাকসন্স-এর 'সাজঘর' ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে সমবেত শিল্পীরা ; মিতা চট্টোপাধ্যায় ; প্লে-ব্যাক্-সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ; হিন্দী 'বিরাজ বহু' ছবিতে কামিনী কৌশল ; আপন কন্যাসহ সুচিত্রা সেন ; কৌতুকশিল্পী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ; 'যদুভট্ট' ছবির এক দৃশ্যে অনুভা, বসন্ত ও অন্যান্য শিল্পী ; নবাগতা নমিতা সিংহ ; বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় দুটি ছবিতে সুচিত্রা ও সাবিত্রী ; আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া মুখোপাধ্যায় ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ; হিন্দী 'ফেরী' ছবির শিশু শিল্পী বেবী বুলা ও মাষ্টার বাবু ; এম্ পি'র আগামী ছবি 'সূর্য্যগ্রাস'-এ উত্তমকুমার ও সাবিত্রী

চিত্রবাণী

নাট্য, চিত্র ও শিল্পকলার সচিত্র মাসিক পত্রিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য—১২৲ সাধারণ ডাকে) : ১৫।০ (রেজিষ্ট্রীডাকে)

সপ্তম বর্ষ | শারদীয়া ১৩৬১ | প্রথম সংখ্যা

সপ্তম বর্ষের যাত্রাক্ষণে

শরতের আবির্ভাবে আনন্দের আভাস। নির্ম্মল আকাশ আর স্নিগ্ধ বাতাস। শিউলি-কমলে, শিশিরে, মাটিতে আনন্দেরই জয়গান। শারদোৎসবের আয়োজন দিকে দিকে।

আমরাও এনেছি অর্ঘ্য সাজিয়ে আজকের এই শুভদিনে। ছয়টি শরৎ পার ক'রে, সপ্তম-শারদীয়ার এই শুভক্ষণ থেকে আমাদের যাত্রা সুরু হ'লো নতুন করে।

আজ তাই স্মরণ করি সকলকে—পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা, পৃষ্ঠপোষক, সমালোচক, বিজ্ঞাপনদাতা, চিত্র ও মঞ্চের শিল্পী ও কলা-কুশলীদের। সকলকেই জানাই আমাদের আন্তরিক শুভ-কামনা।

চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের উন্নতি-কামনায় 'চিত্রবাণী'র সেবা পর্য্যাপ্ত না হ'লেও, তা একান্তভাবে আদর্শপ্রাণ ও আন্তরিক। রচনা ও সমালোচনার মধ্য দিয়েই আমরা চেয়েছি দেশের এই ললিতকলার উন্নতি। আমাদের কথা বহুক্ষেত্রে অপ্রিয় হ'লেও তা সত্য। সে সত্যকে যাঁরা সানন্দে গ্রহণ করবার শক্তি দেখিয়েছেন আমরা তাঁদের অভিনন্দিত করি। সে-সত্যভাষণে যাঁরা আঘাত পেয়েছেন তাঁদেরও আজ আমরা শুভ-কামনা জানাই। সেইসঙ্গে বলি—

ললিতকলার সেবায় যাহারা জীবন করেছে পণ
সত্য শিব ও সুন্দরের পূজায় মগন যারা—
সফল হউক সাধনা তাদের, মধুর সকল ক্ষণ
জীবনে রহুক ছন্দ-সুষমা, সুরের অমিয়-ধারা ॥

হিন্দী ছবির চিত্তহারিণী চিত্রনটী মধুবালা

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ঃ সম্প্রতি 'নদ ও নদী' এবং 'সতী'
চিত্রে নিপুণতর অভিনয়দক্ষতায় দর্শকচিত্ত জয় করেছেন

আশা ও আশঙ্কা

শচীন সেনগুপ্ত

—নাট্যশালা সম্বন্ধে আপনার বলবার কি আছে?

—কিছু না। থিয়েটারগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; একে একে আবার দুয়ার খুলছে। এতেই খুসি আছি।

—নতুন রূপ কেমন লাগছে?

—নতুন রূপ ত কোথাও দেখ্‌ছিনা।

—সে কি!

—ভাবচেন আমাকে কামলা-রোগে ধরেছে? জীবন-পত্র বয়েসে-বয়েসে হরিদ্রাভ হয়েছে বলে সবই হলুদ দেখছি?

—না, তা ভাবচিনা। আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি ষ্টার থিয়েটারের বাড়ী ও বিক্রীর দিকে; রঙমহলের ডান্‌লোপিলো আসনের দিকে।

—কিন্তু সুনির্ম্মিত বাড়ী আর সুকোমল ডান্‌লোপিলো নাট্যশালা গড়ে তোলে এমন কথা কোন্ নাট্য শাস্ত্রে পেয়েছেন? ওসব দর্শকদের প্রীত করে, নাট্যশালার জীবন দেয়না।

—বিক্রী?

—নাট্যশালাকে চালু রাখে; কমে গেলে মালিকের দেনা হয়, তিনি দরজা বন্ধ করে দেন। বিক্রীটা নতুন নয়। এই ষ্টার থিয়েটারে বিক্রী আগেও হোতো। নইলে মালিক ষাট হাজার টাকা লোকসান দেবার পর আবার চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচা করে সব ঢেলে সাজবার সাহস পেতেন না। অতীতে লাভ করেছিলেন বলেই তিনি জানতেন ভবিষ্যতেও লাভ অসম্ভব নয়। সুদিনে লাভ করেছিলেন বলেই ত দুর্দ্দিনে লোকসান দিতে পারলেন, আবার লাভের আশায় টাকাও ঢাললেন। নাট্যশালা চালিয়ে কোন মালিক জমিদারিও করেছেন, কাশীতে অতিথিশালাও স্থাপন করেছেন, কোন মালিক নাট্যশালার নতুন বাড়ীও তৈরি করেছেন, কোন মালিক দেনা শোধ করেছেন, কোন কোন মালিক নবাবী চালও চালিয়েছেন, দেনার দায়ে দেউলেও হয়েছেন। দেউলেদের কথা বাদ দিন। যাঁরা সম্পত্তি করেছেন, তাঁরা তা করেছেন বিক্রী হয়েছে বলেই। কাজেই বিক্রীটা নতুনত্ব নয়, পরিমাণের অপূর্ব্বতা হতে পারে। পরিমাণ বাড়ে, আবার কমে। যখন কমে, তখন চেষ্টা করেও বাড়ানো যায়না। অবিরাম কমতে থাকলে দরজা বন্ধ করে দিতে হয়। সবদেশে, সবকালে, তাই হয়ে এসেছে।

—তবে আপনার মতে নাট্যশালার পক্ষে প্রয়োজন কি?

—বাড়ীও প্রয়োজন, বিক্রীও প্রয়োজন। কিন্তু তার চাইতেও প্রয়োজন নাটক আর অভিনয়। শেষের দুটি ভালো না হলে আগেকার দুটির মর্য্যাদা রাখা সম্ভব হয় না কেননা নতুন বাড়ী পুরোনো হয়। বিক্রী নাহলে বাড়ী সংস্কার করা যায় না। নাটক আর অভিনয় দেখে দর্শকরা যখন খুশি হন না তখন আর বাড়ী-সংস্কারের, সিন-পোষাক তৈরির, কর্ম্মীদের বেতন দেবার টাকা পাওয়া যায় না। ফলে নতুন বাড়ীও একদিন ভুতুরে বাড়ী হয়ে পড়ে, কর্পোরেশন বাড়ী ভেঙে ফেলবার নোটীশ দেয়। এমন অনেক বাড়ীর তাই হয়েছে। নইলে নতুন বাড়ীর দাবী উঠ্‌বে কেন?

—তাহলে এ-কথা মানেন ত নাটক হয়েছে বলে বিক্রীও হচ্ছে?

—নাটক না হলেও বিক্রী হতে দেখেছি। নাটক হয়েও বিক্রী হয়নি, তাও দেখেছি। বিক্রীর পক্ষে নাটকই একান্ত প্রয়োজনীয় নয়, নাটুকেপনাই যথেষ্ট। নাটক আকারে নাটুকে ঢংয়ের গল্প সাধারণতঃ ভালো বিক্রী দেয়।

—'শ্যামলী' সম্বন্ধে আপনার সত্যিকারের মত কি?

—আজ বলতে বাধবে না।

—আগে?

—বাধত।

—কেন?

—যদি নাট্যশালার ক্ষতি হয়, ভেবে।

—আজ ?

—আজ বুঝেছি আমার লেখায়ও নাট্যশালার কোন ক্ষতি হবে না। আমার কিছু হবে।

—আপনার আবার কী ক্ষতি হবে ?

—কটূক্তি বর্ষিত হবে আমার উদ্দেশে। তারও বেশি কিছু হতেও পারে।

—তাই মত দেবেন না ?

—দোব। দরকার মনে করছি বলেই দোব। বরাতে যা-ই থাক্।

—দিন তবে।

—প্রচুর নাটকীয়তা আছে 'শ্যামলী'তে।

—আর ?

—পরিচ্ছন্ন প্রযোজনা হয়েছে।

—অভিনয় ?

—ভালোই হয়েছে।

—কার কার ?

—সকলেরই। কেউ কেউ কিছু বাড়াবাড়ি করেন।

—দর্শকরা নেন ত ?

—তা নেন।

—তবে আর চাই কি !

—আমি ত কিছু চাইনা। আপনি মত জানতে চাইছেন, আমি তা দিয়ে যাচ্ছি।

—কিন্তু তবুও কোথায় যেন আপনার বাধছে। নাটক বলতে চাইছেন না।

—দেখুন, অনেকদিন আগে আমি একটা প্রবন্ধে লিখেছিলাম যে-নাটক যে-জাতির জনপ্রিয় হয়, বুঝতে হবে সেই নাটক সেই জাতির উপযুক্ত নাটক। সে-কথা লিখে আমি প্রচুর গাল খেয়েছিলাম। তখন আমার নাটকের পর নাটক জনপ্রিয় হচ্ছে। যাঁরা গাল দিলেন, তাঁরা বললেন নাট্যকারের গৌরব চুরি করবার জন্যেই আমি ও-কথা লিখেছি। কিন্তু তা নয়। নাট্যশালাকে সব দেশেই জাতির মুকুর বলে। জাতিকে যারা জানতে চায়, তারা নাট্যশালায় গিয়ে নাটক দেখে। জাতির দোষ গুণ শুধু নাটকেই নয়, নাটকের অভিনয়েও দেখা যায়। যে গুণের জন্যে নাটক জনপ্রিয় হয়, তা জাতিরই গুণ—যে দোষ দর্শকদের চোখে পড়ে না, মনে পীড়ার সঞ্চার করেনা, তা জাতিরই দোষ। লেখকরা, অভিনেতৃরা, পরিচালকরা আর দর্শকরা ত একই জাতির মানুষ। জনপ্রিয় হয়না যে নাটকগুলি, তাদের জাতির মুকুর বলা হয়না। অনেক মন্দ নাটকের মতো অনেক ভালো নাটকও জনপ্রিয় হয়নি।

—'শ্যামলী' নাটকে আপনি কি কি দোষ লক্ষ্য করেছেন ?

—জাতির চরিত্রে যা লক্ষ্য করি।

—যথা ?

—চিন্তার বিশৃঙ্খলা, শিব আর শবের পার্থক্য-বোধের অভাব। অবশ্য আমি 'শ্যামলী' নাটকের কথা বলছি, শ্যামলী উপন্যাসের কথা বলছিনা।

—দুয়ে খুবই কি তফাৎ আছে ?

—আকাশ পাতাল। উপন্যাসে যা বলা হয়েছে, নাটকে তার বিপরীত বিষয় দেখানো হয়েছে।

—পরিষ্কার করে বলুন।

—উপন্যাসখানি একটি কালা-বোবা মেয়ের জীবন-বৃত্তান্ত শোনাবার জন্যে লেখা হয়নি। ওকে তখনকার প্রচলিত বিবাহের সামাজিক প্রথার প্রতিবাদ বলা চলে। 'বলিদান' নাটকও যে কারণে লেখা, 'শ্যামলী' উপন্যাসও সেই কারণেই লেখা। তফাৎ 'শ্যামলী' 'বলিদানে'র চেয়েও গভীর এবং ব্যাপক, সূক্ষ্মতর ত বটেই। 'শ্যামলী' উপন্যা-সের আর 'মন্ত্রশক্তি' উপন্যাসের বক্তব্য এক নয়। প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার লেখা ওই উপন্যাসখানি তখনো প্রগ্রেসিভ ছিল, এখনো প্রগ্রেসিভ। কিন্তু নাটকে ওকে প্রতিক্রিয়াশীল করা হয়েছে।

—কি করে ?

—সবটা জোর ওই প্রতিগৃহগামি অঙ্গীকারের ওপরই অর্পণ করে।

—সে কি !

—অবাক হয়ে যাচ্ছেন কেন ? সমাজ একদিন ওইরকম বিবাহকেই সব বিবাহ-প্রথার ওপরে স্থান দিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবাদও জমে উঠেছে অনেকদিন থেকে। বাংলা

সাহিত্যে সে প্রতিবাদ নানা রকমে প্রকাশ পেয়েছে, শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পর থেকেই কেবল নয়—সেই কুলীনকুলসর্ব্বস্ব থেকে। প্রতিবাদ সমাজ থেকেও উঠেছে। ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস, বিদ্যাসাগরের প্রয়াস তা বলে দেবে। হিন্দুসমাজ সমগ্রভাবে ওকে আদর্শ বিবাহের মর্য্যাদা দিয়ে এসেছে। তার জন্যে সমাজের মানুষের অনেক ক্ষয় হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে। হিন্দুসমাজ তা বুঝতে চায়নি, বুঝেও মানতে নারাজ রয়েছে। তাই স্বাধীন ভারতে আইন করে ওই সেক্রামেণ্টাল ম্যারেজ-এর নির্ম্মম বন্ধন এবং উৎপীড়ন থেকে যারা মুক্তি চায় তাদের মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগে যখন হিন্দু কোড্ বিল পার্লামেণ্টে উপস্থিত হয়েছিল, তখন তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল। কিন্তু এবার বিবাহ-সংস্কার বিল দ্রুত আইনে পরিণত হচ্ছে—স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের সম্মতিক্রমে 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' আইন-সঙ্গত করা হয়েছে—মন্ত্রশক্তি দুর্ব্বার থাকতে আর দেওয়া হচ্ছেনা। কাজেই এই জাতীয় প্রগতির প্রয়াসের দিনে মন্ত্রশক্তিকে দুর্ব্বার প্রমাণ করতে চাওয়া প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি নিশ্চয়ই বলা চলে।

—কিন্তু নিরুপমা দেবী তাই করতে চেয়েছিলেন।

—না, তা চাননি। তিনি জানতেন, মন্ত্র যে কানে শুনতে পায়না, মুখে উচ্চারণ করতে পারে না, মন্ত্র পড়ে তার বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রও সমর্থন করে না। এই বিবাহটাই ত দারুণ ট্র্যাজেডি। প্রতিবাদ ত তারই বিরুদ্ধে। 'শ্যামলী'র সোশ্যাল সিগ্নিফিক্যান্স অনেক সুস্পষ্ট, অনেক বেশি প্রত্যক্ষ। 'শ্যামলী' কেবল বিশেষ কোন একটি মূক-বধির বালিকার বেদনার কথা নয়। শ্যামলী কেবল মূক ও বধির নয়, শ্যামলী সম্পূর্ণ জড়-প্রকৃতির অপরিণত অপুষ্ট নারী। শ্যামলী সেই নারী, যে-নারী বাক্যহারা শ্রুতিহারা গতিহারা থেকে বাঙালীর খেলা-ঘরে পুতুলের ভূমিকা অভিনয় করে এসেছে। সমাজ তার কান্না শুনেছে, কিন্তু জানতে চায়নি কেন সে কাঁদে। সমাজ দেখেছে সে উল্লসিতাও হতে পারে, কিন্তু বুঝতে চায়নি কিসে সে উল্লসিত হয়। সমাজ দেখেছে প্রকৃতির সঙ্গে নারী-প্রকৃতি কি ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে মিলতে চায়, কিন্তু তবুও তার বাঁধন খুলে দেয়নি। বহুকাল মাতৃশক্তিকে মূক বধির জড় করে রেখেছে এই সমাজ। শ্যামলীর বিবাহ অনুচিত কাজ। সেই অনুচিত কাজ সমাজের চাপেই করা হোলো। ফলে শ্যামলীই শুধু আরো ছোট হোলো না, তার বাপ-মাও ছোট হোলো। তাঁরা স্নেহে মমতায় চরিত্রবত্তায় আদর্শ বাপ-মা ছিলেন। কিন্তু দুর্ব্বলও ছিলেন। অথবা সমাজ তাঁদের দুর্ব্বল করে ফেলেছিল। এমন দুর্ব্বল করে ফেলে বলেই ত যে-সব সামাজিক বিধি-নিষেধ অবিচারের উপদ্রবের কারণ হয়ে উঠতে পারে, জাগ্রত মন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সমগ্র উপন্যাসটি যদি নাটকে রূপান্তরিত হোতো, তাহলে শিক্ষিত প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারশিপের ছাত্রের শ্লথ-চিন্তারও পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যেত।

—আপনি কি বলতে চান ওই অনিল চরিত্রটিও ঠিক হয় নি?

—উপন্যাসে ঠিকই রূপায়িত হয়েছে, নাটকে হয়নি। নাটকে রেবাকে আনা যখন হোলো, তখন উপন্যাসের শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া উচিত ছিল। যে-কথাটি নাটকে বলা হয়েছে, তা বলবার জন্যে রেবাকে আনবার দরকার আদৌ ছিল না। রেবাকে মাঝখানে এনে, যেভাবে শ্যামলীকে স্থান দেওয়া হোলো, তাতে শ্যামলীর ওপর আরো অবিচার করা হোলো। স্বামী সম্বন্ধে তার বোধোদয় হোলো, স্বামীর প্রতি তার আকর্ষণও জাগল, স্বামীর ঘরে সে ঠাঁইও পেল: সে ভাবল সে প্রেমও পেয়েছে। কিন্তু প্রেম সে পেল না,—পেল করুণা, পেল অনুকম্পা। তাই পাওয়াতেই তার জীবন ধন্য হলো, নাটকখানিকে কমেডি করে তাই বোঝানো হয়েছে: আগেকার সমগ্র গভীর ইমোশানগুলিকে সেণ্টিমেণ্ট করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু শ্যামলী উপন্যাস শেষ পর্য্যন্ত গভীরতর ট্র্যাজেডি। করুণা আর অনুকম্পা নিয়ে জীবনকে সার্থক করে তোলা যায় না, স্বাধিকার পেতে হয়। স্বাধীন ভারতের সংবিধান নারীকে এই স্বাধিকার দান করেছে। সর্ব্বত্র আইন-সম্মত সম-অধিকার, সম্পত্তির আইন-সম্মত উত্তরাধিকার, বিবাহে

নর-নারীর আইন-সম্মত সম-অধিকার—নারীকে আর করুণার অনুকম্পার পাত্রী করে রাখা নয়। সমজ যখন সর্ব্বতোভাবে এই অধিকারের কথা ভেবে সমাজের পরিবারের পুনর্গঠন করবে তখন নারী আর তৈজস-পত্রের মতো না থেকে পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠতে পারবে ; জাতির অর্দ্ধেক শক্তি জাতিকে নানা প্রকারে সবল করে তুলতে সক্ষম হবে। বাংলা উপন্যাসে নাটকে কাব্যে এই আদর্শ প্রায় শতাব্দীকাল ধরে প্রচারিত হয়েছে, বাংলার সমাজে খণ্ড খণ্ড ভাবে এই আদর্শ রূপ-পরিগ্রহও করেছে। কিন্তু বাংলার বৃহত্তর সমাজে, ভারতের বৃহত্তম সমাজে নারী এতদিন স্বাধিকার পায় নি বলে আইন করে নারীকে এই অধিকার দিতে হচ্ছে। তারপর ভাবুন, একটি কালা-বোবা-জড় প্রকৃতির মেয়েকে প্রেম-সচেতন করেও বোবা-কালা-জড় করে রেখে করুণা ঢেলে উদারতা দেখানো কত বেশি নিষ্ঠুরতা! নিরুপমা দেবী মূককে অন্ততঃ ভাষা দিয়েছিলেন। বাংলার বহু মূক নারী বহুদিন পূর্ব্বে এই ভাষা পেয়েছিল, স্বাধিকার যদিও পায়নি। ভাষা পেয়েছিল বলেই ত প্রতিবাদ করতে পেরেছিল। আর মুষ্টিমেয় সেই ভাষা-পাওয়া নারী প্রতিবাদ করেছিল বলেই ত আজ এমন আইন-সম্মত স্বাধিকার পেল, যার জন্যে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদরাও লঘু-চিত্তে একাধিক নারীর চিত্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অথবা করুণা দিয়ে কর্ত্তব্য শেষ করে ভালোমানুষ হবার অবাধ পন্থা খোলা পাবে না। প্রতি-গৃহস্থামি বলে গ্রহণ করেছি বলে বড়াইও করবে আবার অপর নারীর প্রতি আকর্ষণকে দুর্ব্বারও হতে দেবে এমন পুরুষ হয়ত সমাজে থাকবে, কিন্তু সে দুর্ব্বল বলেই লাঞ্ছিত হবে যদি না চিত্তাবেগকে সে আধ্যাত্মিকতা দিয়ে মহীয়ান করতে পারে। উপন্যাসের অনিল তাই করতে পেরেছিল, নাটকের অনিলকে তার সুযোগ না দিয়ে চরিত্রকে ছোট করা হয়েছে। যদি বলি 'চন্দ্রশেখরে'র প্রতাপ আর 'শ্যামলী'র অনিল একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, তা'হলে [illegible] কি? পরিণতি প্রায় একরকমই দেখবেন; [illegible] যদিও পৃথক। দুটি চরিত্রেই যেমন প্রয়োজনীয় সেণ্টিমেণ্ট আছে, ইমোশন আছে, পৌরুষ আছে, তেমন স্পিরিচুয়াল আপলিফ্‌টমেণ্টও আছে। নাটকের অনি[illegible] চরিত্রে আছে কেবল সেণ্টিমেণ্ট। কিন্তু এ-কথা মিথ্[illegible] নয় যে, 'শ্যামলী' নাটক জাতির একটা অংশকে প্রতিফলি[illegible] করেছে। যাঁরা হিন্দু বিবাহ সংস্কারকে পছন্দ করেন না যাঁদের প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টে সংশোধনী-প্রস্তাবে কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করছেন তাঁরা এই জাতিরই লোক। তাঁ[illegible] নাটকে জাতির একটা গভীরতম ট্র্যাজেডিকে কমেডি হ[illegible] দেখে খুসি হয়েছেন।

—তারও ত মূল্য আছে।

—আছে বৈকি। জাতিকে জানবার সুযোগ হয়েছে যেমন সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে পার্লামেণ্টে বিরোধীদের এ[illegible] সংশোধনী প্রস্তাবকারীদের আলোচনা থেকে। আশ[illegible] জাগছে সংস্কারের ব্যবস্থা হচ্ছে দেখে, আবার সংশোধ[illegible] প্রস্তাবের চোরা-গোপ্তা দেখে আশঙ্কাও হচ্ছে আই[illegible] হওয়া সত্ত্বেও ঈপ্সীত ফল পাওয়া সহজ হবে কিনা কিন্তু সে-কথা যাক্। 'শ্যামলী' দেখে দর্শকরা খু[illegible] হয়েছেন কেন, শুনবেন?

—বলুন, তাইত শুনতে চাই।

—ওতে কালা-বোবা মেয়ের, অন্তরের যে-বেদনা ব্য[illegible] হয়েছে তার প্রতি দর্শকদের সহানুভূতি আছে। ওতে যেটু[illegible] সামাজিক অবিচার স্থূলভাবে প্রকট হয়েছে, তার প্র[illegible] আজকের দর্শকদের বিরাগ আছে। ওতে যে হাস্যর[illegible] পরিবেশন করা হয়েছে তাতে দীপ্তি না থাকলেও মাধু[illegible] আছে, কিছু অত্যভিনয় থাকলেও সমগ্র অভিনয় এক-সু[illegible] হয়েছে, সর্ব্বোপরি আজকের দিনে যাঁরা জনপ্রিয়, তাঁদে[illegible] অনেককেই একসঙ্গে দেখবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে গল্প যেটুকু বলা হয়েছে, তা ভালো করেই বলা হয়ে[illegible] আর উইণ্ডো-ড্রেসিং চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

—স্বপক্ষে প্রায় সব কথাই ত বললেন।

—প্রায় সবকথা বললাম, কিন্তু পুরো কথা এখ[illegible] বলিনি। এই উইণ্ডো-ড্রেসিং অভূতপূর্ব্ব নয়। এমন [illegible] প্রোডাকসনের নাম করা যেতে পারে। স্মৃতি আলো[illegible] করলে আপনিও পারবেন।

—দেখুন, আশী বছরকাল বাংলা নাট্যশালা চলে[illegible]

এর মাঝে বহু ভালো নাটক, বহু ভালো প্রযোজনা, বহু অনবদ্য অভিনয় হয়েছে। তবুও লোকে বলে বাংলায় নাটক হোলনা, নাট্যশালার অভিনয় সিনেমার অভিনয়ের চেয়ে নিরেস। কেন বলা হয় জানেন? ওই কর্ণার-ষ্টোন নজরে পড়েনা বলে। অনেক মোড় ঘুরেছে। কিন্তু কোথায় মোড় ঘুরেছে, তার নিশানা রাখবার চেষ্টা করা হয়নি। প্রতি সফল নাটকের বেলাতেই বলা হয়েছে অপূর্ব্ব, অভিনব, এমনটি আর হয়নি। কেন অপূর্ব্ব, কেন অভিনব, তা দেখাবার চেষ্টা করা হয়নি। ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে করে ঐতিহ্য গড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি। টাকার আমদানিকে মাপ-কাঠি করে নাটকত্ব বিচার করা হয়েছে। টাকা চাই, সে-কথা আগে বলেছি। সেটা বড় কথা হলেও একমাত্র কথা নয়।

—কিন্তু নাটক শুনতে পাচ্ছি পাওয়াই যাচ্ছে না।

—না পাবারই কথা।

—কেন?

—জাতির জীবনে এখন ইমোশনের জোয়ার নেই, আর নেই সুঅভিনয়ের প্রেরণা। এখন বুদ্ধি খাটিয়ে নাটক লিখতে হয়। কিন্তু তাতে ইমোশনের বাণ ডাকে না। বুদ্ধিজাত নাটক কিম্বা উপন্যাসের নাট্যরূপ টীম-ওয়ার্কের সাহায্যে আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু তার ছাপ স্থায়ী হয় না। তা জাতির কৌতূহল জাগায়, কিন্তু জাতিকে মাতায় না। মাতাবার জন্য কাব্য চাই, দর্শন চাই, নাটকীয় সংঘর্ষ প্রবল হওয়া চাই। সব দেশেই সুঅভিনয় নাট্যকারদের প্রেরণা দেয়—কিন্তু সে সুঅভিনয় কেবল টীম-ওয়ার্ক থেকে পাওয়া যায় না, অভিনেতা-অভিনেত্রীর ব্যক্তিত্বের আবেদন থাকা চাই, ইমোশনের ঝটিকা-প্রবাহ থাকা চাই। সব দেশেই ভালো-ভালো উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনীত হয়। কিন্তু নাট্যশালাকে নব-জীবন দেয় মৌলিক নাটক। নাটক ওই দুই কারণে পাওয়া যাচ্ছে না।

—কি করে পাওয়া যাবে?

—প্রথমে জাতির হতাশা দূর করতে হবে। আইডিয়ালিজম আনতে হবে; রিয়ালিটি সম্বন্ধে অজ্ঞ না থেকে রিয়ালিটিকে উন্নত রিয়ালিটি করে তুলতে হবে।

—কেমন করে তা আনতে হবে?

—আর্টিষ্টস্ থিয়েটার ক'রে।

—সে জিনিষ কি?

—ষ্টানিস্লাভ্স্কি-ডেন্‌চেন্‌কো মিলে মস্কো আর্ট থিয়েটারকে যা করেছিলেন। শুধু প্রতিফলন নয়, অভিনয়ের সাহায্যে নব-সৃষ্টির নির্দেশ। মূলে ওদেশে আর্ট ছিল পাঁচটি—কাব্য, নাট্য, সঙ্গীত, চিত্র ও স্থাপত্য। অভিনয় আর্ট ছিল না। কিন্তু আর্টিষ্টস্ থিয়েটার হবার পর থেকে অভিনয়ও আর্টের মর্য্যাদা লাভ করল। লাভ করল নাটককে রিক্রিয়েট করে, কেবল লেখা সংলাপ আবৃত্তি করে নয়, অথবা ইচ্ছেমত সংলাপ যোজনা করে নয়—নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়কে নিজেদের কলা-কৌশল প্রয়োগে অপ্রতিহত করে তোলায়। তাতেও টীম-ওয়ার্কের প্রয়োজন হয়, কিন্তু ব্যষ্টির শক্তি-স্ফুরণেরও হয় আবশ্যক। নাটকের আবেদন তার ফলে গভীর হয়। তারই ফলে দর্শকরা এবং নাট্যকারেরা প্রেরণা লাভ করেন। শুধু হাসিয়ে-কাঁদিয়ে পয়সা রোজগার করা যায়, কিন্তু প্রেরণা দিতে না পারলে নাট্যশালাকে জাতির সঙ্গে যুক্ত রেখে বাঁচিয়েও রাখা যায় না, নাট্যশালার ও জাতির উন্নতিও করা যায় না।

—আর্টিষ্টস্ থিয়েটার আমাদের দেশে কবে হয়েছে?

—হয়েছে বৈকি! এই 'ষ্টার থিয়েটার' যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন তা আর্টিষ্টস্ থিয়েটারই ছিল। নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার যখন 'নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন তাও আর্টিষ্টস্ থিয়েটারই ছিল। আর্ট থিয়েটারও আদর্শ নিয়ে কাজ সুরু করেছিল, কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে উঠতে পারেনি। স্বর্গত গদাধর মল্লিক পরিচালিত 'নাট্যভারতী'ও প্রকৃত প্রস্তাবে আর্টিষ্টস্ থিয়েটারই ছিল। আর্টিষ্টস্ থিয়েটারের মানে এ নয় যে, এ্যাক্টর-ম্যানেজারের থিয়েটার। আর্টিষ্টস্ থিয়েটারের মানে হচ্ছে অভিনেতৃদের, নাট্যকারদের, টেকনিক্যাল ওয়ার্কারদের সমবেত প্রয়াসের সাহায্যে এই বিশেষ আর্ট-[illegible] [illegible]নকে সুন্দরতর করে তোলবার কাজে নিয়োগ করা,

নাট্যশালাকে রঙ্গালয়ের স্তরে ফেলে না রেখে মন্দির করে গড়া।

—কিন্তু মালিক কেন লোকসানের ঝুঁকি পোহাবেন?

—সব মালিককেই তা পোহাতে হয়। তবুও তাঁদের ওপরে নির্ভর করে যাতে না থাকতে হয়, তার জন্যেই ত আমি ষ্টেট থিয়েটারের পক্ষপাতী।

—কিন্তু সকলে ষ্টেট থিয়েটার পছন্দ করেন না।

—জানি করেন না। তাই ফ্রি-থিয়েটারও থাকুক। কিন্তু ষ্টেট জাতির প্রয়োজন সম্বন্ধে যেমন সচেতন থাকবে, ব্যক্তিগত সকল প্রতিষ্ঠান তা নাও থাকতে পারে। এখনকার রাষ্ট্রকে ইংরেজের রাষ্ট্রের সম-পর্য্যায়ে ফেলা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নয়। ইংরেজের সঙ্গে সহযোগের প্রশ্নই ছিল না, কিন্তু স্বরাষ্ট্রের সঙ্গে সর্ব্বব্যাপারে অসহযোগের আবশ্যকতা বিরোধী দলেদেরও কাম্য হওয়া উচিত নয়, জনোন্নয়ণের কাজে ত নয়ই।

—কিন্তু সরকারও ত সর্ব্বদলকে সমান সুযোগ দিতে চান না।

—সকল শাসক হয়ত চান না কিন্তু সাহিত্য নাটক সঙ্গীত নৃত্য ললিতকলার জন্য যে তিনটি আকাদামী তৈরি হয়েছে, তাদের স্বয়ম্প্রভু করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দলগত বিচার করা হয় নি। সকল মিনিষ্ট্রির সকল প্রয়াসও যে দলস্বার্থ প্রণোদিত তাও বলা যায় না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সফল করে তোলবার উদ্দীপনা সৃষ্টির আবশ্যকতা যে কেবল ইলেকশন জেতবার ফিকির, একথা বলা অথবা প্রচার করা অন্ততঃ তাঁদের পক্ষে আর উচিত নয়, যাঁরা বলেন যে তাঁরা জেনেছেন এশিয়ান-সলিডারিটি তাড়াতাড়ি করে না ফেলতে পারলে সমগ্র জাতিকে বিপন্ন হতে হবে। তারপর চৌ-নেহেরু পঞ্চশীলা রূপ পরিগ্রহ করুক এ-কথা যাঁরা চান, তাঁরা যুক্তিসঙ্গতভাবে এ-কথাও বলতে পারেন না যে, ষ্টেট যে সাংস্কৃতিক প্রয়াস করবেন তা প্রতিক্রিয়াশীল হবেই। এই পঞ্চশীলা ত প্রকৃতপক্ষে নতুন সংস্কৃতির স্বীকৃতি। অবশ্য এমন শাসকও আছেন, যাঁরা নাট্যশালাকে রঙ্গালয় করেই রাখতে চান। কিন্তু তাঁরা যা কিছু চান, সবই কি সফল হয়? ফ্রি-থিয়েটার বন্ধ করে দেবার কোন কথা এখনও পর্য্যন্ত ওঠেনি। পক্ষান্তরে ফ্রি-থিয়েটারকে আর্থিক সাহায্য দেবার পরিকল্পনাও আছে। ষ্টেট থিয়েটার লেবরেটারী-থিয়েটারের কাজ করতে পারে।

—ফ্রি-থিয়েটার বলতে আপনি কি বোঝেন?

—ষ্টেটের অথবা এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের খাস-কর্ত্তৃত্ব পরিচালিত নয় যে কমার্শিয়াল অথবা নন্-কমার্শিয়াল থিয়েটার দেশে আছে এবং হবে। ধরুন বহুরূপী, কি গণনাট্য সঙ্ঘ, কি ওই ধরণের যে-সব আর্টিষ্টস্ থিয়েটার আছে।

—বহুরূপী প্রভৃতি কি আর্টিষ্টস্ থিয়েটার?

—নিশ্চয়ই।

—ওদেরই কি আপনি আদর্শ থিয়েটার মনে করেন?

—আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ওরা যে কাজ করেন, তা আমি জানি।

—কি আদর্শ নিয়ে ওঁরা কাজ করেন?

—নাটককে এবং অভিনয়কে ওঁরা জনোন্নয়নের উপযোগী করে তুলতে চান। ওঁদের সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে যে আমি একমত হতে পারি না। নাটক সম্বন্ধে ওঁদের আদর্শ আমি পুরোপুরি গ্রহণও করতে পারি না। বহুরূপীর সঙ্গে যতটা পারি, গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে ততটাও পারি না। আমি ওঁদের তা বলি। ওঁরা কখনো কখনো আমার মত স্বীকার করে নেন, কখনো নেন্ না। আমি বিরক্ত হই না। কেননা আমি জানি, আমি যে দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখি, ওঁরা যতক্ষণ না সেই দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখবেন, ততক্ষণ আমার দেখা আর ওঁদের দেখা এক হবে কি করে? তা'ছাড়া বয়েসের পার্থক্যটাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বহুরূপীর 'ছেঁড়াতারে'র পরিণতি আগে যা ছিল, তা আমার কোন দিনই ভালো লাগে নি। যখন প্রথম দেখেছি, তখনই তা বলেছি। একবছর পরে ওঁরা সে পরিণতি পরিবর্ত্তন করেছেন। ওঁদের 'উলুখাগড়া', 'দশচক্র' নিয়ে ওঁদের সঙ্গে আমার মতভেদ হয়নি। ওঁদের 'রক্তকরবী'র আমি একজন সমর্থক, কিন্তু অপরূপ হয়েছে বলতে পারি না। ওঁরা তার জন্যে আমার প্রতি প্রসন্ন নন। কিন্তু আমার মনে নানা সংশয় থাকা সত্ত্বেও ওঁদের অভিনয় চালু থাকুক তার কামনা করি এবং তার জন্যে উমেদারীও করেছি।

—'রক্তকরবী'র ইণ্টারপ্রিটেশান কি ঠিক হয়েছে ?

—ইণ্টারপ্রিটেশান নিয়ে আমার মনে সংশয় জাগেনি, অভিনয় আরো ভালো হতে পারত এইটেই মনে হয়েছে। যাঁরা বলেন ইণ্টারপ্রিটেশান ঠিক হয়নি, তাঁরা ত বলেই খালাস। কিন্তু কোন্ ইণ্টারপ্রিটেশান ঠিক, তা কেমন করে জানা যাবে যতক্ষণ না আর কোন দল অভিনয় করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যথার্থ রূপ কী হওয়া উচিত। এইজন্যেই ত লেবরেটারী-থিয়েটারের দরকার। কোলকাতার বড় বড় অভিনেতৃদের অনেকেই মঞ্চের সঙ্গে এখন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নেই। অভিনেতৃদের একটা এ্যাসোসিয়েশন আছে। এ্যাসোসিয়েশনটি গঠিত হয়েছে কেবল মঞ্চাভিনেতৃদের নিয়েই নয়, চিত্রাভিনেতৃরাও ওর সদস্য। এই আর্টিষ্টস্ এ্যাসোসিয়েশন কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠান নয়। এই এ্যাসোসিয়েশনই ত আর্টিষ্টস্ থিয়েটারের কাজ করতে পারেন। সরকারী সাহায্যও এঁরা অনায়াসেই পেতে পারেন। সেই সাহায্য নিয়ে এঁরা ত 'রক্তকরবী' অভিনয় করে কী ইণ্টারপ্রিটেশান হওয়া উচিত, তা বোঝাবার চেষ্টা করতে পারেন। কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ অভিনয় করেন। তাঁরাও ত এই এ্যাসোসিয়েশনকে দিয়ে অথবা নিজেরাই অভিনয় করে কী ইণ্টারপ্রিটেশান হওয়া উচিত তা বোঝাবার চেষ্টা করতে পারেন। এইরকম নানা দলের চেষ্টা থেকেই ত নাটকের উন্নতি হবে। সমালোচকদের কাজ সমালোচনা করা, আর নাট্যশিল্পীদের কাজ নাটক অভিনয় করে জাতিকে সচেতন রাখা। কিন্তু গোল কোথায় জানেন? একদল লোক অবিরত বলছেন নাটকে সিরিয়াস কিছু এনো না, একটুখানি হাসাও, একটুখানি কাঁদাও। তা'হলেই নাটক ও অভিনয় আর্টের পর্য্যায়ে উঠবে। আজকের কাগজেই দেখছিলাম একটি ছবির সুপারিশ করে সমালোচক বলছেন —Here is a film that will make you laugh and cry by turn and send you back home in a happy frame of mind. ব্যস, আর চাই কি!

—কিন্তু মানুষ ত হাসি-কান্নাও চায়।

—তা চায়। পৃথিবীর এমন কোন নাটক নেই যা তার ব্যবস্থা করে নি। হাসি-কান্নাটাই বড় কথা নয়। যা দেখে কাঁদা উচিত তা দেখে মানুষ যদি হাসে, আর হাসির খোরাক পেয়ে মানুষ যদি কোকিয়ে কেঁদে ওঠে, তাহলে বুঝতে হবে সে মানুষকে উনপঞ্চাশ বায়ু আশ্রয় করেছে। ইউজিন ও'নীল 'মার্কো মিলিয়নস' নাটকে মার্কোকে দিয়ে বলিয়েছেন—There is nothing better than to sit down in a good seat at a good play after a good day's work in which you have accomplished something, and after you have had a good dinner and just take it easy and enjoy a good wholesome thrill or a good laugh and get your mind off serious things until it's time to go to bed. এ প্রেস্কৃপশান ডনজুয়ান-মার্কো দিচ্ছে তারই মতো লোকদের জন্যে। তবু তিনটি জিনিষ যা দরকার বলেছে তা হচ্ছে good play, good dinner এবং good day's work. এ যাঁদের সুনিশ্চিত রয়েছে, তাঁরা নাট্যশালাকে রঙ্গালয় করতে চাইবেন। আবার যাঁরা দৈনন্দিন জীবনের সংঘর্ষে হয়রাণ হয়ে পড়েন, তাঁরাও জীবনের গ্লানি ভুলে থাকবার জন্যে নাট্যশালাকে রঙ্গালয় রূপেই দেখতে চান। তৃতীয় এক দল আছেন, যাঁরা জাতির মানুষকে আত্ম-সচেতন হতে দিতে চান না। তাঁরাও নাট্যশালাকে রঙ্গালয় করেই রাখতে চান। কাজেই হালের নাট্যপরিচালকরা খোঁজেন ফার্স বা কমিক-কমেডি। ট্রাজেডি হাতে পড়লেও তাকে তাঁরা কমেডি করেন, যেমন 'শ্যামলী'কে আর 'দূরভাষিণী'কে করা হয়েছে। 'শ্যামলী' যেখানে শেষ করা হয়েছে, সেখানে শেষ করবার জন্যে কমেডিটা তবুও মানিয়ে গেছে। কিন্তু 'দূরভাষিণী'কে যার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় দূরভাষিণীর চরিত্রটিকে গলা টিপে মারা হয়েছে। কমেডি করতে গিয়ে ফার্সিক্যাল করা হয়েছে। উপন্যাসে যে বিয়ে দেওয়া আছে, তাতে চরিত্রটি যেমন খুলেছে, তেমন বিয়ে দিয়েও ট্রাজেডিকে গভীরতর করা হয়েছে। বাস্তব ওই ট্রাজেডি দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য। পরিচালকরা ভাবলেন ও ট্রাজেডির চেয়ে ফার্সিক্যাল কমেডিই ভালো। কিন্তু সমগ্র জাতি

যদি ওই রকম ফার্সিক্যাল কমেডির দাবীদার হয়ে ওঠে, তাহলে সত্যি সত্যিই তা কি শঙ্কার কারণ হয়ে উঠবে না ?

—প্রতিকার কি ?

—লেবরেটারী-থিয়েটার, অনুশীলনী অভিনয়।

—পশ্চিম বাংলা সরকার ওইরকম কি একটা পরিকল্পনা করেছেন শুনেছি।

—ভাসাভাসা আমিও শুনেছি। ওর স্বরূপ না দেখে কিছু বলতে পারছিনা। তবে এটা দেখছি ভারত সরকার নৃত্য নাটক সঙ্গীতকে জাতিকে প্রেরণা দেবার কাজে লাগাতে চান, আর পশ্চিম বাঙ্গালা সরকার চান ওগুলিকে এন্টারটেনমেন্টের কাজে লাগাতে।

—এন্টারটেনমেন্টই ত ও-সবের বড় কাজ।

—হ্যাঁ, দশবছর আগে থেকে বোম্বাই ওকথা বোঝাতে সুরু করেছে। বোঝাতে বোঝাতে সিনেমাকে তারা কোথায় ফেলেছে, তা ত দেখতেই পাচ্ছেন। এবার পড়েছে থিয়েটারের ওপর নজর। একটু সতর্ক থাকা কি বোকামো হবে ? সারা ভারতে নাট্যান্দোলন এখন প্রবল হয়ে উঠেছে। সরকারও আর উদাসীন নন্, সহায়তার জন্যে উৎসুক। একটু ভেবে বুঝে কাজ করবার এই ত সময়। কিন্তু এই সময়েই দেখা যাচ্ছে, বার্ণার্ড শ'র ভাষায়—The influence of theatre in England is growing so great that private conduct, religion, law, science, politics and moral are becoming more and more theatrical, whilst the theatre itself remains impervious to common sense, religion, science, politics and morals. বার্ণার্ড শ' ও কথা বলবার ঠিক আগেই বলেছেন—"The fine art is the subtlest, the most seductive, the most effective instrument of moral propaganda", সকলে একথ মানেন না, হয়ত বা বোঝেনও না। তাঁরাই নাট্যশালাকে এখনো রঙ্গালয় করে রাখতে চাইছেন এবং এন্টারটেনমেন্টকে moral propaganda-র চাইতে মূল্যবান বলে প্রচার করছেন—নাট্যশালাকে বোম্বাই রঙের পরিণতিতে পৌঁছে দেবার জন্যে। কেননা তাঁরা জানেন নাট্যশালা দুর্বার শক্তির ধারক ও বাহক। ওই শক্তি তাঁদের শঙ্কার কারণ।

সানরাইজ ফিল্মসের 'যদুভট্ট' ছবির একটি নাটকীয় সংঘাতময় দৃশ্যে অনুভা, বসন্ত ও অন্যান্য শিল্পী

আগামী দিনের সম্ভাবনাময় শিল্পী নবীনা চিত্রনটীদের অন্যতমা নমিতা সিংহ

বিকাশ রায় প্রোডাকসন্সের প্রাথমিক চিত্রপ্রচেষ্টা 'সাজঘর'-এর সাম্প্রতিক মহরৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ বিশেষ একটি হাস্যরসবহুল পরিবেশ উপভোগ করছেন : তাঁরা হলেন : যমুনা সিংহ, বিকাশ রায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, কানন দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, দেবকী বসু, উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন, অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

'সাজঘর'-এর মহরৎ অনুষ্ঠানে ভিন্নতর আর এক পরিস্থিতি মজা উপভোগে উল্লসিত সুপ্রভা, পাহাড়ী, কানন, উত্তম, সুচিত্রা ও অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

মধুকণ্ঠী প্লে-ব্যাক সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় : 'অগ্নি-পরীক্ষা' ছবির 'গানে মোর কোন্ ইন্দ্রধনু' গান-খানিতে এঁর ভুবনভোলানো কণ্ঠমাধুর্য্য রসিকচিত্ত ভরিয়ে তুলেছে

উদীয়মানা চিত্রনটীদের অন্যতমা মিতা চট্টোপাধ্যায়

আমরা উচ্ছল : সুচিত্রা ও সাবিত্রী

আমরা গভীর

প্লে-ব্যাক সঙ্গীতশিল্পী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনেত্রী মায়া মুখোপাধ্যায় (বিবাহিত জীবন বরণ করার পর চিত্রজগৎ ত্যাগ করেছেন শোনা যাচ্ছে) এবং অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় একত্রে ষ্টুডিও অভ্যন্তরে মহরৎ অনুষ্ঠানে

শ্রীমতী কানন দেবী : শিল্পী ও টেকনিশিয়ানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ চিত্রপ্রদর্শনীশেষে চিত্রগৃহ থেকে প্রত্যাবর্ত্তনরত

শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ--বৌ'-এর হিন্দী চিত্ররূপে নাম ভূমিকায় কামিনী কৌশল সর্ব্বংসহা মধুময়ী বাঙালী গৃহস্থবধূর রূপটি অনবদ্য অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন অপরূপভাবে

অভিনয় নয় : আপন কন্যাসহ অকৃত্রিম সাংসারিক পরিবেশে বর্ত্তমানের সবচেয়ে জনপ্রিয়া অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন

রঙ্গরসিক ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় কৌতুকপ্রদ কোনো ভূমিকায় নয়,
রীতিমত কর্ম্মচঞ্চল এবং ভাবগম্ভীর দুটি ভিন্নতর ভঙ্গিমায়

বেবী বুলা ও মাষ্টার বাবু : 'ফেরী' ছবিতে এই দুই ক্ষুদে শিল্পী অভিনয়চাতুর্য্যে দর্শকচিত্ত বিমোহিত করেছে : বুলা পরিচালক হেমেন গুপ্তের কন্যা এবং বাবু জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র

[illegible] পি'র আগামী ছবি 'সূর্য্যগ্রাস'-এ উত্তমকুমার ও সাবিত্রী

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র সংবাদ

(স্বপ্নে প্রাপ্ত)

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন, সহসা সেইখান দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যাইতেছিলেন। শরৎচন্দ্রকে এরূপ গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র কথনও দেখেন নাই—তাই থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ডাকিলেন 'শরৎ'—কোন উত্তর আসিল না। বঙ্কিমচন্দ্র আরও সন্নিকটে গিয়া ডাকিলেন।

বঙ্কিম। শরৎ! [শরৎচন্দ্রের চমক ভাঙিল, তিনি একটু অপ্রস্তুতও হইলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন]

শরৎ। এই যে আসুন, আসুন, আপনি কখন এলেন?

বঙ্কিম। এই একটু আগে। তা এত কি ভাবছিলে বলতো?

শরৎ। না—এই সংসারের কথা! বসুন! [বঙ্কিমচন্দ্র বসিলেন, শরৎচন্দ্র তাঁহার সম্মুখে বসিলেন]

বঙ্কিম। এখানে এসেও সংসারের কথা ভাবছো?

শরৎ। আজ্ঞে কি করি বলুন, চিরকাল ঘর-সংসারের বিষয় নিয়েই তো ভেবে এসেছি তাই এখনও সে ভাবনা ছাড়ছে না।

বঙ্কিম। তা হঠাৎ সংসারে এমন কি হল যার জন্মে তুমি এতটা চিন্তিত হয়ে উঠলে? বলতে গেলে এখন তো তুমিই বাজার রেখেছ।

শরৎ। আমি বাজার রেখেছি মানে?

বঙ্কিম। মানে বাংলাদেশের কাগজ খুললেই তো দেখি তোমার নাম প্রত্যেকদিন বিজ্ঞাপনের পাতায় ঝল্‌মল্‌ করছে। তুমি না থাকলে বোধ হয় সিনেমার বাজার কাৎ হয়ে পড়তো।

শরৎ। আজ্ঞে, আমি এতদিন তো বাজার রেখেছিলুম ঠিক কিন্তু সবাই মিলে যা করছে তাতে আমার প্রতিপত্তি থাকে কিনা সন্দেহ!

বঙ্কিম। কেন—তোমার প্রতিপত্তিকে শেষ করে এমন বুকের পাটা কার আছে?

শরৎ। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] আর বলবেন না···আমার বই নিয়ে এমন এক কাণ্ড বেধেছে যে বোধ হয় আর নতুন ক'রে কিছু উঠবে না।

বঙ্কিম। তার মানে?

শরৎ। মানে বাংলাদেশের অভিনেতৃকুল একেবারে সাফ্ বলেই দিয়েছে যে আমার বইয়ে ওরা আর নামবে না।

বঙ্কিম। তা ওরা না নামলেই বা—নতুন নতুন অভিনেতা নিয়ে তোমার বই তো হতে পারে?

শরৎ। মাথা খারাপ! অত সোজা যদি হত তাহলে আর ধর্মঘটের মানে থাকতো না। অভিনেতৃকুল সবাই একজোট, সঙ্গে সঙ্গে টেক্‌নিশিয়ানরা—ওরা যদি সবাই গোঁ ধরে বসে তাহলে ছবিই হবে না।

বঙ্কিম। হিন্দীতে তোলো!

শরৎ। সে তুললেও হয়তো বিপদ হতে পারে, ওরা হয়তো তাতেও বাধা দেবে, শুনছি তা দিচ্ছেও—এমনকি সৌখিন সম্প্রদায়ও আমার বই নিয়ে নামতে সাহস করছে না।

বঙ্কিম। কিন্তু এমন অবস্থা হল কেন? তুমি তো এখানে।

শরৎ। আজ্ঞে, আমি এখানে কিন্তু স্বত্বটা যে সেখানে। আমার স্বত্বাধিকারীর সঙ্গেই যে গোলমালটা বেধেছে।

বঙ্কিম। তা বটে—আমি অবশ্য স্বত্ব খুইয়ে এসেছি এই যা রক্ষে!

শরৎ। আপনি যে পঞ্চাশ বছর আগে চলে এসেছেন কিন্তু আমি যে এই সেদিন...

বঙ্কিম। তা বটে! তোমার পিছু-টান এখনও কমেনি।

শরৎ। কি করে কমবে বলুন? জীবিতকালে আমার বই নিয়ে যা হৈ-চৈ না হয়েছে মৃত্যুর পরে যে এতটা হবে, এ-ধারণা করতেও পারি নি।

বঙ্কিম। ঐ রকমই হয় শরৎ। বাংলাদেশ বড় বড় লোককে নিয়ে সব সময়ই মরবার পর জোর খাতির দেখায় কিন্তু বেঁচে থাকলে ভাবে ও তো নেহাৎ আমাদেরই মত, ওর আর বিশেষত্ব কি আছে?

শরৎ। সে কথা বলতে? আমি বেঁচে থাকতে আমার বইয়ের দর হাজার দেড়হাজার টাকার ওপর ওঠেনি, মারা যাবার পর সেই এক একখানা বইয়ের কিছু স্বত্ব কিনে অপর লোকেরা বিশ তিরিশ গুণ দামে অপরকে বেচেছে।

বঙ্কিম। বল কি?

শরৎ। আর বলবো কি সাহিত্য-সম্রাট, বসুমতীর কল্যাণে আপনার অবিসম্বাদী অধিকারী হয়েও বেঁচে থেকে যে-রাজ্য পরিপূর্ণ মাত্রায় ভোগ করতে পারলুম না—মরে গিয়ে দেখছি আমারই জিনিষ নিয়ে দুশো নেপোয় দৈ খেতে সুরু করেছে।

বঙ্কিম। আর আমার কথাটা ভেবে দেখ—যে-পাচ্ছে সেই গাদা-গাদা গ্রন্থাবলী ছাপছে সংক্ষেপিত সংস্করণ, বালক-সংস্করণ, শিশু-সংস্করণ কতরকম বার করছে, বইয়ের রয়েলটি নেই বলে সিনেমায় পট্ পট্ করে যে-পাচ্ছে সেই ছবি তুলে ফেলছে—একেবারে বেওয়ারিশ মাল। তবে আমার তাতে দুঃখ নেই।

শরৎ। কেন?

বঙ্কিম। প্রচার হোক। আমার লেখা সিনেমার সাহায্যে প্রচার না হলে হয়তো আমাকে লোকে ভুলেই যেত।

শরৎ। কিন্তু সব ছবিগুলোর তো ঠিক রূপ ফুটে বেরোয় নি।

বঙ্কিম। সেকি তোমারই বেরিয়েছে? কিন্তু যে-টুকু মাল আমরা দিয়ে এসেছি তা নিয়ে একটু বুদ্ধি করে ছবি তুললেই বাজার মাৎ—সেটা তো হয়েছে?

শরৎ। আজ্ঞে হ্যাঁ—আমাদের মালে তো ভেজাল ছিল না কিনা, তাই ওর সঙ্গে যত বাজে মালই মেশাক মূল জোরালো থাকাতে ক্ষতি হয়নি বিশেষ।

বঙ্কিম। ভাগ্যিস, বাংলাদেশে থিয়েটার আর সিনেমা ছিল তাই আমাদের নামটা টিঁকে রইল হে।

শরৎ। না, ও কথা কি বলছেন? সাহিত্য হিসেবে—

বঙ্কিম। সাহিত্য হিসেবে টিঁকে থাকলে আমরা থাকতুম হয়তো পুরোনো বইয়ের গাদার আলমারিতে, কিন্তু যাই বল কেউ জানতোও না আমরা কি লিখেছি। যেমন ধর রবির হয়েছে, ভাগ্যিস সে কতকগুলি গান আর কবিতার সঞ্চয়ন ছাপিয়ে এসেছিল তাই লোকের একটু-আধটু ওর বিষয়ে জানা আছে নইলে মুস্কিল হ'ত।

শরৎ। তা বটে···সিনেমায় থিয়েটারে ওঁকে নিয়ে বিশেষ কেউ সুবিধে করতে পারে নি।

বঙ্কিম। রবিরও দিন আসবে—পরে। আপাততঃ ওর জন্যে ক্ষেত্রটা তৈরী হয় নি, কারণ সময়ের তালের চেয়ে রবি একটু বেশী এগিয়ে গেছে।

শরৎ। তা ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমি ভাবছি আমার বই নিয়ে শেষকালে ফ্যাসাদ বাধলো?

বঙ্কিম। তোমার বই আর তুলতে বাকি কি আছে বল? এক 'মহেশ' ছাড়া তো সবই শেষ হয়ে গেল।

শরৎ। না এখনও বাকী রয়েছে কিছু, বিপ্রদাস, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত ইত্যাদি। তাছাড়া এবার হিন্দি সংস্করণগুলো থেকেও কিছু আদায় হবে।

বঙ্কিম। সে তো আর তুমি ভোগ করতে পারবে না?

শরৎ। না তা পারবো না ঠিক, তবু আমার বংশধররা···

বঙ্কিম। দেখ বংশধরদের জন্যে তুমি যা করে এসেছো ও

তো একটা প্রকাণ্ড জমিদারী বললেও হয়… তাদের জন্য আর যাই হোক তোমার ভাবনা করার কিছু নেই।

শরৎ। তা বটে… কিন্তু তা ছাড়াও দেশের কথাটাও তো ভাবতে হবে, আমার বই ছাড়া লোকে দেখবেই বা কি আর সিনেমার লোকেরা পয়সাই বা ক পাবে?

বঙ্কিম। শরৎ এটা তুমি কি বলছো? তোমার বই ছাড়া সিনেমা টি কবে না এত বড় কথাটা……

শরৎ। হ্যাঁ কথাটা একটু দম্ভের মত শোনাচ্ছে সত্যি কিন্তু কি করবো বলুন, বাস্তবক্ষেত্রে যে দেখছি তাই। আমার বই ছাড়া অনেক পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্রী তো একেবারে নস্যাৎ হয়ে যেত।

বঙ্কিম। সেটা ঠিক, তোমার আওতায় থেকে অনেক আগাছাও তরে গেছে কিন্তু তাতে আবার মুস্কিলও বেধেছে কি জান, নতুন করে আর কেউ ভাবতে শেখেনি। বাঁধা ফর্মুলা নিয়ে একই চক্রে সবাই ঘুর্ ঘুর্ করেছে…এবার একটু চাকা উল্টো দিকে ঘোরানো দরকার নয় কি?

শরৎ। ভুল করছেন—বাংলাদেশে কখনও উল্টো চাকা ঘোরাতে নেই, তাহলেই চরকির মত আপনাকে ঘুরতে হবে। আসলে এদেশের লোক নতুনত্ব চায় না—মুখে যতই প্রগতির কথা বলুক তারা পুরোনো সব জিনিষকে বেশি ভালবাসে। দেখছেন না, বাংলাদেশে পুরোনো ধরণের যত বইকে নাটক আর সিনেমায় দিলেই বাঁই বাঁই করে চাকা ঘুরতে থাকে?

বঙ্কিম। তা যা বলেছ। তবে তার কারণ আছে—সিনেমায় বা রঙ্গালয়ে মানুষ যুক্তি চায় না, চায় ঘটনার প্রবাহ। সেই ঘটনা যদি কতকগুলো ঘটে তাহলেই মানুষ ভারী খুশী। পুরোনো বইয়েতে যে সেগুলো খুব আছে।

শরৎ। যুক্তি চায় না বলা কি ঠিক হল?

বঙ্কিম। হ্যাঁগো, যুক্তি হলে ভাল কিন্তু না হলেও ক্ষতি নেই। আসলে তালে গোলে ভড় কিবাজী না করলে সিনেমা থিয়েটার কিচ্ছু জমে না, এ তো দেখছো। তাছাড়া আর একটা কথা, বাংলাদেশ একটু বেশি ভাবপ্রবণ, যেন তেন প্রকারেণ যদি চোখের জল ফেলাতে পার তাহলেই কেল্লা মেরে দিলে।

শরৎ। সে আমি জানি। চোখের জল কি করে ফেলাতে হয় সেই টেক্‌নিকটা আমার কি কম আয়ত্ত ছিল? সেদিক দিয়ে আপনাদের আমি উঁচিয়ে গেছি এটা নিশ্চয়ই মানবেন?

বঙ্কিম। একশোবার। একই মেয়েকে শুধু শাড়ী বদলে তুমি তার এমন রূপ বদলে দিয়েছ যে আমিই অবাক্ হয়ে গেছি। তোমার বাহাদুরী হচ্ছে ঘটনা সাজানো—এইজন্যেই চট্ করে অত জমে যায়। তাছাড়া কথা বলবার প্যাঁচটা তুমি এত আয়ত্ত করেছিলে যে ওখানে আমরাও হটে গেছি।

শরৎ। কিন্তু এত করে শেষকালে যে আমার বই 'বয়কট' করবে এ তো মহা মুস্কিলের ব্যাপার হল!

বঙ্কিম। আবার বলে তোমার মুস্কিল! তোমার কচু, তোমাকে ভাঙিয়ে কারোরই আর খাওয়া চলবে না।

শরৎ। তবে?

বঙ্কিম। সবাই খাবি খাক্ একটু। সাঁতার শিখতে গেলে মাঝে মাঝে নতুন সাঁতারুকে মাঝ গাঙে ছেড়ে দিতে হয় তা তো জান? দু-চার ঢোঁক জল খেলেই বা, কিন্তু তখন বাঁচবার জন্যে যত রকম কায়দা আছে তা দেখিয়ে যে বাঁচবে—নইলে চিরকাল আমাদের আঁকড়ে ধরে রেখে হাত-পা ছুঁড়ে কায়দা দেখিয়ে গেলে সাঁতারই তো শিখবে না কোনদিন।

শরৎ। তা বটে, তবে আপনি যে বলছিলেন 'প্রচার'।

বঙ্কিম। প্রচার যা হবার তা তো যথেষ্ট হয়েছে...আর কেন? তোমার আমার বই ছাড়া এইবার কে কি কায়দা দেখাতে পারে দেখাক্।

[রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ]

এই যে রবি, এস এস। শরৎ তো তার বই নিয়ে বিশেষ ভাবনায় পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ শুনেছি সব। কিন্তু আমি তো বলি শরতের দুর্ভাবনা ঘুচলো। আমার তো বই হলে ভাবনায় ঘুম হয়না।

শরৎ। কেন?

রবীন্দ্রনাথ। তার কারণ যেটুকু মানুষ প'ড়ে বোঝে সেটুকুকেও ছবিওয়ালারা ঘুলিয়ে দেয় আর যারা আমার বই পড়েনি তারা একেবারে ভবিষ্যতেও বইগুলো ওল্টাতে ভরসা করে না।

শরৎ। কেন আপনি তো অনেক পাহারার বন্দোবস্ত করে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ। জীবনে ওর চেয়ে বড় ভুল আর করিনি।

যত পাহারাওয়ালা আছে তাদের রক্তচক্ষু আর হাতের লাঠি দেখে সবাই এত চমকে ওঠে যে ভয়ে ভয় কেউ আর আসলে আমি কি বলতে চাই তাই বুঝতে পারে না। ফলে যে সব জিনিষ তারা বাজারে ছাড়ে তা দেখতে আমার আগেই লোক পালাতে থাকে।

বঙ্কিম। অবশ্য আমাদের তা নয়।

শরৎ। আমার তো নয়ই—লোক দলে দলে নাম শুনেই চলে আসে।

রবীন্দ্রনাথ। আমার নামের জোর অতটা হয়নি বাপু—দুর্ভাগ্য। আমি রবীন্দ্র-জন্মতিথি পালনেই সন্তুষ্ট আছি।

বঙ্কিম। সেটা ঠিক, কিন্তু আমাদের তো অত ঘটার জন্মোৎসব হয়না, মৃত্যুর পরে আমরা যে সিনেমা থিয়েটারের দৌলতেই বেঁচে আছি সেইখানেই যদি হাঙ্গামা হয় তাহলে করি কি বলো?

রবীন্দ্রনাথ। ও কিছু ভাবনার নেই—শরতের মেঘ চট্ করেই কেটে যাবে বরং আমি এখন মেঘে ঢাকা থাকবো কিছুদিন।

শরৎ। তা থাকলেও আপনার তো রয়েলটি আটকাবার কোন বালাই নেই?

রবীন্দ্রনাথ। তা কি করে থাকবে? আমি তো সবই বিশ্বভারতীকে দিয়ে এসেছি, শরৎও ঐ রকম একটা কিছু করে এলে ভাল করতে।

শরৎ। সেটা তো এখন বুঝছি।

বঙ্কিম। কিন্তু যে যাই করে আসুক, অপরের নাম ভাঙিয়ে নিজেদের দাম বাড়িয়ে যেখানেই সে-ব্যবস্থা থাকুক সেখানেই গোলমাল হবে। তার চেয়ে মরার আগেই সাধারণের সম্পত্তি করে না দিয়ে গেলে আমাদের মরেও শান্তি নেই জেনো।

শরৎ। এটা কি বলছেন বংশধররা বঞ্চিত হবে?

বঙ্কিম। বংশকে বেশি সজাগ রাখার দিন আর নেই বাপু—কারণ সে বংশ অপরকে নির্বংশ করে দিতে দ্বিধা করে না। তার চেয়ে দানপত্র করে দেশের লোকের হাতে ছেড়ে দিলে আমাদের জিনিষগুলোর সদ্গতি হবার ভরসা থাকতো।

সিনেমা-প্রশস্তি

কবিশেখর কালিদাস রায়

এযুগে সিনেমা দেবী তোমারি ত জয়জয়কার,
আমাদের মনোরাজ্যে রাজত্ব তোমার।
সাহিত্যকে দিন দিন তুমিই ত করিতেছ গ্রাস
দলে দলে সাহিত্যিক তোমারি ত দাস।
নাটক তোমার হাতে হ'ল ঝুমঝুমি,
নভেল পড়ার নেশা ঘুচায়েছে তুমি।

তুমিই ত চিত্র প্রদর্শনী।
শিল্পীদের চিত্রাগারে হেনেছ অশনি।
পথে পথে তব চিত্রশালা
ফুটপাথচারীদের জুড়াতেছে নয়নের জ্বালা ;
ট্রামে চড়ে যারা দিয়ে লাফ,
তার পানে চেয়ে চেয়ে ভুলে যায় জনতার চাপ।

ভজে তোমা এত পুরনারী
তারা রঙবেরঙের কেনে কত শাড়ী।
সেই শাড়ী পরিবার দেখাবার উপলক্ষ্য তুমি
সৃজিয়াছ, শাড়ী শোভা তব রঙ্গভূমি।
মাছ দুধ কেনা বন্ধ করি'
রাজস্ব জোগায় তব নাগর নাগরী।

এ যুগের ধর্মের প্রচার
কে করিবে তুমি ছাড়া ? লইয়াছ তুমি তারো ভার।
এ যুগের রাষ্ট্র-পরিষৎ
বুঝিয়াছে তব হস্তে নির্ভরিছে তার ভবিষ্যৎ
তোমারি দুয়ারে
প্রোপাগাণ্ডা তরে তাই আসে বারে বারে।
কী বা আর বলিব অধিক ?
তোমার করুণা ছাড়া চলেনাক মাসিক দৈনিক।

তারকার চিত্রগুলি বিজ্ঞাপন ছলে,
ছাপা নাহি হ'লে কোন পত্রিকা না চলে।
দৈনিকের তব পৃষ্ঠাখানি
ছেলে বুড়ো সবে পড়ে শ্রেষ্ঠ পাঠ্য জানি।

জিনিয়াছ তরুণ জগৎ,
তব হর্ম্ম্য পানে চেয়ে ছাত্রগণ কলেজের পথ
ভুলে যায়, গ্যালারিতে পেতে ভালো সীট
বেতন রাখিয়া বাকি কিনে ফেলে তোমার টিকিট।
বইখাতা দাবিয়া বগলে
কিউ দিয়া দাঁড়াইয়া ইস্কুলের ছেলে দলে দলে
দ্বারে তব সহিতেছে মাথার উপর
খর রৌদ্র, বৃষ্টি ধারা, বৈশাখের ঝড়।
এক সারে খাড়া রয়ে ছাত্রসহ বাড়ীর মাষ্টারে
টিকিট ঘরের দ্বারে মুখে মুখে পড়ানোটা সারে।
সরস্বতী নয় আর, ছাত্রদের আরাধ্যা ত তুমি।
তাহাদের মহাতীর্থ তব রঙ্গভূমি।
প্রবর্ত্তন করিবেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
সত্বরই সিনেমাতত্ব নামে এক নূতন বিষয়,
অনায়াসে পরীক্ষার্থিগণ
পেয়ে যাবে এগ্রিগেট আর উচ্চতর ডিভিসন।

চলচ্চিত্র ঃ কথা বনাম ছবি

গোপাল ভৌমিক

চলচ্চিত্র
অতি বিচিত্র
তুলনা কোথায় তার ?
সকল হৃদয়
করে সে বিজয়
অফুরাণ ভাণ্ডার।

নানা রস মিলে
বিশ্ব নিখিলে
শুনি জোড়া নেই তার-
বিশ শতকের
জটিল মনের
এই নাকি নবদ্বার।

সত্য এ সব
করি অনুভব,
মনে ভাবি হোক তাই-
আমার দেশের
বাণীচিত্রের
জয় গাক্ দুনিয়াই।
বাস্তবে দেখি
সব কিছু মেকি
গৃহিনী বলেন যবে :
"বাণী সিনেমায়
'দিন বয়ে যায়'
ছবিতে সঙ্গী হবে ?"
শুনে মাথা ধরে,
কাটাবো কি করে
অতটা সময় বসে—
তবু যেতে হয়
নইলে প্রলয়—
মনকে বোঝাই ক'সে।

ছবি দেখি আর
ভাবি বার বার
কি-যেন থেকেও নেই—
নাচ-গান-হাসি
আছে রাশি রাশি
তবু চিত্রের খেই
পাই নাকো খুঁজে,
শুনি চোখ বুঁজে
প্রাণহীন কথা যত
কর্ণ যুগলে
ঢোকে দলে দলে
কাংস্যরবের মত।

চলচ্চিত্র
অতি বিচিত্র
মন বলে গতি চাই—
শুধু ষ্টার দিয়ে
আসর জমিয়ে
কত দিন চলে ভাই ?
বাণীচিত্রের
একি দেখি ফের
বাণী আছে গতি নাই—
মন যদি চাও
দাও তবে দাও
চোখ জুড়োবার ঠাঁই।

হায় ছবি! তুমি শুধু ছবি!!

(রসরচনা)

নীরোদ রায়

শুধু পটে লিখা? আজ এক মহাতীর্থে বসে তাই-ই শুধু ভাবি। পটপট ক'রে মাথার বকেয়া অল্প ক'গাছি চুল ছিঁড়ে ফেললেও সে ভাবনার শেষ হয় না। তাই সব ভয়-ভাবনা-দুশ্চিন্তা অগতির গতি ভয়ভাবনাহারী দেবতার চরণে সমর্পণ ক'রে বসে আছি। একদা মায়া ছিল সংসারে দুটি জিনিষের ওপরে —তুচ্ছ টাকাপয়সা আর প্রাণটুকু—প্রাণ গেলেও পয়সাটি উপুড়হস্ত করতে পারতুম না আর আজ দেখছি টাকাপয়সা সব মায়াপ্রপঞ্চ, সব মিথ্যে, সত্য এই প্রাণের ধুকধুকুনিটুকু। এই দিব্যজ্ঞান লাভ সচরাচর ঘটে না, ঘটলেও সবাইয়ের ক্ষেত্রে এমনভাবে ঘটেনা যেমন ঘটেছে আমার। আজ এই দূরতীর্থে এসে তাই দেখছি মনে পেয়েছি প্রশান্তি, মুখে সদাহাস্য আর আপত্তি নেই কোন কিছুতেই।

বিপত্তিটা ঘটেছিল মধ্য-জীবনে। নতুন জীবন সুরু করলাম পিতৃ-বিয়োগের পর—তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে। অস্থাবর মুদ্রা-সম্পত্তি প্রায় লাখের ওপর আমার হাতে আসতেই অর্থের উত্তাপটা চমৎকার লাগল। সিগারেটের প্যাকেট ছেড়ে ক্রমে টিন কিনতে সুরু করলাম, ফ্রি-ডিষ্ট্রিবিউশানের মাত্রা বাড়িয়ে দিলাম। বাড়ীতে বেশীক্ষণ না থেকে গাড়ীতেই ছুটোছুটি করে, আড্ডা দিয়ে একটা নতুন জীবনের আবহাওয়া অনুভব করলাম।

পাড়ার ছেলেছোকরাদের ত হামেশাই লেগে আছে একটা না একটা জলসা, মিটিং, পুজো ইত্যাদি এবং প্রত্যেকটিতেই আমাকে হয় সভাপতি, নাহয় প্রধান-অতিথি গোছের একটা কিছু হতেই হ'ত। এদেশে এসব ব্যাপারে কিছু জ্ঞান না থাকলেও চলে, বলতে হয়না কিছু—শুধু টাকার অঙ্কের জোরটাই সব কিছু নীরবে বলে দেয়, শ্রোতা-অভ্যাগতরা এই নীরব ভাষার ব্যাপারটি আপনা থেকেই বুঝে নেন।

ক্রমশঃ পাড়া ছেড়ে বেপাড়ার ছেলেরা এবং ক্রমে দাদা পিসেমেসোর দল পর্য্যন্ত এসে অবলীলাক্রমে আমার কথার মূল্য দেবার জন্য অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে আমার বাড়ীতে আনাগোনা করতে লাগলেন। অর্থশালী ব্যক্তির প্রলাপগুলি পর্য্যন্ত অর্থপূর্ণ হয়ে থাকে, কিন্তু এর অনর্থের দিকটাতেও ঐ সঙ্গে হুঁসিয়ার থাকার অবকাশ তখন আমার কোথায়?

ফিনান্সিয়ার হিসেবে আমার একটা পোজিশান আছে এ-ধারণা নিয়েও অনেকে রকমারী ব্যবসার স্কীম দিয়ে লাভ-লোকসানের খতিয়ান পর্য্যন্ত দেখিয়ে দিতে লাগলো। ব্যবসার মার্কেট রিপোর্ট নিয়ে এরা আনাগোনা করতে লাগলো নিয়মিতভাবে।

ফিল্ম-লাইনে প্রচুর আনন্দের ভেতর দিয়ে দেশ-জোড়া সুনাম আর যশ আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে টাকাও আস্তে থাকে হুড় হুড় করে—এ-সব নিয়ে বহু আলোচনা হ'তে লাগলো স্কীম-মার্কা লোকেদের সঙ্গে। সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হয়ে গেছিলাম যেদিন দর্জ্জিপাড়ার, রক্-রেষ্টুরেন্ট-খ্যাত, যুদ্ধকালীন সিভিক্-গার্ড কর্ম্মী, আমাদের ভবানন্দ ওরফে 'ভবা' ছবি তোলার এক স্কীম বগলে করে এসে হাজির হ'ল। শুধু স্কীমই নয়, ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য

পর্য্যন্তও সে নিজেই লিখেছে—আমার কাছে শুধু সামান্য ফিনান্স-এর জন্যেই আসা। ভবাকে আমি বোঝালাম, 'ভাই, আমাদের বাংলা ছবির কোন বাজার নেই। তাছাড়া, যা সব ছবি হচ্ছে ও-ধরণের ছবি তুলে টাকা নষ্ট না করে ধর্ম্ম-শালা তৈরী করাই ভাল। তাতে পরকালের কাজ কিছু হবে।' ভবা তো কিছুতেই মানতে রাজী নয়, বলে, 'জানেন দাদা, হিন্দী ছবি করলে মাইরি মার নেই। আমার গল্প-টার হিন্দী ভার্সান্ তো দু'দিনেই করে দিতে

একটা লাগসই নাম দিতে হবে—এই ধরুন 'জুতা-কা-হাফসোল'……

পারি, আর ওতে কিছু নাচ-গান লাগিয়ে গুলজার করে দেওয়া যাবে। একটা লাগ্‌সই নাম দিতে হবে—এই ধরুন 'জুতা-কা-হাফ্‌সোল' বা 'মস্তক-কা-টিকি', 'উল্লু-কা-পাঠা', গোছের। দাদা আপনি বিশ্বাস করুন,আমার ওপর ছেড়ে দিলে একটা আগুন ছবি তৈরী করে দেবো আর হিট করে বেরিয়ে যাবে সব্বাই-এর মাথায় চাঁটি মেরে।' আমার কাছে এদিকে বেশী সুবিধে হবে না, সেটা হয়তো ভবানন্দ বুঝতে পেরে শেষকালে হাল ছেড়ে দিল।

কিন্তু গ্রহের ফেরে আবার সেই সিনেমার খপ্পরেই আমাকে পড়তে হ'ল আর এক দলের কাছে। এবার যারা ছবি তোলার স্কীম নিয়ে এলো, তারা আমার আধ-চেনা গোছের। ওদের আমি জানতাম, ওরা কয়েকটা ফেল-পড়া ব্যাঙ্ক থেকে সিনেমাজগতে ওভার-ড্রাফ্‌ট্ হিসেবে জমা হয়েছিল। তারপর এই স্কীম নিয়ে আমার সঙ্গে প্রায়ই তাদের দেখাদেখি হতে লাগলো। ওরা প্রথমে আমাকে টাকার ব্যাপারে একটু কড়া ভেবে, ব্যাপারগুলো মেড্ ইজির মত ক'রে আমাকে বোঝাতে লাগলো, আর সেই সঙ্গে জানালো হাজার পাঁচেক প্রথম দিকে খরচা করলেই মহরৎ ক'রে কাজের অনেকদূর এগনো যাবে। তাছাড়া, ওদের মত দিক্‌পালরা থাকতে কোন কিছুই ভাবতে হবে না আমাকে।

আমার তরফ থেকে সম্পূর্ণভাবে খোলাখুলি 'হ্যাঁ' ব'লে কোন উত্তর না পেয়েও ওরা যা সুরু করলো তাতে দস্তুর-মত আবহাওয়া বদলে গেল। দিনরাত ছুটোছুটি আর কর্ম্মব্যস্ততা দেখে মনে হলো ওরা বুঝি উত্তম, উৎসাহ আর পরিশ্রমের সোল এজেন্সী নিয়েছে। বাড়ীর দরজায় ট্যাক্সি রেখে কেউ ছুটে নেমে আসছে, মাথায় উস্কো খুস্কো চুল নিয়ে পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ আর ফাইল হাতে করে! ঘরে ঢুকে সব জরুরী কথা জরুরীভাবে ব'লে আবার বোঁ করে বেরিয়ে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠছে। কেউ একটু বসে চায়ের

পেয়ালায় চুমুক দিয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়েই লাফ দিয়ে উঠে 'আই এ্যাম অলরেডি লেট' ব'লে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। দু'একজনকে দেখতাম মাল-জাহাজ-এর মত ধীর গতিতে কাজ করতো। এরা আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে যেখানে বসতো সেখান থেকে আর ওঠ্বার নাম করতো না। এরা বসে ফাইল-কাগজ খুলে আপনমনে লেখালেখি করতো—কারো কথার জবাব বড় একটা দিত না। যদিও বা দিত তাও সে হ্যাঁ, না, গোছের সংক্ষেপে, আর নয়তো সিগারেট-ধরা বাঁ হাতটা একটু তুলে 'পরে বলবো' এমনি গোছের একটা ইঙ্গিত দিত। এদের আন্তরিকতায় সন্দেহ করা দূরে থাক, বরং আস্থা আমার বেড়েই যেতে লাগলো। একটা ভাল কাজ হচ্ছে সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম। কিছু দিন পর এরা আমাকে জানালো যে আমার মোট হাজার পঁচিশ টাকা খরচা করলেই হবে—বাকীটা ডিষ্ট্রিবিউটারের কাছ থেকে জোগাড় ক'রে ছবি শেষ করে রিলিজ করবে বলে ভরসাও দিয়েছে। লাভের টাকা মারে কে, কিন্তু কম বেশী নির্ভর করবে আমাদের টিম-ওয়ার্কের ওপর।

টিম সম্পূর্ণ করতে আরও দু'চারজন সিনেমা শিল্পের বিশ্বকর্ম্মার আবির্ভাব হ'ল। এরা শুধু দিস্তে দিস্তে কাগজ নিয়ে লেখালেখি করতো আর কাট্, ফেড্ আউট, প্যান, সুইপ্ ইত্যাদি কি সব বলতো। এদের চতুর্দ্দিকে চায়ের পেয়ালাগুলো ছড়িয়ে থাকতো, আর ওগুলোতে এরা সিগারেটের ছাই বিলিয়ে দিত। দেখে মনে মনে ভাবতাম, কত গুণী এই বঙ্গ-জননীর সন্তানরা! কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে এদের কদর কেউ বুঝলো না। দুর্ভাগা দেশকে এভাবে মাঝে মাঝে স্মরণ করি।

এই সিনেমাজগতে এরা কেউই ফেলবার মত নয়। স্কোপ পেলে দেশে এরা একটা সেন্সেশান্ ক্রিয়েট করতে পারে এবং এদেরই একজনের লেখা গল্প শরৎচন্দ্রের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দিতে পারে!

. এহেন লেখক একদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর সমর্থকদল নিয়ে আমাকে ঘিরে বসলেন—সেদিন তাঁর গল্প শুনে এ্যাপ্রুভ্ করার পালা। আমি শ্রীল শ্রীযুক্তের মতো বিজ্ঞ হয়ে বসে শুনলাম প্রায় দেড়ঘণ্টা ধ'রে। লেখক পড়ে যাবার সময় যতদূর সম্ভব আবেগ, দুঃখ, প্রেম—এসব হাত-মুখের ভঙ্গী দিয়েই বোঝালেন এবং কাহিনী শেষ ক'রে পুরো একগ্লাস ঠাণ্ডা জল চোঁ চোঁ করে মেরে দিয়ে 'কেমন লাগলো, স্যার?' ব'লে আমাকে জিগ্যেস করলেন। আমার ডিসিশানই হবে ফাইনাল্ আর তা' মরালি বাইণ্ডিং। আমি তাই 'গল্প খুব বুঝি' এমনি একটা ভাব দেখিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। আমাকে চুপচাপ দেখে লেখক বোঝাতে লাগলেন যে এই কাহিনীর ৫০ ভাগই সত্যি ঘটনা এবং সেইজন্যেই ছবিটাতে লাইফও থাকবে। তারপর, এতে ড্রামার এফেক্ট হয়েছে অপূর্ব্ব। পিক্চার-ভ্যালুর দিক থেকে এতে আছে ২৫% সাসপেন্স, ২৫% ক্লাইম্যাক্স আর আছে ৩০% লাভ-এ্যাফেয়ার। তাছাড়া এতে রয়েছে চোখা চোখা সংলাপ, কত উত্তেজনা-পূর্ণ মুহূর্ত্ত এবং ট্র্যাজেডি, আর থাকছে বিখ্যাত সঙ্গীত-পরিচালক বলাই সামন্তের সুরের মায়াজাল—দর্শকদের একেবারেই পাগল করে দেবে। সেইসঙ্গে আরও একটা জিনিষ তাঁরা বোঝাতে ছাড়লেন না যে গল্প এত জমাট হয়েছে যে ইন্টারভ্যালে ব্রেক দিলে দর্শকরা রেগে আগুন হয়ে যেতে পারে।

তবুও আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে লেখক একটু গলে যাবার মত ভাষায় বলতে লাগলেন, 'আর আমাদের মনীষা দেবী হিরোইন হ'লে যা মানাবে স্যার! মনে হবে যেন ওঁরই জীবনের কাহিনী উনি ছবিতে সবাইকে জানাচ্ছেন। মনীষা দেবী কিন্তু প্রথমটায় একটু গররাজী ছিলেন, আমার অনুরোধে শেষটায় প্রায় রাজী হয়েছেন। ওঁর টাকার অঙ্কটা একটু বাড়িয়ে দিলেই আর আপত্তি করবার কিছুই থাকবে না। ওঁর ডিমাণ্ড দশহাজার টাকা. আমার টাকা হলে তক্ষুণি হেসে রাজী হতাম। কিন্তু আপনাকে জিগ্যেস না ক'রে আমি তো কিছুই করতে পারি না স্যার! আমি না হয় আমাদের এই নতুন প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ ভেবে ষ্টোরি-র জন্যে পাঁচ হাজারেই রাজী হতে পারি, কিন্তু যিনি এ-কাহিনীর রূপ দিতে নিজের মন প্রাণ ঢেলে অভিনয় করবেন, তাঁর পক্ষে ও-টাকাটা তেমন কিছু বেশী নয়। আপনার কি মনে হয় স্যার?'

আমি মাদ্রাজীদের মত দুদিকেই মাথা নেড়ে না—হ্যাঁ-গোছের আভাষ দিয়েছি মাত্র, কিন্তু আর সবাই প্রায় চেঁচিয়ে, হাত নেড়ে, নানান্ উদাহরণ দিয়ে প্রোপোজালটা পাশ্ করিয়ে নিলে।

পরদিন মনীষা দেবী আবির্ভূতা হলেন—মর্ত্তের অভিনেত্রী দেবীদের মতই —ঝকমকে ভ্যানিটি ব্যাগধারিণী, নয়নযুগলে কালো আভরণী, ঝলমল বিভূষিতা বেশে। রঞ্জিত ওষ্ঠদ্বয়ের ফাঁকে কিঞ্চিৎ বিকশিত শুভ্র দন্তরাজি। ঈষৎ মধুর হাসিকে আরও মধুর করে মনীষা দেবী আমাকে নমস্কার জানালেন। আমার ঘরে যেন এক ঝলক আলো এসে

চেক নিয়ে মনীষা ভুবনবিজয়িনীর হাসি হাসল

ঢুকলো। সসম্মানে তাঁকে আসনে বসিয়ে আমরা সবাই ঘিরে বসলাম। সামান্য জলখাবার এলো, সামান্য কথাবার্ত্তা হলো, শান্ত পরিবেশের ভেতর কণ্ট্রাক্ট সই করে অগ্রিম পাঁচ হাজার টাকার চেক্ নিয়ে মনীষা ভুবনবিজয়িনীর হাসি হাসলেন, এবং পলক না ফেলতে দখিনের শান্ত মলয়ার মত দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ঘরটা যেন গুমট হয়ে দম বন্ধ হয়ে এলো।

* * * *

একটা শুভদিন দেখে যথারীতি আনুষ্ঠানিকভাবে ষ্টুডিওতে মহরৎ হয়ে গেল। এই শুভানুষ্ঠানের হোতা হিসেবে আমারই মাথায় আর কপালে ধান-দূর্ব্বা চন্দন-তিলক অতিরিক্ত পড়লো এবং তারই নিশ্চিত ফলাফল লাভ করলাম আমার জীবনের এই চরম দুর্গতি। ষ্টুডিওর মালিক আমাকে দিয়ে চল্লিশটি স্যুটিং দিনের চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নিয়ে পাঁচহাজার টাকা অগ্রিম নিলেন এবং আন্তরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে জানালেন যে ঐ ষ্টুডিও ধরতে গেলে আমারই এবং যখন যা দরকার তা পেতে কোন অসুবিধাই হবেনা। পরদিনই আমাদের অফিস ঘরের দরজায় প্রযোজক-পরিচালক হিসেবে আমারই নাম লেখা নেম-প্লেট ঝুলছে দেখে মনে মনে আনন্দিত হলাম আর সব সময়ই সচেতন রইলাম 'আমি সব জানি'।

আমার একটা মাত্র গাড়ীতে এতবড় মহৎ কার্য্য হতে পারেনা বলেই গোটাকয়েক ট্যাক্সি আমাদের জন্যে বাঁধা

থাকতো। এভাবে নানান্ খাতে খরচা ট্যাক্সিমিটারের মত পট্ পট্ করে বাড়তে লাগলো—ভারী পকেট হাল্কা হতে বেশী দেরী হতনা। অথচ আসল কাজের পাত্তা নেই, সুটিংও হচ্ছেনা তেমন, আর ফুটেজও মোটেই বাড়ছেনা। তার ভেতর আবার দুদিনের সুটিং মাঠে মারা গেছে মনীষার অসুস্থতার জন্যে। অবশ্য এর জন্যে মনীষাকে দায়ী করা চলেনা মোটেই। বেচারী সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থেকে যেভাবে আমার কাজে সাহায্য করেছে তাতেই

একি গায়ের জোরের কাজ ?

না ওর শরীরটা একটু খারাপ হয়ে পড়েছে। ওর আন্তরিকতাই আমাকে মুগ্ধ করেছে আর এত বড় কাজে নামতে সাহসী হয়েছি।

একদিন রাত্রের সুটিং-এর সময় মনীষা অসুস্থ শরীর নিয়েই মেক-আপ করে বসে রইল। ওদিকে শুনলাম ক্যামেরা নাকি তখনো রেডী হয়নি। ছুটে গেলাম ক্যামেরাম্যান জলিবাবুর কাছে। কাজ একটু এগিয়ে নেবার জন্যেই নাইট-সুটিং-এর ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু রাত ৮টায় যেখানে আরম্ভ করবার কথা সেখানে ১১টা বেজে গেছে দেখে আমি বিচলিতভাবেই জলিবাবুকে একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু কোথায় ? তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে দিব্যি পান চিবোতে চিবোতে বললেন—'দাঁড়ান স্যার, এত ব্যস্ত হলে কি চলে ? একি গায়ের জোরের কাজ ? এসব হচ্ছে টেকনিক-এর ব্যাপার। আপনি যে মালটা এনেছেন ওটা টেষ্ট করতে পাঠিয়েছি—ইমালশান দেখে তারপর ক্যামেরায় লোড্ করবো।' আমি টেকনিকের ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না, তবে 'মাল' অর্থে যে নেগেটিভ্ ফিল্ম তা বুঝলাম। ওদিকে মনীষার কষ্ট হচ্ছে ভেবে আমি ঘেমে যাচ্ছি আর ঘনঘন সিগারেট ফুঁকছি।

একটু পরে জলিবাবু এসে জানালেন যে আমার মাল একেবারে ফগি—ওতে চলবেনা। এমনিতেই প্রোডাকশান ম্যানেজার কোত্থেকে ব্ল্যাক-এ ফিল্ম কিনে আনতো, এখন হাতে আর ষ্টক নেই। এত রাত্তিরে এখন কোথায় কি পাই এসব নানান্ ভাবনা মাথায় এসে আমার চিন্তাধারাকেও ফগি করে দিল। হঠাৎ জলিবাবুরই মুখ দিয়ে যেন দৈববাণী হ'ল। 'স্যার, আমাদের সরোজবাবুকে বলুন, ও এসবের সন্ধান জানে—হয়তো এক্ষুনি ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।' আমি এদিক-ওদিক তাকালাম, এই পরিত্রাণকর্তা সরোজবাবুটিকে দেখবার জন্যে। তাঁর আবির্ভাব ঘটলো সঙ্গে সঙ্গেই। আমাকে কিছুই বলতে হ'লনা, জলিবাবুর নির্দেশে আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে সরোজবাবু মোটর নিয়ে ছুটলেন। শুধু একটিমাত্র কাজ আমাকে করতে হ'ল—তা হচ্ছে ৩৫০৲ টাকা তাঁর হাতে দেওয়া। দেড় ঘণ্টা পরে সরোজবাবু ফিরে এলেন, ক্যামেরাম্যান অভয়বাণী শোনালেন যে আর সুটিং সুরু হতে দেরী হবেনা। তখন কি জানতাম যে আমার মাল আমারই থাকবে আর বাইরের মাল আবার বাইরেই চলে যাবে ?

তখন রাত প্রায় দুটো বাজে। ওদিকে মনীষা মেক-আপ-সুদ্ধো আমার গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি দরজা খুলে গায়ে হাত দিয়ে ডাকতেই মনে হ'ল গা'টা যেন বেশ গরম। 'এ কি! তোমার গা গরম যে? জ্বর এসেছে নাকি ?' মনীষা আমার দিকে আধ-খোলা চোখে তাকিয়ে বললে—'আজ সুটিং থাক।' আমিও সঙ্গে

সঙ্গেই 'প্যাক-আপ' হুকুম দিয়ে মনীষাকে নিয়ে ওর বাড়ী চলে গেলাম। সে রাত্তিরে আর বাড়ী ফেরা হলো না।

দু'দিন পর দিনের বেলা সুটিং হবার কথা। বাড়ী থেকে ৮৷৷০টায় বের হলাম পথে মনীষাকে তুলে নেবো ব'লে। এ-সময় আমাদের প্রোডাকশান-ম্যানেজার শরৎবাবু এসে জানালেন—'স্যার কিছু টাকার জরুরী দরকার, হাতে আর টাকা নেই। আর্টিষ্টদের জন্যে মেটিরিয়্যাল কিনতে বেশ কিছু টাকা খরচা হয়ে গেছে, আর সেদিন আউটডোরে লোকেশান সুটিং-এ গিয়েও বেশ কিছু খরচা হয়ে গেছে। আর এক্সট্রাদের জন্যেও অনেক টাকা খরচা হবে।' আগের খরচের হিসাব-তালিকা আমার হাতে পেশ ক'রে শরৎবাবু জানালেন—'ড্রেসার আরও টাকা চেয়েছে, কারণ আমাদের বেশীরভাগ পোষাকেরই কন্টিনুইটি আছে—ওগুলো আর কাউকে ভাড়া দিতে পারছে না। তাছাড়া স্যার, ওদিকে জুয়েলার ৭৫০৲ টাকার বিল দিয়ে তাগিদ দিচ্ছে মনীষা দেবীর সেই নেকলেস্‌টার দামের জন্যে। আমার মনে হয় স্যার, এ উইকে হাজার তিনেক দিলেই আমি ম্যানেজ করে নিতে পারবো।' সকালবেলা কাজের মুখে অত কথা ভাল লাগে না। দু'হাজার টাকার নোট শরৎবাবুর হাতে দিয়ে, 'আপাততঃ এই দিয়ে ম্যানেজ করুন' ব'লে বেরিয়ে পড়লাম।

ষ্টুডিওতে এসে দেখি ক্যামেরা, সাউণ্ড, সেট্‌, লাইট—সব রেডী। মনটা একটু আশ্বস্ত হ'ল এদের কাজের নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখে! যথারীতি বিভাগীয় কর্ত্তাদের, অর্থাৎ ক্যামেরাম্যান, সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে 'গুড্‌ মর্ণিং' করতে গিয়ে দেখি ভোম্বলবাবু সাউণ্ডের মেসিন খুলে ট্রাকের ভেতর চিন্তিতভাবে বসে আছেন। 'কি ব্যাপার ভোম্বলবাবু? আবার নতুন কোনো সমস্যা কি?' জিগ্যেস করলাম আগ্রহ নিয়ে। 'আর স্যার সমস্যা!'—বলেই তিনি ট্রাক থেকে বেরিয়ে এসে 'দেবেন, দেবেন' বলে চেঁচাতে সুরু করলেন, হাত মুছ্‌তে মুছ্‌তে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'স্যার সেই সকালে বাড়ী থেকে কার মুখ দেখে বেরিয়েছি জানি না, এসেই মেসিন নিয়ে ঝামেলায় পড়েছি—স্পীড-এর কাঁটা ইণ্ডিকেট করছে না। সকালবেলার জল-খাবারটি পর্য্যন্ত মুখে দেবার সময় করে উঠতে পারিনিকো, তাই ব'লে পেট মানবে কেন? আমার আবার আজে-বাজে খাওয়া চলে না, ডাক্তারের বারণ আছে। তাই দেবেনটাকে বললাম আমার খাবার আনতে, আর ও বেটাছেলে কোথায় গিয়েছে কোন পাত্তা নেই।' আমি বিব্রত বোধ করলাম। আমারই কাজের জন্যে একটা লোক এভাবে সামান্য খাবারের জন্য কষ্ট পাবে তা কি হয়! বল্‌লাম—'আপনার খাবার এক্ষুনি আনাবার ব্যবস্থা

এই উইকে হাজার তিনেক দিলেই আমি ম্যানেজ করে নিতে পারবো

করছি ভাই আমার গাড়ী পাঠিয়ে। আমার ড্রাইভারকে বলে দিন আপনার কি কি আনতে হবে।' ভোম্বলবাবু বাজে খাবার খান না—তাই জলযোগ থেকে একপো দই-এর একটা ভাঁড় আর ৪।৬টা সন্দেশ, লেক-মার্কেট থেকে গোটা দুই ভাল কলা আর রূপালী সিনেমার পাশের পানের দোকান থেকে গোটাচারেক জর্দ্দাওয়ালা পান আনিয়ে দিতে বললেন। ড্রাইভার হুকুম তামিল করতে তক্ষুনি চলে গেল।

সকালবেলা এই আহার-কষ্টের জন্যে সহানুভূতি জানাতেই ভোম্বলবাবু একটু উদাসভাবে তাঁর বাড়ীর নানান্ ঝামেলা, অসুখ-বিসুখের কথা জানালেন। এ-লাইনে কাজ করলে বাড়ী-ঘর ভুলে যেতে হয়, তবুও তিনি কাজে গাফিলতি করতে পারেন না। বিশেষ করে, আমাদের মত পার্টি বলেই আজ তিনি এসেছেন, না এলে বহু টাকা লোকসান হয়ে যাবে সুটিং বন্ধ থাকলে।

ইতিমধ্যে ক্যামেরাম্যান এসে আমাকে ডেকে বললেন—শুনছি স্যার সাউণ্ড-মেশিন নাকি গোলমেলে হয়ে আছে—স্পীডোমীটার নাকি কাজ করছে না? এ-সব টেক্‌নিকের ব্যাপার কিনা, তাই কখন যে বিগড়ে যায় কিছুই বলা যায় না। তাছাড়া ভোম্বলবাবুর মানসিক অবস্থাও ভাল নেই, বাড়ীতে স্ত্রীর অসুখের জন্যে। এখন আমি বলি কি, ও নিজে গিয়ে একটা নতুন স্পীডোমীটার কিনে আনুক। দাম কতই বা হবে—বড় জোর ৮০৲ টাকা। নাহলে এই সামান্য টাকার জন্যে সুটিং বন্ধ থাকলে লোকসানটা খুব বেশী হয়ে যাবে। আপনি বরং ওকে টাকাটা দিয়ে এক্ষুনি একটা স্পীডোমীটার আনতে পাঠিয়ে দিন, ফেরার পথে ও বরং বাড়ী হয়ে বৌকে একটু দেখে এলেই—এক ঢিলে দু'পাখী হয়ে যাবে—ঠিক নয় কি? সত্যিই তো, এত সহজ উপায় এত সুন্দরভাবে বাত্‌লে দেবার ক্ষমতা ক'জনের থাকে? এর চেয়ে হিতৈষী আর কে হয়? আমি আর কিছুমাত্র বিলম্ব না ক'রে তক্ষুনি টাকাটা জলি-বাবুর হাতেই দিয়ে বললাম—'একটু শীগ্‌গির করে ভোম্বল-বাবুকে আসতে বলবেন। আমরা সবাই বসে আছি কিনা—'। ইতিমধ্যে আমার ড্রাইভার জলখাবার নিয়ে এসে গিয়েছিল, সেটুকু শেষ ক'রে ভোম্বলবাবু আমার মোটর নিয়ে চলে গেলেন।

সব ঠিক করে লাঞ্চ-এর পরেই সুটিং হবে বলে সবাই তৈরী হ'তে লাগলো। ষ্টুডিওর রেষ্টুরেন্টকে অর্ডার দেওয়া আছে টেক্‌নিশিয়ান আর আর্টিষ্টদের সময়মত চা-টা দেবার। সেই এ্যাকাউন্টে দরোয়ান-চৌকিদার থেকে সুরু ক'রে ষ্টুডিওর পাঁচিলের ভেতরকার সব কটি প্রাণীই ডবল-ডিমের মাম্‌লেট্ ছাড়া চা খায়না। 'বয়' খানিক বাদে বাদে স্লিপ নিয়ে আসে আর আমাদের প্রোডাকসান-ম্যানেজার সই করে দেন। সেদিন লাঞ্চ-এর পর সুটিং হয়েছিল—দু'টি শট্ মাত্র। ২৫০ ফিট্ ফিল্ম এক্সপোজ করা হয়েছিল, চারবার এন্, জি, দু'বার সাউণ্ড ডিফেক্ট হয়েছিল ব'লে। তারপরই আমার হুকুম—প্যাক আপ্।

আমার কোলীগ্‌রা ওদিকে মেতে আছে—ডাইরেকশান, এডিটিং, মিউজিক এইসব নিয়ে—মাঝে মাঝে ওদের দর্শন পাই সেই পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে—মাথায় উস্কো-খুস্কো চুল। সব সময়ই ওদের 'নো টাইম, ভেরি বিজি' ভাব। ওদের চাহিদামত টাকা দেওয়া ছাড়া কথা বলবার সুযোগই পাচ্ছিলাম না। ওদের নিয়ে যে ফিনান্সিয়াল পোজিশানটা একটু রিভিউ করে দেখবো সে সময়টুকুও পর্য্যন্ত ওদের নেই। আমার টাকার পুকুর শুকিয়ে এসেছে প্রায়—ওদের কথামত ডিষ্ট্রিবিউটার বা অন্য ফাইনান্সিয়ারই বা কোথায়? কাহিনীকার তো তাঁর প্রাপ্য ৫০০০৲ টাকা নিয়ে মা-র অসুখ ব'লে বাড়ী চলে গেছেন—আর কোন খবরই নেই।

মনীষার টাকা পুরোপুরিই দেওয়া হয়ে গেছে। ওর নতুন বাড়ীর কাজ হচ্ছে—এখন টাকার ওর খুব দরকার আমি তা বুঝি। আমার ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্ট থেকে যে টাকা ধার দিয়েছি তা আমার নিজের যেচে দেওয়া—ও চায়নি কখনো। ওর মত একজন সঙ্গীর প্রয়োজন খুব। কতবড় অনুভূতি শক্তি ওর—আর আমার কাজে ওর কতখানি দরদ! ও বলতো—আমি নাকি দেবতার মত মানুষ। ওর মনের কথা আমি নাকি ভগবানের মত বুঝতে পারি। মনীষার সম্বন্ধে আমারও এ ধারণা ছিল। আমার কখন কি দরকার হবে না-হবে ও ঠিক বুঝতে পারতো। এমনকি আমার মাথা-ধরাটা পর্য্যন্ত ওর কাছে গোপন রাখতে পারিনি। অদ্ভুত এই মেয়েটি—রূপে গুণে সমান।

ইদানীং বাড়ীতে মোটেই মন টি'কতো না, সারাক্ষণ ষ্টুডিওতে থাকতে ইচ্ছে করতো। ষ্টুডিওতে কত রকমের কত লোকজন—সবাই আমার প্রতি অগাধ সম্মান দেখায়। আমার আশে পাশে ওরা সারাক্ষণ থাকতে

পারলে খুশী হয় আর আমার কোন দরকারে সাহায্য করতে ওরা সর্ব্বদাই উদগ্রীব হয়ে আছে। আমার ছবির কোথায় কি করলে ভাল হবে সে নিয়ে আলোচনা আর উপদেশ দিতে কেউ কার্পণ্য করে না। এরা পরের উপকারের জন্য কতখানি আগ্রহশীল! কত ভাল আমার দেশের লোক, তার প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়।

* * *

একদিন বেলা দশটায় সুটিং সুরু হবে বলে সকাল ৮টায় ষ্টুডিওতে এসে বাইরে চেয়ার টেনে গল্প করছি। সেট-ইন-চার্জ্জ এসে আমাকে জানালেন যে, আমাদের সেট তৈরী করতে গত রাত্তিরে খুব হুজ্জোৎ গেছে। ষ্টুডিওর মালমশলা দিয়ে এত ভাল সেট তৈরী করা সম্ভব নয় বলে বাইরে থেকে মালমশলা কিনে বাড়তি লোকজন লাগিয়ে কাজ শেষ করতে হয়েছে। নাহলে সুটিং আটকে গেলে বহু টাকা গচ্ছা যাবে। মোট খরচা ১৫০৲ টাকার একটা বিল্ দিয়ে আমাকে জানিয়ে দিলেন যে এন, টি, ছাড়া এমন সেট্ আর কোথাও তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। ক্যামেরায় নাকি এর দুর্দ্দান্ত এফেক্ট আসবে। ভদ্রলোক আমাকে এই বিপদ থেকে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন এবং হাই ক্লাস সেট্ তৈরীর জন্যে তাঁকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

ছবির হিরো স্বপনকুমার মেক-আপ করতে গেছে। এই ছেলেটি নতুন হলেও খুব উৎসাহী আর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে মনে হ'ল। তবে মনীষার কাছে ওকে যেন একটু বেখাপ্পা লাগে। আর মনীষাও যেন প্রাণ খুলে ওর সঙ্গে অভিনয় করতে জুৎ পায়না—সঙ্কোচ বোধ করে। যাক্‌গে আজ মনীষার যখন সুটিং নেই তখন এসব ভেবে লাভ নেই। মনীষা একবার নিশ্চয়ই আসবে—নাহলে আমার কাজের অসুবিধা হয়, ও তা জানে। পেছন থেকে হঠাৎ কে বলে উঠলো—'ম্যাডাম্ এসে গেছেন স্যার!'—তাকিয়ে দেখি মনীষাই তো!

ষ্টুডিওর লোকদের ভেতর অফিসের কৃপাসিন্ধুবাবুকে আমার খুব ভাল লাগতো। ভদ্রলোক অতি সজ্জন। অবসরের সময় আমার কাছে বসে ফিল্ম-জগতের নানা কীর্ত্তি-কাহিনী শোনাতেন। কবে কোন্ অভিনেত্রী সেট-এ ফেন্ট হয়ে গিয়েছিল, কবে কোন আর্টিষ্টকে ষ্টুডিও থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল তার চরিত্রদোষের প্রমাণ পেয়ে—এইসব। সেদিন তিনি আমার কাজের অসুবিধা দেখে চুপি চুপি আমাকে বললেন—'আপনি স্যার, এ-লাইনে নতুন এসেছেন—হালচাল জানেন না বলেই এ অবস্থা হচ্ছে আপনার।' সত্যিই তো! সিক্রেট্ অব্ সাকসেস্ বা ট্রেড সিক্রেট্ তো আমার জানা নেই! তিনিই উপায় বাতলে দিলেন—'কাজের মাথাওয়ালাদের হাত

কাজের মাথাওয়ালাদের হাত করতে হলে কিছু এক্সট্রা দিতে হবে

করতে হ'লে কিছু এক্সট্রা দিতে হবে। নাহলে স্যার ওদের এমন কি গরজ পড়েছে যে আপনার জন্যে মন দিয়ে কাজ করবে? ওরা তো ষ্টুডিওর লোক—বাঁধা মাইনে। আপনার কাছ থেকে কিছু আশা করাটা ওদের অন্যায় নয়, এতে বরং আপনারই ডবল কাজ হবে। নাহলে, বুঝলেন না স্যার, এভাবে আপনার অনেক লোকসান হয়ে যাবে।' অফিসঘরে কোন্ বেঞ্চে উঠতেই তিনি উঠে

চলে গেলেন। আমি হাত দুটো পকেটে পুরে দিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলাম।

তখন বেলা আন্দাজ ১২টা হবে—সেট্-এ সবাই হাজির হয়েছি। ক্যামেরাম্যান চেঁচামেচি সুরু করলেন—'এ লাইটে চলবেনা, আরও অন্ততঃ দু' কিলোওয়াট চাই, নাহলে ব্যাকগ্রাউণ্ডের এফেক্ট কিছু আসবে না।' লাইটম্যান্ জানিয়ে দিল যে দু' নম্বর সেট-এ অন্য পার্টির ডাইরেকটার সব লাইট ঠিক করে রেখে গেছেন। এখন ও-লাইটের পোজিসান বদলালে ওর আর চাকরী থাকবেনা। এসব নিয়ে বেশ একটু গোলমাল সুরু হয়েছিল মাত্র, তখন অফিসের কৃপাসিন্ধুবাবু এসে লাইটম্যানকে দু' ধমক দিয়ে লাইট এনে দিতে বললেন। চাকরী থাকবে কি, না থাকবে সেটা কৃপাসিন্ধুবাবুই বুঝবেন। আমাকে এভাবে কৃপাসিন্ধুবাবু বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন মধুসূদন হয়ে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দুজনে দূরে গিয়ে চেয়ারে বসলাম, দুজনের জন্যে চা আর ডবলডিমের মামলেট আনতে দিলাম।

চা খেতে খেতে মাথাওয়ালাদের কত আন্দাজ দিতে হবে কৃপাসিন্ধুবাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন,—'এই ধরুন, ওরা পাঁচজন—৫০০৲ টাকা দিলেই হয়ে যাবে। টাকাটা আমার হাতেই দেবেন, আমি ওদের ম্যানেজ করে নেবো। নাহলে আপনার কাছ থেকে ওরা আরও বেশী আশা করতে পারে, বুঝলেন না?'—এই সহজ সরল কথাটা খুব আন্তরিকভাবেই বুঝেছি তা মাথা নেড়ে জানালাম। এই বোঝবার বোঝা যে আমার মাথায় চেপেছে তাও মনে মনে বুঝলাম।

* * *

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। হিতৈষীরা ক্রমে পাওনাদার হয়ে আমার পেছনে লাইন দিয়ে ঘোরাঘুরি করতে সুরু করলো—ষ্টুডিওতে, বাড়ীতে—যখন যেখানে যাই। চতুর্দ্দিকে সবাই ছেঁকে ধরে—স্যার আমার একটু-স্যার আজ আপনার বাড়ী যাবো—,আমার স্যার খুব অল্প—। ষ্টুডিওতে 'স্যার', পথে ট্যাক্সিওয়ালাদের কাছে 'বাবুজী' আর বাড়ীতে 'মশাই' হয়ে আমি আমার অস্তিত্ব ভুলে গেলাম। একদিন কাগজপত্র নিয়ে বাড়ীতে রাত জেগে হিসেব-পত্র নিয়ে বসলাম:

ছবি তুলতে গিয়ে খরচা হয়েছে—৭৫,০০০৲ টাকা

বাজারে দেনা হয়েছে—২৯,০০০৲ টাকা

ভবানীপুরের বাড়ী বন্ধক দিয়ে

মনীষাকে ধার হিসাবে দেওয়া হয়েছে—৩০,০০০৲ টাকা। মোট ১,৩৪,০০০৲টাকা।

ফিল্ম এক্সপোজ করা হয়েছে—৫০০০ ফুট, আরও ২০,০০০ ফুট এক্সপোজ করতে হবে। আমার হিসেবের লেখাগুলো চোখের সামনে ঘোলাটে হয়ে এলো—মাথাটা যেন কেমন করতে লাগলো—ঘড়িতে তখন টং টং করে চারটে বাজলো।

বাড়ীর ভেতর মা, ভাই-বোন তখন ঘুমোচ্ছে। ওদের কথা মনে এসে মনটাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে হাল্কা করে দিল। এ বাড়ীটা ঠিকই আছে—এখানে ওদের থাকবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। মনের ভেতর এই বিরাট সান্ত্বনা নিয়ে ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।—সেই থেকে এই তীর্থক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে দিন কেটে যাচ্ছে।

একদিন কাগজ-পত্র নিয়ে বাড়ীতে রাত জেগে হিসেবপত্র নিয়ে বসলাম

মীরাবাঈ

মন্মথ রায়

চরিত্র

পুরুষ

মুকুলজী	...	মেবারের মহারাণা
কুম্ভ	...	ঐ পুত্র, যুবরাজ
খড়্গসিংহ	...	ঐ সেনাপতি
বুধাদিত্য	...	ঐ মন্ত্রী
শঙ্করদেব	...	ঐ কুল-পুরোহিত
বীরভদ্র	...	ঐ সেনানী
জনার্দ্দন	...	ঐ
কৌশিক	...	রাজবংশের পুরাতন ভৃত্য
রতনসিংহ	...	মেরতা গ্রামের ভূস্বামী
দুদাজী	...	ঐ পিতা
নটবর	...	ঐ প্রতিবেশী-পুত্র
পুরোহিত	...	গিরিধারিলালের পূজারী
চরণদাস	...	মেরতা গ্রামের অধিবাসী
শ্রীরূপ গোস্বামী	...	মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য
ভৈরব	...	দস্যু সর্দ্দার
চণ্ড ও প্রচণ্ড	...	ঐ অনুচরদ্বয়

(শিষ্যগণ, দস্যুগণ, বৈষ্ণবগণ, রক্ষিগণ, যাত্রিগণ, ভক্তগণ, ভৈরবের বালক পুত্র ইত্যাদি)

স্ত্রী

চণ্ডীবাঈ	...	মেবারের রাজমহিষী
মীরাবাঈ	...	রতনসিংহের কন্যা, পরে যুবরাজ কুম্ভের পত্নী
গঙ্গা ও যমুনা	...	ঐ সখীদ্বয়
ধূমাবতী	...	ভৈরবের পত্নী

(পার্ব্বত্য রমনীগণ, বৈষ্ণবীগণ, পুরনারীগণ, মহিলা ভক্তগণ ইত্যাদি)

★

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রাজপুতানার মধ্যে মেরতা রাজ্যের ভূস্বামী রতনসিংহের প্রাসাদসংলগ্ন নাট-মন্দির। মন্দিরে গিরিধারিলালের বিগ্রহ দেখা যাইতেছে। কাল—সন্ধ্যা।

[পরিজন সমক্ষে পুরোহিত আরতি করিতেছেন ও দেবদাসী আরতি-নৃত্য করিতেছে। রতনসিংহের বৃদ্ধ পিতা দুদাজী করজোড়ে তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছেন। আরতি ও নৃত্য শেষ হইল।]

দুদাজী। গিরিধারিলাল কী—

সকলে। জয়।

[তিনবার জয়ধ্বনির পর সকলে প্রণাম করিল। পুরোহিত চলিয়া যাইতেছিলেন,

এমন সময়ে বালিকা মীরা অন্য দুইটি সমবয়স্কা সহচরী গঙ্গা ও যমুনাসহ ছুটিয়া আসিয়া পুরোহিতের হাত ধরিল।]

মীরা। না ঠাকুর, তা হবে না। রোজ রোজ তুমি দাদুর ঠাকুরের পুজো করে চলে যাও। আজ আমার ঠাকুরের পুজো না করলে তোমায় ছাড়ছি না।

দুদাজী। ওরে পাগলী, ছাড়্ ছাড়্। ওঁকে ছেড়ে দে। তোর ঠাকুর তুই নিজে পুজো কর্। পরে খেলে তোর পেট ভরে? তোর এতো বুদ্ধি—এই সোজা কথাটা তুই বুঝছিস্ না মীরা?

[পুরোহিত মুক্তি পাইয়া চলিয়া গেলেন।]

মীরা। (করতালি দিয়া) ঠিক বলেছে—দাদু ঠিক বলেছে। আয় ভাই গঙ্গা, আয় যমুনা—আমাদের গিরিধারিলাল—আমরা পুজো করবো।

[মন্দির-অলিন্দে একটি ছোট বেদীর ওপর মীরার খেলার ঠাকুর গিরিধারিলাল। মীরা সেই দিকে ছুটিয়া গেল। মন্দিরের পশ্চাদ্দেশে পথে একটি শোভাযাত্রার বাদ্য শোনা গেল।]

মীরা। (সচকিতে) ও কিসের বাজনা দাদু?

দুদাজী। ও-পাড়ার সদাশিব বিয়ে করে বৌ নিয়ে ঠাকুর প্রণাম করতে আসছে।

মীরা। বর-কনে! চল্ ভাই দেখে আসি।

[মীরা সখিগণসহ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।]

দুদাজী। ওরে পাগলী, যাস্‌নে—যাস্‌নে—ওরা এখানেই আসছে।......কার কথা, কে শোনে!

[নবদম্পতি দুই একজন অভিভাবকসহ মন্দির-প্রাঙ্গণে বিগ্রহ প্রণাম করিতে আসিল, তাহাদের পিছনে পিছনে আসিল মীরা ও তাহার সখীদ্বয়। সদাশিবের বৃদ্ধ পিতা চরণদাস দুদাজীর নিকট বর-বধূ লইয়া গেল।]

চরণ। এই যে বুড়ো কর্তা, সদাশিব বৌ নিয়ে এলো—আশীর্বাদ করুন। (দম্পতির প্রতি) এঁকে প্রণাম কর।

দুদাজী। (বাধা দিয়া) আহা-হা, আগে গিরিধারিলালকে প্রণাম করে এসো।

[বর-বধূ বিগ্রহ প্রণাম করিতে মন্দিরের দিকে গেল। মীরা ছুটিয়া তাহার গিরিধারিলালের নিকট গেল। বিগ্রহ প্রণামান্তে বর-বধূ নামিয়া আসিতেছে। মীরা ছুটিয়া তাহাদের নিকট গেল।]

মীরা। আমার গিরিধারিলালকে প্রণাম করলে না?

[ঐখান হইতেই বর-বধূ হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। সকলে হাসিল। বর-বধূ আসিয়া দুদাজীকে প্রণাম করিল। মীরা দাদুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বর-বধূকে পরম বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।]

দুদাজী। (বধূর চিবুক ধরিয়া মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) বাঃ, চমৎকার! বর যেমন আমার সদাশিব, বৌটিও হয়েছে সাক্ষাৎ পার্ব্বতী। গিরিধারিলাল তোমাদের কল্যাণ করুন! আনন্দ্ রহো—আনন্দ্ রহো!

চরণ। বুড়ো কর্তা, আপনি তো আশীর্ব্বাদ করলেন। কিন্তু রাজামশাই—?

দুদাজী। রতনসিংহ? প্রাসাদেই আছে—যাও।

[বর-বধূ চলিয়া গেলে মীরা দুদাজীকে ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—]

মীরা। দাদু, আমার বিয়ে—আমার বর?

দুদাজী। আরে, তোর বর তো অনেকদিন আগেই তোকে দিয়েছি। (উঠিয়া মীরার গিরিধারিলালকে লইয়া তাহার হাতে দিয়া) এই নে—ধর। স্বয়ং গিরিধারিলাল তোর বর। এর চেয়ে ভাল বর ত্রিভুবনে মিলবে না।

মীরা। (আনন্দে লাফাইয়া) আমার বর—গিরিধারিলাল

আমার বর। বাজা—বাজা—তোরা বাজা—

হুদাজী। (হাসিয়া) ওরে বাজারে বাজা—বিয়ের বাজনা বাজা। আজকে মীরার বিয়ে—গিরিধারিলালের সজে আমার মীরার বিয়ে।

[বাদ্য সুরু হইল। সকলে আনন্দ-উজ্জ্বল নৃত্যে যোগ দিল। ক্রমে মঞ্চের আলোক স্তিমিত হইয়া গেল।]

পট পরিবর্ত্তন

[পুনরায় মঞ্চ যখন ধীরে ধীরে আলোকিত হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল, দেবদাসী আরতি-নৃত্যের শেষের ভঙ্গীমায় প্রণতা। পুরোহিত পূর্ব্ববৎ মন্দিরের গর্ভগৃহ হইতে বাহিরে আসিতেছেন, এমন সময়ে মীরা ও তাহার দুই সখী গঙ্গা ও যমুনা প্রবেশ করিল।]

[হুদাজী ও পুরোহিতের রূপসজ্জার পরিবর্ত্তন। ১০ বৎসর গত হইয়াছে।]

পুরোহিত। (নামিতে নামিতে হাসিয়া) আজকাল আর মীরা-মা তার গিরিধারিলালের পুজোর জন্যে আমায় ডাকে না।

হুদাজী (হাসিয়া) সে ছিল অষ্টমী মীরা, এখন সে অষ্টাদশী। ভুলো না ঠাকুর, দশটা বছর পেরিয়ে গেছে।

মীরা। কিন্তু দাদুর কথা আজও আমার মনে আছে—"পরে খেলে নিজের পেট ভরে ?" তাই, আমার ঠাকুরের পুজো আমিই করি।

[পুরোহিত হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।]

হুদাজী। কিন্তু ভাই, আজ সে পুজোর বিলম্ব কেন ?

মীরা। আজ যে গিরিধারিলালকে সাজাবো নীলপদ্ম দিয়ে। নীলপদ্ম যে এখনো আসে নি দাদু।

যমুনা। সখীর যেমন কথা। অজানা, অচেনা বিদেশী লোক—একদিন শ্বেতপদ্ম দিয়ে গেছে বলেই কী আর আশা কর যে, সে আজও আসবে নীলপদ্ম নিয়ে ?

মীরা। সে যে বলে গেছে ভাই যমুনা, আজ সে আসবে নীলপদ্ম নিয়ে। তুমিও তো শুনেছো গঙ্গা।

গঙ্গা। তা' শুনেছি বটে। কিন্তু লোকটা তো বিদেশী—কোন পরিচয়ও দিল না।

হুদাজী। এ—সেই লোকটা তো ? যে কাল শ্বেতপদ্ম এনেছিল ? পরিচয় আবার দেবে কি ? মীরার ভজন শুনে মুখে আর কথাটি নেই। দেখলাম দু'চোখ জলে ভেসে গেছে। তবে বলবো দিদি, যখন কেঁদেছে—তখন মজেছে। হ্যাঁ, সে আসছে—ওই নীলপদ্ম নিয়েই আসছে।

[উত্তেজিতভাবে রতনসিংহের প্রবেশ।]

রতন। পিতাজী ! এ-তো বড় বিপদ হলো। গিরিধারিলালের সামনে মীরার আরতি দেখতে, ভজন শুনতে আজকাল এতো লোক এসে জড়ো হয় যে, বসবার জায়গা হয় না। রোজই এর জন্যে গোলমাল হয়—ভজন-পূজনে ব্যাঘাত হয়।

হুদাজী। তা' হয় বৈকি। যেন একটা হাট বসে যায়।

মীরা। (রতনসিংহকে) হ্যাঁ পিতাজী। আমার গিরিধারিলালও বলেন,—"ওরা আমাকে দেখতে আসে না মীরা, ওরা দেখতে আসে তোমাকে।"

হুদাজী। (হাসিতে হাসিতে) হুঁ, আমি জানি—আমি বুঝি।

রতন। আমি তাই আজ সদর-দেউড়ীতে আদেশ দিয়েছি, বাইরের কাউকেও আসতে দেবে না মীরার আরতির সময়।

মীরা। পিতাজী ! শুধু একজনকে আসতে দিও—যার হাতে দেখবে নীলপদ্ম রয়েছে।

রতন। সে আবার কে ?

মীরা। কে—তা' জানি না। মনে হয় কোনো বিদেশী ভক্ত। কাল এনেছিল শ্বেতপদ্ম। বলে গেছে, আজ আনবে নীলপদ্ম। নীলপদ্ম দিয়ে সাজালে গিরিধারিলালের কী শোভা হয় দেখো !

রতন। বেশ, তাকে আসতে দিচ্ছি। আর কাউকে নয়।

[রতনসিংহের প্রস্থান।]

সুদাজী। কিন্তু আমি বুঝছি না, নীলপদ্ম এ মুলুকে পাবে কোথায়? নীলপদ্ম তো আছে শিবপাহাড়ের ওধারে—সেই দুর্গাহ্রদে। খুব কম করে হলেও সে দুদিনের পথ। অবিরাম ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে আর এলে—তবে যদি সে আজ আসে। আর যদি আসে, সে তাহলে বুঝবো—হ্যাঁ সে বীর বটে—মহাবীর।

[নাগরিকের ছদ্মবেশে চিতোরের যুবরাজ কুম্ভের প্রবেশ। হস্তে তাহার একরাশি নীলপদ্ম।]

মীরা। এই যে এসেছো! তোমারই পথ চেয়ে ছিলাম আমরা।

(ফুলগুলি একরকম কাড়িয়া লইয়া) বাঃ! কী সুন্দর নীলপদ্ম!

[ফুলগুলি লইয়া মীরা ছুটিয়া তাহার গিরিধারিলালের বিগ্রহের নিকট গেল।]

মীরা। গিরিধারি! ছাখো—ছাখো—কী সুন্দর ফুল এনেছে ওই লোকটি! কী সুন্দর সাজ হবে তোমার আজ!

[নীলপদ্মগুলি দিয়া মীরা বিগ্রহটি সাজাইতে লাগিল।]

সুদাজী। সাজানো-গোজানোটা একটু চটপট্ সেড়ে নাও মীরাদিদি। আরতির সময় বয়ে যায়।

[গঙ্গা ও যমুনা আরতির উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিল।]

গঙ্গা। কিন্তু আর কাউকে দেখছি না যে! নটবর, তুমি তো বাজাও ঘণ্টা। কাঁসর বাজাবে কে?

সুদাজী। দেউড়ীতে গোলমাল বেধেছে। সব ছুটেছে সেইখানে। যতো সব! (কুম্ভের প্রতি) ওহে ছোকরা, এদিকে এসো তো! কাঁসর বাজাতে পারবে?

কুম্ভ। হ্যাঁ পারবো।

সুদাজী। দুর্গাহ্রদ থেকে নীলপদ্ম এনেছো তো?

কুম্ভ। হ্যাঁ কর্তা।

সুদাজী। সাবাস্! তুমি পারবে—নাও বাজাও।

[মীরা নৃত্য-ভঙ্গীতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভজন গাহিতে সুরু করিল। গঙ্গা ও যমুনা ধূপ ও প্রদীপযোগে আরতি করিতে লাগিল। নটবর ঘণ্টা ও কুম্ভ কাঁসর বাজাইতে লাগিল।]

[মীরার সঙ্গীত শেষ হইলে চিতোরের রাণার সৈন্যাধ্যক্ষ খড়গসিংহের সহিত রতনসিংহের প্রবেশ।]

রতন। (খড়গসিংহকে) ওই আমার কন্যা মীরা। কিন্তু কোথায় আপনাদের যুবরাজ?

খড়গ। তিনি আছেন—এই রাজপ্রাসাদেই আছেন।

রতন। যুবরাজ কুম্ভ এলেন আমার গৃহে—আর আমি তা' জানলাম না!

খড়গ। যুবরাজের বেশে তিনি আসেননি। তিনি এসেছেন ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে—আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে। আপনি তাঁকে ভিক্ষা দেবেন বলুন। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, কোথায় সেই ভিক্ষুক।

রতন। মেবারের যুবরাজ—রাজস্থানের মধ্যমণি—আমাদের প্রভু—তাঁকে আমাদের অদেয় কী থাকতে পারে? বলুন সেনাপতি খড়গসিংহ, কোথায় তিনি? কী তিনি চান?

খড়গ। (হঠাৎ কুম্ভকে সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিয়া) যুবরাজ, বলুন আপনি কী চান?

[সকলে সবিস্ময়ে কুম্ভের দিকে চাহিল। কুম্ভ রতনসিংহের নিকট আগাইয়া আসিল।]

কুম্ভ। রাজা রতনসিংহ! মৃগয়ায় বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিলাম আপনাদের এই অঞ্চলে। এসে আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে শুনেছি আপনার কন্যা মীরাবাঈয়ের অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা

আর তার অপূর্ব্ব নৃত্যগীতের খ্যাতি। সত্যতা পরীক্ষার জন্য আমি ছদ্মবেশে আসাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছিলাম। জনতার মধ্যে আত্মগোপন করে আমি কালও এসেছিলাম—আজও এসেছি। দেখলাম, তার খ্যাতি এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়। বলতে আমার কুণ্ঠা নেই,—আমি মুগ্ধ···আমি অভিভূত! রাজা আমি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী।

রতন। পিতাজী! (সোল্লাসে দুদাজীর দিকে চাহিলেন)

দুদাজী। মেবারের মহিমময় রাজবংশের বধূ হবে মীরা—এ-তো আমাদের মহা সৌভাগ্য রতনসিংহ।

রতন। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। (কুম্ভের প্রতি) আপনার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করে আমরা ধন্য হবো যুবরাজ। শুধু দুঃখ এই, আজ মীরার গর্ভধারিণী বেঁচে নেই। আমাদের এ সৌভাগ্য সে দেখলো না।

খড়গ। কিন্তু যুবরাজের ইচ্ছা, তিনি শুভকার্য্য সমাধা করেই রাজধানীতে সস্ত্রীক প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

রতন। তাই হবে—তাই হবে, সেনাপতি খড়গসিংহ। আমিও বিলম্ব করতে চাইনা। এমন সুযোগ জীবনে দ্বিতীয়বার আসে না। (বলিতে বলিতে মীরার কাছে গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কুম্ভের হস্তে সমর্পণ করিয়া) আমি আজ ধন্য—আমার বংশ ধন্য! জয় গিরিধারিলাল!

দুদাজী। জয় গিরিধারিলাল! জয় গিরিধারিলাল! ওরে নটবর, ডাক্—ডাক্—সবাইকে ডাক্। বাজা—বাজা—বিয়ের বাজনা বাজা। আজকে মীরার বিয়ে—আমার মীরার বিয়ে!

[নটবর সবেগে বাহির হইয়া গেল। গঙ্গা ও যমুনা ছুটিয়া গিয়া শঙ্খধ্বনি করিল। দূরে সানাই বাজিয়া উঠিল।]

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[চিতোর রাজপ্রাসাদ। কালিকাদেবীর মন্দিরের সম্মুখভাগ। অদূরে নহবৎখানায় নহবৎ বাজিতেছে। কাল—প্রাতঃকাল। একদিক হইতে কৌশিক ও অন্যদিক হইতে বীরভদ্রের প্রবেশ।]

বীরভদ্র। এই যে কৌশিকদা! ওদিকে তো বর-কনে এসে পড়লো—বাজনা শুনে এলাম। এদিকে এখানে তো কোনো আয়োজন-উদ্‌যোগ দেখছিনা। (পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে) ভূরিভোজের ব্যবস্থাটা ভাল করে করেছো তো?

কৌশিক। আরে, রাখো তোমার ভূরিভোজ! তোমার তো খালি ওই চিন্তা। এদিকে ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে—জানোনা তো। রাণীমা তো একেবারে উগ্রমূর্ত্তি—বৌকে এখন ঘরে ঢুকতে দেন কিনা দ্যাখো।

বীরভদ্র। বলো কী! সে কী কথা!

কৌশিক। তা রাণীমা কিছু মন্দ বলেননি। মেবারের যুবরাজ—চাট্টিখানি কথা! বলা নেই, কওয়া নেই,—সে কিনা বৌ নিয়ে এল এক ভূঁইয়ার ঘর থেকে!

বীরভদ্র। (হতাশভাবে) তাহ'লে খাওয়া-দাওয়া! হবে না কৌশিকদা?

কৌশিক। আরে, রাখো বীরভদ্র তোমার খাওয়া-দাওয়া! কে যে তোমায় সেনানী করেছিল, বুঝিনা বাবা। রাতদিন খালি খাই-খাই-খাই।

বীরভদ্র। দ্যাখো দিকিনি, খামোকা রাগ করছো। আরে বাবা, এই দুনিয়াটাই তো পেটকে ওয়াস্তে। এই যে মহারাণা—তিনি যে রাজত্ব করছেন—সেও পেটকে ওয়াস্তে। আর এই যে তুমি—রাজভাণ্ডারের এতোকালের ভাঁড়ারী—সেও তো ঐ পেটকে ওয়াস্তে। এই যে আমরা সেনানী—প্রাণ তুচ্ছ ক'রে যুদ্ধ করি—সেও ওই পেটকে ওয়াস্তে!

[জনার্দ্দনের প্রবেশ]

জনার্দ্দন। কী-কী? যুদ্ধ আবার কোথায় বাধলো বীরভদ্র? এদিকে যে বর-কনে এসে পড়েছে। এইতো দেখে এলাম। উঃ—যা ভীড়!

কৌশিক। দেখে এলে—দেখে এলে জনার্দন? বৌ কেমন দেখলে?

জনার্দন। হাতী দেখলাম, মাহুত দেখলাম। কিন্তু বৌ দেখতে পেলাম না। গোটা রাজধানীর লোক ভেঙে পড়েছে।

কৌশিক। কে যে তোমাদের সেনানী করেছে—বুঝি না। দেখতে গেলে বৌ,—দেখে এলে হাতী।

জনার্দন। আরে, ঐ হাতী যে দেখেছি সেই ঢের। যাও না একবার। যা ভীড়—আমি তো তবু হাতী আর মাহুত দেখেছি। তোমায় শুধু শুঁড় দেখেই ফিরতে হবে।

কৌশিক। আমাকে ঠেকায় কে? আমি যাচ্ছি রাণীমার হুকুমে—বর-কনেকে এই কালিকা-মন্দিরে আনতে। কুম্ভ নিয়ম-কানুন জানেনা তো।

[কৌশিকের প্রস্থান]

বীরভদ্র। ব্যাপারটা কিছু বুঝছি না। এদিকে বলে গেল, ভুঁইয়ার ঘরের মেয়ে আনছে বলে রাণীমা রেগে কাঁই—ভোজ-টোজের আশা বিশেষ নেই। আবার বললে রাণীমা বর-কনে এখানে আনতে বলেছেন। তা' কনেকে এখানে আনা মানেই ঘরে নেওয়া। তাহলে চিন্তা নেই। (ভোজনের ইঙ্গিত করিল)

[নেপথ্যে শোভাযাত্রার বাদ্য শোনা গেল। পুরনারীগণ মাঙ্গলিক গীতকণ্ঠে এইখানে আসিতেছেন বোঝা গেল।]

জনার্দন। ওহে চিন্তা নেই! এবার সরে পড়ি চল। পুরনারীরা এসে পড়েছেন।

বীরভদ্র। এসে পড়েছেন! তা'হলে যেটুকু চিন্তা ছিল, তাও আর নেই। চল—চল—

[উভয়ের প্রস্থান। বিপরীত দিক দিয়া কুম্ভের ভগ্নী চম্পা ও অন্যান্য পুরনারীগণ শঙ্খ, বরণডালা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া কুম্ভকে ও তাহার নবপরিণীতা পত্নী মীরাকে বরণ করিবার উদ্দেশ্যে গীতকণ্ঠে সমবেত হইল।]

রম্ভা। (গীতান্তে চম্পাকে) দাদা তো বিয়ে করে আনছেন ঘুঁটে-কুড়ুনী মেয়ে। (চম্পার চিবুক ধরিয়া) এই মুক্তাহারটি কোন্ বানরের গলায় ঝুলবে—তাই ভাবছি।

চম্পা। দেখিস্ ভাই, আমার বর দেখে তোরা যেন বর-বর করে কোনো বর্ব্বরের গলায় মালা দিয়ে ফেলিস্‌নে।

[সকলে হাসিয়া উঠিল। কুম্ভের জননী রাজমহিষী চণ্ডীবাঈ ও তাঁহার সহিত রাজ-কুল-পুরোহিত রক্তপট্টাম্বর পরিহিত শঙ্করদেব আসিলেন। বিপরীত দিক দিয়া কৌশিক আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।]

কৌশিক। দেখে এলাম—দেখে এলাম রাণীমা, তোমাদের সবার আগে আমি নতুন বোয়ের মুখ দেখে এলাম। বৌকে নিয়ে কুম্ভ একই হাতীতে বসেছিল। হাতী থেকে এই নামলো। হ্যাঁ, বৌ বটে! মুখ তো নয়, একেবারে একটি পদ্মফুল।

চণ্ডী। তা' তুমি চলে এলে কেন কৌশিক? কুম্ভ নিয়ম-টিয়ম কিছু জানে না। নতুন বৌকে নিয়ে আগেই রাজপ্রাসাদে না তুলে কুলদেবতার আশীর্ব্বাদ নিতে প্রথমে আসবে এই কালিকা-মন্দিরে। তুমি ওদের সঙ্গে করে নিয়ে আসবে, তাই তোমাকে পাঠালাম। তা' তুমি একা চলে এলে?

কৌশিক। সব বলে এসেছি। এখানেই আসছে। এলো বলে। আমি ছুটে এলাম বলতে, ছোট ঘরে বিয়ে করেছে বলে বৌ কিছু খাটো হয়নি। হ্যাঁ রাণীমা, দেখবে এখন—পদ্মফুল—গোবরে পদ্মফুল!

চম্পা। থামো কৌশিকদা। তুমি তো যা' ভাখো, সবই পদ্মফুল।

কৌশিক। তা' দেখি বটে। কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। নতুন বৌ এখানে এসে দাঁড়াক, দেখবে—তোমরা সব মিইয়ে যাবে।

[নবপরিণীতা মীরাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ। পুরনারীগণের উলু ও শঙ্খধ্বনি।]

চণ্ডী। কুম্ভ, বৌমাকে নিয়ে মন্দিরে গিয়ে প্রথমে প্রণাম কর কুলদেবতা মহাদেবী কালিকাকে। কুল-পুরোহিত শঙ্করদেবের অনুগমন কর।

শঙ্কর। (বরবধুর দিকে একটু অগ্রসর হইয়া) কিন্তু নব-বধূর হাতে দেখছি কোনো এক বিগ্রহ।

মীরা। আমার ইষ্টদেবতা—গিরিধারিলাল রণছোড়জী।

শঙ্কর। তোমার ইষ্টদেবতা গিরিধারিলাল রণছোড়জী!

কুম্ভ। হ্যাঁ, ওরা বৈষ্ণব।

শঙ্কর। কিন্তু তোমরা শাক্ত। তা' বেশ, তুমি মা তোমার গিরিধারিলালকে এখানে আর কারো হাতে দিয়ে মা কালিকাকে প্রণাম করবে এসো।

মীরা। আমার ইষ্টদেবতা—আর কারো হাতে আমি দিতে পারবো না, দেব।

শঙ্কর। মহারাণী! (অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মহারাণীর দিকে তাকাইলেন)

চণ্ডী। (মীরাকে) শোনো মা। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে নারীর শুধু গোত্রান্তরই হয় না, ধর্ম্মান্তরও হয়। স্বামীর ধর্ম্মই স্ত্রীর ধর্ম্ম।

মীরা। কিন্তু গিরিধারিলাল জগৎস্বামী—আমার স্বামীরও স্বামী।

শঙ্কর। মহারাণী!

চণ্ডী। কুম্ভ!

কুম্ভ। মীরা!

মীরা। আমার গিরিধারিলাল বলেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

শঙ্কর। কিন্তু গিরিধারিলালের বিগ্রহ বুকে নিয়ে মা কালিকার আশীর্ব্বাদ চাওয়ার কোন অর্থ হয় না···তা হবে না।

কুম্ভ। মীরা! (সানুনয়ে মীরার দিকে তাকাইলেন)

মীরা। আমি তাহলে এখানে অপেক্ষা করি। তুমি মন্দিরে প্রণাম করে এসো।

চণ্ডী। কিন্তু তুমি যদি আমাদের কুলদেবতা মা কালিকাকে প্রণাম না কর, তোমাকে তো আমরা বধু-বরণ করে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে পারবো না।

চম্পা। (মীরার কাছে গিয়া) ছিঃ ভাবী! মার আদেশ অমান্য করো না। উনি শুধু তোমার শ্বশ্রমাতা নন, দেশের মহারাণীও উনি।

মীরা। কিন্তু—

চণ্ডী। কুম্ভ! তুমি ওকে বৈষ্ণব-অতিথিশালা গোকুলে রেখে অবিলম্বে মহারাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এস।

কুম্ভ। (ব্যাকুলভাবে) মা!

চণ্ডী। না, এছাড়া আর কোনও পথ নেই কুম্ভ। মেবারের সুপ্রাচীন শিশোদীয় বংশের কুলপ্রথা ভাঙ্বার অধিকার কারো নেই—তোমারও নয়, আমারও নয়।

[চণ্ডীবাঈ চলিয়া গেলেন। পুরোহিত ও চম্পা তাঁহার অনুগমন করিল। পুরনারী-গণও ইতঃস্তত করিয়া অবশেষে মহারাণীরই অনুসরণ করিল।]

কুম্ভ। এ কী হলো মীরা! রাজ-অন্তঃপুরে তোমার প্রবেশের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল!

মীরা। ভালোই হলো। যেখানে আমার গিরিধারিলালের আবাহন নেই, অভ্যর্থনা নেই,—সে নরকে আমি যেতে চাইনা—চাই না স্বামী। বৈষ্ণবের অতিথিশালা—সে-ই আমার বৈকুণ্ঠ। আমায় নিয়ে চল—নিয়ে চল প্রভু।

কুম্ভ! কিন্তু মীরা, তোমার এই পুতুল তোমার স্বামীর চেয়েও বড়ো?

মীরা। পুতুল! পুতুল তুমি কাকে বলছো স্বামী! আট বছর বয়স থেকে একে নিয়ে আমি ঘর করছি! তোমাকে আজ মাত্র দু'দিন পেয়েছি—এরই মধ্যে কী মায়া—কতো আপনার মনে হচ্ছে

তোমাকে। আর—এ আমার কতো কালের সাথী—কতো কাল—কতো কাল। একে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারি না—পারবো না।

[মীরা বিগ্রহটি নিজবক্ষে চাপিয়া ধরিল।]

প্রথম অঙ্ক
তৃতীয় দৃশ্য

[মেবারের রাণা মুকুলজীর উপবেশন-কক্ষ। কাল—প্রাতঃকাল।]

[রাণা মুকুলজী আলবোলাযোগে ধূমপান করিতেছেন। মন্ত্রী বুধাদিত্য তাঁহার সহিত আলোচনায় রত।]

মুকুলজী। বুঝলেন মন্ত্রীবর, ব্যাটা গাধা জীবনে মানুষের মতো যদি একটা কাজ করে থাকে তবে সে এই।

বুধাদিত্য। কার কথা বলছেন মহারাণা?

মুকুলজী। কার কথা আর বলবো! তোমাদের যুবরাজ—কুম্ভ। মেয়েটা বোধহয় ডানাকাটা পরী—বাবাজীবন দেখেছেন আর মাথা ঘুরে গেছে। তাই একেবারে বিয়ে করে আমাদের খবর দিয়েছেন।

বুধাদিত্য। কিন্তু তাই বলে আমাদের অধীন ক্ষুদ্র এক সামন্ত ঘরের মেয়েকে একদিন মেবারের মহারাণী বলে অভিবাদন করতে হ'বে—একথা ভাবতে আমাদের লজ্জা হচ্ছে মহারাণা।

মুকুলজী। না, না, না, ও কথা বলোনা বুধাদিত্য—ওকথা বলোনা। ও কী একটা কথা হলো! শাস্ত্রেই বলেছে—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।" আমি এসব ভাবছিনে—ভাবছিনে। আমি ভাবছি, মেবারের যুবরাজ—কতো বড় একটা ব্যাপার—তার কিনা বিয়ে হয়ে গেল হুট্ করে—কেউ জানতেই পারলো না। দশজনকে নিয়ে একটা মনের মতো উৎসব-করবার সুযোগ পেলুম না।

বুধাদিত্য। সে উৎসব এখনও হ'তে পারে মহারাণা। সামনের আহেরিয়া উৎসব—এই বিবাহ-উৎসব দিয়েই সুরু হ'তে পারে।

মুকুলজী। বেশ, বেশ, তাই হবে—তাই হবে। কিন্তু ভাবছি, যাদের নিয়ে এই উৎসব, তাদেরই তো দেখতে পাচ্ছি না। কালিকা-মন্দির থেকে প্রাসাদে আসতে ওদের এতো বিলম্ব হচ্ছে কেন?

বুধাদিত্য। এই যে মহারাণী—

[চম্পা ও কয়েকজন পুরনারীসহ চণ্ডীবাঈয়ের প্রবেশ।]

মুকুলজী। আরে এতো ঘরের লোক। কিন্তু তারা কোথায়? বধূমাতা কই?

চণ্ডী। কে বধূমাতা? কাকে বধূমাতা তুমি বল মহারাণা?

মুকুলজী। কেন? কুম্ভের স্ত্রী—রতনসিংহের কন্যা মীরাবাঈ?

চণ্ডী। কুম্ভের স্ত্রীরূপে তাকে আমরা স্বীকার করতে—গ্রহণ করতে পারিনা—পারিনা মহারাণা।

মুকুলজী। কিন্তু কেন? বলি—কেন? তোমাদের আর কতবার বলবো,—"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।"

চণ্ডী। আপত্তি সেখানে নয় মহারাণা। বৈষ্ণবের ঘর থেকে এসেছে বলে এ কন্যা শাক্তাচার গ্রহণে অসম্মত। ইষ্টদেবতা এর কৃষ্ণ বলে রাণাবংশের কুলদেবতা কালিকা-প্রণাম সে করেনি।

চম্পা। মহারাণীর অনুনয় ব্যর্থ হয়েছে,—তাঁর আদেশও তুচ্ছ করেছে পিতাজী।

মুকুলজী। কী আশ্চর্য্য!

বুধাদিত্য। আমি বলি,—কী স্পর্দ্ধা!

মুকুলজী। তা' না হয় হলো। কিন্তু হতভাগারা গেল কোথায়?

চণ্ডী। আমি সে মেয়েকে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দিইনি। কুম্ভকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি বৈষ্ণব-অতিথিশালা—গোকুলে।

মুকুলজী। গোকুলে! তা' কুম্ভ কী বলে?

চণ্ডী। ওই সে এসেছে।

[কুম্ভের প্রবেশ।]

চণ্ডী। তোমার স্ত্রীর আচরণ তুমি দেখেছো কুম্ভ। তোমার কী বলবার আছে মহারাণাকে বল।

কুম্ভ। সে গুরুতর অন্যায় করেছে পিতা। কিন্তু অবোধ বালিকা—

মুকুলজী। তা তো বটেই! তা তো বটেই!

কুম্ভ। তার হয়ে আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অপরাধের গুরুত্ব তাকে বুঝিয়ে দিলে সে অনুতপ্ত হবে—ক্ষমা চাইবে।

মুকুলজী। তা' নয় তো কী! ঐটুকু তো মেয়ে—সে বুঝবে, যে কৃষ্ণ, সেই কালী—যে কালী, সেই কৃষ্ণ! সব দ্বৈত-অদ্বৈতের ঝগড়া! (মহারাণীকে) তুমি বোঝো? (অন্য সকলকে) তোমরা বোঝো? ঠিক হবে—ক্ষমা চাইবে। কি বল মহারাণী?

চণ্ডী। ক্ষমা চাইবে—ওই মেয়ে? কখনো না। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। কুলবধুর এই অমর্য্যাদায় আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। পুত্রবধু—তাকে নিয়ে কতো আনন্দ করবো—কতো উৎসব হবে—কতো স্বপ্নই না আমার ছিল! সব চুরমার হয়ে গেল। তার মুখখানি যখন প্রথম দেখলাম, মনে হলো স্বয়ং লক্ষ্মী এসেছেন ঘরে। কিন্তু সে যে এত বড় অলক্ষ্মী—তা' কে জানতো! যতদিন সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করছে, ততদিন তাকে আমি স্বীকার করতে—গ্রহণ করতে পারবো না—তুমি জেনে রেখো কুম্ভ।

[মুকুলজী বুঝিলেন, ব্যাপার গুরুতর। আশু মীমাংসার জন্য তিনি ক্রোধের ভাণ করিয়া কুম্ভকে গিয়া ধরিলেন।]

মুকুলজী। কুম্ভ, বুঝছো—ব্যাপারটা কত বড় গুরুতর, তুমি বুঝছো? (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) যাও—এখনি যাও। সে একটা বাচ্চা মেয়ে—বোঝে না। আর তুমি? বিরাট গাধা--তাকে যেমন করে হোক্ বুঝিয়ে-শুনিয়ে কালিকা-প্রণাম করানো চাই। শুধু কালিকা-প্রণাম নয়, তোমার মাকেও—একবার নয়, বারবার। হত-ভাগা—গাধা—

[কুম্ভ চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বাধা পাইলেন। শঙ্করদেব রুদ্র মূর্তিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার সঙ্গে আসিল কয়েকজন রাজপুরুষ।]

শঙ্কর। মহারাণা, আমায় বিদায় দিন।

মুকুলজী। কেন—কেন ঠাকুর? কী হলো? কুম্ভের স্ত্রী আমাদের কুলদেবতাকে প্রণাম করেনি—এই তো? সে তো এখনি করবে। এতে চলে যাওয়ার কী কথা হলো?

শঙ্কর। শুধু প্রণামেই অপরাধ স্খালন হবে না মহারাণা।

১ম রাজপুরুষ। অপরাধের গুরুত্ব আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন না মহারাণা।

২য় রাজপুরুষ। দুর্বিনীতার ধৃষ্টতায় প্রজারা সব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

৩য় রাজপুরুষ। এই অলক্ষণে তারা রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা করছে।

শঙ্কর। মহারাণা কি ভুলে গেছেন, দুর্দান্ত মোগল বাদশাহ এই রাজ্যের স্বাধীনতা হরণের জন্য শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। রক্ষাকর্ত্রী একমাত্র কালিকা।

চণ্ডী। তিনি রুষ্টা হলে—সর্ব্বনাশ! সেই সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছে ওই সর্ব্বনাশী।

[খড়গসিংহের প্রবেশ]

খড়গ। মহারাণা, গুরুতর দুঃসংবাদ। সেনা-নিবাসে কুলদেবীর এই অমর্য্যাদার কাহিনী এরই মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। মাতৃশক্তির অক্ষয় কবচে রক্ষিত তারা। মাতৃ-অবমাননায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তারা।

বুধাদিত্য। প্রজা-বিদ্রোহ ও সৈন্য-বিদ্রোহ—দুইয়েরই আভাস দেখা যাচ্ছে মহারাণা।

চণ্ডী। কুম্ভ—

কুম্ভ। (ভীষণ বিচলিত হইয়া) মা! মহারাণা! আমি

যাচ্ছি—এখনি যাচ্ছি। আমার স্থির বিশ্বাস, আমি বোঝালে সে বুঝবে—সে আসবে—সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। আর যদি তা' না করে—তার সঙ্গে আমিও নেবো দণ্ড—চলে যাবো দুজনে—চিরনির্ব্বাসনে।

[কুম্ভের প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক
চতুর্থ দৃশ্য

[চিতোরে অবস্থিত 'গোকুল' নামধেয় বৈষ্ণব-অতিথিশালা। সেইখানে গোবিন্দজীর মন্দিরে বিগ্রহের সম্মুখে কয়েকজন বৈষ্ণব আলাপ-আলোচনায় রত।]

১ম বৈষ্ণব। গোবিন্দের ইচ্ছায় ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়ালো যে রাজবধুমাতা এখন থেকে এই বৈষ্ণব-অতিথিশালাতেই থাকবেন। কিন্তু গোবিন্দের ইচ্ছায় এটা তো বুঝতে পারছিনা যে, যুবরাজ রাত্রি-বাসটা করবেন কোথায়? এখানে যুগলে, না রাজপ্রাসাদে একা?

২য় বৈষ্ণব। অর্ব্বাচীন! একাই যদি থাকবেন, তবে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন কেন?

৩য় বৈষ্ণব। ওহে দেখছো কি? রাজবধুর যখন বৈষ্ণব-অতিথিশালায় ঠাঁই হয়েছে, তখন যুবরাজও এখানে নিত্য অতিথি।

১ম বৈষ্ণব। আহা-হা! গোবিন্দ হে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্! নিত্য মহোৎসব—নিত্য মহোৎসব!

২য় বৈষ্ণব। ঐ তোমার মহোৎসবটি আসছেন।

১ম বৈষ্ণব। আহা-হা! ঈর্ষা কেন—ঈর্ষা কেন? গোবিন্দের ইচ্ছায় পরমাগতি একা আমারই ছিল এখানে। যুবরাজেরও পরমাগতি এলো। আহা-হা! গোবিন্দ হে তোমার কী করুণা! তোমাকেও হবে—আমাদেরও হবে। পথ তো খুলে গেল।

[গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবীর প্রবেশ। তিনি বিগ্রহের দিকে আসিয়া গাহিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা ভক্তি গদ্‌গদ্‌ভাবে করতালি দিয়া তাহাকে নৃত্যছন্দে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।]

[গীতের শেষাংশে মীরা গঙ্গা ও যমুনা সখীদ্বয়সহ মন্দির-অভিমুখে আসিতেছিলেন, ভক্ত বৈষ্ণবীর গীত শ্রবণে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত হইয়া উক্ত গানেরই শেষ চরণ মীরা গাহিয়া উঠিলেন। গীতান্তে বৈষ্ণবেরা মীরাকে দেখাইয়া পরস্পর ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া গেলেন। বৈষ্ণবীও চলিয়া গেলেন। কুম্ভ প্রবেশ করিলেন।]

কুম্ভ। মীরা!

[ভাবাবিষ্ট তন্ময় মীরার কর্ণে সে ডাক পৌঁছিল না। গঙ্গা ও যমুনা কুম্ভকে লক্ষ্য করিল। গঙ্গা মীরার মুখখানি কুম্ভের দিকে ফিরাইয়া কানে কানে কহিল।]

গঙ্গা। যুবরাজ!

[মীরা ধীরে ধীরে কুম্ভের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

মীরা। আমাকে তুমি ভুলে গিয়েছিলে?

কুম্ভ। ভুলে গিয়েছিলাম—কেন?

মীরা। সেই কখন চলে গিয়েছিলে—মনে থাকলে, ফিরে আসতে এতো দেরী করতে পারতে না তুমি। তোমার জন্যে আমি কতোক্ষণ বসে আছি। স্বামীর ঘরে আজ আমার প্রথম দিন। তোমাকে আমার সেবা করতে হবে—পূজো করতে হবে—জানো না বুঝি?

কুম্ভ। (সবিস্ময়ে) মীরা!

মীরা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি বোসো। (গঙ্গা যমুনাকে) এই তোরা আন্ পাদ্য, আন্ অর্ঘ্য, আন্ পুষ্প।

[গঙ্গা ও যমুনা এই সব সাজ-সরঞ্জাম তখনই লইয়া আসিল।]

কুম্ভ। (সবিস্ময়ে) এসব কী মীরা?

মীরা। (কুম্ভের হাত ধরিয়া একটি আসনে বসাইয়া)

হ্যাগো, এসব করতে হয়—দাদু আমায় শিখিয়ে দিয়েছেন যে ! গিরিধারিলালও বলেছেন।

[কুম্ভের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মীরা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।]

মীরা। (প্রণামান্তে) তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমার প্রভু —আমি তোমার দাসী।

কুম্ভ। মীরা !

মীরা। প্রভু !

কুম্ভ। তুমি আমার একটা কথা রাখবে মীরা ?

মীরা। কী কথা ?

[গঙ্গা ও যমুনা পূজার উপকরণ লইয়া চলিয়া গেল।]

কুম্ভ। চল আমরা দুজনে চলে যাই দূরে—বহুদূরে—রাজ্যের বাইরে—লোকালয়ের বাইরে—কোন পাহাড়ে—কোন বনে।

মীরা। কেন—কেন প্রভু ?

কুম্ভ। তুমি জানো না মীরা, এ সংসারে কতো অশান্তি—কতো আবিলতা—কতো বিষ ! তুমি তা সইতে পারবে না (মীরার চিবুকটি ধরিয়া) আমার এই অম্লান কুসুমটি দুদিনেই যাবে শুকিয়ে। আমি তা সইতে পারবো না মীরা—আমি তা' সইতে পারবো না।

মীরা। না গো না, তা কেন ? আমার দাদু যে আমাকে সংসার করতে বলেছেন। বলেছেন —পরমপতির দিকে মন রেখে পতিসেবা করবি, সংসারধর্ম্ম করবি। হ্যাগো, বলেছেন—তাতেই সুখ—তাতেই আনন্দ !

কুম্ভ। না মীরা, তা' হয় না। আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে সংসারের বাইরে নিয়ে গেলেই রক্ষা। চল মীরা, আমরা চলে যাই।

মীরা। তুমি আমার জন্যে সংসার ত্যাগ করবে ? ত্যাগ করবে এই রাজ্য—এই ঐশ্বর্য্য ? তুমি বীর—মহারাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি—মেবারের সিংহাসন তোমার মুখ চেয়ে রয়েছে। প্রজাদের আশা তুমি—ভরসা তুমি ! কতো কাজ রয়েছে তোমার ! সেসব ছেড়ে তুমি আমাকে নিয়ে মেবার ছেড়ে চলে গেলে কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না। না, না, তা' হবে না সে আমি পারবো না প্রভু।

কুম্ভ। তবে শোনো মীরা। যে রাজসংসারের জন্যে তোমার আজ এতো দরদ, সেই রাজসংসারেরই আজ দাবী—তোমার ঐ গিরিধারিলালকে ত্যাগ ক'রে তোমায় আরাধনা করতে হবে কুলদেবতা কালিকা দেবীর।

মীরা। গিরিধারিলালকে ত্যাগ ক'রে !

কুম্ভ। হ্যাঁ মীরা, ত্যাগ করে। আর যদি তা' না কর, তোমাকে এই রাজসংসার ত্যাগ করতে হবে—শিশোদীয় রাজবংশের এই বিধান।

মীরা। ও—বেশ ! তবে রাজসংসারই ত্যাগ করবো। আমার গিরিধারিলালকে ত্যাগ করতে পারিনা—পারবো না স্বামী।

কুম্ভ। কিন্তু তোমাকেও তো আমি ত্যাগ করতে পারবো না মীরা, আর তা' পারবো না বলেই বলছিলাম, —এসো মীরা, আমরা দু'জনেই এ-সংসার ত্যাগ করি—চলে যাই দূরে—বহু দূরে—লোকালয়ের বাইরে।

মীরা। তুমি রাজপুত্র—আমার জন্যে হবে সন্ন্যাসী ! আমায় তুমি এতো ভালবাসো স্বামী—এতো ভালবাসো।

কুম্ভ। তবে তুমি প্রস্তুত থাকো মীরা। আমি পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে আসি।

[কুম্ভের প্রস্থান]

মীরা। গিরিধারিলাল ! এ তোমার কী খেলা ঠাকুর ! বাপের সংসার থেকে স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে [illegible] পতি-গৃহ-তীর্থে। পতির প্রেমই [illegible] [illegible]। সেই পাথেয় [illegible]—সেই প্রেমময় [illegible] ধরে এ আবার [illegible]আমায় তোমার

কোন্ তীর্থে আহ্বান, গিরিধারি! হোক্, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্!

[কৃষ্ণ বস্ত্রাচ্ছাদনে আবৃত স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে মহারাণা মুকুলজীর প্রবেশ।]

মুকুলজী। "সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমস্ততে।"

[মুকুলজী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া গোবিন্দজীর সম্মুখে নতজানু হইয়া যুক্ত করে প্রণাম করিলেন।]

মুকুলজী। "কালি কালি মহাকালী কালিকে পাপহারিণী ধর্ম্মার্থ-মোক্ষদে দেবী নারায়ণি নমস্ততে।"

মীরা। (সবিস্ময়ে) ভদ্র! এযে গোবিন্দ-বিগ্রহ। এখানে তো শক্তিমূর্ত্তি নেই।

মুকুলজী। নেই মানে?

মীরা। কেন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? হ্যাঁ, আপনি ভুল করেছেন। কালিকা-মন্দিরে যেতে আপনি চলে এসেছেন মহারাণার বৈষ্ণব-অতিথিশালা গোকুলে—এই গোবিন্দ-মন্দিরে।

মুকুলজী। ঐ হলো। ও একই কথা মা।

মীরা। একই কথা!

মুকুলজী। মেয়েটা কে গো? কৃষ্ণপূজা কর, কৃষ্ণকথা জানো না!

মীরা। আপনি কী বলছেন ভদ্র!

মুকুলজী। ঠিকই তো বলছি। যে কৃষ্ণ, সে-ই কালী।

মীরা। যে কৃষ্ণ, সে-ই কালী!

মুকুলজী। হ্যাঁ গো। কেন? কৃষ্ণ-কালীর গল্প জানো না তুমি?

মীরা। কৃষ্ণ-কালী!

মুকুলজী। হ্যাঁ, কৃষ্ণ-কালী। সেই যে বৃন্দাবনে—আয়ান-ঘরণী রাধা লুকিয়ে কৃষ্ণপূজা করছিলেন, এমন সময়—সে তুমি শুনে নিও। কতো বৈষ্ণব রয়েছেন এখানে—তাঁদের কাছে শুনে নিও। (এদিক ওদিক চাহিয়া) আমার যাবার সময় হলো।

মীরা। (মুকুলজীর হাত চাপিয়া [illegible]) না, [illegible] ভদ্র, তুমি একটু বোসো। আমায় বলে যাও—কৃষ্ণ-কালীর কথা। আমার বড় ভাল লাগছে—বড় ভাল লাগছে। ছেলেবেলায় দাদুর কাছে শুনেছিলাম—আজ তুমি আমায় আবার বল।

মুকুলজী। কে রে এই মেয়েটা? বুড়োর ওপর জুলুম ছাখো। বেশ, বোসো তবে—শোনো।

[মুকুলজী বসিলেন। পরম আগ্রহে মীরা তাঁহার প্রায় কোলের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলেন।]

প্রথম অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

[রাজ-অন্তঃপুর। মহারাণী চণ্ডীবাঈয়ের কক্ষ। চণ্ডীবাঈ ও চম্পা।]

চণ্ডী। তার কথা থাক্ চম্পা। সে পরের মেয়ে। তার কুলধর্ম্ম—সে বুঝেছে। আশৈশব সে কৃষ্ণকথা শুনেছে—কৃষ্ণেই তার বিশ্বাস, কৃষ্ণেই তার প্রীতি। কৃষ্ণছাড়া তাই সে আর কিছু জানে না। আমি বরং দেখছি তার গুরুজনদেরই দোষ বেশী। এ শিক্ষা সে পায় নি যে, স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী—স্বামীর ধর্ম্মই স্ত্রীর ধর্ম্ম।

চম্পা। কিন্তু আমার যেমন তোমার মতো একটি মা আছে, ভাবীর তো তা' ছিল না মা। আমার তো সেই দুঃখ, তোমার মতো মায়ের কাছে এসেও তোমার বুকে ঠাঁই পেলো না।

চণ্ডী। আমার মতো মা! আমিই বা কী করতে পারলাম! শিক্ষা তো আমিও দিয়েছিলাম কুম্ভকে, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।" কিন্তু কী ফল হলো? কুম্ভই বা তার কী মর্য্যাদা দিল? দুদিনের পরিচয়—দুদিনের প্রীতি—আজ এই তার কাছে বড় হলো! তার গর্ভধারিণী মাতা, জন্মদাতা পিতা, স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি চিতোর—সব তুচ্ছ করে সে চললো—এক বালিকার মোহে।

চম্পা। কিন্তু যার হাত ধরে তোমার ছেলে আজ সর্ব্ব-ত্যাগী হতে চললো, কই—সে মেয়ে তো তার স্বামীর মুখ চেয়ে তার খেলার পুতুল ঐ গিরিধারি-লালকে ত্যাগ করতে পারলো না—ত্যাগ করলো না।

চণ্ডী। তুই ঠিক বলেছিস্ চম্পা। তার এই নিষ্ঠার জন্যে আমি বরং তাকে শ্রদ্ধা করি—তাকে ক্ষমা করতেও প্রস্তুত। কিন্তু কুম্ভ?

[কুম্ভের প্রবেশ]

কুম্ভ। জানি মা, তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে না। ক্ষমা চাওয়ার সাহসও আমার নেই।

চম্পা। তবে কি দাদা, সে তোমার কথা শুনলো না?

কুম্ভ। না বোন, তার বুকের ধন গিরিধারিলালকে ছেড়ে কোথাও যেতে সে সম্মত নয়।

চণ্ডী। সে আমি জানতাম। কিন্তু এর পর তুমি কী স্থির করেছো কুম্ভ?

কুম্ভ। আমার আর অন্য গতি কী আছে মা? আমি এসেছি তোমাদের কাছে বিদায় নিতে—চির-বিদায়।

চণ্ডী। কুম্ভ!

কুম্ভ। নিরুপায়—আমি মা নিরুপায়। ধর্ম্ম সাক্ষী রেখে, অগ্নি সাক্ষ্য করে তার ভার আমি গ্রহণ করেছি। তোমার কাছে তার যখন ঠাঁই হলো না, তার ভার আমাকেই বহন করতে হবে মা।

[চণ্ডীবাঈ অন্য দিকে মুখ ঘুরাইয়া লইলেন। তথাপি কুম্ভ তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিল]

কুম্ভ। বুঝি মা, ঘৃণায় তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে। কিন্তু মা, আমার পরম সান্ত্বনা—'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কদাপি নয়।' আশঙ্কা আমার মহা-রাণাকে। বিদায় চাইতে যাচ্ছি। কিন্তু ভয়, তাঁর চোখের জল আমার পথরোধ না করে।

[কুম্ভের প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক

ষষ্ঠ দৃশ্য

[গোকুলে গোবিন্দজীর মন্দির। মহারাণা মুকুলজী ও মীরাবাঈ]

মুকুলজী। বুঝলে মা, এই হলো গিয়ে জটিলা-কুটিলা—যেমন মা, তেমনি ঝি। কাক-চিল বাড়ীতে বসতে পায় না। তোমার এমনি একটি শাশুড়ী হলে কেমন হয় না? (গদগদভাবে হাসিতে লাগিলেন) মানে,—সাক্ষাৎ রণচণ্ডী। তারপর শোন—একদিন হয়েছে কি—কাত্যায়ণীপূজার নাম করে রাধা এসেছে নিধুবনে। তন্ময় হয়ে কৃষ্ণের পূজো করছে। ছুটতে ছুটতে বৃন্দা এসে খবর দিল,—সখি, সর্ব্বনাশ! তুমি অভিসারে এসেছো—জটিলা-কুটিলা জানতে পেরেছে। তোমার স্বামী আয়ানকে সঙ্গে নিয়ে এই দিকেই আসছে। আর বুঝলে মা আয়ান ঘোষ কখনো খালি হাতে থাকে না—হাতে থাকে ইয়া বড় এক লগুড়—শুনেই তো রাধার বুক গুড়্ গুড়্। বলে—কি হবে শ্যামচাঁদ?

মীরা। তারপর—তারপর?

মুকুলজী। না, না, না, ভয় কী মা? যিনি শ্যাম, তিনি শ্যামা। আয়ান এসে দেখে, কোথায় কৃষ্ণ—রাধা কাত্যায়ণী পূজো করছে। আয়ান ছিল পরম কালী-ভক্ত। ভক্তি-গদগদ হ'য়ে সে গেয়ে উঠলো—

"কইল কুটিলে, কুটীল কালা—
এ-যে কালী কপালিনী"

হাঃ-হাঃ-হাঃ! এখন বুঝলে তো মা,—যেই কালী, সে-ই কৃষ্ণ—যে-ই কৃষ্ণ, সে-ই কালী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!.. আচ্ছা, আজ তবে উঠি মা। কথায় কথায় অনেক দেরী [illegible] গেল। তুমি তো এইখানেই আছো মা, আবার [illegible] হবে। জয় [illegible] জয় [illegible]—জয় কা[illegible]—জয় কৃষ্ণ—[illegible]

[মুকুলজীর প্রস্থান। মুকুলজীর এই 'কৃষ্ণ-কালী,' 'কালী-কৃষ্ণ' ধ্বনির সহিত অভিভূতা মীরার কণ্ঠেও মৃদু গুঞ্জনে প্রতি-ধ্বনিত হইল এই নাম-কীর্ত্তন। মুকুলজীর কণ্ঠস্বর যতোই ক্ষীণতর হইতে লাগিল, ততোই উচ্চতর হইতে লাগিল মীরার কণ্ঠস্বর। মীরা যখন মুকুলজীর গমন-পথের দিক হইতে তাহার দৃষ্টি গোবিন্দ-বিগ্রহে নিবদ্ধ করিলেন, তখন দেখিলেন, উহা আর গোবিন্দ-বিগ্রহ নাই কালীমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।]

মীরা। (সবিস্ময়ে) এ-কী! গিরিধারিলাল—রণছোড়জী তোমার এ-কী অপার দয়া ঠাকুর! আমার ভুলের বাঁধ ভেঙে দিয়ে এ-কী আলোর বন্যা তুমি বহালে ঠাকুর! দাদুর কণ্ঠে গীতার সেই শ্লোক আজ আমারও গাইতে ইচ্ছে করছে (সুরে) "আকাশাৎ পতিতং তোয়ং
যথা গচ্ছতি সাগরং।
সর্ব্বদেব-নমস্কারঃ
কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥"

[কুম্ভের প্রবেশ।]

কুম্ভ। মীরা, তুমি প্রস্তুত?

মীরা। হ্যাঁ স্বামী। আমি যাবো। কিন্তু নির্ব্বাসনে নয়, যাবো কালিকা-মন্দিরে।

কুম্ভ। কালিকা-মন্দিরে! কেন, কেন মীরা?

মীরা। প্রণাম করতে।

কুম্ভ। কাকে?

মীরা। শিশোদীয় বংশের কুলদেবী কালিকা-মাতাকে।

কুম্ভ। তোমার গিরিধারিলাল?

মীরা। আমার গিরিধারিলাল? তাঁর আসন তো শুধু

নভেলটি ফিল্মস্ প্রযোজিত শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটকের চিত্ররূপে ভৈরবীর ভূমিকায় দীপ্তি রায়

বিমল রায় পরিচালিত হিতেন চৌধুরী প্রোডাকসন্সের 'বিরাজ বহু'র নাম ভূমিকায় কামিনী কৌশল

আমার বুকে নয়—তাঁর আসন সর্ব্বত্র। এই রাখলাম—এই বিগ্রহ। (গোবিন্দ-বেদীতে গিরিধারিলালকে রাখিয়া) যাবো কালিকা-মন্দিরে—(উচ্ছ্বসিত হইয়া) স্বামী, স্বামী সেখানে গিয়েও আমার গিরিধারিলালকে পাবো। আজ আমি বুঝেছি, শ্যামের মধ্যেই শ্যামা—শ্যামার মধ্যেই শ্যাম!

কুম্ভ। তোমার মুখে আজ এ কী কথা মীরা! এ কী বিস্ময়! এ কী আনন্দ! এ কেমন করে সম্ভব হলো মীরা?

[নেপথ্যে মুকুলজীর হাসি শোনা গেল।]

মীরা। ঐ—ঐ জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু আমায় আজ দিব্যদৃষ্টি দান করেছেন স্বামী।

কুম্ভ। তুমি কার কথা বলছো মীরা?

[হাসিতে হাসিতে মুকুলজীর প্রবেশ।]

মুকুলজী। হাঃ—হাঃ—হাঃ!

মীরা। (মুকুলজীকে দেখাইয়া) ইনি।

কুম্ভ। মহারাণা—পিতা—তোমার শ্বশুর—প্রণাম কর!

[মীরা মুকুলজীকে প্রণাম করিলেন। আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া মুকুলজী হাসিতে লাগিলেন।]

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কুম্ভের শয়ন-কক্ষ। কাল—রাত্রি। কুম্ভ ও মীরা।]

মীরার গান

পিয়া বিন্ রহ্যো না জাঈ।
তন মন মেরো পিয়া পর বারু,
বারবার বলি জাঈ॥
নিসদিন জোউ॑ বাট পিয়াকো,
কব রে মিলাগে আঈ।
মীরাকে প্রভু আস তুমারী
লাজ্যো কণ্ঠ লগাই॥

[সঙ্গীতের শেষাংশে কুম্ভ যোগদান করিলেন।]

কুম্ভ। 'পিয়া বিন্ রহ্যো না জাঈ।' সত্যিই তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারিনা মীরা। আজ এক বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু দেখছি—যতো দিন যাচ্ছে অনুরাগ-বেড়েই চলেছে—'দিন দিন বাঢ়ত সোহাগ।'

মীরা। তোমার কথায় বিদ্যাপতির রাধার কথা আমার মনে পড়ছে,—

মীরার গান

সখি, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু॑
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণাহি শুনলু॑
শ্রুতি-পথে পরশ না পেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁওায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥

[সঙ্গীতের শেষাংশে কুম্ভও যোগদান করিলেন]

কুম্ভ। কিন্তু মীরা, কেন জানিনা—অনুরাগও যেমন বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে ভয়—তোমাকে হারাবার ভয়। কাল আমাদের আহেরিয়া উৎসব—যেতে হবে মৃগয়ায়। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে কেমন করে যাবো? তুমি চল—তুমিও আমার সঙ্গে চল মীরা।

মীরা। সে কেমন করে হবে প্রভু? মৃগয়ায় আমি কী করে যাবো? লোকে কী বলবে?

কুম্ভ। সেই লোকের কথাতে আমারও ভয় মীরা। এই এক বছরের মধ্যে কতো রাত তুমি উদ্‌ভ্রান্ত

হয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেছো। পিছু পিছু আমি গিয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি। আমি জানি তোমাকে নিশিতে পায়—রাজবৈদ্যও তাই বলে। কিন্তু লোকে তা' বোঝে না, বিশ্বাস করে না—দেয় কতো অপবাদ।

মীরা। কিন্তু কেন দেয়? সত্যিই তো রাতে আমি বাঁশীর ডাক শুনি। যখন শুনি, তখন আমার জ্ঞান থাকে না। কী যাদু আছে ওই বাঁশীতে—আমাকে টেনে নিয়ে যায়। তুমি আমাকে ধরে রেখো—আমাকে বেঁধে রেখো। আমি জানি,—আমি বুঝি, তুমি আমায় কতো ভালবাসো। আমি তো ভুলতে চাই—সব কিছু ভুলতে চাই—তোমারি মাঝে আমি ডুবে থাকতে চাই। আমাকে তুমি ধরে রেখো—বেঁধে রেখো—আমায় তুমি ছেড়ে দিও না।

কুম্ভ। তাই তো বলছিলাম মীরা, তুমি আমার সঙ্গে চল। তুমি চলো মীরা। না, না, তোমাকে যেতেই হবে।

[চম্পার প্রবেশ।]

চম্পা। ভাবী, তুমি করেছো কী?

মীরা। কী করেছি ভাই?

চম্পা। সন্ধ্যেবেলায় তুমি বাবাকে ভজন শোনাতে যাওনি?

মীরা। (কুম্ভের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া) তাইতো! বড় ভুল হয়ে গেছে ভাই।

চম্পা। এখন ঠ্যালা বোঝো। বাবা ভেবেছেন, তোমার অসুখ করেছে। তিনি নজেই আসছেন তোমাকে দেখতে।

[সকলে সচকিত হইল। মুকুলজীর প্রবেশ।]

মুকুলজী। কই—মীরা-মা কোথায় গো? এই যে—যাক্ বিছানায় পড়ে নেই—দাঁড়িয়ে আছে। তা' যখন আছো, তুমি ভালই আছো মা—কী বল?

[চণ্ডীবাঈয়ের প্রবেশ।]

চণ্ডী। মহারাণা তুমি আমাকে বল্লে এলে বৌমার অসুখ করেছে। আবার এদিকে আমি শুনে এলাম, কুম্ভ বৌমাকে নিয়ে মৃগয়ায় যাচ্ছে—আহেরিয়ায়। কুম্ভ নাকি সেইরকম ব্যবস্থা করতেই আদেশ দিয়েছে।

মুকুলজী। কী সর্বনাশ! অসুখ থেকে একেবারে আহেরিয়া! সে তো ঘোড়ায় চড়ে—বর্শা হাতে—বনে বনে ছুটে বেড়াতে হয় (মহারাণীকে দেখাইয়া) সে বরং পারেন ইনি। কিন্তু তুমি কেমন করে পারবে মা?

মীরা। না বাবা, আমি যাবো না।

মুকুলজী। বাঁচালে মা, বাঁচালে। যাক্ ওরা সব আহেরিয়ায়—যাক্ ওরা সব মৃগয়ায়। আমরা বাপ-বেটিতে নিরিবিলি বসে পেট ভরে ভজন শুনবো। তাহলে আমি এখন আসি মা। (কুম্ভের প্রতি) এসো কুম্ভ, তোমার সঙ্গে ক'টা কথা আছে। রাজকার্য্যে তুমি আজকাল একেবারেই যাও না—ডেকে পাঠালেও না। তোমার বিয়ে হয়ে তো আমার এই লাভ হয়েছে। চল—চল।

[মুকুলজীর সহিত কুম্ভের প্রস্থান।]

চণ্ডী। চম্পা, তুমিও যাও তো মা। বৌমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

[চম্পার প্রস্থান।]

চণ্ডী। আমার কাছে এসো মীরা।

[মীরা তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন।]

চণ্ডী। তোমার ও নিশিতে পাওয়া আমি বিশ্বাস করি না।

[মীরা অধোবদন হইলেন।]

তোমার কোন অসুখ করেছে, তাও আমি বিশ্বাস করি না।

[মীরা নীরব রহিলেন।]

ছোট ঘর থেকে বড় ঘরে এসেছো—তাতে আমি আপত্তি করিনি। প্রথম যেদিন তুমি গিরিধারিলালের জন্যে রাজ-ঐশ্বর্য্যও ত্যাগ করতে

পেরেছিলে, সেদিন তোমার সে-নিষ্ঠায় তোমার প্রতি আমার বরং শ্রদ্ধা এসেছিল। কিন্তু শেষটায় দেখলাম, ঐশ্বর্য্যের মোহ তুমি ত্যাগ করতে পারলে না—ফিরে এলে রাজপুরীতে। এলে—আপত্তি করিনি। কিন্তু আজ তোমায় এই কথাটাই আমি বুঝিয়ে দিতে চাই যে, এ রাজবংশের সম্ভ্রম, মর্য্যাদা যদি তুমি আর একদিনও ক্ষুণ্ণ কর,—আর যদি একদিনও শুনি স্বামীর ঘর ছেড়ে আর কারো ডাকে তুমি অভিসারে গেছো—

মীরা। (মুখ তুলিয়া) মা !

চণ্ডী। হ্যাঁ, অভিসারে। তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না মীরা। সাবধান ! সাবধান !

[মহারাণীর প্রস্থান। ব্যথা-কাতর মীরা নিজবক্ষ চাপিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন ।]

মীরা। গিরিধারিলাল ! গিরিধারিলাল !

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কালিকা-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে আহেরিয়া উৎসব-রতা রাজগৃহের পুরনারীগণ নৃত্য-গীত করিতেছে। মন্দির-অলিন্দে চণ্ডীবাঈ, চম্পা ও মীরা প্রদীপ, সিন্দুর, ধান, দুর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ বরণ-ডালা লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কাল—প্রভাত।]

[পুরনারীগণ একে একে সোপান বাহিয়া মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিল—পিছনে চণ্ডী ও চম্পা এবং সর্ব্বপশ্চাতে মীরা। মীরা মন্দির-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন, এমন সময়ে অদূরে বংশীধ্বনি হইল। মীরা থমকিয়া দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া বংশীধ্বনি শুনিলেন। মীরা বরণডালা হাতে লইয়া তর্‌তর্ করিয়া তিন ধাপ সোপান নামিয়া আসিলেন। মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিয়া সেই বংশীধ্বনি অনুসরণ করিয়া তিনি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন ।]

[বিপরীত দিক দিয়া রাজ-অন্তঃপুরের পুরুষগণ আহেরিয়ার গান গাহিতে গাহিতে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে কৌশিককেও দেখা গেল—সে-ই এ-দলের নেতা। সকলেই পানোন্মত্ত। পূর্ব্বগীত অনুসরণে তাহারা গাহিতেছিল ।]

[সঙ্গীতের শেষের দিকে কুম্ভ ও খড়গসিংহ তথায় আসিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। পুরুষেরা একে একে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল। প্রথম ব্যক্তি মন্দির-চত্বরে পৌঁছিলে মন্দির-অভ্যন্তর হইতে পুরনারীগণ এক একে গাহিতে গাহিতে বাহিরে আসিতে লাগিল। পুরুষদের সমীপবর্ত্তী হইলে পুরুষেরা দাঁড়াইয়া পড়িল। নারীরা প্রত্যেকে প্রত্যেক পুরুষকে তিলক দিতে দিতে নামিয়া গেল। তখন একে একে পুরুষ-গণ মন্দিরের ভিতরে চলিয়া গেল। নারী-গণের সর্ব্বশেষে ছিলেন মহারাণী ও চম্পা এবং পুরুষ-পংক্তিতে সর্ব্বশেষে কুম্ভ। তিলক লইয়া কুম্ভ জিজ্ঞাসা করিলেন ।]

কুম্ভ। মীরা ? মীরা কোথায় ?

[পুরনারীগণ সকলেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ।]

চম্পা। (সবিস্ময়ে) তাইতো মা ! ভাবী ?

[ইতিমধ্যে খড়গসিংহ প্রভৃতি কয়েকজন রাজপুরুষ প্রণামান্তে মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন ।]

চণ্ডী। [illegible] বোধ [illegible] মন্দিরে।

কুম্ভ। খড়গসিংহ। মন্দিরে মীরা আছে ?

খড়্গ। না যুবরাজ, সেখানে তো কোন পুরনারী নেই।

[কুম্ভের প্রস্থান।]

খড়্গ। তবে তিনি কোথায় গেলেন?

চণ্ডী। আমি জানি, সে কার কাছে গেছে। কিন্তু জানিনা—কোথায়। রাজপুতগণ! যদি তোমাদের ধমনীতে রাজপুতের রক্ত প্রবাহিত হয়,—পবিত্র শিশোদীয় বংশকে যদি কলঙ্কমুক্ত করতে চাও—ঐ কলঙ্কিনীই হোক্ এই আহেরিয়ায় তোমাদের প্রথম শিকার। বৎসগণ! এখনি যাও—যেখান থেকে হোক্—যেমন করে হোক্ তাকে ধরে নিয়ে এসো—এইখানে—এই কালী-মন্দিরে—আমি তাকে চাই।

[মহারাণীর এই আদেশে রাজপুরুষগণ এক সঙ্গে অসি কোষমুক্ত করিল এবং উন্মত্তবৎ যে যেদিকে পারিল ছুটিল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[বৈষ্ণব-অতিথিশালা "গোকুল"। বেদীতে স্থাপিত গোবিন্দজী ও গিরিধারিলালের বিগ্রহ। কাল—প্রভাত।]

[মীরা গিরিধারিলালের সম্মুখে গান গাহিতেছেন।]

মীরার গান

হমারে জনম-মরণকে সাথী।
যাঁনে নাহিঁ বিসরূঁ দিনরাতী॥
তুম দেখ্যা বিন কল ন পড়ত হৈ
জানত মেরী ছাতী॥
উঁচী বড় বড় পংখ নিহারূঁ
রোয় রোয় অঁখিয়া রাতী॥
মীরাকে প্রভু পরম মনোহর
হরিচ[illegible]তরাতী॥
পল পল্র[illegible]
[illegible]রাতী॥

মীরা। ওগো আমার জনম-মরণের সাথী! কী করে আমায় ভুলে ছিলে?…কী?…আমি ভুলে ছিলাম! আমি ভুলে ছিলাম বলে তুমিও ভুলে থাকবে? তুমি না দয়াময়।…দয়াময়, আর আমায় ভুলিও না—আর আমায় দূরে ঠেলো না। তোমার ওই রাঙা পায়ে আমায় একটু ঠাঁই দাও। ভুলেও যদি আমি যেতে চাই, তুমি আমায় ধরে রেখো—ধরে রেখো প্রেমময়!…এ কী! কোথায় যাচ্ছো? …কী বললে… পাশা খেলবে আমার সঙ্গে-আবার! …না, না, তোমার সঙ্গে খেলায় আমি পারি না। যতোবার খেলা হয়, তোমার হয় জিত—আমার হয় হার।…কী? …আজ আমি জিতবো! বেশ, তবে এসো।

[মীরা কুলুঙ্গি হইতে পাশা লইয়া বেদীতলে বসিলেন।]

বোসো, আচ্ছা, তুমি পাশা খেলতে এতো ভালবাসো কেন গিরিধারিলাল?…কী… জীবনটাই একটা পাশাখেলা! (হাসিয়া) তা' যা বোলেছো। … কিন্তু শোনো, কোন ছল চলবে না। বাজী রাখবে! কী বাজী? তুমি জিতলে আমাকে ঘরে ফিরে যেতে হবে! (আর্তকণ্ঠে) না, না, তা' হবে না—তা' আমি খেলবো না। (উঠিয়া, দূরে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) না, না, আমার জীবন নিয়ে এমন করে পাশা খেলতে তোমাকে আমি দেবো না—দেবো না।

[বহির্দ্বারে করাঘাত শোনা গেল। মীরা সচকিত, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।]

কে! (গিরিধারিলালের উদ্দেশ্যে) ওই কে আবার এসেছে—আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে—রাজপ্রাসাদে—স্বামীর ঘরে—সোণার পিঞ্জরে। আমি যাবো না—আমি যাবো না—তোমাকে ছেড়ে আমি যাবো না।

[বহির্দ্বারের করাঘাত প্রবলতর হইয়া উঠিল। শুধু তাহাই নহে, দ্বারে প্রবল আঘাতও হইতে লাগিল।]

না, না, শোনো—শোনো—আমাকে তুমি নিয়ে চল—আমাকে তুমি এখান থেকে নিয়ে চল—দূরে—বহুদূরে—তোমার লীলা নিকেতন বৃন্দাবনে—বৃন্দাবনে !

[দরজা ভাঙিয়া পড়িল। ছুটিয়া প্রবেশ করিল খড়গসিংহ ও তাহার কতিপয় সশস্ত্র অনুচর। মীরা চমকিয়া উঠিলেও তখনই প্রকৃতিস্থ হইলো। খড়গসিংহ ও তাহার অনুচরগণ কক্ষে প্রবেশ করিয়াই উন্মুক্ত গবাক্ষগুলির নিকট ছুটিয়া গেল এবং কেহ পলাইতেছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। কাহাকেও না দেখিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ধীরে ধীরে একস্থানে সমবেত হইল।]

খড়গ। পালাতে চাইছিলে ? কার সঙ্গে ?

[মীরা নিরুত্তর রহিল।]

খড়গ। (বজ্রনির্ঘোষে) বল—কে এসেছিল ?

মীরা। কেউ আসেনি।

খড়গ। কলঙ্কিনী ! কেউ আসেনি ! (পাশার ছক দেখাইয়া) তবে কার সঙ্গে ঐ পাশা খেলছিলে তুমি ?

মীরা। আমার স্বামীর সঙ্গে।

খড়গ। তোমার আবার অন্য কোন্ স্বামী আছে ?

মীরা। জানো না ?

মীরার গান

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা না কোঈ।
যাকে সিতে মোর মুকুট মেরে পতি সোঈ॥
শঙ্খচক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমালা হোঈ ॥
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা ন কোঈ ॥
অব্ তো বাত কৈল গৈয়ি জানে সব কোঈ ॥
সন্তন অঁগ বৈঠ বৈঠ লোকলাজ খোঈ ॥
ছোড় দই কুলকী কান ক্যা করেগা কোঈ।
অঁসুওন জল সী চ সীঁচ প্রেম বোলী বোঈ ॥
মীরা প্রভু লগন লগী হোনী হো সোঁ হোঈ ॥

খড়গ। আমি লক্ষ্য করছিলাম, নারীর ছলনার শেষ কোথায়। দেখলাম, তোমার তুলনা নেই। কিন্তু আপন ব্যভিচার কৃষ্ণে আরোপ করে—তাঁর নাম-গানের নামাবলী গায়ে দিয়ে মুক্তি পাবে ভেবেছো ? (অনুচরগণের প্রতি) পাপিয়সীকে বন্দী কর।

মীরা। স্বামী ! জনম-মরণের সাথী !

খড়গ। হ্যাঁ, তিনিও তোমাকে খুঁজতে এইদিকেই আসছেন। (নেপথ্যের দিকে তাকাইয়া) হ্যাঁ, ঐ এসে গেছেন। কিন্তু আজ তোমাকে কেউ ক্ষমা করবে না। বন্দী কর।

[জনৈক অনুচর মীরাকে বন্দী করিতে গেল, এমন সময় কুম্ভের প্রবেশ। সকলে অভিবাদন জানাইল। পূর্ব্বোক্ত রক্ষী নিরস্ত হইল।]

কুম্ভ। এ কী !

খড়গ। মহারাণীর আদেশ—যেখান থেকে হোক্, যেমন করে হোক্ এই কলঙ্কিনী নারীকে বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে কালী-মন্দিরে—তাঁর কাছে।

কুম্ভ। কলঙ্কিনী ! সংযত হয়ে কথা বল খড়গসিংহ।

খড়গ। এর পরেও কি যুবরাজের ধারণা—তাঁর স্ত্রী সতী সাধ্বী ?

কুম্ভ। তোমার বিপরীত ধারণার কারণ কি খড়গসিংহ ? এখানে আর কাউকে দেখেছো ?

১ম রক্ষী। হ্যাঁ প্রভু, ছিল। ঐ গবাক্ষপথে পালিয়েছে।

কুম্ভ। তা' স্বচক্ষে দেখেছ ?

[উপরোক্ত রক্ষী মাথা নত করিল।]

খড়গ। কিন্তু মহারাণীর আদেশ আমাদের মান্য করতেই হবে যুবরাজ।

কুম্ভ। আমার আদেশ, এই মুহূর্ত্তে তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ কর।

খড়গ। [illegible] কর[illegible]রাজ। মহারাণীর আদেশের চেয়ে [illegible] আমাদের [illegible] বড় নয় [illegible]

কুম্ভ। স্ত্রীর সম্মান যেখানে বিপন্ন, স্বামী সেখানে মহারাণা বা মহারাণীর আদেশ গ্রাহ্য করে না। (হঠাৎ অসি কোষমুক্ত করিয়া) আমাকে বধ না করে আমার মীরাকে বন্দী করতে পারবে না খড়গসিংহ।

[সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক
চতুর্থ দৃশ্য

[মেরতা গ্রাম-সীমান্তে পথ। কাল—দিবা। সৈন্যাধ্যক্ষ বীরভদ্র আহেরিয়া গানের শেষাংশটি গাহিতে গাহিতে পদচারণা করিতেছে। খড়গসিংহের প্রবেশ।]

বীরভদ্র। সেনাপতি আর তো পারা যায় না।

খড়গ। কেন, কী হলো বীরভদ্র?

বীরভদ্র। আহেরিয়া উৎসব ছেড়ে এই মেরতা গ্রামে যখন আপনি আমাদের নিয়ে এলেন, তখন ভেবেছিলাম —বৈবাহিক রাজা রতনসিংহের আতিথ্যেই আমাদের আহেরিয়া উৎসবের শেষ পর্ব্বটা বেশ ভালভাবেই শেষ হবে। উদ্দেশ্যটা আপনি খুলে না বললেও আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় নি। কিন্তু এ কী হলো?

খড়গ। হবে হবে—সবই হবে।

বীরভদ্র। আর হয়েছে! সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে সেনাপতি। কোথায় বা বৈবাহিক রাজা রতনসিংহের বাড়ী, কোথায় বা চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজ! এই কাঠফাটা রোদে গ্রাম-সীমান্তে দাঁড়িয়ে নিছক হাওয়া খেয়ে এ কেমন ধারা আহেরিয়া উৎসব? বরং বলবো ভাগ্যবান জনার্দ্দন। আপনি তাকেই রতনসিংহের বাড়ীতে পাঠালেন। কেন পাঠালেন,—তা' জানি না। কিন্তু এটা জানি, [illegible] বাড়ীতে আমাদের মতো হাওয়া খেয়ে নেই।

খড়গ। কেন [illegible]! বুঝবে—তা' ক্রমে বুঝবে। এটাতো বুঝছো—কী অপমানের জ্বালায় আমি জ্বলছি। কুম্ভ শুধু আমার কাছে যুবরাজ নয়,—একই বংশে জন্ম, একই সঙ্গে লালিত-পালিত হয়েছি,—আমার আবাল্য বন্ধু। ওই কুহকিনীর মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে কী মর্ম্মান্তিক আঘাত আমায় হেনেছে! শুধু আমাকে নয়,—পবিত্র শিশোদীয় রাজকুলের মর্য্যাদা, জননীর সম্ভ্রম—সব কিছু ধূলিসাৎ করে সে আজ ঐ কুহকিনীর ছলনায় অন্ধ।

[নটবরকে লইয়া জনার্দ্দনের প্রবেশ।]

খড়গ। এই যে এসেছো। তুমিই তো নটবর?

নটবর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

খড়গ। যাক্, তাহ'লে ভুল করোনি জনার্দ্দন—ঠিক লোকই এনেছো।

নটবর। কিন্তু কেন এনেছেন—তা তো বুঝতে পারছি না। ইনি বললেন, গোপনে কী কথা আছে।

খড়গ। আমাকে চিনতে পারছো?

নটবর। তা' আর পারছি না। আপনি তো মেবারের সেনাপতি—আমাদের মীরার বিয়েটা তো আপনিই দিয়ে দিলেন। রাজরাণী হয়ে আমাদের মীরা কেমন আছে? গান-টান এখনো গায় তো? আমার কথা বলে?

খড়গ। আরে, বলে বলেই তো তোমাকে নিতে এসেছি।

নটবর। (আনন্দে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল) এ্যাঁ! নিয়ে যেতে বলেছে—আমাকে—তার কাছে!

খড়গ। যাবে তুমি?

নটবর। যাবো না? বলেন কি! মীরা ডেকেছে—যাবো না? মীরা ডাকলে আমি যাবো না? জানেন না তো—

খড়গ। কী? কী জানি না?

নটবর। বললে আপনারা হাসবেন।

খড়গ। না, না, হাসবো কেন হে নটবর।

নটবর। ঐ মীরার সঙ্গে আমার বিয়েও হতে পারতো। আমার বাবা মেরতা-রাজের কাছে কথাটা

পাড়বেন ভাবছিলেন, এর মধ্যে আপনারা এসে মীরাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলেন।

খড়্গ। (জনার্দনকে) ছোকরা ঠিকই বলেছে জনার্দন। (নটবরকে) মীরা তাই আজও তোমাকে ভুলতে পারেনি নটবর। (পুনরায় জনার্দনকে) কী বলো হে জনার্দন?

জনার্দন। তা' আর বলতে! (নটবরকে) তোমার জন্যে মীরা দেবীর লুকিয়ে লুকিয়ে সে কী চাপা কান্না!

নটবর। মীরা কাঁদে? আমার জন্যে কাঁদে?

খড়্গ। শুধু কাঁদে? আরো কতো কী বলে। সে আমি বলতে পারবো না। ওহে জনার্দন, যাওনা হে—ওকে নিয়ে গিয়ে সব বল।

[জনার্দন নটবরকে অন্তরালে লইয়া গেল।]

বীরভদ্র। ওহে বাবা! এতোক্ষণে বুঝলাম, সেনাপতির বুদ্ধি—সে কী বুদ্ধি! হ্যাঁ, এখন বুঝছি, আপনি কেন সেনাপতি আর আমরা কেন নফর।

খড়্গ। (আপন মনে) 'আমাকে বধ না করে আমার মীরাকে বন্দী করতে পারবে না।' ঐ মীরাকে এখন তুমিই বধ করবে কুম্ভ। আর তবেই হবে আমাদের অপমানের প্রতিশোধ!

দ্বিতীয় অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

[কুম্ভের শয়নকক্ষ। কাল—রাত্রি। শয্যায় নিদ্রিত মীরা। আবহ-সঙ্গীত শোনা যাইতেছে। কক্ষসংলগ্ন অলিন্দপথে নটবরকে লইয়া বীরভদ্র ও জনার্দন আসিল। নটবরকে কেমন যেন ভীত সচকিত দেখা গেল।]

বীরভদ্র। যাও নটবর—যাও।

নটবর। যাবো! ওই ঘরের ভেতরে! আমি—

জনার্দন। আরে, যাও যাও। ভয় নেই। মীরা দেবী সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

নটবর। মীরা দেবী!

বীরভদ্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঘরে ঢুকেই দেখবে—পালঙ্কে মীরা দেবী শুয়ে আছেন। তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে হয়তো এতোক্ষণে ঘুমিয়েই পড়েছেন।

নটবর। কিন্তু যুবরাজ যদি এসে পড়েন—

জনার্দন। আরে না না না। তিনি আসবেন না। তিনি যদি আসেন, তাহ'লে কী আর তোমায় আসতে বলেন?

নটবর। তবে যাই?

বীরভদ্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও—আর দেরী করো না!

[বীরভদ্র নটবরকে কক্ষের মধ্যে ঠেলিয়া দিল। ভীত সচকিতভাবে নটবর কক্ষে প্রবেশ করিল। বাহির হইতে বীরভদ্র কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। উভয়ে বাহিরে পদচারণা করিতে লাগিল।]

[নটবর বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে কক্ষের সাজসজ্জা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে মীরার দিকে তাকাইল। পায়ে পায়ে তাহার দিকে একটু একটু অগ্রসর হইতে লাগিল।]

বীরভদ্র। সর্ব্বনাশ! যুবরাজ এসে পড়েছেন। নটবর, লুকিয়ে পড়।

[নটবর ভীতভাবে লুকাইবার স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল।]

জনার্দন। যদি বাঁচতে চাও, শীগগির পালঙ্কের তলায় লুকিয়ে পড়।

[দিশাহারা নটবর উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী পালঙ্কের নীচে আত্মগোপন করিল।]

বীরভদ্র ও জনার্দন। চোর! চোর!

[বাহিরে কোলাহল শোনা গেল,—"চোর", "চোর"। বীরভদ্র ও জনার্দন উভয়ে চীৎকার করিতে করিতে [illegible] বাহির হইয়া [illegible] এবং পরক্ষণেই

কয়েকজন রক্ষীসহ ফিরিয়া আসিল। রক্ষীগণ একে একে বলিতে লাগিল।]

—চোর, চোর।

—হ্যাঁ, যুবরাজের ঘরে।

—গবাক্ষ-পথে ঢুকেছে।

—উদ্যান-রক্ষী নিজে দেখেছে।

—আমিও দেখেছি।

—গবাক্ষের ধারে মাধবীলতা—সেই লতা বেয়ে উঠেছে।

বীরভদ্র। সব সতর্ক থাকো পালাতে না পারে।

জনার্দন। এই যে খবর পেয়ে মহারাণীও এসে পড়েছেন।

বীরভদ্র। ওই মহারাণীও এসেছেন।

জনার্দন। কিন্তু যুবরাজ কই ?

বীরভদ্র। ওই—যুবরাজও এসে গেছেন। চল—চল—ঘরে চল।

[বাহিরের এই কোলাহলে মীরার ঘুম ইতিমধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছে। তিনি প্রথমে বিষয়টা বুঝিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছু বুঝিলেন না। হতবুদ্ধি হইয়া শয্যায় বসিয়া রহিলেন।]

[মহারাণা, মহারাণী, কুম্ভ, খড়্গসিংহ, জনার্দন, বীরভদ্র ও আরো কয়েকজন রাজপুরুষ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মীরা তাঁহাদের দেখিয়া শয্যা হইতে নামিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

কুম্ভ। কই কক্ষে তো অপর কেউ নেই ?

জনার্দন। কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখেছি যুবরাজ, মাধবীলতা বেয়ে গবাক্ষপথে এই ঘরেই ঢুকেছে।

মুকুলজী। [illegible]

তলা হইতে নটবরকে টানিয়া বাহির করিল।]

নটবর। (সভয়ে) আমার কোন অপরাধ নেই—আমার কোন অপরাধ নেই। মীরা দেবী এই ঘরে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

চণ্ডী। (শ্লেষের সুরে) মীরা দেবী! (নটবরকে দেখাইয়া রক্ষীগণের প্রতি) একে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও।

নটবর। (মীরার দিকে তাকাইয়া অসহায়ভাবে) মীরা—মীরা—

চণ্ডী। (বজ্রনির্ঘোষে) নিয়ে যাও।

[রক্ষীগণ নটবরকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।]

চণ্ডী। কুম্ভ! তোমার স্ত্রীর বিচার—তুমিই কর। (অন্য সকলের প্রতি) তোমরা সব চলে এসো।

[সকলে চলিয়া যাইবেন, এমন সময় মুকুলজী বলিলেন।]

মুকুলজী। কুম্ভ! শিশোদীয় রাজবংশের বিধান—ব্যভিচারের শাস্তি বিষদানে প্রাণদণ্ড। (মীরার প্রতি) মা! কিন্তু যদি তুমি সতী হও, তাহলে সে বিষ তার বিষক্রিয়া হারাবে—সে হবে অমৃত। আমার আর কিছু বলবার নেই—আমার আর কিছু বলবার নেই। এ ছাড়া আমি আর কি বলতে পারি!

[কুম্ভ ও মীরা ব্যতীত সকলে চলিয়া গেলেন। ক্ষণিক স্তব্ধতা।]

কুম্ভ। মীরা! তোমার কিছু বলবার আছে ?

মীরা। কিছু না প্রভু।

কুম্ভ। ও লোকটা কে ?

মীরা। ওর নাম নটবর। আমাদের প্রতিবেশীর ছেলে।

কুম্ভ। প্রতিবেশীর ছেলে! হুঁ, মহারাণার আদেশ শুনেছো ?

[illegible]। শুনেছি প্রভু। দাও বিষ। আমি জানি, মহারাণার বাক্য চিরসত্য। ও বিষ—আমার কাছে হবে অমৃত।

[খড়গসিংহের সহিত জনৈকা প্রতিহারিণী বিষপাত্র লইয়া আসিল।]

প্রতিহারিণী। মহারাণী পাঠিয়ে দিলেন।

[বিষপাত্র মীরার প্রসারিত হস্তে দিয়া প্রতিহারিণী দূরে গিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিল।]

কুম্ভ। (কম্পিতকণ্ঠে) মীরা! বিষপাত্র হাতে নিয়ে তুমি হাসছো!

মীরা। হ্যাঁ হাসছি। মহারাণার বাক্য চিরসত্য। এ বিষ আমার কাছে হবে অমৃত।

[মীরা বিষপানে উদ্যত।]

কুম্ভ। মীরা! দাঁড়াও।

[মীরা ক্ষান্ত হইলেন।]

কুম্ভ। তোমার মনের ঐ বিশ্বাস আমার নেই। অবিশ্বাসে আমার মন ভরে গেছে। এতোদিন যা ছিল আমার কাছে অমৃত—আজ আমার কাছে তা' হয়েছে বিষ। বিষ তুমি এখনো পান করোনি, কিন্তু আমার পান শেষ!

মীরা। বিষ তুমি কাকে বলছো প্রিয়তম! এই আমার অমৃত—অমৃত...তোমরা আজ আমার সব বন্ধু—কতো বড় বন্ধু—তোমরা জানো না।

[বিষপাত্র হাতে লইয়া মীরা গাহিতে সুরু করিলেন।]

মীরার গান

রামনামরস পীজে মনুয়া,
রামনামরস পীজে।

[মীরা বিষ পান করিলেন, কিন্তু বিষক্রিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিল না। মীরা গাহিয়া চলিলেন। গানের মধ্যে দেখা গেল, বিষক্রিয়ার পরিবর্ত্তে পরমজীবনের অমৃত সিঞ্চনে মীরা অভিসিক্তা হইয়া গাহিয়া চলিয়াছেন।]

মীরার গান

রামনামরস পীজে মনুয়া,
রামনামরস পীজে।
ত্যজ কুসংগ সতসংগ বৈঠ নিত,
হরি চরচা সুণ লীজে॥
কাম কোদ মদ লোভ কুঁ,
চিত সে দূর করীজে॥
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
তাহি কে রংগ মে ভীজে॥

খড়গ। এ কী! এ আমি কী দেখলাম! কে তুমি—যার কাছে বিষ হয় অমৃত?

কুম্ভ। আমাকে বলতে দাও খড়গসিংহ—ও কে। আকাশে ওই তারা দেখেছো—ওই অরুন্ধতী তারা? ও সেই মহাসতী অরুন্ধতী—অযোধ্যায় ও ছিল সীতা—বৃন্দাবনে ও ছিল রাধা—রাজস্থানে ও

আজ মীরা ! ও সেই সূর্য্যমুখী ফুল—যার সূর্য্য যুগে যুগে জগৎপতি—ওই গিরিধারিলাল !

মীরা। যে বিদায় পাবো না ভেবেছিলাম, বিষ দিয়ে সে বিদায় তোমরা আমায় দিয়েছো। সে বিষপানে রাজসংসারে মীরার হয়েছে মৃত্যু। বিষ থেকে পেয়েছি অমৃত—আমার নবজনমের সচ্চিদানন্দ ! মীরা চলে আজ বৃন্দাবনে—আমার গিরিধারি-লালের লীলা-নিকেতনে।

মীরার গান

ত্যজ কুসংগ সতসংগ বৈঠ নিত,
হরি চরচা স্থণ লীজে।
রামনামরস পীজে মনুয়া,
রামনামরস পীজে ॥

[উপরোক্ত দুইটি লাইন গাহিতে গাহিতে মীরা চলিয়া গেলেন।]

খড়্গ। আমি পাপ করেছি—মহাপাপ করেছি। কুম্ভ, বন্ধু, ভাই,—ওই মহাসতীকে ফেরাও—ফেরাও বন্ধু—ফেরাও।

কুম্ভ। কাকে ফেরাবে খড়্গসিংহ ? ও আজ মুক্ত আত্মা ! কোনো বন্ধনই আজ আর ওর বন্ধন নয়।... কিন্তু আমি ? আমি তো বন্ধন-মুক্ত নই। আমার বন্ধন ওই কৃষ্ণবিলাসিনী মীরা। আমি জানি, আমাকেই একদিন যেতে হবে ওর টানে —ওরই কাছে।

যবনিকা

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পথ। মীরা গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন। বহু পথিক, বহু যাত্রী, বহু ভক্ত আজ তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে। জনতার মধ্যে কৌশিক, গঙ্গা, যমুনা ও গোকুলের বৈষ্ণবগণকেও দেখা গেল।]

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বৃন্দাবন। শ্রীরূপ গোস্বামীর আশ্রম। কাল—সন্ধ্যা। আশ্রমের শিষ্যগণ কর্ম্মব্যস্ত। কেহ ফুল, কেহ যমুনাবারি, কেহ নৈবেদ্য লইয়া—শিষ্যগণ যাতায়াত করিতেছে। কেহ সম্মার্জ্জনী যোগে প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতেছে। কেহ তীর্থবারি প্রাঙ্গণে ছিটাইতেছে। কৌশিকের সহিত গোকুল বৈষ্ণব-অতিথি-শালার কতিপয় বৈষ্ণব আশ্রমে প্রবেশ করিল। কৌশিক ইতঃস্তত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।]

১ম বৈষ্ণব। না কৌশিকদা এ হতেই পারে না। এ আশ্রম শ্রীরূপ গোস্বামীর আশ্রম হতেই পারে না।

২য় বৈষ্ণব। কিন্তু সবাই বললে যে !

১ম বৈষ্ণব। বললেই হলো ! আমরা বিদেশী লোক—বৃন্দাবনে নতুন এসেছি। তাই লোকে আমাদের সঙ্গে মস্করা করেছে !

৩য় বৈষ্ণব। ঠিক ঠিক ! শ্রীরূপ গোস্বামী—যে সে লোক নন্—তাঁর আশ্রম কোথায় শিষ্য-শিষ্যায় গম্ গম্ করবে—

১ম বৈষ্ণব। আর গম্ গম্ ! আরে, এখানে পরমাগতি কই ?

কৌশিক। রাখো তোমার পরমাগতি ! আগে তো নিজেদের গতি হোক্। (১ম শিষ্যের প্রতি) ও প্রভু, শুনছেন।

১ম শিষ্য। কী বলবে বল না।

২য় শিষ্য। ও যা বলবে, তা জানি। (কৌশিককে) দেরী আছে—দেরী আছে।

কৌশিক। কি দেরী আছে ?

২য় শিষ্য। মচ্ছব—মচ্ছব। আগে তো ভোগ হোক্।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের সশ্রদ্ধ নিবেদন

আগতপ্রায়

জয়দেব

৺হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত নাটকের চিত্ররূপ

পরিচালনা • ফণী বর্ম্মা

সংগীত • নচিকেতা ঘোষ শিল্প নির্দেশক • সত্যেন রায়চৌধুরী

চরিত্রে

অসিতবরণ • রবীন • পাহাড়ী • বিকাশ • তুলসী • ভানু

হরিধন • সন্তোষ • জয় • বিজয় • শিশির • শশাঙ্ক • শ্রীমান বিতু

দেবযানী • অনুভা • পদ্মা • রমা প্রভৃতি

সংগীতাংশে

অসিতবরণ • রবীন • নচিকেতা • দ্বিজেন • সতীনাথ

উৎপলা • প্রতিমা • গায়ত্রী প্রভৃতি

পরিশোধ

কাহিনী-চিত্রনাট্য • প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রযোজনা-পরিচালনা-সুকুমার দাশগুপ্ত • সংগীত • রবীন চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণে

ছবি • ধীরাজ • জহর • মঞ্জু দে • অনুভা • পাহাড়ী প্রভৃতি

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

কৌশিক। আরে প্রভু, মচ্ছব নয়—মচ্ছব নয়। জিজ্ঞাসা করছি, এইটেই কি শ্রীরূপ গোস্বামীর আশ্রম ?

৩য় শিষ্য। লোকটা কে হে! বৃন্দাবনে এসে শ্রীরূপ গোস্বামীর আশ্রম চেনে না।

কৌশিক। (বৈষ্ণবগণের প্রতি) ওহে, এইটেই—এইটেই। (শিষ্যকে) তা' প্রভু কখন দর্শন দেন ? আমাদের সঙ্গে মা আছেন কিনা। তিনি প্রভুর দর্শন বাঞ্ছা করেন।

৩য় শিষ্য। লোকটা বলে কী হে! প্রভু করবেন প্রকৃতি দর্শন! কে হে তুমি অর্বাচীন ?

কৌশিক। ওঃ, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। প্রকৃতি দর্শন করেন না!

২য় শিষ্য। হ্যাঁ, করেন না। যাও, যাও এখান থেকে যাও। আমাদের পুজোর আয়োজনে ব্যাঘাত করো না।

কৌশিক। এ্যাঁ! এরা বলে কিহে! এমনটি তো কখনো দেখিনি।

১ম বৈষ্ণব। প্রকৃতি দর্শন করেন না তো পরমাগতিও মিলবে না। চল হে চল।

[কৌশিক ও বৈষ্ণবগণ চলিয়া গেল। শিষ্যগণ নিজ নিজ কর্ম্ম করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে ভৈরবের প্রবেশ।]

১ম শিষ্য। আজ আবার কি মনে করে ভৈরব ? ডাকাতি ছাড়বে বলেছিলে—ছেড়ে দিয়েছো ?

ভৈরব। আর ডাকাতি! কতোবার তো বলেছি প্রভু, বাদশাহের রাজ্যে ডাকাতি করা আর চলে না। যা কড়াকড়ি শাসন—ও আমাকে না খেয়েই মরতে হবে। মরতে আমার ভয় নেই। কিন্তু এতোকাল এই যে পাপগুলো করেছি, তারই বড় ভয়। তাই ঠাকুরের কাছে আসি, যদি দয়া করে এই দীনের গতি করেন।

২য় শিষ্য। না, না, ঠাকুরের দর্শন এখন হবে না।

ভৈরব। সে আজ আর আমি শুনবো না। কতোদিন এসেছি—ঠাকুরের দেখা আজও পেলাম না। আজ আর আমি ছাড়ছিনা। এই আমি বসলাম। ঠাকুর এলে তাঁর পা দুখানা জড়িয়ে ধরবো। গতি আজ আমার করতেই হবে।

৩য় শিষ্য। তা' বোসো। কিন্তু কি হবে বলতে পারিনা।

ভৈরব। কেন হবে না ? তোমাদের মুখেই তো জগাই-মাধাইয়ের গল্প শুনেছি। তারা যদি উদ্ধার হ'তে পারে আমি হবো না কেন ?

[ভৈরব আশ্রমের একপার্শ্বে বসিয়া পড়িল। মীরার প্রবেশ।]

মীরা। এই কি শ্রীরূপ গোস্বামীর আশ্রম ? মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ শিষ্য শ্রীরূপ গোস্বামী!

১ম শিষ্য। হ্যাঁ দেবী।

মীরা। আমি তাঁর দর্শন-প্রার্থী।

২য় শিষ্য। কিন্তু দেবী, গুরুদেব নারীমুখ দর্শন করেন না।

মীরা। নারীমুখ দর্শন করেন না ?

২য় শিষ্য। হ্যাঁ দেবী।

মীরা। কিন্তু আমি যে তাঁর দর্শনলাভের জন্য সুদূর চিতোর থেকে পাগলের মতো ছুটে এসেছি—তাঁর উপদেশ-সুধা লাভ করে প্রাণের জ্বালা জুড়োতে—শ্রীহরির রহস্য জানতে—মোক্ষপথের সন্ধান পেতে।

৩য় শিষ্য। না দেবী, তা হয়না—তা' হবে না।

মীরা। কিন্তু এই বৃন্দাবনেই ব্রজনারীরা কি শ্রীকৃষ্ণের দয়ালাভ করে উদ্ধার হয়নি ? সেই শ্রীকৃষ্ণের পরম সেবক হয়ে—শ্রীরূপ গোস্বামীর এ কী বিপরীত বিধান!

[মীরা যুক্তকরে গান ধরিলেন।]

[গানে আকৃষ্ট হইয়া আবিষ্টের মতো শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রবেশ।]

শ্রীরূপ। কে ? কে ? কার সুধা-কণ্ঠের এই কীর্ত্তনামৃত শুনছি। আমার ধ্যান ভেঙে গেল। এ কী তীব্র আকর্ষণ!··· এ কী! কে তুমি ? নারী! আমার ব্রত ভঙ্গ করলে!

মীরা। (প্রণামান্তে) ব্রত ভঙ্গ করলাম! কী আপনার ব্রত প্রভু ?

যুগ যুগ ধরে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ কাহিনীর
আজ সর্ব্বযুগের শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপ...

"বহুৎ দিন হুয়ে..."

বর্ত্তমানে প্রদর্শিত হইতেছে:

হিন্দ * বসুশ্রী * বীণা
(শীততাপ নিয়ন্ত্রিত) (আমূলসংস্কৃত)

প্রত্যহ তিনবার প্রদর্শনী: ২-৩০মিঃ ৫-৪৫ মিঃ ও রাত্র ৯টায়

সেইসঙ্গে—বঙ্গবাসী * রামকৃষ্ণ * পিকাডিলি * জয়শ্রী * চম্পা * শ্রীকৃষ্ণ * স্বপ্না
(হাওড়া) (নৈহাটী) (সালকিয়া) (বরানগর) (ব্যারাকপুর) (জগদ্দল) (চন্দননগর)
মোহন টকীজ * জয়ন্তী * বর্দ্ধমান সিনেমা * শ্রীলক্ষ্মী * সন্তোষ টকীজ
(বহরমপুর) (রিসড়া) (বর্দ্ধমান) (কাঁচড়াপাড়া) (বেলিয়াঘাটা)
পি, সন * অশোক * প্যারাডাইস * চিত্রা * অজন্তা * লাইটহাউস
(মেটিয়াবুরুজ) (পাটনা) (গয়া) (মজঃফরপুর) (ভাগলপুর) (দ্বারভাঙ্গা)

জেমিনীর ছবি

শ্রীরূপ। আমি কৃষ্ণ-সাধনায় নিমগ্ন। প্রকৃতি-দর্শন আমার নিষেধ।

মীরা। কেন প্রভু?

শ্রীরূপ। সাধন-পথের বিঘ্ন।

মীরা। কৃষ্ণ-সাধনায় প্রকৃতি হলো বিঘ্ন—এই বৃন্দাবনে! এতদিন তো শুনিনি,—এই বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বিনা আর কোনো পুরুষ আছে প্রভু? শুধু এই জানি,—বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ তিনি—পরম পুরুষ সেই শ্রীকৃষ্ণ! আর সবই তো গোপী! পুরুষত্বের এই অভিমান নিয়ে—এ কেমনধারা কৃষ্ণ-সেবা—আমায় বলো—বলো প্রভু।

শ্রীরূপ। কে তুমি মা? জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে এই অন্ধের অন্ধত্ব দূর করে—আমার পুরুষত্বের সকল অভিমান চূর্ণ-বিচূর্ণ করে—কৃষ্ণ-সেবার সত্যপথের সন্ধান দিলে তুমি! বলো মা,—কে তুমি?

মীরা। জানি না কে আমি। শুধু এই জানি, আমি এতো করেও তাঁকে পাইনি। বুকে করে রেখেছি আমার গিরিধারিলালকে,—তবু মনে হয়, আমি তাঁকে পাইনি—তাঁকে পাইনি।

শ্রীরূপ। গিরিধারিলাল! তোমার বুকে গিরিধারিলাল! বুঝেছি মা,—তুমি কে। তুমি রাজরাণী মীরা। তোমার কাহিনী আজ কে না জানে! রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে—

মীরা। সে তো তুমিও ত্যাগ করেছো প্রভু। কেনা জানে—তুমি ছিলে বাংলার নবাবের দবীর খাস—রাজার চেয়েও বেশী ছিল তোমার প্রতাপ, তোমার ঐশ্বর্য্য। কিন্তু সব কিছু ত্যাগ করে তুমি পালিয়ে এলে এক নিশীথে যে পরমধনের সন্ধানে—তা কি তুমি পেয়েছো? আমায় বলো—বলো প্রভু।

শ্রীরূপ। তাঁকে আমি চাইনি মা।

মীরা। চাওনি!

শ্রীরূপ। না। তাঁকে পাওয়ার চেয়ে তাঁকে পাওয়ার সাধনায় বেশী আনন্দ মা। চিনি আমি হ'তে চাইনে,—চিনি আমি খেতে চাই।

মীরা। কিন্তু আমি যে চিনিই হতে চাই প্রভু। আমি তাঁকে চাই—আমি তাঁর মাঝে লীন হয়ে যেতে চাই। আমার এই গিরিধারিলাল—এইতো বুকে নিয়েই আছি, কিন্তু তবু মনে হয়, আমি ওঁকে পাইনি—ওঁকে পাইনি।

শ্রীরূপ। ব্যবধান তো তুমি দূর করোনি মা। তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ রচনা করেছে তোমার রাজরাণীর রূপসজ্জা। তোমার প্রাণের ঠাকুরের সঙ্গে তোমার প্রাণের মিলনের অন্তরায়—তোমার বক্ষের ঐ চন্দন-প্রলেপ—তোমার কণ্ঠের ঐ রত্নহার।

মীরা। (পুলক-মুগ্ধ) তুমি আমার গুরু—আমার মহাগুরু। তুমি আমায় সন্ন্যাস দাও—তুমি আমায় সন্ন্যাস দাও—তুমি আমায় সন্ন্যাস দাও।

[শ্রীরূপ গোস্বামীর পদতলে মীরা লুণ্ঠিতা হইলেন।]

শ্রীরূপ। (মীরাকে সস্নেহে উঠাইয়া) কিন্তু আমিতো তোমাকে সন্ন্যাস দিতে পারবো না মা। বিবাহিতা নারীর প্রথম পরম গুরু—স্বামী। তাঁকে ছেড়ে তুমি চলে এসেছো বটে, কিন্তু, তাতেই তো বন্ধন কাটে না মা। সেই বন্ধন থেকে তোমার মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র তিনিই—তোমার স্বামী।

মীরা। কিন্তু সে মুক্তি তিনি আমায় দেবেন না। তিনি যে আমাকে ভালবাসেন—প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন।

শ্রীরূপ। কৃষ্ণ-প্রেমের রহস্য তুমি তবে জানো না মা। কৃষ্ণ-প্রেম পরশ-পাথর। সেই পরশ-পাথরের প্রেম-স্পর্শে তোমার স্বামীও তোমারই পথে কতদূর এগিয়ে এসেছেন—সে-সংবাদ তো তুমি জানো না মা। আমি আশীর্ব্বাদ করি, আবার তোমাদের মিলন হবে—প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের

অন্তঃলীলা-ক্ষেত্র দ্বারকায়। তুমি সেই দ্বারকায় তোমার গিরিধারিলালের প্রতিষ্ঠা করে তোমার স্বামীর প্রতীক্ষা কর। সেইখানেই হবে তোমাদের পরমমুক্তি!

মীরা। ধন্য আমি! ধন্য বৃন্দাবন চাঁদ! ধন্য তোমার লীলা! দ্বারকায় বসে বাঁশীর সুরে তুমি আমায় ডাকছো। আমি শুনতে পাচ্ছি। আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি প্রভু। জয় গিরিধারিলাল! জয় গিরিধারিলাল!

[মীরার প্রস্থান।]

শ্রীরূপ। (মীরার উদ্দেশ্যে) কৃষ্ণচন্দ্রের বাঁশী নিশিদিন বাজে মা। কেউ শোনে, কেউ শোনে না। তুমি শুনেছো, তুমি ধন্য—তুমি ধন্য!

[শ্রীরূপ গোস্বামী আশ্রমের ভিতরে চলিয়া গেলেন। ভৈরবও প্রস্থানোদ্যত হইল।]

১ম শিষ্য। কিহে ভৈরব, চলে যাচ্ছো যে? তোমার কথা ঠাকুরকে বললে না?

ভৈরব। না, আর বলার দরকার নেই। আমি যা' চাইতে এসেছিলাম, তা' পেয়ে গেছি। ধন্য আমি—ধন্য আমি!

[ভৈরবের প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক
তৃতীয় দৃশ্য

[পার্ব্বত্য পথ। মীরার প্রবেশ। কৌশিক ও বৈষ্ণবগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছে।]

কৌশিক। শোনো মীরা দিদি! আমরা আর পথ চলতে পারছিনা। এ জায়গাটা বেশ। বৃন্দাবন থেকে এতোটা পথ এলাম, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। আজ এইখানেই আমাদের বিশ্রাম।

মীরা। কিন্তু বিশ্রাম নিলে দ্বারকায় পৌছতে দেরী হয়ে যাবে কৌশিকদা। না, না, চল—আমাদের বিশ্রাম হবে দ্বারকায়।

মীরার গান

তুম্হরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা
অব মোহি কুঁ তরসাও।
অব ছোড়্যা নহি বনৈ প্রভুজী
চরণকে পাশ বুলাও॥

[গান গাহিতে গাহিতে মীরা সদলবলে প্রস্থানোদ্যত এমন সময় পাহাড়ের উপর ভৈরবকে দেখা গেল। অনুচরদিগকে আহ্বান-সূচক ধ্বনি করিতেই চতুর্দ্দিক হইতে অনুচরগণ আসিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরিল। বালক-পুত্র সঙ্গে লইয়া ভৈরব পাহাড় হইতে নামিতে নামিতে বজ্রনির্ঘোষে হাঁক দিল।]

ভৈরব। দাঁড়াও।

কৌশিক। কে তোমরা?

ভৈরব। এই চণ্ড, বলে দে—কে আমি।

চণ্ড। জা'না না? যার নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়—ইনিই সেই ভৈরব ডাকাত।

ভৈরব। এ্যাঁ! খুব বললি। এই প্রচণ্ড, তুই বল্

প্রচণ্ড। ইনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ যম। এতোকাল ডাকাতি করেছেন, প্রবল-প্রতাপ বাদশাহও এঁর কিছু করতে পারেননি।

ভৈরব। হাঃ—হাঃ—হাঃ!

মীরা। কিন্তু—তোমাকে—তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—শ্রীরূপ গোস্বামীর আশ্রমে।

ভৈরব। (হাসিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেখানেও আমি যাই। অনেক পাপ করেছি কিনা—তাই। (চণ্ডকে) এই! কি কি পাপ করেছি—শুনিয়ে দেতো।

চণ্ড। তা এ্যাদ্দিনে কম করে হাজারখানেক লোক 'কালী' ব'লে বলি দিয়েছেন।

প্রচণ্ড। ছেলের সামনে বাপ, স্ত্রীর সামনে স্বামী—সব কচুকাটা করেছেন—চোখে এক ফোঁটা জল আসেনি!

চণ্ড। মা-র বুক থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে আছড়ে মেরেছেন—হাত কাঁপেনি।

ভৈরব। ঠিক, ঠিক! এই যে আমার ব্যাটা,—দরকার হলে এটাকেও সাবড়ে দিতে পারি! হাঃ—হাঃ—হাঃ! (পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া) কি বলিস্ ব্যাটা?

মীরা। থামো, থামো, থামো। তোমরা কী চাও—আমার কাছ থেকে তোমরা কী চাও?

ভৈরব। হাঃ—হাঃ—হাঃ। মেবারের রাজরাণী জিজ্ঞাসা করছেন, ভৈরব ডাকাত তাঁর কাছে কি চায়। (মীরাকে দেখাইয়া) ঐ দেহেই তো রয়েছে একটা রাজভাণ্ডার।

[ইহা শুনিয়া মীরা একে একে অলঙ্কারগুলি দেহ হইতে খুলিয়া ডাকাতদের সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। এক

বর্ত্তমানের সর্ব্বজনচিত্তজয়ী অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন

দুই নারী নয়, নারীর দুই রূপ ঃ জননী ও দামিনীরূপে
সুমিত্রা দেবী

এক ডাকাত এক এক লম্ফ দিয়া ঐগুলি কুড়াইতে লাগিল।]

কৌশিক। দেরী করো না দিদিভাই, দেরী করো না।

১ম বৈষ্ণব। ও পাপ যতো তাড়াতাড়ি হয় বিদায় হোক্।

ভৈরব। হাঃ—হাঃ—হাঃ।

২য় বৈষ্ণব। (কাঁপিতে কাঁপিতে) হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

[এতোক্ষণে মীরার দেহ অলঙ্কার-বর্জ্জিত হইয়াছে।]

মীরা। এইবার আমাদের পথ ছাড়ো।

ভৈরব। হাঃ—হাঃ—হাঃ! এইবার আমাদের পথ ছাড়ো! আসল ধন বুকে পুরে রেখে—আমাদের পথ ছাড়ো। আমাদের খোকা পেয়েছো—না? হাঃ—হাঃ—হাঃ। এই চণ্ড, হা করে দেখছিস কি? ধর—কেড়ে নে বুকের ওই পেটিকাটা।

[চণ্ড মীরার দিকে রুখিয়া গেল।]

মীরা। না, প্রাণ গেলেও এ আমি দিতে পারবো না।

ভৈরব। কি আছে ওতে?

মীরা। এ আমার পরম ধন—এ আমার যথাসর্ব্বস্ব। প্রাণ গেলেও এ আমি দিতে পারবো না।

ভৈরব। তবে প্রাণই যাক্। চণ্ড!

মীরা। না—না—না।

[মীরা নিজবক্ষ চাপিয়া ধরিলেন। চণ্ড মীরাকে ব্যাঘ্র-লম্ফনে আক্রমণ করিল।]

মীরা। গিরিধারিলাল! গিরিধারিলাল!

[মীরা বিগ্রহটি নিজবক্ষে সজোরে চাপিয়া ভূপতিতা হইলেন। কৌশিক প্রভৃতি বৈষ্ণবেরা বাধা দিতে গেলে অনুচরেরা উদ্যত ছুরিকা লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিল। উহারা ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করিল। এইভাবে অনুচরেরাও নিষ্ক্রান্ত হইল। ইতিমধ্যে চণ্ড মীরার গলদেশ হইতে বলপূর্ব্বক পেটিকাটি খুলিয়া লইয়া উহা উন্মোচন করিতে উদ্যত হইয়াছে।]

ভৈরব। এই! আমার হাতে দে।

[ভৈরব চণ্ডের নিকট হইতে পেটিকাটি লইয়া উন্মোচন করিল এবং গিরিধারিলালের বিগ্রহটি বাহির করিল।]

ভৈরব। এ কী! হীরা-জহরৎ কই? এ যে এক টুকরো পাথর। হাঃ—হাঃ—হাঃ! পাগলা না ক্ষ্যাপা, এই ওর যথাসর্ব্বস্ব!

ভৈরব-পুত্র। বাবা, ঐ পাথরের ঠাকুরটা আমায় দাও। আমি খেলা করবো।

ভৈরব। নে ব্যাটা, নে—ভাগ্।

[বালকটি বিগ্রহ লইয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল।]

ভৈরব। আমার যা পাবার, তা' আমি পেয়েছি। চল্ চণ্ড,

আজকের শিকার ভালোই হলো। এখন বুঝলি তো,—সাধুসন্তদের আশ্রম ধর্ম্মশালা— এই সব ধর্ম্মের জায়গায় কেন আমি যাই। ওরে, এতে ইহকাল-পরকাল—দু'কালেরই কাজ হয়।

[চণ্ড-সহ ভৈরবের প্রস্থান। ক্ষণকাল পরে রক্তাক্ত মীরা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। গিরিধারিলালকে বক্ষে না দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।]

মীরা। গিরিধারিলাল! গিরিধারিলাল! তোমার জন্যে আমি সব ছেড়ে চলে এলাম, আর তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে ঠাকুর। একটু দয়া হলো না তোমার পাষাণ-প্রাণে! কিন্তু তোমায় যদি আমি ফিরে না পাই, এ বৃথা জীবন আমি রাখবো না—রাখবো না প্রভু।

[মীরা গান গাহিতে গাহিতে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন।]

পট পরিবর্ত্তন

[ধীরে ধীরে মঞ্চ আলোকিত হইতে লাগিল। ক্লান্ত মীরা অসম্বৃতা চরণে পূর্ব্বোক্ত গীত ক্ষীণকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে পাহাড় হইতে নামিতেছেন। একটি শুষ্ক ঝরণার নিকটে আসিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। পার্ব্বত্য রমণীগণ কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছে।]

১মা রমণী। ওলো পা চালিয়ে চল্। জল আনতে হবে সেই এক কোশ পথ থেকে।

২য়া রমণী। আর পারিনি বাবা! রোজ রোজ এতোখানি পথ ভেঙে দুবেলা জল আনা। দেবতার কাছে কী যে অপরাধ হলো, বাড়ীর সামনে ওই ঝরণা গেল শুকিয়ে।

৩য়া রমণী। নিজেও শুকিয়ে গেছে, আমাদেরও শুকিয়ে

মারছে। তা' যেতে যখন হবেই চল্—পা চালিয়ে চল্।

২য়া রমণী। তাড়া তো খুব দিচ্ছিস্। যাবো যে—সর্দার-গিন্নী কই ?

১মা রমণী। তার কথা আর বলিস্‌নে। রাজরাণীর গয়না তার গায়ে উঠেছে। ধরাকে সরাজ্ঞান করছে ভাই।

৩য়া রমণী। তবু বুঝতাম, আমাদের কত্তাদের মতো যদি গতর-খাটানো পয়সায় হতো। ডাকাতি করে গয়না পরার চেয়ে গলায় দাড়ি দিয়ে মরা ভালো।

২য়া রমণী। যা বলেছিস্ ভাই। চুপ, চুপ—ঐ এসে পড়েছে।

[মীরার অপহৃত-অলঙ্কার পরিহিতা ভৈরব-পত্নী ধূমাবতীর কলসী কক্ষে গজেন্দ্র-গমনে প্রবেশ।]

ধূমাবতী। কিলো, তোরা সব দাঁড়িয়ে যে ?

১মা রমণী। এই তোমার কথাই হচ্ছিল দিদি। সত্যি ভাই, রাণীর গয়না পরে কী জেল্লাই খুলেছে তোমার !

ধূমাবতী। হয়েছে—হয়েছে চল্ এখন।

[ধূমাবতী অগ্রসর হইল। অন্য সকলে তাহার পশ্চাদ্‌গমন করিল। ধূমাবতী হঠাৎ মীরাকে দেখিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল।]

ধূমাবতী। ওমা ! এখানে পড়ে কেলো ?

সকলে। তাইতো তাইতো।

১মা রমণী। এ যে ভিন্‌দেশী। মরে গেছে নাকি ?

২য়া রমণী। না, না, মরেনি। মূর্চ্ছো গেছে। জল আন, জল আন, একটু জল।

ধূমাবতী। জল আবার এখানে কোথায় পাবো ?

[হঠাৎ শুষ্ক ঝরণা প্রবাহিতা হইল।]

ধূমাবতী। ওমা, ত্মাখ-ত্মাখ, একী অঘটনলো ! এ্যাদ্দিনকার শুকনো ঝরণায় জল নামলো। এ নিশ্চয়ই কোনো দেবী।

[একজন রমণী ছুটিয়া জল লইয়া আসিয়া মীরার চোখে-মুখে ছিটাইয়া দিয়া তাহার চেতনা আনিবার চেষ্টা করিল। মীরা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন।]

মীরা। গিরিধারিলাল ! গিরিধারিলাল ! তুমি কোথায় ?

ধূমাবতী। ওলো, কথা কয়েছে—কথা করেছে। (মীরার প্রতি) কে মা তুমি ?

মীরা। গিরিধারিলাল ! গিরিধারিলাল !

ধূমাবতী। ওলো, তোরা ছুটে যা। কিছু দুধ, কিছু ফলমূল নিয়ে আয়। দেবীর সেবা করতে হবে।

[পার্ব্বত্য রমণীগণ ছুটিয়া চলিয়া গেল।]

ধূমাবতী। কে মা তুমি ?

মীরা। আমি ভিখারিণী মা।

ধূমাবতী। না মা। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, কোনো

রাজরাণী। দেহে তোমার আঘাতের চিহ্ন দেখছি। বুঝেছি মা,—সে রাজরাণী তবে তুমি। (নিজদেহ হইতে অলঙ্কার খুলিতে খুলিতে) এই নাও মা তোমার অলঙ্কার (অলঙ্কারটি মীরার সম্মুখে ধরিয়া) দেবী তুমি। আমাদের ক্ষমা কর।

মীরা। না, না, তোমরা আমার পরম বন্ধু। আমার অলঙ্কারের বোঝা তোমরা নামিয়ে দিয়েছো। অলঙ্কার তোমরা নাও। শুধু আমার গিরিধারিলালকে আমায় দাও।

ধূমাবতী। গিরিধারিলাল! সে আবার কি মা?

মীরা। গিরিধারিলাল—সে-ই আমার সব—আমার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ।

[পূর্ব্বোক্ত পার্ব্বত্য রমণীগণ দুধ ও ফলমূল লইয়া আসিয়া মীরার সম্মুখে রাখিল।]

মীরা। বৃথা—বৃথা—এসব তোমরা বৃথা এনেছো। আমার গিরিধারিলালের এখনও সেবা হয়নি।

ধূমাবতী। (সঙ্গিনীদের প্রতি) এর কথা তো কিছু বুঝতে পারছিনা ভাই। চল্—সর্দ্দারকে খবর দিই।

[ধূমাবতী সদলবলে চলিয়া গেল।]

মীরা। গিরিধারিলাল! গিরিধারিলাল! আর কতোকাল—আর কতোকাল— আমায় তুমি ভুলে থাকবে ঠাকুর?

[অদূরে বংশীধ্বনি শোনা গেল। ভৈরবের বালক-পুত্রের প্রবেশ। পরম বিস্ময়ে মীরাকে দেখিতে দেখিতে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

ভৈরব-পুত্র। ও সেই তুমি!···তুমি খাচ্ছো না কেন? খাও।

মীরা। কেমন করে খাবো? আমার ঠাকুরের যে এখনও খাওয়া হয়নি। (ক্ষণকাল সানুরাগে বালকটিকে নি[illegible] [illegible] এসো—আমার কাছে [illegible] তুমি [illegible]

ভৈরব-পুত্র। [illegible]রে! [illegible] খাবো? [illegible] বন্ধন হইতে বিগ্রহটি বাহির করিয়া) এই যে—আমার ঠাকুরের এখনও খাওয়া হয়নি।

মীরা। (পরমানন্দে উচ্ছসিত হইয়া) এ কী! গিরিধারিলাল—তুমি। দাও—দাও—আমায় দাও।

ভৈরব-পুত্র। বারে! তোমায় দিলে আমি কি নিয়ে থাকবো?······তুমিও এখানে থাকো। আমরা দুজনেই ঠাকুরের পুজো করবো।

মীরা। ওরে, তাই হোক্। আয়—আয়—তুইও আমার বুকে আয়। (বিগ্রহসহ বালকটিকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া) জয় গিরিধারিলাল! জয় গিরিধারিলাল!

ভৈবর-পুত্র। গিরিধারিলাল? বাঃ কী মিষ্টি নাম! জয় গিরিধারিলাল!

মীরা ও ভৈরব-পুত্র। (উভয়ে মিলিতকণ্ঠে) জয় গিরিধারি-লাল! জয় গিরিধারিলাল!

তৃতীয় অঙ্ক
চতুর্থ দৃশ্য

[দ্বারকায় মীরাবাঈ প্রতিষ্ঠিত রণছোড়জী গিরিধারিলালের মন্দির-অভ্যন্তরস্থ নাট-মন্দির। বেদীর ওপর গিরিধারিলালের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। কাল—রাত্রি। নাট-মন্দিরের প্রাঙ্গণে কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ ভক্ত বসিয়াছিল। কেহ কেহ বাহির হইতে আসিয়া উহাদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিল। একজন বিদেশী যুবকও সেই-সঙ্গে তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সাধারণ বেশ-পরিহিত চিতোর-সেনাপতি খড়গসিংহ।]

খড়গ। দ্বারকায় মীরাবাঈ-প্রতিষ্ঠিত রণছোড়জীর মন্দির কি এইটি?

১ম ভক্ত। হ্যাঁ ভদ্র। আপনি বুঝি নবাগত কোন বিদেশী?

ডি ল্যুক্স ফিলম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃর

সানন্দ শারদীয় সমাচার,

সমারোহে চলছে —

এম·পি·

অগ্নি পরীক্ষা

পরিচালনা: অগ্রদূত

সুর: অনুপম ঘটক

শ্রেঃ সুচিত্রা · উত্তম · চন্দ্রাবতী · যমুনা সিংহ

সুপ্রভা · জহর · কমল · শিখা · অনুপ

উত্তরা পূরবী উজ্জলায় ... ও

দেশের আরো ১ জায়গায়

আর আসছে —

এম·পি·র অগ্রদূত পরিচালনায় আর দুটি

সূর্য্যগ্রাস

শ্রেঃ অনুভা · বিকাশ · উত্তম

কাহিনী: সুশীল জানা

সবার উপরে

কাহিনী: নিতাই ভট্টাচার্য্য

আরোরা ....

পরিশোধ

মঞ্জু দে · অনুভা গুপ্তা

ছবি · ধীরাজ · পাহাড়ী

জহর ও বাবুয়া

কাহিনী ও চিত্রনাট্য: প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরিচালনা ও প্রযোজনা: সুকুমার দাশগুপ্ত ·

সুর: রবীন চট্টোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য পরিষদ ....

রিক্সাওয়ালা

সুর: সলিল চৌধুরী

পরিচালনা: সত্যেন বসু

শ্রেঃ তৃপ্তি মিত্র

আই·এন·এ ....

বাংলার বীর

হাম্বীর

পরিচালনা: শ্যাম দাস

শ্রেঃ মঞ্জু দে · মিত্রা বিশ্বাস

অহীন্দ্র · পাহাড়ী · ভানু

নীলিমা দাস .....

'অগ্রগামী'দের পরিচালনায়

এস·সি·প্রোডাকসন্সের আগন্তুক!

দেবকী বসু প্রোডাকসন্সের একটি ছবি!

রূপজ্যোতি ...

অভিনয়ের শেষে

বোম্বায়ের বহুখ্যাত অনিল বিশ্বাসের পরিচালনায় সমৃদ্ধ হবে এর সঙ্গীত

কাহিনী: মনোজ বসু

পরিচালনা: নির্মল দে

প্রথম বাংলা ছবি

খড়গ। হ্যাঁ ভদ্র। আমি চিতোরবাসী। প্রাতঃ-স্মরণীয়া এই মীরাবাঈ একদিন আমাদেরই রাজলক্ষ্মী ছিলেন।

২য় ভক্ত। আপনি তাঁর দর্শন-প্রার্থী ?

খড়গ। হ্যাঁ ভদ্র।

২য় ভক্ত। আপনি আসন গ্রহণ করুন। তিনি এখনই এখানে আসবেন—ভজনের এই আসরে।

খড়গ। আমার সঙ্গে আরো দু'একজন যাত্রী আছেন।

১ম ভক্ত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁদেরও নিয়ে আসুন।

[খড়গসিংহ বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং লোকজনের এই আসা-যাওয়ার মধ্যে তিনি যখন ফিরিলেন, দেখা গেল তাঁহার সহিত আসিয়াছেন বিধবা মহারাণী চণ্ডীবাঈ। তিনি মহিলাদের মধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন। খড়গসিংহ পুরুষদের সঙ্গে বসিলেন।]

[সাধিকার বেশধারিণী মীরা ভজন গাহিতে গাহিতে সেখান আসিলেন। সেইসঙ্গে বন্দনা-নৃত্যের ছন্দে আসিল গঙ্গা, যমুনা ও অন্যান্য সহচরীগণ। মীরা আসন গ্রহণ করিবার পর গঙ্গা, যমুনা ও সহচরীগণ রণছোড়জীর সম্মুখে বন্দনা-নৃত্য সুরু করিল। মীরার ভজনে ভক্তবৃন্দ যোগদান করিল।]

[ভজন-শেষে সকলে বিগ্রহ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল—গঙ্গা, যমুনা এবং সহচরীগণও। মীরাও শেষে যাইবার জন্য উঠিয়াছেন, এমন সময় খড়গসিংহ ডাকিলেন।]

খড়গ। দেবী !

মীরা। কে আপনি, ভদ্র ?

খড়গ। (মীরার নিকটে [illegible]সিয়া) আমায় তুমি চিনতে পারছো [illegible] আমি খড়গসিংহ [illegible] [illegible] তোমা[illegible] দিয়েছিল—তোমাকে বিষ দিয়েছিল।

মীরা। বিষ নয়,—তুমি দিয়েছিলে আমায় অমৃত।

খড়গ। আমি দিয়েছিলাম বিষই। তোমার স্পর্শে সেই বিষই হয়েছিল অমৃত। সেই থেকে অনুতাপের বিষে আমি নিয়ত দগ্ধ হচ্ছি দেবী। দয়া কর দেবী—আমায় ক্ষমা কর।

[নতজানু হইলেন]

মীরা। (হাত ধরিয়া তুলিয়া) শান্ত হও—শক্তি লাভ কর। তোমরা আমার পরম বন্ধু···বহুদিন পরে তোমাকে দেখে আজ সবার কথাই মনে পড়ছে। আমার দয়াময় শ্বশুর—লোকমুখে শুনেছি,—তিনি আর নেই। মহারাণীমা-র কথা মনে পড়ছে। বধূ হয়েও আমি তাঁর সেবা করতে পারিনি—শুশ্রূষা করতে পারলাম না। কতো অপরাধই না আমার জমেছে তাঁর পায়ে।

[চণ্ডীবাঈ পার্শ্বের অলিন্দ হইতে ইতিমধ্যে উঠিয়া আসিয়া মীরার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন]

চণ্ডী। মা ! আমি এসেছি।

মীরা। এসেছেন ! (পদ ধারণ করিয়া) দাসীকে ক্ষমা করুন মা।

চণ্ডী। (মীরাকে উঠাইয়া) তুমি কোন অপরাধ করোনি মা। কিন্তু আমিও কোন অপরাধ করিনি তোমার কাছে। যখন যা' কর্তব্য বুঝেছি করেছি। সেজন্যে আমার কোন অনুতাপ নেই। জীবনে আমার শুধু এই দুঃখ, তোমাকে যখন চিনলাম, ঠিক তখনই তোমাকে হারালাম মা। আমি তাই এসেছিলাম তোমাকে আবার আমার সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। যাবে মা তুমি ?

মীরা। মা, আপনার পায়ে পড়ি—এ আদেশ আপনি আর আমায় করবেন না।

চণ্ডী। বেশ, তাই হবে। আমার এই শেষ-জীবনে এই কর্তব্যটুকুই বাকী ছিল, তা' আজ শেষ হলো।

মীরা। আপনি আমার আশীর্ব্বাদ করুন মা, আমার যেন ইষ্টলাভ হয়।

চণ্ডী। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি মা শান্তিলাভ কর, যে শান্তি আজ আমাদের কারো মনে নেই। যে আশীর্ব্বাদ তুমি চাইছো মা সে আশীর্ব্বাদ তোমায় করতে পারে শুধু একজন—সে-ও এসেছে। আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[চণ্ডীবাঈয়ের প্রস্থান।]

মীরা। (খড়গসিংহের প্রতি) আমার স্বামী!

খড়গ। তার কথা কি তুমি এখনো মনে রেখেছো পাষাণী?

মীরা। কী করে তাঁকে ভুলি? কী বন্ধনে যে তিনি আমায় বেঁধেছেন, হয়তো তা' তিনি নিজেও জানেন না। আমি যে তাঁরই প্রতীক্ষায় রয়েছি। যদি তিনি এসেই থাকেন, মন্দিরে না এসে বাইরে কেন খড়গসিংহ?

খড়গ। ঐ তিনি এসেছেন।

[কুম্ভের প্রবেশ ও খড়গসিংহের প্রস্থান।]

কুম্ভ। প্রবেশ-অধিকার আমার আছে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল দেবী। ক্ষমার যোগ্য তো আমি নই। স্বামী হয়েও নির্য্যাতিতা রাজলক্ষ্মীকে রাজগৃহে আমি রক্ষা করতে পারিনি। আর এ-ও জানি, তোমারই মতো লাঞ্ছিতা সীতা কুলপ্রথার অত্যাচারে অগ্নি-প্রবেশের অভিমানে প্রবেশ করেছিলেন পাতালে।

মীরা। স্বামী!

কুম্ভ। ক্ষমাসুন্দরের আরাধিকা তুমি। ক্ষমা কর দেবী আমাদের সকল অপরাধ। মহারাণার অন্তিম অনুরোধ—প্রজাপুঞ্জের সকরুণ অনুনয়—আমার জননীর আন্তরিক বাসনা—আমার আর্ত্ত প্রার্থনা—ফিরে চল দেবী। চিতোর-লক্ষ্মী! চিতোরে ফিরে চল।

মীরা। কিন্তু প্রার্থনা যে আমারও আছে স্বামী—তোমার কাছে। আমার প্রার্থনা—প্রজাপুঞ্জের কাছে নয়—চিতোরের কাছে নয়—তোমার কাছে—শুধু তোমার কাছে—আমার স্বামীর কাছে।

কুম্ভ। প্রার্থনা! আমার কাছে? কী সে প্রার্থনা, মীরা?

মীরা। মুক্তি—আমায় তুমি মুক্তি দাও স্বামী।

কুম্ভ। মুক্তি!

মীরা। হ্যাঁ মুক্তি! গিরিধারিলালের কৃপায় সংসারের সকল বন্ধন-পাশ আমি একে একে মোচন করে মোক্ষের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ। কতো মাথা খুঁড়েছি, কিন্তু সে দ্বার আমার খুলছে না।

কুম্ভ। মীরা!

মীরা। মোক্ষের দুয়ারে এসে আবার আমি ফিরে যাবো স্বামী—সেই সংসার-দুঃখ-গহনে? দয়া কর স্বামী—দয়া কর।

কুম্ভ। কিন্তু এই যে সংসার—এ-ও কি সেই জগৎস্বামীর লীলা-নিকেতন নয় মীরা?

মীরা। এটা তাঁর মায়ার খেলা-ঘর—শুদ্ধির সোপান। এই সোপান অতিক্রম করে আজ আমি এসেছি মুক্তির দ্বারে। এসে দেখছি,—সে দ্বারের দ্বারী তুমি—আমার স্বামী। তোমার অনন্ত প্রেমে তুমি আমাকে সংসারে বেঁধে রেখেছো। এ-বন্ধন তুমি নিজ হাতে ছিন্ন না করলে আমি আমার পরম দেবতার দেউলে প্রবেশ করতে পারছি না।

কুম্ভ। তোমার পরম দেবতার মন্দিরে তোমাকে নিয়ে যাবো বলেই আমি এসেছি প্রিয়া। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে তোমারই জন্মে চিতোরে গড়ে রেখে এসেছি—তোমার গিরিধারিলালের মন্দির।

মীরা। না, না, আর মন্দির নয়—দেবালয় নয়—আর কোন বিগ্রহও নয়। জীবনের সব তীর্থ শেষ করে আমি এসেছি বৈকুণ্ঠের দ্বারে। কিন্তু তার চাবি-কাঠি দেখছি তোমারই হাতে। যে অনন্ত প্রেমে তুমি আমায় ধরে রেখেছো, সেই অনন্ত প্রেমে তুমি আমায় মুক্তি দাও—দুয়ার আমার খুলে দাও খুলে দাও স্বামী।

কুম্ভ। মীরা, আমার মুক্তি? আমার মুক্তি কোথায় মীরা?

মীরা। আমাকে মুক্তি দিলেই তোমারও তো আর কোন বন্ধন থাকবে না স্বামী।

কুম্ভ। বেশ···কিন্তু এ মুক্তি দেওয়া যে কতো কঠিন, তুমি তা জানো না মীরা। তবু তাই হোক। দেবী! মুক্ত তুমি।

[মীরা কুম্ভের চরণে প্রণতা হইলেন। কুম্ভ তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।]

কুম্ভ। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ইষ্টলাভ হোক্, মোক্ষলাভ হোক্।

[মীরা উঠিয়া গিরিধারিলালের বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া ভজন গাহিতে আরম্ভ করিলেন। কুম্ভ সাশ্রুনেত্রে যুক্ত-করে নতজানু হইয়া সেই গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।]

মীরার গান

প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো॥
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজন মনোহর।
সংসারসাগর মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্গুরো॥
কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দং মাং মামুদ্ধর মাধব॥

[গীত-শেষে মীরা সমাধিস্থা হইলেন। মীরাকে আর দেখা গেল না; তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার আসনস্থল পুষ্প-বেদীকায় রূপান্তরিত হইয়াছে।]

কুম্ভ। মীরা! মীরা!

[সমগ্র মন্দিরে ধ্বনি উঠিল, "দেবী! দেবী! দেবী!"]

[যবনিকা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে উপরোক্ত স্তবের দুই চরণ শোনা যাইতে লাগিল।]

যবনিকা

কাহিনী ও তার রূপায়ণ

বিমল রায়

চিত্রের 'সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু' হোল কাহিনী—একথাটা প্রায়ই বলতে শুনি। সাধারণে বলে থাকেন যে আমাদের দেশের ছবিগুলো সবই একঘেয়ে, একই আদলে গড়া, বৈচিত্র্যহীন, নির্জীব—কারণ তাতে ভালো কাহিনীর অভাব। অবশ্য ভালো ছবির পক্ষে কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি কোনো বিরূপ মত পোষণ করি না, আর কিছু না হোলেও শুধু এই কারণেই যে, যে কোনো ছবিরই মূল বক্তব্য হলো কোনো-না-কোনো কাহিনীর বর্ণন। তাছাড়া এই ধরণের সমালোচনা ও মন্তব্য বাঞ্ছনীয়, এ থেকে আমাদের চিত্রের গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা সচেতন হোতে পারি এবং উন্নতির জন্যে নানাভাবে প্রস্তুত হতে পারি। তবে এ-ও বলতে বাধ্য হোচ্ছি যে এই ধরণের মন্তব্যগুলি আপাতদৃষ্টিতে সত্য ব'লে মনে হলেও আসলে কিন্তু অর্দ্ধ সত্য, চিত্রের সম্যক উপলব্ধির পথে অন্তরায়স্বরূপ এবং সেই কারণেই ক্ষতিকর। স্বীকার করি—ভালো ছবির মাপ-কাঠি অবশ্য ভালো কাহিনী, কিন্তু যে কোনো চিত্রসংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বলবেন যে উৎকৃষ্ট কাহিনী সংগ্রহের সঙ্গে চিত্র নির্মাণের শুধুমাত্র অর্ধেক সমস্যারই সমাধান হোয়ে থাকে। বাকিটুকু, আমার মনে হয়, অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। নির্বাচিত কাহিনীর সুষ্ঠু চিত্ররূপ কিভাবে দেওয়া সম্ভব? কি ভাবেই বা কেতাবের পাতায় পাতায় অজস্র শব্দ সম্ভারের রূপায়ণ সম্ভব? এই সমস্যাটিকেই আমরা বলে থাকি 'ট্রিটমেন্ট' বা চিত্রনাট্যে কাহিনীর প্রযুক্ত বিন্যাস।

আমাদের দেশের চিত্র-নির্মাণ ক্ষেত্রে চিত্রনাট্যবিন্যাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে চিত্রশিল্প ও তার মাধ্যম, মঞ্চ ও নাটক কিংবা সাহিত্য রচনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের এবং এর আইন-কানুন ও অনুশাসনগুলিও ভিন্ন জাতের। এখানে দৃশ্যমান চিত্র ও তার সঙ্গে মানসিক সংযোগ মঞ্চ অপেক্ষা স্থান-কালের বিস্তৃতির দিক থেকে অনেক ব্যাপক, শ'তিনেক পৃষ্ঠার একখানি উপন্যাসের চেয়ে মূল কাহিনীকে অনেক সংক্ষিপ্ত ও রসঘন ক'রে ঘন্টা দু'একের উপযোগী ক'রে তুলতে হয় এখানে।

আমি অবশ্য টেক্‌নিক্ বাতিকগ্রস্ত নই। 'ট্রিক' ও 'বুম্-শট্' কিংবা ক্যামেরার কোনো উদ্ভট এ্যাঙ্গেলের প্রতি আমার কোনো পক্ষপাত নেই, কিংবা নেই কোনো মোহ সেই সব [illegible]তি-দ্রুত স্নায়ু-পীড়াদায়ক 'কাটিং'-এর ওপর যা দেখে দেবকীকুমার বসু রসিয়ে বলেছেন—'মনে হয় যেন জীবনটা [illegible] অবিরাম ঘোড়[illegible]

তবে ফিল্মের প্রতিটি ইঙ্গিতে যে আঙ্গিক কৌশল জড়ানো রয়েছে সেই বাস্তব সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পাশ্চাত্য দেশের চিত্র-নির্মাতাদের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা হোল টেক্‌নিক্‌কে আয়ত্তাধীন ক'রে অথচ টেকনিক-সর্বস্ব না হ'য়ে শিল্পের মানবিক মর্মটুকুকে টেক্‌নিকেরই মাধ্যমে চিত্রে ফুটিয়ে তোলা। টেক্‌নিক যেখানে প্রধান সেখানে শিল্পের সূক্ষ্ম কারুকলা থেকে যায় অন্তরালে। আমাদের পক্ষেও টেক্‌নিক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমার মনে হয় যত ভালো কাহিনীই নির্বাচিত হোক না কেন তার রসোত্তীর্ণ রূপায়ণ তখনই সম্ভব যখন তার চিত্র-নাট্য সংযোজনায় চিত্রাঙ্গিকের বিশেষ বিশেষ উপকরণ ও তার সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। কাহিনীকে ছোট করা আমার অভিপ্রায় নয়, বরং ঠিক তার উল্টো। বর্তমানে চিত্র-প্রযোজকদের মধ্যে সত্যিকার ভালো কাহিনী সন্ধানের যে প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে আমি শিল্পের সমৃদ্ধি ও শুভদিনের সূচনা দেখতে পাচ্ছি। এই আখ্যানের তাগিদে আজ আমরা নিজের দেশের দিকে দৃষ্টি দিতে

প্রথম শ্রেণীর ফরাসী ও ইতালীয় চিত্র যেমন 'বাইসিকল্ থিফ্', 'ওপন্ সিটি,' 'লা এঁ ফাঁ দ্য প্যারাদি' ইত্যাদি ছবি-গুলির নজির দেখানো চলে যেগুলি বিচিত্র কাব্যিক সুষমায় মণ্ডিত হয়েও আঙ্গিক কারসাজীর দিক থেকে অনুল্লেখ্য। অন্যদিকে আবার বিপরীত দৃষ্টান্তও বিরল নয়। হলিউডের [illegible]পরিচিত ছবি আছে যেগুলি আঙ্গিক উৎকর্ষের ঔজ্জ্বল্যে [illegible] চোখ ধাঁধিয়ে দিলেও [illegible]পদের শূন্যতায় নিরুত্তাপ।

সুরু ক'রেছি, নজর দিয়েছি দেশের অগণিত জনসাধারণের ওপর। আর তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে আবার গ্রহণ ক'রতে সুরু ক'রেছি সেই সব প্রতিভাবান লেখকদের কাহিনী যাঁদের অমর লেখনী দেশবাসীর বিচিত্র জীবনযাত্রার মর্মস্পর্শী চিত্র রচনা ক'রে গেছে।

এখানে স্বভাবতই একটি গুরুতর প্রশ্নের উদ্ভব হয়। আমার মতে, যাঁর কাহিনী আমরা গ্রহণ করি তাঁর সাহিত্যিক

মূল্য যত বেশী হয় ততই বাড়ে আমাদের দায়িত্ব, চিত্র-রূপায়ণে তাঁর রচনার মর্যাদা রক্ষার। লেখকের প্রতি বিশ্বস্ততা ব'লতে আমরা কি বুঝি? এর অর্থ কি তাঁর রচনার চিত্রানুবাদ? ঘটনা, চরিত্র ও দৃশ্যাদির অবিকল অনুকৃতি? এই যান্ত্রিক ও অনমনীয় অনুকরণের মাধ্যমে সত্যিই কি তাঁর কাহিনীর মর্ম তার ঐশ্বর্য-সম্ভার ও নাটকীয় বৈশিষ্ট্য দর্শকের হৃদয়গোচর করা সম্ভব? দেশের স্বনামধন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের কাহিনীর চিত্ররূপ নিয়ে আমার প্রচেষ্টা সম্পর্কে কিছু ব'লতে আমি নারাজ, কারণ আর যাই হই তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচারক আমি নই। দৃষ্টান্ত ও এই সমস্যার সতর্কবাণী হিসেবে হলিউডের সাম্প্রতিক কয়েকখানি ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে যেগুলি বহুলপরিচিত লেখকের বহুপঠিত কাহিনী অবলম্বনে তোলা। 'ফ্রম হিয়ার টু ইটার্নিটি' ও 'মুলা রুজ্'-এর মত ছবির কথা ব'লবো না কারণ এগুলি কাহিনী-বর্ণনের রীতি-পথ থেকে বিচ্যুত, আরও বিচ্যুত মূল গ্রন্থের মর্ম ও উদ্দেশ্য থেকে। সেক্সপীরীয় সৃষ্টির চিত্রনাট্য গ্রন্থনের দিক থেকে লরেন্স অলিভিয়ারের 'হ্যামলেট' ও 'জুলিয়াস সিজার'-এর নব্য-সংস্করণের তফাৎটুকু শিক্ষনীয়। প্রথমোক্তটি, ব'লতে কি, সেক্সপীয়ার-বিশেষজ্ঞদের সংস্কার ও প্রচলিত ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই বলে চিত্রাঙ্গিকের বিপুল সম্ভাবনার এই যে সুষ্ঠ ও সুচিন্তিত ব্যবহার লরেন্স অলিভিয়ার দেখিয়েছেন তা' কি অস্বীকার করা চলে? মানব মনের বেদনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র-রূপায়ণে মূলের মর্ম ও গভীরত্বে নূতনতার আমদানীতে আঙ্গিকের এমন মৌলিক ও পরিকল্পিত প্রয়োগের [illegible] কার না বিস্ময়ের উদ্রেক [illegible] শিক্ষনীয় [illegible]

সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

★

বাংলার ছায়াচিত্র-জগতে যে-দু'টি নাম আজ সবচেয়ে বেশী শোনা যায় তা হ'লো সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার। বাংলার এই দুই অভিনয়-শিল্পী খুব অল্পদিনের মধ্যেই দর্শকচিত্ত জয় করেছেন তাঁদের অভিনয়-নৈপুণ্যে। বহু ছবিতে এঁরা দু'জনে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন—তাই বোধহয়, রাজকাপুর-নার্গিসের মতই এঁদের দু'জনের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয়।

উত্তমকুমারকে আমরা প্রথম দেখি 'কামনা'-ছবিতে। সে-ছবি থেকে সুরু ক'রে 'অগ্নি-পরীক্ষা' পর্য্যন্ত তিনি বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। আজ তাঁকে প্রথম শ্রেণীর দক্ষ অভিনেতা ব'লতে আর বাধা নেই। বয়সে তরুণ, স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন ও সুকণ্ঠের অধিকারী—তাই উত্তমকুমার তরুণ-নায়কের ভূমিকায় সহজেই নির্বাচিত হন। তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলি থেকে আজ এই কথাই প্রমাণিত হয় যে তিনি বিভিন্নমুখী চরিত্রে সু-অভিনয় করবার ক্ষমতা রাখেন। 'বসু-পরিবারে'র দাদা, 'চাঁপাডাঙার বৌ'-এর মহাতাপ আর 'অগ্নি-পরীক্ষা'র বুলু ওরফে কিরীটি মুখার্জি এই তিনটি ভূমিকা থেকেই এ-কথা প্রমাণিত হয়।

একটা জিনিস উত্তমকুমারের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তা হ'লো দিল্‌খোলা, আপনভোলা, প্রাণোচ্ছল চরিত্রের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ। প্রাণ খুলে তিনি হাসতে পারেন। তাই ঐ-জাতীয় চরিত্রের অভিনয় হয় বড় সুন্দর। একটা চট্‌পটে ছট্‌ফটে ভূমিকা পেলেই যেন উত্তমকুমার বেশী খুশি। 'মহাতাপ'-চরিত্রটি এইজন্যেই বোধহয় বেশি উৎরেছে। দিলদরিয়া গ্রাম্য যুবকের অভিব্যক্তি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর অভিনয়ে। অম্বল রেঁধে দেওয়ার জন্যে বৌদির কাছে বায়না, বর্ষা দেখে আনন্দ, কীর্তনের আসরে খোল বাজানো, বৌদির প্রতি ভালোবাসা—এই সব ভাবগুলি নিখুঁতভাবেই রূপায়িত করেছেন উত্তমকুমার। 'অগ্নি-পরীক্ষা'-য় ঠিক এর বিপরীত চরিত্র। সেখানে তাঁকে এক শান্ত-সুন্দর প্রেমিকের চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছে। তাঁর এ-জাতীয় সংযত অভিনয় দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। মহাতাপের সঙ্গে কিরীটি মুখার্জিকে একসঙ্গে দাঁড় করাতে পারেন? অথচ, এই বিপরীতধর্মী দুটি চরিত্রকেই অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনায় মূর্ত ক'রে তুলেছেন উত্তমকুমার। এছাড়া 'বসু পরিবার', 'বউ ঠাকুরাণীর হাট,' 'ওরা থাকে ওধারে,' 'সহযাত্রী,' 'কল্যাণী,' 'মরণের পরে', 'সদানন্দের মেলা'—এই ছবিগুলিতেও উত্তমকুমার সু-অভিনয় করেছেন। 'বসু পরিবার'-এ দাদার অংশে অভিনয় করেই উত্তমকুমার যশ কিনলেন। তাঁর সেই স্নেহপ্রবণ বড়ভাইয়ের রূপটি আজও চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'মর্য্যাদা' ও 'সহযাত্রী'-র অভিনয় ভালো হয়েছিল—তবে, স্বকীয় দক্ষতা প্রকাশের তেমন কোনো সুযোগ এ-দুটি ছবিতে ছিলনা। 'বউ ঠাকুরাণীর হাটে' উত্তমকুমার কেমন অভিনয় করবেন সে-সম্বন্ধে পূর্বে অনেকেরই আশঙ্কা ছিল। কিন্তু কবিগুরু-বর্ণিত উদয়াদিত্যের রূপটি তিনি ভালোভাবেই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'কল্যাণী'-চিত্রে নিখিলের চরিত্রটি বিন্যাস-দোষে আশানুরূপ ফুটে না

'অগ্নি-পরীক্ষা' [illegible]

করবেন না। শ্রীমতী কানন দেবী তাঁর অভিনয়-সাধনার প্রথম দিকে যে-ঔজ্জ্বল্য নিয়ে এসেছিলেন—আজকের সুচিত্রা সেনকে দেখলে আমাদের সেই কথাই মনে পড়ে।

সুচিত্রা সেনের সাফল্য অর্জনের তিনটি প্রধান কারণ হলো তাঁর—অঙ্গসৌষ্ঠব, মিষ্ট বাচনভঙ্গী আর, চরিত্রোপযোগী অভিব্যক্তির ক্ষমতা। বিপরীতধর্মী অভিনয়েও তিনি তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত করেছেন। 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে'র দরিদ্র, দুঃখক্লিষ্ট বেদনাতুর সতী আর 'অগ্নি-পরীক্ষা'র—প্রাণোচ্ছলা, রোমাণ্টিক মানসিক দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধা তাপসীর মধ্যে কতই না পার্থক্য। কিন্তু অভিনয়-নৈপুণ্যে এই বিপরীতধর্মী দুটি চরিত্রই অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন সুচিত্রা সেন। 'ঢুলী'-ছবির নায়িকা 'মিনতি'-র রূপটিও এই কারণেই চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো মিনতির ভালোবাসা—সে-ভালোবাসার রূপটিকে সুচিত্রা চোখের জলে ও ভাবের অভিব্যক্তিতে এমন সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন যে সহজেই দর্শকচিত্তে গভীর একটা রেখাপাত করতে সমর্থ হয়েছেন।

'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতেই সুচিত্রা প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। সেদিন হয়তো কেউ আশা করেননি সুচিত্রা অতি অল্পসময়ের মধ্যেই চিত্রজগতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর জয়মাল্য অর্জন করবেন। তাঁর এই প্রতিষ্ঠার মূলে চিত্র-পরিচালক দেবকী বসুর অভিনয়শিক্ষার কথা স্বভাবতই মনে জাগে। 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে' তিনি যেদিন 'সাড়ে চুয়াত্তরে'র নায়িকাকে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় মনোনীত করেন সেদিন সকলেই খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু সুচিত্রা দেবকীবাবুর মর্য্যাদা রক্ষা করে সকলের [illegible] অর্জন করেন। 'বিষ্ণুপ্রিয়া'-রূপে আমরা

নব চিত্রভারতীর 'গৃহপ্রবেশ' চিত্রের একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার

উঠলেও উত্তমকুমারের অভিনয়-গুণে নিখিল জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'সদানন্দের মেলা'-র অজিত এক কথায় সুন্দর। যদিও চরিত্রটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, তবুও ছবি বিশ্বাস ও পাহাড়ী সান্যালের প্রধান ভূমিকা দু'টির পরেই উত্তমকুমারকে মনে পড়ে। শীলার সঙ্গে অজিতের কথা কাটাকাটির দৃশ্যটি দর্শকচিত্তে রেখাপাত করে। 'মরণের পরে' ছবিতে উত্তমকুমার অভিনয় করেছেন এক তরুণ ডাক্তারের ভূমিকায়। অতি সংযত অভিনয় হয়েছে এই ছবিতে। যে দৃশ্যে নায়িকা তনিমা নায়ক অশোকের কাছে তাদের প্রেমকে ব্যক্ত করছে, সে-দৃশ্যে চমৎকার অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার। একসঙ্গে নিজের অসহায় ভাব ও প্রেমের জন্যে আকুতি অপূর্ব ব্যঞ্জনা লাভ করেছে তাঁর অভিনয়ে।

উত্তমকুমারের অনেক পরে এসেছেন সুচিত্রা সেন। [illegible] তিনি [illegible]

মীরা মিশ্রকে দেখেছি, আবার বিষ্ণুপ্রিয়া দেখলাম সুচিত্রা সেনকে। একথা আজ নিঃসংশয়েই বলা যেতে পারে যে, সুচিত্রার 'বিষ্ণুপ্রিয়া' মীরা মিশ্রের 'বিষ্ণুপ্রিয়া'র চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত ও প্রেমময়ী। সুচিত্রার সংলাপ উচ্চারণ, তাঁর পদক্ষেপ, আনন্দ ও বেদনার অভিব্যক্তি—'বিষ্ণুপ্রিয়া'-কে মহিমান্বিতা ক'রেছে সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সুচিত্রা আরও অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন। যেমন—'ওরা থাকে ওধারে', 'সদানন্দের মেলা', 'ঢুলী', 'মরণের পরে', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'অগ্নি-পরীক্ষা'। এক 'ঢুলী' ছাড়া আর সব ক'টি ছবিতেই তিনি উত্তমকুমারের বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। নায়ক উত্তমকুমার আর নায়িকা সুচিত্রা সেন। বারবার এতগুলি ছবিতে একই নায়ক-নায়িকা। তা সত্ত্বেও কিন্তু এ দুটি অভিনয়-শিল্পী দর্শক-সাধারণের প্রশংসা লাভ করছেন। এই সাফল্যের কারণ হ'লো, তাঁদের অভিনয়-নৈপুণ্য।

'ঢুলী' আর 'অন্নপূর্ণার মন্দির'—এ দুটি ছবিতে সুচিত্রা বেদনার্ত নায়িকার রূপটিকেই মূর্ত ক'রে তুলেছেন। তুলনায় 'ঢুলী'র নায়িকা মিনতিকেই আমাদের বেশি ভালো লেগেছে। অবশ্য, নিরুপমা দেবী বর্ণিত সতী-র চরিত্রটিও অভিনয়গুণে দর্শকসাধারণের বিশেষ সহানুভূতি লাভ করেছে। হতাশা, বেদনা, অভিমান—এই তিনটি রূপই সুচিত্রার অভিব্যক্তিতে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। 'ওরা থাকে ওধারে,' 'সদানন্দের মেলা' আর 'মরণের পরে'—এই ক'টি ছবিতে সুচিত্রা রূপ দিয়েছেন আনন্দোচ্ছলা নায়িকার ভূমিকায়। এদিকে থেকে 'ডাক্তারে'র ভারতী দেবীকেই আমাদের আজ বার বার মনে পড়ে। কোথায় যেন একটা মিল আছে। 'অগ্নি-পরীক্ষা'য় [illegible] দক্ষতার বিস্ময়কর পরীক্ষা দিয়েছেন [illegible] সুচিত্রা। তাপসীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, তাপসীর প্রেম—অভিনয়ের দিক থেকে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। সুচিত্রার সুস্পষ্ট ও সংযত সংলাপ উচ্চারণ, সুমিষ্ট হাসি, বেদনায় ভারাক্রান্ত চোখের জল, উচ্ছ্বাস ও অভিমানের রূপ 'অগ্নি-পরীক্ষা'-তেই যেন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

নব চিত্রভারতীর 'গৃহপ্রবেশ' কথাচিত্রের একটি দৃশ্যে মলিনা দেবী ও মঞ্জু দে

কাহিনী ও তার রূপায়ণ

(৭৫ পৃষ্ঠার পর)

হলিউডের আরও একখানি ছবির নামোল্লেখের প্রয়োজন মনে ক'রছি—'এ ওয়াক্ ইন দি সান', হ্যারী ব্রাউনের উপন্যাস অবলম্বনে। ছবিখানি পরিচালনা ক'রেছেন 'অল কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট'-এর বিশ্ববিদিত পরিচালক লুই মাইলষ্টোন। গভীর সন্দেহ আছে—এ ছবি আমাদের দেশে জনসমাদর লাভ ক'রেছে কিনা! এর বক্তব্য—যুদ্ধের প্রশস্তি—আজকের দিনে দেশবাসীর কাছে গ্রহণীয় হ'বে বলে মনে হয় না। তবে পরিচালক মাইলষ্টোন নিজের সৃজনী প্রতিভার তীক্ষ্ণতায় যে চিত্ররূপ দিতে সক্ষম হোয়েছেন তা' মূল উপন্যাসের ওপর নতুন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ব্যাখ্যার আলোক [illegible]

ফিল্ম্‌-ফ্যানের চিঠি

'চিত্রবাণী'র সম্পাদকীয় দপ্তরে রোজ অজস্র চিঠি আসে। তার বেশির ভাগ চিঠি লেখেন ফিল্ম্‌-ফ্যানরা। কত রঙের, কত ঢঙের, কত চিঠি। অনেকে চিত্র-তারকাদের সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ ক'রে তাঁদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চান, অনেকে আবার চিত্র-তারকাদের সরাসরি চিঠি লিখে সে-চিঠি যথাস্থানে পৌঁছে দেবার অনুরোধ জানান সম্পাদককে। সে-সব চিঠিতে যে-সব চিন্তাধারা প্রকাশ পায়—তা নিয়ে রীতিমত মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা করবার অবকাশ আছে। আমরা এখানে কয়েকটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি।

সিনেমায় নামার আগ্রহ প্রকাশ ক'রে কুচবিহার কলেজ হোস্টেল থেকে বিজ্ঞান-বিভাগের জনৈক ছাত্র লিখেছেন—

> "আমার বহুদিন হইলো সিনেমায় নামিতে ইচ্ছা হয়। তাই আপনি যদি একটু সাহায্য করেন তাহা হইলে আমি সিনেমায় নামিতে পারি। আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি আমার নিজের ফটোটা পাঠাইলাম, আপনি সেই ফটোটা শ্রীমতি কানন দেবীর হাতে দিবেন...। আপনি শ্রীমতি কানন দেবীকে আমার কথা সব বলিবেন, আর যদি না পারেন, তাহা হইলে যে কনো ষ্টুডিয়োতে হয়, আমি যাতে ভর্ত্তি হইতে পারি সেই বিষয়ে চিন্তা করিবেন, আপনি ছাড়া আমার এই উপকার কেও করতে পারবে না। দাদা আমার যদি কোন দোষ হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা করবেন।......আমি একজন সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, আমি কলেজে পড়ি। আমার বয়স হইবে ১৭ বৎসর [illegible]

ডিব্রুগড় থেকে একজন লিখেছেন—

> "এখানে একদল লোক আছে তারা বলে যে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই নাকি মদ পান করেন। এটা নিশ্চয়ই তাদের ভুল ধারণা। এ সম্বন্ধে আমার তাদের সাথে প্রায়ই তর্কাতর্কি হয়, এবং তাদের মতকে আমি মেনে নিতে পারি না এবং কোনদিন পারবোও না, আপনি নিশ্চয়ই আমার কথাকে সমর্থন করে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ভেংগে দিবেন বলে আশা করি।...আচ্ছা ছবিতে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা অভিনয় করার সময়ে যে সব দামী দামী পোষাক ব্যবহার করেন বা অলংকার ব্যবহার করেন, সেগুলি কি তাদের নিজের ? কর্ত্তৃপক্ষ তাদের দিয়ে থাকেন না তারাই ভাড়া করে আনেন ? সুপ্রভা দেবীকে আমরা বেশীর ভাগ ছবিতে বিধবার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখি—তিনি কি সধবা, না বিধবা ?"

বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) থেকে একজন লিখেছেন—

> "...সুদীপ্তা রায় বর্ত্তমানে বিবাহিতা কিনা ? যদি বিবাহিতা হন তবে তাঁহার বর্ত্তমান স্বামীর নাম কি ?"

কানপুর থেকে একজন লিখেছেন—

> "শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার চিঠির সহিত শ্রীমতী মলিনা দেবীকে লিখিত একখানি চিঠি দিলাম। দয়া করিয়া তাঁর হাতে দিয়া দিবেন।"

অরোরা ফিল্মের আগামী সামাজিক ছবি 'পরিশোধ'-এ ধীরাজ ভট্টাচার্য্য এবং অনুভা গুপ্তা

মলিনা দেবীকে তিনি লিখছেন—

"শ্রীচরণেষু দিদি, হঠাৎ আমার চিঠিখানা পেয়ে আশ্চর্য্য হইবেন, ও মনে মনে বলিবেন জানা নেই, শুনা নেই "দিদি" কিন্তু এ প্রশ্নে উত্তরে আমি বলিব যে আপনাকে চিনিতে কারোর বাকি নাই, তার উপর যেখানে ছোট ভাইটির মত দাবী করিতেছি সেখানে পরিচয় কিসের ? আমার মূল কথা যে আপনাকে "বড়দি" বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছুক, ও এই আমার আপনার কাছে প্রার্থনা যে আমাকে দূরে ঠেলিয়া দিবেন না, আপনার কাছে না চাই টাকা আর না চাই অন্য কিছু, শুধু এইটুকু নিবেদন যে আমার প্রার্থনা পূণ্য করুন। পিছন দিকে ঠিকানা দিলাম আশা করি তাড়াতাড়ী উত্তর দিবেন ও ছোটভাই বলে গ্রহণ করিবেন। নিবেদন ইতি...... । পুঃ—কোন রূপ টিকিট দিলাম না কারণ বড়-বোনকে ছোট করিতে চাই না।"

২৪ পরগণা জেলার পানশীলা গ্রাম থেকে একজন লিখেছেন—"যখন নায়ক নায়িকার মধ্যে স্যুটিং আরম্ভ হয় তখন কী তাহাদের মধ্যে সত্যি-কারের প্রেম হয়, না, স্যুটিং শেষ হওয়ার সঙ্গে তাহাদের বিচ্ছেদ হয় ?"

চট্টগ্রাম থেকে জনৈক 'প্রেমিক' লিখেছেন—

"আমি প্রেমে পরেছি। কার সঙ্গে জানেন ? মীরা মিশ্রের সঙ্গে। প্রেম করবার জায়গা কোথায় জানেন এবং কোন সময় জানেন কি ? ইডেন-গার্ডেনের পুর্ব্ব কোনায় ছোট বকুলগাছ-তলায়। স্বপ্নে।"

[illegible] অভিনয়ের সুযোগ করে [illegible] লেছেন— [illegible] হইতে [illegible]

জন্য বাসনা জাগিয়াছে। এই বাসনাই জীবনের একমাত্র পথরূপে নির্বাচিত করিয়াছি। আমার আশা ভবিষ্যতে অভিনেত্রী হইতে পারিব, তাই আপনার নিকট আমার একান্ত অনুরোধ আপনি যেন উক্ত বাসনার প্রতি সহায়িতা হন, এবং আত্মহত্যার হাত হইতে আমার রক্ষা করুন। কারণ ব্যর্থ জীবন নিয়ে জীবিত থাকার চাইতে মরে যাওয়া ঢের ভাল। তাই আপনার নিকট অনুরোধ যে, যেমন শ্রীমতি পিক্‌চার্স, পদ্ম প্রোডাকসন ও এস, বি, প্রোডাকসনের অবস্থান সুচারু জ্ঞাত করিয়া আপনার প্রিয়-বান্ধবীকে রক্ষা করুন।"

চিত্রাভিনেত্রীর জন্য সুপাত্রের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন এই কথা জানিয়ে আসামের চিকনমাটি টি-এষ্টেট্ থেকে একজন লিখেছেন—

"বনানী চৌধুরী কোন্ ছবিতে বেশী নাম করেছেন। তাকে বলবেন তিনি বিবাহিতা কি অবিবাহিতা। যদি অবিবাহিতা হন তাহলে আমাকে জানাবেন। আমি তার সুপাত্রের সন্ধান করেছি।"

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে ক'লকাতার জনৈক পত্রলেখক লিখেছেন : —"প্রকৃত ভালবাসা না পেলে মানুষ সুখী হতে পারে না। নানা কাগজে দেখি অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রায়ই বিবাহ-বিচ্ছেদ করেণ ও সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিবাহ করেণ। ওদের প্রায় সমস্ত জীবনই এমনি ক'রে যায়। এই ধরণের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে, প্রকৃত ভালবাসা তা আমার বিশ্বাস করতে বাধে। আমার মনে হয় হয় সংসার যাত্রায়ও এরা শুধু অভিনয়ই করে যান। আন্তরিকতার লেশমাত্রও তাতে থাকে না।... আমি যদি একমাস ঐ অবস্থার ভিতর পড়ি

তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব আর না হয় আত্মহত্যা করব। জানাবেন কি কেমন ক'রে ওরা সমস্ত জীবন কাটান ?"

চিত্রাভিনেত্রী ও চিত্রাভিনেতা সম্পর্কে নানারকমের কৌতূহল জানিয়ে কয়েকজন লিখেছেন—

১। "কানন দেবী এখন যে উপাধি ধারণ ক'রে আছেন, তা থেকে আবার কবে বদলি হবেন, এবং আর কতবার আশা করা যায় ?"

২। "মীরা মিশ্রের ঠিকানা কি ? কারণ আমি তাঁহার পাণিপ্রার্থী।"

৩। "অশোককুমার কি বিবাহিত ?"

৪। "চন্দ্রাবতী কি যাত এবং তেনার বাড়ি কোথায় সঠিক আমি জানিতে চাই।"

৫। "কবিতা সরকার কি কোন রেলকর্মচারির মেয়ে ?"

৬। "কানন দেবীর বর্ত্তমান স্বামী কে এবং তিনি কোথায় ?"

৭। "অভিনেত্রী প্রতিমা দাসগুপ্তা সত্যই মদ্য পান করেন কি ? তাহার অহিন্দু স্বামী এখনও কি বর্তমান ?"

৮। "রবিন মজুমদার ও সন্ধ্যারাণীর মধ্যে কোন আকর্ষণ আছে কি ? থাকলে বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি ?"

৯। "সুনন্দা দেবী কি বিবাহিতা ?"

১০। "গোপের বেটা দিক্ষিত না দিক্ষিতের বেটা গোপ ?"

১১। "সুরাইয়ার অমন সুন্দর দাঁতগুলি কি বাঁধানো ?"

১২। "ম্যাক্লিন্স্ কোম্পানী সুচিত্রা সেনকে তাঁহাদের বিজ্ঞাপনের মডেল করিতে পারেন না কি ?"

১৩। "সুচিত্রা উত্তম যেভাবে নায়ক-নায়িকা সাজিতেছেন তাহার ফলাফল শেষ [illegible] হইতে পারে ? রাজকাপুর-নার্গিস হইবে না তো ?"

১৪। "দীপ্তি রায় কি ভালো কাট্‌লেট তৈরি করতে পারেন। আমি কাট্‌লেট বড় ভালবাসি।"

১৫। "সাবিত্রী চাটুজ্জে কি বিয়ে ক'রে ফেলেছেন ? খবরটা একটু তাড়াতাড়ি জানাবেন। আমার সন্ধানে একটি সম্ভ্রান্ত বংশের মুখার্জি পাত্র আছে।"

১৬। "অমর মল্লিকের সঙ্গে ভারতী দেবীর নাকি বিবাহ হইয়াছে। কেন হ'লো বলুন তো ?"

১৭। "মঞ্জু দের সঙ্গে কি একবার দেখা করতে পারি ? তাঁর টেলিফোন নম্বর কতো ?"

১৮। "ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (হাসির নায়ক)-কে আমার খুউব ভালো লাগে। নিমন্ত্রণ করিলে তিনি একদিন আমাদের বাসায় এসে কমিক করতে পারেন না ? আমার হয়ে দেখবেন একটু চেষ্টা ক'রে ? রাজি হ'লে আনন্দে আত্মহারা হব।"

১৯। "অনুভা গুপ্তা নাকি ফুটবল খেলতে পারেন ? ক্রিকেট তো জানেনই, তাই না ?"

২০। "চিত্রাভিনেত্রীদের সঙ্গে আপনার ভাব কেমন ? 'চিত্রবাণী'র নিজস্ব ক্যামেরায় কি ওদের ধ'রে রাখতে পারেন না ?"

চিঠির সমুদ্র মন্থন করলে আরও অনেক রত্ন পাওয়া যাবে। বারান্তরে সেই রত্নাবলী উপহার দেবার বাসনা রইল আমাদের।

ধুরন্ধরের চিঠি

প্রিয় সম্পাদকভায়া !

সেদিন সবে ঘুম থেকে উঠে, সকালবেলাকার কাজ-কম্ম সেরে রুটিন মাফিক মার্গারিন-মাখানো দু'পিস রুটি পৈটিক zone-এ পাঠিয়ে, বৈঠকখানায় ব'সে বড় কল্‌কেটি সাজিয়েছি এমন সময় পঞ্চপাণ্ডবের আবির্ভাব !

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌লাম—বিস্তর চাঁদা দিয়েছি এবার, আর নয় !

পঞ্চপাণ্ডবের যুধিষ্ঠির, ওরফে পাড়ার দোলগোবিন্দের বড় ছেলে অমিয়নিমাই এক গাল হেসে সবিনয়ে নিবেদন করলে—চাঁদার জন্যে আসিনি দাদু, বিশেষ একটা পরামর্শের জন্যে এসেছি।

গড়াগড়ার নলটা নামিয়ে রেখে বল্‌লাম—পরামর্শ, বলো কিহে, ব'সো ব'সো।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই আসনে সমাসীন হলেন।

অমিয়নিমাই বিপুল দেহ ভীমকে দেখিয়ে বল্‌লে ইনি বজ্রপাণি বটব্যাল—সম্প্রতি বিলেত থেকে ঘুরে এসেছেন। আর্থার র‍্যাঙ্কের সহকারী পরিচালক ছিলেন। দেশে এসে চিত্রপরিচালনায় জীবন উৎসর্গ করতে চান।

বল্‌লাম—মহৎ উদ্দেশ্য ! আর এঁরা ?

অমিয়নিমাই তখন বাকি তিন পাণ্ডবের পরিচয় দিয়ে বল্‌লে—কর্মজীবন কয়াল—হলিউডে সাড়ে সাত বছর ক্যামেরা চালিয়ে এসেছেন ; নির্বান্ধব নাগ—ছবির রেকর্ডিং নিখুঁতভাবে করেন, তিন বছর মিশরে ট্রেনিং নিয়েছেন ; আর ইনি হলেন ঝুঠারাম মোতিরাম, অগাধ টাকার মালিক—চিত্রশিল্পের উন্নতিতে টাকা খাটাতে চান, লাভের বিন্দুমাত্র আশা না রেখে।

পরিচয় হ'লো। তারপর আসল প্রসঙ্গে আসা গেল।

অমিয়নিমাই সবিনয়ে যা নিবেদন করলো তার মর্মার্থ হ'লো—ওরা পঞ্চপাণ্ডব মিলে, একটা কো-অপারেটিভ্ ফিল্ম-কোম্পানী খুলেছে। কোম্পানীর [illegible]সিদ্ধিদাতা ইষ্টার্ণ কো-অপারেটিভ্ ফিল্ম অর্গানিজেশন", সংক্ষেপে SECFO। এ যে দেখছি SEATO-র সমগোত্রীয় !

—তা আমি কী করতে পারি ?

—আজ্ঞে, আপনি হলেন করিৎকর্মা লোক। আমাদের অর্গানিজেশনের পেট্রন হবেন আপনি। বল্‌লে অমিয়নিমাই —আপনার শুভেচ্ছা নিয়েই আমরা অগ্রসর হ'তে চাই।

ঝুঠারাম 'দন্তরুচি কৌমুদী' দেখিয়ে বল্‌লে—হাঁ হাঁ, প্রোসপেক্‌টাসমে তো হাম্‌রা আপনার নাম ছাপিয়ে দিয়েছি। এখুন একটা ফোরমাল পারমিশেন তো ভী দিয়ে দিন।

—সে কি ! অপরাধী তার অপরাধ জানবার আগেই হুলিয়া বের করেছ !

বজ্রপাণি মুখ-ব্যাদান ক'রে বল্‌লে—আজ্ঞে, আজকের দিনে এইরকমই তো চলে আসছে। আগে নাম ছেপে পরে পারমিশন নেওয়া ! না না, আপনার আর এই মহৎ কাজে না করা চলবে না !

চলবে না, সে তো বুঝতেই পারছি। এখন এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার কী উপায়—এই যখন ভাবছি তখন নির্বান্ধব নাগ আমার সামনে একখানা ছাপানো কাগজ তুলে ধরলো। তাতে লেখা—

ওঁ শ্রীশ্রীসিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ

আমরা নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারী—চোরবাগানের স্বনামধন্য পুরুষ চলচ্চিত্রশিল্পের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী সর্বজনপ্রিয় চতুর-চূড়ামণি শ্রীল শ্রীযুক্ত ধুরন্ধর মহাশয়কে পৃষ্ঠপোষক করিয়া একটি সমবায় চিত্র-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছি। প্রতিষ্ঠানের নাম—

"সিদ্ধিদাতা ইষ্টার্ণ কো-অপারেটিভ্ ফিল্ম অর্গানিজেশন"

সংক্ষেপে

S. E. C. F. O.

কেবল [illegible] আমরা [illegible] প্রথায় শেয়ার বিক্রয় করিয়া [illegible]

অর্থভাণ্ডার খুলিব। দানশীল ব্যক্তিরা এই ভাণ্ডারে অর্থ-সাহায্য করিতে পারেন। এই অর্থ হইতেই আমরা প্রতি বৎসর বারখানা করিয়া মাসিক কিস্তিতে এক একখানি ফিল্ম তুলিব— যে ফিল্ম হইবে বাংলার প্রাণ, বাংলার মান, বাংলার কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ।

আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান মূলধন—তিন লক্ষ টাকা। এই টাকা দান করিয়াছেন আমাদেরই একজন—শ্রীঘুঠারাম মোতিরাম। চলচ্চিত্র-শিল্পের উন্নতি কামনায় তিনি প্রায় নিঃস্বার্থভাবেই এই টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার কেবল একটি সর্ত যে, তিনি ছবির অভিনেত্রীদের নির্বাচন করিবেন। তাঁহার মতো দানশীল ব্যক্তির হাতে আমরা অভিনেত্রী নির্বাচনের ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছি।

পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, সাউণ্ড রেকর্ডিষ্ট, কর্মসচিব —সবাই আমাদের আছেন। সকলেই নিজেদের মেহনতের বিনিময়ে এই কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডার হইয়াছেন। বাৎসরিক লভ্যের সমান অংশ তাঁহারা পাইবেন।

আমরা একজন ধোপা, একজন নাপিত, একজন জমাদার, একজন গোয়ালা, একজন বস্ত্রবিক্রেতা ও একজন অলঙ্কার ব্যবসায়ীকেও শেয়ার হোল্ডার শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছি।

ধোপা—শ্রীধবলসুন্দর রজক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাপড়-চোপড় কাচিয়া দিবেন বিনামূল্যে। নাপিত—শ্রীপুরুষোত্তম প্রামাণিক—মেক্-আপের কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন। জমাদার—শ্রীশোভারাম ষ্টুডিয়ো পরিষ্কার রাখিবে। গোয়ালা—শ্রীগোপবন্ধু ঘোষ, প্রত্যেক শিল্পী ও টেক্‌নিশিয়ানকে বিনা পয়সায় দুধ, ঘি, মাখন খাওয়াইয়া চাঙ্গা রাখিবেন। বস্ত্রবিক্রেতা—শ্রীবসনকুমার মজুমদার কষ্টিউম জোগাইবেন এবং অলঙ্কার-ব্যবসায়ী শ্রী শ্রীমন্ত মালাকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অলঙ্কারে বিভূষিত করিবেন। সকলই বিনামূল্যে। কেবল বার্ষিক লভ্যাংশের সমান অংশ ইঁহাদের প্রাপ্য।

আসুন, আপনারাও আসুন। যে যেমনভাবে পারেন

এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিয়া ইহার শেয়ার-হোল্ডার নিযুক্ত হউন। নিবেদক ইতি—

কর্মসচিব
শ্রীঅমিয়নিমাই অধিকারী
পরিচালকবৃন্দ
শ্রীবজ্রপাণি বটব্যাল ; শ্রীকর্মজীবন কয়াল ;
শ্রীনির্বান্ধব নাগ
ডোনার
শ্রীঝুঁঠারাম মোতিরাম

প্রস্‌পেক্‌টাস্ প'ড়ে চক্ষু চড়কগাছ !

এরা যে এলাহি কাণ্ড ক'রে ব'সে আছে। মানুষের প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যত কিছু কাজে লাগে সব কিছুরই আমদানী করেছে এরা।

শুনলাম, বাঁশবেড়ের বংশলোচন শর্মা নাকি এঁদের বাঁশ দিতে চেয়েছেন—বিনিময়ে শেয়ার-হোল্ডার হবেন।

সিনেমায় বাঁশের প্রয়োজন নাকি খুব বেশি—বজ্রপাণি বটব্যাল বল্‌লেন। সেট্ তৈরি করতে বাঁশ চাই, মালপত্তর ব'য়ে নিয়ে যেতে বাঁশ চাই—হঠাৎ যদি 'পাঁচশো কিলো' মারতে গিয়ে কেউ ওপর থেকে প'ড়ে গিয়ে মারা যায় তা'হলে তাকে শ্মশান পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্যেও বাঁশ চাই !

উঃ কী সাংঘাতিক দূরদৃষ্টি !

বর্তমানে এঁরা একখানা বই লিখেছেন। নাম—"ফসকানো প্রেম"। পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, সাউণ্ড রেকর্ডিষ্ট ও কর্মসচিব অমিয়নিমাই সবাই এর লেখক। কেউ মূলকাহিনী লিখেছেন, কেউ সংলাপ জুড়েছেন, কেউ গান লিখেছেন, কেউ সংশোধন করেছেন। মায় ঝুঁঠারাম মোতিরামও এক ডজন জুৎসই সংলাপ জুড়ে দিয়েছেন ! ভবিষ্যতে অবশ্য এঁরা নামকরা লেখকদের বই নেবেন—

সদ্যমুক্ত 'ওয়ারিস' চিত্রে সুরাইয়া

তবে, ঐ সর্তে, রূপয়া নেহি, শেয়ার-হোল্ডার বন্ যাও, মুনাফা লে লেও।

"ফসকানো প্রেমে"র জন্যে এঁরা কয়েকজন অভিনেত্রী নির্বাচিত ক'রে ফেলেছেন, অভিনেতা নির্বাচনের কাজও চল্‌ছে। বলা বাহুল্য, ঝুঁঠারামই অভিনেত্রীদের নির্বাচন করেছেন—আর, তাঁর বাগানবাড়িতেই রোজ সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত বারোটা অবধি মহলা চল্‌ছে। অভিনেত্রীদের ব্যবহারে ঝুঁঠারাম এতই নাকি খুশি হয়েছেন যে তাঁদের প্রত্যেককে 'পূজার উপহার' হিসেবে এক ডজন ক'রে জর্জেট শাড়ি, [illegible] করে নেকলেশ আর একটা ক'রে

—প্রচার। কোনো খবরের কাগজ, কোনো পিরিওডিক্যাল আমাদের কথা প্রচার করতে সাহস পাচ্ছে না। আপনি, দাদু, এই প্রচারের দিকটা একটু সামলে দিন। আপনার জানা-চেনা ব্লক-মেকার; ছাপাখানা—এদের আমরা সব শেয়ার দিয়ে দেবো। ব্লক তো দু'চারখানা করাতেই হবে, ছাপার কাজও অনেক করাতে হবে দাদু। লাভের অংশ তাদেরও আমরা দিয়ে খেতে চাই। ওই যে কথায় বলে, লিভ্ এ্যাণ্ড লেট লিভ!

—বটেই তো!

—দয়া ক'রে একবার 'চিত্রবাণী'র সম্পাদককে একটু বলে দিন না। বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন ছাপার বিনিময়ে 'চিত্রবাণী'কেও আমরা শেয়ার-হোল্ডার ক'রে নেবো।

তাদের অভয় দিয়ে তো বিদায় করেছি। কিন্তু ভায়া, তোমাকে বলছি,—তুমি কি এদের জয়ঢাকটা বাজাবে না? তোমার কাছে ওদের লেলিয়ে দিয়ে—আমি কিছুদিনের জন্যে আন্দামানে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে ছুটলাম। ফিরে এসে দেখা করব।

ইতি—ধুরন্ধর

'শিবশক্তি' চিত্রে পার্ব্বতীর ভূমিকায় দীপ্তি রায়

হাত ঘড়ি উপহার দিয়েছেন। অভিনেত্রীরা খুশি মনে মহলা দিচ্ছেন। ছবির লভ্যাংশ থেকে এঁরাও সমান মুনাফা পাবেন শেয়ার-হোল্ডার হিসেবে।

প্রস্পেক্টাস পড়লাম—আর এই সব শুনে বল্লাম—খাসা হয়েছে। যেভাবে তোমরা সমবেত হয়েছ, তাতে তোমাদের সাফল্য সুনিশ্চিত।

—আপনার মুখে [illegible] চন্দন পড়ুক দাদু! কেবল একটা জিনিষ হচ্ছে না।

—কী?

সঙ্গীত ও শিল্পী

● সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় ●

ভারতীয় সঙ্গীত মূলতঃ ব্যক্তিমুখী। ব্যক্তি বা শিল্পীকে আশ্রয় করেই তার বিকাশ। এ শুধু আজকের কথা নয়, যুগ যুগ ধরে নিভৃত সঙ্গীত-সাধনাকে কেন্দ্র করেই তার বৈচিত্র্যের ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। যুগপ্রসারী এই সঙ্গীত প্রচেষ্টার মূল উপাদানের সন্ধান নিতে গেলে তাই শিল্পীর খোঁজ নেওয়াই সর্বপ্রথম কর্তব্য।

বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে যে সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে সুরসম্পদে রসের অঙ্গন ভরিয়ে তোলেন, তাঁদের কথা স্মরণ করলে প্রথমেই সঙ্গীত-সম্রাট আলাদীয়া খাঁর কথা মনে পড়ে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই মার্চ বোম্বাইয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত গীতপ্রণালী এতে স্তিমিত হয়নি। আজও তার অবিকৃত রূপ শ্রীমতী কেশরবাঈ-এর কণ্ঠে শোনা যায়। পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার এম আর জয়াকর এই সঙ্গীতবিদ প্রসঙ্গে এককালে বলেছিলেন যে, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাঁকে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরের সঙ্গে তুলনা করলে একটুও অত্যুক্তি হয় না।

আলাদীয়া খাঁ বিখ্যাত হরিদাস ঘরাণার অন্তর্ভুক্ত। জয়পুরের এক সঙ্গীত প্রতিভাশালী বংশে তাঁর জন্ম। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতৃব্য জুগান খাঁর কাছে সর্বপ্রথম সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ন' থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত পিতা খাজা আহম্মদ খাঁ এবং খুল্লতাত জাহাঙ্গীর খাঁ সঙ্গীত শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন। এই শিক্ষার ভিত কতটা সুদৃঢ় আকারে গঠিত হয় তার সন্ধান নিতে গেলে শুধু একথা জানলেই যথেষ্ট হবে যে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই তিনি ভারতের সর্বত্র সুবিদিত হয়ে পড়েন।

আলাদীয়া খাঁ বর্তমানকালের অল্পক্ষণস্থায়ী সঙ্গীত পরিবেশন রীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। একবার তিনি একসঙ্গে বারো ঘণ্টা গান করে এই কথাটাই প্রমাণিত করেছিলেন যে, ভারতীয় সঙ্গীতের কাঠামো ঠুনকো রসবস্তু দিয়ে প্রস্তুত নয়। মুসলমান হয়েও তিনি হিন্দুদের ভক্তি-মূলক গান আন্তরিকতার সঙ্গেই গাইতেন। এবিষয়ে তাঁর উদার মতবাদ তদানীন্তন সকলের কাছেই সুবিদিত ছিল। খেয়াল গানের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গীত প্রতিভাকে শীর্ষস্থানের পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে কারো মনে কখনও সংশয়ের উদয় হয়নি। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় ৪০ বছর তিনি বোম্বাইতেই ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে এইস্থানের সঙ্গীত-ক্ষেত্রকে তিনি এত প্রসারিত ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন যে পরবর্তী কালের সঙ্গীত প্রচেষ্টা তারই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল বলা চলে।

ভারতীয় সঙ্গীত যুগে যুগে নবসৃষ্টির প্রেরণা নিয়েই এগিয়ে চলেছে। কোনও বিশেষ সময়ের সমৃদ্ধি দিয়ে তার গতি বন্ধ করা হয় নি। নিভৃতে বসে সঙ্গীতজ্ঞগণ যে নব নব রূপদানের চেষ্টা করেছেন তাই পরবর্তীকালে সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে মুসলমানী আমলের আগেই ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা উৎকর্ষের বিধিবদ্ধ আকার ধারণ করলেও আমরা তাই নিয়েই ক্ষান্ত হইনি। উৎসাহের সঙ্গেই আমরা তখন স্থান করে দিয়েছি সে-সঙ্গীতের—যার ফলে পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে এক সুমহান বৈচিত্র্য এবং সৌসাদৃশ্যের এক বিরাট সমন্বয়।

রসোপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সঙ্গীতকে যে আমরা কখনও সঙ্কুচিত করে রাখিনি এ অতি আশার কথা। বিভিন্ন শিল্পীর বিভিন্ন অবদান তাই আমরা অতি আদরের সঙ্গেই গ্রহণ করেছি। গ্রহণ-বর্জনের স্বাভাবিক মেয়াদ অতিক্রম করে যেটুকু বাকি রয়েছে তাকেই আমরা স্থায়ী আসন দিয়েছি ভারতীয় সঙ্গীতের অঙ্গনে। তাই আজ মিয়ামল্লার, দরবারী কানাড়া বা মিয়া তোড়ি শুনলে আর সম্রাট আকবরের কৃপাপুষ্ট তানসেনের ওপর কোনও বিরূপভাব পরিলক্ষিত হয় না। তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁ প্রবর্তিত বিলাসখানি তোড়ি গাইতে বসে বর্তমান কালের কোনও গায়কের মুখে বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে ওঠারও সংবাদ পাওয়া

যায়নি। রসগ্রহণের ব্যাপারে আমরা মনের দ্বারে কখনও অর্গল দেওয়ার পক্ষপাতী নই। অবারিত সে দ্বার দিয়ে আমরা গ্রহণ করেছি অনেক আগন্তুককে, সহানুভূতি দিয়ে তাঁদের জিইয়ে রাখবারও চেষ্টা করেছি প্রচুর। শিল্পীর অবদান এক্ষেত্রে একক বেষ্টনী সৃষ্টি করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের সমগ্র প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে বিরাটত্বের দিকে। তাই একথা আজ নির্বিবাদে বলা চলে যে ব্যক্তিগত বিভিন্ন প্রচেষ্টা ভারতীয় সঙ্গীতকে বিভ্রান্তির পথে চালিত না করে সমন্বয়ের তীর্থে মুক্তিস্নান করিয়েছে।

পরিবেশন রীতির পার্থক্য নিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মান নির্দ্ধারিত হয় বলে যে ধারণা সঙ্গীত মহলে প্রচলিত আছে তা উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক বলা চলে না। কারণ এই ব্যক্তিগত পরিবেশন পদ্ধতির ফলেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ঘরাণা বা গীতপ্রণালী। ব্যক্তিত্বের এই বিরাট সমারোহ আজ ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ।

গীতপদ্ধতির উন্নত শিখরে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ব্যাপারে গোয়ালিয়র ঘরাণার অবদান সামান্য নয়। এই ঘরাণার মধ্যে নিশার হোসেনের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। পুরাতন গীতপদ্ধতিকে ব্যক্তিগত প্রতিভা দিয়ে সঞ্জীবিত করে তুলতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন এবং তারই ফলে আজ গোয়ালিয়র ঘরাণার উৎকর্ষ সম্বন্ধে কারোরই মনে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই।

রামকৃষ্ণ বুয়া এই ঘরাণার অন্তর্গত। নিশার হোসেনের কাছে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করলেও রসসৃষ্টির ব্যক্তিগত ধারা তিনি উন্মুক্ত রেখেছিলেন। গোয়ালিয়র ঘরাণায় তানের প্রাধান্য বেশি। কিন্তু রামকৃষ্ণ বুয়া তা পুরোপুরি গ্রহণ না করে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী গীতপ্রণালীর মধ্যে গমকের স্থান করেছিলেন এবং তার ফলেই তাঁর খেয়াল গানে বৈচিত্র্য ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যেতো বেশী।

ভারতীয় সঙ্গীতের পূর্বাচার্যদের মধ্যে যাঁরা নবীনতার স্রোত বইয়েছিলেন রামকৃষ্ণ বুয়া তাঁদেরই অন্যতম। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত বি[illegible]রের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ, পণ্ডিত দত্তাত্রেয় পালুশকর, পণ্ডিতপট বর্দ্ধন এই গীতপ্রণালীর [illegible]লা চলে।

ভারতীয় সঙ্গীতের রসবস্তুকে নিয়মতান্ত্রিক পরিবেশে বেঁধে তার প্রসারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরের জীবনের ব্রত ছিল এবং সেকাজে তিনি কতটা সফলকাম হয়েছিলেন তা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মহলে আজ আর অজানা নেই। গোঁড়ামির দুরপনেয় বাধা কাটিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের বন্ধন মুক্তির পথ এইসব পূর্বাচার্যদের কল্যাণেই রচিত হয়েছে। বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দীর সঙ্গীতের ইতিহাসে এই বিষয়টিকেই প্রধান বলা চলে।

শিল্পীর সাহায্যে ও সৌজন্যে যে সঙ্গীত রচিত হয় তার পরিসমাপ্তি ঘটে একটি জীবনেই—একথা স্মরণ করে সঙ্গীতের স্থায়ী ভিত রচনায় যে কয়জন গুণী এগিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে অন্যতম। সঙ্গীতকে কিংবদন্তীর যুগ থেকে সরিয়ে এনে বৈজ্ঞানিক বিধান দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ইনি অনেকটা সফলকাম হয়েছেন। পুরাতন পুঁথি ও গীতপ্রণালী মন্থন করে নিয়মানুবর্তিতার সন্ধান দেওয়া এক তানসেনের পর এতটা বোধ হয় কেউই করেন নি।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের এক নিষ্ঠাবান মহারাষ্ট্রীয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি বল্লভদাস দামুলজী এবং গোপালগিরি জয়রাজগিরির কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। পরে জয়পুর রাজ্যের মহম্মদ আলী খাঁ এবং গোয়ালিয়রের পণ্ডিত একনাথের কাছেও সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সঙ্গীত সংগ্রহের কাজে তিনি যেভাবে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন তার সঠিক সন্ধান হয়তো অনেকে জানেন না। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর কাছে গিয়ে তিনি প্রত্যেকের প্রধান প্রধান গানগুলি স্বরলিপি আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বিরাট সঙ্গীত-সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করে তিনি পরবর্তীকালে পুস্তক প্রণয়নের মাধ্যমে যে বিধিবদ্ধ ধারার সন্ধান দিয়ে গেছেন তার তুলনা হয় না।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আগ্রার রঙ্গিলা ঘরাণা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। রঙ্গিলা ঘরাণার সাম্প্রতিক যুগপাত্র ছিলেন ফৈয়াজ খাঁ। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু

তাঁর সঙ্গীত ভারতের মন থেকে মুছে যায় নি। শিল্পী যে তাঁর সঙ্গীতের মাধ্যমেই অমরত্ব লাভ করেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছেন ফৈয়াজ খাঁ।

বাল্যাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তিনি মাতুলের গৃহে প্রতিপালিত হন। মাতুল কল্যাণ খাঁ এবং মাতামহ গোলাম আব্বাস খাঁ তদানীন্তন সঙ্গীত জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ ছিলেন। এই দুই সঙ্গীতজ্ঞের প্রতিভা ফৈয়াজ খাঁর প্রতিভাকে এমন এক স্তরে চালিত করেছিল যে তার পূর্ণ অভিব্যক্তি পরবর্তীকালে এক বিরাট সম্ভাবনার আকার নিতে সমর্থ হয়েছিল। গীতপ্রণালীর এত উন্নত বিকাশ খুব কমই দেখা যায়। কৃতিত্বের ভিত এ-প্রণালীতে এমন রসসিক্ত ও শক্তিশালী যে তার আবেদনের সর্বজনীনত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই।

বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে আর যে সব সঙ্গীতজ্ঞ বাংলার তথা ভারতের সঙ্গীত সমাজকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় আব্দুল করিম খাঁর স্থানও বড় কম নয়। আমাদের সাম্প্রতিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীরা আব্দুল করিম খাঁ প্রবর্তিত কিরানা গীতপদ্ধতিকে এত অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন যে সেকথা বলে শেষ কর যায় না। অবশ্য এরও আগে বাংলার সঙ্গীত সমাজ দ্বারভাঙ্গার বেতিয়া ঘরাণার গীতপ্রণালী অনুসরণ করে যে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ গান তারই ফলস্বরূপ ধরা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অঘোর চক্রবর্তী, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলীবাবু, নগেন মুখোপাধ্যায়ের নাম স্বতঃই মনে পড়ে।

উত্তর ভারতের বহু গুণী সঙ্গীতজ্ঞ এককালে বাংলার সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। টপ্পায় রমজান মিঞার ছাপ এখনও হয়তো কিছু পাওয়া যায়। নিধুবাবুর নামও এ প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু বাংলার শ্যামল ক্ষেত্রে টপ্পার রুক্ষ রস তেমন জমেনি। ধ্রুপদের স্থানও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে। প্রথম দিকে কয়েকজন সঙ্গীতরসিক ও ধনী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে ধ্রুপদ বাংলায় কিছুটা

স্থান সংগ্রহ করে নিতে সমর্থ হয়। কিন্তু তার পরই আসে খেয়াল গানের স্রোত। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে দুলীচাঁদ-বাবুর কথা। তিনিই প্রথম তাঁর বাগানবাড়ীতে আলাদীয়া খাঁ ও বাদল খাঁকে আনিয়ে সঙ্গীতের আসর জাঁকিয়ে তোলেন। তাঁরই সংস্পর্শ লাভ করে বাংলার বহু সঙ্গীতজ্ঞ পরবর্তীকালে কৃতার্থ হয়েছেন। এছাড়া উজীর খাঁ, কালে খাঁ, শ্রীজান প্রমুখ বহু গুণী শিল্পী এককালে এই নগরীতেই অবস্থান করে তাঁদের সুরসম্ভার দিয়ে বাংলার সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

কালে খাঁর কর্মক্ষেত্র পূর্বে পাতিয়ালায় নিবদ্ধ ছিল। তাঁরই বংশসম্ভূত বড়ে গোলাম আলী খাঁর নাম বাংলায় আজ সুবিদিত। এই ঘরাণার গীতপ্রণালী বাংলায় কতটা সহানুভূতি পেয়েছে তা আজ কারও অজানা নেই।

ঠুমরীতে গণপৎ রাও ভাইয়া সাহেব, মৈজুদ্দিন, মালকাজান, গহরজান প্রভৃতি শিল্পীর সান্নিধ্যও বাংলার সঙ্গীত-সমাজকে বহুভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাংলার সঙ্গীতে সংস্কৃতির যুগ এঁরাই সৃষ্টি করেন। শিল্পীর প্রকৃষ্ট বিকাশ তাঁর গানে। পরিবেশন রীতির পার্থক্য নিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সারবত্তা নির্দ্ধারিত হয় বলে শিল্পীর মর্য্যাদা এখানে সবচেয়ে বেশী। রাগ-রাগিণীর মৌলিক বিশেষত্ব নিয়ে তেমন কোনও মতান্তর না থাকলেও গানের ক্ষেত্রে দেখা যায় একজনের গান ও অন্যজনের গান অনেক ভিন্ন। এই ব্যক্তিগত পরিবেশন রীতির ফলেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ঘরাণা বা গীতপ্রণালী। ব্যক্তিগত সৃষ্টির প্রয়াস এক্ষেত্রে শুধু পরিবেশন রীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করে চলে। ঘরাণার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিণী গাইবার প্রণালীর দ্বারা প্রভাবিত না হলে শ্রোতার মনে স্থায়ী আসন অধিকার করতে পারে না এবং এই অভাবের দরুন যদি কারও সৃষ্টির উপাদান বিস্মৃতির অতলে ডুবে যায় তাতে দোষ কারও বিশেষ আছে বলে মনে হয় না।

পূজারী যেমন রূপে, রসে, গন্ধে পূজার আবেষ্টনী সৃষ্টি করেন তেমনি সঙ্গীতশিল্পী গভীর অভিনিবেশে রাগরূপের আঙ্গিক সৃষ্টির কাজে অগ্রসর হন। ৺আব্দুল করিম খাঁর সঙ্গীত এ-পর্য্যায়ে পড়ে। ধীর মন্থর গতির সমন্বয়ে তাঁর গান যে শুনেছে সেই মোহিত হয়েছে। পূর্ণ আত্মসমাহিত মনে গান করতে হলে এ-ধারা অস্বীকার করা যায় না। রসের প্রাচুর্য্যে যখন মন ভরে ওঠে তখন সংযম হারালে স্থায়িত্বের প্রতি সংশয় জাগতে পারে। এই কারণে আব্দুল করিম খাঁ প্রবর্তিত গীতপ্রণালীতে সংযম মুখ্যতঃ এমন এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে যে তার সংস্পর্শে এসে সঙ্গীত বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে।

গোলাম আলী খাঁর গান শুনলেও এই কথাই মনে হয়। তিনি তাঁর পিতৃব্য কালে খাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন সেকথা আগেই বলেছি। এই বংশের গৌরব সর্বপ্রথম ফতে আলী খাঁর কল্যাণে গ্রথীত হয়। কালে খাঁর প্রতিভা এককালে এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে তখন তাঁকে "পাঞ্জাবের বাঘ" নামে অভিহিত করা হতো। গোলাম আলীর গীতপ্রণালী ঘরাণা-রীতিকে অগ্রাহ্য করে গঠিত হয় নি। কিন্তু বিধিবদ্ধ ধারার মধ্যেও তাঁর সঙ্গীতে জড়তার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। বন্ধন ও মুক্তির এ এক অপূর্ব সমন্বয়! শ্রোতার তৃপ্তিসাধনে তিনি অযথা স্বাধীনতাকামী হয়ে ওঠেন না! ঘরাণার সমস্ত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তিনি সঙ্গীত পরিবেশনের পক্ষপাতী। শিল্পীর গভীর অনুভূতি তাঁর গানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং এই পথ অনুসরণ করেই তিনি আজ যশের পূর্ণ অধিকারী হয়েছেন। শিল্পীমন ও সঙ্গীতের মধ্যে যে কতটা নিকট সম্পর্ক তা তাঁর গান শুনলে বুঝতে পারা যায়।

সে যুগের দর্শক

★

বিপিনবিহারী রায়

আচ্ছা, বিরুদা'—নরেন বললে, আপনি ত বহু প্রাচীন ব্যক্তি, সেকালের গিরিশ ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফি, অমৃতলাল বোস, যাঁদের আমরা শুধু নাম শুনেছি, তাঁদের সব অভিনয় করতে দেখেছেন। একটা কথা জিগ্যেস করি, আপনিই ঠিক উত্তর দিতে পারবেন।

বিরুদা' (আমাদের বন্ধু শ্রীবিরোচন শর্ম্মা) হেসে বললেন, কি সমস্যা আবার তোমাদের হলো বলো, আমার সাধ্য থাকে নিশ্চয় উত্তর দেবো।

নরেন বললে, ধরুন, আজকাল, মানে গত বিশ-ত্রিশ বছর ধরে, সিনেমা যেমন আমাদের জীবনের সব দিকে প্রভাব বিস্তার করেছে, শুধু ছবি দেখা আব তার ভালমন্দ আলোচনা ছাড়াও, ছেলেমেয়েদের মধ্যে ফিল্ম-অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চলন-বলন, হাসি-খুসী, পোষাক-পরিচ্ছদ, তাদের জীবনের ধারা, এই সবের আলোচনা চলে, শুধু আলোচনাই নয়, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ চলন-বলন ইত্যাদির অনুকরণও চলে, আপনাদের যুগে থিয়েটারের আর্টিষ্টদের নিয়েও কি এতটা আলোচনা, অনুকরণ প্রভৃতি চলতো?

বিরুদা বললেন, ও, তুমি নোভারো হুইস্কার্সের কথা বলছো?

—এ্যাঁ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে নরেন।

বিরুদা বললেন, তোমাদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ (হলিউডের) নির্ব্বাক যুগের অভিনেতা র‍্যামন নোভারোর অভিনয় কোন ছবিতে দেখে থাকবে, তবে সে ত' মারাই গেছে ২০।৩০ বছর আগে, নিতান্ত তরুণ যারা তোমাদের মধ্যে—নরেন, বিনয়, নিতাই তোমরা শুধু নামই শুনেছ। সে বেশ সুপুরুষ দেখতে ছিল, হিরোর পার্ট করতো, প্রেমের অভিনয় খুব ভা[illegible]া—সে তার গালের জুলপি খুব বড় করে অর্থাৎ ছোট গালপাট্টা দাড়ির মত রাখতো। তখনকার যুগে আমেরিকার তরুণ সম্প্রদায় [illegible]ই তার মত বড় জুলপি রাখতে আরম্ভ করলে, তাকে বলতো নোভারো হুইস্কার্স। কেন, আজকাল ত শুনেছি কানন-বালা শাড়ী, মানে না মানা সাড়ী এই রকম সব হয়েছে, সে ত তোমরা আমার চেয়ে বেশী জানবে। তা তোমরা জানতে চাইছ যে আমাদের যুগে এ-ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কি বলতে পারি। যুগটা ভাগ করে নেওয়া গেলে বলা যেতে পারে ১৮৯০ থেকে ১৯২০—এই ত্রিশ বছর পুরা যুগের রেশ্ চলেছিল। ১৯২০।২৫ থেকে এখন পর্য্যন্ত নতুন যুগ চলছে, আর্ট থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠা, শিশিরকুমারের আবির্ভাব, এই সব হলো আধুনিক যুগের কথা।

ছাখ, প্রথম কথা হচ্ছে, আজকের যুগে সিনেমার দর্শক-সংখ্যা যেমন লাখে দাঁড়ায়, সেকালে থিয়েটার দর্শকের সংখ্যা সে তুলনায় অনেক কম ছিল। ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, আজকের দিনে কলকাতায় গোটা পঞ্চাশ-ষাট সিনেমা রয়েছে, প্রত্যেকটাতে দিনে তিনবার ছবি দেখানো হয়, সোজা অঙ্কের ব্যাপার, ধরো পঞ্চাশটা সিনেমা, প্রত্যেকটাতে তিনটে সো'তে গড়ে মোট ২০০ লোক হয়, দৈনিক দশহাজার অথবা সপ্তাহে ৭০ হাজার দাঁড়ায়। আর তখন বাংলা থিয়েটার বলতে ষ্টার, মিনার্ভা, ক্লাসিক, আরো ২।১টা হতো যেতো, অর্থাৎ মোট ৪।৫ টার বেশী নয়। সপ্তাহে তিনদিন মাত্র অভিনয় হতো, বুধ, শনি ও রবিবার। গড়ে যদি প্রত্যেক দিনে ৩০০ করেও লোক ধরো, সপ্তাহে হাজার পাঁচেকের বেশী লোক হয় না। অবশ্য কলকাতার লোকসংখ্যাও তখন যথেষ্ট কম ছিল, এখন যেমন ২৫ লাখের ওপর লোক হয়েছে, ১৯০১ সালে লোকসংখ্যা দশ লাখেরও কম ছিল।

এ ছাড়া আর একটা দিক আছে। আজ যেমন সিনেমা দেখতে ১২।১৪ বছরের ছেলেমেয়ে থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই যায়, তখন অল্পবয়স্ক কিশোর বা বালক থিয়েটার দেখতে যেতোনা। অন্ততঃপক্ষে কলেজের ছাত্র বা যুবক এর নীচে বয়সের নয়। শুধু তাই নয়, এমন অনেক বাড়ী ছিল যেখানে কর্ত্তারা তাঁদের বাড়ীর এমনকি প্রাপ্তবয়স্ক যুবক যুবতীদেরও থিয়েটার দেখতে যাওয়া পছন্দ করতেন না। এর কারণ ছিল,

কর্তারা থিয়েটারের আবহাওয়াটা কলুষিত বলে মনে করতেন। এ রকম মনে করবার কারণ একবারে ছিল না এ-কথা বলা চলে না। তখনকার যুগে থিয়েটারের অভিনেত্রীরা সমাজের যে স্তর থেকে আসতেন সেটা ছিল অপাংক্তেয়, এবং যেহেতু পুরুষ অভিনেতারা তাঁদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করতেন সেজন্য তাঁরাও অপাংক্তেয় বলে গণ্য হতেন। তাই বলে এমন কথা বলা চলে না যে তাঁরা সকলেই চরিত্রহীন বা দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন। তাঁদের অনেকেই সাধারণের মতই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করতেন, অনেকেই গভর্ণমেণ্ট বা সওদাগরী আফিসে দিনেরবেলা চাকরী করতেন, থিয়েটারে কাজ করতেন সেটাও পেশা বা চাকরী হিসাবে, অর্থ সংস্থানের জন্যে। কিন্তু তবুও, সে যুগে এটা কল্পনা করা যেতো না যে, তাঁরা রাজ-ভবনে আমন্ত্রিত হয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করছেন, যেমন এখন দেখা যাচ্ছে। এই ত ক'মাস আগের 'চিত্রবাণী'তে একটা ছবি দেখলুম, কয়েকজন ভারতীয় অভিনেত্রী আমেরিকায় আমন্ত্রিত হয়েছেন, প্রেসিডেন্টের বাড়ী হোয়াইট্ হাউসে দাঁড়িয়ে তাঁদের ছবি উঠেছে। তার মানে, এখন বহু ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা পেশা হিসাবে অভিনেতৃ জীবন বরণ করেছেন এমনকি কয়েকজন আই, সি, এস্ পত্নীকেও এই দলে দেখা যাচ্ছে। এটা সে যুগে কল্পনার অতীত ছিল। আর সেইজন্যেই সেকেলে (তখনকার সেকেলে!) কর্তারা ধরে নিতেন যতসব বখাটে, বাউণ্ডুলেরাই থিয়েটার করে, এবং তাদের দূষিত আবহাওয়ার সংসর্গে না যাওয়াই ভাল। অবশ্য সে যুগের মহারথী যাঁরা ছিলেন, গিরিশ, অমৃতলাল প্রভৃতির কথা বাদ দিলে, সাধারণ অভিনেতাদের মধ্যে হয়ত অনেকে ছিল যাদের জীবনে ও চরিত্রে আপত্তিকর অনেক কিছু ছিল। আগেই বলেছি, এর ব্যতিক্রমও ছিল। আমি নিজে এক ভদ্রলোককে জানতুম—১৯০০-১৯১০ নাগাদ সময়ের কথা বলছি। তাঁর নাম ছিল অতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বাড়ী ছিল গঙ্গার ওপারে, শালিখা বা কাছাকাছি কোন স্থানে। রাইটার্স বিলডিং-সে কোন এক বিভাগে কেরাণীর চাকরী করতেন, থিয়েটারেও অভিনয় করতেন, বোধহয় আপিসে ৫০।৬০ টাকা পেতেন, থিয়েটারে ৩০।৪০ টাকা। বুধবারে আপিস-ফেরৎ মোটা জলখাবার খেয়ে রাত্রে অভিনয় করে, শেষ রাত্রে গঙ্গাপার হয়ে বাড়ী যেতেন, আবার সকাল ৯টা না বাজতেই আপিসের জন্য রওনা হতে হতো। বৃহস্পতিবার (এবং রবিবার রাত্রে অভিনয়ের পর সোমবার) দিনের বেলাটা আপিসে বে[illegible] তাঁর ঘুমিয়েই কাটতো, নাহলে বাঁচবেন কি করে? নিজের চোখে দেখেছি। [illegible] টেবিলে বসে কেরাণীরা কাজ করছে, আর

তিনি টেবিলের নীচে মোটা করে কাগজ-পত্র বিছিয়ে সটান শুয়ে নিদ্রামগ্ন। এ সব লোককে বাহাদুরী দিতে হয়, সামান্য আয় বাড়াবার জন্যে কি অমানুষিক পরিশ্রমই করতো।

যাই হোক, অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের কথা বলছিলাম, এরা সেকালে থিয়েটার-দর্শকের মধ্যে স্থান পেতোনা। তাই না, ক্লাসিক থিয়েটারের সুচতুর অধ্যক্ষ অমরেন্দ্র দত্ত ব্যবস্থা করলেন, সপ্তাহে একদিন (বুধবার) বেলা বারোটায় থিয়েটার আরম্ভ হবে। যতো সব স্কুল-কলেজপালানো ছাত্র, এমনকি অনেকে বই হাতে, এই সো'তে ভীড় করে যেতো। বিকেল ৫টায় বাড়ী গেল, অভিভাবকেরা জানতেও পারলেন না! এইভাবে তারা অভিভাবকের চোখে ধুলো দিয়ে থিয়েটার দেখার সখ মেটাতো।

আর একটা জিনিষ তোমাদের একালের ছেলেদের জানা উচিত, থিয়েটারে দোতলায় ছিল বক্স আর তার ওপরে তেতলায় ছিল জেনানা সিট, সামনে চিক্ ফেলা, সেখানে মেয়েরা বস্তো। থিয়েটার শেষ হওয়ার পর যাদের বাড়ীর মেয়েরা এসেছে, বাবুরা দাঁড়াতো গিয়ে পেছনের দরজার যেখানে সোজা তেতলা থেকে সিঁড়ি নেমে এসেছে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতো একজন ঝি, বাবুরা তাকে পরিচয় বললে সে হাঁক দিতো ওগো—ও—ও—ও, পটলডাঙ্গার সুরেনবাবুর বাড়ী—ই—ই—ই— আর তখন সেই বাড়ীর মেয়েরা নেমে আসতো। প্রথম প্রথম যুগে সিনেমাতেও সাধারণতঃ দোতলায় কাঠের পার্টিসন দিয়ে আড়াল-করা জেনানা সিট থাকতো, কিন্তু কালক্রমে এখন সব একাকার হয়ে গেছে, মেয়েরা সবাই এখন অবাধে পুরুষদের সঙ্গেই বসছে।

নরেন বললে, বেশ লাগছে বিরুদা, এবারে সেই কথাটা কিছু বলুন না, ফ্যাসান, কায়দা কানুন, ভঙ্গী এসব যেমন সিনেমার যুগে আলোচ্য ও অনুকরণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেরকম সেকালে কিছু [illegible] অভিনেতৃবৃন্দের জীবন, ধরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে [illegible]কর কৌতূহল, এসব কি তখনও ছিল?

সিগারেটে একটা টান দিয়ে বিরুদা বললেন, অবশ্যই ছিল, তা আবার ছিল না! কিন্তু কৌতূহল যথেষ্ট থাকলেও তখনকার যুগের আর্টিষ্টদের 'প্রাইভেট' জীবন ইত্যাদি জানবার সুযোগ ছিল খুব কম। তখন তো আর আজকের মত এতো ফিল্ম পত্র-পত্রিকা ছিলনা, কতো হয়েছে এখন, আর অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ, তাদের নিজের লেখা আত্মজীবনী, এসব তখন কোথায়?

হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, বলুন তো, তখন কি নিছক থিয়েটার সম্বন্ধে কোন পত্রিকাই ছিলনা? নরেন জিগ্যেস করলে।

আমি যতদুর জানি, বিরুদা উত্তর দিলেন, অমরেন্দ্র দত্ত মশায় "রঙ্গালয়" বলে একখানা সচিত্র মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন, আন্দাজ মনে হয় ১৯০৩-৪ এই রকম সময়। তখনকার প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে অমরেন্দ্রবাবু সম্পাদক নিয়োগ করেন এবং সে কাগজে গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল প্রভৃতি অনেকের লেখা থাকতো। যতদুর জানি, এইটিই ছিল থিয়েটার সম্বন্ধে প্রথম পত্রিকা, তবে বছরখানেকের বেশী চলেনি। এর পরে হেমেন্দ্রকুমার রায় "নাচ ঘর" বলে একখানি পত্রিকা বের করেন, তাতেও বহু পুরাতন তথ্য পাওয়া যাবে, আর ত কোন কাগজের কথা মনে পড়ছে না। হয়তো আরো হয়েছিল, আমার মনে নেই। আজ এই পর্য্যন্ত থাক্, আবার পরে কোন দিন এসে এসব পুরানো কাহিনী আলোচনা করা যাবে, বলে বিরুদা বিদায় গ্রহণ করলেন।

রূপালী প্রেম

রসরচনা : দেবেশ দাশ

রেখা : শ্রীরামকুমার

রূপালী প্রেম। সাচ্চা চাঁদির কারবার আপনাদের।

এ হেন একটা মন্তব্য শুনে হেসে ফেললেন ডিরেক্টার মশায়। আর প্রোডিউসার ত একেবারে হাঁ। ডিষ্ট্রিবিউটার মহোদয় গোঁফে তা দিতে দিতে এর পরের টিপ্পনীটা শোনবার জন্য ঘাড়টা একটু বাঁকিয়ে রাখলেন।

দোষ আমার নয়। এই ভদ্রলোক তিনজন সিনেমা জগতে তিন মহারথী। ওঁদের কল্যাণে অনেক ছবিঘরে রোজ সন্ধ্যায় নিয়ন আলো জ্বলে। আবার অনেক মূলধনওয়ালার কপালেও লাল বাতি জ্বলে। আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই কারো। কিন্তু একেবারে একজন আনকোরা নতুন নিরপেক্ষ লোক পেয়ে ওরা আমায় বাংলা ছবি সম্বন্ধে মতামতের জন্য ছেকে ধরেছেন।

প্রথমেই বলে রাখি যে ওঁরা কেউ আমায় নিজেদের মোটরে চড়িয়ে 'পাসে' ছবি দেখাবার আশা দিয়ে রাখেন নি। নিদেনপক্ষে 'ট্রিংকা'র দোকানে এক কাপ চা। তবু বললাম—সভয়ে বলব, না নির্ভয়ে?

বলা বাহুল্য, ওঁরা ইংরেজীতে যাকে বলে—খুব স্পোর্ট। অনেক দর্শকের মন নিয়ে খেলিয়েছেন। অনেক ক্যাপিটালিষ্টের টাকা নিয়েও। কাজেই মেট্রো গোল্ডুইনের ছবির প্রথমেই যে সিংহটা থাকে, তার ঘাড়ের কেশর ফোলানোর মত পোজ নিয়ে তিনজনেই বললেন—নির্ভয়ে।

এটুকু ভরসাও দিলেন যে যেহেতু আমায় কেউ চেনে না, কোন চিত্র-তারকা যে গোসা করে কণ্ট্রাক্ট বাতিল করে দেবেন সে ভয় নেই।

তারপর বললেন, প্রথমে বলুন পর্দার প্রেম সম্বন্ধে।

কি বলি ভেবে পেলাম না। ইংরেজী কথাটা মনে পড়ল—যা কিছু ঝকমক করে সবই যে সোনা তা নয়। তবে এটুকুও মনে হল যে সিনেমাওলারা ত কখনো পর্দার প্রেমকে খাঁটি সোনা বলে চালান না। ওতে ছুটো পূর্বরাগ, বিয়ের পরে মনের ভুলে একটু-আধটু অভিসার, এসব জিনিষ থাকে। মাঝি, বেঁধো না তরী হেথা—এ হেন করুণ সুরে বারণ করার মত গানও থাকে। কাজেই খাঁটি সোনা নয়, এ কথা বললে ঠিক হবে না।

তাই বললাম—রূপালী প্রেম। সাচ্চা চাঁদির কারবার হচ্ছে পর্দার প্রেম।

একটু চুপ করে থেকে ডিরেক্টার বললেন,—হয়ত

সাবধান, আংটিটা কাঁচের বাঁধানো

আপনি কবি। রূপালী পর্দার তারকাদের চেয়ে আকাশের তারকা আপনার বেশী পছন্দ।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আকাশের তারা চকমক করে, শান্তি দেয়। আর এই তারারা জলজল করে, জ্বালিয়ে দেয়।

সে কি মশায়? এত সুন্দর নাচ, এত মিঠে গান ওঁরা পরিবেশন করেন। তবুও আপনি?……আপনি বড় বেরসিক। 'পিন-আপ গার্ল' পর্য্যন্ত আপনার ভাল লাগে না?

অপরাধ কবুল করলাম।

তবে যে সব আমেরিকান সুঠাম তরুণীদের ছবি লোকে দেওয়ালে পিন দিয়ে এঁটে রেখে রাতদিন দেখে তাদের সঙ্গে বাঙালী অভিনেত্রীদের তুলনা করাটা যে অন্যায় সে কথাও মনে হল। তাই বললাম,—গড়ন-পেটন থাকলে তবে ত পিন-আপ করা যায়। আমাদের এদের যতটা ঢেকে রাখা যায় ততটাই ভাল।

তিনজনই চটে গেলেন। একজোটে বললেন,—আপনি বোধ হয় মার্কিন ছবির সবই ভাল দেখেন। যায় ওদের প্রেম করতে করতে হাতে আংটি পরিয়ে দেওয়া পর্য্যন্ত।

হাসতে হাসতে বললাম—ঠিক অতটা নয়। ওরা যখন আংটি পরায় তখন মনে মনে বলে দিই,—সাবধান, এনগেজমেণ্টের আংটিটা কাঁচের বানানো।

সাবাস মশায়—হেসে উঠলেন ডিষ্ট্রিবিউটার। আপনাকে মার্কিন মুলুকের তারকারাও ঠকাতে পারবে না। আশা করি অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার দৃশ্যে দেশী ছবির স্বপক্ষে দুয়েকটা কথা আপনার মনে আসে।

মুচকি হেসে বললাম,—তা আসতে পারত। কিন্তু দেখুন একটা বড় মুস্কিল হয়। আমাদের ছবিতে যখনি আশীর্ব্বাদের দৃশ্য হাজির হয় আমি অমনি চোখ বুঁজে তারা ব্রহ্মময়ীর নাম জপ করি।

ডিরেক্টারের আর [illegible] না। বললেন,—সে কি মশায়, এ হেন রোমাঞ্চকর মুহূর্ত্তে আপনি কিনা………

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললাম—দেখুন, রূপসজ্জাতে অর্থাৎ রূপ না থাকলেও সাজাতে যারা ওস্তাদ সেই মেক-আপ-ম্যানদের খুব বাহাদুরী আছে। কিন্তু বলুন ত, গাধা পিটিয়ে ডিরেক্টার মশায় যদি বা ঘোড়া বানাতে পারেন, হাতীকে কি মেক-আপ-ম্যান হরিণ সাজাতে পারে? আপনারা যা করেন তাতে শুধু তৈরী হয় প্রেমের বিরুদ্ধে একখানা ম্যাজিনো লাইন।

প্রেমের বিরুদ্ধে ম্যাজিনো লাইন

তার মানে?

মানে হচ্ছে যে কত বয়সে আপনাদের নায়িকা পর্দা থেকে শেষ পর্য্যন্ত বিদায় নেন তা আপনারা খবর রাখেন না। ওঁরা সুরু করেন মধুর সপ্তদশী, তবু অচুম্বিতা অর্থাৎ "সুইট সেভেনটিন বাট ইয়েট আনকিসট" সেই বয়সে। আর কমসে কম বিশ বছর পরে মাত্র একুশ বছর বয়সে করেন রিটায়ার। তা শাস্ত্রে লেখে যে দেবতাদের বয়েস হয় না।

একটু চুপ করে থেকে আর একটা ফোড়ন ঝাড়লাম। বললাম—দেখুন, এই স্বাধীনতার যুগে আমরা এত এগিয়ে গেছি যে ওই সব আশীর্বাদ আর ছাঁদনতলার দৃশ্যে আর মন ওঠে না। ওসবে শুধু আইবুড়ো ছেলেমেয়েদের দীর্ঘশ্বাস জাগায় আর বিবাহিত লোকদের মন সামনে থেকে পেছনে টেনে আনে।

ডিরেক্টার নড়ে-চড়ে বসলেন। বললেন—তাহলে বলুন, দীর্ঘশ্বাসগুলো সিনেমায় বন্ধ করে দিই।

না, না খবরদার তা করবেন না। দীর্ঘশ্বাস হচ্ছে তারকাদের যে ফিলিংস্ অর্থাৎ ভাবে আগুন ধরেছে তার প্রমাণ, তার ধুঁয়ো।

এতক্ষণে প্রোডিউসার মুখ খুললেন,—তাহলে প্রেমের দৃশ্যগুলো কেমনভাবে সাজালে হালের বাংলার তরুণ-তরুণীদের রুচবে সে কথা বলুন।

ফ্যাসাদে ফেললেন ভদ্রলোক। সমালোচনা করা সোজা। সমঝানো বড় শক্ত। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম।

উনিই খেই ধরিয়ে দিলেন। বললেন—এই ধরুন, যদি দুজনেরই চোখে জল ঝরিয়ে দেওয়া হয়।

জোরে মাথা নাড়লাম। উহুঁ, তাতে হবে না। নায়িকার চোখের জলে রূপ পায় তার নারীত্ব আর নায়কের অশ্রুতে তার দুর্বলতা। প্রেমের চেহারা তাতে খোলে না।

তবে ?

হঠাৎ দেখলাম রাস্তা দিয়ে চলেছে একজন মেমসায়েব মার্কা তরুণী। মুখে সিগারেট না মোমবাতি বোঝা যায় না। মোদ্দা কথা বাতিওয়ালা অর্থাৎ আলোকপ্রাপ্তা। অন্য দিক দিয়ে হন হন করে চলেছে এক জহর, গাঙ্গুলী নয়, জ্যাকেট। মুখে সিগার, পায়ে স্লিপার।

দেখিয়ে দিলাম ওদের দুজনকে। বললাম—মনে মনে মেপে-জুপে নিন ওদের। মেয়েটি দেখাবে রম্ভা আর ছেলেটি বলবে—আই লভ ইউ। এক কাঁদি কলার মত গজিয়ে উঠবে ওদের প্রেম। দর্শক-দর্শিকারা হবে দিশেহারা আর বক্স অফিস হয়ে যাবে লুঠ।

আই লভ ইউ

কৃতজ্ঞতায় গলে গেলেন ওঁরা তিনজনেই।

তবে ডিষ্ট্রিবিউটার অত সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তিনি গোঁফে চাড়া দিতে দিতে বললেন—মশাই, নায়িকার যে সুন্দর হওয়া দরকার। শুধু চটকে ত চলবে না। জানেন ত, কবিরা নারীর সঙ্গে ফুলের তুলনা করেছেন।

আহা, আমিই কি আর করছি না নাকি ? ওদের দুজনেরই আছে খসবুই, কিন্তু সে ত আর পর্দায় ফুটবে না। আর রূপ ? সে ত আপনার মেক-আপ-ম্যানের কৌটোয় খুঁজে পাবেন। ম্যাক্স ফ্যাক্টর মার্কা।

ডিরেক্টার এবার মুখ খুললেন,—বেশ তো কিন্তু শুধু নায়কই কি নায়িকার রূপের প্রশংসা করবে ? নায়িকা নায়কের রূপ সম্বন্ধে চুপ-চাপ থাকবে ?

জবাব দিলাম,—কিচ্ছু লোকসান নেই। পুরুষ ব্যবহার করে ভাষা আর নারী করে কটাক্ষ।

প্রোডিউসার বললেন,—তা যাই বলুন না কেন—যৌবনের আবাহন করতেই হবে। তা না হলে প্রেম খোলে না।

হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। তাই মাথাটা শুধু ডাইনে বাঁয়ে দোলালা[illegible]কটু লেগ পুল, অর্থাৎ রগড় করবার ইচ্ছাও হল।

হেসে বললাম—পশ্চিমের [illegible]

আপনারা তবু পুরোপুরি পশ্চিমে কারবার দেখাতে ভয় পান। তাই লোকে সিনেমাতে নতুন কিছু পাচ্ছে না।

নতুনের কথায় প্রোডিউসার পুলকিত হয়ে উঠলেন। বললেন,—দেখুন আমরা ত পূর্বরাগের পূর্বের রাগ পর্য্যন্ত দেখাতে রাজী আছি। আপনার মতামত জানলেই এবার পর্দায় সেটা তুলে দেখাব।

সাধু, সাধু—সমর্থন করলাম তাকে। এই দেখুন না—আপনাদের নায়িকারা যখন তমুলতা থেকে তরুলতায় প্রমোশন পান শুধু তখনি প্রেমের দৃশ্যে তাদের দেখাবেন।

তমুলতা থেকে তরুলতায় প্রমোশন

বিলেতে আমেরিকায় তরুণরা প্রৌঢ়াদের প্রেমে পড়ে। না পড়লেও তাদের বিয়ে করতে চায়। আমাদের দেশে ঠিক তার উল্টো। দেখুন না একবার ওসব দেশের রেওয়াজটা দেশী পর্দায় চালু ক'রে। প্রেমের নতুন রূপ খুলে যাবে।

কিন্তু!.....

কিন্তু-টিন্তু কিচ্ছু না। নায়িকাদের ত বয়েস হয় না। কাজেই প্রেমের পা[illegible] ভাল মানাবে। তাছাড়া [illegible]র পুলক শিহরণে পুরোনো ছবিঘরগুলির পর্দা আরো একটু বেশী কাঁপবে—এটুকুই যা লোকসান।

প্রোডিউসার জানতে চাইলেন প্রেম করবার সময় কখন সবচেয়ে সুন্দর দেখায়? হাসলে, কাঁদলে না 'ব্লাশ' করলে (লাজুক ভাব দেখালে)?

মনে মনে ভেবে দেখলাম তিনটে আলাদা আলাদা রূপ। নায়িকা যা ছিলেন, যা হইয়াছেন ও যা হইবেন। তাই বললাম—হাসি, অশ্রু, লজ্জা তিনটেই ত হচ্ছে ওদের হাতিয়ার। মেয়েরা যখন মুখে দেখায় রাগ আর মনে অনুরাগ তখনি সবচেয়ে সুন্দর দেখায়।

ওঁরা খুসী হলেন না। বরং শাসিয়ে দিলেন যে এবার থেকে রূপ আর প্রতিভা এই দুটি পদার্থ-ই যে নায়ক নায়িকাদের আছে শুধু তাদের দিয়ে প্রেমের পার্ট করাবেন।

আমি কিন্তু খুসী হয়ে বললাম,—চমৎকার হবে তাহলে। প্রেমের আগুনে দেখবেন ষ্টুডিয়ো থেকে সিনেমা পর্য্যন্ত সবারই মন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। তবে তার ঠ্যালা সামলাতে দমকল না ডাকতে হয়।

নাঃ। মিছে-মিছি আপনার মতামত চেয়েছিলাম মশাই। আপনার পরামর্শে চলবে না। আপনি হয়ত বলবেন যে জননেতা গুটিকয়েক ধরে নায়ক সাজিয়ে দিন।

ওঁদের বুদ্ধি দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। তা হলে দেখছি বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ খুব ফর্সা। নেতাদের খেলার মত বাংলার নায়ক-নায়িকার খেলায় প্রেমেরও মাত্র একটি ফল। সেটা হচ্ছে ট্রাজেডি। নেতা আর নায়ক একেবারে মাণিকজোড় কম্বিনেশন হবে। আকাশের তারকা আর ফিলিমের তারকায় থাকবে না কোন তফাৎ। ওঁদের হাতে হাত রেখে ঝাঁকানি দিয়ে হ্যাণ্ডশেক করলাম। অভিনন্দন করলাম যে এভাবে চললে শীগ্‌গিরই রূপালী

প্রেম খাঁটি সোনা হয়ে উঠবে। নেতা আর নায়িকা দুজনেরই প্রেম একেবারে নিঃস্বার্থ, পুরোপুরি পরস্মৈপদী। অভিনয় ত শুধু অভিনয়ই। অভিনয় করতে গিয়ে হৃদয় হারিয়ে ফেলতে হয় না। ওটি পকেটেই বহাল তবিয়তে থাকে।

উঠে পড়লাম। ওঁদের কাছে ভাঙলাম না যে এখনি একটা সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। রাস্তার মোড়ে ট্রাম দেখা যাচ্ছে। যাত্রী যাত্রিনীরা সবাই রূপোলী প্রেমের সঙ্গে মরিয়া হয়ে প্রেমে পড়েছে। সবাই যাচ্ছে সিনেমায়। সে জন্যে গোটা দুনিয়াটাকেই ওরা ভুলে গেছে।

ভোলে নি কিন্তু ট্রাম কোম্পানী। প্রেমে পড়ে সব ভোলো ক্ষতি নেই। কিন্তু ভাড়াটা দিতে যেন ভুলো না। অজুহাত তুলো না যেন পকেট মারা গেছে। তাই ট্রামের গায়ে বড় বড় হরফে রাষ্ট্রভাষায় নোটিশ লটকানো

——প্রেম আর পকেটমার হইতে সাবধান——

প্রেম আর পকেটমার হইতে সাবধান

বাংলার নাট্যপত্রিকা

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় নাট্যশালা সৃষ্টির মত বঙ্গীয় নাট্য-পত্রিকার উৎপত্তি কাহিনীও কৌতুহলোদ্দীপক এবং বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়ে সে কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার প্রয়োজনও আছে। সাধারণ নাট্যশালার সৃষ্টির অনেক পূর্বে কলকাতার নাট্যানুরাগী সম্ভ্রান্ত সমাজের উদ্যোগে যখন এ্যামেচার বা সখের নাট্যাভিনয় সহরের বিভিন্ন স্তরে রীতিমত আলোড়ন উপস্থিত করে তখন থেকেই যেমন সেই সব অভিনয়ের আলোচনায় সুধী সমাজ ও সাময়িক পত্রিকাগুলি অবহিত ছিলেন, তেমনি সৌখীন অভিনয়-পর্বের পর সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হলে, নট-নাটক-নাট্যশালা সম্বন্ধে বিশেষ ধরণের পত্রিকা প্রচারকল্পে নাট্যরসিক-সমাজে একটা প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ ধরণের নাট্যপত্রিকা প্রকাশিত করা সে-যুগে সহজসাধ্য ছিল না বলেই, একেবারে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা না বেঁধে, অনেকেই যে দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়েছেন, সে পরিচয় পাওয়া যায়। সে সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করছি।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ অনেকেই নট-নাটক-নাট্যশালা প্রসঙ্গে প্রশস্তিসূচক আলোচনা করেছেন এবং সম্বাদ ভাস্কর, সংবাদ প্রভাকর, বেঙ্গল হরকরা, সমাচার চন্দ্রিকা, সোম-প্রকাশ, অমৃতবাজার, হিন্দু পায়োনিয়ার, হিন্দু পেট্রিয়ট, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলিতেও নিয়মিত-রূপে নাট্য-বার্তা পরিবেশিত হোত। এই সব পত্রিকা থেকে কাটিংস সংগ্রহ করে ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্য-শালার ইতিহাস' সঙ্কলন করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থের একস্থানে তিনি লিখেছেন, 'তখনকার দিনের সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইলেই নাট্যশালা ও নাটক সম্বন্ধে বহু মন্তব্য চোখে পড়ে। লেখকগণ সকলেই নাট্যশালা ও নাটকের প্রসারকে দেশের উন্নতির লক্ষ্য বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন।'

সুপণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি "পুরোহিত ও অনুশীলন" নামে একখানি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। বিদ্যানিধি মহাশয় ছিলেন নাট্যানুরাগী। তিনি উক্ত পত্রিকায় নট-নাটক-নাট্যশালা সম্বন্ধে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করে প্রকাশ করতে থাকেন। তখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতাদের আহ্বান ক'রে তাঁদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য আহরণ করে তিনি বিষয়টিকে নিখুঁত ও সমর্থন-যোগ্য করতে সচেষ্ট ছিলেন। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির পত্রিকায় নট-নাটক-নাট্যশালা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ের পরিকল্পনা থেকেই বিদ্যানিধি মহাশয়ের নাট্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বরচিত 'সন্দর্ভ সংগ্রহ' নামক গ্রন্থেও তিনি নট-নাটক-নাট্যশালা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছিলেন। 'সাধারণী' পত্রিকায় সাহিত্যাচার্য অক্ষয় চন্দ্র সরকারও নাট্য সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। 'সাধারণী'র নাট্য-সমালোচনা থেকে সেকালের নট-নাটক-নাট্যশালার অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' নাটকের অভিনয় দেখে সরকার মহাশয় 'সাধারণী' পত্রিকায় যে সমালোচনা করেছিলেন, এখনকার পাঠকমহলের অবগতির জন্য তার কিছুটা অংশ এখানে অবিকল উদ্ধৃত করছি।

"মেঘনাদ বধের অভিনয় দেখিতে গিয়া আমরা যে প্রীতিলাভ করিয়াছি, অনেকদিন আমাদের ভাগ্যে সে-প্রকার সুখ আর ঘটে নাই। রামচন্দ্র এবং মেঘনাদ এই দুই রূপে নাট্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র [illegible] অভিনয় করেন। পাত্র-দ্বয়ের চরিত্র, কার্য্য এবং [illegible] সমস্তই বিভিন্ন, সুতরাং একই ব্যক্তির দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ কিছু বিসদৃশতা হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে [illegible]। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের

অভিনয়-দক্ষতায়, তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায়, এ-দোষ দেখিয়াও আমরা মনে কিছু করিতে পারি নাই, দোষ একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম এবং তাঁহার রামরূপের অভিনয়ে বারংবার আমাদের কঠোর চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ যখন পূজাগারে প্রবেশ করেন, তখন গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদ-সম্ভব সৌম্যভাব দর্শনে আমরা মুগ্ধ হই, আবার তৎপরক্ষণেই যখন মেঘনাদ সহসা রোষকষায়িত নেত্রে বীরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বক্ষপ্রসারণপূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিলেন, তখন তিনি অভিনয়-পটুতার চরম সীমা দেখাইলেন, তাঁহার সে ভাব অদ্ভুত, বিস্ময়কর। তাহাতে আমরা মুগ্ধেরও অধিক হইয়াছিলাম। ইংলণ্ডের প্রথিতনামা গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা কোনও গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণা হয় না। গিরিশ বঙ্গের অলঙ্কার।...গিরিশবাবু যখন রামরূপে লক্ষ্মণকে বিদায় দেন, ঠিক সেই সময় মহিলা-আসনের সম্মুখস্থ চিক খসিয়া পড়ে, কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ উভয় দর্শকই তৎকালে এরূপ মুগ্ধ যে, কাহারও ইহা লক্ষ্য হয় নাই। অঙ্ক-শেষে পটক্ষেপণ হইলে নারীদর্শকবৃন্দ সতর্ক হইলেন।" (সাধারণী, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৭)

সাধারণ নাট্যশালা সম্পর্কে নটগুরু গিরিশচন্দ্র যখন নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, তখন থেকেই নাট্যশালার পক্ষ থেকে একখানি শক্তিশালী নাট্য-পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। কিন্তু নাট্যশালা পরিচালনার সঙ্গে নাট্য-পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব একসঙ্গে গ্রহণ করা সহজ নয় জেনেই তাঁকে নিরস্ত থাকতে হয়। তৎকালে তাঁর রচিত কবিতা ও নাট্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলি 'জন্মভূমি' 'অর্চনা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হোত।

হাতীবাগানের দত্ত-পরিবারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। গিরিশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে এ-বাড়ীতে আসতেন। তখন নাট্য-জগতের দিক্‌পালস্বরূপ গিরিশবাবুকে পরিবেষ্টন করে দত্তবাড়ীর বৈঠকখানায় রীতিমত মজলিস জমে উঠত। এ-বাড়ীর জ্যেষ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন রেলীর আফিসের মুৎসুদ্দী, তিনি থিয়েটার দেখতে ভালবাসতেন, গিরিশচন্দ্রের নাট্যাভিনয় দেখে প্রচুর আনন্দ পেতেন। মধ্যম ভ্রাতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররূপে এ্যাটর্নীসিপ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত

হয়েছেন, আর কনিষ্ঠ প্রিয়দর্শন সুকুমার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র, কিন্তু সেই বয়সেই বাড়ীর আস্তাবলের দিকে একটা নিভৃত ঘরে কুসঙ্গীদের নিয়ে নাট্যচর্চ্চা করেন। গিরিশবাবু বাড়ীতে এসেছেন শুনলেই তিনি সচকিত হয়ে উঠতেন, ছুটে আসতেন বৈঠকখানায়, নট-গুরুর কাছে ঘেঁসে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু গিরিশবাবু অপাঙ্গে এই কিশোর ছেলেটির অপরূপ চেহারাটি দেখে তখন মনে মনে কি ভাবতেন কে জানে, কিন্তু কোনরকম প্রশ্রয় দিতেন না। অমরেন্দ্রনাথ কিন্তু নটগুরুর সঙ্গে মেশবার জন্যে উসখুস্ করতেন।

গিরিশবাবু সে সময় ধীরেন্দ্রবাবুকে প্রায়ই বলতেন যে, থিয়েটারের পেছনে কিছু টাকা ফেলে তাকে ভালোভাবে চলবার সুযোগ-সুবিধা যাতে করে দেন। একদিন কথায় কথায় বললেন : ছাখ, কলকাতা সহরে এই নাট্যাভিনয়কে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন বিশিষ্ট ঘরের নাম-করা ধনীর দুলালরা। তাঁরা অজস্র পয়সা ঢেলে অস্থায়ী নাটমঞ্চ তৈরী করে নানা শ্রেণীর শিল্পীদের আনিয়ে নিখুঁত ভাবে নাট্যাভিনয় করে আদর্শ হয়ে রয়েছেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, ছাতুবাবুদের বংশধররা, শোভাবাজার ও পাকপাড়ার রাজারা যে পথ দেখিয়ে গেছেন, আমরা তারই অনুসরণ করে তাঁদের সেই 'দুর্লভ দর্শন' সখের অভিনয়কে সর্বসাধারণের দেখবার উপযোগী করে আজকের দিনে এই অবস্থায় এনেছি। এখন যদি তোমাদের মত কোন বিশিষ্ট ও বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের অবস্থাপন্ন লোক ব্যবসায় বুদ্ধি নিয়ে এর সংস্পর্শে আসেন, তাহলে এই সাধারণ নাট্যশালাকেও আমরা অসাধারণ করে তুলতে পারি।

গিরিশচন্দ্রের এই প্রস্তাব ধীরেন্দ্রনাথকে অভিভূত করে। তিনি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলেন : কত টাকা ফেললে তোমাদের থিয়েটারটাকে ভালোভাবে চালাতে পারা যায় বলত ?

গিরিশবাবু বললেন : আমাদের থিয়েটারে অনেক কিছুই আছে, কাজেই খুব বেশী টাকা ফেলবার প্রয়োজন হবে না। হাজার পঁয়ত্রিশ হলেও একে সর্বাঙ্গসুন্দর করা যেতে পারে।

ধীরেনবাবু তখন ভাবেন যে, এই টাকা ফেলেন যদি তাঁদের বাড়ীর কাছের—একরকম পাড়ারই এই নামী থিয়েটারটিকে যদি ভালো রকমে জাঁকিয়ে তোলা যায়, অন্ততঃ ভদ্র কলাবিদ্‌দের একটা উপায় তো হতে পারবে। তাহলে মন্দ কি !

গিরিশচন্দ্র তাঁকে আরও বলেন যে, ধীরেন্দ্রনাথের মত বড় ঘরের নামী লোক যদি থিয়েটারের সত্যই পৃষ্ঠপোষক হন, তাহলে ক্রমে ক্রমে এটা অপবাদমুক্ত হয়ে একটা ইন্‌ষ্টিটিউসনে পরিণত হবে। তা ছাড়া, থিয়েটার থেকেই একটা মুখপত্র বার করে নাটক ও নাট্যশালার উন্নতির দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

ধীরেন্দ্রবাবু তখন খুশি হয়েই বললেন : বেশ, তাহলে তোমাদের থিয়েটারের ভেতরটা একবার দেখে আসি চল। বরাবর তো বাইরে থেকেই অভিনয় দেখা গেছে, এখন অন্দরটা দেখা যাক্।

গিরিশচন্দ্রও উৎফুল্ল হয়েই তৎক্ষণাৎ ধীরেন্দ্রবাবুকে

থিয়েটারের আভ্যন্তরীন সিন-সিনারী সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবার জন্য নিয়ে চললেন। ছুটির দিন সেটা, দিনমানে ষ্টেজের মধ্যে সিফ্‌টার, চাকর-বেয়ারা, রঙ্গমঞ্চের পরিচারিকাদের মধ্যে তখন রীতিমত কলহ চলেছে—পরস্পরের স্বার্থসংক্রান্ত কোন একটা ব্যাপার নিয়ে। তারা কল্পনাও করেনি যে, এমন অসময়ে কর্তৃপক্ষদের কেউ মঞ্চের মধ্যে আসবেন। দিনের দিকে যাঁরা আসেন, বাহিরে আফিসে কাজ-কর্ম সেরেই চলে যান। গিরিশবাবুর সঙ্গে মঞ্চের ভেতরে ঢুকেই সেই উচ্ছৃঙ্খল দৃশ্য ও ইতরভাষায় গালি-গালাজ শুনেই অভিজাত বংশের সন্তান, মার্জিত রুচিবিদ্ ধীরেন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—থাক্ গিরিশ চলো আমরা বাইরে যাই।

গিরিশবাবুকে দেখেই ওপক্ষ লজ্জিত শঙ্কিত ও অপ্রস্তুত হয়ে সরে পড়েছিল, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের অন্তর এমনি বিষিয়ে উঠেছিল যে, তিনি গিরিশবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করেই ভেতর থেকে চলে এলেন। তারপর, ভাসা ভাসা কথায় গিরিশবাবুকে পর দিন আসতে বলে বাড়ী ফিরে গেলেন। কিন্তু পরদিন সকালের দিকে গিরিশচন্দ্র দত্ত-বাড়ীতে এসে ধীরেন্দ্রনাথকে খবর দেবা মাত্রই তিনি বাইরে না এসে ভেতর থেকে বলে পাঠালেন—'ষ্টেজের মধ্যে কাল যে কাণ্ড দেখেছি তাতে থিয়েটারের সঙ্গে আমাদের মত লোকের সম্বন্ধ রাখা উচিত নয় বলেই স্থির করেছি। ওর মধ্যে আমি আর যেতে রাজী নই।'

ধীরেনবাবুর এই ব্যবহারে এবং এ ধরণের কথা শুনে গিরিশচন্দ্র রীতিমত চটে গেলেন। থিয়েটারের নিম্নশ্রেণীর কতকগুলো লোকের ব্যবহারে থিয়েটারের ওপর বিশ্রী একটা ধারণা পোষণ করা যে ঠিক নয়, তিনি সে কথা ধীরেন্দ্রনাথকে বোঝাতেও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ একেবারে অটল, তাঁর এক কথা—আমাদের ঘরের ছেলেদের থিয়েটারের সংস্পর্শে যাওয়া উচিত নয়, আমি বুঝতে না পেরে তখন এগিয়ে গিয়েছিলাম, ব্যাপার বুঝে এখন পিছিয়ে যাচ্ছি।

গিরিশবাবুও ক্রুদ্ধকণ্ঠে ধীরেন্দ্রনাথকে জানিয়ে দিয়ে এলেন—'তোমাদের এই ভদ্রঘরের ছেলেকে দিয়েই আমি যদি থিয়েটার খোলাতে না পারি, আমার নামই তাহলে গিরিশ ঘোষ নয়!'

এ-প্রসঙ্গ শুনে অনেকেই হয়ত চমকে উঠবেন; ভাববেন বাড়িয়ে লেখা হয়েছে। কিন্তু কথাটা সত্যি। নটগুরু তৎকালে এমনই জেদীই ছিলেন। আভিজাত্য বা আত্মম্ভরিতার গর্বে কেউ কোন প্রকার অনুচিত ব্যবহার করলে, সাধারণ বা মধ্যবিত্তদের অবজ্ঞা করলে, গিরিশচন্দ্র সে অবহেলা সহ্য করবার পাত্র ছিলেন না, তার যোগ্য প্রতিবিধান করে তবে নিরস্ত হতেন। পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসার পর তিনি অবশ্য আত্মশাসনের শক্তিলাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

এ-ঘটনার পর ধীরেন্দ্রনাথের অনুজ অমরেন্দ্রনাথ কুসংসর্গে পড়ে নানা প্রকার অপব্যয়ে দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথ, মধ্যমাগ্রজ হীরেন্দ্রনাথ, মায়ের সাহায্য নিয়েও তাঁকে আয়ত্তে আনতে

সমর্থ হলেন না। তাঁদের উপদেশ, অনুরোধ, শাসন সুপরামর্শ সব ব্যর্থ হয়ে গেল। বন্ধুদের নিয়ে প্রত্যেক অভিনয় রজনীতে থিয়েটার দেখা, বাগমারীর বাগানে আমোদ-প্রমোদ, কুস্থানে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় অবাধে চলতে থাকে। ষ্টার থিয়েটারে তখন সবেমাত্র 'চন্দ্রশেখর' নাটক খোলা হয়েছে, ঐ নাটকে শৈবলিনীর ভূমিকায় তারাসুন্দরী তাঁর অপূর্ব্ব অভিনয়ে বিপুল প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। অমরেন্দ্র-নাথ তারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থিয়েটারের বিশিষ্ট দর্শকরূপেই অশোভন আচরণে প্রবৃত্ত হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষদের বিরাগভাজন হলেন। তাঁরা অমরেন্দ্রনাথকে অনুযোগ করেই নিরস্ত হলেন না, তাঁর অগ্রজদের কাছেও অভিযোগ করলেন। কিন্তু এর ফল হলো বিপরীত। অমরেন্দ্রনাথ তারাসুন্দরীকে ষ্টার থিয়েটার থেকে ভাঙিয়ে বাগমারীর বাগানে নিয়ে গেলেন।

এই সময় অমরেন্দ্রনাথের অন্তরে আগ্রহ জাগল, তিনি একখানি পত্রিকা বার করবেন, আর সেই পত্রিকায় নাট্যশালা ও নট-নটীদের কথা ছাপা হবে। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে তো একজন নামজাদা লোকের প্রয়োজন, যিনি সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা দেবেন। অমনি মনে পড়ল তাঁর নটগুরু গিরিশচন্দ্রের কথা। আর কালবিলম্ব না করে তিনি একেবারে গিরিশ-চন্দ্রের আলয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করে উদ্দেশ্যটি জানালেন: আমি একখানা মাসিক পত্র বার করতে চাই—আপনাকেই তার সম্পাদক হতে হবে।

গিরিশচন্দ্র কথাটা শুনে বিস্মিতই হয়েছিলেন—আঠারো-উনিশ বছরের একটি ছেলে এসে বলছে, মাসিক পত্রিকা বার করবে! তিনি বললেন: মাসিক পত্র বার করে ঠিক মত চালানো কি সোজা কথা—অনেক টাকার দরকার।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন: টাকা আমি জোগাড় করেছি। তার জন্যে আটকাবে না। বলুন, আপনি সম্পাদক হবেন? আপনি আমাদের আত্মীয়—আপনার ওপরে আমার জোর আছে বলেই আপনার কাছে এসেছি।

গিরিশচন্দ্র বললেন: আমি ত বাপু থিয়েটারের জন্যে

অরোরার 'জয়দেব' চিত্রে কবিপ্রিয়া পদ্মাবতীর ভূমিকায় শ্রীমতী দেবযানি

নাটক লিখি, অভিনয় করি। ওসব কাগজ-ফাগজ ত কখনো চালাইনি। তাছাড়া সম্পাদক হিসেবে আমার কোন খ্যাতিই নেই। তার চেয়ে তুমি কোন নামকরা সম্পাদককে ধর, তাতে কাগজ চলবে ভাল।

কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ নাছোড়বান্দা, তিনি বললেন: আমি ত মামুলী কাগজ বার করছিনে, নাটকের কথা, অভিনয়ের কথা, নাট্যশালার কথা, নট-নটীদের কথা আমার কাগজে থাকবে। আর, আপনি ত নাট্যজগতের দিকপাল তার ওপর নটগুরু, তাই আপনাকে ধরেছি।

গিরিশচন্দ্র চমৎকৃত হয়ে বললেন: এ্যাঁ! এই বয়সে তুমি থিয়েটারী কাগজ বার করবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমার কাছে এসেছ? তাহলে থিয়েটারের দিকে তোমার খুব ঝোঁক আছে বল?

গিরিশচন্দ্রেরই মাজোপাজদের ভেতর থেকে

একব্যক্তি অমরেন্দ্রনাথের নাট্য-প্রীতি সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন, অমরেন্দ্রনাথকে আর বলতে হলো না। ছেলেবেলা থেকে কি ভাবে খেলার ছলে থিয়েটার করে এসেছে খেলার সাথীদের নিয়ে, তারপর এই বয়সে সাবালক হতে না হতেই ওঁদের বাগমারীর বাগানে কি ভাবে রীতিমত একটা নাটুকে দল করেছে, সব কথাই শুনিয়ে দিলেন নটগুরুকে। এর পর অমরেন্দ্রনাথও বললেন : দেখুন, থিয়েটার একটা খোলবার মত টাকা এখনো আমার হাতে আসেনি তাই, থিয়েটারী কাগজ খুলেই ঐ চর্চ্চাটা বজায় রাখছি। পরে টাকা যেই হাতে আসবে তখন এমন একটা উঁচু ধরণের থিয়েটার খুলব, সবাই দেখে বাহোবা দেবে।

এই তরুণেরই জ্যেষ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথের সেদিনের কথা গিরিশচন্দ্রের মনে বিজলী ঝলকের মত চমক দিয়ে উঠল। কি অপমানই তিনি করেছিলেন গিরিশচন্দ্রকে আর, তিনিও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কি ভাবে তাঁকে শাসিয়েছিলেন! সেই দাম্ভিক ধীরেন্দ্রনাথের অনুজ আজ তাঁর কাছে এসেছে নাট্য পত্রিকা খোলবার উদ্দেশ্যে—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে একথাও বলছে যে, টাকা হাতে এলে থিয়েটার সে খুলবেই। চমৎকার। সে দিনের কথাগুলি এত শীঘ্র যে—

কিন্তু গিরিশচন্দ্র অধৈর্য হলেন না, যদিও ক্রোধের বশে একটা পণ করে বসেছিলেন, কিন্তু এই সুকুমার তরুণের মুখ চেয়ে আপনাকে সংযত করে বললেন : কাগজ করতে চাইছ কর, বুঝে-সুঝে চালাতে পারলে লোকসান খেতে হবেনা, বিশেষ ক'রে এ ধরণের কোন [illegible] বাজারে নেই। তা ব'লে থিয়েটার খোলবার ঝোঁক এখন মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল। অনেক লোকে বাজারে, তাদের স্বার্থ আছে বলে। কিন্তু ও বড় শক্ত কাজ। অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারপর ওতে নামলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।

যাই হোক প্রস্তাবিত পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন চলতে লাগল, তার নামকরণ অমরেন্দ্রনাথ আগেই করেছিলেন। সে নাম—'সৌরভ'। সম্পাদক হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সহকারী সম্পাদক, প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ। ম্যাঙ্গো লেন থেকে এইচ, সি, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং মুদ্রাকর রূপে পত্রিকা ছাপবার ভার নিলেন। বার্ষিক মূল্য আড়াই টাকা, প্রতি সংখ্যা চার আনা। ২।৭ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে—শোভাবাজার রাজবাড়ীতে 'সৌরভ'-এর কার্যালয় খুললেন অমরেন্দ্রনাথ। ক্রাউন আর্ট পেজী আকারে ৬৮পৃষ্ঠার আয়তনে—বঙ্গাব্দ ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসে 'সৌরভ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কবিতায় ১১টি সন্দর্ভ প্রথম সংখ্যায় স্থান পেল। যথা—

১। সৌরভ পত্রিকার মুখবন্ধ—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ২। সমাজ-চিত্র (সামাজিক উপন্যাস) অমরেন্দ্রনাথ ৩। কে তুমি (প্রবন্ধ) অমরেন্দ্রনাথ ৪। কলঙ্ক (কবিতা) অমরেন্দ্রনাথ ৫। নক্সা (গল্প) অমরেন্দ্রনাথ ৬। সত্য (কবিতা) গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৭। গ্রহফল (প্রবন্ধ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৮। ঝালোয়ার দুহিতা (ঐতিহাসিক উপন্যাস) গিরিশচন্দ্র ৯। সুখ কোথায় (প্রবন্ধ) প্রমথনাথ বসু ১০। হৃদয় রত্ন (কবিতা) বিনোদিনী দাসী ১১। প্রবাহের রূপান্তর (কবিতা) তারাসুন্দরী দাসী।

মুখবন্ধে অমরেন্দ্রনাথ লিখলেন—'সংসারের কর্তব্য মাত্রেরই সৌরভ আছে। সকলেরই স্তরে স্তরে সৌরভ জড়িত। যদি সংসারে থাকিয়া সকল সুখ চাও, একাধারে

এম পি প্রোডাকসন্সের জনপ্রিয় ছবি 'অগ্নি-পরীক্ষা'য় সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী, কমল মিত্র,
যমুনা সিংহ ও শিখারাণী

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দেখিতে সাধ থাকে, তবে সাহিত্যের "সৌরভ" সেবন কর। সেই উদ্দেশ্যেই সৌরভের বিকাশ। সৌরভ যাহাতে দিগন্ত প্রসারিত হয়, যথাসাধ্য ত্রুটি হইবে না। এক্ষণে সাধারণের সহানুভূতির সংযোগ প্রার্থনীয়।"

'সৌরভে'র প্রথম সংখ্যায় যে দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়, তার একটি লেখেন তখনকার যশস্বিনী অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী ও অপরটির লেখিকা উদীয়মানা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী তারাসুন্দরী। নাট্যশালার অভিনেত্রীদের রচনা বলেই গিরিশচন্দ্র কবিতা দুটির মুখবন্ধ স্বরূপ লিখলেন—"সভ্য সমাজে আমার স্থান আছে কিনা জানি না, জানিতেও চাহি না, কারণ যৌবনের প্রথম অবস্থা হইতে, রঙ্গভূমির উন্নতির উদ্দেশ্যে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া জনসাধারণের উপেক্ষার পাত্র হইয়া আছি। সে যাহা হউক, অভিনেতৃবর্গ আমার চক্ষে আমার পুত্র কন্যার মত সন্দেহ নাই। তাহাদের গুণগ্রাম অপ্রকাশিত থাকে আমার ইচ্ছা নয়। সেই উদ্দেশ্যে প্রবীণা ও নবীনা দুইজন অভিনেত্রীর রচিত নিম্নলিখিত কবিতা দুইটি পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম।"

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সম্পাদিত পত্রিকায় অভিনেত্রীদ্বয়ের রচিত কবিতা সম্পর্কে ঐ মন্তব্যটুকু ছাড়া নট-নাটক-নাট্যশালা সম্বন্ধে এমন কোন প্রবন্ধ গিরিশচন্দ্র বা অমরেন্দ্রনাথ লেখেন নি—যার জন্য 'সৌরভ'কে নাট্য-পত্রিকার পর্যায়ে ফেলা চলে। সাধারণ সাহিত্য পত্রিকার মতই এই পত্রিকাখানিতে গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে এবং চারমাস প্রকাশের পর 'সৌরভ' বন্ধ হয়ে যায়।

পত্রিকার সাধ মিটে গেলে অভিনেতারূপে থিয়েটারে নামবার সাধটি তখন অমরেন্দ্রনাথের অন্তরে প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে উঠল। তিনি গিরিশবাবুকে ধরে বসলেন: আমি অভিনয় করতে চাই, আমাকে আপনি থিয়েটারে ঢুকিয়ে দিন।

গিরিশবাবু আপত্তি করে বললেন: তুমি হচ্ছ বড়লোকের ছেলে, পরম সুখে মানুষ হয়েছ, কোন কষ্ট কখনো ভোগ করনি। অভিনেতাদের জীবন বড় কষ্টের। তুমি তা সহ্য করতে পারবে না।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন: সে কি, আমি ভাবতাম ওদের জীবন খুবই সুখের, ওরা খুব আনন্দেই থাকে।

গিরিশবাবু বললেন: বাইরে থেকে সাধারণ লোক তাই মনে করে বটে, কিন্তু আসলে তা নয়। ওদের বড় কষ্ট।

অমরেন্দ্রনাথ তখন জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার মত লোক থিয়েটারে থাকতেও অভিনেতাদের এত কষ্ট! আপনি সে কষ্ট ঘোচাবার চেষ্টা করেন না কেন?

গিরিশচন্দ্র বললেন: আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনা, কিন্তু আমার চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হবে না যে পর্যন্ত মালিকরা সচেতন না হবেন, অভিনেতৃদের জন্যে ওঁদের প্রাণ না কাঁদবে! কিন্তু সে রকম মালিক কোথায় পাব বল?

অমরেন্দ্র বললেন: আমি যদি থিয়েটারের মালিক হতাম তাহলে অভিনেতাদের এ সব কষ্ট দূর করতাম—তাদের মান মর্য্যাদা বাড়িয়ে দিতাম, তাদের আয় বৃদ্ধির দিকেও লক্ষ্য রাখতাম।

গিরিশচন্দ্রের কাছেই তিনি আলোচনাসূত্রে জানতে পারেন যে, যে সব নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রী মঞ্চে অভিনয় করেন, যাঁদের অভিনয় দেখবার জন্য লোকের আগ্রহের অন্ত নেই, তাঁদের মাসিক বেতনের পরিমাণ ষাট থেকে আশী। যাঁরা মাঝামাঝি রকমের অভিনেতা, তাঁর পান মাসে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। আর নিম্নশ্রেণীদের কথা তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, তাঁদের বেতনের হার সিন ঠেলা সিফ্‌টারদের চেয়ে বেশী নয়, বরং কমই।

অমরেন্দ্রনাথ এ সব খবর জেনে রীতিমত ব্যথাই পান, তাঁর অন্তরটি ছিল অত্যন্ত কোমল, আর্তস্বরে বললেন: দেখুন, আমার ছেলেবেলা থেকেই একটা আগ্রহ ছিল থিয়েটার করব, অভিনেতা হব। আমার খেলাধুলা ছিল—ঝাঁকারির তীর ধনুক তৈরী করে থিয়েটারের অনুকরণে যুদ্ধের অভিনয় করা। বড় হলে থিয়েটার দেখা যেন বাতিক হয়ে পড়ে, হেন বই নেই—আমি যার

অভিনয় দেখিনি। নিয়মিত ভাবে থিয়েটার দেখার ফলে দোষ ত্রুটিও চোখে ধরা পড়ত, তখন ভাবতাম—আমি যদি কখনো থিয়েটার করি, কোন ত্রুটি তার রাখব না। তখন কিন্তু মঞ্চকে উন্নত করবার কথাই ভাবতাম, কিন্তু মঞ্চে নেমে যাঁরা অভিনয় করেন, এক কথায়—যাঁরা এই থিয়েটারের প্রাণ, তাঁদের সম্বন্ধে কিছুই ভাবতাম না। তখন কি জানতাম যে, এত কষ্টে তাঁদের দিন চলে!

গিরিশবাবু বললেন: তোমার সবই খবর আমি রাখতাম—মতিগতিরও। ভায়েদের সঙ্গে ঝগড়া করে বেহিসেবির মত সমস্ত সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে মনের আনন্দ আর স্বার্থপর ইয়ার-বক্সিদের মনোরঞ্জন করবার জন্য যে টাকা পেয়েছিলে, সমস্তই বাগমারীর বাগানে ফুঁকে উড়িয়ে দিলে। এমন অর্বাচীন তুমি, সখের কাগজখানাকেও রাখতে পারলে না। সেই সময় তুমি টাকাগুলো বাজে খরচে উড়িয়ে না দিয়ে, অনায়াসেই একটা থিয়েটার খুলতে পারতে। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে এমনি আমোদে মেতেছিলে যে, সে দিকে আর লক্ষ্যই ছিল না। লক্ষাধিক টাকা তুমি দুটো বছরে শেষ করে ফেললে। আমার একবার মনে হয়েছিল, তোমাকে ঐ সব বাজে আমোদ থেকে সরিয়ে এনে থিয়েটারের নেশা মাথায় ঢুকিয়ে দিই, কিন্তু খবর নিয়ে জেনেছিলাম যে, তুমি বড়ই অব্যবস্থচিত্ত, তার ওপর তোমাদের সঙ্গে আমার একটা আত্মীয়তাও আছে। হাতীবাগানের ঘোষারী দত্তের ছেলেকে গিরিশ ঘোষ থিয়েটারে নামিয়ে উৎসন্নে দিলে—অতবড় বংশের মুখ নীচু করালে, এই অপবাদ পাছে শুনতে হয়, তাই আমি নিরস্ত হয়েছিলাম।

অমরেন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বললেন: সত্যি তাই যদি করতেন, আপনার পরামর্শে আমি তখন সত্যিই ফিরতে পারতাম। মিছিমিছি ড্রামাটিক ক্লাব খুলে তার পেছনে যে টাকার রাশি ঢেলেছি, তাতে একটা ভালো থিয়েটার খোলা যেত! কেন আপনি আমাকে সে পরামর্শ দেন নি, স্যার?

গিরিশবাবুও উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন: দিতাম। এমনকি, তোমার বড়দা যখন থিয়েটার করবেন বলে আমাকে কথা দিয়েও নিজের বংশগরিমার অহঙ্কারে হঠাৎ অত্যন্ত অভদ্রভাবে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওঁর বংশের কাউকে দিয়ে আমি যদি থিয়েটার খোলাতে না পারি, আমার গিরিশ ঘোষ নামটাই মিছে। কিন্তু বাপু, পরে ভেবে দেখি—রাগের বশে যে পণ করেছি, সেটা অন্যায়। তার জন্যে আমাকেও দুর্নাম কুড়োতে হবে। এ-রকম প্রতিজ্ঞা লংঘন করলেও দোষ নেই।

মনে মনে পরম কৌতুক ও কৌতূহল বোধ করে অমরেন্দ্রনাথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁর বড়দা সম্বন্ধে সেই অপ্রীতিকর কথাগুলি শুনলেন। অমনি তাঁর মুখখানা ভার হয়ে উঠল, বললেন: বড়দা সত্যিই খুব ভুল করেছিলেন। তাঁর যে-রকম ব্যবসা-বুদ্ধি, তিনি যদি থিয়েটারের মালিক হতেন, আর আপনি থাকতেন পরিচালক—তাহলে সত্যিই বাংলা-রঙ্গমঞ্চের ভাগ্য ফিরে যেত। আমি যদি স্যার, এ-কথা জানতাম, তাহলে বড়দার সঙ্গে যখন বিষয় ভাগ আর টাকাকড়ি নিয়ে ঝামেলা বাধিয়েছিলাম—তখন তাঁর কথাটা যাতে বজায় থাকত, তার ব্যবস্থা করতাম। যে টাকা হাতে পেয়েছিলাম, তা থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কেন পঞ্চাশ হাজার টাকা অনায়াসে আপনার হাতে দিতে পারতাম। তাহলে আজকের অবস্থা হয়ত অন্যরকম রূপ ধরত, আমাকেও আজ থিয়েটারে অভিনয় করবার আর্জী নিয়ে আপনার কাছে আসতে হোত না। যাই হোক, অভিনেতাদের অবস্থার কথা আপনার মুখে শুনে আমার মনে আর অন্যের থিয়েটারে ঢুকে অভিনয় করবার সাধ মুছে গেল। তবে এ-কথা আপনাকে আমি বলে যাচ্ছি স্যার, অভিনেতা আমি হবই—থিয়েটার আমাকে করতেই হবে, তখন আবার আমি আপনার কাছে আসব।

অনেকের ধারণা, অমরেন্দ্রনাথ ভ্রাতাদের সঙ্গে বিরোধ করে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে তাঁর অংশের দরুন যে প্রচুর টাকা পেয়েছিলেন, সে [illegible] থিয়েটার করে উড়িয়ে দেন। কিন্তু এ-কথা ঠিক নয়। [illegible] পদস্খলনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অমিতব্যয়ে অভ্যস্ত হন এবং এমন একটা কুজ্ঝটি

তাঁকে ঘিরে ধরেছিল যে, তাদের ইঙ্গিতেই তাঁকে অজস্রভাবে অর্থব্যয় করতে হোত। মাসোহারার টাকায় যখন খরচ কুলোত না, তখন দাদাদের কাছ থেকে নানা ছলে টাকা আদায় করে বন্ধুদের কাছে প্রিয় ও উদার হতেন। ধীরেন্দ্রনাথ তখন রেলী ব্রাদার্সের বাড়ীর মুৎসুদ্দী, মাসে তিন চার হাজার টাকা বৈধভাবে উপার্জন করেন। গতিক দেখে তিনি অমরেন্দ্রনাথকে ঐ প্রতিষ্ঠানের কেসিয়ারের পদে বসিয়ে দিলেন। সে টাকায় বৃহৎ একটি পরিবারের ব্যয় স্বচ্ছলভাবে তখনকার দিনে নির্বাহ হতে পারত। কিন্তু কুবন্ধু পরিবেষ্টিত অমরেন্দ্রনাথের মাসিক ব্যয় তাতে কুলিয়ে উঠল না। অগত্যা বন্ধুদের পরামর্শে কুসীদলোভী মহাজনদের কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট কাটতে আরম্ভ করলেন। এই সূত্রে ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্য হলো এবং স্বাধীনচেতা জেদি অমরেন্দ্রনাথ অমন সুখের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে পৈতৃক সম্পত্তির ওপর তাঁর অংশ দাবী করে বসলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের চাই তখন টাকা, ভাগ বাঁটোয়ারাজনিত বিলম্ব সহ্য করবার মত শক্তি নেই, অগত্যা নগদ লক্ষাধিক টাকা নিয়ে তাঁকে পৈতৃক সম্পত্তি মায় ঘরবাড়ী বাগান সমস্ত ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে হলো। বছর দু'য়েকের মধ্যেই সেই টাকা প্রায় নিঃশেষ করে ফেলে অগত্যা নিরুপায় হয়ে অভিনেতার বৃত্তি গ্রহণের আশায় তিনি গিরিশচন্দ্রের দ্বারস্থ হন। ভেবেছিলেন, 'সৌরভ' কাগজের জন্য থিয়েটার মহলে তাঁর যে সৌরভ ছুটেছে, বিধাতাদত্ত ভালো চেহারা আছে, নিজের অভিনয়ের ওপরও তাঁর যখন আস্থা রয়েছে, তখন গিরিশচন্দ্র তাঁকে সাদরে লুফে নেবেন। কিন্তু তিনি যখন অভিনেতাদের কষ্ট, বিশেষতঃ তাঁদের উপার্জনের স্বল্প পরিমাণের কথা জানিয়ে দিলেন, তখন অমরেন্দ্রনাথকে এ বৃত্তি অবলম্বনে ভাগ্যোদয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হলো।

কিন্তু অন্যদিক দিয়ে গিরিশচন্দ্রের কথাগুলির গুরুত্বও তিনি উপলব্ধি করলেন এবং সেইটিই তাঁকে ক্রমাগত প্রেরণা দিতে থাকল যে, এ অবস্থা থেকে একটা রীতিমত পরিবর্তন তাঁকে আনতেই হবে, সেটি হচ্ছে—নিজের চেষ্টা যত্ন উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে একটা থিয়েটার খোলা। অমরেন্দ্রনাথ এ-সময় পৈতৃক বাগমারীর বাগান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে তারই কাছে আর একখানি বাগানবাড়ী ভাড়া নিয়ে সেখানেই সবান্ধবে বসবাস করছিলেন। বরাবরই তিনি ভাবপ্রবণ। এখন নটগুরুর কথাগুলি তাঁর অন্তরে নতুন একটা ভাবপ্রবাহ বইয়ে দিল। ভাবাবেগে তিনি প্রকাশ করলেন যে, এ্যামেচার নয়, রীতিমত পেশাদারী থিয়েটার তিনি খুলবেন। এখন থেকে তাঁর মনে প্রাণে এই হলো একমাত্র কামনা। কথাটা প্রচারিত হ'তে তাঁর আত্মীয়-সমাজে একটা সাড়া পড়ে গেল। একি সর্বনেশে কথা—হাতীবাগানের অভিজাত দত্ত বংশের ছেলে 'কালু' থিয়েটার করবে! বাড়ীর পরিজন ও আত্মীয়-সমাজে অমরেন্দ্রনাথ 'কালু' নামে পরিচিত ছিলেন। ভায়েরাও উদ্বিগ্ন হলেন। জ্যেষ্ঠ ধীরেন্দ্রনাথ তৎকালের বর্দ্ধিষ্ণু সমাজের মুকুটমণি, মধ্যমাগ্রজ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন বেদান্ত রত্নরূপে বাংলার পণ্ডিতসমাজে বরেণ্য হয়েছেন। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন; তাঁদের অনুজ কিনা থিয়েটার খুলে উচ্চ বংশের নাম ডোবাতে বসেছেন! ফলে, বাগমারীর বাগান ব'য়ে একের পর এক এক আত্মীয় উপস্থিত হয়ে তাঁকে নিরস্ত করতে সচেষ্ট হলেন। ভায়েদের আপত্তি ও

অনুরোধ জানিয়ে ঐ হীন সংকল্প ত্যাগ করবার জন্য বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের সব উদ্যম বৃথা হলো। অমরেন্দ্রনাথ প্রত্যেকের মুখের ওপরেই দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দিলেন যে তাঁরা থিয়েটারের যতই নিন্দা করুন অভিনেতৃদের হেয় ভাবুন, আমি তা মানতে রাজী নই। আমার মতে, দেশে যে সব সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান আছে—থিয়েটার তাদের অন্যতম। সমাজে থেকে যিনি যত বড় পদে বহাল হয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করুন না কেন, অভিনেতারা তাঁদের তুলনায় কিছুতেই নীচু নয়, বরং কলাবিদ্‌রূপে এঁদের মর্য্যাদা আরো বেশী। আমার থিয়েটার করবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে—থিয়েটারের দুর্নাম ঘুচিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রীতিমত প্রতিষ্ঠা দেওয়া।

এর পর সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার খোলবার উদ্দেশ্যে সেই বাগান-বাড়ীতেই বাছা বাছা অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে তাঁর পুরোনো 'ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব'টিকে ঢেলে সাজালেন। কবিবর নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক বাজার' নামে নাট্যরঙ্গ নিয়ে মহলা আরম্ভ হলো। দানীবাবু, চুনীবাবু, নীলমাধববাবু, নৃপেনবাবু, নিখিলবাবু, সতীশবাবু, প্রবোধবাবু, তারাসুন্দরী প্রভৃতিকে নিয়ে দল গড়ে উঠল। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যকে নাট্যে রূপায়িত করে দিলেন গিরিশচন্দ্র। তখনকার 'এমারেল্ড থিয়েটারে' অমরেন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব সর্বপ্রথম 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় করলেন। ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ—সিরাজ, প্রবোধ ঘোষ—মোহনলাল, চুনীলাল দেব—জগৎ শেঠ, দানীবাবু—ক্লাইভ, বৃটানিয়া ও সিরাজ মহিষীরূপে তারাসুন্দরী অবতীর্ণ হলেন। বেল্লিক বাজার-এ ললিতের ভূমিকায় নামেন তারাসুন্দরী। দানীবাবুর নাম এই অভিনয়ে "ইয়ং জি, সি, ঘোষ" নামে বিজ্ঞাপিত হলো। অমরেন্দ্রনাথ তখন বিংশবর্ষীয় যুবা। তাঁর অপূর্ব চেহারা, সুকণ্ঠ ও অপরূপ ভঙ্গী দর্শকদের অভিভূত করল। স্বয়ং নবীনচন্দ্র সেন অমরেন্দ্রনাথের সিরাজ-চরিত্রের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গ্রীণরুমে গিয়ে অমরেন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করলেন: তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।

এইভাবে কিছু কাল ভেসে ভেসে অভিনয় করার পর অমরেন্দ্রনাথ বিখ্যাত ধনী গোপাললাল শীলের 'এমারেল্ড' ষ্টেজ লীজ নিয়ে 'ক্লাসিক' থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করলেন—১৩০৪ বঙ্গাব্দের ৪ঠা বৈশাখ, ইং ১৮৯৭—১৬ই এপ্রিল গুড ফ্রাইডের দিন। গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী' ও 'বেল্লিক বাজার' নিয়ে নূতন থিয়েটারের উদ্বোধন হলো। এখন থেকে নিয়মিত সুসংস্কৃত 'ক্লাসিক থিয়েটার' শনি রবি ও বুধবার নব নব নাট্য-সম্ভার নিয়ে কৌতূহলী নাট্যরসিক সমাজের আগ্রহ চরিতার্থ করতে লাগল। ক্রমে ক্লাসিক থিয়েটার প্রতিযোগী নাট্যমঞ্চগুলিকে দাবিয়ে জনপ্রিয় নাট্যশালায় পরিণত হয়ে উঠল এবং অমরেন্দ্রনাথ সকল দিক দিয়েই প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন করে এমন সব সংস্কারমূলক উন্নত প্রথার ব্যবস্থা করতে লাগলেন, নাট্যজগতে একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল। আগে পাতলা রাফ কাগজে ক্ষুদ্রাকারে থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল ছাপা হোত, অমরেন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট আইভরি-ফিনিস কাগজে হাফটোন

প্রায় আট বছর একটানাভাবে যশ ও আর্থিক সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। 'বিডন ষ্ট্রীটের কেশরী' নামে তিনি থিয়েটার মহলে খ্যাতিলাভ করেন। ঠিক যেন রাজার হালে চলতেন, মেজাজও ছিল তেমনি উঁচুদরের। টাকাকে টাকা বলে ভাবতেন না—তাঁর কাছে যেন ধূলিমুষ্টি। যদি তিনি বুঝে চলতেন, তাহলে এক 'ক্লাসিক' থিয়েটার থেকে তখনকার দিনে ভাগ্য ফিরিয়ে ভাগ্যবান মনোমোহন পাঁড়ের মত বিপুল বিত্তবান হতে পারতেন। কিন্তু নির্বিচারে দান, অনন্যসাধারণ অমিতব্যয় ও অব্যবস্থচিত্তের জন্য তিনি এহেন সৌভাগ্যকে বরাবর ধরে রাখতে পারেন নি।

সে যাই হোক, এখন আমাদের কথায় আসা যাক। ক্লাসিকের যখন গৌরবোজ্জ্বল অবস্থা, সেই সময়েই তাঁর মনে পূর্ব্ব-আকাঙ্ক্ষিত 'নাট্য পত্রিকা' প্রকাশের আগ্রহ জাগ্রত হয়ে উঠল। তার ফলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ক্লাসিক থিয়েটার থেকেই তিনি 'রঙ্গালয়' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশে অবহিত হলেন। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ১৭ই ফাল্গুন, ইং ১লা মার্চ, ১৯০১—শুক্রবার 'রঙ্গালয়ে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকার মুখবন্ধে তিনি লিখলেন :

"নানাবিধ কারণে প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের কোপদৃষ্টিতে আমরা পড়িয়াছি। তাঁহাদের নিকট উৎসাহ পাওয়া দূরে থাক, প্রতি পদে পদদলিত হইবার আশঙ্কা! যদি প্রয়োজন হয়—উক্ত মহাত্মাগণের মনোবিরাগের কারণ আমরা পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে পরে প্রমাণ করিব। অনেকে সংবাদপত্রে রঙ্গভূমির অভিনয় সমালোচনা পাঠ করিয়া দোষগুণের সত্যাসত্য বিচার করেন। [illegible] কোনও সম্পাদক লিখিলেন—'অমুক

'বিরাজ বউ' চিত্রে শকুন্তলা

ব্লক সংযোগে ক্লাসিক থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে এলোপাথাড়িভাবে বিলির বন্দোবস্ত করলেন। থিয়েটারের অভিনেতা, অভিনেত্রী, অন্যান্য শিল্পী ও কর্মীদের সাবেক হারের বেতন দ্বিগুণ তিনগুণ বাড়িয়ে দিলেন, তার ওপর প্রতিভাবান নট-নটীদের বোনাস ও বেনিফিট দেবার রীতি চালু করলেন। রঙ্গমঞ্চে নৃত্যগীত-পটিয়সী রূপসী কিশোরীদের দলে দলে আবির্ভাব ও নানা ঢংয়ের নৃত্যলীলা দর্শক-সমাজকে বিহ্বল করে তুললো। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, অন্যান্য মঞ্চে যখন মুষ্টিমেয় দর্শক, ক্লাসিক থিয়েটারে তখন তিল ধারণের স্থান নেই—পিছনে ও পাশে যেন বাদুড় ঝুলছে। অমরেন্দ্রনাথের [illegible] তাঁর ক্লাসিক মঞ্চে তখনকার নির্বাক [illegible] ছায়াছবিও প্রদর্শিত হতে লাগল এবং তাঁর রচিত 'শিবরাত্রি' [illegible] কর্তৃক বাঙ্গালী নটনটীদের [illegible] চিত্রে [illegible]য়িত হলো।

স্থানটি ভাল হয় নাই।' কিন্তু কেন ভাল হয় নাই, মন্দ কোন্‌খানটায়, সে সকল কথার নাম-গন্ধ নাই অথবা বলিবার মত অভিজ্ঞতার অভাব। অথচ, আমাদের এমন কোন উপায় নাই, যাহার দ্বারা প্রতিবাদ চলে। সে অভাব দূর করিবার জন্য এবং বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চসমূহ সর্ব্বসাধারণের উপকার কি অপকার সাধন করিতেছে, তাহাও বিশিষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য, উপরন্তু—কি করিয়া অভিনয় করিতে হয়, কিরূপ শিক্ষায় উচ্চাঙ্গের অভিনেতা হওয়া যায়,—এই সকল বিষয়েরও পর্য্যালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে 'রঙ্গালয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিতরূপে 'ক্লাসিক থিয়েটার' হইতে প্রকাশিত হইতেছে।"

'বিরাজ বহু' চিত্রে কামিনী কৌশল ও অভি ভট্টাচার্য্য

অমরেন্দ্রনাথের 'রঙ্গালয়' প্রকাশের পরেই 'রঙ্গভূমি' নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তথাপি নাট্য-পত্রিকার ইতিহাসে তার নামটি উল্লেখ করতে আমরা বাধ্য।

অমরেন্দ্রনাথের স্বভাবই ছিল, যখন যে কাজে হাত দেবেন, তাকে চরম করে তোলা—তিনি যেন কোন দিক দিয়ে পিছিয়ে না থাকেন। তখন সাংবাদিক-রূপে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব নাম ও প্রতিষ্ঠা—বাংলা সংবাদপত্রমহলে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সম্পাদকরূপে বিখ্যাত। অমরেন্দ্রনাথ দ্বিগুণ বেতন দেবার ব্যবস্থা করে তাঁকে 'বঙ্গবাসী' অফিস থেকে ভাঙ্গিয়ে আনলেন 'রঙ্গালয়ে'র জন্যে। পাঁচকড়িবাবুর সম্পাদনায় রঙ্গালয় অপ্রতিহত গতিতে প্রকাশিত হতে লাগল। এখানেও অমরেন্দ্রনাথ ব্যবসায় বুদ্ধি চালিত হয়ে পত্রিকা প্রকাশে যে প্রবৃত্ত হননি, তাঁর খামখেয়ালী বিধি-ব্যবস্থায় তা প্রকাশ পেল। আইভরি-ফিনিস কাগজে ম্যাটার ছেপে, তার সঙ্গে আর্ট পেপারে ছাপা অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রতিকৃতি সম্বলিত নাটকীয় দৃশ্যাবলী বিতরণে যে কত ব্যয় পড়ে, সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপও করতেন না। কেউ বললেও শুনতেন না। অথচ, প্রতি সংখ্যা 'রঙ্গালয়' দুই পয়সা দামে বিক্রী হোত, বার্ষিক মূল্য ছিল আড়াই টাকা। কিন্তু সংখ্যাপ্রতি খরচা পড়ে যেত দু'আনারও বেশী। এ-সম্পর্কে অমরেন্দ্র বলতেন—"আমার উদ্দেশ্য থিয়েটারকে প্রচার করে জনপ্রিয় করে তোলা। এই যে বাংলার ঘরে ঘরে ভালো ভালো নাটকের দৃশ্য বিশেষের ছবি বাঁধিয়ে টাঙ্গিয়ে রাখছে, এর কি কোন ফল নেই? নাই-বা টাকার দিক দিয়ে লাভ হলো; কিন্তু থিয়েটারের সুনাম প্রচার [illegible] থিয়েটারের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়ছে এ কি [illegible] লাভ [illegible] এই [illegible]ণের নাট্যপ্রীতি ও [illegible] প্রকৃত দরদ নিয়ে আর কোন নাট্য-সংশ্রবে এসেছিলেন বলে জানা নেই।

পাঁচকড়িবাবু যেমন শক্তিশালী সম্পাদক ছিলেন, তেমনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বিরোধীপক্ষকে কশাঘাত করতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই সূত্রে 'বসুমতী'র মালিক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং 'নবযুগে'র মালিক পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রায় একই সঙ্গে 'রঙ্গালয়ে'র বিরুদ্ধে দু'দফা মানহানির মামলা দায়ের করেন। সে মামলা সহরে রীতিমত চাঞ্চল্য তোলে। অমরেন্দ্রনাথ জলের মত টাকা ব্যয় করে প্রতিপক্ষদ্বয়কে মামলা মিটিয়ে নিতে বাধ্য করেন। চার বছর প্রচারের পর কমপক্ষে ষাট হাজার টাকা লোকসান দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ অবশেষে 'রঙ্গালয়' বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

এদিকে থিয়েটারের ব্যাপারেও অমরেন্দ্রনাথের দুর্দিন ঘনিয়ে আসছিল। ১৯০৫ অব্দের ২রা এপ্রিল অভিনয়ের পর অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থেকে বিদায় নিলেন। হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে থিয়েটার রিসিভারের হাতে গেল। ক্লাসিক থেকে বেরিয়ে অমরেন্দ্রনাথ তাঁর অনুগত কর্মীবৃন্দ নিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে তখনকার 'কার্জন থিয়েটার' ভাড়া নিয়ে নাম বদলে 'গ্র্যাণ্ড-থিয়েটারে'র পত্তন করলেন। জন-সাধারণের ওপর তখনো অমরেন্দ্রনাথের এত আস্থা ছিল যে, তিনি 'গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে'র হ্যাণ্ডবিলে লিখলেন—'আমি যদি বনে গিয়েও থিয়েটার খুলি, আমার বিশ্বাস, সেখানেও আপনাদের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হব না।' এখানেও অমরেন্দ্রনাথ 'পৃথ্বীরাজ' নাটক খুলে এই পরিত্যক্ত ও অনাদৃত স্থানে জনপ্রবাহ ছুটিয়েছিলেন। পরে 'গ্র্যাণ্ডের' নাম তুলে দিয়ে 'নিউ ক্লাসিক' নাম চালু করে বিষবৃক্ষ অবলম্বনে 'কুন্দ' নাটক খুললেন। এর পরবর্তী নাটক হরনাথ বসুর 'স্বর্ণহার'। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখন অমরেন্দ্র-নাথকে চারদিক দিয়ে পরিবেষ্টন করেছে, 'স্বর্ণহার' খোলবার আগেই তাঁর শুভাদৃষ্টের হার হারিয়ে গেল। ভগ্নস্বাস্থ্য, আশাভঙ্গ, কপটবন্ধুদের শঠতা তাঁকে একেবারে শয্যাশায়ী করে ফেলল। সেই চরম দুর্দিনে সর্বহারা অমরেন্দ্রনাথের রোগ শয্যাপার্শ্বে দেবীর মত এসে দাঁড়ালেন তাঁর উপেক্ষিতা সহধর্মিণী।

নটকেশরী অমরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ ত্যাগ করে নাট্যপত্রিকার প্রসঙ্গে আসা সঙ্গত মনে করছি। কারণ, নাট্যপত্রিকার কাহিনী ও ইতিহাসই বিবৃত করছি। ছ' বছর পরের কথা। বঙ্গাব্দ ১৩১৭, ইং ১৯১০-এর মাঝামাঝি সময়। ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ রসরাজ অমৃত-লাল বসু তখন বিকেলের দিকে বসুমতী অফিসে এসে মজলিস বসান। গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ের বাড়ী থেকে সে সময় সাপ্তাহিক 'বসুমতী' প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত সুরেশ সমাজ-পতি বসুমতী সম্পাদনা করেন। আমি তখন উদীয়মান সাহিত্যিক ও তরুণ সাংবাদিকরূপে বসুমতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—সমাজপতি মহাশয়ের সহকারী। রসরাজের আবির্ভাবে বৈঠক গুলজার হয়ে ওঠে। নট-নাটক-নাট্যশালা সম্পর্কে কত কথাই আমরা তাঁর মুখে শুনি। সেই বয়সে নাটুকে ভূত আমার মাথায়ও চেপে বসেছিল। সৌখীন থিয়েটার-গুলোর গলদ দূর করে তাকে পেশাদারী থিয়েটারের উর্দ্ধে নিয়ে যাবার জন্য আমরা জিদ ধরেছি। পেশাদারী যাত্রার

চেয়ে সখের যাত্রা যখন খাতির পায়, তাদের মর্যাদা বেশী, তখন সৌখীন থিয়েটার সম্প্রদায়ই বা হেয় হয়ে থাকবে কেন ? এই কলকাতা সহরে যাঁরা প্রথম থিয়েটারের পত্তন করেছিলেন—বিশিষ্ট অভিজাত বংশের সন্তান সব, তাঁরাও ত ছিলেন সৌখীন অভিনেতা, তাঁদের কীর্তিই ত সখের দল। তবে আমরা—সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় কেন পিছিয়ে থাকব, কেন পদে পদে পেশাদার থিয়েটারওয়ালাদের অনুকরণ করব ? এই নিয়ে তখন আমি আন্দোলন চালিয়েছি, সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় এবং সমগ্র সৌখীন সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য, 'বঙ্গীয় নাট্য পরিষৎ' নামে একটি সংস্থা স্থাপনেরও পরিকল্পনা চলেছে।

এমনি সময় রসরাজ বসুমতীর বৈঠকে প্রায়ই আক্ষেপ করেন যে, নাটকের কথা, নটনটীদের কথা, থিয়েটারের কথা সবাই ত শুনতে ভালবাসেন দেখছি, কিন্তু এসব কথা স্থায়ীভাবে গেঁথে রাখবার কোন ব্যবস্থা কেউ করলে না। কারও সাধ্যে কুলাল না যে, একখানা নাট্যপত্রিকা ভাল ভাবে বার করে।

তরুণ বয়স, তাতে মাথায় ঘুরছে নাটুকে ভুত, কথাটা মনে লাগল সেই বয়সেই। তারপর বন্ধুবর হরলালের সঙ্গে পরামর্শ করে সাব্যস্ত হলো যে, আমরাই বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধব। পরের বৈঠকে কথাটা তুলতেই রসরাজ প্রথমে ত চমকে উঠলেন, ভাবলেন—আমার মাথার গোল আছে। নাহলে ২২।২৩ বছরের ছোকরা নাট্য পত্রিকা বার করতে চায় ! অবিশ্যি, তাঁদের মনে বরাবরই একটা ধারণা ছিল যে, নাট্য সম্বন্ধে ওঁরাই একমাত্র ওয়াকিবহাল, নাট্যশালার বাইরের লোকের শুধু শোনাই কর্তব্য, কিন্তু যা কিছু বক্তব্য ওঁদেরই। যেহেতু ওঁরা ষ্টেজের ব্যাপারে 'এ্যানাটমি'তে উৎরে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

কিন্তু যখন তৈরী ডামিখানা রসরাজকে দেখালাম, তিনি বুঝলেন যে, সত্যিই আমরা ছেলেখেলা করতে হাত বাড়াই নি, আমরাও অনেক ভেবেচিন্তেই এ কাজে হাত দিয়েছি। তখন বললেন—আচ্ছা, আমি একটু ভেবে দেখি—তোমাদের রঙ্গমঞ্চের জন্যে কি করতে পারি।

ডামিতেই আমরা আমাদের প্রস্তাবিত মাসিক না[illegible] পত্রিকার নামকরণ করেছিলাম 'রঙ্গমঞ্চ'। ডবল ক্রাউন আট পেজি আকারে ছয় ফর্মা ৪৮ পৃষ্ঠায় ছেপে প্রতি সংখ্যা বেরোবে। দাম হবে ছয় আনা—বার্ষিক তিন টাকা। কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, সে সবও ডামিতে ছিল। রসরাজ ডামি দেখে মনে মনে খুশিও হয়েছিলেন।

'ষোড়শী' চিত্রে জীবানন্দের রূপসজ্জায়
ছবি বিশ্বাস

কিন্তু পরদিন তাঁর বাড়ীতে যেতে, তিনি বিনা ভূমিকায় বলে ফেললেন : না হে, তোমাদের কাগজে আমার লেখা হবে না। থিয়েটার থেকে আমরাই একখানা মাসিক পত্রিকা বার করছি—তার নাম পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে। শীগগিরই বেরোবে। তোমরাও বরং ও-সব হাঙ্গামায় না গিয়ে আমাদের কাগজখানাকে ইয়ং মহলে চালু করবার চেষ্টা দেখ।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম রসরাজের কথা শুনে। কই, ওঁদের ত কাগজ খোলবার কোন পরিকল্পনাই হয় নি ; রসরাজ দু'দিন আগেও দুঃখ করেছেন এই বলে যে—এ-ধরণের একখানা পত্রিকা বার করতে কেউ এগিয়ে আসছে না। এখন আমরা উদ্যোগী হয়েছি দেখে, ওঁরাই উঠে পড়ে লাগলেন !

[illegible]র বাড়ী থেকে হতাশ হয়ে বেরিয়ে আমি ট্রামে চড়ে হাই[illegible] উপস্থিত হলাম। বিখ্যাত নাট্য[illegible] ও

অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির পুত্র ব্যোমকেশ মুস্তাফি হাইকোর্টে চাকরী করতেন। তিনি ছিলেন আমার আপন মামার সহপাঠি বন্ধু, সে হিসেবে আমিও তাঁকে মামা বলতাম। অল্প বয়সে আমি সাহিত্য সেবায় ব্রতী হওয়ায় তিনি আমাকে খুবই উৎসাহ দিতেন; বলতেন—ছেলেবেলা থেকে আমাকেও ঐ রোগে ধরেছিল। ব্যোমকেশবাবু তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মসচিব—সর্বেসর্বা বললেও অত্যুক্তি হয় না। সাহিত্য পরিষদের অসহায় অবস্থায় যাঁরা তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছেন, যাঁদের আত্মত্যাগ ও কঠোর সাধনার প্রভাবে পরিষদ নিজস্ব ভবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, ব্যোমকেশ মুস্তাফি তাঁদের অন্যতম। বঙ্গীয় পরিষদকে তিনি তাঁর কর্মজীবনের ধ্যান-জ্ঞান সাধনা ভেবে তার উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। দুঃখের কথা, আজকের পরিষদে যাঁরা কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁরা পরিষদ-প্রাণ এই সাহিত্যধর্মী সুধীকে স্মরণ করাও কর্ত্তব্য মনে করেন না। পরিষদের সংশ্রব থেকে ব্যোমকেশ মুস্তাফি বিশিষ্ট লেখকরূপেও প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়েছিলেন।

প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর বিরাট কীর্তি 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থমালায় বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস তাঁরই লিখিত। অসংখ্য প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রবন্ধাবলীর দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করেছিলেন। পক্ষান্তরে নট-নাটক-নাট্যশালার তিনি ছিলেন সুকঠোর সমালোচক। 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকা সম্পর্কে সব কথা বলে আমি তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হলাম। তিনি সস্নেহে ও সানন্দে নানাভাবে 'রঙ্গমঞ্চ'কে সাহায্য করতে সম্মত হলেন।

১৩১৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রায় একই সময়ে দু'খানি মাসিক নাট্য-পত্রিকা প্রকাশিত হলো। প্রথমখানি—বঙ্গের রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। দ্বিতীয়খানি—নট-নাটক-নাট্যশালা সম্বন্ধে সাধারণের পক্ষে আলোচনার মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

'নাট্য-মন্দির' আকারে ডবল ক্রাউন ৮ পেজী-৫-১।৪ ফর্মা—৪২ পৃষ্ঠা। 'রঙ্গমঞ্চ' ডবল ক্রাউন আট পেজী—৫ ফর্মা—৪০ পৃষ্ঠা। প্রায় সমান আয়তন। 'নাট্য-মন্দিরে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হলো: ১। নাট্য-মন্দির (গিরিশচন্দ্র) ২। নাট্যকার (গিরিশচন্দ্র) ৩। রঙ্গালয়ের উন্নতি ও অবনতি (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ৪। অভিনেত্রীর রূপ (উপন্যাস—অমরেন্দ্রনাথ) ৫। আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) ৬। রত্নাবলী (নাটিকা—রসরাজ অমৃতলাল) ৭। রঙ্গভূমি ভালবাসিলাম কেন? (মনোমোহন গোস্বামী) ৮। গুরুঠাকুর (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ৯। ফুলশয্যা (কবিতা—অমৃতলাল) অকপট হাসি (কবিতা—গিরিশচন্দ্র)। 'রঙ্গমঞ্চে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাবলী: ১। নটনাথ (সম্পাদক) ২। নাট্যবেদ (কবিতা—সম্পাদক) ৩।

সংসার নাট্যশালা (পূর্ণচন্দ্র ঘোষ) ৪। সূচনা (সম্পাদক) ৫। নট ও নাট্যকার (মহাদেব চক্রবর্ত্তী) ৬। নাটক ও নাট্যশালা (জটাধর ভট্টাচার্য্য) ৭। প্রাচীন ভারতে নাট্যকলা (সম্পাদক) প্রাচীন যুগে রঙ্গমঞ্চ (বসন্তকুমার দত্ত) ৯। প্রতীচ্য রঙ্গমঞ্চ (শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়) ১০। বিলাতে সখের থিয়েটার (ভূপতিচরণ ধর এম, এ,) ১১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (ব্যোমকেশ মুস্তাফি) ১২। নাট্যপীঠ-শিল্পী ৺ধর্ম্মদাস ও নটকুলশেখর ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর (খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,) ১৩। বাঙ্গলার আদি নাট্যকার (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি, এ) ১৪। বাঙ্গলা নাটকের আদি পোষ্টাবর কালীচন্দ্র (সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী) ১৫। নাট্য-সাহিত্যে নেপোলিয়ান (হরলাল হালদার) ১৬। তেইশ শত বর্ষের ভারতীয় প্রাচীন নাট্যশালা (ব্যোমকেশ মুস্তাফি) ১৭। ইষ্টসিদ্ধি (গল্প) (পূর্ণচন্দ্র ঘোষ)। ছবি : নাট্যমন্দিরের ১ম সংখ্যায় আর্ট পেপারে মুদ্রিত : ১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ২। বিনোদিনী দাসী (বিখ্যাত অভিনেত্রী) রঙ্গমঞ্চে প্রকাশিত ছবি—প্রসিদ্ধ শিল্পী কে, ডি, সেন নির্মিত হাফটোন ব্লক, আর্ট পেপারে ছাপা : ১। নটনাথ (পূর্ণপৃষ্ঠা) ২। নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর (পূর্ণপৃষ্ঠা) ৩। তেইশ শত বর্ষের ভারতীয় প্রাচীন নাট্যশালা (পূর্ণপৃষ্ঠা) ৪। নাট্যপীঠ-শিল্পী ধর্ম্মদাস সুর ৫। আদি নাট্যকার রামনারায়ণ ৬। লেখকরূপী তরুণ নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ৭। প্রাচীন নাট্যশালার প্রেক্ষাগার (রেখা-চিত্র)।

'নাট্য-মন্দিরে'র সূচনায় নটগুরু গিরিশচন্দ্র লিখলেন : "বঙ্গীয় নাট্যশালার মুখপত্র নাই, তাই এখানি প্রকাশিত হইল। আমরা আপনাদের আপনি সমালোচক হইয়া "নাট্য-মন্দির" প্রকাশিত করিব। সাহিত্যও আমাদের প্রধান আলোচনার সামগ্রী। কায়মনোবাক্যে তাহার আলোচনা করিব।" রঙ্গমঞ্চের সূচনায় সম্পাদকরূপে আমার বক্তব্য এইরূপ : অনেক আশা ও ভরসা লইয়া ভগবানের মঙ্গলময় নাম স্মরণ করিয়া "রঙ্গমঞ্চ" কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। নামেই ইহার উদ্দেশ্য কতকটা বুঝা যায়। নট-নাটক-নাট্যশালা লইয়া অপক্ষপাতে আলোচনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ওদেশে জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের অনুষ্ঠানগুলির উন্নতিকল্পে সমাজহিতৈষিগণ যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন—ঐ সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য নানা সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ-বিষয়ে আমাদের দেশে বিলক্ষণ অভাব রহিয়াছে। সেই অভাব কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই রঙ্গমঞ্চের আবির্ভাব। আশা করি, আমরা এই মহৎ কার্য্যে আমাদের স্বদেশবাসীর আনুকূল্য অনুগ্রহ ও সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইব না।

নট-নাটক-নাট্যশালা সম্পর্কে [illegible]পত্রিকা[illegible]শের ইহাই মোটামুটি ইতিহাস।

মেরিন ড্রাইভ থেকে

(বোম্বাইয়ের চিঠি)

প্রিয় সম্পাদকভায়া,

আজ ৯ই সেপ্টেম্বর। মহরম উপলক্ষ্যে প্রায় ছুটি। ঘরের দেওয়ালে পা তুলে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছি। পাশে ধূমায়িত এক পেয়ালা চা। ওপাশ থেকে মাওয়ালি নারীবৃন্দের কল-কাকলী ভেসে আসছে। ধপাধপ্ কাপড় কাচার আওয়াজ। ধৈর্য এদের ধোপাদের চাইতেও ঢের বেশী। বোম্বাইয়ে ধোপা-টোপা বড় একটা নেই। ধোপ-দোস্ত হতে গেলে যে খরচা তা ফিরোজ শাহ্ মেটা রোডের বাসিন্দেরা জোগাতে পারে, আমাদের কম্মো নয়। রেস্তোরাঁ-স্বভাব কলকাতার আর গেল না কিছুতেই, যেমন গেল না আমার চিরকেলে ট্রেণে চড়ার ভয়। তবুও মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে সাজানো ইরানী চায়ের দোকানে এক-আধবার ঢুকে পড়ি। বেকুব বনি। বেরিয়ে আসি। কথায় কথায় ট্রেণে চড়া, আর রাত্তিরের বাজার দিনের বাজার এ দুটোর তফাৎ করতে করতে বোম্বাইয়ে অর্দ্ধেক সময় কেটে গেল। বোম্বাইয়ের চোখে নাকি ঘুম নেই। তুমি যখন মাঝরাত্রে পরম আরামে পাশ ফিরছ, তখন ওদিকের অর্দ্ধেক লোক তোড়ে কল খুলে মাজন নিয়ে দাঁত মাজছে; কেউ কেউ বাজার থেকে ফিরে এসে ধোয়াধুয়ির কাজ করবে বলে আগের লোককে তাড়াতাড়ি সেরে রাখতে বলছে। ইনসোম্‌নিয়াগ্রস্ত বোম্বাইয়ে তবু ধোঁয়া নেই, ধুলো নেই, কথায় কথায় তেরিমেরি নেই, এই বেঁধে বেঁধে-এ-এ-এ নেই, ডিমের খোসা, মাছের কাঁটা, ছাগলের রক্ত, ছানার গন্ধ নেই। কলকাতা থেকে প্রথম প্রথম এসে আমার একটু অদ্ভুত লেগেছিল বটে, কিন্তু এখন দেখছি কলকাতায় ফেরার মন আছে কিন্তু বোধ হয় টানটা আর অতো নেই। রোজগার বেশী করি বললে ভুল হবে। চাকরী-[illegible] নিয়ে এই [illegible]নের [illegible] বা ফি-বছর দিতে হ[illegible] করে তা কল[illegible]তারই প্রায় সমান। তবে, এ [illegible]টা ঠিক এখানে একশ' টাকা রোজগার করলে একশ' টাকার মতো করে বাঁচতে হয়। বেশীর ভাগ লোক শহরের দূরে দূরে ভাড়া বাড়ীতে থাকে, একবেলার খাওয়াটাই একটু মোটা করে খায়, মেয়েছেলেরা স্বচ্ছন্দে সংসারের জন্যে রোজগার করা অংশটুকু বাদ দিয়ে আর সবই করে থাকে—এখন অবশ্য এখানে রোজগেরে মেয়েদের সংখ্যাও কম নয়—সবাই বেড়ায়, ঘোরে, বাঁচে। আর একটা বিশেষ লক্ষ্য করবার জিনিষ এখানকার গোয়ানীজ সম্প্রদায়! কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা হোল, বোম্বাইয়ের লোকের 'ফ্রুটস্'-প্রীতি। দেখে মনে হয়, গড়পড়তা একটা করে আপেল বা কলা প্রত্যেক লোকে খেয়ে থাকে এদেশে প্রত্যহ। এদের সাদা-মাটা লোকের রোজগার তোমার আমার চেয়ে বেশী নয়। 'কেজিনের' তৈরী মনোহারী সন্দেশ-মিষ্টি-দইয়ের চাইতে এরা প্রকৃত সুস্বাদু ও অকৃত্রিম রসগোল্লা প্রচুর পরিমাণে খেয়ে থাকে। আশ্চর্য, এ দেশে খাদ্যে ভেজাল বলে জিনিষটি চালু আছে বলে এখনও শুনিনি—এন্‌ফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ ও মিউনিসিপ্যালিটি দুই-ই যদিও আছে। মাইনের রোজগারের চেয়ে মহত্তর কোন উচ্চাশা যেমন দেখলুম বাঙলা থেকে উত্তরপ্রদেশ পর্য্যন্ত প্রতি জেলার প্রতি লোককে রেসখেলার মতো পেয়ে বসেছে সে তুলনায় বোম্বাইয়ের এই সব চাকুরেদের দেখলে একটু কেমন যেন বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মায়। সরকারী জমি দখলি নিয়ে বিহার-উড়িষ্যা-উত্তরপ্রদেশে কী খেলা যে চলেছে তা মানুষের ধারণাতীত। এদের তুলনায় বাঙ্‌লাদেশ তো স্বর্গ, অবশ্য লিখতে পড়তে জানা বাঙালীর সংখ্যা আজ আর খুব নগণ্য নয় বলেই হয়তো এ কথা বলছি। জন্মের মতো এবার দেখা হয়ে গেল মানুষের আদিম লুকোন [illegible]বৃত্তির চেহারাটা।

বোম্বাইয়ের আর একটি জিনিষ আমার বিশেষ ভালো

লেগেছে। এদের সংঘবদ্ধতা, নাগরিক হিসেবে। অবশ্য মিল থেকে বেরিয়ে আসার পথে দু'চারটে খুন-জখম রোজই লেগে থাকে। কিন্তু বাঁচার জন্যে জাগানো এক বিশেষ অস্বস্তি এদের ভর খুব করে নি। বেশী টাকা পেলেই যে বেশী ভালো ভাবে বাঁচবো এমন অসত্য বুদ্ধি এদের চেতনাকে ততটা আচ্ছন্ন করে নি। এদের দাবী-দাওয়া নেহাৎ কম নয়, বড়লোক গরীব লোকের মধ্যে পার্থক্যটাও বিশেষ দৃষ্টিকটু, তবু এদের সকলেরই সুস্থ স্বাভাবিক একটা জীবনবোধ আছে। ভাষার মধ্যে মারাঠিই বেশী চলে। কী মেয়ে কী ছেলে এই সম্প্রদায়ের—সবায়ের মধ্যেই মুখে চোখে মাথার খোঁপায় যেন কেমন একটা সুন্দর উজ্জল পরমায়ুর ছাপ আছে। মূলতঃ, বোম্বাইয়ের প্রাণ বলতে এরাই—বাদ বাকী সব হট্টমালার দেশের লোক। কেমন যেন পুতুল পুতুল ভাব। ভারী বিশ্রী লাগে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অসহ্য বলে মনে হয় না। কেননা, আগে ঐ যে বলেছি যে কোন দেশেরই সুষ্ঠু নাগরিক এরা। চলতে ফিরতে এ সব উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দেশে একটা কথার মাত্রা খুব চলতি দেখতে পেলুম। আমার মতো মানুষ বেকায়দায় পড়লে পাশের লোকটি ওমনি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে: "কুছ্ ফিকর নহি বাবুসাব, ইয়ে কলকত্তা নহি। আপ্ তমাম্ চলা যাইয়ে..."

আমার বেশীর ভাগ ঘোরাফেরা বাধ্য হয়েই করতে হয় মাতুঙ্গা বা মালাদ থেকে প্যারেল, প্যারেল থেকে মেরিন ড্রাইভ, জুহু। তোমরা কখনও ইচ্ছে করে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো? আমি থাকি। এখানে ভি, টি-তে। খুব ভাল লাগে। নিরবচ্ছিন্ন কর্মচাঞ্চল্য অবশ্য মনে কী দোলা যে দেয় তা আর কি বলে বোঝাবো। বোম্বাইয়ে সবচেয়ে দুঃখু, তোমার আমার মতন এইরকম হামেশা-বাঙালীকে খুঁজে বের করা। বুঝতে পারলেও তোমায় তারা পরিচয় দেবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত পারে। তাদের ধারণা একবার মুখ খুললেই তুমি হয়তো তার পেছন পেছন ধাওয়া করবে এবং একটা বাঙালী বিদেশে এসে কী মালে পরিণত হয় তা চাক্ষুস করলে হয়ত দেশে ফিরে গিয়ে 'গজব' করে দেবে। চিত্র-পরিচালক, শিল্পী, সাহিত্যিক বাঙালী হয়ে এসে সেইসব বিশিষ্ট বঙ্গ-সন্তান কী ভাবে নিজেদের এখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তা বর্ণনায় বলা যায় না, ছবি এঁকে দেখাতে হয়। আমার সে বিদ্যে জানা নেই। পুরুষ মহিলা কেউই ক্যা[illegible] দিয়ে এ বক্তব্যের বাইরে যান না।

[illegible] কর্মে, যাই হোক, কয়েকটা দিন [illegible] কেটে গেল। পণ্ডিত নেহরুর আসাম সফর নিয়ে এখানে [illegible]ডিওয় [illegible]ষ্টুডিওয় [illegible] একটা কাণাঘুষো চলছে। [illegible] আমি

সাত-পাঁচে থাকি না। থাকতে গেলে তো বলেইছি, পয়সা। লাখ-বেলাখওয়ালাদের পথের সঙ্গী হয়ে দিনকতক ঘুরতে হলে কোন্‌দিন কী বদখেয়ালে একেবারে হোল্‌ডলে পুরে চালান করে দেবে কন্যাকুমারিকায় না কোথায়, কে জানে। এদের খেয়ালখুশীর বন্যায় আমার মতো অনেক ভীরু প্রাণকে কতোবার যে টেক্‌নিশিয়ানগিরি ভুলে বেমালুম ভেসে যেতে হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। তাই সভয়ে বাঁচিয়ে চলি এদের।

বলতে দ্বিধা নেই রাজকাপুর-নার্গিসই হচ্ছে বোম্বাইয়ের সবচেয়ে প্রিয় জুটি। সরকারী দফতর থেকে ছবির ব্যবসাদারদের কর্ণধার, ষ্টুডিওর কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, এমনকি কুলি-মজত্বরদের সঙ্গেও ওদের দরাজ মন-খোলা ব্যবহার মাঝে মাঝে আমাকেও চম্‌কে দেয়। রাজ বাঙ্‌লায় মানুষ হয়েছে বলেই হয়ত আড্ডায় একেবারে পয়লা নম্বরের চাল্‌ ছেলে। আগেকার আড্ডায় একজন থাকতো এমন যে খরচ করতে বা খরচের উৎসাহ দিতে কখনই পেছ্‌-পা হোত না। রাজ বেমালুম সে-গুণটি লাভ করেছে কি করে জানিনে। নিঃসন্দেহে তাদের মিলিত রোজগার যে কোন মানুষের চোখ ধাঁধানো, কিন্তু রোজ-গারের এই ষ্টেজে উঠলে সাধারণতঃ মানুষ একেবারে আস্ত একটা ওয়ান্‌ পাইস ফাদার-মাদারে পরিণত হয়ে যায় অথচ অন্যদিক দিয়ে হাতী গলে গেলেও দেখেও-দেখে না দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে। কয়েকদিন থেকেই দেখছি ব্যবসা-দারদের গোপন বৈঠকে রাজের ঘন ঘন যাতায়াত চলেছে। ভাবছি, কাল সকালে উঠে একটা প্রচণ্ড গোছের কিছু এ্যানাউন্স্‌মেন্ট দেখতে পাবো নিশ্চয়ই। বোম্বাইয়ে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে-রাত্রে হরবখত কাগজ বেরোয়, তাই দুজনের ফিসফাস এখানে এমন এক একটা গমক মেরে ঠেলে ওঠে যে সাধারণ্যে ব্যাপারটি ফুসুর-ফাসুর করবার বহুত আগে মোদ্দা খবর কাগজওয়ালাদের শিকারী কুকুর এসে কোন্‌ সময় মাটী শুঁকতে শুঁকতে একেবারে টেলি-প্রিণ্টারের গোড়ায় গিয়ে হাজির হয়ে হাঁচ্‌তে সুরু করে তার খবর কেউ রাখে না।

এ ক'দিন রাজে দিলীপে একটু বেশী মাখামাখি দেখছি। দিলীপকুমার স্বভাব-গম্ভীর, হাজার হলে'ও পাঠানের রক্ত ওর শিরায় উপশিরায় এখনও ওঠানামা করছে। দিলীপ ভিড় পছন্দ করে না একেবারে। রাজের কাছে ওর গেরেম্বানী যে মাঝে-সাঝে আমাকেও একটু খট্‌কা না দিয়েছে এমন নয়। রাজ দিলীপ থেকে আলো-চনাটা ক্রমশঃই বর্ধমান যাবার তোড়জোড় করছে দেখতে পাচ্ছি ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যে। বিশ্বাস নেই, তোমাদের কাগজে হয়ত এতক্ষণে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়ে গেছে। তারপর বিষয়টি যখন ষ্টুডিও কর্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত না-গিয়ে ছাড়লে না, তখন বুঝলুম, গুরু-চরণ একটা কিছু। কেউ হঠাৎ মরে গেল, না

মরমর, কে জানে ? ভাবলুম তোমায় একটা চিঠি লিখে কলকাতার হাল-আদতটা জেনে নিই। যে রকম বিশ্বমৈত্রীর তোড়জোড় চারিদিকে তাতে বেমক্কা যে কেউ কিলটা ঘুষিটাও তো নিদেনপক্ষে মেরে যেতে পারে। থমথমে ভাব দেখে অতদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে চিঠি লিখে খবর জানবার সাহস সময় কোনটাই আর হোল না। ইতিমধ্যে দিন-কয় আগে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে এখন আব-হাওয়াটাকে বেশ চকচকে করে রেখেছে। আন্দাজ করলুম, খুব বিপদ কিছু-একটা আলবৎ ঘটে নি ; ঘটলেও আকাশে মেঘ দেখা দিত।

তোমাদের কাছে পুরোনো কিন্তু আজকে আমাদের কাছে একেবারে নতুন, ১৫ই সেপ্টেম্বরের খবরের কাগজখানা হতবাক করে দেবার জোগাড় করেছে। সকালে ষ্টুডিওর কাজ থাকায় তাড়াতাড়ি ছুটতে হোল। সেখানে পৌঁছে খুব মুখ গম্ভীর করে একটা ভীষণ বিপৎপাতের চিহ্ন মুখে এঁকে নেবার চেষ্টা করার আগেই, রাজকে দেখতে পেলুম অদ্ভুত তার পোষাকে। ছুটে আমার কাছে এসে বললে, তোমার দেশে এখন কী অবস্থা হচ্ছে তার কল্পনাও আমি করতে পারছি না। তুমি নিশ্চয়ই আগে থেকে আমাদের ব্যবস্থার কথা জেনেছ। আমি ঘাড় নাড়লুম, না। ওর স্বভাবসুলভ চাপড় আমার পিঠে এসে পড়ল, বললে : আরে দোস্ত, দেখগে তোমার দেশে গিয়ে, দলে দলে লোক রাস্তায় বেরিয়ে বন্যায় ভিখিরী মা-বোনের সাহায্যে প্রাণপাত করছে। আর তুমি একটা উল্লুক, সবচেয়ে আগে তোমার যেটা জানার দরকার সেইটেই তুমি নিজেই জানো না! আর আমায় তা বিশ্বাস করতে হবে। এখন বেকুফি রেখে যেতে হয় তো চলো আমার সঙ্গে, আমি বাদবাকী সব ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

তরদেও। সেণ্ট্রাল ষ্টুডিয়োর গেট। পরিষ্কার চক্‌চকে সক[illegible]ল কী পরিচ্ছন্ন একটা মিছিল, প্রায় খান ষাট-সত্তর মাথা-খোলা লরী সবার তৈরী মানুষের থামের পেছনে সার দিয়ে দাঁড় করানো। বড় মেজ সেজ ছোট সবাই, ফিল্ম লাইনের হাতী থেকে পিঁপড়ে আজ [illegible]য়েরই

মাহিনাসমেত ছুটি মঞ্জুর হয়েছে (ফ্যাক্টরী আইন ওখানে বহুদিন ধরে চালু আছে) সকলের হাতে একটি করে ভিক্ষার ঝুলি। কাণাঘুষো শুনলুম, লাখ দুয়েক টাকা তুলে দিতেই হবে আজ—যেখান থেকে হোক যেমন করে পারা যায়। আর এজন্যে আশু বিপদের সম্মুখীনদের দুঃখকে প্রত্যেকের অংশ করে নিতে গেলে, পথে পথে পায়ে হেঁটে (শেষ পর্য্যন্ত প্রায় মাইল বারো দাঁড়িয়েছিল) মাধুকরী করতে হবে। টাকার অনুমান কম কি বেশী কথা নয়, কম হলে যে কেউ একাই পুরিয়ে দেবে বা দিতে পারে ; কিন্তু নিজেদের ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে অসংখ্য অচেতন দেশ-বাসীর ছোট-খাট উপলব্ধি। তাকে উদ্বোধিত করতে গেলে শুধু রঙ্ মাখা নয়, দুঃখের ভাগ নিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে এ সমস্যা কী ব্যাপক, কতো নিদারুণ। একটু ঘাবড়ে গেলুম। বাঙালীর ছেলেকে চমকে দেবার মতো তাল্পি তা'হলে এরাও শিখেছে ? ভাল, সবই ভাল।

তারপর সুরু হোল যাওয়া পথ থেকে পথে, ঘুরে ঘুরে, ফিরে ফিরে। তাজ্জব ব্যাপার একেই বলে। যেখানেই যে কেউ দাঁড়ায় সেখান থেকেই সাড়া মেলে অদ্ভুত ভাবে। টাকা-পয়সা, ওষুধ-পত্তর, জামা-কাপড়, জুতো কম্বল দিয়ে লরীগুলো একে একে বোঝাই হতে হতে এগিয়ে চলল। আশ-পাশের লোকের আর বাঁধ মানে না। তারা পাগল হয়ে যা পারে তাই নিয়ে, নিজের একমাত্র সম্বল নিয়ে, ছুটে এলো। মনে পড়ল : "রামদাস গুরু তাঁর ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার, ফিরিছেন আজি অন্নহীন"···রাজা আজ ফকির হয়েছে। ফকির দেবার স্পৃহায় রাজা। রাজ-নার্গিস, দিলীপের সঙ্গে সঙ্গে নৌশাদ, শান্তারাম. দেবানন্দ, কল্পনা কার্তিক, প্রেমনাথ, বীণা রায়, সুরাইয়া, গীতাবালী, সুমিত্রা, সবাই-ই, অশোককুমার, মেহতাব, আগা, গোপ, দেওয়ান শারার পর্য্যন্ত কেউই, কাউকেই, অর্থাৎ কয়েকজন বিশেষ বিশেষ বাঙালী ছাড়া, বাদ যেতে দেখলুম না—হাসি মুখে এঁরা ভিক্ষের ঝুলি বুকে তুলে নিয়েছেন। যাঁরা দেশের শত শত দীনহীন দরিদ্রের বুকের মণি-কোঠায় চিরকাল বাস করে এসেছেন এই সেই তাঁরা। সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের চাঁইরা ক্যামেরা ও নোটবুক নিয়ে এর সবগুলি তোমাদের পরিবেশন করবেন বলে দেগে দেগে জমা করে রাখছেন। ভীড়ের মধ্য থেকে আমি কেমন দেখতে পাচ্ছি দানের রাজসূয় যজ্ঞ ! রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় বন্ধ। ব্যস্ত-সমস্ত বোম্বাইয়ের এ কি অভূতপূর্ব থমকে দাঁড়িয়ে যাওয়া !

সেদিনের মতো সমস্ত বাক্সগুলো ও জিনিষপত্তর একত্র করে রাজ রাত্রে তত্ত্বাবধানের পরামর্শ ও নির্দেশ দিলে, এক-জন অতি উচ্চপদস্থ ও নামকরা লোকের কাছে গচ্ছিত রেখে দিতে। একদিন আমি ওকে একটু আড়ালে পেয়ে বললুম, আমার দেশের শিল্পীদের কাছে একটা টেলীগ্রাম পার না করে দিতে ! ও বললে, তারা কেউ কাজ করবার অপেক্ষায় বসে নেই। আমি কোন কথা না বলে সই সংগ্রহ করা একখণ্ড কাগজের শিরোণামায় তাদের ফুটবল মাঠে প্যারেডের দৃশ্যটি দেখালুম। রাজ একটু হাঁ করে বললে, চুপিচুপি আমরা তা'হলে বোম্বাই প্যাঁচ কষতে গিয়ে খুব খানিকটা বাড়াবাড়িই করে মরলুম ? এঁ্যা ?

আমি আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে সোজা বাড়ী ফিরে এসে কথাগুলো তোমায় লিখতে বসেছি। দেখো ভাই, তোমার ফিল্ম জগতের কারোর হাতে এ লেখাটা যেন গিয়ে না পড়ে—কলকাতায় তাহলে আর এজন্মে ফেরা হবে না ! ইতি— মুশাফির

সাজঘর

অখিল নিয়োগী

[একাঙ্ক নাটিকা]

[একটি রঙ্গমঞ্চের নায়কের সাজঘর। দেয়ালে বড় একটি আয়না। আয়নার গা ঘেঁষে একটি টেবিল ও সঙ্গে চেয়ার। আশে-পাশে কয়েকটি সোফা। এক কোণে একটি বড় আলমারি, তাতে সবরকম পোষাক বিভিন্ন তাকে সাজানো আছে। মাথার ওপরে দড়ি টাঙানো আছে। বিভিন্ন জাতীয় পরচুলা তাতে ঝুলছে। দু-এক-জন গুণগ্রাহী ভদ্রলোক সোফায় বসে আছেন। যবনিকা উত্তোলিত হতেই প্রেক্ষাগৃহের দিক থেকে ঘন ঘন কর-তালি ধ্বনি শোনা যেতে লাগ্‌লো। দ্রুতবেগে মঞ্চের নায়ক সর্ব্বদমন সাধু এসে সাজঘরে ঢুক্‌লেন।]

সর্ব্বদমন

ওরে মাকাল, কোথায় গেলিরে? তাড়াতাড়ি এদিকে আয়! ঘামে যে একেবারে ঝোল হয়ে গেলাম! ধরা-চুড়াগুলো আগে খুলে নে। ফ্যানটা ফুল-স্পিডে চালিয়ে দে। একটু ঠাণ্ডা হয়ে বাঁচি।

[মাকালের পিতৃদত্ত নাম গোবিন্দ। কিন্তু নায়ক সর্ব্বদমন ওকে মাকাল বলেই ডাকেন। নায়কের মেক্‌-আপ্‌-ম্যান আর ড্রেসার হচ্ছে এই মাকাল। ওকে ছাড়া নায়কের এক মুহূর্ত্তও চলে না। আর সব সময় তাকে গালাগাল করা চাই। মাকাল বাইরে বিড়ি টান্‌ছিল,—তাড়াতাড়ি এসে ঘরে ঢুক্‌ল।]

মাকাল

এই ত' আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি স্যার। আগে পর-চুলাটা খুলে নিই। একি! পরচুলার একটা দিক যে ফেঁসে গেছে!

সর্ব্বদমন

তা আর যাবে না! শেষ দৃশ্যে যে ভিলেনকে হত্যা করে এলাম। ঘন ঘন করতালি ধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছিস্‌ নে? যা ধস্তাধস্তির ব্যাপার। ও-ও মরবে না, আর আমিও ছাড়বো না! ভাগ্যিস পরচুলাটা একেবারে খুলে পড়ে যায়নি!

মাকাল

তা'হলে আরো বেশী হাততালি পড়ত স্যার। আর সমালোচকেরাও একটা খোরাক পেত!

সর্ব্বদমন

ঠিক বলেছিস্‌ মাকাল! তুই মাকাল ফল হলে কি হবে! মাঝে মাঝে এমন বুদ্ধির পরিচয় দিস্‌ যে আমি অবধি হকচকিয়ে যাই!

মাকাল

তবু ত' আপনি আমায় একদিন ষ্টেজে নামতে দিলেন না!

সর্ব্বদমন

সাজঘরে আছিস্‌—সেই ভালো। আবার চুণ-কালী মাখ্‌বার সখ কেন? দেখ্‌ছিস্‌ ত' আমার অবস্থা!

মাকাল

আপনার অবস্থা? হেঁ-হেঁ-হেঁ! সবাই হিংসে করে আপনাকে।

[দ্রুতবেগে একজন তরুণের প্রবেশ]

তরুণ

সত্যি। আমরাও হিংসে করি আপনাকে। আজ যা অভিনয় করলেন! চার্লস্‌ লটনকেও ছা[illegible]ড়িয়ে দেখ্‌তে হবে।

সর্ব্বদমন

আজ্ঞে আপনি ?

তরুণ

আমায় চেনেন না ? 'রঙ্গব্যঙ্গ' পত্রিকার 'ছায়া ও কায়া' ত' আমার কলমের জোরেই এত পপুলার। প্রতিটি সংখ্যা পাঠিয়ে দেওয়া হয় আপনার বাড়ীর ঠিকানায়।

সর্ব্বদমন

ঠিক! ঠিক! পাই বটে কাগজখানা। তবে পড়বার কি জো আছে ? ছবির পাতা ওল্টাতেই মেয়েরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

তরুণ

সেই ত' আমাদের 'কমপ্লিমেন্ট'! শুধু গ্রাহিকাদের চাহিদাতেই ত' কাগজটি চল্‌ছে। আজ এসেছি আপনার একটা স্ন্যাপ্‌ নিতে। আমাদের ষ্টাফ্‌ ফটোগ্রাফার সঙ্গেই আছে।

মাকাল

কিন্তু আমি যে আদ্দেক মেক্‌-আপ খুলে ফেলেছি! ছবি নেবেন সেকথা আগে বল্‌তে হয়!

তরুণ

তোমায় কিছু ভাবতে হবে না ভাই! "রূপসজ্জা উন্মোচনে রূপদক্ষ সর্ব্বদমন"! কেমন সুন্দর ক্যাপ্‌সন হবে বলুন ত! আমাদের গ্রাহিকারা এই জাতীয় ছবি ভারী পছন্দ করে। ওহে নবাঙ্কুর, আর দেরী নয়। চট্‌ করে তুলে নাও এই বিশেষ 'পোজ'টি।

[ষ্টাফ্‌-ফটোগ্রাফার নবাঙ্কুর নারাঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে এসে আর বাক্যব্যয় না করে কাজ হাসিল করে নিলে। মুখে বললে, 'ও কে.'।]

তরুণ

তাহলে আসি স্যার। আর আপনার সময় নষ্ট করবো না। আগামী সংখ্যা "রঙ্গব্যঙ্গ"তে নাটকের সমালোচনা আর আপনার কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গিমার ছবি ছাপা হবে। ষ্টাফ ফটোগ্রাফার অনেকগুলো ফটো অভিনয়ের সময়ই তুলে নিয়েছে কিনা! সে সংখ্যাটি দেখ্‌তে ভুল্‌বেন না স্যার!

সর্ব্বদমন

সে কি কথা! দেখ্‌বো বৈকি! তবে আমার চাইতে মেয়েরাই বেশী পড়বে। ওরাই সব সময় গল্প করে কিনা!

['রঙ্গব্যঙ্গে'র প্রতিনিধিদের প্রস্থান]

[সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাড়ালেন—গণপতি কাঞ্জিলাল। বিশাল বপু। আদ্দির পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি পড়নে, উড়নি গায়ে, হাতে মস্ত বড় পানের ডিবে, মচ্‌মচ্‌ শব্দ করছে চকচকে পাম্প-সু জুতো।]

গণপতি

আস্‌তে পারি স্যার ?

সর্ব্বদমন

এ কি! গণপতিবাবু যে! কল্‌কাতায় কবে এলেন ?

গণপতি

এলাম ত' আপনারই কাছে। আমাদের মাঝেরহাট সংস্কৃতি সম্মেলনের বার্ষিক উৎসব—আস্‌ছে রবিবার। আপনাকে সভাপতিত্ব করতে হবে।

সর্ব্বদমন

রবিবার কি করে হবে ? রবিবার যে আমাদের অভিনয় রয়েছে।

গণপতি

না, না, সেজন্তে আপনি কিছু ভাববেন না। আপনার অভিনয়ের আমরা বাধার স্বষ্টি করবো না। সকালবেলা আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেবো। সোজা চলে যাবেন। চা-জল-খাবার খাওয়ার পরই উৎসব। তারপর দুপুরবেলা আমার বাসায় একটু ডাল-ভাত। একটু বিশ্রামের পর সোজা গাড়ী করে আপনাকে পৌঁছে দেবো থিয়েটারে। কোনো অসুবিধেই আপনার হবে না।

সর্ব্বদমন

কিন্তু আপনার ওখানকার ডাল-ভাতের খবর ত' আমি রাখি। সেই ভুরি-ভোজনের পর কি এসে আমার অভিনয় করবার ক্ষমতা থাকবে?

গণপতি

মিছিমিছি আমাকে আর লজ্জা দেবেন না সর্ব্বদমনবাবু। না হয় আপনি চারটি শাক-ভাতই খাবেন। হ্যাঁ, ভালো কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম। মাঝেরহাট সংস্কৃতি সম্মেলন আপনাকে ওই দিন "নট-নক্ষত্র" উপাধি দেবে, একটি অভিনন্দন পত্র দেবে। আপনি তার যে জবাব দেবেন—সেটা যদি আমরা একটু আগে পাই ত' ছাপিয়ে নিতে পারি।

সর্ব্বদমন

এ-সব আপনারা কি সুরু করেছেন, বলুন ত? অভিনন্দন পত্র, "নট-নক্ষত্র"···না-না, সে আমার ভারী লজ্জা করবে!

গণপতি

কি যে আপনি বলেন স্যার! গুণী লোককে সম্মান দেবো না? তবে আমাদের "সংস্কৃতি সম্মেলন" করে লাভ কি? জান্‌বেন, আমরা কখনো ভস্মে ঘি ঢালি না, যজ্ঞের আগুনেই ঢেলে থাকি। লোকে বলে, গণপতি জমিদার টাকাগুলো খোলামকুচির মতো খরচ করছে! কিন্তু তারা ত' জানে না—সংস্কৃতি কাকে বলে। বুঝ্‌লেন, মাঝের হাটকে আমি কল্‌কাতার চাইতেও উন্নত করে তুলবো। তখন লোকে বল্‌বে, হ্যাঁ গণপতি জমিদার বাপের ব্যাটা।

[হঠাৎ দরজার কাছে নারী-কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল। "ভেতরে আস্‌তে পারি?"]

সর্ব্বদমন

কে? আসুন।

[দুইটি আধুনিকা তরুণীর প্রবেশ]

উভয় তরুণী

নমস্কার।

সর্ব্বদমন

নমস্কার। কিন্তু আপনাদের কি প্রয়োজন?

প্রথমা তরুণী

মানে আমরা দুই বান্ধবী। কলেজের ছাত্রী। আপনার অভিনয় দেখ্‌তে এসেছিলাম। আমাদের অটোগ্রাফ-খাতায় কিছু লিখে দিতে হবে।

গণপতি

তা আপনারা বসুন। আমি আজ তবে উঠি সর্ব্বদমনবাবু।

আমি আপনার কোনো আপত্তি শুনবো না। কবি কালিদাসকে সম্মান দেখিয়েছিলেন বলেই মহারাজ বিক্রমাদিত্য আজও বেঁচে আছেন। রবিবার খুব সকালে আমি গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[গণপতির দ্রুত প্রস্থান]

সর্ব্বদমন

[তরুণীদের উদ্দেশ্যে] আপনাদের অটোগ্রাফ খাতায় আমি আর কি লিখতে পারি বলুন! আপনারা কলেজে পড়েন। আমার চাইতে কত বেশী জানেন। মা সরস্বতীর কাছে পাত্তা পেলাম না বলেই ত' এ-লাইনে পা দিয়েছি!

দ্বিতীয়া তরুণী

অমন কথা মুখেও আনবেন না। মা সরস্বতী ত অভিনয় কলারও দেবী। উচ্চাঙ্গের অভিনয়ের ভেতর দিয়ে আপনি দেশকে যে উন্নত করছেন—তার মূল্য কি কিছু কম? আপনার অভিনয় দেখতে দেখতে আমরা ত সেই কথারই আলোচনা করছিলাম।

সর্ব্বদমন

আপনারা আমাকে মিছি-মিছি লজ্জা দেবেন না! দেশকে দান করবার মতো যোগ্যতা আমার কিছুই নেই। বড় জোর আপনাদের খাতায় আমি স্বাক্ষর করে দিতে পারি।

প্রথমা তরুণী

একটা কথা তাহলে আপনাকে খুলেই বলি। আমার এই বান্ধবীটি চমৎকার অভিনয় করতে পারে। কলেজ সোশ্যালে বহুবার পদক পেয়েছে। ওর খুব সখ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে। আপনাকে ও মনে মনে গুরু বলে বরণ করে নিয়েছে। ওর জন্যে একটা সুযোগ আপনাকে করে দিতেই হবে।

সর্ব্বদমন

আপনারা বলছেন কি? ভদ্রঘরের মেয়ে আপনারা।

'কবি' উপন্যাসের হিন্দী চিত্ররূপে বসনের রূপসজ্জায় গীতা বালী

চিত্রবাণী

●

শারদীয়া

●

১৩৬১

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের 'জয়দেব' চিত্রে বিমলার ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা

বোধ করি বড়লোকের মেয়েই হবেন। এই পাঁকের মধ্যে কেন পা দেবেন বলুন ত?

দ্বিতীয়া তরুণী

পাঁক? পাঁক আপনি বলছেন বিশুদ্ধ অভিনয়কলাকে? হ্যাঁ আমি বড়লোকের মেয়ে। অর্থের অভাব আমার নেই। আমাদের প্রত্যেক ভাই-বোনের আলাদা মোটর। কিন্তু জীবনকে আমি বিকশিত করতে চাই। ওই যে রাজকুমারী আজ অভিনয় করল। ওকে কি আপনি অভিনয় বলবেন? আপনার পাশে ওকে এত বেমানান দেখিয়েছে যে, লজ্জায় আমার গা শির্‌শির্‌ করছিল! আর ওই কি ডায়ালগ বলার নমুনা? দোহাই আপনার, আমাকে সুযোগ করে দিতেই হবে। আপনার কথা থিয়েটারের মালিক কিছুতেই ফেলতে পারবেন না।

সর্ব্বদমন

আপনি আপনার বাবার মত নিয়েছেন?

দ্বিতীয়া তরুণী

তার প্রয়োজন হবে না। কাগজে ঘোষণা দেখলেই ত' তিনি জানতে পারবেন। তাছাড়া আমি ত' এখন সাবালিকা। ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগে এ প্রশ্ন আদৌ ওঠে না।

সর্ব্বদমন

আপনার বাবা বুঝি শুধু চিনির বলদ?-টাকা জুগিয়েই খুশী!

দ্বিতীয়া তরুণী

কি বললেন?

সর্ব্বদমন

না না, আমি বলছিলাম বহু টাকা-পয়সা খরচ করে আপনার বাবা উপযুক্ত শিক্ষাই দিয়েছেন।

দ্বিতীয়া তরুণী

নিশ্চয়ই! অপরের স্বাধীনতায় তিনি কখনো হস্তক্ষেপ করেন না।

সর্ব্বদমন

কিন্তু আমি করি। দোহাই আপনাদের। আজ আমাকে আপনারা রেহাই দিন। আমার বড্ড মাথা ধরেছে।

প্রথমা তরুণী

বেশ। আজকে আমরা যাচ্ছি। আমার বান্ধবীটিকে নিয়ে আর একদিন কিন্তু আসছি। আমরা প্রায়ই থিয়েটার দেখতে আসি কিনা! একটা ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতেই হবে।

মাকাল

আচ্ছা স্যার, দিদিমণিরা এত করে বলছেন—আপনার মুখের কথা খসালেই ত' একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়।

সর্ব্বদমন

দ্যাখ্ মাকাল ফল. যা বুঝিস্‌নে-- তার [illegible]র কথা বলতে

আসিস্ কেন? তোর কাজ হচ্ছে সঙ্ সাজানো, আর চুণকালি তুলে ফেলা। যা করছিস্ তাই কর না কেন? ওই যে কথায় বলে না—খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে—কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে! তোর হয়েছে তাই!

দ্বিতীয়া তরুণী

আজ আপনার শরীরটা ভালো নেই দেখছি! আচ্ছা, আমরা চল্‌লাম আবার শিগ্‌গিরই আস্‌ছি। সেইদিন ভালো করে অটোগ্রাফ লিখিয়ে নেবো।

[দুইজনের প্রস্থান]

সর্ব্বদমন

ভাখ্ মাকাল, তুই আমাকে ডোবাবি দেখছি! কোথায় কার সঙ্গে কিকথা বল্‌তে হয় কিছু জানিস্ নে! ওই মেয়েকে যদি আমি থিয়েটারে ঢুকিয়ে দি—তবে আমার হাতে হাতকড়া পড়বে। তুই কি তাই চাস্ নাকি?

মাকাল

[জিব কেটে] না-না, আমি তা চাইবো কেন? ভদ্দর ঘরের মেয়ে এত করে আপনাকে বল্‌ছে—তাই আমি কথাটা তুল্‌লাম।

সর্ব্বদমন

আরে বোকা বুঝ্‌ছিস্ না কেন? ভদ্দর ঘরের মেয়ে বলেই ত' বিপদ! মিছিমিছি আমি হাজতবাস করতে রাজি নই!

[কোনো-রকম জিজ্ঞেসবাদ না করেই হুড়মুড় করে কয়েকটি যুবকের প্রবেশ]

প্রথম যুবক

আপনার সঙ্গেই আমরা দেখা করতে এলাম।

সর্ব্বদমন

তা কি আপনাদের প্রয়োজন?

২য় যুবক

দেখুন, আমাদের "অভিসার সংসদের" পক্ষ থেকে শুভ শারদীয়ায় "কে এ কামিনী" অভিনীত হবে। আপনাকে তার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

সর্ব্বদমন

[illegible] কার লেখা নাটক বলুন ত? নামটা [illegible] ত' মনে হচ্ছে না!

৩য় যুবক

হুঁ! হুঁ! ওইটুকুই ত' আমাদের 'অরিজিনালিটি'! আমরা চর্ব্বিত চর্ব্বণ নিয়ে কারবার করিনে! নিজেরা মিলে নাটক লিখেছি, নিজেদের বান্ধবীদের নিয়ে অভিনয় করবো। নিজেরাই দৃশ্যপট পরিকল্পনা করবো, সংসদের সভ্য ছাড়া আর কারো সেখানে প্রবেশ-অধিকার নেই। আর নাটক শেষ হবার পরই সুরু হবে আমাদের অভিসার!

সর্ব্বদমন

দেখুন, উপানন্দ মুখুজ্জে কি আপনাদের সংসদের কোনো সংবাদই রাখেন না?

৪র্থ যুবক

কি বললেন? কি বললেন? কি বললেন?

সর্ব্বদমন

না, এই বল্‌ছিলাম কি—কল্‌কাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আপনাদের সংসদের সংবাদ নিশ্চয়ই রাখেন!

৫ম যুবক

রাখেন বৈকি! নিশ্চয়ই রাখেন। লেডি গজাননা বোস আমাদের প্রেসিডেন্ট। কাজেই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন,—ক্রীম অফ্ দি সোসাইটি আমাদের অভিনয় দেখ্‌তে আস্‌বেন। তাঁরা সব আমাদের ঘরের লোক। অনেকেই অভিনয়ে নাম্‌ছেন।

সর্ব্বদমন

দেখুন, সবাই যখন আপনাদের ঘরের লোক—তখন পরিচালনার ব্যাপারে আর বাইরের লোক আমদানী করতে চাইছেন কেন? ও কাজটাও আপনাদের লেডি গজাননা সুসম্পাদন করতে পারবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

১ম যুবক

মানে—আপনি আমাদের চলে যেতে বল্‌ছেন?

মাকাল

না-না, সে কি কথা! স্যার, মেক্‌-আপের ব্যাপারটার ভার ত' আমিই নিতে পারি। আপনি একটু বলে দিলেই ত'—

সর্ব্বদমন

আঃ মাকাল! তুই চুপ্ করবি? [যুবকদের প্রতি]

দেখুন, আমার ভয়ানক মাথা ধরেছে, আজ আপনারা আসুন—

২য় যুবক

আচ্ছা দেখে নেবো। এত দেমাক ভালো নয় কিন্তু। আমাদের পাড়া দিয়ে কি আপনি হাঁটবেন না ?

[যুবকদের প্রস্থান]

মাকাল

হায়! হায়! এমন দাঁওটা একেবারে হাতছাড়া হয়ে গেল! আপনি স্যার একটু বলে দিলেই হত!

সর্ব্বদমন

দ্যাখ্ মাকাল, আজ আমায় বিরক্ত করিস নে। আজ মন মেজাজ আমার ভারী খারাপ!

মাকাল

কেন স্যার ? কি হয়েছে ? মাথাটা টিপে দেবো ?

সর্ব্বদমন

না রে পাগলা! অসুখ আমার মনে। আজ পনেরোদিন ধরে ছেলেটা টাইফয়েডে ভুগ্ছে। টাকা-পয়সা সব খরচ হয়ে গেছে! এই সময় অভিনন্দন, 'নট-নক্ষত্র'. .নাকী সুরে ন্যাকামো···এই সব ভালো লাগে ? মনে হয় ঘাড় ধরে সবাইকে বার করে দিই। কিন্তু আমরা ত' ভদ্রলোক। তা পারি না। মনের মধ্যে গুম্‌রোতে থাকি!

মাকাল

তা হলে ত' স্যার আপনি বড় বিপদে পড়েছেন। যদি রাত জাগতে হয় তাহলে—

সর্ব্বদমন

না রে না! আসল ব্যাধি হচ্ছে অভাব। যেমন করে হোক—আজ আমার পঞ্চাশটা টাকা চাই। তুই ম্যানেজারবাবুর কাছে গিয়ে আমার নাম করে—

মাকাল

আমি এক্ষুনি যাচ্ছি স্যার। আপনি ততক্ষণ এই ন্যাকড়ায় নারকোল তেল ভিজিয়ে মুখটা রগ্ড়াতে থাকুন।

[প্রস্থান]

সর্ব্বদমন

ঠিকই বলেছিস মাকাল! শেষ পর্য্যন্ত মেঝেতে ওই মুখই রগ্ড়াতে হবে।

[আপন মনে হাস্‌তে লাগ্‌লো]

সর্ব্বদমন

হুঁ! সংস্কৃতি! অভিসার! গুষ্টির পিণ্ডি! সবাইকার ঝুঁটি ধরে গঙ্গায় ডোবাবো—

[মাকালের প্রবেশ]

মাকাল

ঝুঁটি ধরে গঙ্গায় ডোবাবেন ? কিন্তু আমার কি দোষ স্যার ? আমি ম্যানেজারবাবুকে অনেক খোসামোদ করলাম। উনি বললেন, পুজোয় নতুন বই খুল্‌তে হবে। অনেক টাকা খরচ। এখন কাউকে আগাম টাকা দেওয়া চল্‌বে না।

সর্ব্বদমন

হুঁ! আর্ট! বাণীর বরপুত্র! কালিদাস! কলা! মর্ত্তমান কলা!·· রাবিস্!

মাকাল

আজ্ঞে, মর্ত্তমান কলা খাবেন! তা আগে বললেই আমি বাজার থেকে এনে রেখে দিতাম। সিঙাপুরি কলাও খুব ভালো উঠেছে বাজারে!

সর্ব্বদমন

হ্যাঁ, শেষ পর্য্যন্ত ওরা আমায় কলা খাইয়ে, ঘোল ঢেলে যে একদিন তাড়িয়ে দেবে সে আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি! হতুম নায়িকা·· তাহলে না চাইবার আগেই টেবিলে চেক্ এসে হাজির হত!

মাকাল

দেখুন স্যার, বাড়ীতে অসুখ থাক্‌লে যে মনের অবস্থা কি হয় তা আমি জানি। আমার একটা কথা শুনবেন স্যার?

সর্ব্বদমন

(অপ্রসন্ন মুখে) কি বল্‌বি—বল্‌।

মাকাল

আজই শ্বশুরমশাই গোটা পঞ্চাশেক টাকা পাঠিয়েছেন মনিঅর্ডার করে। আমার ইস্তিরীর জন্যে পুজোর সাড়ী কিনতে হবে। আমি বলি কি পুজোর ত দেরী আছে—এই টাকাটা আজ আপনি নিয়ে যান্‌—

সর্ব্বদমন

এ্যাঁ! মাকাল! তুই বল্‌ছিস্‌ কি? তোর বৌয়ের সাড়ীর জন্যে টাকা এসেছে...আর সেই টাকা তুই আমার ছেলের চিকিৎসার জন্যে দিতে চাইছিস্‌?

মাকাল

বেশ ত! আপনি মাইনে পেয়েই শোধ করে দেবেন।

সর্ব্বদমন

মাকাল, তোকে আমি অমানুষ ভেবে কত বকি, কত গালাগাল দিই দিনরাত। তোর মন এত উঁচু!

মাকাল

কি যে বলেন স্যার! আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ···শুধু সঙ্‌ সাজাতেই জানি!

সর্ব্বদমন

সত্যি! আমরা সবাই সাজঘরের সঙ্‌! কিন্তু তুই যে সেই সঙের মধ্যে আসল রসাল···মাকাল সেজে থাকিস্‌···তা শুধু আজই জান্‌তে পারলাম। আমায় তুই ক্ষমা কর ভাই—

মাকাল

সত্যি স্যার! এবার আমি কিন্তু কেঁদে ফেল্‌বো। গালাগাল দেন বেশ সইতে পারি। কিন্তু অমন ধরা-গলায় এমন মিষ্টি-মিষ্টি কথা আমায় শোনাবেন না! মাইরি বল্‌ছি—

সর্ব্বদমন

ওরে, চোখে জল কি আমারই আস্‌ছে নারে? কিন্তু এই সাজঘরে সঙ্‌ সাজার মোহ আমরা কেউ কাটাতে পারবো না! দে ভাই, টাকা ক'টা দে। অমনি মেক্‌-আপটাও ভালো করে করে দিস্‌। এবার অক্ষম-পিতার ভুমিকায় অভিনয় করতে যাবো। কিন্তু দেখে নিস্‌ মাকাল, অভিনয় আমি ভালোই করবো।

[পাগলের মতো নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।]

[ধীরে যবনিকা নেমে এলো]

চলচ্চিত্র ও জনসমাজ

ভবানী রায়

ভারতবর্ষে চলচ্চিত্রের ইতিহাস মাত্র চল্লিশ বছরের এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে বহু বাধা বিপত্তি ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প, শিল্প হিসেবে আজ একটা বিশেষ স্থানই অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় চিত্র আজও আপন সত্তা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এই অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পের অগ্রগতি বিস্ময়কর সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা আদর্শমুখী উদ্দেশ্যের অভাবে, জনসাধারণের মনের ওপর, যতখানি প্রভাব বিস্তার করা উচিত ছিল, এদেশের চলচ্চিত্র-শিল্পটি তা পারেনি। যে শিল্পে সর্বসমেত প্রায় ৪০কোটি টাকা খাটে এবং যেখানে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার লোকের অন্নসংস্থান হয়, সেই শিল্পটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রত্যেকেরই কাম্য। আমাদের জাতীয় সরকারেরও এই শিল্পটির শুভাশুভ সম্পর্কে দায়িত্ববোধ থাকা উচিত, কারণ সরকারকে কর বাবদ ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প বাৎসরিক যে-টাকাটা দিয়ে থাকে তার পরিমাণ প্রায় ১৩ কোটি টাকা। কাজেই এই শিল্পটির আদর্শগত, নীতিগত এবং ব্যবসাগত সব দিকগুলি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উচিত শিল্পটির উন্নতিকল্পে এই বিষয়ে একটি সর্বভারতীয় সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

সমস্যার কথা বলবার আগে আর একটি কথা বলা দরকার। ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পে সমাজ সচেতনতার অভাব বড় পীড়াদায়ক। যুদ্ধোত্তর স্বাধীন ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে এক নতুন যুগ দেখা দিয়েছে, দেখা দিয়েছে সেই সঙ্গে নানাবিধ সমস্যা। এই যুগ-মনকে বুঝতে হবে সকলের আগে। সাহিত্যের মতই চলচ্চিত্র-শিল্প আমাদের সামাজিক জীবনের দর্পণ। কাজেই এখানে যদি সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিফলিত না হয়, তাহলে এর আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। [illegible] প্রভাবান্বিত বা জনকল্যাণমূলক ছবি তৈরী করতে হলে জন-মানসের সন্ধান নেওয়া দরকার, এই মূল কথাটা চলচ্চিত্র-ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের গভীরভাবে বোঝা দরকার।

ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই স্বীকার করে থাকেন যে, জনগণকে আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য এবং সহজ উপায়ে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও এর স্থান অদ্বিতীয়। কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের বিগত চল্লিশ বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এদিক দিয়ে এই শিল্পটি উল্লেখ-যোগ্য কিছুই করতে সক্ষম হয়নি। দুই-একটি সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার মধ্যে বর্তমানের সমাজ-জীবন যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এনে দিয়েছে। এদিক দিয়ে কয়েকজন সমাজ-সচেতন পরিচালক, প্রযোজক ও লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়। যতদিন না এই সমাজ-সচেতনতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে ততদিন চলচ্চিত্র-শিল্পকে বেওয়ারিস লুচির ময়দা মনে করে এক শ্রেণীর ভাগ্যান্বেষী কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি এই ব্যবসায়ে এসে জুটবেনই। বিগত চল্লিশ বছরের ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলে দেখা যাবে যে, এমনি ধরণের জনকতক ব্যক্তি শিল্পক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে শুধুমাত্র ফাটকাবাজী করেছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা নিজেদের এবং চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রভূত পরিমাণ ক্ষতি করে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। শিল্পক্ষেত্রে এইরকম মনোবৃত্তি অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং সমাজ-সচেতনতা বিবর্জিত এই শ্রেণীর লোক যাতে এই শিল্পের ত্রিসীমানার মধ্যে না আসতে পারে, সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তা নাহলে বর্ত্তমানের এই সংকট থেকে একে রক্ষা করা যাবে না।

ভারতীয় চিত্রে হিন্দী ছবির প্রাধান্য স্বীকার করতেই হবে। এই হিন্দী ছবির বর্ত্তমান [illegible] ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের অগ্রগতির পথে ক্রমশঃই [illegible] দুরতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। নীতির বালাই নেই, [illegible] বালাই নেই, একমাত্র যৌন-আবেদনকে [illegible] শতকরা [illegible] হিন্দী ছবি আজ যেভাবে [illegible]

প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, তা সত্যিই ভয়াবহ। হিন্দী ছবিরও একটা গৌরবময় অতীত আছে। নিউ থিয়েটার্স-এর "দেবদাস," প্রকাশ চিত্রের "রামরাজ্য" বা "ভরত মিলাপ" কিংবা বোম্বে টকিজের "অচ্ছুত কন্যা", শান্তারামের "আদমী", "পড়শী", "দুনিয়া না মানে", "সন্ত তুলসীদাস" মেহবুবের "আউরাৎ"-এর মত ছবি একদা দর্শকমনকে যেভাবে আলোড়িত করেছিল, তা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। আধুনিক বহু ছবিতে আলোড়নের সৃষ্টি হয় সত্যি, কিন্তু এই দুই আলোড়নের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। আজকের দিনের আলোড়ন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যৌন-কেন্দ্রিক ; নগ্ন, কুৎসিত হাস্য লাস্য পরিবেশনের ভেতর দিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প আজ তার কবর খুঁড়ছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। সাম্প্রতিক ভারতীয় চিত্রের যৌনপ্রবণতা আমাদের সামাজিক জীবনকে যেভাবে বিধ্বস্ত করতে উদ্যত হয়েছে, তার পরিণতি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। এর ফলে দর্শকমনে এমন একটা বিকৃত রুচি দেখা দিয়েছে যে, এখন একখানা যথার্থ উন্নত আদর্শমূলক এবং রুচি-সম্পদে পূর্ণ ছবি অধঃপতিত দর্শককে তেমন আকর্ষণ করতে পারে না। চিত্তবিনোদনের নামে এই ধরণের চিত্ত-বিক্ষেপকারী চিত্র-নির্মাণ এবং পরিবেশনের ফলে সাধারণ দর্শকমনে এইরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে, পর্দা থেকে পোষ্টার পর্য্যন্ত তার সাগ্রহ দৃষ্টি এখন নিবদ্ধ থাকে যৌন-লালসার ইঙ্গিতমূলক অভিব্যক্তির দিকে। এইখানেই এর শেষ নয়। "এই ধরণের ছবির 'বাজার' আছে"—এই ধারণা এখন প্রায় প্রত্যেক প্রযোজক পরিচালক এবং পরিবেশকের মনে বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, ভূত প্রেত রোমাঞ্চকর এবং উদ্ভট বিভীষিকাপূর্ণ অবাস্তব ছবির প্লাবন বয়ে চলেছে। এই শ্রেণীর চিত্রই ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের অগ্রগতি ও সমাজ কল্যাণের পক্ষে পরিপন্থী হয়ে ক্রমশঃ একটি ভয়াবহ সমস্যা হয়ে উঠেছে।

হলিউডের যৌন-লালসা উদ্দীপক ছবি যেদিন থেকে ভারতীয় সেন্সরের অনুমোদন লাভ ক'রে সারা ভারতের দর্শকসমাজে আলোড়ন জাগিয়েছে সেদিন থেকে আমরা

লক্ষ্য করেছি, ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের নেপথ্য নায়কগণ ঠিক এই ধাঁচের ছবি একটার পর একটা তৈরী করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। "লেডি হ্যামিলটন" বা "মাদাম ক্যুরির" মত মহৎ ও সুন্দর চিত্র থেকে এঁরা কোন প্রেরণাই লাভ করতে পারেন না; এঁদের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে এক ধরণের মার্কিনী কুরুচিপূর্ণ ছবি। সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষ যদি কঠোর হাতে, কি বিদেশী কি ভারতীয় এইসব জঘন্য কুরুচিপূর্ণ চিত্রের প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণ না করেন, তাহলে জন-কল্যাণমূলক আদর্শ চিত্র রচনা করা অদূর ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সরকারের সেন্সর পদ্ধতির সমালোচনা ইতিপূর্বে বহুবার হয়েছে। কিন্তু তার ফলে পদ্ধতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। "লারে লাপ্পা" জাতীয় ছবি না হলে দর্শক দেখে না—এ ধারণা যে একেবারেই ভ্রান্ত, তা প্রমাণ করে দিয়েছে "মহাপ্রস্থানের পথে"র মত ভাবসম্পদে পূর্ণ উন্নত ছবি।

চল্লিশ বছর আগের দর্শকের রুচি আর আজকের দিনের দর্শকের রুচি একরকম থাকবার কথা নয় আর প্রাকৃতিক নিয়মে তা থাকেও না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথায়, মানুষের রুচি-বোধ এবং রসজ্ঞান যদি একটা আদর্শকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয়, তাহলে যুগের পরিবর্তনে রুচির পরিবর্তন হতে বাধ্য। কিন্তু পরিবর্তনের ভঙ্গীটা হওয়া চাই আদর্শ-মুখী। শিল্প এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে অগণিত পাঠক এবং সমালোচকের রুচির ধারা যুগ যুগ ধরে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে শিল্পীর সৃজনীশক্তি-সম্পন্ন প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শেই, কোন স্থুল বা উত্তেজক দ্রব্য দ্বারা নয়। ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের পুরোভাগে যাঁরা আছেন তাঁরা ত দর্শকের রুচিকে সম্মান করেন না, আঘাতই করেন দেখতে পাই। এই বাংলা দেশে যখন কৌতুক চিত্রের ধারা এল, তখন কয়েকখানা ছবির সাফল্য দেখে চিত্র-নির্মাতারা ধরে নিলেন যে দর্শকের রুচি এই দিকে। তৈরী হতে লাগলো একটার পর একটা হাল্কা ছবি—যার মধ্যে রসোত্তীর্ণ কৌতুকের চেয়ে সস্তা ভাঁড়ামির উপাদানই ছিল বেশী। কাজেই রুচির

দোহাই না দেখিয়ে একটু মানসিক শুচিতার পরিচয় যদি চিত্র-নির্মাতারা দিতে পারেন তাহলেই মঙ্গল—তাঁদের পক্ষে এবং দর্শকদের পক্ষেও।

ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সর্বাংশে ভারতীয় হতে হবে; তা নাহলে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে তা কি করে ভারতের পরিচয় বহন করবে? চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিদেশীর চক্ষে যদি ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি না পেল তাহলে ছবি করার সার্থকতা কোথায়? এমনকি সোভিয়েট সরকার পর্য্যন্ত তাঁদের দেশে সেই ধরণের ছবি তুলতে দেন না, যে ছবি বিদেশীর কাছে সোভিয়েট রাশিয়াকে বড় করে দেখায় না। নিজের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে যদি আমরা বিদেশীদের চোখের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারলাম, তা হলে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে জাঁকজমকপূর্ণ ছবি করবার সার্থকতা কোথায়? "দো বিঘা জমীন"-এর মত খাঁটি ভারতীয় চলচ্চিত্র এদেশে যত তৈরী হয় ততই ভাল। নিজের দেশকে লোকে যাতে বেশী করে ভালবাসতে পারে, ছবি দেখে সেইরকম প্রেরণা যাতে দর্শকরা লাভ করে, সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আজ চলতে হবে সকলকে। সম্প্রতি বিদেশী এবং হলিউডের ছবির প্রভাব কিছুটা হ্রাস পেলেও ভারতীয় চলচ্চিত্র এখনও সর্বাংশে ভারতীয় হোয়ে উঠতে পারে নি। পারে নি তার কারণ নিজের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে, নিজের দেশের ইতিহাসের সঙ্গে অধিকাংশ নবাগত চিত্র-ব্যবসায়ীদের পরিচয় নেই। যে-ধরণের যৌন-লালসামূলক ছবি বর্তমানে তৈরী হচ্ছে তাতে আমাদের আশঙ্কা হয়, হয়ত বা হলিউডের কোন প্রযোজকের টাকা বেনামে ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পে খাটুচে। ভারতের আধুনিককালের ইতিহাসে এমন সব মনীষী জন্মগ্রহণ ক'রে এদেশের জনচিত্তকে আলোড়িত করে গেছেন যে তাঁদের জীবন-চরিত অবলম্বন করে আজকের দিনে সুন্দর সুন্দর চিত্র অনায়াসেই তৈরী হতে পারে। দেশের নিজস্ব ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এমন সব মহিয়সী বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎ আমরা পাই যাঁদের জীবনের আখ্যায়িকা অবলম্বন করে "জোয়ান অব আর্কের" মতই ছবি তৈরী করা যেতে পারে। দুঃখের বিষয় এসব বিষয় নিয়ে খুব কম লোকই মাথা ঘামান। এমনি কত উপাদান ইতিহাসের প্রান্তরে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে চলচ্চিত্রে যার সদ্ব্যবহার অনায়াসেই করা যেতে পারে। জাতি গঠনের পক্ষে, আমাদের পরবর্তী বংশধরগণের চরিত্র গঠনের পক্ষে এইরকম যথার্থ ভারতীয় বিষয়বস্তু অবলম্বনে ছবি যখন তৈরী হবে, তখন আজকের দিনে যেসব সমস্যা ও সঙ্কট চলচ্চিত্র-শিল্পে দেখা দিয়েছে তার অনেকখানি সমাধান সহজ হবে। নতুবা, ভারতীয় চলচ্চিত্রের অগ্রগতি সহসা সম্ভব হবে না। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণীর ব্যক্তিগণ আজ যদি সমবেতভাবে এই শিল্পটির সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন, তাহলে জনগণকে উন্নত আদর্শে এবং সুস্থ জীবন-দর্শনে উদ্বুদ্ধ করার মতো ছবি তৈরী করা সম্ভব হবে এবং দর্শকের রুচির মোড়ও ঘুরিয়ে দিতে পারা যাবে। মোট কথা, স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে এক সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। এখন প্রযোজক ও পরিচালকবৃন্দ কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনের উপকরণ হিসেবে চলচ্চিত্রের ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ না রেখে, একে যদি লোক শিক্ষার বাহন ও বাহকরূপে গণ্য করেন তাহলে কালক্রমে এর দ্বারা সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।

'গৃহপ্রবেশ' ছবির সেটে মহলারত মঞ্জু দে, মলিনা দেবী, সুচিত্রা সেন, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, বিকাশ রায় ও উত্তমকুমার

সান্‌রাইজ ফিল্মসের নির্ম্মীয়মান 'যদুভট্ট' চিত্রে বসন্ত চৌধুরী ও অনুভা গুপ্তা

শেষ খেয়া

★

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[দুনিয়ার চিত্র ও নাট্যামোদীদের কাছে ব্যারিমুর পরিবার একান্ত আপনার! ভ্রাতাদ্বয় লায়োনেল ব্যারিমুর এবং জন ব্যারিমুর এবং ভগ্নী এথেল ব্যারিমুর একত্রেও একাধিক ছায়াছবিতে অবতীর্ণ হয়ে আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। বিশ্বজননন্দিত অভিনেতা জন ব্যারিমুরের জীবনের শেষ ক'দিনের ঘটনা। ১৯৩৪ সালে জন ভারতবর্ষে আসেন চিকিৎসার জন্যে এবং ভারতে ছবি তোলার উচ্চাশা নিয়ে। কিন্তু সে-আকাঙ্খা তাঁর অপূর্ণই রয়ে যায়। স্বাস্থ্যের ভাঙ্গন আর রোধ করা যায় না। এক মাসের ভেতরই জন আবার ফিরে যান স্বদেশে। ১৯৪২ সালের ২৯শে মে তিনি মহাপ্রয়াণ লাভ করেন। তাঁর অনুরাগী অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং চিত্র ও মঞ্চ রাজ্যের নামী পরিচালক জিন ফাউলার মৃত্যুর পূর্ব্বে ক'দিনই তাঁর কাছে কাছে আশেপাশে ছিলেন; সেই ক'দিনের বিবরণ যেমনি বিয়োগবিধুর, তেমনি আবেগময়। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে স্বভাব-শিল্পীর সহজাত শিশুসুলভ সারল্য পরিহাস-প্রিয়তা এবং অম্লান স্মৃতিশক্তির এই পরিচয় করুণ হলেও অন্তরস্পর্শী।]

১৯শে মে। ১৯৪২ সাল।

জন ব্যারিমুর চলেছেন তাঁর সাপ্তাহিক রেডিও প্রোগ্রামের অনুষ্ঠানে। যাবার পূর্ব্বে তিনি টেলিফোনে তাঁর দোভাষীকে দিয়ে জার্মান্ থেকে ইংরাজী অনুবাদ করে সাদা কাগজে লিখলেন। অনুবাদটি শেষ করে, একটি সাদা লাইন টেনে কোনে লিখলেন—"আমার মনে হচ্ছে আমি যেন, মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। যদি কেউ পার এই লাইনগুলি আবৃত্তি করে দিও রেডিওতে"। জীবনের শেষ লেখা তিনি তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে রাখলেন।

—না আমি সকালে আজ ব্রেকফাষ্ট খাব না। কই নিশি কই? নিশি—নিশি—জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন।

নিশি জন ব্যারিমুরের প্রিয় ভৃত্য ও বাগানের মালী। জন ব্যারিমুরের বাগানের সমস্ত ভার নিশির ওপর ছিল। জাপানের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধের দরুন নিশিকে জাপানে ফিরে যেতে হয়। জনই একদিন ক্ষেপে গিয়েছিলেন যখন পুলিশ তাকে নিতে এসেছিল।

—আমার চাকর, কেন তাকে আপনারা ধরে নিয়ে যাবেন? পুলিশ বোঝালে যে, যুদ্ধের নিয়ম এই।...কিন্তু জন ব্যারিমুর একেবারে ভুলে গেছেন সে কথা।

১৯শে মে। দুপুরবেলা। ক্রিং ক্রিং ক্রিং—টেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো, কে, জিন ফাউলার? আমি ব্যারিমুর কথা বলছি। দ্যাখ, নিশিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

জনের শরীর খুব অসুস্থ এবং এই সময় তাকে বিব্রত না করে জিন ফাউলার বললেন—হ্যালো, নিশিকে পাওয়া যাচ্ছে না—তা ও বোধ হয় কোথাও গিয়েছে। এখনি ফিরে আসবে।

জিন ফাউলার লক্ষ্য করলেন যে জন ব্যারিমুরের স্বর ভগ্ন এবং কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ রুক্ষ। সাধারণতঃ অভিনেতাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই তাঁরা অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন। কিন্তু, জিন ফাউলার বেশ সহজ ভাবেই আজ ফোনে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কেমন আছ জন?

—ভাল নেই, শরীর যেন কি রকম করছে—মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

জিন ফাউলার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি লায়োনেল ব্যারিমুরের সঙ্গে দেখা করলেন এবং জনের সম্বন্ধে বললেন।

লায়োনেল ব্যারিমুর জন সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন এবং বললেন—জন তো কখনই স্বীকার করে না যে সে অসুস্থ। তুমি ভাল কাজ করলে ফাউলার। আমি তাকে চোখে চোখে রাখব।

জনের সেক্রেটারী হারলিং মস জনকে নিয়ে রেডিও অফিসের দিকে রওনা হলেন। জন মোটরের ভেতরে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। গরম ওভারকোট, ম্যাফলার, মাথায় গরম টুপি, হাতে দস্তানা।

—আচ্ছা, আজ শীত কি বেশী? আমার বড় কাঁপুনি আসচে। কি জানি, আমার মনে হচ্ছে আমার সময় যেন হয়ে আসচে।

মাঝ পথে জনের প্রিয় রেস্তোরাঁ সেন্ট ডোনাট-এ কফি ও কিছু স্যাণ্ডউইচ খাওয়ার জন্যে সেক্রেটারী মস অনুরোধ করলে।

—না, আমার খেতে মোটেই ভাল লাগছে না। চল তাড়াতাড়ি রেডিও ষ্টেশনে পৌছোনো যাক্—আমার মনে হয় সময় বড় অল্প।

সেক্রেটারী মসের কাছে এই কথাটা মোটেই ভাল লাগল না। এই প্রিয় রেস্তোরাঁতে জন কখনও কফি বাদ দেননি। কিছু না খেলেও একবার নেমে কিছুক্ষণ বসে মালিকের সঙ্গে দেখা করে গল্প করবেন—এ তাঁর বরাবরের অভ্যাস।

মার্চ মাসে জনের সর্দ্দি-কাশি হয়। তখন থেকেই তিনি অসুস্থ। সেরে উঠতে পারেন নি। বেতার কেন্দ্রের ষ্টুডিওতে যখন পৌছলেন তখন জন ঘন ঘন কাসছেন।

—না, না, আমি ঠিক আছি। অত্যন্ত সুস্থ, তাছাড়া আমি মদ এ-ক'দিন একেবারে স্পর্শ করছি না। কোন চিন্তা নেই আপনাদের—ষ্টেশন ডিরেক্টরকে এই কথা বলে জন রিহার্সাল সেরে প্রকাণ্ড বারান্দা ধরে তাঁর ড্রেসিং রুমের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কোন রকমে টাল সামলে এবং যারা তাঁকে দেখবার জন্যে ভীড় করেছিল তাদের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তিনি দেওয়াল ধরে ধরে চলতে লাগলেন।

জনতা ভীড় করেছিল তাঁকে দেখবার আর তাঁর অভিনয় শোনবার জন্যে। অত্যন্ত মর্মাহত হলো তারা জনের অবস্থা এবং কাণ্ড-কারখানা দেখে।

—না, লোকটাকে কোন সময়েই সুস্থ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়

না। রেডিওতে অভিনয় করতে এসেচে তাও মাল টেনে। নিজেকে সামলাতে পাচ্ছে না, কি অভিনয় করবে ?

জন তখনও টলতে টলতে চলেছেন। চোখে অন্ধকার দেখছেন। নিজের ড্রেসিংরুম গোলমাল করে ফেলে অপর একটি ড্রেসিংরুমে গিয়ে চেয়ারে ঢলে পড়লেন।

তরুণ উদীয়মান নট জন ব্যারিমুরের প্রিয় ভক্ত এবং একনিষ্ঠ শিষ্য জন ক্যারাডাইনের ড্রেসিংরুম সেটা। এই তরুণ অভিনেতা তখন অপর একটি ষ্টুডিওতে আবৃত্তি করতে গেছেন।

মাত্র দু'সপ্তাহ পূর্ব্বে ক্যারাডাইন 'ইফ আই ওয়্যার কিং' নাটকে লুই একাদশের চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে ব্যারিমুরের কাছে এসেছিলেন কিছু শিখে নিতে। কারণ জন ব্যারিমুর তাঁর আদর্শ এবং হিরো। জন ব্যারিমুরের তিনি একনিষ্ঠ ভক্ত। শয়নে, স্বপনে, অভিনয়ে তিনি জন ব্যারিমুরের চিন্তা করেন। মনে মনে সব সময়ে অভিনয়ের পূর্ব্বে প্রণাম জানান।

ক্যারাডাইন প্রোগ্রাম শেষ করে ফিরে এলেন তাঁর ড্রেসিংরুমে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'ইফ আই ওয়্যার কিং'-এর সমালোচনা সেঘরে ছিল। কাগজটি পড়বার তিনি সময় পান নি। ক্যারাডাইন তাঁর ড্রেসিংরুমে ঢুকে একজনকে ইজি-চেয়ারে শুয়ে থাকতে দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তাঁর সেই সমালোচনার কাগজটি লোকটির মুখে ঢাকা। কাগজটি লোকটির মুখ থেকে খসে মেঝেতে পড়ে যেতেই ক্যারাডাইন জন ব্যারিমুরকে শুয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠে আনন্দে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন।

ক্যারাডাইন খুব কাছে গিয়ে ডাকলেন—স্যার কি ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছেন ?

কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পেলেন না। তিনি চমকে উঠলেন। নিশ্বাস-প্রশ্বাসও সহজ বলে মনে হ'লনা। নাড়ী দেখলেন টিপে টিপে, কোন অনুভূতিই নেই। হঠাৎ কি খেয়াল গেল ক্যারাডাইন প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—স্যার শুনচেন ?

জন ব্যারিমুর চোখ খুলে চাইলেন। তারপর নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে ক্যারাডাইনের সঙ্গে কর-মর্দ্দন করে বললেন—কেমন আছ ?

—আপনি কেমন আছেন স্যার ?

—আমি, খুব ভাল আছি,—ব'লে আকাশের দিকে হাত তুললেন।

হঠাৎ জন ব্যারিমুর খুব কাসতে লাগলেন এবং খুব টেনে টেনে নিশ্বাস নিতে লাগলেন। তাঁর যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ক্যারাডাইন বেশ বুঝতে পারলেন। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কাসতে কাসতে জন ব্যারিমুর বললেন—এই কাগজগুলোতে তোমার অভিনয়ের সমালোচনা পড়ছিলুম। খুব সুখ্যাতি করেছে। খুব ভাল হয়েছে।

—আপনার নির্দ্দেশমত আমি লুই একাদশের চরিত্রে অভিনয় করেছি। যখনই অভিনয় করেছি আপনার উপদেশগুলি সব সময় স্মরণ করেছি।

—এই তো চাই, আমি তোমাকে একজন খুব বড় অভিনেতা করে দেবো। ঐ চরিত্রটি তোমার বেশ ভাল লাগছে তো ?

—আচ্ছা, সত্যি বলছেন, আমি আপনার মতন বড় অভিনেতা হতে পারব ?

—নিশ্চয়ই, তুমি আমার চেয়েও বড় অভিনেতা হতে পারবে। আগে চরিত্রগুলি কি ধরণের, নাটকে নাট্যকার কি বলতে চাইছেন—সব বার বার বুঝবে, তবে সেই চরিত্রে অভিনয় করতে অসুবিধা হবে না।

ক্যারাডাইনকে পিঠ চাপড়ে আদর করে তিনি ইজি-চেয়ারে ঢলে পড়লেন এবং তাঁর শ্বাস উঠতে লাগল এবং নিমেষেই জন জ্ঞান হারালেন।

তাড়াতাড়ি ষ্টুডিওর ডাক্তার কারষ্টেনকে কল্ দেওয়া হ'ল। তাঁকে কোনরকমে ধরাধরি করে মোটরে চাপিয়ে 'হলিউড হস্‌পিটাল'-এ নিয়ে যাওয়া হ'ল। ডাক্তার রোগ ধরলেন। তাঁর ডবল নিউমোনিয়া হয়েছে—ডাক্তার কারষ্টেন বিস্মিত হলেন। এই মৃত্যুপথযাত্রী রোগী কি করে ক্যারাডাইনের সঙ্গে অভিনয় সম্বন্ধে অতক্ষণ আলোচনা করছিল!

জনসাধারণের কাছে জন ব্যারিমুরের এই সাংঘাতিক অসুখের খবর গোপন রাখা হ'ল। লায়োনেল ব্যারিমুর জনের হ'য়ে রেডিও-প্রোগ্রাম সেরে এলেন। দুই ভায়ের স্বর প্রায় এক প্রকার। শ্রোতারা কেউ ধরতে পারল না।

যকৃতের "সিরোসিস্" জনের পীড়ার একমাত্র কারণ। এর সঙ্গে কিডনীর পীড়া, গ্যাস্‌ট্রিক আলসার প্রভৃতি উপসর্গও জুটলো। শরীরে রক্তচলাচল ঠিকমতো না হওয়াতে তাঁর সমস্ত শরীরে জল জমে উঠল। তাঁর বুকে এবং পেটে জল জমলো এবং হৃৎপিণ্ডের অবস্থাও অত্যন্ত কাহিল হল এবং রক্তের চাপও বাড়তে লাগল।

এরই ভেতর হঠাৎ গভীর রাতে জ্ঞান হওয়ামাত্রই জন চোখ খুলে চারিদিকে তাকিয়ে বললেন—আমার রেডিওর প্রোগ্রাম কি শেষ হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, আপনি তো সন্ধ্যের সময় সেরে এসেছেন।

—আচ্ছা, লোকগুলো আমাকে মাতাল ভাবলে। আমি তখন বেশ অসুস্থ বোধ করছি। তাই টলতে টলতে কোনরকমে দেওয়াল ধরে যাচ্ছিলাম। আশ্চর্য্য, আমি যা করব তাতেই সবাই ভাববে জন ব্যারিমুর মাতাল হয়েছে।

—ক্যারাডাইন কোথায় গেল? বড় ভাল অভিনয় করে সে। খুব বড় অভিনেতা হবে। ভগবান তার মঙ্গল করুন—বলেই আবার জন অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কোন রকমে সে রাত কাটল।

ডাক্তার কারষ্টেন বিস্মিত হয়ে বলেছেন—জন ব্যারিমুর কি করে যে অভিন সম্বন্ধে এত সচেতন, এত অসুস্থতার মধ্যেও মনের জোর দেখান তা ভেবেই পাওয়া না। সেই রাত্রেই তাঁর মৃত্যু হতে পারতো। কিন্তু অসম্ভব মনের জোরের জন্যেই রাত কাটিয়ে দিলেন। কেমন ক'রে যে তিনি রাতটা কাটিয়েছিলেন আজও সেকথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়!

২০শে মে। সকালবেলা। জীবনে জন ব্যারিমুরের শরীরে কোন অস্ত্রোপচার হয়নি। "ট্যাপ" করে শরীর থেকে জল বার করা হবে শুনে তিনি বললেন—মৃত্যুর পূর্ব্বেই পোষ্ট মর্টেম! আমার দেশের লোকেরা কি? এত বড় অভিনেতার দেহের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হচ্ছে আর তারা তা সহ্য করছে? এর পরেই আবার তিনি জ্ঞান হারালেন। ট্যাপ করে জনের শরীর থেকে জল বার করা হ'ল। পাশের ঘরে জন ব্যারিমুরের অন্তরঙ্গ এবং অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ বিখ্যাত মঞ্চ-শিল্পী ডেকার এবং জনের বড় ভাই লায়োনেল ব্যারিমুর মনমরা এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছেন।

জিন ফাউলার ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন লায়োনেল ব্যারিমুর ভায়ের জন্যে সমস্ত রাত উৎকণ্ঠিত হয়ে কাটিয়েছেন।

—এস ফাউলার। কি দুঃখের কথা ভাই বলো তো? আমি তার দাদা, সে যন্ত্রণায় কাতর অথচ আমি কিছুই করতে পারছি না। মানুষের ক্ষমতা কতটুকু ভাই! এতটুকু ক্ষমতা নেই যে তার যন্ত্রণার উপশম করি। টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা জল লায়োনেলের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

জিন ফাউলার জনের ঘরে ঢুকলেন। কামারের হাপরের মত তাঁর ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস হচ্ছে। মুখটি হাঁ করা, চোখ দু'টি অর্দ্ধনিমীলিত, চোখের তারা ওপর দিকে উঠে গেছে। ধীরে ধীরে ফাউলার ঘরে ঢুকলেন।

জিন ফাউলার মনে করেছিলেন জন অচৈতন্য হয়ে আছেন। কিন্তু, ঢোকবামাত্রই জন বললেন—এস, ভাই জিন, এস। তাঁর স্বর বিকৃত এবং একেবারে ক্ষীণ। এর আগেও অনেকবার অসুখের সময় জিন ফাউলার জনকে দেখেছেন এবং ডাক্তারেরা যখন আশা ছেড়ে দিয়েছেন তখনও ফাউলার কখনও ভাবেন নি জন মারা যাবেন। ফাউলারের মনে হয়েছে জন নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন।

কিন্তু আজ তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন মৃত্যু দূত তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে। সমস্ত ঘরটিতে যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছেন জন ব্যারিমুর। জীবনে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ দর্শকদের তিনি হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন—তাদেরই একজন হয়ে বিভিন্ন চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু আজ কারও এতটুকু ক্ষমতা নেই যে, তাঁর যন্ত্রণার উপশম করতে পারে!

কানে কানে কে যেন ফাউলারকে বললে—ছাখ, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ধীরে ধীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রতে চলেছে, তোমার অসামান্য প্রতিভাধর বন্ধু আজ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে!

ডেকার ঘরে ঢুকলেন। হঠাৎ ডেকারকে দেখে জন উঠে বসলেন এবং বললেন—এস, বন্ধু, এস, মনে হয় যতক্ষণ তুমি আছ আমার কাছে, ততক্ষণ আমাকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। জীবনে কোনদিন বন্ধু তোমাতে আমাতে একমুহূর্ত্তের জন্যেও ছাড়াছাড়ি হয় নি। তাই মনে হয় যম এসে ফিরে যেতে পারে।

লায়োনেল ব্যারিমুর ফাউলারকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি মনে হয়?

ফাউলার কাতর কণ্ঠে বললেন—আর মিছি-মিছি লুকিয়ে কি লাভ? তুমি বেশ বুঝচ এবং আমিও জানি জনের শেষ হয়ে আসছে।

জন ব্যারিমুর ছটফট্ করছেন। বেশীরভাগ সময়ই অচৈতন্য অবস্থায় রয়েছেন। মাঝে মাঝে কাতরানি আর, উঃ, আঃ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

জনের ভগ্নী অভিনেত্রী এথেল ব্যারিমুরকেও খবর পাঠানো হয়েছে জনের অবস্থা জানিয়ে।

খানিকক্ষণের জন্যে জনের জ্ঞান ফিরে এল। ঘোলাটে চোখ নিয়ে একবার চারিদিকে তাকাতে লাগলেন, তারপর বললেন—ফাউলার, বন্ধু, আর কেন? এইবার প্রেস-রিপোর্টারদের খবর দাও। তাঁরা আসুন। আমার বড় হবার পথে এঁদের দান কম নয়। তাঁরা না হলে হয়তো এত বড় হতে পারতাম না। আমাকে জীবনে তাঁরা প্রচুর সম্মান দিয়েছেন।

'হলিউড হস্‌পিটালে' ব্যস্ততার সীমা নেই। সমস্ত সহর যেন এই হাসপাতালে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সমস্ত আমেরিকার সাংবাদিক, রিপোর্টার এবং সিনেমা সম্পাদক এবং অন্যান্য নর-নারী এসে প্রতি মুহূর্তে জন ব্যারিমুরের অন্তিম অবস্থার সংবাদ শুনে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রত্যেক সংবাদপত্র এবং চিত্রপত্রিকার তরফ থেকে সেখানে সাময়িক ভাবে অফিস খোলা হয়েছে। সেদিন এর চেয়ে বড় খবর আর কিছুই হতে পারে না। চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নট অসামান্য প্রতিভাধর শিল্পী জন ব্যারিমুর এপারের রঙ্গমঞ্চের অভিনয় শেষ করে চলে যাচ্ছেন।

স্তিমিত দীপের ভীরু কম্পিত শিখা! সমস্ত হাসপাতাল যেন মৃত্যুর মুখোমুখি এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। ফিস্‌ফিস্ শব্দ। ঐ, ঐ বুঝি সব শেষ হ'য়ে গেল। ঘন ঘন ডাক্তার-দের বুলেটিন বেরোচ্ছে। বিশেষ বিশেষ সংস্করণ প্রতি মুহূর্তে বেরোচ্ছে জন ব্যারিমুরের অবস্থা জানিয়ে।

প্রতিভাশালী জনপ্রিয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানিত বিদায় সম্বর্দ্ধনা।

ট্যাপ ক'রে বৃহস্পতিবার আবার জনের শরীর থেকে জল বার করা হল। কিছুক্ষণ বাদে একটু জ্ঞান হ'ল জন ব্যারিমুরের। লায়োনেল ব্যারিমুর, এথেল ব্যারিমুর, জিন ফাউলার এবং জনের কন্যা ডায়না—সবাই তাঁর চারিদিকে বসে রয়েছেন।

—দাদা, (লায়োনেল ব্যারিমুরকে) আমার জীবন কি ব্যর্থ? আমার মৃত্যুর পর কি সব লিখবে যে আমার জীবনই আমার ব্যর্থতার জন্যে দায়ী।

—না ভাই, তোমার জীবন যদি ব্যর্থ হয় তাহলে সার্থক জীবন কার? মঞ্চ ও চলচ্চিত্র যতদিন থাকবে তুমি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

—দ্যাখ তো দাদা, আমার স্মৃতি-শক্তি ঠিক আছে কিনা? শ্বাসকষ্ট সত্ত্বেও জন ক্ষীণকণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

To-morrow and to-morrow and to-morrow creeps into the............ইত্যাদি। নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করে গেলেন।

—তোমরা কি মনে কর, আমি কিং লিয়ার-এর পার্ট এখনও এই অবস্থায় করতে পারি?

একটু দম নিলেন। তারপর, মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন—মা, তোমার সঙ্গে রোমিও জুলিয়েট-এ শেষ অভিনয় করেছি তোমার পিতার ভূমিকায়—যদিও আমি তোমার সত্যিকার পিতা। হায়, আজ যদি এই "মৃত্যু দৃশ্য" কেউ তুলত তো আমি এখনও অভিনয় করে দেখিয়ে দিতে পারি।

পরের দিন জনের অবস্থার একটু উন্নতি দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাগজপত্রে এবং হাসপাতালে একটা সাড়া পড়ে গেল। ফাউলার ঘরে ঢুকলেন। নার্স জনের চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন চিরুণী দিয়ে।

জন জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি করছ ?

—আমি আপনার চুল আঁচড়ে দিচ্ছি। নার্স বললে।

—দূর, কি মুস্কিল, আমি মনে করছি তুমি আমাকে চুমু খাবে ব'লে আমার মুখের কাছে ঝুঁকছ।

—শোন, জীবনভোর নারী দেখলেই আর আমি থাকতে পারি নি। কিন্তু তারা আমার সঙ্গে ছলনা করে গেছে। তারা ছলনাময়ী। তা হলেও তাদের আমি বড় ভালবাসি। শুনবে আমার কবিতা, শোন—"Oh woman, Beautiful beyond............ জন আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

প্রদীপ নেভবার পূর্ব্বে যেমন একবার দপ করে জ্বলে ওঠে এও হ'ল তাই।

জনের বিশিষ্ট বন্ধু রেভারেণ্ড ফাদার জন ও'ডোনেল আজ এসেছেন জনের বন্ধু হিসেবে নয়, এসেছেন শেষকৃত্য সমাপন করতে পুরোহিত হয়ে। মৃত্যুপথযাত্রীকে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের আদব-কায়দা অনুযায়ী বাইবেল থেকে পাঠ করে শোনাতে লাগলেন তিনি। কিন্তু প্রাণ যেন বেরিয়েও বেরোতে চায় না। কি দুর্নিবার আকর্ষণ এই মায়াবিনী পৃথিবীর প্রতি। কি উদ্যম আর আকাঙ্ক্ষা এই মঞ্চ ও চিত্র, এই নকল রঙ্গ-জগৎ থেকে না যাওয়ার। জিন ফাউলার দেখলেন জনকে দাঁত মাজিয়ে দেবার জন্যে নার্স বিশেষ চেষ্টা করছেন কিন্তু জন দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে আছেন।

—দেখুন তো, কিছুতেই দাঁত মাজাতে পারছি না। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে পড়ে আছেন।

—আচ্ছা, দাঁত মাজানো কি বিশেষ প্রয়োজন ?

—নিশ্চয়ই, ডাক্তার বিশেষ করে বলে গেছেন। আমার মনে হয় ওঁর জ্ঞান আছে।

জিন্ ফাউলার নার্সকে বললেন—আচ্ছা, আমি যা বলব আপনি কিছু মনে করবেন না। কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়ান।

—জন, শোন, আমি ফাউলার বলচি,—ব'লে জনের কানের কাছে গিয়ে বললেন—চোখ খুলে ত্যাখ তুমি কি জিনিষ হারাচ্ছ? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী [illegible] আজ তোমাকে দাঁত মাজাতে এসেছে। এরকম ভাগ্য ক'জনের হয়। আর তুমি তা হারাচ্ছ ? সে এখনও তোমার কাছে আছে।

জন ব্যারিমুর সুবোধ বালকের মত চোখ চেয়ে দেখে মুখ খুললেন। নার্স দাঁতের মাজন দিয়ে মুখ পরিষ্কার করবার জন্যে এক গ্লাস তরল 'মাউথ-ওয়াশ্' দিলেন তাঁর মুখে।

জন ঢক্‌ঢক্ করে খেয়ে ফেললেন। হৈ হৈ করে সমস্ত ডাক্তাররা ছুটে এলেন। কিছুক্ষণ বাদেই জন রক্ত বমি আরম্ভ করলেন। তারপর একেবারে নিস্তেজ ও ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

ফাউলার এলেন দেখতে। জন বিছানায় শুয়ে আছেন। গলা পর্য্যন্ত সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। হাত

দু'টি বুকের ওপর রাখা। শান্ত সৌম্য ভাব। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন একটা দুরন্ত যৌবনের জীবন্ত উজ্জ্বল জ্যোতি বেরোচ্ছে! কে বলবে এই লোক মৃত্যুপথযাত্রী।

জন চোখ খুললেন—ফাউলার, ভাই, আমি ঘুমোচ্ছি, তুমি আমার হাত দু'টো ধরে থাক ভাই, যাতে আমি পালিয়ে না যাই। ছাখ, বন্ধুকে চোখে চোখে রেখো!

আবার তিনি জ্ঞান হারালেন। আবার যখন জ্ঞান এলো তখন ফাউলারকে ডাকলেন—শোন, কথা আছে, আমার কাছে এস। তুমি বাফেলো বিলের অবৈধ সন্তান, না? কর্ণেল কডি তোমার আসল পিতা, তাই না? আমি জানতুম কিন্তু কাউকে বলি নি। তুমি আমি ছাড়া এ পৃথিবীতে কেউ জানে না এবং আমিও আজ পর্য্যন্ত ছাখ কাউকে বলিনি এ-কথা।

ফাউলারের সঙ্গে জন ব্যারিমুরের এই শেষ কথা। তারপরই আবার তিনি জ্ঞান হারালেন।

সেদিন নবম দিবস। জনের অবস্থা ক্রমেই খারাপ [illegible] ছে। নতুন উপসর্গও দেখা যাচ্ছে—জন ভুল [illegible] আরম্ভ করেছেন। সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে [illegible]

Ninth Day.
John Barrymore in delirious state.

—দাদা, আমি চললুম। আর অভিনয় করব না। এথেল ব্যারিমুর, দিদি রাগ ক'রো না, তোমার ভাই চলে যাচ্ছে, আমার অভিনয় আর ভাল লাগছে না। প্রেসকে জানিয়ে দাও 'হ্যামলেট' মরেছে।

এক সেকেণ্ডের জন্যে জনের যেন জ্ঞান হ'ল। লায়োনেল ব্যারিমুরকে যেন খুঁজতে লাগলেন।

লায়োনেল ঝুঁকে পড়ে বললেন, কি ভাই কি বলছ?

—বড় কষ্ট হচ্ছে দাদা, ঘরে কি হাওয়া নেই! তোমরা চলে যাচ্ছ? আমায় ছেড়ে যেও না দাদা। ঐ, ঐ, কে যেন আমায় নিতে আসছে।

ব্যাস্। সব শেষ। এই কথা কটি বলেই জন ব্যারিমুর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সেদিন ১৯৪২ সালের ২৯শে মে।

ডুক্‌রে ডুকরে কেঁদে উঠলেন লায়োনেল আর এথেল ব্যারিমুর।

—এত একা জীবনে কখনও অনুভব করি নি। ছেলেবেলা থেকে 'জন জন' করে তাকে ডেকেছি। জীবনে অভিনয়ে তার সঙ্গে ছাড়া কোন দিন থাকিনি। আজ সব হারালুম। কোন সান্ত্বনা নেই। আর তাকে কোন দিন দেখতে পাবো না। তাকে ছাড়া 'মঞ্চ ও চিত্র ভাবতেই পারছি না। আমাদের ছেড়ে সে চলে গেল, এতটুকুও তার দাদা দিদির কথা ভাবল না। এত নিষ্ঠুর সে! কেবলই মনে হচ্ছে—ঐ বুঝি জন আসছে। রঙ্গমঞ্চের 'হ্যামলেট' সত্যিই চলে গেল। কামনা করি সে স্বর্গে সুখী হোক। তার আত্মার শান্তি হোক। একমাত্র সান্ত্বনা রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নটের ভাই বোন আমরা।

অপ্রতিহত জনপ্রিয়তার অধিকারিণী
শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী

মূক ও মুখর চরিত্রের রূপদানে সমান সুদক্ষা
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

নতুন নাটক

রঙ্‌মহলে 'দূরভাষিণী'

গত ৩১শে জুলাই নব ব্যবস্থাপনায় নবসংস্কৃত 'রঙ্‌মহলে'র দ্বার নতুন ক'রে উদ্ঘাটিত হয়েছে কথা-সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস অবলম্বনে রচিত নতুন নাটক "দূরভাষিণী"-র অভিনয় দিয়ে। উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন 'নতুন ইহুদী'-খ্যাত নাট্যকার সলিল সেন, গীত রচনা ক'রেছেন শৈলেন রায়, সঙ্গীত পরিচালনা ক'রেছেন নচিকেতা ঘোষ, মঞ্চশিল্পের ভার ছিল মনীন্দ্র দাসের ওপর আর নৃত্য পরিচালনা ক'রেছেন অতীনলাল।

উপন্যাসের প্রসঙ্গে না গিয়েই এ-নাটকের আলোচনা করা সমীচীন। কেননা 'দূরভাষিণী' উপন্যাসের চিত্র ও চরিত্রগুলিকে এই নাটকে আমরা ঠিকভাবে পেয়েছি কিনা, ঠিকভাবে পেতে পারতাম কিনা, সে বিষয়েই যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমাদের। নাটকে আমরা পাই টেলিফোন অপারেটর বীণা বসুমল্লিককে। দেশ ছেড়ে এদের পরিবার যখন ক'লকাতায় আসে, তখনই এর সঙ্গে আলাপ হয় মৃন্ময় নন্দীর। মৃন্ময় খবরের কাগজের রিপোর্টার। সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি কোথাও না থাকলেও ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ভেতর

দিয়ে মধুর সম্পর্কই গড়ে উঠেছিল এদের মধ্যে।' কিন্তু বীণার বাবা গিরীণবাবু যখন বিয়ের প্রস্তাব করলেন মৃন্ময়ের কাছে, উল্টোভাবে নিল সে, দুর্নাম দিয়ে মেয়ে গছিয়ে দেবার চেষ্টা ভেবে গিরীণবাবুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করল মৃন্ময়, আহত হ'ল বীণাও। এদের নিয়ে গল্প লিখতে চেয়েছিল মৃন্ময়ের সহকর্ম্মী কল্যাণ, কিন্তু গল্প বুঝি তার আর লেখা হয় না, যে-পরিণতির দিকে ঝুঁকেছে এদের জীবন, সে-পরিণতি তো সে চায় নি। মোটা মাইনের সরকারী চাকরী পেয়েছে মৃন্ময়, ধনী কীর্ত্তি গুহের নৃত্যগীতকুশলা মেয়ে সুস্মিতার সঙ্গে

তার বিয়ের কথা চলছে। কীর্ত্তি গুহ কল্যাণেরই দূরসম্পর্কীয় কাকা, তাই মৃন্ময়ের কাছ থেকে পাকা কথা নেবার ভার পড়ল কল্যাণের ওপর। মৃন্ময় পাকা কথা দিতে চায় না, এখনও যেন তার দুর্ব্বলতা রয়েছে বীণার সম্পর্কে, সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহও দানা বাঁধছে। বিমল মুখার্জ্জি বীণার সহকর্ম্মিণী কমলার ভাই, মুভি আর্টিষ্ট। বিবাহিতা কমলা কুমারী সেজে টেলিফোনে কাজ করতে গিয়ে বিষ নজরে পড়ে শাশুড়ীর, সন্দেহভাজন হয় স্বামীরও। শেষ পর্য্যন্ত স্বামীগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে যক্ষ্মারোগগ্রস্তা কমলা তিলে তিলে এগিয়ে চলে আত্মহত্যার পথে। বীণা বিমল মুখার্জ্জির বাড়ীতে যেত এই কমলার সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যে। বিমল মুখার্জ্জির সঙ্গে বীণাকে জড়িয়ে সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে মৃন্ময়ের মনে। তবু সে গিরীণবাবুর সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নেয় ক্ষমা চেয়ে, কিন্তু বীণা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না তাকে। মন স্থির ক'রে মৃন্ময় আর একদিন এল বীণার বাড়ীতে, এসে দেখে বিমলের গায়ে হাত রেখে তাকে কি অনুনয় করছে বীণা, ধৈর্য্যচ্যুত মৃন্ময় মনের সন্দেহ এবার প্রকাশ করল সরাসরি অভিযোগ করে, মিথ্যা অভিযোগে বীণাও উঠল গর্জ্জে, এই পরিস্থিতিতে বিমলই মধ্যস্থ হয়ে সহজ সমাধান ক'রে দিল মৃন্ময় ও বীণার মিলন ঘটিয়ে।

'দূরভাষিণী' নাটকের এই কাহিনীতে দূরভাষিণীদের তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় দৃশ্যে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের যে চিত্র দেখানো হয়েছে, তা' যেমন যান্ত্রিক তেমনই একদেশদর্শিতাহেতু রসসৃষ্টির পরিপন্থী। সুপারভাইজার কড়া বা অত্যাচারী হ'তে পারে কিন্তু হৃদয়-হীনতার প্রকাশে অতখানি দ্বিধাহীনতা কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কমলা ও বিনয়ের (কমলার স্বামী) দ্বন্দ্বে টেলিফোন গার্লের কর্ত্তব্য ও কর্ম্মজীবনের যে-প্রসঙ্গ এসেছে তা' অবান্তর না হলেও তুচ্ছ, চাকুরীজীবিনী যে-কোনও মেয়ের স্বামীই এমনি সন্দেহ করতে পারে তার স্ত্রীকে। বিশেষতঃ, সিঁদুর পরার যে-প্রসঙ্গ আনা হয়েছে এদের দ্বন্দ্ব-সংলাপের মধ্যে তা' তুচ্ছ না হ'লেও আকস্মিক। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে নাটকের নায়িকা কমলা নয়, বীণা, টেলিফোনের কাজ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কোনও দ্বন্দ্ব বা সমস্যা বীণার জীবনে প্রতিফলিত হয় নি। বীণা তো যে-কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারের যে-কোনও চাকুরীজীবিনী মেয়ে, দূরভাষিণী বলে তাকে আমাদের ভুল হয় না নাটকের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মুহূর্তে।

নাটকের গঠনপদ্ধতি আলোচনা করলে দেখতে পাই, টেলিফোন

কর্মীদের জীবন যে দৃশ্যে নাট্যকার প্রত্যক্ষভাবে দেখাতে চেয়েছেন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের চিত্র-সমন্বিত সেই দ্বিতীয় দৃশ্যটিই নাটকে প্রক্ষিপ্ত অর্থাৎ সেই দৃশ্য বাদ দিলেও নাট্যকাহিনী এগিয়ে যেতে পারে। এমনই অবান্তর দৃশ্য পাই খবরের কাগজের অফিসে। সুস্মিতা বা তার নাচ নাটকের পক্ষে বোধ হয় অপরিহার্য্যই নয়। বিনয়-কমলার দ্বন্দ্বে দুটো দৃশ্যের কোনও প্রয়োজনই ছিল না। ঘটনা ও নাট্যক্রিয়ার দ্বন্দ্বে নাটকের কাহিনী এগিয়ে যাওয়াই নাট্য-স্বাচ্ছন্দ্যের মূল কথা। অথচ সমগ্রভাবে দেখতে গেলে, নাটকের প্রথমার্দ্ধে নাট্যকাহিনী যেন খুঁড়িয়ে চলতে চেয়েছে বলে মনে হয়। শেষ দিকে কিছুটা সংহতি এলেও রুগ্না কমলার একঘেয়ে জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কিছুটা আঘাতও করা হয়েছে সেই সংহতিতে। কোনও কোনও দৃশ্যের শেষে কোনও নাট্য বিস্ময়ই সৃষ্টি হয় না দর্শকের মনে। যেমন, খবরের কাগজের অফিসের দৃশ্যগুলি, পার্কের দৃশ্যটি, মৃন্ময়ের সরকারী অফিসের দৃশ্য। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে এই দৃশ্যগুলি উপভোগ্য হয় নি। বরং নাটকের সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য দৃশ্য বলতে হয় পার্কের দৃশ্যটিকে। গিরীণবাবুর দৃশ্যগুলিও কম উপভোগ্য নয়। কিন্তু স্বতন্ত্র-ভাবে যে-দৃশ্য যত উপভোগ্যই হোক, যে-দৃশ্যে যে-নৈপুণ্যই প্রকাশ পাক, দৃশ্য-সমাবেশ ও ঘটনা-সংস্থানের পদ্ধতি যেখানে নাট্যকাহিনীকে সংহত ও দৃঢ়গতি করার পরিবর্ত্তে ছন্নছাড়া ও শ্লথ-গতি করে সেখানে আর যাই হোক নাট্যরসের সৃষ্টি হয় না। তা' ছাড়া প্রতিটি দৃশ্যই ঘনিষ্ঠ চিত্র ও চরিত্র সমাবেশে সৃষ্টি করা হবে, 'নতুন ইহুদী'র নাট্যকারের কাছে এমন আশা করা অন্যায় হবে না। কিন্তু সে-আশা আমাদের ব্যর্থ হয়েছে। খবরের কাগজের অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ওয়েলিংটন পার্ক ও বীণাদের বাড়ীর অধিকাংশ দৃশ্য দেখে কেউ বলতে পারবে না, এগুলি সেই সেই পরিবেশের ঘনিষ্ঠ চিত্র। নাটকের ঘটনার যতটুকু গতি দেখা যায়, তা' যেন সরলরৈখিক, দ্বন্দ্বের যেখানে অবকাশ ছিল সে অবকাশ কাজে লাগানো হয় নি, অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অনেক রসাত্মক ঘটনা ঘটেছে নেপথ্যে, আমরা পেয়েছি তার বিবরণ। মৃন্ময়ের দুর্ব্যবহারের পর থেকে যে দ্বন্দ্ব বীণার জীবনে আসা সম্ভব ছিল, নাট্যকার সে-সম্ভাবনা গ্রহণ করেন নি, বীণাকে নিযুক্ত রেখেছেন কমলার সেবায় আর মাঝে মাঝে উপস্থাপিত করেছেন কোনও কোনও ঘটনার বিবরণ। ছায়াছবিতে এই ফাঁক পূরণ করে বীণাকে সম্পূর্ণ ক'রে তোলা যায় সামান্য দু'চারটি কথায়, দু'চারটি দৃশ্যাংশের সংযোজনায়, কিন্তু নাটকে এই ফাঁক সামান্য নয়, নাট্যরসের অভাব বেড়ে ওঠে আমাদের এই ফাঁকে। নাটককে নাটকের মত ক'রে রচনা না করলে নাটক হিসেবে তাকে দেখা খুব মুস্কিল হয়ে পড়ে।

'দূরভাষিণী'-র অভিনয় কিছুটা উপভোগ্য হয় নি, তা'

নয়। চরিত্রসৃষ্টির বৈচিত্র্য, স্থানে স্থানে শক্তিশালী ও রসমধুর সংলাপ আর এককভাবে দৃশ্য সজ্জার শিল্পকুশলতা ও শিল্পীদের অভিনয় কিছুটা আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছে এ-নাটকের অভিনয়কে। ওয়েলিংটন পার্ক, বীণা ও কমলাদের বাড়ী, কীর্ত্তিবাবুর ড্রয়িং রুম প্রভৃতি সব দৃশ্যই শিল্পী মনীন্দ্র দাসের সুরুচি ও শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দেয়, কিন্তু খবরের কাগজের অফিস কোন কাগজের অফিস তা' বোঝা গেল না। অবশ্য, এর জন্যে নাট্য পরিচালকের দায়িত্বও কম নয়। অভিনয়ে সবচেয়ে আগে নাম করতে হয় বৃদ্ধের ভূমিকাভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায়ের। উচ্চস্তরের হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর গম্ভীর মুখের পরিহাস-রসিক সংলাপে, তাঁর "তবে যে বললে একা একা" উক্তি দর্শকরা অনেকদিন মনে রাখবেন। চরিত্রসৃষ্টির গুণে গিরীণ-বাবুর ভূমিকায় নীতীশ মুখার্জ্জির অভিনয় উপভোগ্য হয়েছে, তবে তাঁর অভিনয় ভঙ্গীতে হাস্যরস সৃষ্টির যে প্রচেষ্টা মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তা' রসসৃষ্টির পরিপন্থী। বীণার ভূমিকায় প্রণতি ঘোষ রূপসজ্জায় ও অভিনয়ে সহজ সাবলীলতা বজায় রেখেছেন, মাঝে মাঝে টেনে কথা বলার ঝোঁক ও দৃশ্যশেষে স্বর উচ্চগ্রামে চড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা তাঁকে সংযত করতে হবে। এদিক দিয়ে কমলার ভূমিকায় রূপ-সজ্জায় না হ'লেও অভিনয়ে সর্বত্রই সাবলীলতা ও স্বরগ্রামের পরিবেশানুগ তারতম্য বজায় রেখেছেন। প্রথমে অসুস্থ কমলাকে যেভাবে মুখে কালিঝুলি মাখা দেখি, পরের দিকে সে-তুলনায় তাকে সুস্থ বলেই মনে হয়। কাজিল মেয়ে লতার ভূমিকায় তপতী ঘোষ চরিত্রানুগ সু-অভিনয় ক'রেছেন। মৃন্ময়ের ভূমিকায় দীপক মুখোপাধ্যায় যে তৎপরতা ও স্বাচ্ছন্দ্য নাটকের প্রথম দিকে দেখিয়েছেন শেষ দিকে ততটা পারেন নি, অবশ্য এর জন্যে নাট্য-পরিবেশ কিছুটা দায়ী। ছায়াছবির শিল্পী হয়েও তিনি তাঁর গলা যে-ভাবে সুদূর-শ্রাব্য ক'রে তুলেছেন রবীন মজুমদার ও প্রশান্তকুমার তেমন পারেন নি। তাই কল্যাণ-রূপী প্রশান্তকুমার আর বিমলরূপী রবীন মজুমদার থিয়েটারের দর্শকের সামগ্রিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। তবুও এটা আনন্দের কথা, রবীন মজুমদারের আড়ষ্টতা প্রশান্তকুমারে নেই। পরেশের সরল ভূমিকায় জীবেন বসুর সহজ অভিনয় প্রশংসনীয় কিন্তু কোনও এক দৃশ্য-শেষে তাঁর চরিত্রের মুখের "স্কাউণ্ড্রেল" কথাটি তাঁর উচ্চকণ্ঠে একাধিকবার স্থান পেয়ে দৃশ্য ও দৃশ্য-রচয়িতাকে হাস্যকর ক'রে তুলেছে। নকুলের ভূমিকায় জহর রায় উপভোগ্য কিন্তু তাঁকে হাস্যরসসৃষ্টির ভঙ্গীটি ছাড়তে হবে। মহেশবাবুর ভূমিকায় আদিত্য ঘোষ, টেলিফোন সুপার-ভাইজরের ভূমিকায় গীতা সিংহ, কাত্যায়নীর ভূমিকায় সন্ধ্যা দেবী, যোগমায়ার ভূমিকায় বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয়ের ভূমিকায় বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও পথচারীর ভূমিকায় বলীন সোমের অভিনয় স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। ঘুগ্নীওয়ালার ভূমিকায় কার্ত্তিক সরকার যথা সময়ে প্রবেশ করতে না পেরে তাঁর চরিত্রের তাৎপর্য্য নষ্ট করেছেন আর কীর্ত্তিবাবুর ভূমিকায় সৌরেন ঘোষ অনাবশ্যকভাবে টেনে কথা বলে চরিত্রটিকে একঘেয়ে ক'রে তুলেছেন, অথচ তাঁর কণ্ঠ তাঁর অমূল্য সম্পদ, এ-ভূমিকার পক্ষে তাঁর কণ্ঠ কোন কৃত্রিম প্রয়োগপদ্ধতির অপেক্ষা রাখে না। জগন্নাথের (খবরের কাগজ অফিসের বেয়ারা) ভূমিকায় দেবী নিয়োগী অভিব্যক্তিহীন হলেও তৎপর। কিন্তু সুস্মিতারূপিনী জয়শ্রী সেন বৈশিষ্ট্যহীন। আলোকসম্পাত পরিবেশ ও পরিস্থিতির সহায়ক হয়ে ওঠে নি।

—সুবোধকুমার ঘোষ

[আবেগাভিব্যক্তিময়ী সুদক্ষা অভিনয়শিল্পী শোভা সেনকে ছায়াছবির ব্যাপার সংক্রান্ত বিষয়ে 'চিত্রবাণী'র পক্ষ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। তিনি অত্যন্ত সহজ এবং সরলভাবেই সেগুলির উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নোত্তরগুলি পাঠকবর্গের কৌতূহল এবং আগ্রহ নিবৃত্ত করবে মনে হয়। —চি. স]

ছোটবেলার কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে চলচ্চিত্রে আসার বাসনা জাগে? যদি সেরকম কোনো ঘটনা থাকে বা মনে পড়ে জানাবেন।

ছোটবেলার বিশেষ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলচ্চিত্রে আসিনি। আই. পি. টি. এ'র 'নবান্ন'-অভিনয়ের সময় দু'একজায়গা থেকে ডাক আসে। সেটাই পরে নিমাই ঘোষ-এর 'ছিন্নমূলে' সত্যিকারের রূপ নেয়।

সত্যিকারের অভিনেত্রী হিসেবে সার্থকতা লাভ করতে গেলে অনেককিছু গুণেরই অধিকারী হওয়া দরকার। প্রথম দরকার অভিনয় শিক্ষা। তার জন্য দরকার উপযুক্ত শিক্ষক। নিজের চেষ্টাও বিশেষ দরকার। দৈহিক সৌন্দর্য্যও শিল্পীকে অনেকখানি সহায়তা করে। শিল্পীকে শিখতে হবে অভিব্যক্তি, বাচনভঙ্গী, উচ্চারণ এবং গোটা চরিত্রকে বিশ্লেষণ করবার মত শক্তিও তার থাকা একান্ত দরকার।

কোনো ছবিতে নিজকণ্ঠে গান গেয়েছেন কি?

না।

বিদেশী ছবি আপনি দেখেন কি? বিদেশী ছবির মধ্যে কোন্ জাতীয় ছবি আপনার বিশেষ পছন্দ এবং কেন? দুর্বৃত্তপনা (Gangsterism) বা ডিটেকটিভ ছবি এবং যৌন মাদকতাময় বিদেশী ছবি অবাধে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় বাংলা দেশে প্রদর্শন সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

আমার উত্তর

শোভা সেন

আপনি কি কোনদিন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সাধারণ শো'তে আপনার নিজের অভিনীত ছায়াছবি দেখেছেন? আপনার অভিনয় সম্বন্ধে দর্শকসাধারণের উচ্ছ্বাস বা মন্তব্যপূর্ণ সমালোচনার কলকোলাহল শুনে আপনার মনে কী অনুভূতি জেগেছিল অথবা কোনো অনুভূতি জেগেছিল কিনা?

নিজের অভিনীত অনেক ছবিই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দেখেছি। আমি নিজের ছবি প্রথমতঃ নিজে প্রথমবার দেখলে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করি। প্রত্যেক জায়গাতেই মনে হয় আরও ভাল করা উচিত ছিল এবং সেই জায়গায় দর্শকসাধারণ যদি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বা বিরূপ সমালোচনা করেন তবে তা মনের ওপর গভীরভাবেই রেখাপাত করে।

অভিনেত্রী হিসেবে সার্থকতা লাভ করতে গেলে, আপনার মতে শিল্পীর কোন্ কোন্ বিশেষ গুণ থাকা দরকার?

হ্যাঁ, ভাল ভাল ছবি বাছাই করে দেখি। যে ছবির মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকে এবং যা দেখার পর বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—কিছু সঙ্গে নিয়ে এলাম সেই ছবিই ভাল লাগে। যেমন সাম্প্রতিক ছবিগুলোর মধ্যে 'রোমান হলিডে', 'মুলা রুজ', 'রোড টু হোপ,' 'এ্যানা', 'আন-ওয়ান্টেড উওম্যান' ছবিগুলো বেশ ভাল লেগেছে। কুৎসিকরুচিপূর্ণ ও দুর্বৃত্তপনা হলিউড-মার্কা ছবি দেখানোর মোটেই পক্ষপাতী নই। কারণ এগুলো মানুষের রুচিকে নীচের দিকেই নামিয়ে দেয়, কিছু শিক্ষা দেয় না। মানুষ কিছুক্ষণের জন্য তার মনের সুস্থতাকে হারিয়ে ফেলে।

আপনার অভিনীত কোন্ [illegible] বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে?

সেটা আমার চেয়ে [illegible] বেশী জানেন না কি? তবুও লিখছি কয়েকটা নাম আপ[illegible]

পরিবর্ত্তন, বিদ্যাসাগর, মেজদিদি, বাবলা, অন্নপূর্ণার মন্দির, মরণের পরে।

ছবিতে অভিনয়াংশ সম্বন্ধে সেই ছবির পরিচালক বা কাহিনীকারের সঙ্গে ছবির কাজ সুরু হবার আগে আলাপ আলোচনার অবকাশ পাওয়া যায় কিনা? সব ছবির ক্ষেত্রেই আপনার অভিনীত চরিত্র এবং সিচুয়েশন সম্বন্ধে আপনাকে সম্পূর্ণ অবহিত করানো হয়েছে কি? যদি হ'য়ে থাকে তবে কোন্ কোন্ ছবির ক্ষেত্রে তা' হয়েছে জানাবেন।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয় না। কারণ পরিচালকদের অবকাশ থাকে না। তবে সবক্ষেত্রে নিশ্চয়ই নয়। যে ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ পাওয়া গেছে সেক্ষেত্রে চরিত্র চিত্রণে অনেকখানি সহায়তা লাভ করেছি। প্রথম ছবি 'ছিন্নমূলে' আমি নিমাইবাবুর কাছে এবিষয়ে খুবই সাহায্য পেয়েছিলাম। চিত্ত বসু, অজয় কর, অর্দ্ধেন্দু মুখার্জি, অগ্রদূত, নরেশ মিত্র, কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় ও ভোলানাথ মিত্র এঁরা সকলেই চরিত্র ও সিচুয়েশন সম্বন্ধে আমাকে যথেষ্ট অবহিত করেছেন।

কোন্ ধরণের চরিত্র রূপায়ণে আপনি বেশী তৃপ্তি পান বা বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন?

যে কোনো সিরিয়াস চরিত্র অভিনয় করতে আমি ভালবাসি।

মঞ্চে অভিনয়ের কোনো ঝোঁক আছে কিনা এবং মঞ্চে যোগদানের ইচ্ছা আছে কিনা?

মঞ্চে অভিনয়ে ঝোঁক খুবই আছে তবে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যোগদানের ইচ্ছে আপাততঃ মোটেই নেই।

বোম্বাই চিত্রজগতে যোগদানের বাসনা আছে কিনা?

যদি আমার দেশে ভিখ মেলে তবে অন্যদেশে যাবার ইচ্ছে নেই। তবে বিশেষ কোনো কারণে খুব ভাল পরিচালক-এর অধীনে এক-আধখানা ছবিতে অভিনয়ের আহ্বান পেলে যেতে পারি।

সম্প্রতি দিল্লীতে ভর হাজার গৃহিণী ও জননী সিনেমার কুপ্রভাব প্রতিরোধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর কাছে এক সম্মিলিত আবেদন জানিয়েছেন, এ-

খবর আপনি নিশ্চয়ই রাখেন। জননী ও গৃহিণীদের এই আবেদনপত্রের সার্থকতা বা তাঁদের এই কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি ?

দিল্লীর সেই তের হাজার গৃহিণী ও জননীর আবেদন পত্রের সার্থকতা খুব আছে বলে আমার মনে হয় না, তার কারণ একমাত্র সিনেমার প্রভাবে কোন ছেলে মেয়েই খারাপ হয়ে যেতে পারে বলে আমার মনে হয় না। তবে ছেলে-মেয়েদের একটা বয়স পর্য্যন্ত মা-বাবার পছন্দমত ছবি দেখা উচিত। তারপর বয়স একটু হলেই তারা নিজেরাই ভালমন্দ বিচার করতে শেখে। সেখানে তাদের স্বাধীন মতামতের ও রুচির ওপর ছেড়ে দিতে হয়। তাহলে ভালমন্দ তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে। তবে এটাও স্বীকার করা উচিত যে সিনেমার সুপ্রভাব আবার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অনেক সহায়তা করে। সেটা তো জননীরা একবারও উল্লেখ করেন নি। তাঁদের দাবী করা উচিত যে শিক্ষাপ্রদ ও রুচিসম্পন্ন ছবি যেন আমাদের দেশে যথেষ্ট হয় যাতে আমাদের ছেলেমেয়েদের সেটা শিক্ষার মাধ্যম হয়।

চিত্র ও মঞ্চ-সংক্রান্ত পত্র, পত্রপত্রিকা আপনি নিয়মিত পড়েন কি ? এ-জাতীয় পত্রপত্রিকা আপনার কেমন লাগে ? বাংলা দেশের সিনেমা কাগজের ছবির সমালোচনা আপনার কেমন লাগে ? মতামত নির্ভয়ে এবং অকপটেই প্রকাশ করতে পারেন।

পড়ি। মোটামুটি ভাল লাগে। আপনাদের কাছে আমরা আরও কিছু আশা করি। যেমন দেশবিদেশের বড় বড় শিল্পী বা শিক্ষকদের কথা, তাঁদের ছবিগুলোর তর্জমা, তাঁদের জীবনী যা আমাদেরও শিক্ষনীয় এবং নিজেদের গণ্ডী ছাড়িয়েও আমরা যাতে বৃহত্তর জগতকে চিনতে পারি। এবং এ দেশের কাগজগুলো বেশীর ভাগই অভিনেত্রীদের পারিবারিক খুঁটিনাটি ও তুচ্ছ কথাগুলোকে এত বেশী ফলাও করে পরিবেশন করেন যে সেটা অত্যন্ত ধিক্কারজনক। যে অভিনেত্রীর জীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা তাকে শিল্পী হতে সহায়তা করেছে সেইটুকুই জানতে চাই, তার বেশী তার ঘরের খবর জানবার কোন প্রয়োজন কারোর থাকতে পারে না, থাকা উচিতও নয়। এবং আমাদের দেশের ছায়াশিল্পের আজ যে অর্থ নৈতিক অবনতি হয়েছে তার কারণ বিশ্লেষণ, তার উপায় নির্দ্ধারণ, এসব বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকা অগ্রগামী হয়ে সহায়তা করতে পারলে ভাল হয়। ছবির সমালোচনা বেশীর ভাগ কাগজই ভাল করেন, তবে সকলেই সে দলে পড়েন না। দোহাই আপনাদের, ব্যক্তিকে ভুলে তার কর্মকে বড় করে তুলুন এটাই অনুরোধ।

বাংলার গৌরব

'সুলেখা'

[‘সুলেখা’ কালির কারখানার অভ্যন্তরস্থ ক্রিয়াকাণ্ডের কয়েকটি ছবি এখানে দেওয়া হ'লো। বাঙালী মূলধনে ও পরিচালনায় গঠিত এবং নিত্য প্রসারমান এই প্রতিষ্ঠান ভারতের মধ্যে আধুনিক সাজ সরঞ্জামযুক্ত সর্ব্ববৃহৎ কালি তৈরীর কারখানা]

এ্যাড্ সল্ গাম ও পেষ্ট তৈরীর বিভাগ

অটোমিক ফিলিং মেসিন—বাতাস ও ধূলোর হাত থেকে কালিকে মুক্ত করার জন্যে। পাশে—জাল প্রতিরোধের জন্য অটোমেটিক ক্যাপ-সিলিং মেসিন

পরীক্ষাগার—কালি বাজারে ছাড়বার আগে ‘সুলেখা’ কালির সুনাম অনুরূপ নির্দ্দিষ্ট গুণাগুণ ও উৎকর্ষের মান এখানে পরীক্ষা করা হয়।

আমার কথা

★

ভারতভূষণ

চিত্ররাজ্যে আমার প্রবেশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে প্রথমে আপনাদের কয়েকটি কথা বলে নিই। চিত্রশিল্পী বা চিত্রতারকা হওয়ার মূলে অনেকের অনেকরকম কৈফিয়ৎ থাকে। আমার নিজের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম নেই। আমার বেলা আরও একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেকেরই থাকে একটা বংশানুক্রমিক বা পারিবারিক উৎসাহের উৎস—চিত্রশিল্পী হওয়ার পথে তা খুবই অনুকূল। আমার ক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম কোন পরিবেশের সহায়তাই আমি পাইনি বরং আমাদের বাড়ীর আবহাওয়াটা আমার চিত্রশিল্পী হওয়ার পক্ষে প্রতিকূলই ছিল বলা যায়। কারণ, আমার পিতা ছিলেন আইনজ্ঞ। তিনি ছিলেন মীরাটের সহকারী এ্যাডভোকেট। এই মীরাটেই আমার জন্ম—১৯১৯ সালে। ছোটবেলাটা একটানা এইখানেই দিন কাটলো আর সেইসঙ্গে সমানে লেখাপড়ার পালাও সাঙ্গ হলো—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী সংগ্রহ করে। বাড়ীতে সকলেই ভাবলেন, এইবার আমিও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে যথারীতি আইন-ব্যবসায়ে লেগে পড়বো।

কিন্তু, আপন অন্তরের বাসনাকে আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। চিত্ররাজ্যের মহাকর্ষণ আমায় নিরন্তর আহ্বান করে এসেছে তাই অধ্যয়নকালের মধ্যেও আমি প্রতিনিয়তই অনুভব করেছি সেই আকর্ষণ। চিত্রশিল্পী হওয়ার বাসনা আমায় এমনভাবে অভিভূত করে ফেলেছিল যে তার জন্যে আমি উঠে-পড়ে লেগে গেলাম—যেমন করে হোক চিত্রজগতে আমি প্রবেশ করবোই। সরাসরি শিল্পী হবার সুযোগ আমি পেলাম না। চিত্রশিল্প সংক্রান্ত অন্যান্য কাজকর্ম্ম জোগাড় করে তার সূত্র ধরেই চিত্রজগতের প্রথম সোপানে এসে পা দিলাম। অভিনেতা হওয়ার আকাঙ্খা আমায় পূরণ করতেই হবে। সুযোগ পেলাম বহু পরে—১৯৪২ সালে কিদার শর্ম্মা পরিচালিত 'চিত্রলেখা' ছবিতে। কলকাতায় তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হলো। এই ছবিতে ভূমিকা গ্রহণের পূর্ব্বে আমি নিয়মিত বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করতাম। ক্যামেরা বা মাইকের সামনে যাতে আড়ষ্টতা বা লজ্জার ভাব না আসে তার জন্যেই আমি এই অভ্যাস চালিয়ে গেছি। এইভাবে বক্তৃতা দেওয়ার মহড়াই আমি চালিয়েছি দেড় বছর ধরে। আপনারা হয়তো হাসছেন, কিন্তু আমার মনে হয় সত্যিকার শিল্পী হতে গেলে, অভিনয়ে জড়তা দূর করতে হলে এই ধরণের বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস করা, যা সংলাপ বলার নামান্তর মাত্র, নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। পরিচালক কিদার শর্ম্মা আমার মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার লক্ষণ দেখেছিলেন, কিন্তু, 'চিত্রলেখা' ছবিতে আমাকে ছোট-খাটো ভূমিকাতেই প্রথমে সুযোগ দিলেন। 'চিত্রলেখা' সে সময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। চিত্রশিল্পী হিসেবে আমার উন্নতি সেই 'চিত্রলেখা' ছবি থেকেই সুরু হয়েছিল। এর পরের ছবিটিতেই নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ পেলাম। এ-ছবিটি হলো রামেশ্বর শর্ম্মা পরিচালিত 'ভক্ত কবীর'। এর পরবর্ত্তী 'সোহাগ

রাত' ছবিতেও 'খোকা খোকা' ভাবের নায়ক-চরিত্রে অভিনয় করলাম। কিন্তু যে-ছবিগুলিতে অভিনয় করে আমি দর্শকদের স্নেহধন্য এবং প্রিয় হয়েছি তার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে পারি 'বৈজু বাওরা" 'মা' এবং 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' ছবি তিনটি। প্রথমটি ছিল সঙ্গীত-প্রধান ছবি। এই ছবি থেকেই দর্শকচিত্ত জয় করার সুযোগ আমি বেশী করেই পেয়েছি। এটিও পরবর্ত্তী দুটি ছবি সম্বন্ধেও সংবাদ পত্রাদিতে আমার সম্বন্ধে যে-পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে নিজেকে ভাগ্যবান বলেই মনে করি। এই ছবিগুলি জনপ্রিয় হওয়ায় অভিনয়শিল্পীর জীবন গ্রহণ করার কাজে উৎসাহও পেয়েছি। আমার অভিনীত সর্ব্বাধুনিকতম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি হলো 'শবাব,' এবং মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি 'কবি'। শেষোক্ত ছবিটি বাংলার স্বনামধন্য পরিচালক দেবকীকুমার বসুর পরিচালনায় তোলা হয়েছে।

ছবিতে বিভিন্ন ধরণের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে আমাদের যেন একই সঙ্গে দুটি ক'রে জীবন চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এর ফলে চিত্ররাজ্যে একটি কথার প্রচলন হয়েছে সেটি হলো 'গ্ল্যামার' শব্দটি। অথচ, আমার কাছে এ-শব্দটা বড় অবাস্তব বলেই মনে হয়। যার সত্যিকার প্রতিভা আছে তার 'গ্ল্যামার' জাতীয় শব্দ প্রয়োগে নিজেকে আবরণ এবং আভরণের ভারে ভারাক্রান্ত করে তোলার সার্থকতা কোথায়? পর্দ্দার ওপর শিল্পীকে দেখে দর্শকরা যে-ধারণা করে নেন, পর্দ্দার বাইরে, সাধারণ জীবন-যাত্রায়ও তারা বুঝি-বা সেই রকম ভাবেই থাকেন বলে দর্শকদের যে ধারণা আছে তা ঠিক নয়। আমার একটি ব্যক্তিগত বাসনার কথা আপনাদের জানাতে চাই। আমার খুবই ইচ্ছে আমি কোন ছবিতে 'ভিলেনে'র ভূমিকায় অভিনয় করি। আমাদের দেশের ছবিতে দেখা যায় যে কোন শিল্পীকে একটি বিশেষ ধরণের ভূমিকায় নামিয়ে তাকে পরপর সেই একই ধরণের ভূমিকায় নামানো হয়। সে যদি ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করে তো সেই ধরণের ভূমিকাতেই নামানো হবে বা হাস্যকৌতুকোদ্দীপক চরিত্রে অভিনয় যিনি করেন তাঁকে সেই ভূমিকা ছাড়া অন্য কোন ভূমিকাতেই নামানো হয় না। ছবির কাহিনী এবং চিত্রনাট্যও রচিত হয় ঠিক এই নিয়মকে কেন্দ্র করেই। আমাদের ছবির নায়করা তাঁদের সেই অভিনীত চরিত্র সম্বন্ধে এতটা সজাগ থাকেন যে দর্শকরা শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের পছন্দও করেন না। ফলে তা' তাঁদের মনে একঘেয়েমির সৃষ্টি করে। সমারসেট মম বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে সৎ এবং বদ্ অভ্যাসের মধ্যে যে কোনটির চর্চ্চা করলে তাদের মধ্যে যে কোনটির বিকাশ লাভ সম্ভব হতে পারে। সম্ভবতঃ সেই সূত্র ধ'রেই আমারও যেন বদ চরিত্র বা ভিলেনের ভূমিকায় অভিনয় করার বাসনা জেগেছে। সুযোগ পেলে আমিও এই ধরণের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে কৃতিত্ব প্রকাশ করতে পারি কিনা তার বিচার দর্শকরাই করবেন। একজন ফিল্ম-ফ্যান এক চিঠিতে আমার এক অভিনেতা-বন্ধুকে জিগ্যেস করেন, আমরা যেসব ভূমিকায় অভিনয় করি তা বরাবরের জন্যে মনে দাগ কেটে রাখে কিনা। কিন্তু সত্যিই যদি আমাদের তাই হতো তাহলে অমাদের পাগল্ হ'য়ে যাবার উপক্রম হতো। আমরা যতক্ষণ কোন ছবিতে কাজ করি ততক্ষণ সেই ভূমিকায় ডুবে থাকতে হয় বৈকি! তাই ব'লে তার রেশ যদি টেনে চলাতে হয় সেই ছবি

অভ্যস্ত হবার পরেও তাহলে কিন্তু খুবই মুস্কিলে পড়তে হবে। গতানুগতিক ধরণের একই ভূমিকায় অভিনয় করে তাই নিজেরও একঘেয়ে লাগছে ব'লে এবং নতুন রকমের আস্বাদ পাওয়া যাবে মনে ক'রে 'ভিলেনে'র ভূমিকায় অভিনয় করতে চাই এবং আশা করি দর্শকরাও আমার সেই নতুন মূর্ত্তি দেখে উপভোগ করতে পারবেন। শিল্পীর জীবনে এত বৈচিত্র্য আছে ব'লেই তা' আমার কাছে এত ভাল লেগেছে।

আমার কথা বলতে গিয়ে অনেক কথাই তো বললাম। কিন্তু, সর্বশেষে একটা কথা না বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে পারছি না। বিষয়টি খুব গুরুতর না হলেও আমার অন্তরে তা' গভীরভাবে রেখাপাত করেছে ব'লেই আমায় সে-বিষয়ে উল্লেখ করতে হচ্ছে। বিদেশী ছবির দিকে আমার নজর দিতে হচ্ছে—কেন তা বলছি। বিদেশী চিত্রজগতের কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর কথা আমার মনে পড়ছে। ক্লার্ক গেব্‌ল্‌, গ্যারী কুপার, গ্রেটা গার্বো, মেরিলীন মন্‌রো, পল মুনি, এ্যালেক গাইনেস্, ফ্রেডারিক মার্চ—সত্যিই এঁদের অভিনয়ের তুলনা হয় না। কেন এঁদের অভিনয় এত সাড়া জাগায়, তার কারণ, বোধ করি একটিমাত্র—এবং তা হলো, এঁদের অভিনয়ে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। পর্দার ওপরেও এঁদের অভিনয়ের মারফতে সত্যিকার ব্যক্তিসত্তাটি অতি নিপুণভাবে ফুটে ওঠে। এঁদের এই স্বীয় ব্যক্তিত্বটি অভিনীত ভূমিকায় ফুটিয়ে তোলাই এঁদের কৃতিত্ব এবং প্রতিভা প্রকাশের নিদর্শন এবং তা দর্শকচিত্তে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় ব'লেই তাঁরা সত্যিকার শিল্পী। তাঁদের বেশভূষারই শুধু অনুকরণ না করে কেমনভাবে অভিনীত চরিত্রে স্বীয় ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলেন সেই ধারাটিও প্রত্যেক শিল্পীরই উচিত আয়ত্ত করা। নানান্ ধরণের ভূমিকায় অভিনয় করে আমিও যদি নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ পাই এবং দর্শকদের যদি তা আকৃষ্ট করে তবে তার চেয়ে সান্ত্বনা এবং সন্তুষ্ট হওয়ার মতো অন্য কোন বস্তু সত্যিকার শিল্পীর পক্ষে ঈপ্সিত নয় বলেই আমি মনে করি।

★★★কাজের মানুষ রাজ★★★

এস কে ভাটিয়া

('চিত্রবাণী'র বোম্বাই প্রতিনিধি)

জলের প্রবাহ যেমন ছুটে চ'লে একটা প্রকাশের পথ খুঁজতে থাকে, শিল্পীর ভেতরের আমি সত্তাটিও যেন তেমনি একটা প্রকাশের পথ খুঁজছে অবিরাম—শিল্পীর অন্তরের ভাব রূপ নেবার চেষ্টা করে সৃষ্টির কাজে। রাজকাপুরের মধ্যে এই শিল্পী সত্তাটি প্রকাশের পথে যখনই বাধা পেয়েছে তখনই সেই বাধাকে ভেঙে চুরমার ক'রে এগিয়ে গেছে তার লক্ষ্যে পৌছবে ব'লে—পরিণামে যত পেয়েছে প্রশংসা তত জুটেছে সমালোচনার তীব্র কশাঘাত। বাঁধের ওপর জলস্রোত যেমন আছড়ে আছড়ে পড়ে তেমনিধারা হয়েছে রাজের অবস্থা। কিন্তু রাজকাপুর বিচলিত হয়নি কিছুতেই। কাজের প্রতি তার আসক্তি এবং নিষ্ঠা অসামান্য। তার প্রকৃত কর্ম্মশক্তির চেয়েও দ্বিগুণ উৎসাহে সে কাজ করবার চেষ্টা করেছে, তার পক্ষে জানা যতটা সম্ভব তার চেয়েও বেশী জানবার চেষ্টা সে করেছে। এই বহুল পরিমাণ জ্ঞান অনেক সময় তার মনে নানান ভাব এবং উচ্ছ্বাসের এক জগাখিচুড়ীর সঞ্চার করে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই অন্তরের নির্দ্দেশই তার সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। যেমন, 'আওয়ারা' ছবির সেই বিরাট স্বপ্নের দৃশ্যটির কথা ধরা যাক। বহুদিন ধরে সে ঐ দৃশ্যটির পরিকল্পনা মনে মনে আঁচ করতে পারে নি। সেট্, ক্যামেরার অবস্থান, সঙ্গীত—সবই যেন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন সমস্ত কুয়াসা দূর হ'য়ে সব কিছু পরিষ্কার হ'য়ে যায়। এর কোনরকম কৈফিয়ৎ রাজকাপুর দিতে পারে না—এর সন্ধান দিয়েছে তার অবচেতন মন—যা সব সময় একটা নির্দ্দেশ পাঠিয়েছে নতুন কিছু একটা করবার, বিরাট কিছুর স্বপ্ন দেখবার, যা আর কেউ পারে নি তারই সন্ধান সে দিয়েছে আর তার নিদর্শনও ছবিতে পাওয়া

গেছে। রাজকাপুরের ছবি ভাল বা মন্দ যে পর্য্যায়েই পড়ুক না কেন অন্যান্য সাধারণ ছবি থেকে এর পার্থক্যটা কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজকাপুর খুব ছোট বয়েস থেকেই উচ্চাভিলাষী। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাশাও তার ক্রমাগত বেড়েই গেছে। তার কাছে যেন অসাধ্য ব'লে কিছুই নেই। রাত্রে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা নিয়ে ভাবতে থাকে—কাল যা করতে হবে আগের দিন সে তাই ভেবে-চিন্তে ঠিক করে রাখে। অনেকে বলে, রাজকাপুর সব সময় নিজেরই চিন্তায় মগ্ন। হয়তো তাই-ই। ভবিষ্যতের চিন্তা যখন সে করে তখন তার নিজেরই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করে, তার নিজের পরিকল্পনা আর ছবির চিন্তাতেই সে নিমগ্ন হয়ে থাকে। রাজকাপুরের কাজের মানুষের রূপটি থেকে তাকে পৃথক ক'রে দেখাটাই হল ভুল। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব আর তার কাজ এ দু'টিই তার কাছে অভিন্ন। রাজ যখন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন সে তার কাজের চিন্তা নিয়েই ধ্যানস্থ থাকে—সার্থকতার শীর্ষে পৌছবার একাগ্র উদগ্র বাসনাই শিল্পীর একমাত্র অভিপ্রেত বস্তু। আসল অভিনয়ের সময় ছাড়াও অন্য সময়েও অভিনয় করে যাওয়াটাও রাজকাপুরের আর সব দুর্ব্বলতার মধ্যে অন্যতম। এই ক'বছরের ভেতর রাজকাপুরের মধ্যে অপর একটি মানুষের যেন সৃষ্টি হয়েছে। সেই দ্বিতীয় মানুষটিকেই আপনারা পর্দ্দার বুকে এবং মঞ্চের ওপরও দেখতে পান।

পিতার কাছ থেকে আর সব জিনিষের মধ্যে সে যেটি লাভ করেছে তা' হলো নিয়মিতভাবে সময়ানুবর্ত্তী না হওয়া। অনেক জিনিষই মীমাংসা না করে শেষ পর্য্যন্ত ফেলে রাখাটা তার একটা স্বভাব-দোষ দাঁড়িয়ে গেছে। বেশ সহজ স্বচ্ছন্দভাবেই সে সময় কাটাতে চায়। তাস খেলে বা একখানা বই নিয়ে খানিকক্ষণ সে মেতে ওঠে। তারপর যখন দেখে বেশ দেরী হয়ে গেছে তখন আবার তার কাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করে—যতটা কাজ করবার ছিল সেটা শেষ করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। মন্থর গতিতে কাজ করার জন্যে তার খুবই বদনাম আছে—তার দেরী

অরোরার মুক্তি-প্রতীক্ষিত 'জয়দেব' ছবির একটি দৃশ্যে পরাশর চরিত্রে রবীন মজুমদার এবং নাম-ভূমিকায় অসিতবরণ

হওয়ার একমাত্র কারণ হলো সম্পূর্ণ নিখুঁত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ সে করে না। অতি যত্ন নিয়ে বা দরকার হ'লে তার 'রিটেক'-এর অন্ত থাকে না। কিছুকাল আগে একখানি ছবির চিত্রনাট্য রচনার ব্যাপারে সে দেড় বছর কাটিয়েছে এবং তার পরে সেটির চিত্রগ্রহণ করা হয়। কিন্তু চিত্রগ্রহণ সুরু হ'লে রাজ আর সকলের চেয়ে কম সময়ে ছবি তোলা শেষ করে ফেলে।

রাজকাপুর কথাবার্ত্তাতেও বেশ পাকাপোক্ত এবং জমজমাট। কোন বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা চলার সময় তার যুক্তির তোড়ের মুখে আর কেউ পেরে ওঠে না—হয়তো সেই বিষয় সম্বন্ধে রাজ-এর ততটা জানা নাও থাকতে পারে। নিজের সম্বন্ধে রাজ সম্পূর্ণ পরিতুষ্ট। অপরের কাজের প্রশংসা করার সময় যতটা শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা তার প্রাপ্য তার এতটুকুও তাকে জানাবার কার্পণ্য সে করে না। এই গুণটি সে পেয়েছে পিতার কাছ থেকে। তিনি রাজকে শিখিয়েছেন—যতই তুমি অপরের কাছে নতি স্বীকার করবে অপরের কাছে ততই তুমি স্বীকৃতি পাবে।

অপর্য্যাপ্ত টাকা রোজগারের প্রলোভন তার মোটেই নেই আর অনাবিল বিলাসিতার স্রোতেও সে কোনদিন গা ভাসিয়ে দেয় নি। বিরাট কিছু একটা করার দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে সার্থক করে তোলার উদ্দেশ্যে সে অপরের বক্তব্য মন দিয়ে শোনে এবং অপরের কাজের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের কিছু অংশ সে সব সময় কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে। রাজ তার নিজের ছবির বেলায় গল্পের মূল আলম্বটুকু জানিয়ে দেয়। সে-ছবির সঙ্গীত, ক্যামেরার কাজ, সেট্ এবং অভিনয় সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার নির্দ্দেশ দিয়ে দেয় তার ছবির সহকর্ম্মীদের। সেই নির্দ্দেশ অনুসারেই তারা ছবি তোলার কাজে মেতে উঠে। তার যে অপূর্ব্ব টিম-ওয়ার্ক রয়েছে তার জন্যে সে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। তাদের সে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে এবং তাদের জন্যে সে গর্ব্বিতও! তার নিজের প্রেরণার ফলেই তার কর্ম্মীবৃন্দ অতখানি কুশলী হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই ছেড়ে চলে গেছে—পরিচালক, কাহিনীকার, শিল্পী এবং সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে যশ অর্জ্জন করেছে, কিন্তু রাজ-এর মনে হয়েছে তার নিজের জগতের খানিকটা অংশ যেন তার কাছ থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

রাজ-এর ষ্টুডিওটিই হলো তার ঘর-বাড়ী, তার কর্ম্মকেন্দ্র—সেইটাই তার নিজের জগৎ।

অসাফল্য কি জিনিষ তার পরিচয় রাজ আজও পায়নি—তবে ছায়াছবির ব্যবসায়ে এটা যে মৃত্যুর মতোই অবশ্যম্ভাবী সে সম্বন্ধেও সে সমান সজাগ। একদিন হয়তো তার ছবি পর্য্যাপ্ত অর্থাগমে সমর্থ হবে না কিন্তু তখন তার কি মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সে বিষয়ে কিন্তু রাজ আজ ঠিক কিছু বলতে পারে না। সে শুধু এইটুকুই জানে ছবি তৈরীর কাজ হলো কোনো একটা মহৎ কাজে নিজেকে উৎর্গস করারই সামিল—সেখানে অসাফল্যও তাকে প্রেরণা জোগাবে নতুন করে পরিশ্রম করবার এবং আদর্শকে সফল করে তোলার সাধনায়।

সুমিত্রা দেবী যা বলেন•••

(বোম্বাই সংবাদদাতা প্রেরিত)

সম্প্রতি সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি কয়েকটি মূল্যবান এবং সুস্পষ্ট কথা বলেছেন। প্রথমতঃ কি ধরণের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করতে চান সে-বিষয়ে তিনি মনের কথা খুলে বলেন। দুশ্চরিত্রা স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করার বাসনা তিনি ব্যক্ত করেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, 'বহু ভারতীয় ছবিতেই সত্যিকার ভারতীয় চরিত্রের রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা থাকে না। বেশীর ভাগ ছবির নায়িকাই হয় সুশ্রী, মহৎ-প্রাণা আর বেশ ভাল মানুষ, তার আরও থাকে বিভিন্নপ্রকার সৎ গুণাবলী। এর বিপরীতে যদি দুশ্চরিত্রা ধরণের কোন স্ত্রী-চরিত্র সৃষ্টি করা হলো তো তাকে রূপায়িত করা হলো খুবই জঘন্য চরিত্রের স্ত্রীলোক হিসেবে। এ-বিষয়ে প্রতিবাদ করে সুমিত্রা দেবী বলেন,—আমি এমন ধরণের দুশ্চরিত্রা স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করতে চাই যেটি হবে 'ষ্ট্রেঞ্জ উওম্যান' ছবিতে হেডী লামার যে-ধরণের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সেই ধরণের। গুরু-গম্ভীর ভূমিকা ছাড়াও হাল্কা ধরণের চরিত্রে অভিনয় করতে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছে কিন্তু সেগুলো একদম চটুল ভূমিকা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সত্যিকার অভিনেত্রী সবরকম ভূমিকায় অভিনয় করতেই সক্ষম হবেন—বিশেষ এক ধরণের চরিত্রে অভিনয় করে যাওয়া ঠিক নয়। সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, জাঁকজমকপূর্ণ বা রূপকথার গল্প নিয়ে সৃষ্ট ছবিতে অভিনয় করলেও আধুনিক কাহিনী সমন্বিত ছবিতে অভিনয় করতেও আমি পেছ-পা নই।

বোম্বাই আর বাংলার চিত্রশিল্প সম্বন্ধে তিনি বলেন, বাংলা ছবিতে সত্যিকার ভালো কাহিনী আছে এবং সে সব ছবিতে ভারতীয় আবহাওয়াই বজায় থাকে। দর্শকদের কাছে তাই বাংলা ছবির আবেদনও প্রচুর। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে একমাত্র মুস্কিলের ব্যাপার হলো টাকার অভাব। ছবি তোলাও হয় বড় ধীরে ধীরে—অবশ্য ছবির সংগঠকদের মধ্যে একতা এবং মৈত্রীভাব যথেষ্টই আছে। কলা-কৌশলের কাজের দিক থেকে বোম্বাই-এর ছবিই অধিক অগ্রগামী কারণ তাদের উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি যথেষ্ট রয়েছে। এই অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় বোম্বাই চিত্রজগতের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। বোম্বাই চিত্রজগতে নিয়োগ করার মতো টাকার প্রাচুর্য্য আছে কিন্তু সত্যিকার কাহিনীমূলক কোনো ছবি সেখানে তোলা হয় না। সেখানে সব কিছু নির্দ্ধারিত হয় নিছক ব্যবসাদারী ভাবেই। শিল্পীদের সব টাকা-কড়ি মিটিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রযোজকের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। কোন চুক্তিপত্রে সই করার আগে শিল্পীরা পারিশ্রমিকের ব্যাপারে মাছের বাজারের মতো পছন্দসই দরাদরি করতে পারেন। বোম্বাইতে প্রযোজকরা বহু শিল্পীর সঙ্গেই কথাবার্ত্তা চালান এবং যে অভিনেতা বা অভিনেত্রী সব-চেয়ে কম পারিশ্রমিক নিতে রাজী থাকেন তাঁর সঙ্গে চুক্তি করেন। বাংলা দেশে কিন্তু ভূমিকার শিল্পী-নির্ব্বাচন পূর্ব্বেই পাকাপাকি হয়ে যাবার পর তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালানো হয়। প্রযোজক যা দিতে পারবেন তা শিল্পীকে জানান এবং অভিনেতৃবর্গও তাতে রাজী হয়ে যান—পারিশ্রমিকের হার অবশ্য ন্যায়সঙ্গতভাবেই ধার্য্য করা হয়। দিনকয়েক চিত্রগ্রহণের পর কোনো শিল্পীকে বিদায় দিয়ে সেই জায়গায় অন্য শিল্পীকে দিয়ে অভিনয় করানোর নজীর বোম্বাইতে আছে কিন্তু বাংলাদেশে এটি হয় না। কেননা, পূর্ব্বে অন্য কোন শিল্পী কর্তৃক অভিনীত একই ভূমিকায় অপর কোন শিল্পী অভিনয় করতে সম্মত হন না।

চিত্রগ্রহণের অন্তরালে: সম্প্রতি দলবলসহ পরিচালক ফণী বর্ম্মা অরোরার 'জয়দেব' ছবির কয়েকটি দৃশ্য গ্রহণের জন্য পুরী যান। পুরীতেই চিত্রগ্রহণের প্রাক্কালে রবীন মজুমদার ও অসিতবরণ গল্পগুজবে মগ্ন